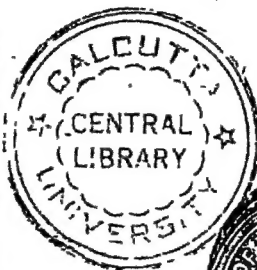


কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় - ৩
 CUL - H04287-3-2584201

যুগলমুণ্ডি

ত্রিগুণতৈল

যাবতীয় শিরোরোগের মর্হেষ্ণ



একজনীন বোতলের মুখে
 লালরং-এর জালনিবারণ
 ছিপির উপর পরিচালকের
 ফটো ও কোম্পানির নাম
 দেখিয়া লাইবেন

প্রতিনিয়ত অজস্র বই বেবুছে বাজারে কিন্তু গ্রন্থস্বল্প-এর বইয়েব মতো এমন সুনির্বাচিত, সুশোভন, পবিপাটি ও সম্পন্ন প্রকাশন নিঃসন্দেহে দৃষ্টিগোচর। বাংলা প্রকাশনার গ্রন্থস্বল্প সূচীত করেছে এমন এক বলিষ্ঠ, বৈশ্ববিক ও যথার্থই যুগোপযোগী এবং অভিনব।

অখণ্ড অমিয় শ্রীগোরাঙ্গ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

প্রথম খণ্ড (২য় মূদ্রণ) ৮.৫০ দ্বিতীয় খণ্ড ৮.০০ তৃতীয় খণ্ড ৭.৫০

‘এই দেখে চৈতন্যের কৃপা মহাবল। তার অনুসন্ধান বিনা করয়ে সফল।’ এই কবুগার ধারান্যানেই লেখকের যাত্রাব প্রাণ কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ সে জীবন। / কেন কৃষ্ণ বল ডাই হই এক মন। / ভজ কৃষ্ণ সম্ব কৃষ্ণ শূন্য কৃষ্ণনাম / কৃষ্ণ হ জীবন ধন প্রাণ। / নাম কীতনই ভক্তের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। সত্যযুগে ধ্যান, স্বাপবে অর্চনা আব কলিতে শব্দ হ কৃষ্ণ কথায় কি তুমি মেটে.....? শ্রীনাম কীতনই কৃষ্ণভজন। প্রেম ভক্তব বসন ব্রহ্ম, সব্বদুগ সমস্যা দীপসমুদ্র লেখকের শ্রম সাহায্যের অমৃত পানীয়ধার্য আপনার মনপ্রাণ রসানুদিত হয়ে উঠবে। আর বড়ি কোন

উপন্যাস	প্রবন্ধ	২৬ জন লেখক-লেখিকা
সীমন্তিনী	মধু জীবনীর নতুন ব্যাখ্যা	অভিজ্ঞতা সম্বন্ধ একটি
নীহারবল্লভ গুপ্ত	বাণী বায়	৭.০০
খড়িমাটির স্বর্গ	স্মৃতি চিত্রণ	৭.০০
দীপক চৌধুরী	পবিমল গোস্বামী	৭.৫০
অরুণ-বাহি	বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ	৭.৫০
তারাক্ষক বন্দ্যোপাধ্যায়	মৈত্রেয়ী দেবী	
মণ্ডকন্যা	ছোট গল্প, রম্যচর্চা ও অন্যান্য	
ধনঞ্জয় বৈরাগী	বাক্স বদল (চলচ্চিত্রে ব্যপ্যিত)	
রাতের পাখি	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২.৫০
শক্তিপদ রঙ্গগুরু	ভালবাসার ইতিহাস	
সুখীশিখা	শিববাম চক্রবর্তী	২.৫০
মায়া বসু	প্রেমের গল্প	৪.০০
নন্দন নয় মন	প্রতিভা বসু	৪.০০
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য	শ্রেষ্ঠ গল্প	৫.০০
রাঙামাটির পাহাড়ে	চাবুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৫.০০
সৈলেশ দে	বিচিত্র মনসী	৫.০০
চাল সন্ধ্যা	শ্রীপাথ	৩.৫০
বিভূতি গুপ্ত	পরকীয়া	৩.৫০
মাণিক্য রায়ের প্রেমকথা	উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	৩.৫০
বেদুইন	সামনে চড়াই	১.৫০
	প্রেমেন্দ্র মিত্র	৩.৫০
	প্রিয়তমেশ্বর	৩.৫০
	ডঃ নবগোপাল দাস	৩.৫০
	সেই কলকাতা	৩.৫০
	দেবেশ দাস	৩.৫০

ছোটদের জন্যে মজার মজার বই

দাদুনাতীর দৌড়	২.২৫
শিবরাম চক্রবর্তী	
রোলান্দব ২০৫	২.৫০
পরিমল গোস্বামী	
বাঘের চোখ	২.৫০
লীলা মজুমদার	
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ	২.৭৫
মণি গঙ্গোপাধ্যায়	

কিস্তিগত গ্রন্থ তালিকার জন্য লিখুন

পত্রিকা সিডিগেট প্রাইভেট লিমিটেড

১২/১ লিম্বুসে স্ট্রীট, কলকাতা ১৬

‘বন্দু প্রভাতকুমারকে নমস্কার কবি, তিনি ফাঁকি দেননি—তাজাডাউ বা একখানা বই লেখেন নি। হযতে কাথাও কেথাও হুটি থাকতে পারে, অগভীরতা বা শৈথিল্য দেখিনি। আজ থেকে প্রায় অর্ধশতক পূর্বে প্রভাতকুমার এই বলে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

মনস্বী লেখক প্রভাতকুমার এবাব উপহার দিয়েছেন তাঁর অর্গণিত ভক্ত

পৃথিবীর ইতিহাস

(প্রাচীন ও মধ্যযুগ—প্রথম খণ্ড)

সুদৃশ্য রঙিন জ্যাকেট মোড়া, জমকালো বোরস বাঁধাই, মূল্যবান আর্টপেপার দম্প্রাপ্য ছবি সহ দাম খোল টাকা

ভারতে জাতীয় আন্দোলন

প্রভাতকুমার মুনোপাধ্যায়

১১.০০

স্কুল কলেজ, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে বিশেষ আকর্ষণীয় এবং আমরা পুস্তক ব্যববাহ কবি। কিস্তিগত জানিতে হইলে

সারদা-রামকৃষ্ণ

—সম্মানিত হীদ্যগোষ্ঠী বচিত—
হৃদয়ান্তরঃ—সর্বদ্রস্মলব জীবনচরিত।
গ্রন্থখানি সর্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট হইয়াছে।
শ্রীরামকৃষ্ণ মিশ্রের অনেক সম্মানীঃ—
পাঠিতে পড়িতে ভ্রম্য হইয়া শ্রীশ্রীমাতের
ও শ্রীশ্রীঠাকুরের যেন জীবন্ত স্পর্শ
অনুভব করিয়াছি।

সন্তোষের মুদ্রিত হইতেছে।

গৌরীমা

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যের অপূর্ণ জীবনচরিত
হৃদয়ান্তরঃ—তিনি একাধারে পবিত্রজিকা
তপস্বিনী, কন্মী এবং আচার্য। ঘটনাব
পব ঘটনা চিত্তকে মগ্ন করিয়া রাখে।
গৌরীমার অলোকসামান্য জীবন
ইতিহাসে অমূল্য সম্পদ হইয়া থাকিবে॥
পঞ্চমবার প্রকাশিত হইয়াছে—৫,

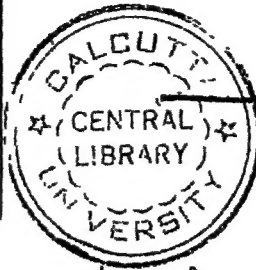
সাধনা

আনন্দবাজার পত্রিকা—ভারতীয় সভ্যতার
আদিকাল হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত
যে সকল উচ্চভাবপূর্ণ স্তোত্র সম্পন্ন
ইত্যাদি বচিত হইয়াছে, তাহাব উল্লেখ-
যোগ্য প্রায় সবগুলিই ইহাতে স্থান
পাইয়াছে। ধর্ম, সংস্কৃতি ও সাহিত্য...
তিন দিক দিয়াই ইহা মর্যাদা পাইবার
যোগ্য॥

পরিবর্তিত পঞ্চম সংস্করণ—৪,

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম

২৬ মহালালী হেমন্তকুমারী স্ট্রীট, কলিকাতা



756.3

100121

পৃষ্ঠা বিষয়

লেখক

১১	সম্পাদকীয়		
১২	ববীন্দ্রনাথের পত্রগুচ্ছ		
১৪	শেষ অভিনয়	(গল্প)	—শ্রীভারতশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
২৬	প্রতিমা রহস্য ও মূর্তিপূজা	(নিবন্ধ)	—শ্রীসুধময় ভট্টাচার্য
৩০	স্মৃতিসভা	(গল্প)	—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র
৩৪-৩৯	মা বোন বোঁ	(উপন্যাস)	—শ্রীবিমল মিত্র
৫০	একা দোকা	(গল্প)	—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়
৫৪	একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	(গল্প)	—শ্রীবনফুল
৫৬	যজ্ঞবল্লভ	(গল্প)	—শ্রীমুনোজ বসু
৬১	সূর্যস্বেতের আগ্নেয়	(গল্প)	—শ্রীস্ববাজ বন্দ্যোপাধ্যায়
৬৫	উত্তরামারণ	(নিবন্ধ)	—শ্রীসুধুমার সেন
৬৭	সিঞ্চিলাভ	(বড় গল্প)	—শ্রীনাথবাণ গঙ্গোপাধ্যায়
৭৫	নিজস্ব সংবাদদাতা	(নিবন্ধ)	—শ্রীকৃষ্ণ ধর
৭৯	হারানো বোতাম	(রহস্য গল্প)	—শ্রীবিমলনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৮৬	সেহতার নিরন্তর	(নিবন্ধ)	—শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য
৮৮-১১৯	জটায়ু	(উপন্যাস)	—শ্রীমহাশ্বেতা দেবী
১২০	বাংলা সাহিত্যে দ্বৈত বিচিত্র রূপ	(নিবন্ধ)	—শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়
১২৩	স্বর্গ	(গল্প)	—শ্রীলীলা মজুমদার

যুম পোয়াছ ? চুল বেঁধে শুতে কিন্তু ভুলবেন না !



এতিদিনের কর্মব্যস্ততার পর রাতে যখন চোখের পাতা ঘুমে
জড়িয়ে আসে তখন যতাবতই ইচ্ছে করে কোনরকমে শুয়ে
পড়তে। চুল আঁট করে না বেঁধে শুলে চুলের সাবলীলতা হ্রাস
পায়। ঝাঁদের অল্প বা অল্প কাবনে চুল উঠছে বা ঝাঁদের
চুলের সৌন্দর্য্য অত্যধিকভাবে হ্রাস
তাদের পক্ষে বিশেষ করে খানিক-
ক্ষণ চুলের গোড়াগুলিতে জ্বাকুহুম ভেল
মালিশ করে, তারপর ভাল করে চুল
আঁচড়ে, আঁট করে চুল বেঁধে, তবে
শোওয়া উচিত। মনে রাখবেন, চুলের
খোঁরাক আর যত্ন হুটোই সমান দরকার।



জিবাকুমার

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জ্বাকুহুম হাউস, ৯৬, চিত্তরঞ্জন এডিনিউ, কলিকাতা-১২

১৩৬/৭৮



“আমি যদি

রেলের অধিকর্তা
হ’তাম.....

রেল প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দিতাম—অনলাইনগকে
বেন জ-নিরে দেওয়া হয় যে বাজীরা টিকিট না কিনলে ট্রেন চলাচল বন্ধ
করে দেওয়া হবে এবং তাঁরা নিজেদের থেকে পাওয়া ভাড়া দিলে আবার
ট্রেন চলাচল শুরু করা হবে।”

—মহাত্মা গান্ধী



পূর্ব রেলওয়ে

== পূজার অভিনয়যোগ্য নাটক ==

প্রত্যেকখানা ২.৫০ হিঃ

মেন লাহিড়ী— পান্থশালা
শীল মদ্যোপাধ্যায়— অনর্থ
রাজকর বন্দ্যোপাধ্যায়— কালরাত্রি
পল দত্ত— চাঁদর কোঠা
মথনাথ বিলী— পারমিট
রমেশ নাগ— প্রতিধ্বনি
গণীকুমার— সন্তান ৩
অভিষা— স্বামী বিবেকানন্দ
শ্রীমধব রায়— সহস্রাব্দী
ধীরেন মিত্র— মহানারক শমশক
হীরেন্দ্র মদ্যোপাধ্যায়— পলাশী
হরনাথ চক্রবর্তী— বৈশালিনী
বীরেশ্বর বসু— থাকসিদ্ধ
যোগেশ চৌধুরী— পরিবর্তা
বিধবক ভট্টাচার্য— ক্ষমা, পিতাপুত্র,
অভাব, এণ্টনী কবিরাজ, ভোজার পতাকা
দেবনারায়ণ গুপ্ত— শ্রীরাঙ্গপ্রসাদ
প্রশান্ত চৌধুরী— পল্লভাষ্য শ্রীরাঙ্গকৃষ্ণ
বটাকটক, মৃদুস্বামী, প্রত্যাবর্তন
উৎপলেন্দু সেন— সিন্ধু গৌরব,
পাথসারথি, রত্নভিষাক
কলবর চট্টোপাধ্যায়— প্রাণের দাবী
P. W. D. রীতিমত নাটক,
সত্যের সন্ধান, শক্তির মন্ত্র,
রাজরাশি, ধানুষ চাই
মহেন্দ্র গুপ্ত, সত্যেন সিংহ— কালপদার্থ
শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়— জীবন সংগ্রহ

মহেন্দ্র গুপ্ত প্রণীত

দুর্গেশনন্দিনী, টিপু সুলতান, উত্তরা,
শাপমন্ডি, সোনার বাংলা, শ্রীদর্শী,
মহারাজ নন্দকুমার, রাফসিংহ, পৃথিবীরাজ,
কম্বাবতীর ঘাট, রাণী ভবানী, মৃগালিনী,
রঞ্জিত সিংহ, দেবী চৌধুরাণী, বিজয়-
নগর, হারদার আলি, শকুন্তলা, উষাহরণ,
গয়াতীর্থ, মহালক্ষ্মী স্বর্গ হতে বড়,
শতবর্ষ আগে, সর্বাধী শ্রীকৃষ্ণ, চক্রধারী,
রাণী দুর্গাবতী, উর্বশী, রাজনর্তকী।
কনক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সমা-
লোচনা সহ গিরিশ বোষের— জনা, প্রফুল্ল
বিশ্বেন্দ্রলাল রায়ের— সাতাহান, মেবার
পতন, চন্দ্রগুপ্ত।

মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ ভট্টাচার্য
প্রণীত

বাংলার বৈষ্ণব দর্শন ৭

সুশীলকুমার ভট্টাচার্যের সদ্য প্রকাশিত
বিশ্বলোক সাহিত্যের

ধারা পাঁচ টাকা

অভিষা প্রণীত

যে বন সরসী তীরে ৯

ত.রামকর বন্দ্যোপাধ্যায়
ভুবনপুত্রের হাট-৬

শ্রীমদ্র লাইব্রেরী ফোন ০৪-২১৪৩
২০৪ বিধান সরণী, কলিকাতা ৬



পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
১২৫-১৩২	কৃষ্ণভা—সবিত্রী বিদ্যুৎ দে. সের ভট্টাচার্য, অবুধ মিত্র, চিন্ময় দাস, কীরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, হরপ্রসাদ মিত্র, হরেন্দ্রনাথ সিংহ, নরেন্দ্র চরণ চট্টোপাধ্যায়, অরবিন্দ গুহ, কামাকীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুদীপ গঙ্গোপাধ্যায়, নবনীতা সেন, বাসু বসু, মৃগেন্দ্র নাথ, উমা দেবী, অদোবরপ্রদ নাথগুপ্ত, জগদীশ চন্দ্রকান্ত, শান্তিনন্দনাথ বোষ, মৃণাল, পদ্ম, উদয় সন্ন্যাস, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শংকর দে, বীরেন্দ্রনাথ বসু, শান্তনু দাস, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, আশিস সান্যাল, পবিত্র মৃদোপাধ্যায়, গুণেন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্র সেনগুপ্ত, চিন্ময় গুহঠাকুরভা, মণীন্দ্র নাথ।	
১৩৩	রাজসী	(গল্প) —শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
১৩৭	অমবকটক	(গল্প) —শ্রীআশাপূর্ণা দেবী
১৪১	বর্ষা	(গল্প) —শ্রীআশুতোষ মৃদোপাধ্যায়
১৪৪	যোড়া কপালে তেঁজা খাচ	(শিকার) —শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বোষ
১৫০	পদ্মমণ্ডল	(গল্প) —শ্রীপ্রান্তকর হুট
১৫৫	বন্দন	(গল্প) —শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু
১৫৮	লক্ষ	(গল্প) —শ্রীবিভূতিভূষণ মৃদোপাধ্যায়
১৬১	সত্যসন্ধ	(এককল্প নাটক) —শ্রীকৃষ্ণদেব বসু
১৭০	বই সংগ্রহের খতিব	(নিবন্ধ) —শ্রীভবানী মৃদোপাধ্যায়
১৭৩	মৃগচন্দ্র	(গল্প) —শ্রীপদ্মিনী গোস্বামী
১৭৭	প্রারম্ভ	(গল্প) —শ্রীগদ্যেন্দ্রকুমার মিত্র
১৮২	অপরাধ প্রসঙ্গ	(নিবন্ধ) —শ্রীসুভদ্রা বসু
১৮৪	ভয়	(গল্প) —শ্রীদীপক জেহুদী

বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম

সংশোধিত ও পরিবর্তিত ২য় সংস্করণ

প্রশ্নোত্তরে ডিজেল ইন্জিন

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত বাংলা ভাষায় ডিজেল ইন্জিন, পেট্রোল ইন্জিন ও ইলেকট্রিক সম্বন্ধে চিরসহ বিভিন্ন বিষয়ের বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। প্রত্যেক Engineer, Engine Driver এবং Mechanic (Marine & Land) -এর প্রয়োজন অনুযায়ী লিখিত।

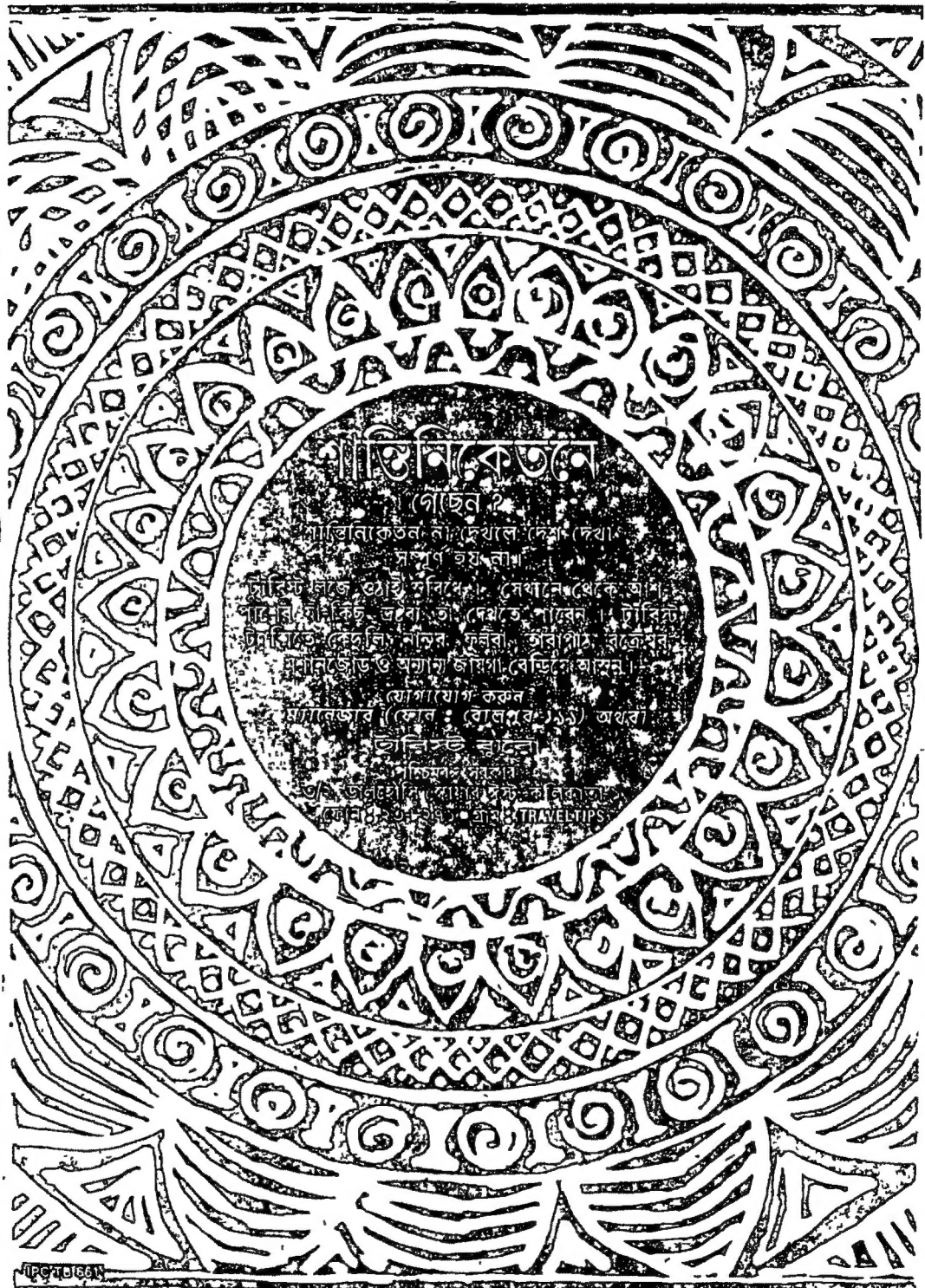
Rear-Admiral, Retd. T. B. Bose (Ex-Tech Director, Jayanti Shipping Corp. Ltd.) এবং Sri S. K. Paul (Engineer Superintendent, Calcutta Port Commissioner) কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত।

দাম ৪ দশ টাকা

বিঃ দ্রঃ—ভি, পি-তে পাইতে হইলে অগ্রিম দুই টাকা পরাইবে।

RABINDRA LIBRARY

15/2, Ghyama Charan De Street, Calcutta-12: Phone: 34-8338.



॥ গান্ধী স্মারক নিধির বই ॥

বাহির হইল

আত্মকথা

মহাত্মাজীর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ

'The Story of My Experiments
with Truth'-এর

সচিত্র নূতন বাংলা সংস্করণ

অনুবাদ : শ্রীমদেবপ্রসাদ গুহ

মূল্য : বারো টাকা

*

কয়েকখানি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ

গান্ধী-রচনা-সংকলন

মূল্য ৫.০০

স্বামী পদ্রুবোত্তমানন্দ অবধূত

প্রণীত

মহাত্মাজীর

গঠনকর্ম-গুরুতি

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় উক্ত-প্রশংসিত

মূল্য : ৩.০০

মোহনমালা

একখানি নিত্যব্যবহার্য গান্ধীবাদী-
চরিত্রিকা

মূল্য : ৩.৫০

ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

মহাত্মা গান্ধী

লেখকের ব্যক্তিগত জীবনসম্বন্ধে অনুপম
জীবনী

মূল্য : ৫.৫০ ও ৬.৫০ (কাপড়ে বঁধাই)

সর্বোদয়ের গথ

বিশিষ্ট গান্ধীবাদী নেতৃবর্গের হাশপের
সংকলন

মূল্য : ৩.০০

সম্পূর্ণ পুস্তকভাগিকার জন্য পত্র
লিখুন।

প্রকাশন বিভাগ

গান্ধী স্মারক নিধি (বাংলা)

১২ডি, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৩



পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
১৮৮	চৈনিক দারু মৃত্তি (রহস্য গল্প)	—শ্রীঅশ্রীশ বর্মন
১৯৪	তাসিনে তিনদিন (ভ্রমণ)	—শ্রীদীক্ষণবল্লভ বসু
১৯৮	কবচধামায় হত্যাকাণ্ড (বহস্য কাহিনী)	—শ্রীবিপ্লবী মথোপাধ্যায়
২০১	সিংহাসনে নারী (নিবন্ধ)	—শ্রীপ্রমীলা
২০০	বাংলার পুজাপার্বণ (নিবন্ধ)	—শ্রীবেলা দে
২০৪	পদ্মবের চোখে নারী (নিবন্ধ)	—শ্রীজাভা পাকড়াশী
২০৬	পাললৌকিক (নকসা)	—শ্রীআশা দেবী
২০৮-২৫১	ভাপ (উপন্যাস)	—শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষ
২০২	ছাত্রী-বোধি (গল্প)	—শ্রীসুখনাথ ঘোষ
২০৬	সর্বনাশ (গল্প)	—শ্রীশ্রীলেক্ষা বসু
২৪০	মন্দির পরিভ্রমণ (নিবন্ধ)	—শ্রীকমল চৌধুরী
২৪৫-২৬৯	চলচ্চিত্র	
২৪৫	সমালোচকের লড়াই (নিবন্ধ)	—শ্রীনির্মলকুমার ঘোষ (এন কে জি)
২৪৭	তপন সিংহের ছবি (নিবন্ধ)	—শ্রীভবেন্দ্র সান্যাল
২৫২	বাংলা ছবির বিষয়ে	
	মৃণাল সেন (নিবন্ধ)	—শ্রীঅজয়কুমার বসু
২৫৯	বাংলা ছবির বিষয়ে	
	কৃষ্ণক ঘটক (নিবন্ধ)	—শ্রীসত্যরত্ন দে
২৬১	বাংলা ছবি ও তার শিক্ষণীয় (নিবন্ধ)	—শ্রীবিনতা ঘোষ
২৬২	ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল প্রসঙ্গে (নিবন্ধ)	—শ্রীসত্যজিৎ রায়
২৬৭	নারক-নাথিকা (নিবন্ধ)	—শ্রীবিজয় দত্ত
২৭০	হোলিউডের প্রেক্ষাপট (নিবন্ধ)	—শ্রীসুধীকান্ত সরকার

• কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ •

অবনীন্দ্রনাথ ॥ শ্রীলীলা মজুমদার

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ সাহিত্যিকরূপে কতটা সাফল্যলাভ করেছেন এই গ্রন্থে
তা আলোচিত হয়েছে। ২.০০

অবকাশ ও তত্ত্ববস্তুর বিচার ॥ ফ্রেডরিস হার্বার্ট ব্রেডলি

Appearance and Reality-গ্রন্থের প্রাক্তন অনুবাদ। অনুবাদ
করেছেন শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মজুমদার। ৮.০০

জাতীয়জীবনী ॥ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দীর্ঘদিন পরে মুদ্রিত মহর্ষি-সচিত্র এই মহামূল্য গ্রন্থখানিতে অনেক নূতন
তথ্য সংযোজিত হয়েছে। ১২.০০

ইতিহাসের মূর্তি ॥ অতুলচন্দ্র গুপ্ত

ইতিহাসের মূর্তি, ইতিহাসের বীতি, বৈজ্ঞানিক ইতিহাস, ইতিহাস, এই চারটি
মুদ্রিত রচনায় সমৃদ্ধি। ২.৫০

নদীপথে ॥ অতুলচন্দ্র গুপ্ত

পত্রাকারে লিখিত বাংলা ও আসামে জলপথভ্রমণের বিবরণ। ২.০০

পূর্ণকুম্ভ ॥ শ্রীবানী চন্দ

ভীষ্ম-ভ্রমণের কাহিনী। অনেকটা ডাবেরির ভঙ্গিতে লেখা। ১৯৫০ সালে
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ববীন্দ্র-পুস্তক-প্রাপ্ত। ৫.০০

বৌদ্ধদের দেবদেবী ॥ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য

বৌদ্ধ মূর্তিশাস্ত্র এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবদেবী সম্বন্ধে আলোচনা। ৩.০০

হিমাদ্রি ॥ শ্রীবানী চন্দ

কৈলাস-বদবী ভ্রমণ-কাহিনী। লেখিকার 'পূর্ণকুম্ভ' গ্রন্থের ন্যায় সুখপাঠ্য। ৪.০০

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন । কলিকাতা ৭

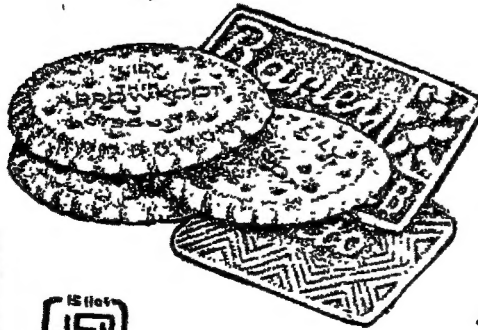


বিশিষ্ট স্বাদের জন্যে



লিলি
বিস্কুট

আজ সকলেরই প্রিয়



LB-27/67



লিলি বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪

জেনারেলের গুজা-অর্থ

॥ দলপ ও উপন্যাস ॥

• শিবজেন গম্পোপাধ্যায়ের

চৈত্রদিনের করা পাতার

পথে ... ৬.০০

দিনগুনি মোর কোথায়

গেল ... ৬.০০

এতটুকু ডুল

... ৩.০০

• অমরেন্দ্র মধোপাধ্যায়ের

চার্লি চ্যাপলিন

... ৩.০০

• চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস

ফুলমণি ও করুণা

... ৫.০০

• জ্যোতির্ময়ী দেবীর

আরাবল্লীর আড়ালে

... ১.৫০

• বিভূতিভূষণ মধোপাধ্যায়ের

বর্ষায় ৩.০০

চৈতালী ৩.০০

• পরিমল গোস্বামীর

টোমের সেই লোকটি

... ২.০০

• বোম্বালা কবিনাথমের

ভারতীয় গল্পসংকলন

৪.০০

• জনার্দন চক্রবর্তীর

স্মৃতিভারে

... ৫.০০

॥ প্রথম কাহিনী ॥

• স্বামী ভাগ্যেশ্বরানন্দের

উত্তরসার্য দিশি

... ৩.০০

• কপা সেনগুপ্তের

ডলারের দেশে

... ৪.০০

• যশোবর্ত্তের

হিমালয়ের চিঠি

... ৬.০০

॥ কাব্য ও সম্মতি ॥

• মোহিতলাল মজুমদারের

বিস্মরণী

... ৫.০০

• প্রমথনাথ বিশীর

ঘুড়বেণী

... ২.০০

• দিলীপকুমার রায়ের

শিবজেন্দ্র-গীতি

... ৮.০০

হাসির গান

... ৩.০০

[জেনারেল প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশিত]

জেনারেল বুকস্

এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২



পুস্তক

বিষয়

লেখক

২৭২ মহাকাশ যাত্রার এক দশক	(নিবন্ধ)	—শ্রীদিলীপ বসু
২৭৫ পাথর প্রতিমা	(গল্প)	—শ্রীশেফালী চট্টোপাধ্যায়
২৭৭ উন্মোচন	(গল্প)	—শ্রীঅমল আত্মীজ আল আমান
২৭৯ ভালবাসা	(গল্প)	—শ্রীনিমিত্তা চক্রবর্তী
২৮১ একটি রাইব অপেক্ষা	(গল্প)	—শ্রীনীলিমা মধোপাধ্যায়
২৮৪ পৌড় পবিত্রতা	(নিবন্ধ)	—শ্রীকেশবনাথ বসু
২৮৭ হিসাবনিকাশ	(গল্প)	—শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

অনুবাদের :

সবশ্রী প্রব বাবু, সুবোধ দাশগুপ্ত, সুব্রত
দ্বিপাঠী, নিতাই ঘোষ, স্বপন রায়, মল্লিক-
শঙ্কর দাশগুপ্ত।

কটো : অমৃত
শ্রীসুকুমার বসু

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

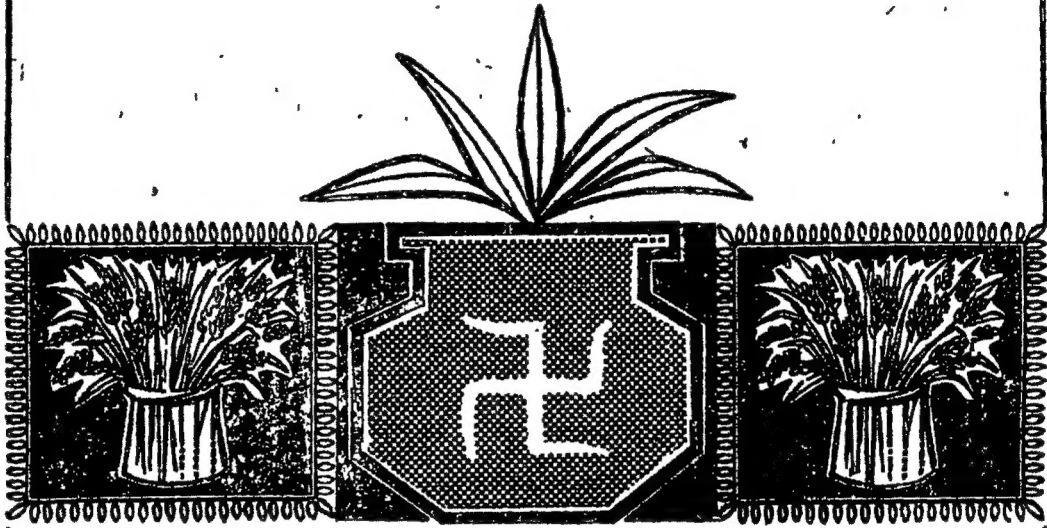
প্রকাশিত অমৃত্য গ্রন্থসারঞ্জি :

১। অভয়া ঝংগল (শিবজি রামদেব প্রণীত)	
—ডঃ আশুতোষ দাস কর্তৃক সম্পাদিত	মূল্য ৭.০০
২। এগারটই বাংলা নাট্যগ্রন্থের দৃশ্য নিবন্ধন	
—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় কর্তৃক সম্পাদিত	মূল্য ৬.০০
৩। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য নৃত্য—ডঃ যতীশচন্দ্র মধোপাধ্যায়	মূল্য ৭.৫০
৪। ধর্মমঙ্গল (মহান রায় মধোপাধ্যায়)	
—শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত ও শ্রীমতী সুনন্দা গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত	মূল্য ১২.০০
৫। দার্শনিক রায়ের পাঁচালী	
—ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত	মূল্য ১৫.০০
৬। বিদ্যাপতির শিবগীত—শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত	মূল্য ৪.০০
৭। দ্বৈতধর্মের ভারতীয় সমাজ—ডঃ নাথুরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	মূল্য ২.০০
৮। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের চর্চা—ডঃ তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত	মূল্য ৭.৫০
৯। প্রাচীন কবিবালার গান—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র পাল কর্তৃক সম্পাদিত	মূল্য ১৫.০০
১০। প্রাগৈতিহাসিক মোহন জো দাডো—শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ গোস্বামী	মূল্য ৫.৫০
১১। সাহিত্যে নারী প্রতীক ও নৃসিং (লীলা বসুতামালা)	
—শ্রীমতী অননুপা দেবী	মূল্য ৬.০০
১২। স্বাধীন রাষ্ট্রের লবঙ্গপত্র—শ্রীমখনলাল সেন	মূল্য ২.০০
১৩। বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও বিকাশ—শ্রীমমতমোহন রায়	মূল্য ৭.০০
১৪। বাংলা আধুনিক কাব্য ১৮৫০-১৯০০—ডঃ প্রভাকরী দেবী	মূল্য ৬.৫০
১৫। কবি কুমার দাসের গ্রন্থাবলী	
—ডঃ সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত	মূল্য ১০.০০
১৬। কাণ্ডীকারেরী—ডঃ সুকুমার সেন ও শ্রীমতী সুনন্দা সেন	মূল্য ৫.০০
১৭। কৃষি বিজ্ঞান ১ম খণ্ড (কৃষির মূলনীতি)	
রাববাহাদুর যাজ্ঞেশ্বর দাশগুপ্ত	মূল্য ১০.০০
১৮। জ্ঞান গীতিকা (লালনশাহ ফকিরের গান)	
ডঃ হরিলাল দাস ও ডঃ পশ্চিকান্তি মহাপাত্র কর্তৃক সম্পাদিত	মূল্য ৭.০০
১৯। পদ্মাপুরাণ (কবি বিজয় গুপ্ত)	
শ্রীজয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত	মূল্য ১২.০০
২০। মনসামঙ্গল (কবি জগজীবন কৃত)	
—শ্রীসুধেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য ও ডঃ আশুতোষ দাস কর্তৃক সম্পাদিত	মূল্য ১২.০০
২১। পবনরামের কুমারঙ্গল—শ্রীনিমিত্তা দাশগুপ্ত	মূল্য ১২.০০
২২। শিবসম্বন্ধীতন নামা বা শিবায়ন	
শ্রীযোগীলাল হালদার কর্তৃক সম্পাদিত	মূল্য ৮.০০
২৩। শ্রীচৈতন্যের ও তাঁহার পারদর্শন	
—শ্রীগিরিজাশঙ্কর বাঘচৌধুরী	মূল্য ৩.৫০
২৪। মহানন্দ শিবজেন্দ্রলাল—শ্রীদিলীপকুমার বাবু	মূল্য ৫.০০
২৫। গীতার বাণী—শ্রীঅনিলবরণ বসু	মূল্য ২.০০

বিস্তৃত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন —
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন বিভাগ

৪৮নং হাজরা রোড কলিকাতা-১৯ ফোন ৪৭-১৭৬৬ ও ৪৭-১৪৬৬

॥ শারদীয় অভিনন্দন ॥



শারদীয় উৎসবের এই শুভক্ষণে আমরা আপনাদের আন্তরিক
 শুভেচ্ছা জানাচ্ছি
 আর আপনাদের সুখ, সমৃদ্ধি ও সুন্দর স্বাস্থ্য কামনা করছি।

গাজার ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

শারদীয়া ব্রতীয়া ১৩৭৪

বিশ্বাস্যত বর্ষগের পর এবর আকাশে শারদোৎসবের আমন্ত্রণ। তার মেঘ হালকা, তার নীল আরও কোমল এবং ক্রান্ত। এই দিনগুলির জন্য আমরা, বাংলাদেশের মানুষ, অপেক্ষা করে থাকি। আনন্দের কাল থেকেই আমাদের নিমন্ত্রণ এই উৎসবে। মাতৃ আবাহন এই উৎসব স্নিগ্ধ, সুন্দর এবং উজ্জ্বল।

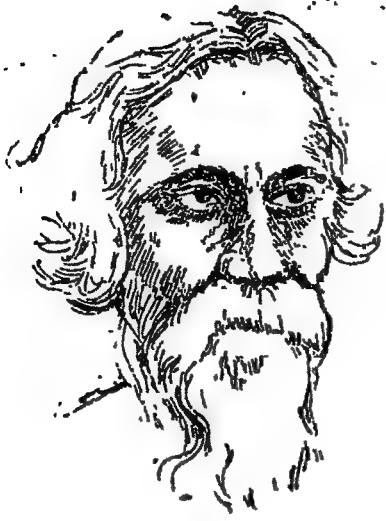
এই দিনেই হরোঁছিল শক্তিরূপিণী দুর্গার অকালবোধন। এই দিনেই জননীর জন্য স্নেহাতুর সন্তানদের আকুল প্রার্থনা উচ্চারিত। এই দিনেই জননীর স্নেহস্নিগ্ধ অঙ্গল সন্তানদের দেয় পরম সান্নিধ্য, নিশ্চিত আশ্রয়।

বাংলাদেশের আকাশে শরৎ আগমনীর সুর নিয়ে বেজে ওঠে। ঋতু বিচারে এর সঙ্গে অন্য কোনো ঋতুর তুলনা হয় না। শহর থেকে দু'পা এগিয়ে বাইরে গেলেই দেখা যাবে কী অপূরণীয় আয়োজন এই আগমনী উৎসবের। 'শিউলিগন্ধ সাড়া দিয়েছে মালতীলতার পাতায় পাতায় শূদ্র ফুলের অসংখ্য অনুপ্রাস, কিন্তু রাতে চাঁদের আলোয় আকাশ-জোড়া একখানি মাত্র শূদ্রতা। কাশের গুচ্ছ সার বেঁধে দাঁড়িয়ে বাতাসে মাথা নত করে পৃথিবীর শারদ-সংগীত শুনিয়ে দিচ্ছে।' কবির এই বর্ণনার সঙ্গে নিখুঁত মিলে যার আজকের শারদ-বাংলার আঙিনার শূদ্র-শূদ্র চিহ্নটি।

তবু এই আনন্দ-আয়োজনের মধ্যেও আমরা উপলব্ধি করি, দেশের অন্তরে সেই সুর যেন কোথায় কেটে গেছে। খরা এবং তারপর প্লাবনে অসংখ্য মানুষ নিঃস্ব, রিক্ত এবং নিরস্ত। খাদ্যের অভাবে চারদিকে হাহাকার। দুঃখী মানুষ এই সময়ে কিছু প্রত্যাশা করে। উৎসব-দুয়ারে প্রার্থী হয়ে এসে দাঁড়ায়। এ-বৎসর সেই প্রত্যাশা অরও বাস্তব, আরও অনিবার্য।

এই নিদারুণ দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে আমরা দিনাতিপাত করছি। শরতের পর হেমন্ত-লক্ষ্মী নবান্নের ডালা পূর্ণ করে আমাদের আশ্বাস দেবেন। এবারে যেন সেই আশা আমাদের ব্যর্থ না হয়।

আমাদের এই উৎসব মানব-কল্যাণের উৎসব। পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনাই আমাদের উৎসবের প্রার্থনা। সেই প্রার্থনা এবার কোটিকোটে উচ্চারিত হোক।



রবীন্দ্রনাথের

পত্রগুচ্ছ

(১)

ঙ

কল্যাণীয়েবদ,

কতদিন ধরে ভাবিচি তোমাদের চিঠি লিখি। কিন্তু একদিকে কু'ডেমি, অন্যদিকে ব্যস্ততার মিলে হয়ে ওঠে নি। দেশে থাকতে তুমি আমাকে ছবি সম্বন্ধে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়োছিলে। তখন ভেবেছিলুম অত্যাশ্চর্য করচ। দক্ষিণ ফ্রান্সে যখন পৌঁছলুম, আমার বন্ধু "কান্" সাহেবকে ছবির কথা বললুম, কিন্তু ছবি সম্বন্ধে সে নিতান্ত আনাড়ি। সে বলে, এ সব এত

নতুন আমি কিছু বুঝতে পারিচি নে। যখন তাকে একজীবনের কথা বললুম সে বললে, খবরদার, এমন কাজ কোরো না—তোমার এত বড় মস্ত খ্যাতি, যদি ফরাসীরা অটহাস্য করে তাহলে লজ্জা পেতে হবে। শব্দে মনটা দমে গেল। ইতিমধ্যে খবর পেলুম পোল্ জাতীয় একজন ভালো আর্টিস্ট পাড়ায় কোথায় আছে। তাকে একদিন ডেকে এনে ছবিগুলো দেখাতেই সে একেবারে আশ্চর্য হয়ে গেল। তার স্ত্রীকে বললে, আমি তো গ্রিশ বৎসর এই কাজ করে আসিচি, ইনি দু বছরে বা করেচেন আমি করতে পারলে খুঁসি হতুম। এ আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিলে। প্যারিসে গিয়ে একদিন সেখানকার সমজদারদের দেখানো গেল। তাদের একজন আমাকে বকে জড়িয়ে ধরে বললে, আমি জানতুম তুমি great, কিন্তু আজ সত্যি বোঝা গেল তুমি কত great। কেউ কেউ বললে এসব ছবি আমাদের আর্টিস্টদের পক্ষে এডুকেশন। ইত্যাদি ইত্যাদি। ওরাই সবাই চেষ্টা করে একজীবন করলে। লজ্জা পেতে হয় নি। আমার পক্ষে এ সমস্ত অভাবনীয়। এখন বার্মিংহাম Picture Galleryতে একজীবন চলছে। সেখানেও প্রচুর প্রশংসা বেরিয়েছে। বোধ হয় তার কিছু কিছু তোমাদের চোখে পড়ে থাকবে। সুহৃদের কাছ থেকেও কিছু শুনতে পাবে। এই তো গেল আমার চিত্রাঙ্কনপর্ব। তার পরে অক্সফোর্ডে লেকচারের আসরও জমোছিল। তোমাদের মারামারি খুনোখুনির মধ্যে এসব খবর পৌঁছন্ন কিনা জানিনে—পৌঁছেলেও হয়তো স্বাদ মরে যান। অক্সফোর্ডে হ্যাভেল এবং উড্ডফের সঙ্গে দেখা হল—কেমন যেন জরাজীর্ণ হয়ে গেছে।

এখন আছি এল্‌মহাস্টের বাড়িতে। রথীর। থাকে আর একটু তফাতে। তার শরীর মোটের উপর অনেকটা ভালো।

তোমাদের খবর কিছুই জানিনে। গগন কেমন আছে? এখনো কি কথা কহিতে পারে না?

রবিকাকা।

২

ঙ

অবন,

তোমরা আমার আশীর্বাদ জেনো। ইন্সব্রুকের আবেশ বেড়ে ফেলে উঠে পড়বার চেষ্টায় আছি। তবুও বিছানার ধারে ধারেই আমার দিনব্যাপার খেলা বেয়ে চলিছি। বোমা আজকাল ভালোই—রথীর কোনো উপসর্গ নেই। আরো বহুদূরে পালাতে পারলে আমি খুঁসি হতুম। কিন্তু সেই নিরাপদ দূর পদার্থটি পৃথিবীর ভূগোল খণ্ডে দর্শন। বস্তুত এই সে

পালাবার ইচ্ছে এটা কেবল নিজের সমস্ত খুচরো দান্নিষের নিরন্তর উৎকাবর্ষণ থেকে। যেখানেই যাব এই ব্যাক আমার সঙ্গে সঙ্গেই চলবে। পিছন ফিরে এক দৌড়ে বালককালে পৌঁছতে পারলে তবেই নিষ্কৃতি পেতুম। সেইজন্যই আজকাল যখনতখন মনের জানলা খুলে সেই কালটির দিকে তাকিয়ে থাকি। তখন কোনো পরীক্ষা পাশ করিনি, কোনো প্রাইজ পাইনি, রবি নামটা নিরুপাধিক, তার পঞ্চাশতীর্ষ ঠাকুরটা পর্যন্ত বর্জিত। যা খুঁসি তাই করলে কিম্বা কোনো কিছু না করলে তার জবাবদিহী নেই। কর্তব্যবিহীন দেবলোকে দেবতারা যেমন থাকেন সেই রকম। সবাই জিজ্ঞাসা করে কি করচ, যদি বলি, বেঁচে যে আছি কেবলমাত্র এইটি ভালো করে অনুভব করবার চেষ্টা করচি, তাহলে ওপাড়ার সবাই বলবে লোকটা বড়ো হাল্কা। সর্বদা যথোচিত গাম্ভীৰ্য রাখবার চেষ্টায় ও আরোজনে বড়ো মনটাকে কবে চেপে ধরচে—সেই আরব্য উপন্যাসের ঘাড়ে-চড়া দাড়িওয়ালা মানুষটার মতো। ইতি ৯ কার্তিক, ১৩৩৮।

রবিকাকা।

৩

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়েব্দ

অবন, চীনের আর্টিস্ট জু পিয়ন, বিশিষ্ট গৃহী লোক। তোমাদের সোসাইটি হলে তাঁর ছবির প্রদর্শনী হবে—যা কিছুর আশ্রয় হবে চীনের সাহায্যের জন্যে দেবেন। এই প্রদর্শনী উদ্ঘাটনের ভার তোমাকেই নিতে হবে—এই কাজটি চীনের প্রতি আমাদের কর্তব্যের অঙ্গ। আমার শরীরে যদি কুলোত তাহলে আমি যেতুম কিন্তু ছবি প্রদর্শনার নেতৃত্ব তোমাকেই শোভা পায়। ইতি ৫।২।৪০

রবিকাকা।

শান্তিনিকেতন

৪

৫

কল্যাণীয়েব্দ

অবন, তথ্যসূত্র। কিন্তু আমি আমাদের অধ্যাপক দলকে ভুল করি—তারা রীতিমত গুরুদশায়, "আর্ট" সম্বন্ধেও তারা বেত উঁচিয়ে থাকে, হাঁক পাড়ে। এদের টিটকিরি কাটিয়ে উঠতে তোমার যৌবন পার হবে এল—কিন্তু আমার মেয়াদ তো বেশি দিনের নয়—শেষ দশায় কটকটবোর আঁধি লাগবে, আর "অন্যে বাক্য কবে কিন্তু আমি রব নিরন্তর।"

যা হোক বিপদের সময় তোমরা অভয় দিয়ো। দোল পূর্ণিমার দিন পাঁচ ছয় পরে এখান থেকে একদল যাবে জুজুংসু দেখাতে এবং সেই সঙ্গে নববসন্তের



অবনীন্দ্রনাথকে
লিখিত

গীতোৎসব হবে। সেই উপলক্ষ্যে ছবিগুলো পাঠিয়ে দেব।

জোড়াসাঁকোর লীলা অবসান হবার সমস্ত এসেচে। ওর এখন "অস্তমিত মহিমা"। স্রোত গেছে মরে সাঁকো পড়ে আছে—আর ভালো লাগে না—তোমরা আছ বলেই তবু শেষ বাতির মূখে আলো জ্বলচে, এইটুকু নেববার পূর্বেই বিদায়ের রাস্তা খুঁজে বেরিয়ে পড়া ভালো। ইতি তারিখ জানিনে, ফাল্গুন, ১৩৩৭।

রবিকাকা।

শেষ আভিনয়

অভিনেতা বাম্পা বোস, গল্প বলছিলেন। যাত্রা দলের বিখ্যাত অভিনেতা। যার বিশেষণ হল চিরতরুণ! যাত্রাওলারা বিজ্ঞাপনে লেখে, চিরতরুণ অভিনেতা বাম্পা বোস।

* * *

বাম্পা বললে—“মনে হল দিশ-বদিশ বছরের যুবতী এবং রূপবতী।

এক পিঠ কখকবে কালো চুল, পিঠের উপর ঝোঁপে পড়ে আছে। পরনে এক ইণ্ডি চওড়া কালা পেড়ে ধুতিই হোক আর শাড়ীই হোক, গায়ে টাইট হাতা সাদা রাউস; এবং বাকে বলে পানোমত পরোয়না তাই। শূদ্ধ শরীরে একটু মেদ জমেছে, না হলে অর্থাৎ ছিপছিপে হলে বা দেহখানি হালকা থাকলে তিরিশের নিচে বয়স বিধবা যুবতী বলা যেতো। কারণ সিঁথিতে সিঁদুর নেই, হাতে চুড়ির গোছা নেই এবং পরনের কাপড়ের পাড়টা এক ইঞ্চির বেশী চওড়া নয়। মুখে এখনও পেষ্ট রয়েছে, ঠোঁটে লিপস্টিকের রঙ টুকটুক করছে, তাতে মুখখানাকে দূর থেকে কাঁচা দেখালেও কাছে থেকে বদলে পারা যাচ্ছে, বর্ষায় দুকূল ভরা পাথার হলেও গঙ্গানদী বহুকালিনী। তবে অনন্ত-যৌবনা বা ঐশ্বর-যৌবনা।

ঝরঝর রাজবাড়ীর রাস উৎসবের সময়। একটা আশ্চর্য অভিনয় হয়ে গেল। এমন অভিনয় একালে মানুষেরা দেখে নি, একথা এক বাক্যে ঘোষণা করে গেল। আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য এই যে, বিনোদ অপেরার তিন দিন অভিনয়ের মধ্যে দু-দিনের অভিনয় দেখে লোকে চিৎকার করে গেছে, চিটকারী দিয়ে গেছে, শাসিয়ে গেছে, তাদের ঢোল-তবলা কেড়ে নেবে। সেই বিনোদ অপেরার শেষ অভিনয় যে এমন হবে এ তো কম্পনার অতীত।

দু-দিনের গাওনা খরাপ হওয়ায় আসরে লোক বেশী হয় নি। আগের আগের দিনের চেয়ে কমই হয়েছিল। কিন্তু এই কম লোকের আসরই এমন একটি জমাট অভিনয়ের এবং কানায় কানায় টলোমলো রসের আসর হয়ে উঠবে এ কেউ কম্পনাই করতে পারে নি। কিন্তু তাই হয়েছে।

প্রথম রাতে আসরের প্রথম দিকে লোক বেশী হয় নি। কিন্তু পালাটা, প্রথম থেকেই এমন জমে উঠল যে, রাত্রি দশটা হ’তে হতে আসর জমে উঠল; ঝরঝর বাজার পর্বন্ত খবরটা রটে গেল, “বিনোদিনী এমন গাইছে যে, বসলে আর ওঠা যায় না। আর পাটও করছে তেমনি। যেমন বিনোদিনী তেমনি হিরো বাম্পা বোস।” কথাটা রটল মুখে মুখে এবং টেলিফোনে।

বাম্পা বোস বললেন, পালা ছিল স্যার ‘মদন ভাস্কর পর’। এককালের ভাল বই, নামকরা বই। কিন্তু কতিন বই। ঘটনাটা হল হর কোপানলে মদন ভাস্কর হয়ে গেলেন, রাত কাঁদতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমরেরা মবে গেল, ফুল সব বারে গেল, ফল ফসল হবে না। তখন মহাদেব বললেন, মদন বাঁচবে। মদন বাঁচবে কুঙ্কর ওবসে রুক্মিণীর গর্ভে পুত্র হয়ে জন্মাবে। এবং সেই বধ করবে শম্বর নামক দৈত্যকে। শম্বর দৈত্যকে সেই সংবাদ দিয়ে গেল, আমাদের পুত্রাণের সকল ল্যাঠার ‘লাটার ফল’ নারদমুনি।

রসভঙ্গ করে বাম্পা বোসকে প্রশ্ন করে বসলাম—কোথায় বাড়ী আপনার? মানে আপনি রেচো কিনা? ‘লাটার ফল’ শুনে জিজ্ঞেস করছি।

হেসে বাম্পা বোস বললেন, শব্দটা মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে। বাড়ী বর্ধমান জেলা। কাটোয়ার ওদিকে। ছেলেবেলা লাটার ফল এনে লোকের বাড়ীতে ফেলে দিতাম যে। আর অব্যর্থ ছিল। ফেললেই ঝগড়া বাখত।

বললাম, ও অভিজ্ঞতা আমারও আছে। বলুন এখন।

বাম্পা বোস আবার আরম্ভ করলেন। তার আগে গম্পের আসর সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলে নি। বলার প্রয়োজন আছে।

যাত্রা সম্পর্কে আমার অনুরাগ ও প্রীতির কথা সর্বজন-বিদিত। সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহ আসক্তি ছিল, সে নাওয়া-খাওয়া ভোলানো উৎসাহ। এবং যার পরিণতি হল এক মর্মান্তিক ট্রাজেডিতে। সেবার অভিনয় নিয়ে যখন প্রমত্ত হয়ে রইছি, তখন আমার মেয়ে বুল্লুব মল্লোরিয়া হল, ম্যালিগন্যান্ট ম্যালোরিয়া। এই প্রমত্ততার মধ্যে তার চিকিৎসার দিকেও নজর রাখতে পারি নি; ফলে সে হঠাৎ মারা গেল। আমার লেখার মধ্যে এসব আছে। অভিনয় করা তখন থেকে ছেড়েছি, কিন্তু অভিনয় দেখার নেশা যায়নি। বিশেষ করে যাত্রাগানের দলের অভিনয়।

আমাদের গ্রামে কো-জাগরীতে ব্যবসাদারেরা বাবোয়ারী আসর পাতেন। লক্ষ্মীপুজো করে দরিদ্রভোজন করান, আর যাত্রার আসর বসান। দেশে ব্যবসায়ের বাজারে এখনও ঈশ্বর-বস্তির রেওয়াজ আছে। খরিস্দার বা বিক্রীদার যেই আসুক, কোন কারবার করুক অর্থাৎ ধান নিয়ে এসে বিক্রীই করুক, আর ধান-চাল কি খইল, ডাইল কিনেই নিয়ে যাক, বাজারনিয়ম অনুযায়ী দুই তরফেই হয়তো বা টাকায় পয়সা বা নয়াপয়সা হিসেবে কিছু ঈশ্বরবৃষ্টি হিসেবে পাতায় জমা হয়।

এ টাকা থেকে আগে কি হ’ত জানিনে, তবে শতাব্দিক বৎসর ধরে বারোয়ারি বা বারোইয়ারি ব্যবস্থায় ওই একটা পুজো উপলক্ষ্য করে দরিদ্র ভোজন এবং যাত্রা থিয়েটার, এমন কি আগের কালে টপ কীর্তন কি খ্যামটা নাচও হয়েছে। বারোইয়ারির দেবতা তিনটি, প্রথম মা লক্ষ্মী, দ্বিতীয় মা কালী, তৃতীয় মা গণেশ্বরী। এই ঈশ্বরবৃষ্টির প্রসার ছিল বহু বিস্তৃত। ধান-চালের বাজার থেকে কয়লার বাজার পর্বন্ত বিস্তৃতি আমার জানা আছে। কলিয়ারিতেও বারোয়ারি কাঙ্গী পুজো হয়। সেখানে কলয়ার খরিস্দারদের

আরম্ভ
কলিয়ার



কাছে বৈমল ঈশ্বরবৃন্দ আদায় হয়, তেমনিই এ বৃন্দ আদায় হয় কুলিকামিনন্দর কাছ থেকেও।

কথাটা বোধহয় অবান্তর হল, তা হোক।

এখন আমাদের এই গ্রামের বারোইয়ারির ষাঁরা কর্মকর্তা, তাঁরা মধ্যে মধ্যে হঠাৎ এসে আমার উপর ঢেঁাও হন। যে, এই দলটিকে একটু বলে দিতে হবে। ওরা আশানি বললে নিশ্চয় যাবে।

আমার খ্যাতির মূল্য আমি ধরিনে বা ধরাছিনে, তবে যাত্রা দলের ষাঁরা নামা লোক, অভিনেতা ম্যানেজার, এঁরা আমাকে 'মঞ্জরী-অপেরা'র গ্রন্থকার বলে ভালবাসেন, অনুরোধ রাখেন। সে ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ, ছোট ফণিবাবু, দিলীপবাবু থেকে হালের স্বপনকুমার পর্যন্ত। এঁরা ভালবাসেন বলে কথা রাখেন।

সেবার অতুল এসে খবলে বারোইয়ারি কমিটির দূত হয়ে 'ভরত নাট্যসমাজ' যাত্রা পার্টি যাতে বায়না বের তাদের তা করে দিতে হবে। ও দলটার খ্যাতি দূ বছর থেকে বিপুল থেকে বিশাল হয়ে উঠেছে, তার উপর এবার হিরো হয়ে এসেছে বাম্পা বোস। ভরত নাট্যকে এবার চাই-ই।

তা হয়ে গিছল। আমি টেলিফোন করে অনুরোধ করতেই ওঁরা রাজী হলেন। লোক পাঠাতে বললেন। অতুলকে পাঠালাম। অতুল ফিরে এল কিছুক্ষণ পর, সঙ্গে দুজন অভিনেতাকে সঙ্গে নিয়ে। একজন স্বয়ং বাম্পা বোস এবং অপরজন শ্রীপতি পাল। বাম্পা বোসের নাম বিখ্যাত। তার নামে গ্রামাঞ্চলেও লোক ভাঙে। মানুষটির বয়স হয়েছে, তা পঞ্চাশ পার, হয়তো পঞ্চাশ বা তারও বেশী হতে পারে। কারণ লোকটির এমন চেহারা যাতে দশ বছর বয়স এমনি মারা যায়, মেক-আপ নিলে তো কথাই নাই, অনায়াসে বিশ ছাড়িয়ে পঁচিশ বছরও চুরি করা যায়। এখনও বাম্পা বোস যখন বোল-সতের বছরের নবাব সিরাজউদ্দৌলার ভূমিকায় এসে আসরে নামে এবং বেশ খানিকটা ছেলেমানুষী চাপলোর সঙ্গে চঞ্চল পদক্ষেপে আসরটা মাড়িয়ে বেড়ায় বা আসরের মূখ থেকে একটু লাফানোর ভঙ্গিতে ছুটে এসে লুৎফুন্নিহার হাত দুখানা তুলে নিজের গলার দুপাশে জড়িয়ে নিয়ে বলে, লুৎফা মেবি পিয়ারি আমরা জিতেছি। ফিরিঙ্গী ইংরেজ কলকাতায় হার মেনে সান্ধি করেছে।



তখন মনে হয় নবাবের ভূমিকার অভিনেতাটি সত্যিই ষোল বছরের ছেলে। বাপ্পা বোসের বিপরীতে মেয়ে অভিনেত্রী পাওয়া মুস্কিল। ওর সামনে জুড়ি দিয়ে অভিনয় করার মত ক্ষমতা সচরাচর কাঁচা বয়সী মেয়েদের থাকে না; এমন মেয়ে মেলে না। লুৎফার পাটের কথা ছাড়ান দিতে হবে, ও পাটে নেই কিছ্। তবে আলোয়ার মত পাট। ওখানে অল্পবয়সী মেয়েরা বাপ্পা বোসের সামনে দাঁড়াতে পারবে না।

বাপ্পা বোস এসে একেবারে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। কোন বাবা মানলে না। বললে—আপনার কালিদাসীতে আমি অহীন করছি; দুইপুরুষে আমি অরুণ করছি, দীপান্তরে আমি তারাচরণ করছি। আপনাকে প্রণাম করতে এসেছি; বাবুনা আমরা নিলাম; কিন্তু আপনাকে কথা দিতে হবে, আপনি সে সময় থাকবেন, আমাদের অভিনয় দেখবেন।

কথা দিয়েছিলাম।

সেই অভিনয় দেখার পব দিন বাপ্পা বোস বলিছিল।

* * *

আমি ওই সিরাজউদ্দৌলা দেখেই বলিছিলাম, এই বয়সে ভূমি আশ্চর্য অভিনয় করলে।

মানান হিসেবে কথাই নেই। থিয়েটারেও ষাঁরা সিরাজ কবেছেন, তাঁদের দেখেছি, অবশ্য তুলনা করা উচিত নয়, তা করব না। তাঁরা সব দিকপাল। কিন্তু এ ভূমি অশ্রুত করলে।

এই প্রসঙ্গে গল্প হতে লাগল, ভাল অভিনয়ের। সূর্য হল সেই গল্প থেকে। বিনোদিনীর চৈতন্যলালার নিমাইয়ের অভিনয়, রামকৃষ্ণ দেবের সামনে। অর্ধশতাব্দীর মনস্তাত্ত্বিক মশায়ের সেই রোগ সাহেবের ভূমিকায় অভিনয় এবং বিদ্যাসাগর মশায়ের চট্টা ছোঁড়ার। চাঁদবিবি অভিনয়ে তারাসুন্দরী আর তিনকড়ির রেবাবোবির অভিনয় চাঁদবিবি নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীতে। গোষাপুত্র দানীয়াবুর শ্যামাকান্তের অভিনয়। মিশরকুমারীতে শিশিরবাবু এবং অহীন্দ্রবাবুর সাম্প্রদায়িক এবং আবুনের ভূমিকায় অভিনয়ের কথা। জনা নাটকের নবপর্বাণের অভিনয়ে তারাসুন্দরীর জন্য ভূমিকায় নেমে মৃত প্রাতিষ্ঠানিক তিনকড়ির অভিনয়-গৌরব স্থান করা অভিনয়ের কথা। এমন কি, সেই যাত্রার দলের প্রথম কালে, বর্ধমান রাজবাড়ীতে নীলকণ্ঠ মহাশয় এবং মতি রায়ের দলের অভিনয় প্রতিষ্ঠানদ্বারা কথা। পাশাপাশি নাট্যমন্দিরে দুটি আসরে দুই হল গান করোঁছিল। দুই দলের গানই অশ্রুত এবং আশ্চর্য। গানের শেষে মতি রায় নীলকণ্ঠ মহাশয়ের কাছে এসে প্রণাম করেছিলেন। কণ্ঠমহাশয় তাকে পা থেকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, মতি বুকে এসে ভাই, ভূমি কণ্ঠের কণ্ঠ-শোভা, মতির মালা ভিন্ন কি কণ্ঠেব শোভা হয়? মতি রায় সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন, কণ্ঠ নইলে মতির আশ্রয় কোথায়?

বাপ্পা বোস হঠাৎ এক সময় বেন অনামনস্ক হয়ে গেল বলে মনে হল আমার। আমি ওই কণ্ঠমশায়ের গল্প শেষ করে নিজের একটা গল্প বলিছি। সে হয়েছিল ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের শিশিরবাবুর দলের চন্দ্রগুপ্ত মর্নি সেজেছিলেন, সেই ফণি বোসের সঙ্গে। আলেকজান্ডার বইয়ে ফণিবাবু আলেকজান্ডার, আমি দ্বারে পড়ে ক্রীটাসের পাট করেছিলাম। এবং একবার সাজাহান নাটকে ফণিবাবু গুরুজীব আমি জাহানারা—দুই বারই কেমন বেন দুজনে একটা রেবারেবি লেগেছিল। কি হয়েছিল সে থাক।

বাপ্পা বোস অনামনস্ক হয়ে শুনছিল। আমার কথা শেষ হতেই সে বললে, মজারী অপেরা লিখেছেন আপনি, আপনাকে বলতে হচ্ছে করছে এমন একটা গল্প।

বললাম, বল।

সে এক বিচিত্র জাতের হাসি, সেই হাসি হেসে সে বললে—আমার জীবনের গল্প বুঝতেই পারছেন। আর

আশ্চর্য। মনে পড়লে আশ্চর্য হয়ে যাই। ঝরিয়াকে গাওনার গিয়েছি, মথুর শায়ের দলের সঙ্গে। তখন আমার বয়স বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ। যাকে বলে ফর্মের একেবারে ঠপে উঠেছি। গাইতে পারি, পূর্ণযোবন তখন; আর খুব নিম্নমে থাকি। বুঝলেন? জানে মদটদ খাই, খেলেও খুব নিয়মিত।

ঝড়েতে—ঝরিয়াকে তো বলে না, বর্ধমান বীরভূম বাঁকড়াতে বলে 'ঝড়ে'। ঝড়েতে গিয়ে পৌঁছলাম, ইনডেপেনডেন্সের আগে, ঠিক আগে: ঝড়ের রাজ্যসাহেবদের—কুমার-সাহেবদের যুদ্ধের বাজারের অটল পরস, রাস উৎসবে, সে একেবারে উৎসবের মহোৎসব। এক নাগাড়া চলছে। যাত্রা খেমটা ঝুমুর কবিগান। যাত্রা তাও প্রথম গেছে কুমারী। তারপর তিন-দিন ছিল বিনোদ অপেরার গাওনা। দু দিন হয়ে গেছে। সোঁদিন আমরা খানবাদের নেমে বাজারে একরাতি গাওনা গেয়ে পরের দিন যাব ঝড়ে। পরের দিন থেকে রাজবাড়ীতে আমাদের গাওনা।

সেখানে নেনে শুনলাম, বিনোদ অপেরা নাকি বিপদে পড়েছে; গত দুদিন গাওনাতেই বদনাম তো কুড়িয়েছেই উপরন্তু দলের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হয়ে জনকতক লোক দলের জিনিসপত্র নিয়ে কলকাতা চলে গেছে। ওখানে তারা আটক পড়েছে। অথচ এই অবস্থায় রাগে গাওনা হওয়াই মুস্কিল এবং গাওনা না-হলে রাজ্য এস্টেট থেকে একটি পরস দেবে না, তাছাড়া বাজারের লোকে ওদের অপমানের আর শেষ রাখবে না।

দলের মালিক কেণ্টাবিনোদ চক্রবর্তী যাত্রাদলের পুরনো পাপী। অ্যাক্টর। পুরনো কালের দুদে অ্যাক্টর। শাহী পুরনু, তেমন গলা। ষাড়ের মত চেঁচাতে পারত, তেমন ভাবের খেলাও দেখাতে পারত। এখন সে গলা ভেঙেছে। বড়ো হয়েছে। তাছাড়া মেয়েদের নিয়ে বাতিল আছে। যে-দলে মেয়ে নেই, সে দলে কেণ্টাবিনোদবাবু নেই। আমাদের সব দাদা! ওই মেয়ের টানেই কেণ্টাদা এই বিনোদ অপেরা করেছে। কেণ্টা বিনোদের বিনোদ নিয়ে বিনোদ অপেরা নয়, বিনোদিনীর নামে বিনোদ অপেরা। বিনোদিনী যাত্রা দলের তারাসুন্দরী নয়, সে হল নবীসুন্দরী সুশীলাসুন্দরী কুমুমকুমারী, একালে চারু-শীলার তুলনা দেওয়া যায়। যেমন গান, তেমন নাচ, তেমন পাট; তবে জনা চাঁদবিবি এসব পারলেও পছন্দ করে না। বিনোদিনীই কেণ্টাদাকে বেঁধে রেখেছে। বেঁধে বাখলেও পড়ন্ত বয়স কেণ্টাদার তার সঙ্গে বিনোদিনীরও নাকি কর্ম গেছে, রঙ গেছে। তার সঙ্গে আছে কেণ্টাদার পেজোমী; বিনোদিনীকে কেউ কারদা করতে পারে নি, কেণ্টাদা কবেছে। ফলে দলের আসামীর মাইনে পারানি। পৈষাক-পরিচ্ছদ পুরনো হয়েছে, জোলুস নেই; বই সব পুরনো আমলেব; এই নিয়ে বত অপছন্দ বাইবের লোকের তত আপত্তি ঝগড়া দলের ভিতরে।

ঝড়েতে গাওনা করতে এসে সেটা উঠল চরমে। প্রথম দিন গাওনা শেষ হল লোকজনের ঠাট্টা-তামাসা-টিটকিবির মধ্যে। কে একজন দর্শক দেবরাজ ইন্দ্রের পুরনো ময়লা অর্গান্ডির জামাটা হঠাৎ টান মেরে ছিঁড়ে দিয়ে বললে, এই ময়লা ছেঁড়া দুগুণ্ডালা জামা পরে ইন্দ্র ফলাতে এসেছ বাবা! ঢালাকী ধরবার আর জায়গা পাওনি? ধু-রো-ও।

তারপর আরও ক'জনের ভাগ্যে তাই ঘটেছে। নারদের দাড়ী খুলে নিয়েছে টেনে। কারণ সেগুলো ক্রপের দাড়ী নয়। সেই সনাতন ভায়ে বাঁধা, ন্যাকড়ায় বসানো দাড়ী, যার বয়স অন্ততঃ বছর সাত-আশ্বেক কি দশেক।

পরের দিন এর উপর দলের লোক নিয়ে ঝগড়া বেধেছে। তারা টাকা চেরেছিল। কিন্তু দেওয়া সম্ভবপর হয় নি। মান রাখবার খাতিরে সোঁদিন যা কিছু ছিল তাই দিবে বাণীগঞ্জ লোক পাঠিয়ে কিছু পোষাক এবং টল ক্রেপ গাঙ্গ ভাড়া করে

আনা হয়েছিল। পালা তাতো ডাল হয়নি, জমেনি। কেণ্ট-বিনোদ প্রাণপণে চেঁচিয়েও জমাতে পারে নি সরমা নাটক। কেণ্টবিনোদের ছিল মেন পার্ট। রাবণ সাজত সে। রাবণ বইয়ের হিরো, তার সঙ্গে সমান ইম্পার্টান্ট পার্ট হল তরণী-সেনের। ফিমেল পার্টেব মধ্যে বড় পার্ট সন্ন্যাস। আর আছে সীতা। তা সে একটি মিষ্টমুখী কাঁদো কাঁদো ভাবের মেয়ে হলেই চলে। মোটামুটি কোন রকমে চলে যাবার কথা, কিন্তু তাও চলে নি। তবণী সেন সাজতো একটা ছেঁব; রাম যে সাজত তার সঙ্গে তার ছিল প্রেম। স্নেলর মাঝখানে বিভীষণের সঙ্গে তরণী সেনের—মানে ওই মেয়েটার কি একটা হাসি তামাসা ঢালাই হয়। তাই দেখে রাম চটে, তরণী সেন সাজা মেয়েটার গালে কষিয়ে দেব এক চড়। এই মহাকাণ্ড। মেয়েটা মাথাব পরচুলো টেনে খুলে ফেলে বলে একদুনি চলে যাব।

এতেই স্নেল বন্ধ থেকেছে সে প্রায় আধ ঘণ্টা। নানা কসরৎ করে কনসার্ট দিয়ে ডান্স দিয়েও ফাঁকি মারা যায় নি। লোকে চেঁচামেচি করেছে। শেষ, কোন মতে স্নেল হয়েছে বটে, কিন্তু সে থাকে বলে যাচ্ছে-তাই। লোকে যাচ্ছে-তাই অপমান করেছে। তার উপর স্নেল শেষ হওয়ার পূর্ব শেষ রাতে রাম সাজতো যে, সে আরও জন দু-তিনকে জুড়িয়ে নিয়ে বাসা থেকে বেরিয়ে একেবারে স্টেশন-সেখান থেকে ট্রেনে চেপে রওনা দিয়েছে কলকাতা। তাদের সঙ্গে হুটুওয়লা পালিয়েছে, আরও জন দুই পালিয়েছে, তারা অবশ্য মাইনের পার্টের লোক। তবে দলের থেকেটা ভাল গোষাক, তা নিয়ে পালিয়েছে। নাকী মাইনে বাবু। পালিয়েছে মানে খগড়া করে পালিয়েছে, ওদের বলে-ক'ড়ে। চুরির চার্জেও ফেলা চলে না, বা চলবে না। এখন মহাবিপদ—আজকের বায়না আছে। রাজরাজড়ার বাড়ির কান্ড; লোকে বলছে গাওনা না-হলে সর্বনাশ কান্ড হবে বনদেশের কান্ড। হয়তো থানে বেঁধে কোঁড়া লাগাবে, যখনবর্ষ তো কেড়ে নেবেই। অগত্যা পড়ে কেণ্টবিনোদ এসেছে আমাদের ম্যানেজারের কাছে। কোনরকমে মান রক্ষা করে দিতে হবে। নইলে—।

কেণ্টদা কেঁদে ফেললে। বললে, হ'ত না, এমনটা হ'ত না। হ'ল ওই মাগীর জন্যে। প্রমীলার রাজ্যে এই ঘটে। মাগী যে কাউকে মানুষ মনে করে না।

কেণ্টদা সিবিয়াস পার্ট, মোটামুট খবাব গলতে বেশ কবে, কমিক সিরিও-কমিকে অচল, সেই কেণ্টদা বললে, আবে বাবা আসরে রাণী দুর্গাবতী সাজিস, গ্রীষ্মরুম ভাঙে চা খাস, বিড়ির পয়সার জন্যে বিশ টাকা মাইনের আসামীরা চেঁচালে বাবা বলতে হয়। এ বিনোদিনী কিছুতে মনে থাকবে না। বলে দিলে, দল তুলে দেব! কিন্তু এই ধরনের কান্ড সহ্য করব না। করাবি না তো করাবি না। নে এখন ঠেলা! ঠেলা সে সামলাচ্ছে সেখানে। আমার সঙ্গে সেও অসছিল আপনাদের কাছে, কিন্তু আটকে বেখেছে, দুজনকে এক নগ্নে বেরুতে দেয় নি। মানে দলের এরাই দেয় নি। যদি পালাই!

বুড়োর চোখ থেকে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল।

বাম্পা বোস বললে, বুড়ো এমন সিরিওকমিক ব্যাপারটাকেও সিরিয়াস করে ফেললে। ভারী লাগল সকলের মনে। সে আমাদের ম্যানেজার, আমাদের প্রোপ্রাইটারের লোক, আমাদের হিরো ডিরেক্টর তখন গগন মুখার্জি, মানে গগণীবাবু; সকলেই বললে, ঠিক আছে। কুছ পরোয়া নেই। চালিয়ে দিতে হবে। আমরাও যাত্রা পার্ট। তোমরাও যাত্রা পার্ট, এক পার্ট দায়ে ঠেকেছে অন্য পার্ট। চালিয়ে দেবে। নান্নক পক্ষ অসহ্য পেয়ে একটা পার্টের অপমান করবে, তাই দাঁড়িয়ে দেখবে?

কেণ্টবিনোদা বললে, আজকের টাকার মধ্যে আমাদের দলের মাইনে বাপে যা থাকবে অপন্যারি নিন

ঠিক আছে। সে-সব পরে হবে। এখন দেড়খানা দল থেকে দুটো দল করতে হবে, এখন পালা কি সেট আছে বলো। পুরনো আমলের পালা বা মোটামুট যাত্রার আসামীরা সবাই করেছে, এমন পালা ধরো।

বাম্পা বোস বললে—বুঝলেন, ওই বইখানা ঠিক হল। ওই 'মদন ভস্মের পর'। আমাদের হিরো গগণীবাবু বললে—ওই বইখানা দেখ। হবে যাবে। আমি জানি বিনোদিনী মায়াবতীর পার্টে খুব নাম করেছিল এককালে। কেণ্টবিনোদ শম্বর করবে। আর প্রদ্যুম্নের জন্যে বাম্পাকে দিচ্ছি। ওর ও পার্ট করা আছে বলেই আমার ধারণা, ওকে আমি পার্ট আওড়াতে শুনোঁছি। কি রে ভাই? আর না থাকলেও আটকাবে না—বই দাও, ওকে—ও পড়ে নেবে, চালিয়েও দেবে। আমি হাসলাম। ওই পার্টই আমার জীবনের প্রথম পার্ট।

'মদন ভস্মের পর' পুরনো কালেই বই। আমিও দেখেছি।

মদন ভস্ম হলেন শিবের তৃতীয় নরনের ধ্বংসের আগুন। রতি কাঁদতে লাগল, ফুল শুকলো, ফল মরে গেল, বাঁজ শুকলো। সৃষ্টি যায় যায়। ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার স্তব করতে লাগলেন। দৈববাণী হল ম্বাপরে কুম্ভাবতার বিষ্ণু, যখন ধরাধামে অবতীর্ণ হবেন, তখন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী দেবী রুক্মিণীর গর্ভে 'জন্মাবে মদন নব-কলেবরে। সে পবিত্র মদন থাকল অতনু হয়ে। শম্বর নামক দৈত্য আমার বরে অচেতন হয়ে আছে। তাকে বধ করতে পারে কেবল বিষ্ণুব গুরুসজ্জাত লক্ষ্মীর গর্ভদাত সন্তান। সে সন্তানই হবে এই মদন। সে শম্বরকে বধ কববে।

শম্বর দৈত্য শুনল সে-কথা। সে খোঁজ নিতে লাগল কুম্ভচন্দ্রের সন্তান হল কিনা। কক্ষের প্রথম্য মহিষী দেবী রুক্মিণী। একদিন দেবীর সন্তান হল। শাঁখ বাজল, ভেরী বাজল, তুরী বাজল: বাদবকুলডিলক কংসারী—কুম্ভের সন্তান হয়েছে। শম্বর মায়াবলে আকাশলোকে উড়ল এবং গভীর রাতে সূর্যকাগছে ঢুকে নবজাত সন্তানটিকে তুলে নিয়ে আবার শুনলোকে উড়ল। শুনলোক থেকে পাহাড়ে ফেলে দেবে বলে ছেলোটিকে ফেলতে গিয়ে শম্বর নিজেকে হারিয়ে ফেললে এত সুন্দর। এমন রূপ। এ যে ত্রিভুবন আলো-করা রূপ, চাঁদের আলো শুধু পৃথিবীর বাইরেটা আলো কবে—এ-ছেলের রূপে যে শম্বর দৈত্যের ভিতরটাও কেমন হবে গেল। পারলে না সে ছেলেকে ফেলতে। তার ছেলে ছিল না, সে তাকে নিজের সন্তান হিসেবে পালন করবে বলে বাড়ী নিয়ে এল।

পূর্বপ্রবেশ করবে—পুরী বড়কবে বাইবে গাছতলায় এক রূপসী যুবতীর সঙ্গে দেখা হল। সে-যুবতী, শিবস্তোত্র গান করছিল। শিবভক্ত শম্বর মুগ্ধ হয়ে দাঁড়াল তার সেই অপূর্ব কণ্ঠের স্তোত্র-সংগীত শনে। বললে—তুমি কে?

মেয়েটি বললে—আমি অনাথিনী পিতৃমাতৃহীনা পতি-বিধূরা। আমার স্বামী দেবরোষে নির্বাসিত। ষোল বছর নির্বাসনদণ্ড হয়েছে তাঁর উপর। দেবতা সদয় হয়ে আমাকে আদেশ করেছেন—তোমাব এই অসামান্য রূপ নিয়ে তুমি দৈত্যরাজ শিবভক্ত মহারাজ শম্বরবংশবের কাছে যাও। তাঁর আশ্রয়ে থাক। শিবভক্ত শম্বর সংযমী স্ত্রীর প্রতি একনিষ্ঠ। সেখানে তুমি নিরাপদে থাকবে।

শম্বর দৈত্য দেবমায়ার এবং ওই অপরূপ রূপসীর রূপে এমনই মুগ্ধ হলেন যে, কোন কথা ভেবে দেখলেন না। তাকেও আশ্রয় দিয়ে পূর্বপ্রবেশ করলেন এবং মহারাণীর কোলে সেই চাঁদের মত ছেলোটিকে তুলে দিয়ে বললেন—এই নাও তোমার সন্তান। আব এই একে নাও, এই কন্যাটিকে। এ চাঁদকে পরিচর্যা করবার যোগ্য মেয়ে এই।

বাপ্পা বোস বললে—বিনোদিনীর নাম যাত্রার দলে জানা নাম। এবং ও-নামের মধ্যে বেশ খানিকটা রোমাঞ্চ ছিল। এবং সে-রোমাঞ্চ একটা বিশেষ জাতের। বন্ধুরে বঁধ দাঁড়ান। হিরোইন বাবা সাজে, বিশেষ করে তরুণী হিরোইন, বাবা কুমারী যাদের বহু-কণ্ঠে বহু বিখ্যাত অতিক্রম করে যাত্রার পালায় আবধোর সঙ্গে বিয়ে হয়, যেমন সাবিত্রী, সত্যী, সীতা, উত্তরা, বেহুলা—এরা নয়। এরা তো আলাদা। ওর আসরে নেগেই মানুষের মনে ঠাই পেয়ে যায়। ওদের জন্যে সিংহাসন তো পাতিই আছে।

বাপ্পা বোস বললে—কিন্তু ধরুন অঙ্গুরা-টঙ্গুরা জাতেব পাট, নাচ-গান কবে

কটাক্ষ হেনে বাবা মুন-বাঁধি এমনকি দৈত্যট্টভয়দের তপস্যা ভঙ্গ করে—এদেব পাটের বোমাস আলাদা। আসরের লোকেরা এদেব দেখলে সিটি মারে, চোখ তো মারেই, দু-চারজন বাবা একটু কানকাটা গোছরে, তারা কথা ছোঁড়ে। দলেব লোকেরাও এসব পাটের মেয়েদের নামে বেশ রসস্থ হয় ওঠে। মনে মনে যা হয় সে তো বুঝতেই পারছেন।

বাপ্পা বোস হঠাৎ একটু চুপ হয়ে গেল, তারপর বললে—একটা অনুমতি নিয়ে রাখতে চাই।

বললাম—কি বল?

বাপ্পা বললে—মনেব কথা খোলাসা করে বললে বাগ করবেন না তো?

বললাম—না-না-না। বল তুমি স্বচ্ছন্দ, বল।

সে বললে—দেখুন, যাত্রা দলের লোক তো। তার উপর এখন বস হল পণ্ডার ওপরে। যাত্রা দলে ঢুকছে যখন, তখন বিশেষ ওপারে—মানে উনিশ চলছে তখনও। তার মানে পরিত্রাণ বছর আগে। বত্রিশ-তেরিশ সালে। থিয়েটারেই তখন সব শিশি-ব-যুগ—আট থিয়েটার যুগ শুরুর হয়েছে। যাত্রার দলে তো তখনও সেই পুরনো আমল। সে-আমলের লোক আমরা। যাত্রা দলে তখনও মেয়ের পাট করত ছেলেবা। এ-কথা জেনেও সীতা সাবিত্রী যারা সাজত, তাদের ওপর যে বোমাস্টিক কোঁকটা পড়ত, সেটাকে মোটামুটি পবিত্র বলা চলে। ভাবতাম, এ-ছেলেটা যদি সত্যিই মেয়ে হত তো একে বিয়ে করতাম। তবে যারা মেনকা উর্বশী সাজে কি আলোবা সাজে কি ডুরেট নাচে, তাদের সম্পর্কে নেশাটা ঘোরালো বটে কিন্তু পবিত্র নয়। এখন যখন সত্যি সত্যি মেয়েরা এইসব পাট করতে লাগল যাত্রাদলে তখনকার কথা ভেবে দেখুন।

আর একটা কথা আছে। থিয়েটারে যাত্রা পাট কবে, তাদের এই রোম্যান্টিক্সিম কলকাতা শহরে দর্শকদের মধ্যেও ছড়ায়। যাত্রা দলে এটা যাত্রা দলেব লোকের মধ্যেই বাঁধা। মানে এ নিয়ে বা বোমাস হয়, তা ওই যাত্রা দলের এ্যাক্টরদের মধ্যেই হয়। থিয়েটারের দর্শক খন্দেব এদের জোটে না—কোন খনী দর্শক কোন মেয়েকে বাঁধা রাখ

না। আজকের কথা আমি বলছি। বিনোদিনী মেয়েটা যে-যুগে, বসে রূপে লাস্য-হাস্যে পটিনসী মেয়ে, সে-যুগে যাত্রা দলের সকলেই বিনোদিনীর নামে চণ্ডল হয়ে উঠত। মনে মনে মেয়েটার সঙ্গে প্রেমে পড়েই ছিল সবাই। যে সুযোগ পেত সেই যুগী হত। উর্বশী মেনকার পাটও যেমন করত মেয়েটা, তেমনি নাকি প্রেমে পারগমাও ছিল। বছরে দু'বছরে একটা কবে প্রেমিক পাটাতো। যে-দলে সে যেতো, চাক্ষুশী নিতো সেই দলের হিরোব সঙ্গে প্রেম না হলে সে থাকত না। মেয়েটা যাত্রা দলে এল যখন তখন এ-লাইনে আমাব একটু-আধটু নাম হয়েছে। ছোটখাটো পাট করি। নবম্বীপের দল। নবম্বীপেই থাকি। চার্লিশ-একচা্লিশ সাল হবে। শুনলাম—দারুণ মেয়ে।

আমার এক গুরু ছিলেন যাত্রার দলে, তিনি বলতেন—দেখ, যাত্রার দলে ঢুকছিঁস, এ-লাইনেব নিয়ম হল, যেরে বটা পরিবারই থাক, জীবনে অবিন্দ্য জুটবেই। বিব্রমংগল না হলে কেউ যাত্রা দলে কি থিয়েটারে আসে না। কিন্তু খবরদার বাবা বর ছেড়ে বেবির আসা কুলবধু খানকীর সঙ্গে আসনই করিসনে। তার থেকে বারা বেশ্যাব মেয়ে বেশ্যা, জাত খানকী তারা অনেক ভাল। আর একটি কাজ করাব বাবা মানিক, আকাশের চাঁপ ধরতে যেন ভালগাছে উঠে হাত বাড়িয়ে বাঁপ খাসনে কি অর্থে দহের জলে বাঁপ দিয়ে ডুব দিসনে। তার থেকে মাটির দুনিয়ার গাঁদা দোপাটি গুলুগু স্বা পাস, তাই নিয়ে সুখে থাকিস।

এই বিনোদিনী মেয়েটা শুনছিলাম একেবারে বাকে বলে জাতখানকী। কে কে যেন ওর একটা কুলচীও বেব কবেছিল। এবং ওর সম্বন্ধে রটিয়েছিল—মেয়েটার একটা আশ্চর্য ক্রমভা আছে, সেটা হল এই যে যে-পুরুষকে ধরবে তাকে বসবাস্তে জনার প্রবীরকে যেমন নিশাস্তে নরকপাস বুকে চাপিয়ে ফেলে বেখে গিছিল, তেমনি করে ছুড়ে ফেলে দিয়ে হাসতে হাসতে সবে যায়।

নানা বিবরণ ওব সম্পর্কে ছিল। কেউ বলত—মেয়েটার বসেব গাছপাখ নেই। একটা নামও রটোঁছিল গিল্টীর গমনা বলে।

একটু থেমে বাপ্পা বললে—কথাটা গমনা নয়, কথাটা হল গিল্টীর ফাঁকি।

বাকগে। বিনোদিনী সম্পর্কে কথাবার্তা আমাব শোনই ছিল, ওকে আমি দেখিনি।

সুস্মিত: আমাকে মাধার দিবা দিয়ে বাবণ করোঁছিল যেন ওই বিনোদিনীর সঙ্গে কোনক্রমে নিজেকে না জড়াই।

সুস্মিতা আমার স্ত্রী।

একটু হেসে বললে—সুস্মিতাও যাত্রা দলের এ্যাক্ট্রেস। ওর সঙ্গে একসঙ্গে থাকত থাকতে বস্তু ভালবেসে ফেলি। বুঝেছেন!

বুঝলাম সব সংবোচ ঘটিছেও একটু-খানিক আর সবাতো পারছে না, সেটা হেন সংস্কারের সূক্ষ্ম দাগে দাগে অতীত ইতিহাসের ফসিলের মত একেবারে মিশে

অনুবাদ গ্রন্থ	
প্রবী ঘোষ অনুদিত আলবার্টা মোরাডিয়াব (The Woman of Rome)	
১। রোমের রূপসী (১ম খণ্ড)	৪.০০
(২য় সংস্করণ)	
২। রোমের রূপসী (২য় খণ্ড)	৬.০০
(২য় সংস্করণ)	
এমিল জোলা (Human Beast)	
৩। পার্শ্বিক	৬.০০
(২য় সংস্করণ)	
আলবার্টা মোরাডিয়াব (The wayward wife)	
৪। স্ত্রীরণী	৪.৫০
(Two women)	
৫। দুই নারী	৬.৫০
সম্বসেট মম-এব (Theatere)	
৬। অভিনেত্রী	৬.০০
পেটন প্লেস-এর (Peyton Place)	
৭। পেটন প্লেস	৮.০০
বোগেশচন্দ্র নন্দী অনুদিত ম্যাক্সিম গোকীব (A man who was afraid)	
৮। অজ্ঞান	৭.৫০

চলিতকা প্রকাশন

১১২/১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

ইন্ডিয়ান মিল্ক মিডিয়াম
বেনারসী, তাঁত ও সিল্ক
শাড়ীর বেচি
৪৭-এ, গড়িয়াহাট রোড (গড়িয়াহাট জংসন)
বালিগঞ্জ • কলিকাতা-১৯



ফটো : মিহির বানার্জি

গিয়েছে—এক হয়ে গিয়েছে। চকমকির পাথরে যেমন কালো কালো দাগ থাকে তেমনি ধরনের।

বললাম—ভারী ভাল লাগল হে! দেখ বাংলা সাহিত্যে মেয়েদের মৃদুতির স্বর্ণ আমরা রচনা করেছি কম্পনায়। তুমি এখন কাজে করেছ—এটা ভারী। সুখের কথা সাহসের কথা। অস্তিত্ব আমার কাছে সংকোচ রেখে না।

বাপ্পা বললে—সেই জন্যেই বললাম, না হলে বলতাম না।

—কেন? বলবে নাই বা কেন? সংকোচই বা কেন?

—কেন, ঠিক বলতে পারব না; তবে হয়। মনকে বোকাই অনেক। বলি কিসের জন্যে? বাবা তো তাজাপুত্র করে গেছেন। কিছু বিষয়আশয় ছিল, তার ভাগ পাইনি। জ্ঞাতগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক নেই। তবু—! তবু সংকোচ হয়ে যায়। এবং জানেন—বাবা তাজাপুত্র করেছিলেন এই অপরাধেই। মানে স্থূলোক সংকলিত—। যাক পরে শুনবেন।

একটু ফণ চুষ করে থেকে বাপ্পা বোস বললে—সুস্মিতাও ওই বিনোদিনীর মত পাটগলো করত। আলোর পাট করত সিরাজন্দোলার, আমি সিরাজ। ওইতেই প্রেম হয়ে গেল। সুস্মিতা মাথার দিবি দিয়েছিল আর বলছিল—ভয়ংকর মেয়ে। বয়সের গাছ-পাথর নেই, কিন্তু বুঝতে পারবে না। আর বেশ্যার মেয়ে নয়, ও হল জন্মবেশ্যা। মানে, ভগবান ওকে ওই করে গড়েছেন। ও নাকি ওর স্বামীকে বিষ দিয়ে মেরে বোরিয়ে এসেছে ঘর থেকে।

এসব মেয়েকে আমার ভয় আছে। বুঝেচেন না। সেই ভয়ে আমি এই মেয়েটা যে-দলে থেকেছে, সেখান থেকে দূরে থেকেছি। আর যাত্রা দলের কথা তো জানেন। দলে না-থাকলে দেখা হয় না। আমরা কানেই শুনিনি—এ ভাল অভিনয় করে, ও ভাল অভিনয় করে, মুখেও বলি, কিন্তু দলের ব্যাড়া তাদের ছাড়া অভিনয় দেখাও হয় না, দেখিও না।

বিনোদিনী বিনোদিনী রবটা উঠল। যাত্রার বাজার তোলপাড় হল। একে একে বড় বড় বীর—যাত্রা দলের দিকপাল বীর, পর পর চার-পাঁচটা ঘাল হয়ে ধরাশায়ী হল—তারপর মল্লা পড়ল। বিনোদিনীর যৌবন নাকি সেই তেমন থাকলেও লোকে একটা হিসেব পেলে বয়সের এবং তার সঙ্গে পাট করার চণ্ডের পরিবর্তন হল। মানে গিরিশ-বাবু, দানীয়াবাবু পর শিশিরবাবু অহীনবাবু ছবি বিশ্বাস—তারপর মডার্ণ একেবারে উত্তমকুমারী চণ্ডের মত সেই নীলকণ্ঠ নতিরায়মশায় থেকে ফণি বিদ্যাতৃষণ পণ্ড-বাবু দিলীপ মধুসূদন, তার সঙ্গে আমাকেও ধরতে পারেন ঢঙ পাটোচ্ছে। সেই সঙ্গে পুরনোরা তো গড়েছে। সেই পুরনোর সামিল হতে চলেছে বিনোদিনী। ইদানীং আর নামডাক শোনা তেমন যেত না। তার নতুন হিরোরা কেউ ওর টানে পড়ত না। ওই কেষ্টাবিনোদদার মত বড়ো নিরৈই খেলা চলছিল তার।

আবার একটু ধামল বাপ্পা বোস। তারপর বললে—আশ্চর্য, বিনোদিনী যখন হৈ-হৈ কৈ-কৈ ছুটিয়েছে, তখন আমি উঠতে ধরেছি। তারপর তার এই হৈ-হৈ কৈ-

কৈ-কৈ মধোই আমি উঠে পড়লাম। আমার অভিমন্যু আমার সিরাজ আমার কুসুম—এসব একেবারে খুব তোলপাড় তুলেছিল। আমিই প্রথম মাইনে চাইলাম—হাজার। তা পেলাম। কিন্তু আশ্চর্য, বিনোদিনী কখনও কোনদিন আমাকে চুপিচুপি ডাকেনি। আমাদের জীবনে এটা আছে দাদা। বে মেয়ের রূপ আছে, যৌবন আছে, তার সঙ্গে নাম আছে, সে নতুন হিরোকে ডাকে। নিমন্ত্রণ করে। আবার যারা হিরো, রাজা হয়ে বসে আছে, তারা নতুন হিরোইন ব্যাড়া উঠছে তাদের কাছে নিমন্ত্রণ চেয়ে পাঠায়।

সুস্মিতাকে বিয়ে করেছি বেশী দিন না। পাঁচ বছর। পঞ্চাশ বছরে। তার আগে নিমন্ত্রণ পেয়েছি গিয়েছি। কিন্তু বিনোদিনী কখনও ডাকেনি। আমিও নিমন্ত্রণ চেয়ে পাঠাইনি। হঠাৎ সেদিন ধানবাদে কেষ্ট-বিনোদদা বিরত হয়ে এসে পড়ল, চোখের জল ফেললে, সঙ্গে সঙ্গে বিনোদিনীকে গালও দিলে, বললে—আজকে রাতটা উদ্ভর করে দাও ভাই, কাল সকালে উঠে ওই কাল-নাগিনীর বেড় কাটিয়ে এখন থেকেই রওনা দেব কাশী।

ঠিক হল, পালা হবে ওই ‘মদন ভাস্কর পুর’, শম্বর কেষ্টাবিনোদ, মায়াবতী ওই বিনোদিনী। ওদের প্রদান ছিল ওই রাম-চন্দ্র, সে পলাতক এবং সেই রোমাণ্টিক হিরো, সেই পাট আমাকে করতে হবে। আর তিনটে পাট কুক রুকিণী আর বলরাম আমাদের দল থেকে যাবে। আর যাবে একজন ফুটওয়ালার। আরও স্থির হল—দক্ষিণের টাকা চারশো-র মধ্যে ওরা নেবে দুশো আমরা নেব দুশো।

সন্ধ্যার পাকীতে ধানবাদ থেকে বড় টেনে নিয়ে নালায়। আমার পোষাক-আপেক্ষা নিয়ে গিছলাম। মেক-আপের ব্যাপার নিয়ে। বাকিরাও ওসব সরঞ্জাম সব থেকে নিয়ে গিছল। ওদের বেশকারীর উপর ভরসা আমরা করিনি। সেলাই, স্টেশনে লোক ছিল। ওদের দলের লোক। তবে ভয়-ভয়ে পুরুনো পাপী। মানে সব দলের জামাশোনা সব সঙ্গে মোরাকেরা আন-বরনের লোক, তারা যত্নের ব্যপারে কোনে কোনে জামা জামা মনে পড়লে লাগলে লাগে।

নিয়ে উঠলাম বস, ডকা সাজবের সাজ-পোষাকের আসলো সব জুড়েছে, দলভেও ছেঁদে পোষেনি, মিটিমিটি জ্বলার মত জ্বলখানা। একে তো ডাকা বাতাস দলের হাট। রান্নাবান্নার সেওয়া সাজবের ইলেকট্রিক লাইট আছে কিন্তু এতবড় বরখানায় একটা দিকও জ্বলেনি। ওই দু'জনে চারজন করে হাটের বস আছে। বেশকারীরা দাঁড় টাঙিয়ে পোষাক ছাড়িয়ে নিয়েছে। পরচুলো অঁকিয়েছে। একটু পুরো রান্নাবান্নার স্টেশনের দুজন লোক বসে আছে। তারা ডাকার পোষাক করেছে।

কলিনোদয়া বসে আছে একেবারে জাপা-পানকা দিবার মত। মহা উৎকণ্ঠায় জামাশোনা পোষাক-মানে পরনের ধাঁচ-পানার কত পরন্ত কটা নেই। রাসের সময় জাকা পড়েছে, গারে জাকা দেয়নি; বসে বসে

শব্দ বিড়িই টেনে যাচ্ছে। মধ্যে মধ্যে একটা সিগারেট। একটা সিগারেটের প্যাকেট বের করে দিবে বললে—বাও।

আমি হাত বাড়ালাম তো উনি দিতে গিয়ে সেটা প্যাকেটে পুরে বললে—না। এটা নয়। বলে আর একটা প্যাকেট বের করে বিলে। বললে—ওটাতে স্টিমুলেন্ট আছে।

স্টিমুলেন্ট মানে গাজা। কেট্টো মদ খেয়ে আর সহ্য করতে পারে না। আঁপং খায়। এই রকম উৎকণ্ঠা হলে গাজা। সিগারেটের ভিতরে গাজা পুরে তৈরী করে রেখেছে।

আমার সঙ্গে আমার ড্রিস্ক আমি একে-বারে মাপ করে পাণ্ড করে রেখে দি। মানে ওর বেশী কিছুতেই হবে না। এ-মাপ বেঁধে নিয়েছে সুস্থিত।

ডোল পথ থেকে নিয়ে এসেছিলাম। ওখানে বসে মেক-আপের ব্যাপার সমানে রেখে আর এক ডোল নিলাম। একটু ভাড়াভাড়ি করে গেলাম। মেন একটা কিছুতে ভাড়া লিঙ্কলাম।

আজ যেটা আপনাকে বলছি—সেটা ওই বিনোদিনীকে দেখবার একটা কোতুহল। প্রত্যাশাও ছিল, ভেবেছিলাম—বহু চিত্ত-বিজয়িনী বিনোদিনী অন্তত সহস্রাবদনে আর কাউকে অভ্যর্থনা না করুক আমাকে অভ্যর্থনা করবে। কারণ সে হল বিনোদিনী মায়বতী আর আমি হলম প্রদ্যুম্ন—নব-

জনে তনুবান অভিনয়। অর্ধম ভাকে উদ্ধার করতে এসেছি। নাটকের কথাটা বলতে গেলে বাস্তব অভিবাস্তব মৌদীন। কিন্তু মায়বতীরূপিনী বিনোদিনীকে দেখতে পেলাম না। দলের লোকেরা আমার মুখ চেঁনা। পুরুনো তো বটেই। মেয়েরা বলতে বিনোদিনী ছাড়া তিনজন। তার মধ্যে এক-জনকে জানডাম—বাকি দুজন অচেনা। তারা এসে হাসিমুখে সামনে দাঁড়াল। কেট্টো বললে—কিনো কোথায়?

বিনোদ মানে বিনোদিনী।

একটি মেয়ে বললে—শরীর . খরাপ করছে বিনোদিনীদির—শুয়ে আছে সে। বললে, একটু পরে উঠবে।

—পরে উঠবে? শরীর খারাপ করছে? মরেছে! মরতে বল মরতে বল—নুটো আয়ারপারিন-এর সঙ্গে একটা স্ট্রং ডোল খেতে বল—সে না উঠলে আজ—আজ। কি বে হবে! উঃ, কি হবে তা জানি না। বামে বেঁধে চাককাৎ। না হয় বিচিতি লাগিয়ে দেবে।

বলে উঠে চলে গেল কেট্টোবিনোদনা। বাসা অল্প একটু পরে। কেট্টো ফিরল কিছুকণ পর। ফিরল বিনোদিনীকে সঙ্গে নিয়েই। দেখলাম কিন্তু কাছে এসে আমাপ-টালাপ করার ধার দিয়ে গেল না। একেবারে পদীর ওপাশে মেয়েদের মেক-আপের জায়গার গিয়ে ঢুকে বসল।

কেট্টো গজগজ করতে লাগল—দেখ না, নসীব বলে একেই। গা জ্বরজ্বর করছে। তা টেম্পারেচার হয়েছে একটু, একটু মানে তা বেশ একটু হবে। একেই তো তির্যাক মেজাজ মেয়েটার তার ওপর দেখনা—

একজন তাড়া দিলে—আসরে বড় চ্যাঙডামি করছে লোকে বড়বাবু। এ বলছে—আমি—চোলটা নেব—ও বলছে আমি হারমোনিয়াম নেব—

কেট্টো আরও নাভাস হয়ে গেল। এবং চটে উঠে চ্যাচামেচি শব্দ করে দিলে দলের লোকের ওপর। দেখনা সব বসে বসে বিড়ি ফুকছে। যেন সব বাবার জমিদারীতে সেলামী আদার করতে এসেছে। মেক-আপ নাও। ব্যাং যা মেক-আপ নাও। জরদি কর। ডোল নেবে হারমোনিয়াম নেবে মন্দিরা নেবে খজনী নেবে; বড়ো মিরের ইন্তেকলে হয়েছে তাই ভাগবটোরা করতে বসেছে। তোবা তেবা! রামচন্দ্র হে—। এই পাণ্ডব-বর্জিত দেশে—

মেয়েদের দিকের পদা তুলে বেরিয়ে এল একটি মেয়ে। রূপসী মেয়ে। দেখে চমকে যেতে হল। বুকতে বাকি রইল না সে কে! বললে—চেঁচিয়ে না তো বাঁড়ের মত। মেক-আপ নিচ্ছে লোকে। বসে টা আছে কে? আছ তো তুমি। অথচ তোমার পাট হল প্রথম অঙ্ক। নিজে মেক-আপ নাও ছে!

কেট্টো খিঁচিয়ে উঠল—এদিকে 'ক' হচ্ছে জান?

জানি। শুনছি। না-জর ভূত হয় না কেউ। ভূত হব এই ভয়ও মরে না

শ্রীশ্রীসদগুরু সত্র

শ্রীমদ্রাধা শ্রীশ্রীব্রহ্মচারক গোম্বামী প্রভুর রূপভাজন শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর জন্মদিনে প্রকাশিত এই অমৃত গ্রন্থখানির প্রতি দ্রষ্টব্য শ্রী শ্রী সম্বন্ধ। সাধক জীবনের উদ্যান-পত্রনে শ্রীগুরুর রূপা, অনুশাসন ও সহানু-ভূতি কবীর সন্ততার ও মাধুর্যে পরম মনোহর হইয়া উঠিয়াছে। সংসারী হইয়াও প্রশান্তি বিলাস সাধন ভঞ্জে শ্রীগুরুর রূপার কিভাবে মানবেন সর্বাভিষ্ট লাভ হইতে পারে তাহার পথ নির্দেশ হইতে আছে। গ্রন্থখানি বাংলা ভাষায় ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ—মূল্য বৎসরমে ৪-০০, ৪-০০, ৪-৬০, ৪-৬০ ও ৬-০০ হিঙ্গল সংস্করণ ৩ খণ্ড—মূল্য ৪-০০, ৪-০০ ও ৪-৬০।

আচার্য প্রসঙ্গ

শ্রীমদ্রাধা অক্সফোর্ডের গোম্বামী প্রভুর জীবনকথা তদীয় একনিষ্ট সেবক শ্রীসারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষেণী হইতে শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী সম্পাদিত। মূল্য—৪-৬০।

BRAHMACHARI KULADANANDA

By Dr. Beni Madhab Barua, M.A. D.Lit (Lond.) Foreword by Dr. S. Radhakrishnan, Ex-President, India — Price Rs. 5.00

প্রাপ্তিস্থান :-

- ১। শ্রীজগদীশ দাসদত্ত—৪৪/১৫, বেনিরাটোলা লেন—কলিকাতা-১
- ২। মহেশ লাইব্রেরী—২/১, শ্যামচরণ দে স্ট্রীট—কলিকাতা-১২
- ৩। শ্রীমদ্রাধা লাইব্রেরী—২০৪, বিধান সত্ৰ—কলিকাতা-৬
- ৪। কলকাতা পাবলিশিং লিঃ—৬, কলকাতা কোয়ার্টার—কলিকাতা-১২

কেউ। আর মরব বজলেও মরা হয় না।
নিজে মেক-আপ নাও।

বলে আমার সামনে এসে দাঁড়াল
বিনোদিনী।

একটু মোটা লাগছে। একটু। রূপের
বিচারে অনেকের কাছে এই মোটাটটার সে
দেখতে ভাল হয়েছে বলে রাস হবে। কথাটা
খুব মিথ্যে বলে না। দেহ একটু পুষ্ট হলে
লাবণ্য স্বাস্থ্যসংবদ্ধ হয়। হাটপুষ্ট দুইই
হলে বোধ শুল হয়—সেখানে ভোগের কথা
আসে। তা বিনোদিনীর দেহের শুলভার
মধ্যে সেটুকু এসেছে। না-হলে মেয়েটার কি
ফিগার কি গেইট! একটু হেলে ঘাড় কাত
করে দাঁড়িয়ে আমাকে নমস্কার করে
বললে—আমি মায়াবতী—আপনি তো
প্রদ্যুম্ন?

কথা শেষ করেই ফিক করে হেসে
বললে—ওই নামেই পরিচর হোক! কি
বলুন?

প্রতিনমস্কার করে বললাম—বেশ তো!

আবার হেসে বললে—দেখুন তো বড়ো
মিসের ভর! বলে বিচিতি লাগবে!

বলেই কেউদার দিকে ফিরে বললে—
ভেবো না ভূমি। তোমার অঙ্গ কেউ স্পর্শ
করতে পারবে না। আমি দারী রইলাম। উনি
বখন এসেছেন তখন কোন ভর নেই। ঠিক
পার করে দেবেন।

—কি গো কান্ডারী, পার করে দিতে
পারবেন না?

বাণ্পা বোস বললে—আমি বললাম;
চেঁটার ভো চুটি হবে না।

—শুনলে তো! নাও এখন সাজো!

ওদিকে আসরে ঢোল বাজল। বিনোদিনী
মুখে রঙ মেখেই এসেছিল; পিঠে একপাঠ
এলানো কালো কব্বকে চামরের মত চুল
সুন্দর করে আঁচড়ানো। পরনে কালো ফিতে
পাড় কাপড়। হাতে অঙ্গ গরনা; পানীয়ত
পরোখরা, মস্তুর মত বকবকে সুন্দর দাঁত
একটি ইঙ্গিতপূর্ণ কটাক হেনে বললে—
হল না পরিচরটা, স্বীরেসুখে হল না।
চলুন আসরেই হবে।

দেখ—দেখ—ভাল করে দেখ—প্রিয়
প্রিয়তম কুমার কিশোর; অতনু
লভেছ তনু—; আমার এ তনুখানি—
দেখ দেখি—চেনো কি না? দেখ—দেখ—

বাণ্পা বোস জমিয়ে গল্প বলতে বলতে
নিজেও জমে গিছিল। কণ্ঠস্বর স্বাসাধ্য মিহি
করে সে যেন নারীভূমিকায় অভিনয় করেই
আবিস্তি করলে ওই কয়েকটা ছত্র। বললে—
আমার মানে প্রদ্যুম্নের সঙ্গে মায়াবতীর এই
প্রথম ডায়ালগ। মায়াবতী প্রাতঃবসক
প্রদ্যুম্নের পূর্বজন্মের স্মৃতি জাগাচ্ছে—সেই
কথা কটা বলে সে হাসতে হাসতে চলে গেল।

তা—একটা দোলা আগিরে নিয়ে গেল
বিনোদিনী। অবাক হয়ে আমি দেখলাম তার
সেই হেলে-দুলে বাওয়াটাকে। বেন নাচের
পায়ে পায়ে পা ফেলে ফেলে চলে গেল।

কেউবিনোদনা ভালগার লোক। সে
বলে উঠল—মাগীর বরস হ'ল পঞ্চম বছর।
চলে কলপ মেখে ঝরির চুল লাগিয়ে বাঁধানো
দাঁত পরে ছেনানী দেখ দেখি।

আমি ধমকে উঠলাম। হাঁ, ধমকই বলা
চলে থাকে। বললাম—খিস্তি করবার সময়
আছে কেউদা। হি!

সে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালে।

বাণ্পা বোস বললে—বাটা দলের সাজ-
বরের কথা ভো আপনাকে বলতে হবে না।
কেউবিনোদনা অচলা কথা কিছু বলেনি।
ও কথা করটা কাঁচা খিস্তি নয়! এর থেকে
অনেক বেশী বেশী চড়া রঙের বাক্য সাজ-
বরে বাড়ির মত চলে।

আমি একটু লজ্জা পেয়ে বললাম—সেই
নিন। আর আপনাদের ও প্রেমলাপ রাতে
সারবেন।

এর পর কিছুকণ আমি চুপচাপ বসে
রইলাম। কেমন যেন হয়ে গেলাম। আর
তাড়া ছিল না, কেমন হয়ে যাবার মত অবকাশ
ছিল। মানে গোড়ার দিকে আমার পাট ছিল
না। নেকেন্ড অ্যান্ড শেরদিকে শূন্য—
তারপর তিনটে অ্যান্ড ঠাসা।

গোড়ার দিকে শব্দ দৈত্য কুকের পূত্র
প্রদ্যুম্নকে হরণ করে নিয়ে গেল, তখন
প্রদ্যুম্ন একটা বড় ডল পড়ল। তারপর
একটা ছোট ছেলে। ছেলে মানে একটা মেয়ে
ছেলে সাজত বালক প্রদ্যুম্ন। গান-টান
আছে। তারপর শব্দ প্রদ্যুম্ন, বোল বছর
বয়স পূর্ণ হল!

কাজেই হাতে সময় ছিল। আমার
অবকাশ ছিল, সেই অবকাশে ওই কথা কটা
বলে যেন কেমন হয়ে গেলাম। মানে যাত্রা
পার্টির নিয়মাবলম্ব ব্যাপার। যাত্রাপার্টির
প্রানরুমে কগড়া আছে কাঁটি আছে, গোপন
প্রেম আছে ইসারা আছে ধরে ফেলাও আছে
কিন্তু অপ্রস্তুত হওয়া নেই। করেছি করেছি
বেশ করেছি। এখানে “কে-কার আপন কে
কার পর।” কিন্তু আমি অপ্রস্তুত হয়ে
গেলাম। বোধহয় সূক্ষ্মতার কথা মনে
হয়েছিল, সে এই বিনোদিনীর কথা বলে
বারণ করেছিল। মাগো কি যে কান্ড ওর,
কি যে ঘেমার মেয়ে তা কি বলব! গল্প
শুনোছি—সূক্ষ্মতার প্রথম প্রেমের পাঠটিক
ছিনিয়ে নিয়েছিল, আর সূক্ষ্মতার চাকরী
থেয়ে দিয়েছিল। বিনোদিনী তখন খাঁহত
শিখরে। আরও বোধহয় লজ্জা হচ্ছিল
কেউদার জন্যে। হি—হি—হি। বস্তু মানব।
ষাট বাষাটি বরস। এখন সব ছেড়ে ওই
মেয়েটাকে নিয়েই আছে। তার কাছে মেয়েটা
সম্পর্কে দরদ দেখিয়ে থরা পড়ে বাটা দলের
প্রানরুমেও লজ্জা না-অনুভব করে
পারিছনে।

রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত

উপন্যাসের সার্থক চিত্রপ !



অরোরা

নিবেদিত

নিকাল

সন্ধ্যারায়

শ্রুতেন্দু

কম্বা

চন্দ্রাবতী

অম্বরগঙ্গা

চন্দ্রা

রবি শ্রোম

বল্লিম মোম

দিলীপরম্মা

রমা দাস

অভিষেক

তারশঙ্করের

আরোগ্য

নিকেতন

পরিচালনা

বিজয় বসু

সংগীত

রবীন্দ্র চ্যাটার্জী

১৩৭৭ : কৃষ্ণ চক্রবর্তী :

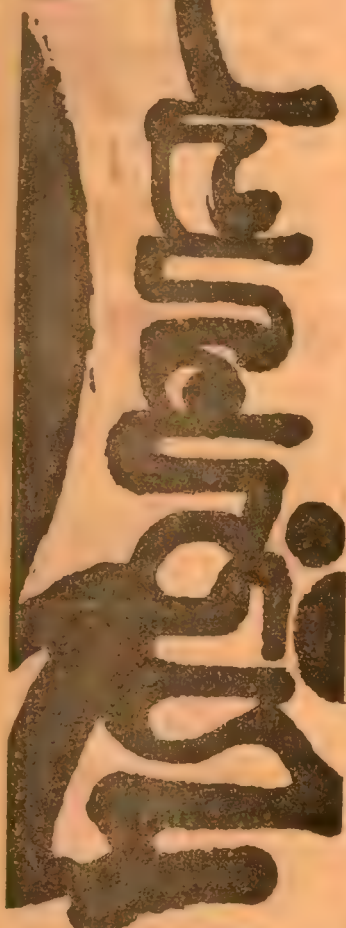
সম্পাদনা : বিশ্বনাথ মিত্র :

মাকড়শ : সময় বস :

মুক্তি আসন্ন !

শারদীয় শ্রেষ্ঠতম আকর্ষণ !

সত্যের স্রোতঃস্রাবের প্রথম
নিবেদন
শরাদিন্দু
বন্দোপাধ্যায় রচিত
বলাচরী অবলম্বনে
সত্যজিৎ রায়ের ছবি



বলাচরী পিকচার্স পরিবেশিত

রাধা - পূর্ণ

অন্যান্য চিত্রগৃহে !

ভুরু কুঁচকে কুঁচকে উঠছিল। আরও
বেন কিছড়। সেটা ওই মেয়েটা! মেয়েটা—
মেয়েটা—। বৃকের মধ্যে একটা অস্বস্তি
অনুভব করছিলাম।

ওদিকে খেল আরম্ভ হয়ে গেল।

মুখে রঙ নিয়ে, ভুরু চোখ একে, সাজ-
ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম—গতিকটা
কেমন দাঁড়ায় দেখব বলে। আসরে তখন
প্রস্তাবনা দৃশ্য হয়ে গেছে, রতি-বিরহ
বলুন, বেদনা বলুন—কোন একটা সংগীত
ধরেছে—গাইতে গাইতে নামছে মর্ত্যভূমে।
গাইছে খাসা। খাসা গলা। একটু চড়া—কি
কড়া বাই বলুন। তবে যাত্রার আসরের পক্ষে
ভাল। মানিয়েছিল ও খাসা। বাড়িয়ে বলছি না
আপনাকে—এক ওই কাঁচুলির টান বাঁধনে
পিঠের দিকে একটা বিদ্রী খাঁজ ছাড়া মেয়েটা
সত্যিই রমণীয়! জমিয়ে দিয়ে এসেছে বই।

পিছন থেকে কে যেন বললে—নবীন
নায়ক এসেছে, নায়িকা আজ বাঁধনী!

—হু—ভেক্কীবাজী দেখাবে আজ,
দেখ না।

—আঃ বড়োর কি হবে গ?

থুঙ্ থুঙ্ শব্দে হাসির শব্দ উঠল।

—কি? দেখছেন? কেমন লাগল?

জিজ্ঞাসা করলে বিনোদিনী; প্রথম
সিনের গান সেরে ও ফিরল। ওদিকে আসরে
তখন ধরাগলা নিয়ে কেঁস্টাবিনোদনা ঢুকে
চেঁচাচ্ছে—শিব—শব—শিব। হে শব্দু শব্দর!
হে পিনাকী—।

কে যেন দর্শকদের মধ্যে থেকে বললে,
ধরা গলা নিয়ে চেঁচাস নে বাবা। এই তো
সবে সম্ভবেলা। শেষ রাতে তোর
হবে কি?

হাসি উঠল। সে খুব হাসি।

বিনোদিনী আমার হাতখানা চেপে
ধরলে, বুকলাম কেঁপে উঠল। বললে,
কি হবে?

উত্তর আমাকে দিতে হল না, কেঁস্টনা
উত্তর দিলে, সেই ধরা গলার সে যেন সত্যি-
সত্যি ভগবানকে ডাকলে, হে শব্দর! হে
পিনাকী! আশুতোষ!

প্রাণফাটনো ডাক।

বিনোদিনী চমকে উঠল। আমিও চমকে
উঠলাম। বলব কি কাঁটা দিয়ে উঠল গারে।
আমার হাতখানা ছেড়ে দিয়ে সে চল গেল।

* * *

সেই শব্দ হল। বুকলেন।

পাল্লা আমার সঙ্গে ঠিক নয়। তবে
একেবারে নয় তা বলব না। পাল্লা শব্দ হল
কেঁস্টাবিনোদনার সঙ্গেই যেন।

মুখোমুখি দাঁড়াল ওরা, শব্দর দৈত্যের
পূরীর সিংহাস্বারের সামনে। শব্দর একটা
ডল পুতুল নিয়ে ঢুকছে, মানে প্রদ্যুম্নকে
নিয়ে। মায়াবতীরূপিণী। রতি অপেক্ষা
করছে পূরীর স্বারের পাশে। তাকে দেখেই
শব্দর বললে—

কে তুমি রূপসী বালা ত্রৈলোক্য মোহিনী
নিভান্ত কিশোরী কন্যা সদ্য নববধূ
জ্ঞান কেন সীম স্তে সিদ্ধুর

ললাটের টিপ।

এমন মলিন বস্ত্র আভরণহীন।

ভিখারিণী সম। কে মা—তুমি।
এমনভাবে বললে, সে যেন অন্তর নিঃড়ে
মায়ী মমতা ঢেলে দিয়ে বললে। শেষ লাইনে
বললে—

আমি দৈত্য বটে, কিন্তু মাগো

দৈত্যেরাও দেবতার চেয়ে
সংযমী হইতে পারে।

তপস্যা তাদের মত দেবতার
করে নাই। জন্ম হতে সৌভাগ্য তাদের।
আমি মাগো শিবভক্ত। মোর পত্নী ছাড়া
পৃথিবীর সব নারী জননী

আমার। কোন ভয়
নাই। বল তুমি, বল কিবা চাও!

বিনোদিনী মুখ তুলে চাইলে শব্দু। সে
চাউনির জাত আলাদা। তার মানে বোঝা
যায় না। তারপর মৃদু স্বরে বললে, আগ্রয়।
—দিলাম। প্রিসত্য করিলা কহি দিলাম।
দিলাম।

—যদি তাতে তোমার বিপদ আসে?

—আসকে। শমনে ডরি না আমি।

—কিন্তু এ সংসারে মৃত্যু ধুব—

—সে মৃত্যুরে সম্মানে করিব আহবান
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে।

—সে যদি আমার হাত ধরি প্রবেশ
করিতে চায় তোমার ভবনে।

—মৃত্যু মবার পথে প্রবেশ করহ দেবী—

মৃত্যু যদি তব হাত ধরে অশরীরী
হয়ে প্রবেশ করিতে চায়। করদুক।

—জয় হোক। জয় হোক। জয় হোক তব।

এমন করে 'জয় হোক, জয় হোক'
বললে যে, হাততালিতে আসর ফেটে পড়ল।
এবং সঙ্গে সঙ্গে বেশ একদল লোক বলে
উঠল—সাবাস, সাবাস।

কে একজন বললে, কাঁচপোকায় আর-
সোলা ধরলে রে!

মানে এমন লাস্য মিশিয়ে বেরিয়ে
বেরিয়ে কথাগুলি বললে, হাত-পা নাড়লে
তাকালে, তাতে মনে হল রতি মায়াবতী হয়ে
একেবারে মায়ী বিস্তার করছে। শব্দর তাতে
তুলে গিয়েই আগ্রয় দিলে পূরীতে।

অথচ আমাদের যাত্রা দলের ট্র্যাডিশনে
এ জায়গাটা সিরিয়াস অ্যাক্টিং করেছে সবাই।
কথাটা দলের লোকেরাও বলাবলি
করলে। এ কি করলে পাট? এ রকম তো
নয় এখানটা?

একজন বললে, মরেছে যে। নতুন যে
মন মেতেছে! রঙ্গারস তুলতে পারছে না।
বড়ো বয়সে কান্ড—দেখতো।

কিন্তু আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।
রঙ্গারস দিয়ে যে অ্যাক্টিং করলে তার আর
তুলনা নাই।

তখনও কানে আসছিল ওর অ্যাক্টিং।
বলছে, আমার স্বামীর জন্যে প্রতীক্ষায়
তপস্যা করছিলাম।

স্বামী মম উদ্দেশ্যহীন,

হারারে গিয়েছে কোথা।

আকাশে বাতাসে আলোয় ইসারা নাই তার—
কিন্তু পাই না উদ্দেশ্য। তপস্যা করিনু তাই।

দেবতা সদয় হয়ে কহিলেন মোরে—

পূর্ণ হবে তব মনস্কাম। আজ আমি

হারানো স্বামীর মোর উদ্দেশ্য পেয়েছি।



ফটো : পার্থসারথী

থাক, গ্রামের নাম বলব না। তখন ম্যাট্রিক ফেল করে ওই গ্রামের বাবুদের বাড়ীর থিয়েটারে মেয়ের পার্ট করি আর এইসব

শ্রীতুবারকান্তি ঘোষের

বিচিত্র কাহিনী

৩

আরও বিচিত্র কাহিনী

গ'ড়ে আনন্দ পাবেন

ধরনের পার্ট করি যেমন বাদল-মদন-কুক। বাম্পারাও বইয়ে বালক বাম্পারাওয়ের অংশটা খুব ভাল করেছিলাম বলে বাম্পা বোস নাম হয়ে গেল। সেই বাবুদের বাড়ীতে থিয়েটার করি আর কলিকারীর দস্তুরে কাজ করি। ওই গানের হারি ভট্টাচার্যের ছেলে—রমাপতি ভট্টাচার্য আমার বন্ধু ছিল। প্রাণের বন্ধু। তাদের বাড়ীর বাইরের ঘরখানায় চলে গেলাম যেন।

আমি আর বেন আসর দেখতে পাচ্ছিলাম না। ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছে। হয়তো ডোজ বেশী খেয়েছিলাম। তা হোক, প্রম আমার হয়নি। মনে পড়ছে, হঠাৎ দেখলাম মায়াবতী কোঁদে ফেললে।

বর্ধমান জেলার ওই গ্রামের হারি ভট্টাচার্যের বাড়ীতে ১৬।১৭ বছরের বাম্পা বোস সেদিন শুরুর ছিল। রাতে ওদের বাড়ীতে খেয়ে ওদের বাড়ীতেই শুরুরেছি। বন্ধু রমাপতি বরসে বড় ছিল। তার বউয়ের ছিল সাধ। তাই নেমস্তন্ন।

হঠাৎ কিসের দ্বা খেয়ে বাম্পা বোসের ঘুম ভেঙে গিছিল। ঘরটা তখন অন্ধকার নয়, কমানো ডিজ লন্টনটার পলকেটাই উজ্জ্বল উঠছে—ঘরটায় বেল আলো। সেই অজ্ঞান মধ্য ঠিক এমনই করে একটা কলসী কাঁখে নিয়ে একটু হেলে একটু তেরচা চোখে তাকিয়ে একটু মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। একটু একটু হাসছে সে।

সে রমাপতির বিধবা দ্বিদি। চোদ্দ বছরে বিয়ে হয়েছিল। পনের বছরে হয়েছিল বিধবা। চেহারা তার ঠিক এমনি। অবিকল এমনি।

বাম্পা বোস ডি এল রায়ের বিরহ নাটকে গোলাপী বলে একটি রাগগণী মেয়ের

পার্ট করেছিল। সে-পার্ট তার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পার্ট। ১৬।১৭ বছর বয়স, তখন মেয়ে সাজলে মেয়েরা লক্ষ্য পেত। তার একটা দৃশ্য ছিল কলসী কাঁখে নিয়ে ঘাটের পাশে গান গাইছে।

বিশ্বাস করুন, আমার চোখের সামনে সারা পৃথিবী দুলতে লাগল। আমি বোধহয় টলছিলাম। বন্ধু কস্টে সামলে নিলাম। তখন বিনোদিনীর চোখ থেকে টপটপ করে জল পড়ছে। সে কাদছে। ব্যাকুলভাবে বলছে—“দেখ দেখ, চেয়ে দেখ, চেনো মোরে। আমারে চিনিলে তুমি চিনিবে নিজেরে।”

* * *

সেদিনের অভিনয় সেদিনের তার সে-পার্ট অবিস্মরণীয় হয়ে আছে আমার কাছে।

পঞ্চাশের উপর বয়স তখন বিনোদিনীর। কিন্তু কে বলবে তা। সে রতি তো সত্যিই রতি। বিনোদিনী পাগল করে দিলে আসরকে। কিন্তু আমার কাছে সে স্মৃতি হয়ে উঠল সে—সেই মূহুর্ত থেকে। রমাপতির চেয়ে দু বছরের বড় ছিল তার দ্বিদি—নাম ছিল স্মৃতি। পনের বছরে বিধবা হয়েছিল। কোনমতে হয়তো নিজেকে বেঁধে রেখেছিল কিন্তু বাম্পার ওই গোলাপীর পার্ট দেখে নিজেকে সামলাতে পারেনি। সেদিন গভীর রাতে—ঠিক গোলাপীর মত টকটকে রাঙাপাড় শাড়ী পরে, হাতে চুড়ি পরে, কলসী কাঁখে এসে দাঁড়িয়েছিল বাম্পার সামনে। ওখানে গান ছিল গোলাপীর—

হেসে নাও দুদিন বই তো নয়—
কে জানে কার কখন সন্ধ্যা হয়।

যৌবন বড় মধুর।

স্মৃতিদীপ লাগুক ছিল। আর ওই চির-তরুণী চেহারা ছিল তার। ভারী মার্শি

চেহারা; বিনোদিনীর সঙ্গে মেলে আবার মেলে না। অবশ্য সেদিন রাতে যে সুমতি কলসী কাঁধে বাম্পারাওকে গান শুনিয়েছিল নেচে দেখিয়েছিল, তার সঙ্গেও সে চম্ভিশ ঘণ্টার লাজুক সুমতিদির অনেক তফাৎ। গানের গলা সুমতিদির মিষ্টিই ছিল। তবু মিলেও মেলে না। কারণ, এমন গান সুমতি গাইছে বিশ্বাস করতেই হচ্ছে হয়নি।

না। হয়নি।

তবু আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম— ওই দিনের পাট শেষ করে হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে আসছি, তার হাত আগুনের মত গরম—আমার হাত ঠাণ্ডা। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি কে?

সে বললে—কি? যেন বুঝতেই পারিনি প্রশ্নটা।

আবার বললাম—তুমি কে?

মুখ ভুলে আমার দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে বললে—আজকে রাতে মায়ামতী রতি। নইলে বিনোদিনী।

ডাকসাইটে বিনোদিনী।

সে শেষ হল। সে স্নেহ বা হল, তা আমার চিরদিন মনে থাকবে। বিনোদিনীর সঙ্গে পাট করতে গিয়ে হাঁপিয়ে গেলাম।

মেয়েটার যেন পাটের চুঙের ধরনের নাগাল পেলাম না। যেখানে আগে কেসেছে,

সেখানে হাসলে; যেখানে হেসেছে সেখানে কাঁদলে। তবে কারা মংসামান্য। এক-আধ-বার। ওই চেন চেন বলে বা কাঁদলে তাই। আর না।

এরপর একেবারে সে বেন রংগনীর রত্নের পাট করে গেল। নাচে গদনে কটাক্ষে দর্শকদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

রঙটু মূছে আমরা ধানবাদ বাব। ট্যাক্সি এসেছে, জিনিসপত্র আমাদের উঠেছে। বিনোদিনীই কেবল আসেনি। সে শুনলাম বসে আছে। তাকে ডাকলে যেন কে।

বিনোদিনী এল।

পোষাক ছেড়েছে। পড়েছে একথানা কালো ফিতেপাড় শাড়ী। হাতের গয়না একগাছা কি দুগাছা করে চুড়ি। পিঠে চুল—সে একপিঠ চুল এলো—হয়ে পড়ে আছে। মুখে রঙ তখনও তেমনি আছে। কলপমাখা চুল জরি দিয়ে বাড়ানো চুল, বাঁধানো দাঁত, রঙমাখা মুখ—সবই জানি, তবু চোখে পড়ল না। বোকা গেল না। মনে হল বিনোদিনী যুবতী বিনোদিনী। সেই সুমতি। একটু লম্বা দেখাচ্ছে এই বা। একমুখ হাসি নিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল বিনোদিনী। তখনও সে রংগনীর।

আবার তাকে একটু আড়ালে নিয়ে প্রশ্ন করলাম—বললে না তুমি কে?

হেসে সে বললে—কেন নাম লুকোবার কুমতি হবে কেন? আমি বিনোদিনী! ভারী

পাট করলেন। ভারী ভাল লাগল। অনেক কাল থেকে বাসনা ছিল আপনার সঙ্গে নাম্ব স্পেল করব। ভারী ভাল লাগল। সাধটা মিটল আমার।

বাম্পা বোস বললে—জানেন? বাবা আমাকে তাজাপুত্র করেছিল। কেন জানেন? এই সুমতির জন্যে। সেদিন রাতেই সুমতিকে আমার সঙ্গে ওই বাইরের ঘরে লোকে ধরে ফেলেছিল। লাঞ্ছনা হয়েছিল অনেক। চাকরী থেকে দূর করে দিয়েছিল। বাড়ীতে ঠাই হয়নি। বেরিয়ে পড়েছিলাম। যাত্রার দলে ঢুকে এই তো চলছে হেসেখেলো। হেসে নাও দুদিন বই তো নয় করেই চলছে। সুমতির কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। সেদিন হঠাৎ মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে বাওয়াটা অ্যাকসিডেন্ট নয়। ওটা সত্যি। অস্তত আমার তাই ধারণা। বিনোদিনী বললে—কেন, নাম লুকোবার কুমতি হবে কেন। আমি বিনোদিনী।

অসাধারণ পাট সেদিন সে করেছিল। অসাধারণ।

আর সেই তার শেষ অভিনয়। কল-কাতায় ফিরে এসে শুনলাম বিনোদিনী মরেছে। বিষ খেয়েছিল। কেউ কেউ বলে—কেউদা কিছু করেছিল। কিন্তু না—তা না। কেউদা ধানবাদ থেকেই দল বিদায় করে নিরুদ্দেশ।

যে সব ওষুধের-কল সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন

ওরিয়েন্ট টুথ পাউডার বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রবলীতে প্রস্তুত। গাঁত, অক্লম রাখতে, মুখের দুর্গন্ধ ও দাঁতের রক্ত নিবারনে অধিতীয়। ৩০ গ্রাম পলিথিন আধারে পাওয়া যায়।

মিল্ক অব ম্যাগনেশিয়া অত্র ও কোট-কাঠির নিবারনে অধিতীয়। ১১০ ও ৩৪০ মি: লি: বোতলে পাওয়া যায়।

আয়োডিল আয়োডিনের সহিত মিথাইল সেলিসাইলেট সংযোগে প্রস্তুত। এই মলম গাঁটের ব্যথা, মচকানি প্রভৃতিতে আন্ত ফলপ্রসূ। ১৫ গ্রাম ও ৩০ গ্রাম আধার পাওয়া যায়।



ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড

৬৭, ডা: সুরেশ সরকার রোড, কলিকাতা-১৪



প্রতিমা বহন ও মূর্তি পূজা

স্বাধীনতা

অনাদিকাল থেকে ভারতবর্ষের সনাতন-পন্থী হিন্দুসমাজে প্রতীকোপাসনা চলে আসছে। প্রতী, তন্ত্র, পুরাণ, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে এই উপাসনা বিষয়ে অনেক বিধ-বিধানও রয়েছে। সাক্ষিদানময় ব্রহ্মই জীবের একমাত্র উপায় ও উপাস্য—এই বিষয়ে সকল শাস্ত্রেই সমান উপদেশ। তাঁর উপাসনার দ্বারা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বিধ ফল লাভ করা যায়। প্রতীতে প্রবণ, মনন ও নির্মিথ্যাসনের যে-সকল পদ্ধতি পাওয়া যায়, তা অনুসরণ করা আমাদের ন্যায় সাধারণ মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য। শ্রীমদ্ভগবৎগীতার দ্বারা অধ্যাত্মে এই দুঃসাধ্যতার কথা বলা হয়েছে।

ধিনি অশ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বের প্রকৃত প্রচারক, সেই শিবাবতার ভগবান শঙ্করাচার্য ও তাঁর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (১।১।১২) বলেছেন—স্বাক্ষর দুটি স্বরূপ। একটি স্বরূপ হচ্ছে—নাম রূপ প্রভৃতিবস্তুর আর অপরাধিত হার বিপরীত। অর্থাৎ সবপ্রকার উপাধি-বিবর্জিত। একই ব্রহ্ম নাম-রূপাদি উপাধি-বস্তুর হয়ে সঙ্গরূপে উপাস্য হন এবং সর্বাধি উপাধিহীন হয়ে নির্গুণরূপে জ্ঞেয় হয়ে থাকেন। এইই বেদান্তশাস্ত্রে উপদিষ্ট।—আচার্যের এই ভাষ্য থেকে বোকা হচ্ছে যে, তিনিও রূপাদিবিবর্জিত ব্রহ্মের উপাসনা স্বীকার করেন না।

শাস্ত্রের আলোচনায় জানা যায়, নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা হতে পারে না। এইরূপ উপাসনায় ভান শাস্ত্র ও মূর্তির বিরুদ্ধ। সঙ্গুণ মনের দ্বারা নির্গুণের ধ্যান করা চলে না। উপাসনা শব্দের অর্থই হচ্ছে—সঙ্গুণ ব্রহ্মবিষয়ক মানস ব্যাপার। ‘আমি উপাসক, তিনি উপাস্য’—এইপ্রকার ভেদজ্ঞান বাস্তব উপাসনা হয় না। যতকাল এই ভেদজ্ঞান থাকবে, ততকালই সাক্ষরের উপাসনা করতে হবে। এই ভেদজ্ঞান তিরোহিত হলে উপাস্য-উপাসক বা সেবা-সেবকভাবই থাকে না। তখন উপাসনাও সম্ভবপর হয় না। আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (১।২।১৪, ৩।২।৩০) এই কথাও বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করেছেন।

আমরা ঈশ্বরের উপাসনা করে থাকি। যার ঈশ্বর্য আছে, তিনিই ঈশ্বর। নির্গুণ ব্রহ্মের ঈশ্বর্য নেই। ঈশ্বর্য একটি ধর্ম। ধর্ম, গুণ ও শক্তি একার্থক শব্দ। যার ঈশ্বর্য আছে, তাতে নির্গুণও থাকতে পারে না। অতএব উপাসনায় মনের একাগ্রতা সম্পাদনের নিমিত্ত দেব-দেবীর প্রতিমাকে অবলম্বন করতেই হবে। যার রূপ ও গুণ আছে, তাঁর বিষয়েই বাক্য অর্থঃ মস্তাদি প্রবৃত্ত হতে পারে এবং মনও তাঁর রূপগুণের

ধ্যান করতে পারে। নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা করা চলে না। এইমাত্র বলা যেতে পারে যে, জগতে বস্তু বস্তু আছে, তিনি তা নন। শূন্য ‘নেতি নেতি’ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

কৃষ্ণকাতন্ত্রে মহাদেব ভগবতীকে বলছেন—দেবি, প্রথমতঃ সাক্ষরেরই উপাসনা করতে হয়। সকল উপাসনায়ই সাক্ষর ভাবনার প্রয়োজন আছে। সাক্ষর উপাসনার সিদ্ধিলাভ করলে নির্গুণ ব্রহ্মের তত্ত্ব জানতে পারা যায়।

কুলার্ণবতন্ত্রে বলছেন—গাতীর দ্ব্যর্থ যদিও তার সমস্ত শরীরেই রয়েছে, তথাপি স্তনমুখেই সেই দ্ব্যর্থ কর্তৃত্ব হয়। সর্বব্যাপী পরমেশ্বরও সেইরূপ প্রতিমাদিতে অধিষ্ঠিত হয়েই উপাসককে অনুগ্রহীত করেন।

শূল রূপের ধ্যান ব্যতীত কোন উপাসকই সূক্ষ্ম প্রবেশ করতে পারেন না। ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (৩।২।৩০) আচার্য শঙ্কর এই কথাই বলেছেন। তিনি আরও বলেন যে, নির্গুণ ব্রহ্মে ব্যুৎকৃষ্ট স্থাপন করা সম্ভবপর নয়। নির্গুণ ব্রহ্মই নামরূপ প্রভৃতি গুণের যোগে উপাসনার নিমিত্ত সঙ্গুণ ব্রহ্মরূপে উপনিষাদিতে কীর্তিত হয়েছেন। সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে উপলব্ধি করার নিমিত্ত মূর্তিবিষয়ে উপাসনা করতে হয়। যথা—শালগ্রামে বিষ্ণুর উপাসনা। (ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ১।২।১৪)।

আচার্য শঙ্কর এরূপ স্পষ্টভাবে প্রতিমা-পূজার কথা বলা সত্ত্বেও একদল গবেষক বলেন যে, যেহেতু এই আচার্য অশ্বৈত মতের প্রতিষ্ঠাতা, সেইহেতু ইনি নাকি বিভিন্ন দেবদেবীর স্তবস্তুতি রচনা করেননি। ইনি নাকি মূর্তিপূজার কথা বলতে পারেন না। অশ্বৈতবাদ আর মূর্তিপূজার যে বিরোধ থাকতে পারে—তা আমাদের ব্যুৎকৃষ্ট অগম্য। আমরা বেদান্ত-শাস্ত্রে এরূপ কোন ইঙ্গিতও পাইনি। আচার্য শঙ্কর তৃতীয়া মহাবিদ্যা ত্রিপুত্র-সুন্দরী-দেবীর উপাসক ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মঠগুলিতে অঢাণি স্তবরূপা ত্রিপুত্রসুন্দরীর নিতাপূজা চলে আসছে। তা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি।

ব্রহ্মের রূপ বা দেবদেবীর প্রতিমা পারমার্থিক সত্য নয়, পরম্পর কল্পিত। কুলার্ণবতন্ত্রের মতেই প্রমাণে একটি ঘটনা আছে—

‘চন্দ্রস্যাচ্ছতীয়া নিষ্কলস্যশরীরিণঃ। সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা ॥

এই ঘটনা ‘কল্পনা’ এই কদম্ব শব্দের বোঝে কর্তা ও কর্ম উভয়েই মূর্তী-বিভক্তি হতে পারে। এতে ‘ব্রহ্মণঃ’ পদে কর্তাতে অথবা কর্মে মূর্তী-বিভক্তি হয়েছে—তা বিচার বিষয়।

একপক্ষ বলেছেন, এই মূর্তী-বিভক্তি কর্তাতে। এই মতে ঘটনটির অর্থ হচ্ছে—চন্দ্রের অশ্বতীর নিষ্কল অশরীরী ব্রহ্ম সাধকদের হিতার্থে রূপ কল্পনা করছেন।

অপরপক্ষ বলেছেন—‘সাধকানাং’ পদের মূর্তী-বিভক্তির অর্থ কর্তা। ‘রূপকল্পনা’ পদের সংগে তার অর্থের হচ্ছে, ‘ব্রহ্মণঃ’ পদের মূর্তী-বিভক্তিটি সম্বন্ধবোধক। এই মতে ঘটনটির অর্থ হচ্ছে—সাধক কর্তৃক ব্রহ্মের রূপ কল্পিত হয়েছে।

পান্ডবগীতার ব্যাসদেবের একটি কমা-প্রার্থনা দেখা যায়। তিনি বলেছেন—হে জগদীশ, তুমি রূপরিহিত। আমি (পুরাণ-দিতে) তোমার ধ্যানমগ্ন রচনা করে রূপ বর্ণনা করেছি। তুমি অনিবচনীয়। আমি স্তবস্তুতি রচনা করে তোমার অনিবচনীয়তা কল্প করেছি। তুমি সর্বব্যাপী, তীর্থক্ষেত্রে গেলে তোমার দর্শন মিলবে বলে ভীর্থ-মহাত্মা বর্ণনার দ্বারা তোমার সর্বব্যাপীত্ব খবর করেছি। আমার কৃত এই তিনটি বিকলতা-দোষ তুমি ক্ষমা কর।

যদি বলে থাকেন, দেবদেবীর রূপ সাধকেরই কল্পিত, তাহা ব্যাসদেবের এই কমা প্রার্থনাকে নিজেদের সিদ্ধান্তের অনুকূল মনে করে থাকেন।

যে-কোন সন্নিধ্য শাস্ত্রব্যাক্তের সিদ্ধান্ত স্থির করতে হলে কতকগুলি শাস্ত্রানুগ বিচারপদ্ধতিকে ব্যক্তি ও প্রমাণের দ্বারা মেনে নিতে হয়। সেই পদ্ধতিকে অনুসরণ করে যদি ঘটনটির ব্যাখ্যা করেছেন, তাহা বলেন—সাধকদের হিতের নিমিত্ত ব্রহ্ম কর্তৃক স্রষ্টার রূপ কল্পিত হয়েছে। এই ব্যাখ্যা শাস্ত্রীয় উপরত্ন ও উপসংহারের মধ্যে কোন বিরোধ ঘটে না।

মহানিবর্গতন্ত্রে আছে—তুমি নিরাকার হয়েও উপাসকদের হিতের নিমিত্ত, জগতেই কলাগণের নিমিত্ত এবং দানবগণের বিনাশের নিমিত্ত নানাবিধ রূপ-পরিগ্রহ করে থাক।

অগস্ত্য-সংহিতা বলেছেন—তিনি বেঙ্কায় লীলাঙ্কলে রূপগ্রহণ করেন। নবরশ্মিরে দেখা যায়—চন্দ্ররূপা মহামায়া সাধকদের হিতের নিমিত্ত নানা রূপ ধারণ করেছেন। সুপ্রভেদ-তন্ত্রে আছে—সন্ন্যাসী, মন্ত্রসাধক, জ্ঞানমার্গী ও যোগী—এঁদের ধ্যান ও পূজার নিমিত্ত ব্রহ্ম মায়ায় আত্মরূপ গ্রহণ করেন।

মাকণ্ডেয় ‘চন্দ্রীতে’ রয়েছে—মাতঃ অম্বিক, অনেক রূপগ্রহণে আত্মমূর্তিকে বহুবিধ বিভক্ত করে অসুরদের বিনাশ সাধন করেছেন। তুমি ব্যতীত অপর কে এরূপ অনুগ্রহ করতে পারে।

মহাভাগবতের অন্তর্গত ভগবতী-গীতার শ্রীপাণ্ডব-হিমালয় সংবাদে এইরূপ অনেকগুলি বচন আছে। আরও আছে যে, মহাশক্তিই দক্ষব্রহ্মে বাবার সময় দশ-

মহাবিদ্যার রূপ ধারণ করে শিবকে বিমোহিত করেছিলেন।

আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (১।১।২০) বলেছেন—সাধককে অনুগ্রহ করতে পরমেশ্বরও স্বেচ্ছায় মায়াময় রূপ ধারণ করেন। তিনি তাঁর এই উত্তর অনুকূলে একটি পৌরাণিক বচনও উদ্ধৃত করেছেন। বচনটির অর্থ হচ্ছে—হে নারদ, তুমি যে আমাকে দেখতে পাচ্ছ, এই মায়াময় আমিই সৃষ্টি করেছি। অন্যথা আমার ভৌতিক গুণাবিশিষ্ট রূপ দেখতে পেতে না।

শাস্ত্রে এইরূপ সিদ্ধান্ত থাকার পাণ্ডবগীতার ব্যাসদেবের ক্ষমা-প্রার্থনার বচনটির অন্যপ্রকার তাৎপর্য স্থির করতে হবে। ব্যাসদেব মহাভারত, অষ্টাদশ মহাপুরাণ এবং অনেকগুলি উপপুরাণ রচনা করেছেন। পুরাণের আখ্যায়িকাভাগ প্রভৃতিতে এরূপ অনেক কথা আছে, যেগুলির যথাস্থিত অর্থ গ্রহণ করা চলে না। পুরাণাদি শাস্ত্র সর্বসাধারণের পাঠ্য। আখ্যায়িকাদির তাৎপর্য নির্ণয় করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নয়। ব্যাসদেব বলেছেন—হে জগদীশ, তুমি রূপবাহিত হয়েও সাধকদের হিতার্থে রূপগ্রহণ করে থাক। আমি তোমার সেই সাধকানুগ্রাহক রূপেরই বর্ণনা করেছি। তোমার লীলার বর্ণনাকেও অপরাধ বলেই মনে করছি। কারণ অনেকেই পুরাণাদি পাঠ করে মনে করবেন, এই সকল রূপ আমারই কল্পিত। তুমি বাক্য ও মনের অগোচর। তথাপি ভক্তদের হিতার্থে আমি তোমার স্তবস্তুতি রচনা করেছি। তোমার স্তুতিপাঠে সর্বসাধারণ মনে করবেন যে, তুমি বাক্যের গোচর হয়ে থাক। সুতরাং এইপ্রকার বর্ণনা করায়ও অপরাধী হয়েছি। তুমি সর্বব্যাপী বিড়ু, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে তুমি বিরাজিত। আমি তীর্থমাহাত্ম্য বর্ণনা করায় অনেকে মনে করতে পারেন যে, শৃঙ্খল তীর্থক্ষেত্রেই তুমি বিরাজ করছ। অতএব প্রার্থনা—আমার এই তিনটি অপরাধ তুমি ক্ষমা কর।

মহর্ষি বেদব্যাসের বাক্যের এইপ্রকার তাৎপর্য স্বীকার না করলে বহু শাস্ত্রবচনের অসঙ্গতি ঘটে। সুতরাং যথাস্থিত প্রাথমিক অর্থকে বাদ দিয়ে ব্যাসবচনের অন্যবিধ তাৎপর্য নির্ণয় করা ব্যতীত উপায় নেই।

সিদ্ধান্তবাদীদের কয়েকটি যুক্তিও প্রদর্শিত হচ্ছে—নিগূঢ় ব্রহ্মের দয়াদাক্ষিণ্য, রোষতোষ, মায়ামমতা প্রভৃতি কিছুই নেই। তাঁর দেহও নেই। তথাপি তাঁর প্রসাদলাভের নিমিত্ত কেন উপাসনা করতে যাব? এইপ্রকার উপাসনার ভান তো আত্মপ্রবণতা। বিশেষতঃ এতে উপাসনার প্রাণবন্ত ভক্তির তো কিছুমাত্র স্থান নেই।

চিন্তকে স্থির করবার নিমিত্ত সাধককে যদি রূপের কল্পনাই করতে হয়, তবে শৃঙ্খল নরনরনোবিমোহন রূপের কল্পনা না করে চতুর্ভুজ, দশভুজ, দিগম্বরী, নৃমুণ্ডমালিনী ইত্যাদি অস্বাভাবিক ও অমৃত রূপের কল্পনা করবার কি কারণ থাকতে পারে?

প্রতিমার কল্পনা যদি উপাসকের স্বেচ্ছাধীন হয়, তবে উপাসনার পদ্ধতিও

তাঁরই ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হবে না কেন? আর প্রতিমার কল্পনার যদি উপাসকের স্বাধীনতা থাকে, তবে পূজার মন্ত্রও তিনিই রচনা করেন না কেন?

এইসকল আপত্তির যুক্তিসঙ্গত উত্তর পাওয়া যায় না। অতএব ব্রহ্ম কতৃক রূপ-কল্পনা—এই সিদ্ধান্তই সমীচীন।

ব্রহ্মের লীলাঙ্কলে অনন্ত প্রতিমার প্রকাশ, তাই অনন্ত দেবদেবীর বর্ণনা। প্রকৃতপক্ষে সকল প্রতিমাই ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছু নয়। সচিদানন্দের লীলাবিগ্রহ প্রতিমাত্মক সচিদানন্দস্বরূপ। উপাসক মন্মথ

প্রতিমাত্মকও তাঁর চিন্ময় স্বরূপ উপলব্ধির চেষ্টা করেন। প্রথমে কোন অশুদ্ধ মূর্তিতে কোন পণ্ডিতম্ভন্য ব্যক্তি হিন্দুর প্রতিমা-পূজাকে পৌত্তলিকতা নামে উপহাস করেছিলেন, তা আমাদের জানা নেই।

যেহেতু পরমেশ্বরের লীলাতেই তাঁর অনন্ত রূপের প্রকাশ, সেইহেতু তাঁর কোন রূপকেই একমাত্র রূপ বলা চলে না। তিনি বিশ্বরূপ হয়েও বিশ্বেশ্বরীর্ণ। আমরা মনে করি, নিরাকার শব্দের অর্থ আকারবিহীন নহে। যার নির্দিষ্ট কোন আকার নাই, যার আকারের ইয়ত্তা করা সম্ভবপর নয়, তিনিই

পূজায় চাই
বাড়ীর সকলের জন্য

বজ্রসর্প

থেকে
নতুন মডেলের
ফ্রিজিফ্রিস
স্যানিটাইজিং
রেডিও!

মডেল	নগদে (বিক্রয়কর অতিরিক্ত)	কিস্তিতে প্রথম	মাস
মোস্টো এ সি	৮৯৮	৩২৯.৩০	৬৫
ড্যালিগাট এ সি	৮৮৫	১২০.৫০	৪০
ড্যালিগাট ট্রানজিটর	৮৮৫	১৮০.৫৫	৩৫
পোর্টেবল ট্রানজিটর	৮৮৫	২৪০.৫০	৩০
পাইওনীয়ার পোর্টেবল ট্রানজিটর	৩৬৫	১৫২.৭০	২৫
ফিলোটা ট্রানজিটর	২৯৮	৯৪.১৫	২০
ফিলোটা সুপার এ সি/ডি সি	৩২৫	৬৮.০০	২৮
বাহাদুর ট্রানজিটর	১২৫	কিণ্ডে পাওয়া যায় না	



কলকাতার
অন্তম প্রাচীন
ফ্রিজিফ্রিস ডীলার

জি বজ্রসর্প অ্যাণ্ড কোম্পানী
৫৯, থিয়েটার রোড, কলিকাতা-১৭ ৪৪-৩১০০
১২, ডালাহোমি স্কোয়ার ইন্ড, কলিকাতা-১ ২২-৪৪৭২

নিরাকার। অনন্ত রূপে লীলা করলেও সকল রূপই তিনি নিলিপ্ত বা অনাসক্ত। রূপপরিগ্রহ তাঁর লীলামত। স্বরূপতঃ সত্য না হলেও আনন্দের আতিশয্য বা সত্যের নাম অভিনীত হয়, তাই লীলা। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তাঁর রূপগ্রহণ ঘেরূপ অভিনয়, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও সেইরূপ অভিনয়। আমাদের নাম অজানাজ্ঞান জীব যতদিন এই সংসারকে অভিনয় বলে ধারণা করতে না পারে, ততদিন তাঁর লীলাবিগ্রহকেও অসত্য বা অভিনয় বলেতে পারে না। অতএব হিন্দুকে চিরদিন প্রতিমা-পূজা করতেই হবে।



সকল প্রকার অফিস টেশনারী, কাগজ, সাভেইং ড্রইং ও ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

কুইন টেশনারী স্টোর্স
প্রাঃ লিঃ

৬৩ই, রাধাবাজার স্ট্রীট,

কলিকাতা-১

ফোন : অফিস-২২-৮৫৮৮ (২ লাইন)

২২-৬০০২

ওয়াকসপ-৬৭-৪৬৬৪ (২ লাইন)

আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে—আধুনিক বিকৃত মূর্তিকে চরিতার্থ করার নিমিত্ত নিজের ইচ্ছামত দেবদেবীর প্রতিমা নির্মাণ করলে শাস্তসম্মত পূজা হবে না।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৭।১২) আট-প্রকার প্রতিমার কথা পাওয়া যায়। যথা—পাষণ্ডময়ী, দারুণময়ী, ধাতুনির্মিতা, চন্দন-সিন্দুরাদিচিত্রিতা, চিত্ররূপা, মৃন্ময়ী, মনোময়ী ও মণিময়ী। শ্মশিডল (কুশাশিডল বা বজ্রের নিমিত্ত শোভিত ভূমি), অগ্নি, সূর্য, জল এবং স্বর্গীয় ইন্দ্রের দেবচর্চনার কথাও শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৭।১) বলা হয়েছে।

পবিত্র স্থানে শূন্য আসনে বসে উপাসনা করার নিয়ম। সর্বাঙ্গে মনোময়ী মূর্তিরই উপাসনা করতে হয়। এই উপাসনাকে অন্তর্ভাগ বলে। অতঃপর অন্তর্নিহিত ব্রহ্মতেজঃ পূর্ণ প্রতিমার সংক্রামিত করে সাক্ষক যথাবিহিত উপচারাদির দ্বারা বাহ্য-পূজা করে থাকেন। মূর্তির ধ্যান করে তাঁর সমস্ত মূল তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করতে না পারলে সেই মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠাই হয় না।

প্রতিমাকে পূজা না করে বাঁসা দেবতার বস্তু, ঘট প্রভৃতি আধারে পূজা করেন, তাঁরা শূন্য মনোময়ী মূর্তিরই ধ্যান করে থাকেন। উপাসক প্রথমতঃ মানস পূজায় তাঁর সর্বস্বই দেবতাকে নিবেদন করেন। উক্ত-পতরের সাধক ভেবে থাকেন, সমস্ত দিন-রাত্তিতে তিনি বা কিছু করছেন, সব কিছুই তাঁর ইন্দ্রদেবতার পূজার অঙ্গ—

‘সদ্যং যং কৰ্ম্ম’ করোমি তত্তদখিলং

শম্ভো তবারণনম্।

উমানন্দের নিত্যোৎসবে উক্ত হয়েছে—সহস্রারে অধিষ্ঠিত পরমাত্মাই হৃদয়-পুণ্ডরীকে জীবরূপে অবস্থিত। তিনিই ইন্দ্রের দ্বারা বাবতীয় উপভোগ্য বিষয় ভোগ করছেন। তাঁকে অগ্নিরূপে কল্পনা করতে হয়। আর তাঁর সঙ্কুচিত স্বাতন্ত্র্য অর্থাৎ নিয়তি, সঙ্কুচিত নিত্যতা অর্থাৎ কাল, সঙ্কুচিত নিত্যত্বতা অর্থাৎ রাগ, সঙ্কুচিত

নিত্যকর্তৃতা অর্থাৎ কলা, সঙ্কুচিত সর্বজ্ঞতা অর্থাৎ অবিন্যা—এই পাঁচটি শক্তিকে সেই অগ্নির শিখারূপে কল্পনা করার বিধান। ইন্দ্ররূপে পূজা দ্বারা বাবতীয় উপভোগ্য বিষয়রূপে হইতে সেই অগ্নিতে আহুতি প্রদান করতে হয়। অর্থাৎ ইন্দ্রের দ্বারা আমরা যে-সকল বিষয় উপভোগ করি, তা জীবরূপে অবস্থিত পরমাত্মায় আহুতি-প্রদান মাত্র। এইপ্রকার ভাবনার ফলে কর্ম্মফলে অনাসক্তি আসে। কিছুই আশ্র-সুখের নিমিত্ত নয়, সমস্তই ইন্দ্রদেবতাকে অর্পণ করছি—এইপ্রকার ভাবনার বিষয়োপ-ভোগও বন্ধনের হেতু না হয়ে মূর্তির অনুকূল হয়ে থাকে।

ভক্তপ্রবর রামপ্রসাদও মানস পূজার অপূর্ব সঙ্গীত গেয়েছেন—

ওরে মন ভজ কালী,

তোর ইচ্ছা হয় বে আচারে,

গুরুদেব সাধন-মন্ত্র দিবানিশ

জপ করে।

শরনে প্রণাম জান,

নিদ্রার কর মাঝে ধ্যান,

ভূমি নগর কের মনে কর

প্রদীপন শ্যামা মারে।

যত শূন্য কর্ণপটে

সকলই মার মস্ত ঘটে,

সে মা পঞ্চাশ বর্ষময়ী

বর্ণে বর্ণে রূপ ধরে।

কোড়কে রামপ্রসাদ রটে,

মা বিদ্যাজে সব ষটে,

ভূমি আহার কর মনে কর

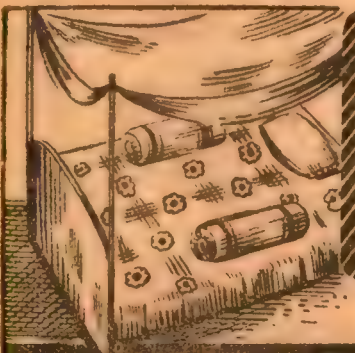
আহুতি দাও শ্যামা মারে।।

এইপ্রকার আত্মসর্পণ পরম ভক্ত ব্যতীত অপরের পক্ষে সম্ভবপর নয়। ভক্তিই মূর্তি-পূজার সর্বপ্রযুক্ত উপচার। পূজার ফলে পূজার গুণগান পূজকের চরিত্রে কিছুমাত্র প্রকটিত না হলে সেই পূজা নিরর্থক। তদ্বশাস্ত্র বলেছেন—ঈশ্বরের সঙ্গে আপনার সঙ্গতি অর্থাৎ সান্নিধ্যবোধই হচ্ছে স্বার্থ পূজা।

প্রথমাদিকারীর বাহ্যপূজায় ফুল, চন্দন, নৈবেদ্য প্রভৃতি শাস্ত্রীয় উপচারকে উপেক্ষা করা অনুচিত। সাধকের উচ্চাধার এই সকল উপচারের প্রতি লক্ষ্য রাখবার তেমন প্রয়োজন নেই। মন্ত্রতন্ত্রাদির শিথিলতায়ও সেই পূজার অঙ্গহানি ঘটে না। বিধি-নিষেধসম্বলিত অনুষ্ঠানপদ্ধতি মধ্যতঃ চিত্তশুদ্ধির হেতু ও তত্ত্বের প্রয়োজক। এই হচ্ছে মূর্তি পূজার অন্তর্নিহিত রহস্য।

আজ বাঙালীর মহত্তম জাতীয় উৎসবের পবিত্র শূন্য লগ্নে জগজ্জননী মহাশক্তির চরণভঞ্জে বসে সংঘর্ষচক্রে ভক্তিরয়ে আমরা প্রার্থনা করব—আমাদের এই প্রতিমাপূজা যেন সার্থক হয়, কুৎসিত তামসিকতা থেকে তিনি যেন আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে চোয়পথে উত্তীর্ণ করেন—

‘ও ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ও’।



শুভ বিবাহের
শয্যাড্রব্য ও
মনোমত্ত ঘশারী

ফোন • ২৪ - ৪৩২৮

অনন্ত চরণ মাল্লিক এওকো:

১৬৭/৪, ধর্মভালা স্ট্রীট • কলিকাতা-১৩

একটি মাত্র টানই
আপনাকে বুঝিয়ে দেবে
কেন
নাস্বার টেন
সিগারেটের চাহিদা এত বেশী
শত শত শহরে
এবং সহস্র সহস্র গ্রামে
যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক

প্রতিদিন
কোটি কোটি
নাস্বার টেন

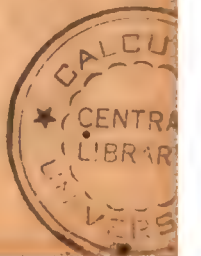
সিগারেটের
ধূমপান করে শ্রেষ্ঠ
ধূমপানের আনন্দ
উপভোগ করে।

সোনালী ডার্কনিয়া তামাক...
...আরো ভাল স্বাদ



AC-NTN-50/B

তুমি একটি মাত্র টানই আপনাকে বুঝিয়ে দেবে... একবার খেয়ে দেখুন





গত শনিবার সন্ধ্যা সাতটায় তেইশের পাঁচের দুই নম্বর মহাতপা লেনে গ্রীরাথহরি বারিক মহাশয়ের বাড়িতে, অকালে যাঁকে হারিয়ে বাংলা সাহিত্য-চিরদিনের জন্যে দীন হয়ে রইল, সেই অসামান্য প্রতিভাময়ী কুমারী দীপিকারাণীর দ্বাদশ স্মৃতি-দিবস বিশেষ সমারোহের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম উজ্জ্বল জ্যেষ্ঠিক গ্রীবাণীবিনোদ মুস্তাফী মহাশয়। তাঁর অনবদ্য ভাষণে দীপিকারাণীর জন্যে সমস্ত সাহিত্যজগতের পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করে মুস্তাফী মহাশয় বলেন যে, বিধাতার কোন দুঃস্বপ্নে বিধানে মকুলেই হবে না গেলে দীপিকারাণীর শতদলে বিকশিত প্রতিভা আজ সারা বিশ্ব নিজের সৌরভে আমোদিত করে তুলত। দীপিকারাণীর যে কটি প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনা পাওয়া গেছে সেগুলি সমগ্র জাতীয় গ্রন্থাগারে সংগ্রহ করে রাখবার জন্যে তিনি পশ্চিমবঙ্গ ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানান। ভাষণের শেষে এরকম ক্ষণজন্মা কন্যার জনক হিসাবে গ্রীরাথহরি বারিক মহাশয়কে তিনি অভিনন্দিত করেন।

অবাক কেউ যেন না হন এ বিবরণ পড়ে।

না, এ বিবরণ কোন সংবাদপত্রের অবহেলিত একটি কোণে সংক্ষিপ্ত দু'লাইনের মর্যাদাও পায় নি।

সংবাদটি কিন্তু মিথ্যা নয়, সেটুকু আমি হলফ করে বলতে পারি। কারণ আমি এই ঘটনাটির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও অস্বেদভাবে জড়িত।

এ বিবরণের সত্যটুকু যেমন, তার মিথ্যাটুকুও আমার চেয়ে বেশী কেউ জানে না।

আমার নিজের পরিচয়টা এখানে দিতে পারি। কিন্তু তা দেবার প্রয়োজন নেই। যে কোন বিষয়ে খ্যাতিমানদের পেছনে সর্বদা ও সর্বত্র লেজুড় হিসাবে যারা বিচরণ করে, আমি তাদেরই একজন।

সাহিত্য, রাজনীতি থেকে শিল্প ও খেলাধুলা পর্যন্ত সমস্ত ক্ষেত্রে বীদের নাম সংবাদপত্রে সম্মানে মন্থিত হয় তাঁদের কাছে কখনো-না-কখনো আমার একবার দেখা যাবেই।

সকল একমুখী সভায় আমি নিরমিতভাবে উপস্থিত থাকবার চেষ্টা করি। গণমাণ্ড-দের সঙ্গে একবার একটা বাক্যবিনিময় করতে পারলে ধনা হই।

খ্যাতিমান মহৎ ব্যক্তিদের দরজায় দিনের-পর-দিন ধরনা দিতে আমার ক্লান্তি নেই, তাঁদের বসবার ঘরে ঢোকবার একটু অধিকার পেলে, — সব সময়ে পাই না, —তবুও কাকের মত দিনের-পর-দিন আমি বসে থাকি তাঁদের গ্রীমুখের একটু বাণী কিংবা বারেক একটু কৃপাদৃষ্টির আশায়।

কৃপাদৃষ্টি বলতে ভাঙান যায় বা ব্যবহার করা যায় এমন কোন অনুগ্রহের কথা বলছি না।

আমি সেরকম কিছুই প্রত্যাশী নই। বড়জোর আমার অটোগ্রাফে একটু সই, এর বেশী কিছু চাহিদা আমার নেই।

হ্যাঁ, অটোগ্রাফ খাতায় স্মরণীয়দের স্বাক্ষর সংগ্রহ আমার একটা নেশা। নেশা না বলে আমার রোগ বলাই উচিত। অটোগ্রাফের খাতায় একটা সই-এর জন্যে আমি সাত ঘন্টা এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি, সাত ক্রোশ হাঁটতে পারি অম্লান বদনে।

একটা নয়, আমার পাঁচ-পাঁচটা অটোগ্রাফ খাতা আছে। তাতে বাংলা দেশের এমন কোন নামকরা মানুষ নেই, যার স্বাক্ষর না পড়েছে। বাংলা দেশের বাইরের মানুষেরও দু'চারটে সই সেখানে নেই এমন নয়। কিন্তু সে নেহাৎ পড়ে পাওয়া। আমার উৎসাহ শূন্য বঙ্গবীরদের সম্বন্ধে।

সই শূন্য নয়, বেশীর ভাগই সই-এর সঙ্গে একটু করে বাণীও আছে আমার অটোগ্রাফে।

সে সব বাণীতে প্রতিদিন একবার করে চোখ বোলালে আত্মার উন্নতি না হয়ে পারে না। আত্মার উন্নতি আর চিন্তের।

হিতোপদেশকে হার মানানো বহু অমূল্য দার্শনিক নির্দেশ যেমন তাতে আছে, তেমনি অপূর্ব সব মস্তুর দানার মত বাণীকণা। বেশীর ভাগই কবিতায়।

রাজনীতিক ক্রীড়াবিদ চিত্রশিল্পী ইত্যাদিরা অন্যের রচিত কবিতার পঙতিই সাধারণতঃ উদ্ধৃত করেন। আর সাহিত্যিকেরা সর্বদাই স্বরচিত।

আমার অটোগ্রাফের খাতায় সুপ্ত প্রতিভার এক আশ্চর্য উন্মাতন লক্ষ্য করেও আমি মূগ্ধ আর বিস্মিত হই। ছন্দোবদ্ধ বাণী দিয়ে প্রায় সব সাহিত্যিকই আমাকে ধন্য করেন, কিন্তু তার মধ্যে বিশেষ লক্ষ্যণীয় এই যে, কবি হিসেবে যারা অল্পবিস্তর পরিচিত তারা যদি-বা কখনো-সখনো দু'এক লাইন গদ্যে নেমে দাঁড়ান, বীদের রচনার মাধ্যমে গদ্য, তাঁরা স্বরচিত কবিতায় ছাড়া কখনো কোন বাণী দেন না। সে সব কবিতার নমুনা দেখে কাব্যের সিংহাসনের দাবী ত্যাগ করে তারা যে কত বড় স্বার্থত্যাগ করেছেন তা বোঝা যায়। সেই সঙ্গে দুঃখ হয়, বাংলা কাব্যের ক্ষতির পরিমাণ ভেবে।

অটোগ্রাফ নিয়েই হয়ে গেলেই খ্যাতি-মানসের সঙ্গে সম্পর্ক আমি চুকিয়ে দিই না। ওই সূত্র ধরে যতটুকু পারি তাঁদের সান্নিধ্যলাভের চেষ্টা করি।

সান্নিধ্য অথবা চাইলেই পাওয়া যায় না। কেউ কেউ এ বিষয়ে একটু উদার, আবার কেউ কেউ নিষ্ঠুরভাবে কৃপণ।

হাসি উদার তাঁদের অটোগ্রাফ প্রদানের চেয়ে কৃপণদের ছিটে-ফোঁটা নাকিপোষ মূল্যে যে আমার মত মানুষের কাছে অনেক বেশী, তা বলতে হবে না বোধহয়।

এমনি এক সম্ভাব্যতায় সুন্দর সাহিত্যিকের কাছাকাছি পৌঁছবার দুলভ সুযোগ আমার কখনো-সময় হয়।

সৈনিক তাঁর বাড়ির বৈঠকখানাতোই তাঁর আরও বহু অনুরাগী ভক্ত ও কথুবাখ্যেয়র মধ্যে একটু কনবার কারণে গিয়ে কুতূহল হয়েছিল। দিনটা বোধহয় অশুভ ছিল।

তাঁর মত মানুষদের কেন যে নিজের সুন্দর করে তুলতে হয় কিছুকাল থাকবার পর সৈনিক যেন একটু ভালো করে বুঝে-ছিল।

সত্যকতার আকাশে তোলবার সোজাও অভাব ছিল না, তেমনি কথু বাহিনীর হলে যেখানকার রত নিশা কলঙ্ক সব সংগ্রহ করে এনে সোৎসাহে পেঁচে দেওয়ার।

মৈত্রী ও প্রসন্নতা রাখা কঠিন কাজ তোলার মত ব্যাপারও ছিল যথেষ্ট। সত্য কথা বলতে গেলে হঠাৎ প্রথম একটু ক্ষেত্রের দরুণই সুন্দর সাহিত্যিক তুল আত্মহিত করেছি, তাঁর সহিত্যতা কিছুকাল বাধে প্রথা ও বিশ্বব্রহ্ম জাগিয়েছে।

আমার মত অটোগ্রাফ-লিপিকার উপস্থিত আছেই, তার ওপর আছে কৃমিকা লিখার নেবার জন্যে ধরনা। কোথাও সুস্বাধীনতার জন্যে পেড়াপীড়ি আর সভা-সমিতিতে নিরে যাওয়ার জন্যে খুলেখোঁলি।

সুন্দর সাহিত্যিক কোন মতে এই সব দাবীদারদের সর্বস্বত্বের নিজের অজমতা জ্ঞাপন করে অনুন্নয়ন-বিনয়ে ঠেকিয়ে তখন প্রাস্ত।

ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই সেই মানুষটির আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁকে ঘরে ঢুকতে দেখে সবাই কেমন একটু সচকিত অবস্থার সঙ্গে তার নিকে প্রতিক্রিয়া।

নাহিত্যিকের বৈঠকের ঘর রাজসভা নয়। সেখানে পোশাক-আশাক চেহারার কোন বাধাধরা দৃষ্টের নেই। এ সমুদ্রটি তা সত্ত্বেও এ অঙ্গরে শায়ের প্রবাহের বর্ণিত জগত থেকে আশ ময়লা খ্যাতি সার্ট ও লম্বাটে বেচপ হাড়-বেরুন চেহারা পর্যন্ত সব কিছুতেই একেবারে বেমানান।

প্রথমে ত অনেকেরই মনে হয়েছে লোকটি ভুল করে এখানে এসে পড়েছে।

কি চাই। জিজ্ঞাসা করেছে তত্ত্বাবধায়ক একজন। জিজ্ঞাসার 'আপনার' কথাটা জুড়তে গিয়েও তার বেধেছে যেন।

মানুষটি কিন্তু কৃত্রিমত সম্বৃদ্ধ নয়। তার বসে বেশ একটু উখতই তাঁর তপন।

সেই ভাষাতে মুক শব্দে সুন্দর সাহিত্যিকের নিকে চেয়ে বলেছেন,—ও'র সঙ্গে একটু দরকার আছে।

ঘরে শুধুমাত্র ভিড়। তবু বসবার জায়গার একেবারে অভাব ছিল না। তাঁকে বসতে বলার কথা কারুর কিন্তু মনে হয় নি।

সুন্দর সাহিত্যিকই সেই সৌজন্যটুকু দেখিয়ে বসেছেন,—বসুন আপনি। কি আপনার দরকার।

মানুষটি বসেন নি। সন্তা পুরোনো রঙ-ওঠা তাঁর হাতের ফোলিও ব্যাগটা থেকে একটা কার্ড বার করে এগিয়ে ধরে বলেছেন,—এই কার্ডটা আপনাকে দিতে এসেছি। এবার আপনাকে যেতেই হবে।

সুন্দর সাহিত্যিকের কাছে প্রসারিত হাতটা পৌঁছায় নি। কাছাকাছি বসে থাকার নতুন যথাস্থানে এগিয়ে দেবার জন্যে সেটি আমাকেই দিতে হয়েছে।

কার্ডটি এগিয়ে দেবার কিন্তু দরকার হয় নি। সুন্দর সাহিত্যিক হাত তুলে আমার কান্ড করে বলেছেন,—খাও, ও কার্ড আমার দিতে হবে না।

তাঁর দেবার উৎসাহ না থাকলেও কাছাকাছি ভক্ত ও কথুদের আশ্রয়ে কার্ডটি তাঁদের পড়তে দেবার জন্যে নামিয়ে ধরতে হয়েছে। নিজের কৌতুহলও কিছু তও ছিল না। সেটি পাড়ে নিয়েছি ওই অবসরে।

ছাপানো নয়, হাতে লেখা সন্তা চেই-তোলা কবিতা দেওয়া একটা কার্ড। তাতে কাঁচা হাতে কয়কটি লাইনে যা লেখা আছে তা কোন এক স্বগতা দীপিকারাবীর স্বাক্ষর ব্যবসারিক স্মৃতিভাস উপলক্ষ্যে একটি সভার আয়োজনের ঘোষণা। সভা প্রীরকৃতিক বারিক মশাই-এর বাড়িতে হচ্ছে। তিনিই উপোজ্ঞা। বারিকমশাই নিজেই কার্ড নিয়ে এসেছেন মনে হয়েছে। সে ব্যাপার তুল নয় বলে পরে জানা গেছে।

সুন্দর সাহিত্যিক কার্ডটা নিয়ে অস্বীকার করায় বারিকমশাই কিছু তখন গরম হয়ে উঠেছেন। আমাদের কার্ড পড়ার মধ্যেই কক্ষণ বিদ্যুতের শব্দে বলেছেন,—হাতে লেখা বলে যেমা হচ্ছে বাকি! ছাপানো সোনার জলে লেখা হলে হাত ব্যতীত নিতেন!

সাহিত্যিকমশাই এ উদ্ঘা গিয়ে মাথেন নি। সর্বিনের জানিয়েছেন যে, হাতের লেখা বা ছাপানো যাই হোক, কোন নিমন্ত্রণ নিতে অক্ষম বলেই তিনি মিছিমিছি কার্ডটা নিয়ে নষ্ট করতে চান নি।

সুন্দর চেয়ে বারিক হাত বেশী। সাহিত্যিকমশাই যখন তাঁর বিনীত কৌতুহল নিচ্ছেন তাঁর মধ্যে কথু, ভক্তবৃন্দ ও স্তাবক দেব কার্ডটি পড়া আর তারপর পরস্পরের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেছে।

মেয়েটি স্বগতা বলে একটু যে নিবধ্য সঙ্কোচ সমন্বিত গোড়ার ছিল, বাদশ বার্ষিক বলে বিজড়িত আর বারিকমশাই-এর উখত উয় মেজাজই তা কাটিয়ে দিয়েছে। তাতে ক

সাহায্য করবে তার পঠিত্য ভক্তদের টিপ-টিপনিতেই পাওয়া গেছে তারপর।

মুখ টিপে হেসে একজন বলেছেন—সাহিত্যিক-টার্হিত্যিক কেন ডাকতে এসেছেন! আপনার সভাপতি ত দেখছি মিনিষ্টার!

এ বিদ্যুৎ বারিকমশাই-এর সত্যই পাওনা। কার্ড একজন মিনিষ্টারের নামই লেখা আছে সভাপতি হিসেবে।

একটা চাপা হাসির চেউ ঘরের ভেতর উঠতে গিয়ে মিলিয়ে গেছে বারিকমশাই-এর নিকেরই কথা। বিদ্যুৎটা তিনি অন্যভাবে বিস্ময়মুগ্ধতা বলেই ধরে নিয়েছেন। গম্ভীর হয়ে সমস্ত জানিয়েছেন,—এই মিনিষ্টার ত আসছেনই। তবে একজন সাহিত্যিকও ত দরকার।

কেন সাহিত্যিক আবার কি দরকার?—মুখ চোখের এমন অশুভ ভাঙ্গা করে একজন জিজ্ঞাসা করেছেন যে হাসি চাপা দায় হয়ে উঠেছে সকলের।

না, অজায় ঘরে, মানে দীপুও লিখত কিনা! সেও সাহিত্যিক ছিল।

বলতে বলতে হাড় রাত-করা কথুদের উয় উখত দৃষ্টিটা কেবল হয়ে এসেছে। ফোলিও ব্যাগটা ভেতর হাত গলিয়ে বারিকমশাই আমার বলেছেন,—দেখেন তার লেখ?

না, না থাক থাক! বলত হয়ে সবাই তাঁকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করেছে।

কিন্তু ততক্ষণে তিনি বহুদিনের দৃষ্টি খাতা আর একটা চিঠি পেয়েই হুপা ধী বাক করে ফেলেছেন। সেগুলো আমার নিকে বাড়িয়ে ধরে উল্লেখভাবে বলেছেন—দেখেন না! দেখুন না একবার। তাঁর হাসির দৃষ্টি খাতা ও একটি পুস্তিকা। যথ বার হলট দেওয়া সত্ত্বেও বহুদিন বহুবার হাতে-হাতে ফিরে ছিড়ে-খুড়ে পেছ। বারিকমশাই সেগুলি খোদ এগিয়ে ধরে আছেন দেখে কেমন অবস্থিততে হাতটা বাড়তে গিয়েও গুটিয়ে নিতে হল অন্যত্র চোখের জুকুটতে।

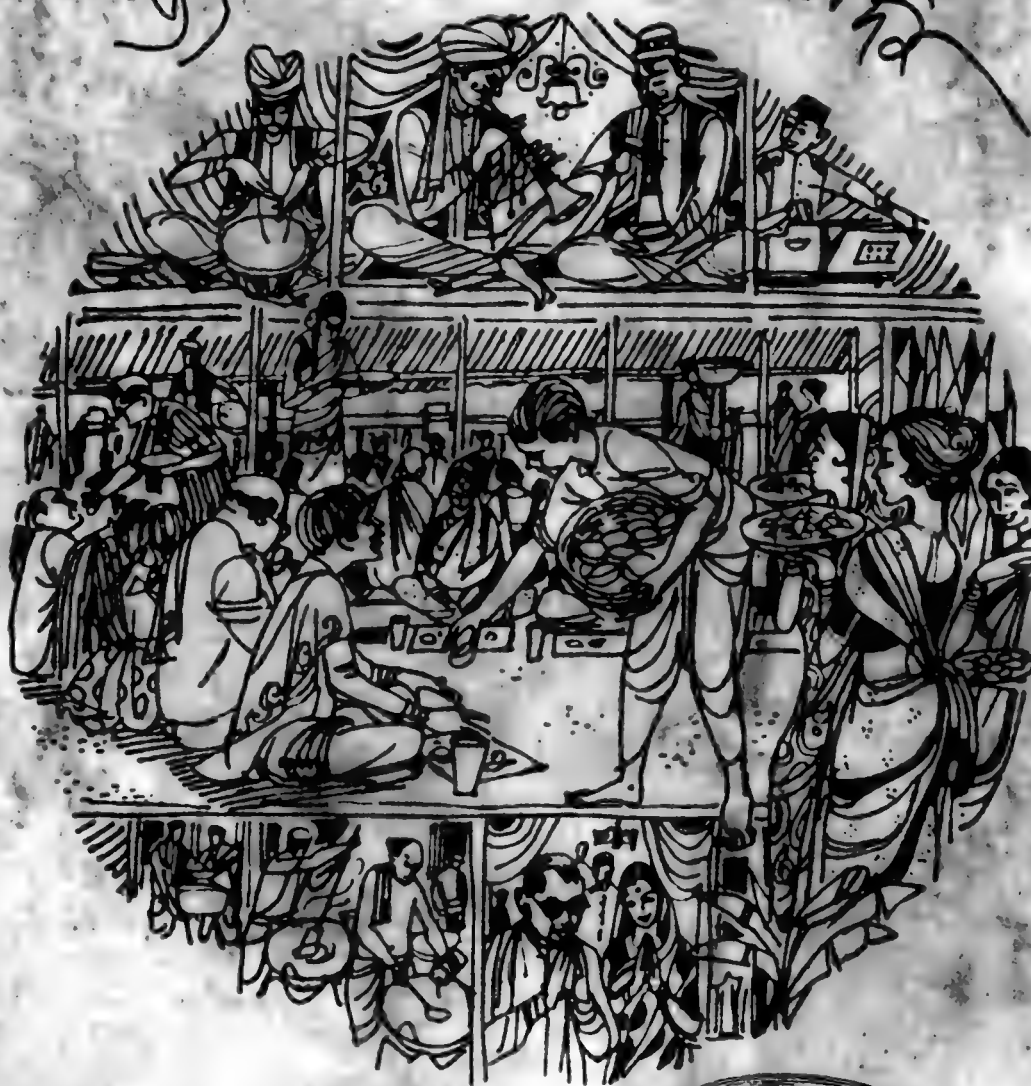
সাহিত্যিকমশাই সাহিত্যিকের নতুন মোলারেম বরই বলেছেন,—না ওগুলো দেখবার দরকার নেই। আপনার মেয়ে লেখা ত আগও অনেকবার দেখেছি। আর বহুরও ত আপনি এনে দেখিয়েছিলেন।

হ্যাঁ।—এবার বারিকমশাই-এর মুখ চোখ আর গলায় শব্দে কাতরতা ফুটে উঠেছে—আর বারে আপনি কিন্তু কথা দিয়েছিলেন এবারে ঘাবেন বলে। শব্দ আঘাতের জন্যে একবারটি চলেন। দীপু'র আরো অনেক খাতা আছে আপনাকে দেখাব।

উনি ত সেই ভয়েই,—এই পর্যন্ত বলেই কথার কৌতুকভরে হঠাৎ ঘুরিয়ে নির একজন ভক্ত বহু বলেছেন,—মানে মিনিষ্টার-টিনিষ্টার দেখে উনি তত পায়েরন বুকতে পারছেন না...

ভক্ত আর কিছ, হাসিকতা করতন বোধহয়। তাঁকে খামিয়ে দিয়ে সাহিত্যিক নিজেই একটু শত হয়ে জ্বলছেন,—বন্দু,

ସୁମାର ଦିବ ଓ ନିକର



ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦି

ଆନନ୍ଦର ବର୍ତ୍ତ
ବଢ଼ି ଆନ



LG-P/2/67



ସିନ୍ଧୁଳା ବ୍ୟାସୀୟ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ଵିତୀୟାପୂଜା

ଓଡ଼ିଶା ଚଳିକାଳୀ

କଳାର ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରଣେଷି : ଅନୁରାଗ ନିଜ

মিছিমিছ আপনায় সময় নষ্ট করতে চাই না। এইটুকু আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি যে, আপনার মেয়ের স্মৃতিসভার যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আচ্ছা নমস্কার!

তার মানে এবারও আপনি যাবেন না! —বারিকমশাই—এর গলা ভারী হয়ে এসেছে। না ত বলেছি। মিছে আর কথা বাড়বেন না!—সাহিত্যিকমশাইকে স্বরট স্নিগ্ধ রাখতে বেশ কষ্ট করতে হয়েছে বোধহয়।

না বাড়বে না! বারিকমশাই জ্বলে উঠেছেন এবার। বই ও খাতাগুলো ফেলিওটার ভেতর ভরতে-ভরতে রাগে ফেটে পড়ে বলেছেন, আপনি না গেলেই সভা বন্ধ হবে ভেবেছেন! আপনার মত সাহিত্যিক ঢের দেখেছি। টাকা ছাড়িয়ে তু করে ডাকলে ত আপনারা চার পায়ে ছোটেন! আপনার চেয়ে ঢের বড় সাহিত্যিক সেধে সভায় বাবে বুঝেছেন, গিয়ে কৃতার্থ হবে।

ভক্তদের মধ্যে অনেকের চোখই তখন প্রায় লাল হয়ে উঠেছে। একজন উঠে দাঁড়িয়ে কি বলতে যাচ্ছিলেন। তাকে থামিয়ে সাহিত্যিকমশাই শান্ত স্বরে বলেছেন,— তাহলে ত আর ভাবনা নেই। আচ্ছা আসুন।

আর কিছু না বলে ঘরের সকলের দিকে শেষ জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে বারিকমশাই চলে গেছেন এবার।

ঘরে একটা হাসির রোল উঠেছে। সেই সঙ্গে হরেক রকম টিপনি।

এটা একটা ব্যবসা বোধহয়? স্কট সন্দেহ করেছেন।

না মাথাটাই খরাপ! বলেছেন কেউ।

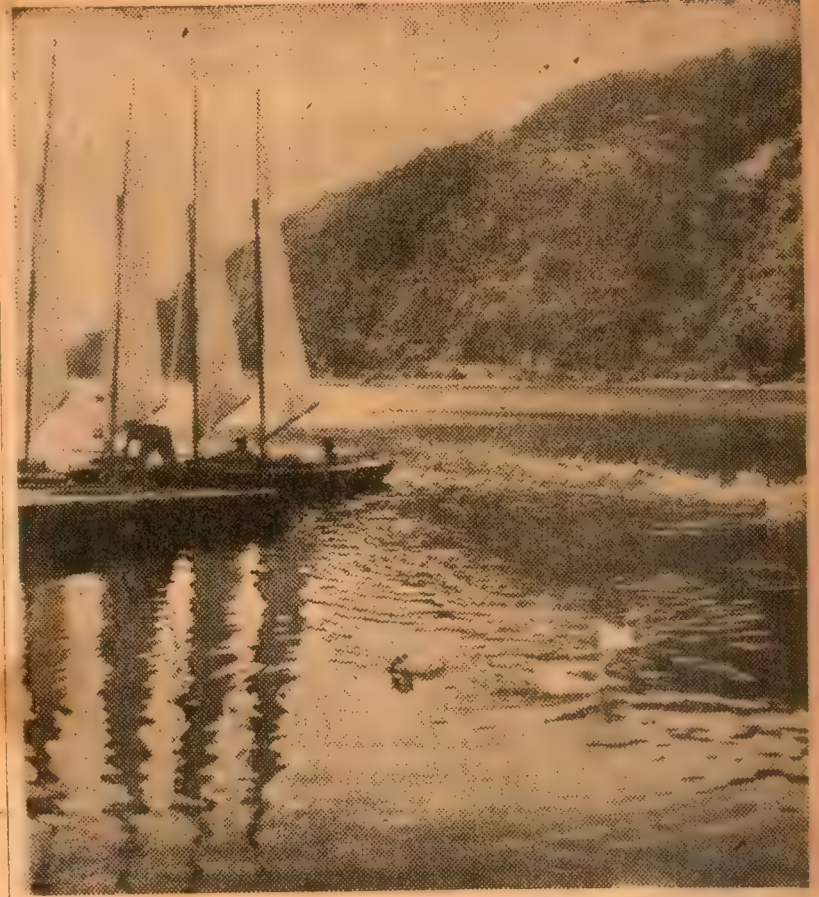
খরাপ হলেও সেয়ানা পাগল! কান্দুর মন্তব্য, — স্মৃতিসভার নাম করে বড় সাহিত্যিক-চিহ্নিতকদের ধরে কিছু ট্যাক-ভারীর বন্দোবস্ত হয় বোধহয়।

কম ত নয়। বারো বছর ধরে এই চালাচ্ছে! বিস্ময় ও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন কেউ,—সত্য দীপিকারানী বলে কেউ ছিল কিনা, আর ওর মেয়ে কিনা সে, তাই বা কে জানে?

না, ছিল বলেই মনে হয়।—সাহিত্যিকমশাই বলেছেন এবার,—তবে লোকটার নাথায় কিছু গোল আছে! আর বছরেই শুধু নয়, গত পাঁচ-ছ বছর ধরে এমনি সময়ে আসে একবার করে ওই রকম একটা হাতে লেখা কার্ড নিয়ে। তাতে সভাপতি প্রধান অতিথি হিসেবে প্রত্যেকবারেই মস্ত মস্ত লোকের নাম থাকে। ওইগুলো লিখে এনে দৌড়েই বোধহয় ওর সুখ।

ওই দীপিকারানীর খাতাগুলো কি বইটা আপনি পড়ে দেখেছেন কখনো?—আমিই জিজ্ঞাসা করেছি এবার কোতুহলী হয়ে।

না, দেখিনি।—সাহিত্যিকমশাই একটু, যেন কুণ্ডার সঙ্গে স্বীকার করে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন—একটু একবার দেখলে আর রেহাই থাকত না। একটা থেকে সবগুলো দেখতে হত, তারপর আসত ছাপিয়ে দেবার জন্যে



ফটো : মালতী সিংহ

বুলোকালা। অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে হত শেষ-পর্যন্ত। আর যাই হোক আমার না দেখার সহিত্যজগতের খুব বেশী ক্ষতি বোধহয় হয়নি। বারো বছরের মেয়ে মাস্টারপিস লিখে যাবনি নিশ্চয়।

আরো কিছুকণ বাদে এ-আসর ছেড়ে বেরিয়েছিলাম।

বাড়ির পথে যেতে যেতে হঠাৎ রাস্তার একটা মোড়ের কাছে এসে ধমকে দাঁড়াতে হল।

হ্যাঁ, বারিকমশাই-ই ত! রাস্তার ধারে কেমন অসহায়ভাবে শূন্যদৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

হঠাৎ কেন জানি না তাঁর কাছে না গিয়ে পরলাম না। কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কি বারিকমশাই, এখানে দাঁড়িয়ে আছেন যে!

বারিকমশাই ভূকুটি করে আমার দিকে তাকালেন। আমাকে তিনি চিনতে পারেননি। আসরের ওই ভিড়ের মধ্যে দেখে চিনতে পারবার কথাও ত নয়।

তাঁর স্মরণশক্তিটা উস্কে দেবার চেষ্টায় তাই সাহিত্যিকমশাই-এর নাম করে জানলাম যে, খানিক আগে তাঁর আসরে আমি ছিলাম।

ওঃ, ছিলেন!—বারিকমশাই-এর আমার প্রতি বিশ্বেষটা তাতে বাড়বার বই কমবার কথা নয়। কিন্তু এখন কেমন, যেন তিনি একেবারে নিস্তেজ হয়ে গেছেন। আমার দিকে

চেয়ে হতাশ করুণভাবে বললেন—কত বছর ধরে ওঁর কাছে আসছি, উনি একবার কি কষ্ট করে আধঘণ্টার জন্যে যেতে পারতেন না! দীপ্তির লেংখাগুলোও, কেউ আপনার একবার উল্টে দেখতেও রাজী নন।

হঠাৎ সেই মূহুর্তে কে যেন আমার মুখ দিয়ে বললো—ওঁরা না রাজী হন, আর কি সাহিত্যিক নেই!

আর সাহিত্যিক!—বারিকমশাই ক্রান্ত হতাশার সঙ্গে আমার দিকে তাকালেন—আমি অনেক সাহিত্যিকের কাছে গেছি!...

কিন্তু বাণীবিনোদের কাছে গেছেন কি? —বারিকমশাইকে থামিয়ে সেই মূহুর্তে উদ্ভাবিত নামটার ওপর জোর দিয়ে বললো, —বাণীবিনেদ মুনতাকীর কাছে গেলে ব্যবহার পেতেন না।

বাণীবিনোদ?—বারিকমশাই বিমূঢ়ভাবে আমার দিকে তাকালেন।

সে-বিমূঢ়তা দূর করে তাকে উৎকর্ষ করে তুলতে খুব বেশী কষ্ট করতে হয়নি।

হ্যাঁ, অপ্রকৃতিস্থ এক প্রৌঢ়কে অসম্মোচে আমি প্রতারণা করেছি সেই মূহুর্তের খেলালে। তার জন্যে বিস্ময়ের অনুশোচনা আমার মনে নেই।

একটিবারের জন্যে আশ্চর্য এক উদার সহৃদয় সাহিত্যিক বাণীবিনোদ মুনতাকী—হবে আমি নিজেই কৃতার্থ হয়ে গেছি! ৥

একবার একটা ফিল্ম-স্টুডিওতে গিয়েছিলাম। জীবনে যে-সব জায়গায় খুব কম গিয়েছি তার মধ্যে ফিল্ম-স্টুডিও একটা। ফিল্ম দেখতে যেমন, ফিল্ম যেখানে তৈরি হয় সে-জায়গাটা কিন্তু তেমন নয়। অর্থাৎ বাড়ি-ঘর-ড্রাইংরুম কিছুই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নয়। সব নোংরা, ধুলো-ময়লায় ভর্তি। শুধু বে-জায়গাটার ছবি তোলা হবে সেই জায়গাটুকু সাজানো-গোছানো থাকে।

তা আমার পক্ষে স্টুডিও-জিনিসটা নেহাৎই খুব স্বাভাবিক জায়গা নয়।

স্বাভাবিক নয় তার কারণ সেখানে বড় গোলমাল চারদিকে। মাথার ওপর থেকে ঘরের মেঝে পর্যন্ত সবাই হৈ-ঠে করছে সব সময়। ছবি তোলার সময়টুকু ছাড়া সেখানে চুপ করে বসে থাকতে এক পাপ। অবশ্য আর্টিস্টদের কথা জানি নে। তাঁদের জন্যে নিশ্চয়ই নানারকম আরামদায়ক বন্দোবস্ত থাকে। তাঁরা সেখানে যাবেন, অবসরের সময়ে বিশ্রাম নিতে পারেন তার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই থাকে। নইলে তাঁরা কাজই বা করবেন কেমন করে?

এমনি অবস্থার মধ্যে একবার যখন কাউকে পড়তে হয়, তখন হাসিমুখে সব সহ্য করাটাই নিয়ম। অর্থাৎ আপনার ভাল লাগছে না, এ-কথাটা চেপে রেখে আপনার যে ভাল লাগছে সেইটেই প্রকাশ করার নামই আধুনিক সভ্যতা। মূখে-চোখে একটা মিহি আপ্সা হাসি নিয়ে সকলের সপো নমস্কার বিনিময় করতে হয়। খাড়

নাড়তে হয়। ভাঙা চেয়ারে আরাম করে হেলান দিয়ে বসতেও হয়। এবং তেতো চা খেয়েও তৌটে পরিভূক্ত হাপ মাখিয়ে রাখতে হয়।

আমিও সেই অভিনয় করে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটলো।

একজন অভিনেত্রী মেক-আপ করা অবস্থায় আমাকে এসে নমস্কার করলে। অভিনেত্রীটির বয়েস কম। আমি প্রথমে চিনতে পারিনি। মেক-আপ অবস্থায় যদি চিনতেই পারবো তো মেক-আপ-এর সার্থকতা কী?

অভিনেত্রীটি বললে—আমার চিনতে পারছেন না, আমি নীতা—

নীতাকে মনে পড়লো। বহুদিন আগে 'রংমহলে' আমার একটা উপন্যাসের নাটক হয়েছিল, তাতে সে একটা ছোট ভূমিকায় অভিনয় করেছিল মনে আছে।

বললাম—কেমন আছে?

নীতা বললে—ভালো—আপনি কেমন আছেন? অনেকদিন পরে আপনার সপো দেখা হলো। আপনার কথা কালই হাচ্ছিল—

—আমার কথা? হঠাৎ?

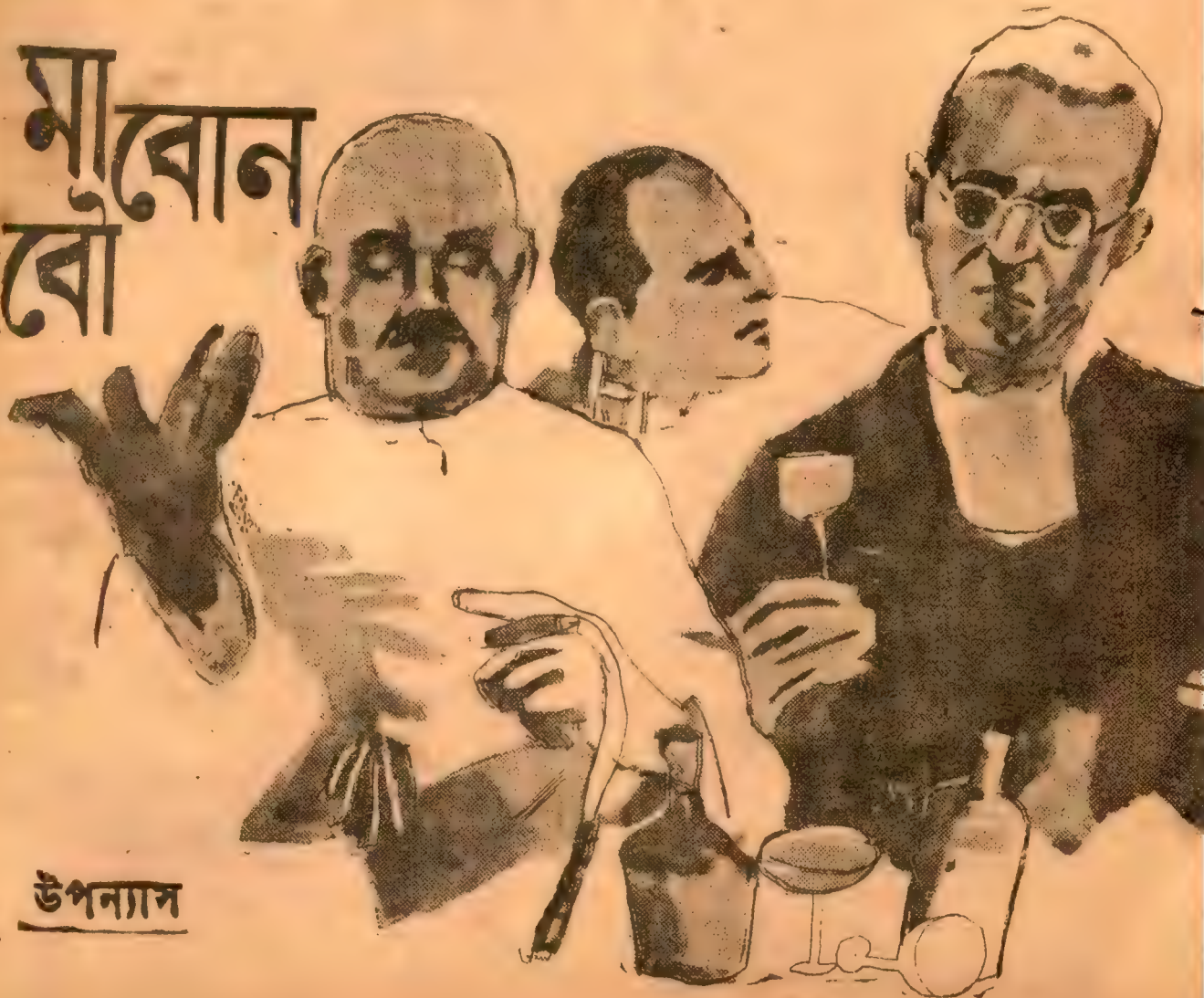
—আপনার একটা গল্প বেরিয়েছে। সেইটে পড়েছে না।

বললাম—কোন গল্প?

—ওই যে ফড়েপুকুর স্ট্রীটে মাধব দত্তর কথা লিখেছেন?

মাঝে বো

উপন্যাস



মাধব দত্ত, তার মোসারেবদের দল-বল, তারপর সীতানাথবাবু, মা
বলছিলেন আপনি আমাদের কথা নিয়েই লিখেছেন।

বললাম—কিন্তু তোমার মাকে তো আমি চিনলাম না ঠিক।
তোমার মা'ও কি এই লাইনে আছেন নাকি?

নীতা বললে—না,

—তাহলে? আমার মনে হয় বোধহয় কিছু ভুল করেছেন
তোমার মা। আমি বানিয়ে-বানিয়ে গল্প লিখি, অনেকে মনে করে
সত্যি-ঘটনা।

খানিক পড়েই শব্দটি—এ নীতার ডাক পড়লো।

নীতা বললে—একদিন আমাদের বাড়িতে দরম করে পারের
খুলো দেবেন?

বললাম—তোমাদের বাড়িতে?



বিমল
মিত্র

নীতা বললে—আমার মা বলছিল আপনি আমার থাকে
চেনেন। চেনেন বলেই আপনি আমাদের নিয়ে লিখেছেন।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। কোনও অভিনেত্রীর থাকে আমি
চিনি, এটা আমার নিজের কাছেই একটা সংবাদ-বিশেষ। তা ছাড়া
কোনও মহিলার সঙ্গে কখনও কোথাও বিনিমিতা হয়েছে এমন
ঘটনায় কই, মনে তো পড়ে না। তাই নীতার কথায় একটু অবাকই
হয়ে গেলাম। ভাললাম—তা হবে। কেউ যদি আমার সঙ্গে আলাপ-
পরিচয়ের গোঁড়বে গোঁড়বান্ধিত মনে করে তো তাতে আমি কেন
মাম সাধি!

ভেবেছিলাম অনুরোধটা কথার কথা। এমন অনুরোধ
কখনও শুনতে হয়, এবং এ-অনুরোধ পালন করার সম্বন্ধে
অনবধানতা অপরাধ হিসেবেও গণ্য হয় না। এমন তো কতই
হচ্ছে। ভদ্রতা আর আন্তরিকতার ব্যবধান ছুটিয়ে কে আর রোজ-
রোজ এক-কথাতেই মানুষের ঘনিষ্ঠ হচ্ছে!

সেদিন আর তার সঙ্গে দেখা হয়নি। হবির কারিগর থেকে
লিপ্সী সবাই তখন থেকে বলত হয়ে পড়লো। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।
তাদের কাজ তখনও শেষ হয়নি, আরো অনেকক্ষণ বাস্তু থাকবে
ভায়া। আমি এক ফাঁকে নিঃশব্দে স্টুডিও থেকে বেরিয়ে চলে
এসেছিলাম।

এ হলো আদিকথা।

কিন্তু আদিকথার আগেও যে অনাদি-অতীত-কথা আছে তা
জানতে পারলাম ওদের কড়িাপাড়ুর স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়ে। তাও
ওই-ঘটনার অনেক পরে। তখন ছবি-টবি শেষ হয়ে গেছে। হাউস
থেকে উঠে গেছে সে-হবি। প্রথম-প্রথম নীতা কয়েকটা ছবিতে
নেমেছিল, তাতে নাম-টাম না-হওয়ারত সিনেমাতো নামাও ছোট
দিয়েছিল।

আটমার্ট পৃথিবীর আর দশটা ঘটনার চাপে তখন অন্য সব
ঘটনা চাপা পড়ে গিয়েছিল। যেমন চীনের হুম্বা কাশ্মীরের
হ্যালামা, কংগ্রেসের পতন। পৃথিবীর ঘটনার কি শেষ আছে?

মনে আছে মাধব দত্তর কথা।

মাধব দত্ত বলতেন—চাটুজে, কারোর বিপদের কথা শুনলে
আমি আর স্থির থাকতে পারি না, জানো তো—এও আমার একটা
রোগ!

চাটুজে বলতো—আজকে রোগ কেন বলছেন, এ আপন'র
মহানুভবতা!

মাধব দত্ত বলতেন—দূর, তোমাদের ওই খোশামোদে কথা
আমার ভাঙ্গবে না। খোশামোদ আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি নে।
যে খোশামোদ করে তাকেও দেখতে পারি নে—

চাটুজে বলতো—আজ্ঞে সে কি আর আমি জানি নে
কতাইশাই, জানি বলেই তো আমি খোশামোদ-টোদ করি নে।

চাটুজের গাশে নন্দকিশোরও বসে থাকতো।

নন্দকিশোর বলতো—খোশামোদে আর যে-কেউই ভুলুক
আমাদের কতাইশাইকে কখনও খোশামোদে ভোলানো হবে না—

মাধব দত্তর কথা সে-গল্পে খুব খুঁটি-নাটি দিয়ে লিখেছিলাম।
মাধব দত্ত সে-কালের বর্ধিত লোক। এলাহি খানদানি মেডাজের
বাবু-সমাজের প্রতিনিধি করেছিলাম তাকে। সেকালের বাবু-সমাজে
তার প্রতিপত্তি দেখানোর জন্যে তার যেমন দান-খান দেখিয়েছি,
মহানুভবতা দেখিয়েছি, তেমন তার নানা নৈশ-কীর্ত-কলাপও
দেখিয়েছিলাম। শুধু যে তিনি মেয়েমানুষ পুষতেন তা নয়, তার
সঙ্গে তার উদারতার উদাহরণও দিয়েছি।

আসলে সে-গল্প লেখার পেছনে আমার মূল উদ্দেশ্য ছিল
সমাজের ক্রম-বিবর্তন দেখানো। আজকে কলকাতা শহরে যে-সমাজ
ক্রোধের সামনে দেখতে পাচ্ছি, এর পেছনে যে ইতিহাসটা আছে
সেইটে বলাই ছিল আমার সে-গল্পের-প্রধান বক্তব্য।

কিন্তু আজকে সে-গল্পটা ছিল আমার সম্পূর্ণ কাব্যনৈতিক।

কল্পনাটাও বাস্তবধর্মী করে লেখা যায়। গল্প লেখা
যায় বা পড়ে পাঠকের মনে হবে এ ঘটনা লেখকের বাস্তবিক অভিজ্ঞতা
থেকে উদ্ভূত। তেমন ধারণা করাবার জন্যে অনেক মার-পাট
আছে। আসলে মার-পাটটাই সব। পড়তে পড়তে যেন মনে না
হয় যে এ লেখকের মাথা ঘামিয়ে বানিয়ে বানিয়ে লেখা।

কিন্তু সেই বানানো গল্পই যে একদিন নীতাদের বংশের গল্প
হয়ে যাবে, সেই গল্পকে সত্যি মনে করে যে কেউ তা নিয়ে আলোচনা
করবে কল্পনা করতে পারিনি।

আর, সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে, নীতা যে নীতা, থাকে
আমি বলতে গেলে ভালো করে চিনি না, বার মাকে জীবনে কখনও
দেখিনি, তাদের ধন-ধান-কুল-শীল সম্বন্ধে কিছুই জানি না, তারাই
কিনা বললে—সে-গল্প তাদের নিয়েই লেখা?

মাধব দত্ত বড়লোক।

তা কলকাতার মাধব দত্তর মতন বড়লোক কি আর দশটা নেই?

আরো একটা কথা। বড়লোকদের সঙ্গে বড়লোকদের কোনও
তফাৎ নেই। আসলে তো সব বড়লোকরাই এক। বড়লোকদের
মধ্যে কোনও বন্ধুত্ব নেই বলেই কোনও বৈচিত্র্য নেই। বড়লোক
হলেই যেমন বাবুয়ানি করতে হয়, বাবুয়ানি না করলে যেমন
বড়লোক হওয়া যায় না, তেমনই গরীব হলে কিছু ঠিক উল্টো।
গরীব হলেও বড়লোকিন্দা করতে কোনও বাধা নেই। গরীব-
লোকদের মধ্যে সব-সময় বৈষম্যের উপর নেই যে লোকটা গরীব
কি বড়লোক। আসলে এক-কথার গরীবরা একজাতীয় হলেও
কোনও জাতই নেই তাদের।

বহুদিন আগের লেখা সে-গল্পটা! সবটা মনেও নেই আমার।
আর হাতের কাছে তার কোনও কপিও নেই, শুধু এইটুকু মনে
আছে যে তিনি সকালবেলা ঘুমোতে যেতেন আর বিকেল তিনটে-
চারটের সময় ঘুম থেকে উঠতেন।

আগ্রিত-অনাগ্রিত, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, মোসাহেব,
উকীল-আটর্নী সবাই-ই জানতো সে-কথা। তাই সবাই-ই জানতো
সে-কথা। তাই সবাই-ই প্রয়োজন হলে কিম্বা বিনা-প্রয়োজনেও
সেই সময়েও এসে হাজির হতো তার নাচ-দরবারে। এসে নাচ-
দরবারে বসে ঘটটার পর ঘটাই ধরা দিত।

তারা জানতো যে দত্ত-মশাই ওই সময়ে ঘুম থেকে উঠে
আড়মোড়া খেতেন। সারা রাত জাগরণের পর বেলা করে ঘুম
থেকে ওঠাই স্বাভাবিক। চাটুজেও তার নিজের বাড়িতে গিয়ে
ঘুমোত, নন্দকিশোরও তাই। আর ছিল সীতানাথ। সীতানাথ
স্নান-কটোগ্রাফার।

বলতে গেলে মাধব দত্ত সে-গল্পের প্রধান নায়ক হলেও
সীতানাথবাবুই ছিল তার প্রধান লক্ষ্য। গল্পটা সীতানাথবাবুকে
নিয়েই ঘটেছিল।

আটর্নী হরনাথবাবুও কাগজ-পত্র নিয়ে হাজির থাকতো সেই
নাচ-দরবারে।

হরনাথবাবুর দারিদ্ৰ্যটাই ছিল সবচেয়ে বেশি।

কারণ মাধব দত্তর এস্টেটের ভাল-মন্দ লাভ-লোকসান দেখার
পুরোপুরি দায়িত্ব হরনাথবাবুর ওপরে হস্তান্তরিত করে মাধব দত্ত
নিশ্চিত থাকতেন। কোন নিলামে কোন বাড়ি কিনলে কত
পার্সেন্ট প্রফিট হবে তা হিসেব করার সময় বা বর্ধিত কিছুই মাধব
দত্তর ছিল না।

মাধব দত্ত বলতেন—খুব বড় শুনবে হরনাথ, তুমি
বেখানে বসছো আমি দেখেনেই সেই দিনে নিছি, লোকসান হলে
কিন্তু তোমার দায়িত্ব-বৃত্তে তো?

হরনাথ কাগজ-পত্রগুলো ভরে ভরে সামনে এগিয়ে দিত,
আর মাধব দত্ত চোখ বুজে ততো একটার পর একটা সেই দিন
লিখতেন।

হরনাথ বলতো—আজকে হুইকোটে একটা মহলায় দিন
পড়েছে দত্ত-মশাই—

কথাটা শুনিয়ে আঁতকে উঠতেন মাধব দত্ত।

বলতেন—সম্বোধনাশ, আমাকে কেটে কেটে হবে না কি?

ম্যাটনটী হবনাথ সান্দ্রনা দিত। বলতো—না না, ক'রে বলুন, আপনাকে কেনা হাইকোর্টে যেতে হবে? আমি শুধু কথাটা বলে রাখলাম আপনাকে—

—তাই কাজে, বলে একটা স্মৃতির নিঃশ্বাস ছাড়তেন মাধব দত্ত।

মোসাহেব চার্টার্ড পাশ থেকে ফুটু বাটতো। বলতো—কেটে যাওয়ার মত পাপ আর নেই দস্ত-মশাই—

নন্দকিশোর বলতো—কোর্টে যাওয়ার চেয়ে নবকে বাওয়া চ্যব ভালো—

মাধব দত্ত বলতেন—তোমরা কিছু জানো না—

আশ-পাশের সবাই মাধব দত্তের কথা শোনবার জন্যে উদ্‌গীরিত হয়ে সামনে সরে আসতো। দস্ত-মশাই যে-কথা বলতেন সে তো শুধু কথা নয়, বাণী। মহাপুরুষের বাণীও অত মন দিয়ে কেউ শোনে না।

মাধব দত্ত তখন জামিরে বসতেন।

আদালত আলী ছিল মাধব দত্তের বাস-খানগায়। সে আলিবোলাটা এগিয়ে দিত মাধব দত্তের দিকে। মাধব দত্ত সেটা নিয়ে ধূমের পুরতেন। তাবপুর ভালো কবে ধোঁবা টেনে সেটা হাবার গামনের দিকে ছাড়তেন।

প্রথম টেনেই যদি গল-গল করে ধোঁবা না বোঝাত তো তিনি বরগে-মেগে নলটা টান মেবে ছুড়ে ফেল দিতেন।

বলতেন—বেরো, তুই বেবো এখন থেকে—অকম্বার গাড়ি, এতদিন ধরে তোমাক সাজাছিস এখনো ধোঁবা বাব করতে শিখলি না—

কিন্তু সে ওই একদিনই। একদিনই ওইবকম দুর্ঘটনা ঘটেছিল আদালত আসির জীবনে। একদিনই আদালত আলি বরখাস্ত হয়ে গিয়েছিল মাধব দত্তের দফতর থেকে। তাবপুর আবার ধব ঠিক হয়ে গিয়েছিল ফড়িপুরুষ স্ট্রীটের বাড়িতে।

ফড়িপুরুষ স্ট্রীটের বাড়িটাই ছিল উনিবিংশ শতাব্দীর মনীষের প্রতিনিধি-স্থানীয়। ওটা নিছক কম্পনা। ও বাড়িখানাই গ্রামি কম্পনা কবে নিয়েছিলাম অতীত ইতিহাসের বই পড়ার পর। সমাজ-ব্যবস্থা কেমন কবে বদলে-বদলে এবং বদলানোর ফলে সমাজ বদলে-বদলে কী রূপ গ্রহণ করে তাবই প্রতীক ছিল ওই মাধব দত্ত।

কিন্তু মাধব দত্তরা তো শুধু একলা ওঠে না।

একলা যেমন ওঠে না তেমনি আবার একলা পড়েও না। যখন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তখন তাদেব সঙ্গে চার্টার্ড-নন্দকিশোর-হবনাথ-সীতানাথ সবাই-ই ওঠে। তাদেব সঙ্গে তাদেব আশ্রিত-অন্যপ্রিত আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব-মোসাহেব-চার্ক-দাসী-বি সবাই-ই ওঠে। আবার মাধব দত্তরা যখন পড়ে তখন তাদেব নিষেই পড়ে।

মাধব দত্ত বলতেন—সব মিথ্যে, জানো নন্দকিশোর, এ সংসারে সব মিথ্যে। মানে সব কিছুটা মাল—

নন্দকিশোর বলতো—আজ্ঞে দস্ত-মশাই, পবনহংসদেবও ঠিক ওই কথাই বলে গেছেন—

—আরে, রাখো তোমার পরমহংসদেব! পবনহংসদেবের কি আমার মত এত টাকা ছিল?

নন্দকিশোর বলতো—আপনি হাসালেন দস্ত-মশাই, আপনাকে সঙ্গে কাব তুলনা। আপনাকে সঙ্গে যদি কেউ কাবে তুলনা কবে তো সে আহাম্মক—

—তুমি একটা আস্ত আহাম্মক নন্দকিশোর একটা আস্ত আহাম্মক তুমি—

নন্দকিশোর বরফের মতন হাসতে লাগলো। হেসেই সবিনয়ে স্বীকার করে নিলে যে সে আহাম্মক। দস্ত-মশাই এর লেহু আহাম্মক হয়ে থাকাও আনলেন। দস্ত-মশাই যদি আহাম্মক না

বলে হাসাজাদাও বলতো, তাহলেও তা মাথা পেতে স্বীকার করে নেওয়া রীতি।

তাবপব হঠাৎ হঠাৎ খেঁচাল হতো মাধব দত্তব।

মাধব দত্ত হঠাৎ বলতেন—কই, সীতানাথকে তো দেখাচ্ছিনে, সীতানাথকে তো দেখাচ্ছিনে—

সঙ্গে সঙ্গে লোক ছুটতো সীতানাথকে ডাকতে। সীতানাথও একজন মোসাহেব। ওই চার্টার্ড-নন্দকিশোর-হবনাথ-সীতানাথ এই তিনজনই বলতে গেল ছিল মাধব দত্তব আমি মোসাহেব মোসাহেব।

সেই বিকট চার্টার্ড সময় মাধব দত্ত ঘুম থেকে উঠেই মোসাহেব ঠাকুর-ঘবে। ঠাকুর-ঘবে গিয়ে পুজো-কবতেই তাঁর দু'হাটা কেটে যেত। তাবপব যখন পুজো-ঘর থেকে বেরোতেন তখন মাধব দত্তব সে কী সৌম্য মূর্তি। কপালে রক্ত-চন্দনের তিলক, পবন গম্বুজ ধূতি, ধপ্পে ফরসা খালি গা—

আব তাবপব আদালত আলি তাঁর শান্তিপূরী ধূতি, মলমলের গজাবি সিলেক্স গেরি নিবে তাঁকে পালিয়ে দিত। আঙুলে আংটি দিত, হাতে রিস্ট-ওয়াচ, গলায় সোনার চিব-তল।

আব ওদিকে আটনটী হবনাথবাব নিলেমের নথি-পত্র নিয়ে হাজির থাকতো নাচ-বববাবে। হরনাথের সঙ্গে হাজির থাকতো চার্টার্ড-নন্দকিশোর। আব এককোণে বসে থাকতো সীতানাথ। সকলের হাজির না থাকলে মাধব দত্তব খাবার জগতো। সবলে শগরীবে হাজির না থাকলে মাধব দত্তব ঘুমের ব্যাঘাত হতো।

বলতেন—নাঃ, সবাই আলসে হয়ে গেছে, বেড়ি আর বসে করে না—

এ-গল্প বহুদিন আগেব লেখা। যেমন মানুষ সব ঘোরে তাগাদার পড়ে লেখা, সে লেখাও তাই। যে-গল্প এখনও লেখা হয়ে যাব, তাবপরে আব সে-লেখাব কথা মাথাব ধরে না। পুস্তক-পাত্র-পাত্রীসে নাম ভুলে যাই। অনেক সময়ে তেঁও হাঁস-যায। তাবপব যখন প্রকাশকের তাগিদে আবার বঁপের সংসদ কবতে যাই তখন কোনওটাই বজ্জে পাই না। তখন কাউকে ধরে পত্রিকাব অফিসে পাঠাতে হয় লেখাটার নকল বসিয়ে আনতে। লেখা এক জিনিস। সেটা মনের তানদে কিন্বে মাথাব ঘাম পান ফেলে একদিন শেষ করা চলে। কিন্তু সেই লেখাব হিসেব ক'র অন্য জিনিস। সেইটেই বড় কঠিন কাজ মনে হয় আমার কাছে। আর সঙ্গে সঙ্গে আছে সেই লেখা-সংক্রান্ত ব্যাপারের পাঠক-চিঠি লেখালেখি। সেটা আরো শক্ত কাজ।

চিঠি পেতে যে ভালো লাগে না তা নয়। খুবই ভালো লাগে। যাঁরা চিঠি লেখেন তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু উত্তর দেওয়া?

উত্তরটা তো নিজের হাতেই দিতে হবে। নিজেব হাতে উত্তর না দিলে তো কেউ খুশী হবে না। তাই উত্তর দেব-দেব করে এখন অনেক দিন কেটে বসে, তখন বাসি হবে যাঁর জিনিসটা। তাই উত্তর দেওয়াও যা অন্য না-দেওয়াও তাই। আর ততদিনে অন্য চিঠিব ভিড়ে সে-চিঠি হবত হাবিয়েই গেছে।

এবার আব তা নয়। এবার একেবারে সবাসর্পি অন্য অভিযোগ।

কবে একদিন কোন গল্প লিখাছিলাম কোন পত্রিকাব কোন সম্পাদকের তাগিদে, সেই গল্পকেই আবার স্মৃতির সিন্দুক খুলে উদ্ধার করতে হচ্ছে। এ যেন সেই পূর্বপুরুষের শাল-দোশালা গায়ের নেওয়ার মতন। তাব ভাঁজে ভাঁজে মনেদীঘানা, কিন্তু ভাঁজ খুলেই সর্বনাশ। একেবারে ছিঁড়ে-খুঁড়ে এক্সা হয়ে যাবে।

এবার মোসাহেব কথা শুন বড় অবসিত্তে পড়লাম। সেই ফড়িপুরুষ স্ট্রীটের দস্ত-বাড়ির মনস্তাত্ত্বিক ফড়িপটুর ফড়ি-ফড়ি চুপে কবলান। ঐশ্বর্যের সঙ্গে যে-বস্তুগে মেলানো থাকে,

সেই স্বপ্নগাথ কথাই তো আমি বরাবর লিখে চলেছি। স্বপ্নগা না থাকলে তো মানুষ নিশ্চিন্ত। স্বপ্নগা না থাকলে তো এ-পৃথিবী নরক হয়ে উঠতো। এই নরকের মধ্যেই আমি বরাবর শিল্পের খোরাক খুঁজে বেড়িয়েছি। আব মানুষকে আমার সাধ্যমত অমৃত পিবেশন কবতে চেয়েছি।

যেমন সীতানাথবাবু।

মাধব দত্তর নাচ-দরবারে চার্ট্রেশ্জ, নন্দ-কিশোর আর হরনাথবাবুর সঙ্গে সীতানাথ তো নরক-স্বপ্নগাই ভোগ করেছে। কিন্তু সেই নরকের মধ্যেও সীতানাথ কেমন করবে পরমার্থের সন্ধান পেয়েছিল সেইটেই ছিল আমার সে-গল্পের প্রতিপাদ্য বিষয়।

মাধব দত্ত কিন্তু সীতানাথকেই খুঁজতেন।

বললেন—কই হে, সীতানাথকে তো দেখছি নে—

লোক ছুটেতো সীতানাথের কাছে। সীতানাথের কাছে মনে মাধব দত্ত-ব আন্তাবল-বাড়িতে। মাধব দত্তর বিরাট বাড়ি। ফড়েপুকুর স্ট্রীটের বাইরে থেকে কিছু বোঝা যেত না। বাড়ি না বাড়ি। যেমন আর পাঁচটা বাড়ি হয়, তেমনি। কিন্তু সব গেট পেরিয়ে একটু ঢুকলেই দেউড়ি। সেখানে মাধব দত্তর দরোয়ান বসে থাকতো। দরোয়ানের কাজ দাঁড়িয়ে সদব গেটে পাহারা দেওয়া। যেমন আব পাঁচটা বড়লোকের বাড়ির দরোয়ান পাহারা দেয়। কিন্তু মাধব দত্তর দরোয়ান বসে থাকতো। শব্দ বসে থাকতো নশ। বসে থাকতো আর আঙা জমাতো।

তারপর দেউড়ি পেরিয়ে ডার্নাদিক বরাবর লম্বা উচু পাঁচল। একেবারে মাধব দত্তর বাগানের শেষপর্বত গিয়ে সীমানা তোর কবেছে।

আর বাঁদিকটার বৈঠকখানা।

বৈঠকখানার ভেতর গোটাকতক হেলান দেওয়ার বেঞ্চ আছে। একটা ফরাস। ফরাসেব ওপর খেরো-ভার্কিয়া গোটাকতক এঁদিক-ওঁদিক পড়ে আছে। দেয়ালের গায়ে খানকমণ ছবি। কাব ছবি কে জানে। সেকালের পুরোন আমলের কতামশাইদের কাবো কারো হবে হয়ত।

সে-ঘরের উত্তর দিবে বাগানের মৃখ-বরাবর ইট-বাঁধানো রাস্তা পেরিবে পড়বে বার-মহল। বার-মহলে ঢুকতে দু'পাশে সিমেন্ট-বাঁধানো বসবার বেঞ্চ। সেখানে বসতেও পারো আবার শূতেও পারো। একেবারে লম্বা টান হয়ে চিপ্পাত শূয়ে পড়ো। অনেক জাষগা পড়ে আছে।

আর তাই ভেতবে চকমিলান বাব-বাড়ির উঠান। চারপাশে সবুজ রং-এর জানালা-দরজা। ওগুলো আসলে জানালা-দরজা নয়। আঁকা জানালা-দরজা। আর সমস্ত উঠানটা ঘিরে দেয়াল-লাগোয়া উঁচু বোয়াক। দু'তিনটে। সিঁড়ি দিয়ে সেই রোয়াকে উঠে হেটে গিয়ে ডার্নাদিকের কোণে পড়বে দোতলায় ওঠবার কঠোর সিঁড়ি।

সেই সিঁড়ি বেবে উঠলেই বাঁদিকে পড়বে মাধব দত্তর নাচ-দরবার।

তা সেই সেখান থেকে তলব পেয়ে সীতানাথকে ডাকতে গেলে ওই সিঁড়ি, ওই রোয়াক, ওই দেউড়ি, ওই বাব-মহল, ওই বাগান মাড়িবে ভবে বেতে হয়। একেবারে বাগানের পশ্চিম কোণে মাধব দত্তর আন্তাবল-বাড়ি। সেখানে আন্তাবল-বাড়ির লগোয়া একখানা ভাঙা ঘরের ভেতরে তক্ত-পোয়ের ওপর সীতানাথবাবুর রাজ্যপাট।

রাজ্যপাট ওই নামেই। ওটা শ্লেষার্থে বললাম।

দেয়ালের ওপর কুলদ্বিগতে একটা কঁচের শিশিতে একটু সরষের তেল থাকে। থাকে দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম। দড়িতে গমজা কোলে। ভিজে চিট-ময়লা গামছা। কাসে গেলে, নাকে গম লাগে। তবু তারই মধ্যে বেশ দিবা নক ভাকিয়ে ঘুমোষ সীতানাথবাবু।

মাধব দত্ত যখন রাস্তিবে গাড়ি হাঁকিলে মোসয়েব নিষে নৈশ-বিহারে যান, তখন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সীতানাথবাবু নাক ডাকায। বাজ পড়লেও তাব ঘুমের ব্যাঘাত হয় না। তারপর শেষ ব্যগ্রের দিকে কখন মাধব দত্ত বাড়িতে ফেবন অজ্ঞান-অচেতন হয়ে তাব খোয়াল রাখে না।

হুসেন মিয়া মাধব দত্তের কচোয়ান।

শেষ রায়েব দিকে বাড়ি ফিবে হুসেন মিয়া আন্তাবলের সামনেই খাটিয়াটা নিয়ে পড়ে থাকে।

সীতানাথবাবু ডাবে—ও হুসেন, হুসেন মিয়া—

হুম-জডানো চোখে হুসেন মিয়া ওঠে।

বলে—কী হুজুব?

সীতানাথবাবু বলে—কাল কত রাস্তিবে বাড়িতে ফিবেল গো?

হুসেন মিয়া বলে—কাল রাস্তিবে তো নয়, আজ সবেরে—

—আহা!

সীতানাথবাবুর মৃখ দিয়ে একটা মৃদু 'আহা' শব্দ বেরিয়ে বাব অজান্তে। সে 'আহাটা' যে আসলে কার জন্যে তা কেউ বুঝতে পারে না।

রিহম বোমো। রিহম মাধব দত্তর সহিস। কচোয়ানের সাগরেদ।

বলে—সীতানাথবাবুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে হুসেন ভাইয়া—

তা অন্যলোকের চোখে তাব মাথাটা খারাপই হয়ে গেছে বলতে হবে। তাগ সবাই ডাবে সীতানাথবাবু আন্ত পাগল মানুষ।

নইলে ঘোড়ার জন্যে কেউ মাথা ঘামাষ?

মাধব দত্ত পড়ে রইল, চার্ট্রেশ্জ পড়ে রইল, নন্দকিশোর পড়ে রইল। হুসেন মিয়া, রিহম সবাই-ই পড়ে বইল, যত মায়া ঘোড়াটার ওপর।

মাঝে মাঝে সীতানাথবাবু ঘোড়াটার কাছে গিয়ে দাঁড়াব। মৃখেব দু'পাশে সিঁড়ি দিবে বাঁধা। দমন চিবোয়। মৃখ দিয়ে ফেনা বেরিয়ে ফোঁটা ফোঁটা মাটিতেও পড়ে। তার মত অবলা জীবন সঙ্গে কীসের এত ভাব সীতানাথবাবুর নে জানে।

ঘোড়াটা যেন সীতানাথবাবুর আপন কেউ।

সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে সীতানাথবাবু তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। নাকে হাত বুলিয়ে দেয়। ঠোঁটেও হাত বুলিয়ে দেয়। যেমন করে মানুষ আপন ছেলেকে আদব কবে, ঠিক তেমনি।

আবার কাছাকাছি কেউ না থাকলে তার সঙ্গে কথাও বলে।

বলে—কী রে, খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি?

ঘোড়াটা বোবার মত চেবে থাকে সীতানাথবাবুর দিকে।

সীতানাথবাবু বলে—ওরে, সকলেবই কষ্ট হয়। এ-সংসারে বাবা গরীব হয়ে জন্মেছে, তাদের সকলেই তোঁর মত কষ্ট হয়। তুই অবলা জীব তো, তাই মৃখফুটে বলতে পারিস না—

তারপর আবার একটু থামে।

বলে—আমিও তোব মতন রে, আমিও তোঁর মতন। তুইও কিছু বলতে পারিস না। আমিও না।

তারপর আবার একটু থেমে বললে—যাকগে, একদিন এর কড়ায়-গম্ভায় হিসেব-নিকেশ হবেই, একদিন সব বোঝাপড়া হবেই—তখন?

তারপর হুসেন মিয়াব পায়ের শব্দ পেয়ে নিঃশব্দে সরে আসে। কেউ দেখতে পাবে বলে বুঝি লজ্জা হয় সীতানাথবাবুর? ওবা তো বুঝবে না। জানোয়ারও যে মানুষ, জানোয়ারেবও যে মানুষের মত প্রাণ আছে তা তো হুসেন মিয়া বুঝবে না।

হুসেন মিয়া বলে—সীতানাথবাবু, আপনি কি ঘোড়ার সঙ্গে কথা বলেন নাকি?

সীতানাথবাবু লজ্জায় পড়। বলে—না, কী যে বলো ছুঁমি। ঘোড়া কি আর কথা বলে। আমি নিজের মনেই কথা বলছি—বলে হাসে। তারপর বলে—তবে কি জানো ...

বলে কাছে সরে আসে। বলে—অবলা জীব তো, বোঝে সব। এই যে আমি ওর কাছে গিয়ে কথা বললাম, ওব ঘড়ে মৃখে হাত বুলিয়ে দিলাম, ও সব বুঝতে পেরেছে—

--কী বুঝতে পেরেছে!

সীতানাথবাবু বলে—বুঝতে পেরেছে আমি ওকে ভালবাসি—। ভালবাসা কখনও চাপা থাকে না গো। আমি ওকে ভালবাসি এটা ও বুঝতে পারে। দেখছো না, ওব চোখ দিয়ে জল পড়ছে—

সিঁতাই সীতানাথবাবু কাছে গেলে, কাছে গিয়ে আদব কবলেই ঘোড়াটার চোখ দিয়ে জল পড়তো। অবলা জীব হলেও বুঝতে পারতো এই বুড়ো লোকটা ওকে ভালবাসে। বড়লোকের বাড়ির ঘোড়া। ওই ঘোড়াই অনেক দেখেছে। মাধব দত্তকে অনেক দিন ধরেই দেখে আসছে।

প্রতিদিন সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন চার্ট্রেশ্জ এসে জোটে, নন্দকিশোর এসে জোটে, তেমনি হরনাথ এ্যাটর্নীরও এসে জোটে।

চাটুজ্ঞ বলে—অপনি আবার আজকে কেন এলেন এ্যাটর্নি-বাবু?

হবনাথবাবু বলে—কালকে একটা নীলম আছে হাইকোর্টে—

—নীলম? ঠিক এই সময়ে নীলমের কথটা শোনাবেন কর্তৃমশাইকে? আব সন্দের পেরলেন না?

হবনাথবাবু বলে—কী কববো চাটুজ্ঞ-মশাই, দস্ত-মশাই তো কিছু দেখেন না, আমার ওপর সব ভাব ছেড়ে দিয়ে নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছেন। তা বল জামি তো আব ঘুমিয়ে থাকতে পারি না। আমার তো একটা দারিয়ার আছে—

তা সত্যিই, সম্পত্তির ব্যাপারগুলোর ব্যাপারে মাধব দস্ত একেবারে নরকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোতেন।

চাটুজ্ঞ সামনে থাকলে বলতেন—তারপর, আজকের কী খবর বলো?

চাটুজ্ঞ বলতো—আজ্ঞে, আজকে একটা সর্বনাশের ব্যাপার হয়ে গেছে—

—সর্বনাশ? কীসের সর্বনাশ?

চাটুজ্ঞ বলতো—আজ্ঞে, আজকে আমাদের পাড়াব একটা হুবতী মেয়েকে নিয়ে এক ব্যাটা লোফার কোথায় উধাও হয়ে গেছে—

—উধাও হয়ে গেছে মানে?

মাধব দস্ত গড়গড়ায় নলটা সর্ষে সোজা হয়ে বসতেন।

বলতেন—হুবতী মেয়ে? তোমাদের পাড়া থেকে উধাও হয়ে গেল?

চাটুজ্ঞ বললে—আজ্ঞে, তা গেল—

—গেল মানে গেল? আব তোমরাও চুপ-চাপ মাধব হাত নিক বসে বইলে! তোমাদের পাড়াব মানুষ নেই কেউ?

চাটুজ্ঞ বলতো—আজ্ঞে, মানুষ থাকলে কী হবে, করো জত কাব্যে, জ্ঞান মাধব্যাধি নেই—

মাধব দস্ত বলতেন—তাহলে পাড়ার ভন্দবলোক কেউ নেই বলো—

চাটুজ্ঞ বলতো—এ-সংসারে পথের জন্যে কে ভাবে বলুন তো? এক অপনি হুড়া, আর তো কাউকে দেখলাম না তেমন যে পথের কথা ভাবে—

মাধব দস্ত বলতেন—তুমি তোমার এই খোসামুদে কথাগুলো ছাড়া তো, আমি খোসামুদে কথা শুনতে মোটে ভালবাসি না। এখন কী বিহত কববো তাই বক্তা। মেয়েটার বাপ-মা-ভাই কেউ আছে?

—কেউ নেই স্যাব, কেউ নেই, একজন বড়ি বিষবা গা আছে, তাও সে না-থাকাবই মত!

—তা কোথায় আছে মেয়েটা কিছু খোঁজটোজ পেয়েছে?

চাটুজ্ঞ বলতো—না স্যাব, খোঁজ-টোজ আর কে-ই বা নেবে, তবুমা পুচার জন ছেলে-ছোকরার দল শুনলুম মেয়েটা খুড়ান আছে। খুড়ান এক গোঁসাই-এর বাড়ি নিয়ে গিয়ে বেথে দিয়েছে তাকে—

মাধব দস্ত দু'একবার নলটায় ঘন-ঘন টান দিতেন।

তারপর বলতেন—খুড়ান য়েতে হয় তাহলে একবার, এ শুনো তো আর চুপ করে

থাকা যায় না। অন্যথা বিধবাব একমাত্র হুবতী মেয়ে নিখোঁজ হয়ে যাবে, আব আমবা এতগুলো জুলোক থাকতে সব চুপ করে বসে থাকবো? চলো চলো—সবাই চলো—

তা সেই সময়েবেলাই ভোড-জোড সুন্দর হয়ে যেত। মাধব দস্ত খুড়ান য়াবেন রুদ্রিণী উদ্ভার কবতে। সঙ্গে চাটুজ্ঞ যাবে, নন্দকিশোর যাবে, সীতানাথ যাবে আদালত জালি যাবে, আর যাবে হুসেন শিখা আব বহিম। এতগুলো লোকের খাবার-দাবার সঙ্গে যাবে। লুচি-পবটা মাংস আলু দম, সব সঙ্গে যাবে। আব . .

আদালত জালি সঙ্গে কিছু বোতলও নিয়ে যাবে। লালপানি আব সোডার বোতল।

তারপর হৈ-হৈ কবে ফেডপদু হব বেবোবে মাধব দস্ত গাড়ি। পাড়ার লোক দেখবে বাবুবা নৈশ-বিহাবে চলেছে। প্রথম মাধব দস্ত উঠবেন, তারপর চাটুজ্ঞ, তারপর নন্দকিশোর। আব তারপর সীতানাথবাবু আর পেছনে আদালত জালি লুচি-পবটা মাংস চ্যাটারি নিয়ে উঠবে গাড়ির ছাদে ভেতরে বসে মাধব দস্ত গড়গড়ায় নল টানবেন, খোঁয়া বেরোবে, তবে আদালত জালি নিশ্চিন্ত হবে। তারপর হুসেন শিখা গাড়ি ছেড়ে দেবে।

তারপর দুর্গা-দুর্গা বলে যাত্রা সব হবে, রুদ্রিণী উদ্ভার পালা আবস্ত হবে

নির্ভরযোগ্য কয়েকখানি কলেজ বই

অধ্যাপক চৌধুরী ও অধ্যাপক সেনগুপ্ত প্রণীত

(১) তর্কবিজ্ঞান-প্রবেশ (Deductive & Inductive)

—৪র্থ সংস্করণ ৬.০০

ডঃ সভাপ্রসাদ সেনগুপ্ত প্রণীত

(১) পাশ্চাত্য সাহিত্যের সমালোচনার ধারা

৭.০০

অধ্যাপক প্রমোদবাবু সেনগুপ্ত প্রণীত

(১) দর্শনের মূলতত্ত্ব (ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শন)—৪র্থ সংস্করণ ১৪.০০

(২) ভারতীয় দর্শন (Indian Philosophy)—৪র্থ সংস্করণ ৭.৫০

(৩) ভারতীয় দর্শন (২য় পর্ব) For Burdwan University ২.০০

(৪) পাশ্চাত্য দর্শন (Western Philosophy)—৪র্থ সংস্করণ ৭.৫০

(৫) পাশ্চাত্য দর্শন (For Burdwan University, Part II) ১০.০০

(৬) নীতিবিজ্ঞান ও সমাজদর্শন—৬ষ্ঠ সংস্করণ ১৪.০০

(৭) নীতিবিজ্ঞান (Ethics)—৬ষ্ঠ সংস্করণ ৭.৫০

(৮) সমাজদর্শন (Social Philosophy)—৫ম সংস্করণ ৭.৫০

(৯) মনোবিদ্যা (Psychology)—২য় সংস্করণ ১৪.০০

(১০) Handbook of Social Philosophy 2nd edition 12.00

(১১) পাশ্চাত্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—

(আধুনিক যুগ : বেকন-হিউস) ৬.০০

অধ্যাপক মহাদেব চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

(১) রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Theory : Recommended by B.U.) ৭.০০

(২) ভারতের সংবিধান (Constitution of India) " ৪.০০

(৩) আধুনিক সংবিধান—

(ব্রিটিশ, মার্কিন, সুইজারল্যান্ড ও বাসিরা) " ৫.০০

অধ্যাপক জ্যোতীকুমার রায় প্রণীত

(১) শিক্ষা-তত্ত্ব (Principles and Practice of Education) ৬.৫০

(২) ভারতের শিক্ষা-সমস্যা—২য় সংস্করণ (Educational Problems) ১২.০০

(৩) শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান—২য় সংস্করণ (With Statistics)

—অধ্যাপক সেনগুপ্ত ও রায় ১৫.০০

By S. Banerjee : Revised by Prof P. B. Sengupta

1. P.U. & U.E. Logic Made Easy (in Bengali) 2.25

2. Ethics Made Easy (in Bengali) 2.50

3. Psychology Made Easy (in Bengali) 4.50

4. H. S. Logic Made Easy (in Bengali) 4.00



ব্যনার্জী সাবলিভার্স

৩১০, ৭-এ প্রা. বাল্যাকালী : ৩০-৬২৩৭

এমনি প্রায় বোঝ। প্রায় 'রোজই' বাবে এমনি চলবে মাধব দত্তর নৈশ অভিবান। কোনও দিন খড়্গা, কোনও দিন শ্রীরামপুর, কোনও দিন কলাতলার বসন্ত, আবার কোনও দিন একেবারে খাস-কলকাতা। একদিন না একদিন কোনও বুঝতী মেয়েব সর্বনাশের খবর দেবে চাটুক্ষে আব মাধব দত্তর বনেদী রক্ত টগবগ কবে ফুটে উঠবে পবোপকাবে ত্যাগদে, আর সঙ্গে সঙ্গে লুচি-পুরোটো-মাংস-আলুর দমের সঙ্গে লালপানি আর সোডার বোতলের চ্যাচারি সঙ্গে বাবে।

আর বন্ধন বাবুরা রুক্মিণী উষ্মার করে ফিরবে, তখন ফড়েপুকুরের রাত ভোর হয়ে এসেছে। সে-দৃশ্য আর কারো নজরে পড়ে না। তখন ফড়েপুকুরের পাড়ার সবাই ঘুমে অচেতন। মাধব দত্তকে তখন ধরে নামিয়ে দিতে হয়। আদালত আলি গাড়ি থেকে নেমে মাধব দত্তকে ধরে। ধরে আস্তে আস্তে সদর-গেট পেরিয়ে বাড়ির ভেতর-মহলে নিয়ে যায়। ভেতর-মহল মানে একেবারে বার-মহল পেরিয়ে অন্দরের শোবার ঘরে।

প্রথম-প্রথম তন্দর-মহলে যাওয়ার ক্ষমতা থাকতো মাধব দত্তর।

কিন্তু শেষের দিকে নেশা হলে মাধব দত্তর মাতলামি বেন বেড়ে যেত। হাত-পা ছুঁড়তেন। চিৎকার করতেন। আদালত আলিকে মারধোর করতেন।

বলতেন—নিকাল যাও ই'হাসে, শালা শুরুরা কা বাছা—নিকলো—

আদালত আলিকে মাধব দত্ত গালাগালিই দিন আর মারধোরই কবুন, তাতে আদালত আলির কিছ্র এসে যেত না। শব্দ বলতো—

জী হাঁ—
আর তারপর মাধব দত্ত অঝোরে বিছানার ওপর টেল পড়তেন। একবার শুরে পড়লে তাকে নড়ান এমন সখ্য ছিল না কারো। তখন তিনিই বা কে, আর স্বয়ং দেবাদিদেব মহা-দেবই বা কে!

এ-গল্প আমি আগে বলেছি।

এ বারী আগে আগে পড়েছেন তারা জানেন ঊনবিংশ শতাব্দীর যে-ঐতিহ্য বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত চলে এসেছিল, এ তারই বিকৃত রূপ। তারপর আমবা এখন শ্যামবাজারের দিকে কলেক্টে পড়বাব লম্বা হাতারাত করেছি, তখনও তার কিছ্র কিছ্র ধ্বংসাবশেষ দেখেছি।

মাধব দত্তব সেই লাল বাড়িখানা তখনও সেইরকমই অটুট ছিল। সেই লাল রং। সেই সদরফটক, সেই দেউড়ি, সেই বার-মহল। সেই পেছনদিককার বিরাট বাগান।

বে-নাচ-দরবারে মাধব দত্ত বসতো, তার মেয়ের ওপর সেই লম্বা-চওড়া ফরাস তখনও পাতা ছিল। আগে নাকি ফরাসটার ওপব ফরাসা চাদর পাতা থাকতো। চারপাশে লম্বা লম্বা বেলজিয়াম কাঁচের আরনা ঝোলানো থাকতো। ঝাড়-লণ্ডন বুলতো মাথার ওপর। আর গোটা দশ-বারো তাকিয়া ছড়ানো থাকতো ফরাসটার ওপর।

আর ফরাসের সামনে অনেকখানি জারগা শ্বেত-পাথরে ঢাকা ছিল। শ্বেত-পাথরের

মেঝে, কিন্তু তার ওপর রং-বেরঙের পাথর নিয়ে একটা মসত পদ্মফুল আঁকা ছিল।

মাধব দত্তর পূর্ব-পুরুষের আমলে এখনে নাচ হতো। বেনারস-লেক্কা থেকে বাঁজী-সাহেবারা আসতো মজরো নিয়ে। বাবর সম্ম ইনাম নিয়ে যেত। আবার পরের বছর আসবার বরাত নিয়ে যে-বার দেশে ফিরে যেত।

কিন্তু মাধব দত্তর আমলে সে-নিয়ম উঠে গিয়েছিল।

মাধব দত্ত বাড়িতে নাচ-গানের পক্ষ-পাতী ছিল না। বাড়িতে মেয়েমানুষ নিয়ে এসে ফুটি করা তার হাতে সহিত না।

মাধব দত্ত বলতেন—বাড়িতে ও-সব বেলেজাগিবি ভল্লাগে না—

চাটুক্ষে বলতো—বেলেজাগিবি আপনার হাতে সহিবে না স্যার, আপনি হলেন অন্য ধাতের—

মাধব দত্ত শব্দী হতেন শূনে।

বলতেন—জানো চাটুক্ষে, সে-কালের কতাদের তো কাজকর্ম করতে হতো না, কেবল ফুটি করে গেরছ, টাকা উড়িয়ে গেছে। আমরা হলুম খেটে-খাওয়া মানুহ, ভামাদেব ও-সব পোষাবে কেন হে!

নন্দকিশোর বলতো—সে-মুগে ম্যার কতাদের দায়বজ্ঞান ছিল না তো—

মাধব দত্ত বলতেন—এই দেশ না, কল্-টোলার মোড়ে যে মসত বাড়িখানা, ও-খানা তো আমার কতাবাবরই ছিল। ছোটবেলার আমরা ও-বাড়িতে অনেকবার গিয়েছি—

—ওটা তো—এখন মল্লিকদের স্যার।
হুঁচো মল্লিকের—

মাধব দত্ত বলতেন—আরে এখন তো হুঁচো মল্লিকের, কিন্তু হুঁচো মল্লিকের সম্পত্তি হোল কী করে তাই তো বলছি—
চাটুক্ষে বলতো—তাই নাকি স্যার, কী করে হলো বলুন—

—কী করে হলো শোন, আজমীরের বাঁজী, বুঝলে চাটুক্ষে, আজমীরের বাঁজী কুন্দন বাঁজী কতাবাবর ডাক পেয়ে কলকাতার গন গাইতে এসেছে। কুন্দন বাঁজী-এর নাম শুনলে তো?

নন্দকিশোর বললে—আজ্ঞে কী যে বলেন স্যার, কুন্দন বাঁজী-এর নাম শুনিনি? রেকর্ডে কুন্দন বাঁজী-এর গান শুনিয়ে ছোটবেলার—

সেই কুন্দন বাঁজী-এর কথা বলছি...

হঠাৎ ধোঁয়া টানতে টানতে নল দিয়ে আর ধোঁয়া বেরোয় না। মাধব দত্তর মেজাজ গবম হয়ে গেল।

লক্ষ্য করেছে চাটুক্ষে। চাটুক্ষে ডাকলে—আদালত—আদালত—

মাধব দত্ত নলটা ছুঁড়ে ফেল দিলেন। রাগে তখন মেজাজ সন্তমে উঠেছে তাঁর। আদালত আলি সর্বনাশের গন্ধ আগেই পেয়েছিল। একটুকু গাফিলতিব জনোই এমন হয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা সজ-কলকে এনে নলচের ওপব বসিয়ে দিলে।

—কোথার থাকিস, উল্লুক?

আদালত আলির ওই এক উত্তর—জী হাঁ—

—ফের যদি গাফিলতি দেখি তো তোকে চাবুক মেবে বাড়ি থেকে বার করে দেব, হারামজাদা কোথাকার—

ধোঁয়া বেরোল। আর সঙ্গে সঙ্গে মাধব দত্তর মুখেও হাসি বেরোল।

বললে—তারপর শোন চাটুক্ষে, সেই কল্-টোলার বাড়িটার কথা বলি—কিন্তু তার আগেই এ্যাটর্নী হরনাথ সামনে এগিয়ে এসে কাগজটা মেলে ধরে।

বলে—এইখানটার একটু সহি করে দেবেন দস্ত-মশাই—

মাধব দত্ত বিরক্ত হয়।

বলে—তুমি আবার কাজের সময়ে বিরক্ত করতে এলে কেন, বল দিকিনি—

হরনাথ বলে—আজ্ঞে, এই প্রপাটিটার প্রোবেট হবে—

—তুমি এখন প্রোবেট-টোবেট রাখো দিকিনি হরনাথ। আমি বরাবর দেখেছি কাজের সময় তোমার বত তাকি! দেখতো এখন একটা কাজ করছি—

হরনাথ কাগজটা গুটিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে পিছিয়ে আসে।

মাধব দত্ত বলে—এই তোমাকে বলে রাখছি কাজের সময় ঝুঁকনো তুমাকে বিরক্ত কবে না। কাজের সময় বিরক্ত করলে আমার মাথা-গরম হয়ে যায়—

হরনাথ আর দাঁড়ালো না। অনেকক্ষণ ধরে বসে ছিল হরনাথ এই সামান্য কাজটার জন্যে। কিন্তু হলো না। মাধব দত্ত এখন গল্প করতে বসবে তখন কারো সাধ্য নেই তাকে বিরক্ত করে।

চাটুক্ষে বললে—হ্যাঁ দস্তমশাই, ঠিক বলেছেন, বত সব বাজে কামেলা। তারপর বলুন আপনার গল্পটা—

মাধব দত্ত বললে—তবে শোন—

বলে গাড়গাড়ার নলটা আবার মুখে তুলে নিলে—

বলে—জানো কুন্দন বাঁজী তো গান গাইতে এল আমার কতাবাবর মজরো নিয়ে। এসে উঠলো ওই কল্-টোলার বাড়িতে। সে কী বুপ কুন্দন বাঁজী-এর, একেবারে সারা গা-ভরা বুপ—

নন্দকিশোর বুঝতে পারলে না।

জিজ্ঞেস করলে—গা-ভরা বুপ মানে?

—দেখছে চাটুক্ষে, নন্দকিশোর কী-বক্স বেরসিকের মত কথা বলে। এইজন্যই তো আমি বেরসিকদের দেখতে পারি নে। গা-ভরা বুপ মানে, বোক না? গা-ভরা বুপ মানে হচ্ছে ভবা-বোবন। এবার বুঝলে?

নন্দকিশোর লজ্জায় পড়লো বড়।

বললে—আজ্ঞে, ঠিক বুঝতে পারিনি—

—বুঝতে পারবে কী করে? তোমার কি বস-জ্ঞান-ট্যান কিছু আছে। এতদিন আমাব দবাবে আছে, এখনো একটু বস-জ্ঞান হলো না। লোকে বলবে কী বলো তো?

চাটুক্ষে বললে—আজ্ঞে গুলি মেয়ে দিন, গুলি মেয়ে দিন ওর কথায়—

মাধব দত্ত বললে—গুলি ওমনি মারলেই হলো? সোজা কথাটা বুঝতে

পাববে না? সোজা কথা যদি বুঝতেই না পাববে তো কথা বলে লাভ কী, বলো। কথা বলে আমার লাভটা কী শুনো? কথা বলতে কষ্ট হয় না?

চাটুজ্জ বললে— তা তো হবেই। কথা বললেই শক্তি তো অপচয় হয়—

—তাহলেই বোঝ। আমি যে-কথাগুলো বলি সেটা তো 'সাজা কথা' নয় যে ভাবগুরু আর শ্রুতি দিয়ে ফস করে বেরিয়ে গেল। আমি অনেক ভেবেচিন্তে তবে কথা বলি, তা জানো?

চাটুজ্জ বললে—তারপর দস্ত-মশাই, তারপর?

মাধব দস্ত বললে—হ্যাঁ একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল চাটুজ্জ, তোমাদের পাতার সৈন্য বলছিলেন একজন মহিলার স্যামী মারা গেল—এখন কেমন অবস্থা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, সে তো আমি বলছি আপনাকে। অবস্থা কী করে ভাল হবে? মাধব দস্ত উদ্বেগে হলো।

বললে—তা অবস্থা ভালো না হলে চলছে কী করে!

—আজ্ঞে বলছে না।

—চলছে না মানে? অচল হয়ে গেছে?

চাটুজ্জ বললে—তার দুঃখের কথা আর বলবেন না স্যার—বড় কষ্টে চলছে— সে অচল অবস্থাই বলতে পারেন—

—কত ব্যয়?

—আজ্ঞে আঠারো। খুব সুন্দরীও ঘটেন—

—আঠারো? খুব সুন্দরী?

চমকে উঠলো মাধব দস্ত। চমকে উঠলো আবার রেগেও গেল। রেগে গাড়গাড়ার নলটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

বললে—তোমরা তো বড় আহাম্মক হে। একজন সুন্দরী আঠারো বছরের মহিলা অনাথা হলো আর তোমরা কিনা চুপ করে হাত কোলে নিয়ে বসে আছো?

চাটুজ্জ বললে—আজ্ঞে, কী করবো বলুন? আমাদের কি টাকা আছে, না সন্দের আছে। তাকে সাহায্য করতে গেলে টাকার দরকার হবে—

—তা টাকাবই যদি দরকার তো আমাকে বললে না কেন? আমি তো এখনও বেঁচে আছি, আমি তো মরিনি—

চাটুজ্জ চুপ-চুপ করে উঠলো।

বললে—ছি ছি, কী যে বলেন আপনি, আপনার মধ্যে দেখছি কিছুই আটকান না—আপনি রাগ করবেন না স্যার—

—রাগ করবো না? তুমি বলছো কী! তোমার খুন করে ফেলতে ইচ্ছে হচ্ছে, আমার এত রাগ হচ্ছে মনে—

চাটুজ্জ বললে—সে তো জানি, আপনাকে বলতেও ভয় হয়, আপনি একলা মানুষ। আপনি কত দিকে দেখবেন?

—কত দিকে দেখবো মানে? লোকের কণ্ঠ পাবে তখন আমি চুপ করে বসে থাকতে পারি তোমাদের মত?

বলে ঘন-ঘন ধোঁয়া টানতে লাগলো মাধব দস্ত।

বললে—তোমরা সব এক-একটা আহাম্মক, কেউ পবের দুঃখ-কষ্ট বুঝবে না। যেন

নিজে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতে পাবলেই হলো। আরে আহাম্মক, বনের বাঘ-সিংহও তো নিজের খাবাটা জোগাড় করতে পারে, তাতে আর তোমার বাহাদুরিটা কী?

এব পর আর কারো কথা বলবার কিছু থাকে না।

হঠাৎ খানিকক্ষণ পরে মাধব দস্ত বলে ওঠে—তা হলে কি চুপ করে থাকলেই তোমাদের চলবে? চুপ করে থাকলেই অনাথা বিধবা মেয়েটার সুদায়া হবে?

নন্দকিশোর বলে—আজ্ঞে, আপনার কণ্ঠের কথা ভেবেই চুপ করে আছি—

মাধব দস্ত রেগে যায়।

বলে—তা এই তোমাদের বৃশ্চি? আমার কণ্ঠটাই বড় হলো? আর সেই যে বৃশ্চিই অনাথা বিধবা নিরাশ্রয় হলো, একটা লোক নেই তাকে দেখবার, তার কণ্ঠটা বুঝি কিছু নয়? তোমরা গরু, না ভেড়া? তোমাদের ঘটে একটা বৃশ্চি নেই কেন?

তারপর একটু থেমে ডাকে—আদালত, ও আদালত—

আদালত সামনে এসে ফুর্গিল করে দাঁড়ায়।

মাধব দস্ত বলে—চল, তৈরি হ, এই সব আহাম্মকদের জ্বালায় আশ্বিন—

আদালতের এসব জানা আছে। এরকম আশ্বিন হওয়ার ঘটনা রোজই ঘটে। আব আদালতের তৈরি হওয়া মানে হুসেন মিয়া আর রহিমের তৈরি হওয়া। অন্দর-মহলের ঠাকুর-কবি তৈরি হওয়া। লুচি ভাজা আবশ্য হইবে বাবে রামাবাড়িতে, আলুর দম হবে, বেগুন ভাজা হবে। তাবপর ডিম-মাংস মাছ তো আছেই। আর তারপর আছে সোডার বোতল আর.....

—চাটুজ্জ!

—আজ্ঞে স্যার।

—সে তো, আদালত ওগুলো নিতে জেসেই প্ত!

চাটুজ্জ দেখাব আগের আদালত তার ব্যবস্থা করে ফেলে। দেউড়িতে গাড়ি জোড়া হয়, ঘোড়ার পিঠে লাগাম চড়ে। গাড়ি ছাড়ে খাবারের চ্যাঙারি ওঠে। আর আসল মাল থাকে আদালতের জিম্মায়। বোতল-টোতল নিয়ে সে তৈরি।

তখন মাধব দস্ত সাজ-গোজ করে বেরোবে। গায়ে মলমলের ফিল্মফিশন পাজারি, গিলেকরা হাতা। গলায় সোনার মক্চেন আর বুকপকেটে ঘড়ি-ঘড়ির চেন। গায়ে বো-আটা পম্প-শু অয়ে হাতে কুকুর-গুথো পাকানো ছড়ি।

গাড়ির দবজা খুলে দাঁড়াবে রহিম বক্স। মাধব দস্ত ওঠবার সময়ে পাশে কোচানো-খুতির কোঁচা আটকে যায় তাই নন্দকিশোর সেটা ধরে সঙ্গে সঙ্গে চলবে। আগে উঠবে মাধব দস্ত, তারপর নন্দকিশোর, তারপর চাটুজ্জ।

মাধব দস্ত অনর্গত না দিলে গাড়ি ছাড়তে পারে না কচোয়ান হুসেন মিয়া।

সে তখনও লাগাম ধরে তৈরি হবে আছে।

মাধব দস্ত গাড়িতে উঠে বৃৎ করে বলে বলবে—কী, সবাই উঠেছে তো ঠিক?

—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

—চাটুজ্জ, তুমি উঠেছ? আর নন্দকিশোর!

নন্দকিশোর বলবে—হ্যাঁ, এই তো আমি উঠেছি স্যার—

—ঠিক আছে। আর সীতানাথ? সীতানাথ কই? সীতানাথ আর্সেন?

চাটুজ্জ বললে—আজ্ঞে, সীতানাথের শরীরটা একটু গ্যাজ-গ্যাজ কবছে—

মাধব দস্ত হো-হো করে হেসে একেবারে গাড়ি পড়লো।

বললে—সীতানাথকে আর মানুষ কবতে পাবলাম না চাটুজ্জ, চিবকলই অমানুষ করে গেল হে—

চাটুজ্জ বললে—আজ্ঞে, যা বলেছেন—মাধব দস্ত বললে—বড় বেরসিক হয়ে যাচ্ছে দিন-দিন—

নন্দকিশোর বললে—শুধু বেরসিক নয় স্যার, একেবারে হাংস বলে বেরসিকের বেহুন্দ—

—চলো চলো, আদালত হুসেন মিয়াকে গাড়ি ছাড়তে বল—

হুকুম পাবার সঙ্গে সঙ্গে হুসেন মিয়া চাবুক ঘোবালো আর মাধব দস্ত গাড়ি ফতেপুত্র স্ট্রীট পেরিয়ে বড় রাস্তার গিরে মিশে গেল।

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

হে নিকরপদ্মা

২.০০

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

সিংহ সেনাপতি

৪.০০

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

গোড়াঘাট ডাঙাঘর

৪.০০

মহাশেখতা ভট্টাচার্য

সোনা নর রূপা নর

২.৫০

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

বিন্দু বিন্দু

২.৫০

আর, এন, চ্যাটার্জী এন্ড কোং

কলিকাতা—১২

এও আমি লিখেছি সেই গল্প। তখনকার আমলে মাধব দত্ত আর পাঁচটা বড়লোকের মত জীবন-যাপন করতো, এইটাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। অনর্জিত অর্থের অপচয়ের আনন্দে তখনকার সম্প্রতিসম্পন্ন মানবদের এই-ই ছিল দৈনন্দিন রুটিন।

কিন্তু এ-গল্প যে কখনও কারো জীবনের সত্য-ঘটনা হয়ে উঠবে তা তখন ভাবতে পারিনি। ভেবেছিলাম সমাজ-বিবর্তনের চেহারাটা দেখিয়ে আজকালকার সমাজের মানবদের একটু সচেতন করব দেব।

নীতা বললেন—আপনি তো ওদিকে যান মাঝে মাঝে?

বুঝতে পারলাম না। বললাম—কোন দিকে?

—ওই আমাদের ফুডপুকুর স্ট্রীটের দিকে?

বললাম—এখন আর যাওয়ার দরকার হয় না ওদিকে। আগে যেতাম। বিদ্যাসাগর কলেজে পড়বার সময় ওই পাড়ায় অনেক বন্ধু-বান্ধব ছিল, ওই লাহা-বাড়ি, মল্লিক-বাড়ি, দত্ত-বাড়ি, শীল-বাড়ির ছেলেদের সঙ্গে তাদের বাড়িতে যেতাম, আর নানা রকম কাহিনী শুনতাম।

নীতা বললে—মা বলছে, যদি আপনাব সময় হয় তো বৌদিন ইচ্ছে যাবেন—

জিজ্ঞেস করলাম—তোমার মা কি ওই বাড়িই মেয়ে?

নীতা বললে—হ্যাঁ—

তাবপর একটু থেমে বললে—সেকালের অনেক গল্প মার কাছে শুনছি। মার অনেক বয়েস হয়েছে তো, কেবল আমাদের সেকালের কথা শোনাতে চায়। আমরা শুনতে চাই না বলে মার মন-খাপ হলে যায়—

নীতা যা-ই বলুক, আসলে আমার গল্পটা ছিল ওই মাধব দত্তর বাড়ির সীতানাথকে নিয়ে। সীতানাথবাবু।

চাটুজ্ঞে মাঝে-মাঝে সীতানাথের কাছে যেত। অস্তাবল-বাড়ির ছোট ঘরখানার মধ্যে গিয়ে ডাকতো। বলতো—ও সীতানাথ, সীতানাথ—

সীতানাথ তখন ভক্তপোষটাব ওপরে একটা আধ-ময়লা গামছা পরে হাত শুঁয়ে আছেন।

উঠে পড়তো—কী চাটুজ্ঞে? কী খবর?

—তুমি যাবে না?

—কোথায়?

—আরে, আজ কে খড়ম য়াচ্ছ আমবা।

—খড়ম কোথায়?

—আরে, খড়ম গোসাইপাড়ায়। একটা ভাল খবর আছে। খুব ভাল জিনিস, মানে বাকি বলে জবাবদস্ত।

সীতানাথ বলতো—তোমরা যাও ভাই, আমি যেতে পারবো না, শরীফটার ভেমন ঘর নেই।

—আবে তুমি দেখছি যৌবনে বড়ো হয়ে যাচ্ছে। এই ভাবা-যৌবনেই এমন বড়িয়ে গেলে হে। চল্লিশ পেরোলো তখন কী করবে?

—আর ভাই আমাদের কথা ছেড়ে দাও।

—কিন্তু কত! তোমার কথা বলছিল।

বলছিল সীতানাথটা দিন-দিন বড় বেবসিক হয়ে যাচ্ছে। একেবারে থাকে বলে বেরসিকের বৈশিষ্ট্য আছে। ভগবান বাত তৈরি করেছিল ফর্টিফ করাব জন্যে, আর তুমি কিনা সেই ভগবানের দেওয়া বাতগুলো এই ঘুপাচি-ঘরে ঘুমিয়ে কাবার করে দিলে—

দুঃখ করতো সীতানাথ।

বলতো—আমাব কথা আর বোল না ভাই, আমি একেবারে মানবের বার হয়ে গেছি—

এরপর আব সময় নষ্ট করতো না চাটুজ্ঞে। সীতানাথের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলাটাও সময় নষ্ট করা মনে হতো চাটুজ্ঞের।

অথচ এমন ছিল না আগে। সে বহুদিন আগেকার কথা। তখন ওই হাতী-বাগানের মোড়ে ফোটোগ্রাফিক দোকান করেছিল সীতানাথ। জোখান কবেস তখন। সুন্দর লাল টুকটুক ছেলোটা। ক্যামেরা নিয়ে নাড়াচাড়া করতো ছোটবেলা থেকে। ক্যামেরা দামী জিনিস। কেউ সহজে হাত দিতে দিত না। কিন্তু কারো কাছে ক্যামেরার সম্মান পেলেই নেড়েফড়ে দেখতো। ছবি তোলায় সময় পেছন-পেছন ঘুরতো।

তারপর কাকা একদিন একটা দোকান করে বিল।

সেই সময়েই এই মাধব দত্তর সঙ্গে পরিচয়।

মাধব দত্ত একদিন বললে—ওহে চাটুজ্ঞে, ভালো ছবি তুলতে পারে এমন কেউ আছে?

নন্দকিশোর বললে—আছে স্যার, ডেকে আনবো?

—ডাকো তো এববার, দেখি কেমন ছবি তুলতে পারে।

তা তখন ছবি তোলায় বেশ নাম হয়েছে সীতানাথের। তখন পদীর যুগ। মেয়েবা বাস্তবায় বেরোয় না। বাস্তব যদিই বা বেবোষ তো গাড়িতে করে।

তাও আবার ঘোড়ার-গাড়ির জানালা-খড়খড় সব বন্ধ করে। রাস্তায় যদি কেউ মেয়েমানুষ দেখতে পেলে তো হুঁড়ু পেরে পড়লো তার ওপর। থিয়েটারে মেয়েদের মোতলার ওপর বসবার ব্যবস্থা। যাত্রার আসরে মেয়েদের দিকটা চিক দিবে ঢাকা।

কিন্তু ফোটোগ্রাফারের কাছে লজ্জার বালাই থাকলে চলবে না।

সুন্দরী-সুন্দরী গেরস্তখরের বাবুবা বাড়িতে ডেকে পাঠাতো সীতানাথকে। তাদের বাড়ির মেয়েদের ছবি তুলতে হবে। একেবারে বাড়ির অন্দরমহলের ভেতরে গিয়ে ঢুকতে হতো। যে-বাড়িতে পুরুষ-মহিলা পর্দা ভেতরে ঢোকা নিষেধ, সেখানেও সীতানাথের অবাধ গতি।

একেবারে মেয়েদের কল্যাণার্থে মদ্যো-মদ্যি ছেঁষাখি।

সুন্দরী সুন্দরী বউ সব। বলতে গেলে সুবুও কখনও তাদের মদ্য দেখতে পারিনি। সেইসব মেয়ে-বউদের কাছাকাছি মদ্যোমদ্যি ছেঁষাখি হওয়া।

সীতানাথ বলতে—ফর্টিফ যা করবার তা তখন সব করে নিচ্ছি ভাই—

চাটুজ্ঞে নন্দকিশোর জিজ্ঞেস করতো—কী বকম? কী বকম?

সীতানাথ বলতো—কবো গালে হাত দিতে ইচ্ছে হলে গালটা ধরে বাঁদিকে সারিয়ে দিয়ে বলডুম—একটু বাঁদিকে মুখটা ফেরান—আর একটু, আর একটু বাঁদিকে—

সীতানাথ আবার বলতো—ওসব তোমরা দেখে ভাই, আমাব ওসব পর্ব শেষ—

তা যখন সীতানাথের বেশ নাম হয়েছে চারদিকে তখন একদিন চাটুজ্ঞে আব নন্দকিশোর গিয়ে হাজির হলো সীতানাথের দোকানে।

চাটুজ্ঞে বললে—ছবি তুলতে পারবেন আপনি?

—কার ছবি?

নন্দকিশোর বললে—আমাদের কতাব ইচ্ছে যে তার মেয়েমানুষদের ছবি তুলে রাখা—

—মেয়েমানুষদের? তাব মানে?

—বলি, মাধব দত্তর নাম শুনছেন?

ফুডপুকুরের বিখ্যাত দস্তবংশের মাধব দত্ত?

সীতানাথ বললে—খুব নাম শুনছি—

—আজ্ঞে তাইই মেয়েমানুষদের।

—কোথায় গিয়ে ছবি তুলতে হবে?

চাটুজ্ঞে বললে—তা কি ঠিক তগছে হশাই? আজ হযত খড়ম যেতে হলো, কাল হযত আবার চন্দননগরে। কিনা আজ গেলেন চন্দননগরে, কাল হযত কলুটোলায়। কোনও ঠিকঠাক নেই। কতাব মেজাজের যেমন কোন ঠিক নেই, তেমন কতাব মেয়েমানুষেরও কোন ঠিক নেই। মেজাজ বুঝে কাজ করতে পারবেন?

সীতানাথ বললে—তা পারবো না কেন? টাকা দিলে সবই পারবো। আমার তো এই-ই কাজ—

—এক-একদিন বাড়িরে কিন্তু বাড়ি ফিরতে পারবেন না। চাই কি পব পর সাতদিন সান্তরাত মদ্যহেশে মেলায় বজরায় কাটিয়ে দিলেন।

সীতানাথ বললে—এ আব নতুন কথা কী! এ তো কলকাতার হামেশাই কথা। টাকা দিলে করতে কী?

চাটুজ্ঞে বললে—আবে, এখানে মদ্য টাকা নষ, এখানে টাকার সঙ্গে পেসাদও পাবেন—

—পেসাদ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, পুজোর যেমন পেসাদ থাকে, পেসাদ না হলে তো পুজো হয় না, তেমন মাইফেলেরও আবার পেসাদ আছে। পুজোটা তো ফাউ, পেসাদটা হলো আসল—ইপিগটা বুঝলো সীতানাথ।

তখন বয়েস কম। প্রসাদের লোড তখন কম নয়।

বললে—চলুন—

এ-সব সেই আনিকালের কথা। সেইখান থেকেই এই গল্পের শুরুর কাহিনী। সেই-ই প্রথম সীতানাথ এসেছিল এ-বাড়িতে

এই ফড়িপুত্রের স্ট্রীটে। তখন থেকেই সেই গল্প আরম্ভ হয়েছিল।

কিন্তু এতদিন পাবে সে-গল্প কেউ মনে রেখেছে, তা বল্পনা করতে পারিনি। বলতে গেলে আমার নিজেরও গল্পটা স্পষ্ট মনে নেই।

সেদিন আবার ওই পাড়ার দিকে গিয়েছিলাম। শ্যামবাজারের দিকের পাড়াগুলোব একটা মেজাজ আছে। সে-মেজাজ দক্ষিণ-কলকাতায় নেই। এদিকে কেমন যেন সব কিছু ছাড়া-ছাড়া। কারোর সঙ্গে কারোব মেলামেশা নেই। আবার ওদিকটার সবকিছু ঘেঁষাঘেঁষি, সবকিছু মাথামাথি।

ওই মাথামাথি ভবনহাওয়াটা আমার বরবর ভাল লাগে।

ঠিক সময়ে ঠিক দরজার গিঁথে কড়া নাড়লাম। কে একজন দবজা খুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করল—কাকে চাই?

বললাম—নীতা আছে?

ভেতর থেকে একজন মহিলার গলাব আওয়াজ পেলাম—কে রে ভূতো?

আমি আমার নিজের পরিচয় দিলাম। পাকিস্তানিটেই এক বৃদ্ধা মহিলা খপাস-খপাস করতে করতে এসে এগিয়ে এলেন।

বললেন—আসুন, আসুন, নীতা কোন স্টুডিওতে গেছে, এখান আসবে, ও ভবনের কথা বলছিল। বলছিল আপনি একদিন আসবেন বলেছেন.....

বললাম—এদিকে এসেছিলাম, তাই মনে পড়লো আপনার কথা—

ভদ্রমহিলা সঙ্গ সঙ্গ ভেতরে গিয়ে একটা ঘরে বললাম। মাথব দস্তব, বাড়িতে বৈশ্বকর্মে ছবি টাঙানো থাকে, সেই বস্ত্রের ছবিই সব টাঙানো রয়েছে দেয়ালে। নিচু নিচু চেয়ার। যেসব ছবি এদিকে-ওদিকে ছোট ছোট ফ্রেমে বাঁধানো রয়েছে তা সবই নীতার। নীতা রায়েল। নীতা যেসব থিয়েটারে, সিনেমায় যেসব ভূমিকায় নেমেছে, তারই সব স্যাম্পল।

ভদ্রমহিলা বললেন—নীতা তো সেই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত স্টুডিও-স্টুডিও ঘরে বেড়ায়। ওসব অভিনয় করে কী যে হবে, বুঝতে পারি না। ওকে কত করে বলি বিয়ে করে ঘব-সংসার করতে, তা রাজি হয় না—

বললাম—আজকাল তো অনেকেই দেখছি বিয়ে করে না—

ভদ্রমহিলা বললেন—কোনটা ভালো, আর কোনটা মন্দ তাও বুঝতে পারি না—সেকালও দেখলাম, আবার একালও দেখছি, কোনও ডফাৎ খুঁজে পাচ্ছি না, মনে হয় যেন সেই সেক লই রয়েছে, কোনও কিছু বদলায়নি। আপনি তো আপনার গল্পে সবই লিখে গেছেন—

বললাম—আমি যা কিছু লিখেছি সবই কিন্তু কল্পনা করে করে—

ভদ্রমহিলা বললেন—কিন্তু আমি আপনাকে বলছি আপনি যা লিখেছেন সবই সত্য—

—সব সত্য?

ভদ্রমহিলা বললেন—হ্যাঁ সব সত্য, ওই মাথব দস্তব সত্য, ওই চার্টার্ড নন্দকেশোর, ওরাও সত্য, ওই হরনাথ এ্যাটর্নী'ও খাটি সত্য আর মাথব দস্ত ঠিক ওমনি করেই প্রতি রাতে ফুটি করতে বেরোতেন, আর বাড়িতে তাঁব স্থায়ী শোবার ঘরে একলা-একলা রাত কাটাতে—কোনদিন ঘুম আসতো না—

আমি বললাম—কিন্তু বিশ্বাস করুন, ও সবই আমার কল্পনা—

—তা হবে, হয়ত, আপনার কল্পনাই হবে। কিন্তু আশ্চর্যকরভাবে মিলে গেছে আমার দেশ জীবনের সঙ্গে। শূন্য নাম-গুজো আপনি বললে দিয়েছেন।

আমি সত্যিই তব্বাক হয়ে গেলাম।

ভদ্রমহিলা বললেন—এ বাড়িটা সেই মাথব দস্তবই—এই সেই নাচ-দরবার। এখন এ ঘরটাকে দেয়াল দিয়ে ছোট ছোট টুকরো কবতে হয়েছে। অর্ধেকের বেশি বিক্রী কবতে দিয়েছি—

আমি অবাক হয়ে চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম।

তিনি বলতে লাগলেন—এবই উত্তরে সেই বাগানটি ছিল। আর এর উত্তর-পশ্চিম কোণে ছিল সেই ভক্তাবল-বাড়িটা, সেখানেই একটা ঝুপাড়ি ঘবে থাকতো আমার মামা, থাকে আপনি নাম দিয়েছেন—

আপনার মামা? তার মানে সীতানাথ-বাবুর বোনব মেয়ে? কিন্তু তার বোনের কথা তো আমি কিছু লিখিনি?

—আপনি লেখেন নি, কিন্তু তাঁব বোন ছিল একজন! আমি তাই মেয়ে!

কী বিচিত্র ব্যাপার সব জীবনে ঘটে! আমি এতদিন সংসারে বেঁচে থেকে এ বৈচিত্র্যব কোন কুল-কিনারা আজ পর্যন্ত করতে পারিনি।

বললাম—এরকম ঘটনা আমার জীবনে আর একবার ঘটেছিল—

ভদ্রমহিলা বললেন—কী রকম?

বললাম—জানেন, অনেক দিন আগে 'সাহেব বিবি ফেলাম' বলে একটা উপন্যাস লিখেছিলাম। সেটা বাঙলা সিনেমা হয়েছিল। হিন্দী সিনেমাও হয়েছিল। হিন্দী-সিনেমা-ওয়ালাব; কলকাতায় এসে উত্তরপাড়ার জমিদারবাড়ির ভেতরে ছবি তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু তাঁবা ছবি তুলতে দেন নি।

—কেন?

—তাঁরা বললেন—ও গল্প আমাদের পরিবারকে নিয়ে লেখা, আমাদের বাড়ির ভেতরে ও-ছবি তুলতে দেব না—

ভদ্রমহিলা বললেন—সে তো আমারও জানি। আমরা বনমালী সরকার লেন খুঁজতে গিয়েছিলাম বোবাজ বে, ভেবেছিলাম 'বড়বাড়িটার চেহারা দেখতে পাবো—' কিন্তু এ তা নয়, এ একেবারে সত্য—ওই সীতানাথবাবুকে সত্যি সত্যি আপনার মাথব দস্ত খুন করেছিলেন—

বললাম—সত্যিই আজব ঘটনা। তাহলে অলৌকিক ঘটনা এখনও ঘটে দেখছি—

* সদ্য প্রকাশিত কয়েকটি শেরা বই *

অজিত গাঙ্গুলীর

প্রতিদান ৪.০০

মুখুজো পরিবার ও উত্তরপাড়ার উপ-ন্যাসের স্রষ্টা অজিত গাঙ্গুলীর আব একটি অবনয় সাহিত্যসৃষ্টি। দ্রুত সিনেমায় আসছে। আজই পড়ুন।

সুয়েজ পেরিয়ে (২য় খণ্ড) ॥ সুজাতা

অপরূপ রমা কাহিনী । ৫.০০

দারোগার জবানবন্দী ॥ চিরঞ্জীব সেন

এক নিম্নবাসে পড়বার মত রহস্য কাহিনী । ৪.৫০

মানুষ যখন পশু হয় ॥ বীর চট্টোপাধ্যায়

রোমাঞ্চিত চিত্রে পড়তে ইঁবে শেষ না হওয়া পর্যন্ত । ৪.৫০

মারলিন পার্কের রাত্রি ॥ দেবদূত

অকিমবণীয় প্রেম কাহিনী । ৩.৫০

সন্তোষকুমার অধিকারীর

জগদীশচন্দ্র মজুমদার

রক্ত কমল ২-৫০

উত্তর মৌসুমী ৩-৫০

সুধাংশুদেব বোমের

রামায়ণী প্রেমকথা ৫.০০

অগ্নিগন্ধা ১০.০০

প্রথম মুদ্রণ নিঃশেষিত প্রায়। আর কয়েকটি কপি আছে মাত্র।

প্রফুল্ল গ্রন্থাগার : ৫১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি-৯

শেষটা অলৌকিকই চটে!

এমন অলৌকিক ব্যাপার ঘটেছে তা নে-ই বা! কল্পনা করতে পেরেছিলাম? মাধব দহণ ব্যাপনা করতে পারেনি, সীতানাথবাবুও ব্যাপনা করতে পারেনি।

আব মাধব দত্তব ছেলে?

যতদূর মনে পড়ে তার নাম দিয়েছিলাম বন্দাবন। বন্দাবন দত্ত।

সেই ছেলেই শেষকালে কিনা..

বিশ্বতু সে-সব কথা পরে বলবো।

সীতানাথবাবু প্রথম বন্ধন এ বাড়িতে এলো, ফুটফুটে চেহারা। বাবার চুল, ফিরিয়ে আনিব গিলেকরা পাঞ্জাবি। লম্বাটা জুতো। চেহারা দেখেই মাধব দত্ত মজুর করে ফেললো।

বললে—কী রকম ছবি তোলা, স্যাম্পল আছে কিছ?

স্যাম্পল দেখালে সীতানাথ। মাধব দত্তব গাছের হাথে গেল।

বললে—আজ আমাদের সঙ্গে খড়দহ যেতে পারবে? সেখানে গিয়েই ছবি তুলতে হবে—

—পারবো না কেন? আমার তে তাই-ই পেশা।

তা সেই-ই হলো সূত্রপাত। দলের সঙ্গে সীতানাথ চললো খড়দহ। সেখানে গোসাই পণ্ডিত গির্ষে রাত কাবার হয়ে গেল বাবুব সংগে। খানাপিনা হলো, নাচ হলো, গান হলো। তারপর পরের দিন ফিরে এলো দলের সঙ্গে এককাতা। আর সেই বৈশাখ এসে জুটলো, আর তখন থেকে তার মধ্যে যাবত কথা মনে উঠলো না। সীতানাথও দ্বন্দ্ব গেল চাটুজ্ঞদেব সংগে।

প্রথম-প্রথম দোকানটা চালিয়েছিল সীতানাথ। কখনওরকমভাবে চালানো। সে প্রায় না-চালানোরই মত।

কোনওদিন দোকান খোলে, কোনওদিন খোলে না। খন্দের দোকানে এসে ফিরে যায়। কাজ দিলে সময়মত ছবি পাওয়া যায় না। কাকা ছিল মাধব ওপরে।

একদিন কাকা বেদম বকুনি দিলে।

বললে—টাকা দিয়ে দোকান ক'বার দিয়েছি তোমার ফুর্তি-মারাব জন্যে?

বাস্, সেই-ই শেষ।

মাধব দত্ত বললে—কুছ পরোয়া নেই, আমার এখানে থাকো। আমার এখানে থাকবে খবর আর ফুর্তি করবে। ফুর্তি করলে এখানে কেউ বেজার হবে না। দম গেলে কেবল ছবি তুলে যও—

এ-সব সেই চাঁদ-পাশা বছর আগেকার কথা। সেই তখন থেকেই সূত্র হইয়াছিল মাধব দত্তর নৈশ-বিবাহ। সেই নৈশ-বিবাহের সূত্র থেকেই বলতে গেলে জুটে গিয়েছিল সীতানাথ।

সেই সময়ে হঠাৎ একটা কাণ্ড হলো:

সেদিন মাধব দত্ত সদলবলে নৈহাটিতে যাচ্ছে। মাধব দত্তর অস্টম-পক্ষের মেয়েমানুষ তখন নৈহাটিতে সংসার পেতেছে।

মাধব দত্তর হঠাৎ খেয়াল হলো যে রাতটা নৈহাটিতে তার অস্টম-পক্ষের

সংসারে গিয়েই রাত কাটানো। ভোজ্যছোড়া সূত্র হইয়া গেল। আদালত আলি ভেতবে খবর পাঠিয়ে দিলে। লুচিভাজা, মাংস, আলুর দম, সোডার বোতল আর লালপানি হাথে সংগে। প্রতিদিনের নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম হলো না।

গাড়িতে উঠে মাধব দত্ত গড়গড়ান নলটা মধু দিলে।

বললে—সব উঠেছে তো?

চাটুজ্ঞ বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যাব, সব উঠেছে—

নন্দাক্ষর, তুমি উঠেছ?

নন্দাক্ষর বললে—হ্যাঁ, এই তো উঠেছি স্যার—

—বোতলগুলো উঠেছে?

আদালত আলি ওপর থেকে বললে—জী হ্যাঁ—

—আর সীতানাথ?

চাটুজ্ঞ বললে—সীতানাথ এলো না স্যার, সীতানাথের শরীরাটা ম্যাক্সিমাক্স কবছে, সে শব্দে আছে—

মাধব দত্ত বললে—সীতানাথটা দিন-দিন একেবারে বেরসিক হয়ে পড়েছে—

নন্দাক্ষর বললে—হ্যাঁ স্যার, একেবারে যাক বলে বেরসিক, একেবারে বেরসিকের বেহুন্দ—

মাধব দত্ত বললে—ঠিক আছে, আদালত, এবার হুসেন মিরাকে গাড়ি ছাড়তে বল—

সেদিন সীতানাথ কুপাড়ির মধ্যে একা একা শুয়েছিল?

হঠাৎ মনে হলো কে যেন দরজার টোকা দিলে। এত বাজে কে টোকা দেয় দরজার? শূন্যে শূন্যেই সীতানাথ বললে—কে?

ধোনও উত্তর নেই।

সীতানাথ অব্যবহিত একবার জিজ্ঞেস কবলে—কে? কে গো তুমি? কে দরজার টোকা দিলে?

কেউই না। কেউই সাড়া দিলে না। সীতানাথ একবার উঠলো দরজাটা খুলে বাইরে গিয়ে দাডাল। আস্তাবল-বাড়িটা ফাঁকা। বাইরে বাগানের করবী-গাছটার পাতার চাঁদের আলো এসে পড়েছে।

সীতানাথ আশে-পাশে চারিদিকে চেয়ে দেখলে। সমস্ত বাঘমহলটা খাঁ খাঁ কবছে। বেউ কোথাও নেই।

অনেকক্ষণ সেই অবস্থায় সেখানে দাঁড়িয়ে বইল সীতানাথ।

তারপর আবার নিজের ঘরের তত্ত্ব পেরে ওপর উঠে শূন্যে পড়লো।

মনের ভুল। হয়ত মনের ভুল। তাকে কে ডাকতে যাবে। কব এমন মাথা-ব্যথা পড়েছে। ত কে মনে করে কেউ ডাকবে এমন কেউ নেই তার। একটা মাত্র বোন আছে বরানগরে। তারও বিয়ে হয়ে গেছে। আব তা ছাড়া তারা তে পঙ্গল নশ। পাগল ছাড়া এত ব্যস্তের বে আব তার দরজায় টোকা দেবে।

পরদিন সকাল-বেলা সীতানাথ ঘুম থেকে বের হইয়া বিছানা ছেড়ে উঠলো।

কলের কাছে চান করতে গিয়ে সরলার সঙ্গে দেখা। সরলা বাল্যেই গিরে বধবারিড়র দিকে আসছিল।

সীতানাথবাবু ড কলে—সরলা, ওগো ও সরলা শুনছো—

সরলা সীতানাথবাবুকে দেখে ঘোমটা দিয়ে সবে গেল।

—বালি ও সরলা শুনতে পাচ্ছে?

সীতানাথবাবু তখন গামছা পরেছে, গায়ে তেল মেখেছে। চান করতে যাচ্ছে। বললে—হ্যাঁ গা সরলা, কাল রাত্তিরে তুমি আমার ঘরে টোকা মেরেছিলে নাকি গা? সরলা থমকে দাঁড়ালো।

—আমি? আমি তোমার ঘরে টোকা দিয়েছি? তুমি কী বলছো গো? আমি কখন টোকা মারতে গেলুম?

সরলা অদরমহলেব অনেককালের খস-খস। জন্দব-মহলেব কাজকর্মই করে। কচিং-কদাচিং বারবাড়িতে আসে।

সীতানাথবাবু কথায় অবাক হয়ে গেল। বললে—কখন শুন? কখন?

সীতানাথবাবু বললে—এই কাল রাত্তিরে হঠাৎবাঁবে বৈশিষ্য বাবার পর বনমালী আমার ভেতবে খেতে ডাকতে এল। আমি রান্না-বাড়ির দাওবার বসে থেকে নিজে বাইরে চলে-এলুম। তারপর পেটটা খুব ভরে গিয়েছিল, তাই শুলুম আর ঘুমিয়ে পড়লুম—তখন আমার মনে হলো কে যেন আমার দরজার টোকা মারলো—

সরলা বললে—না বাবু, আমার অমন ভীমরাত্তি শুনিনি যে জন্দবলোকের ঘরের দরজার আমি টোকা মেরে খুম ভাঙবো—আমাব অমন স্বভাব-চরিত্রের নয়—

সীতানাথবাবু বললে—না, আমিও তাই ভাবছিলাম যে সরলা তো ভালমানুষের মেয়ে, সরলাকে তো আমি চিনি, সরলা তো এমন নয়—

—তাহলে হবত সৈরভী-মাসীর কাণ্ড।

—তাই নাকি? তা হতে পারে।

তাহলে তুমি নও, ওই সৌভদীরই কাণ্ড—সেদিন ওই পরবর্ত্তই। সরলা ভালো-মানুষের মত নিজের কাজে চলে গেল।

মাধব দত্তর অদরমহলে একটা ঝি নয়, ফিরেব যেন গোলা বসে গেছে। বহুকাল থেকে বহু বৃগ থেকে পূর্ব-পূর্বের আমলেব সব ফি-রা কাজ করে আসছে এ-বাড়িতে। একবার যে আসে সে আব বেরোর না। একবার এ-বাড়িতে এলে সে থেকেই যায়। তারপর তার নিজের আত্মীয়-স্বজন থেকে সূত্র করে দেশের লোক পাড়া-পড়শী সবাইকে এনে টোকায়। বন্ধন তারদের ঝগড়া বাধে তখন সে দেখবাব মত।

বনমালী এসে ডাকতো সীতানাথবাবুকে।

বলতো—চলুন বাবু, খাবার দেওয়া হয়েছে—

আগে বেশ সময় মত এসে খেতে ডাকতো বনমালী। আগে চাকর-খ-দেবারান বেশ খাতিরও করতো। সীতানাথবাবু চান-টান করে ঠোঁট হাথার সংগে সংগেই খেতে ডাকতে আসতো। বাড়ির ভেতবে

গেলো কি-কিউড়িও গলাব সুর নানতো।
দোটেমট একটু; সমীহ করতো।

কিন্তু অনেকদিন থাকলে বা-হর, শেষে
আর কেউ মানতে চাইতো না। সীতানাথ-
বাবু আন্তাবস-বাড়িতে তৈরি হয়ে বসে
বসে শেষকালে হাই তুলতে আকন্ড করতো।
হুসেন মিয়া আর বাহিম বক্স তখন
রাস্তাবাঘা সেয়ে খেয়ে নিলেছে।

সীতানাথবাবু সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে।
বলতো—কি গো হোসেন, তোমাদের
খাওয়া-দাওয়া সুরা?

হোসেন মিয়া বলতো—হ্যাঁ বাবু, খাওয়া
হয়েছে। আপনার?

—আমার কথা আর বোল না মিহা-
সহেব। আমাকে এখনও খেতে ডাকলে না।
বনমালী কান্টা একবার দেখ দিকিনি।
বুড়োমান্দু হকৌছি, কিধ পার না? তোমরাই
কলো না, কিধে পার না?

হুসেন মিয়া বলে—তাঁ তো পাবেই,
কিধে তো পাবেই!

—তবেই বোঝ, তোমরা বেশ আবারে
আছো মিয়া সহহেব। তোমরা নিজের হাতে
রাখা করছো, আর খেয়ে-দেবে খুশোছ!
আর এ যে কী বাড়ি হয়েছে, এদের কারো
একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই। আমার পেট চোঁ
চোঁ করছে, কিধের জ্বালায়, অথচ এদের
কারো সোদিকে হুঁশ নেই—

হুসেন মিয়া বাহিম বক্স, তাঁ কি
বলবে? তারা চুপ করে থাকে। তারা তো
এই সীতানাথবাবুর এককালের খাতিব
দেখেছে। তারা তো দেখেছে বাড়ির কি-
চাকর থেকে সরু করে কতাবাবু পর্যন্ত
কি জোরফ করছে এই সীতানাথবাবুকে।

তখনকার কথা আলাদা! বলতে গেলে
সে একটা বৃণ গেছে সীতানাথবাবুর।
সোদিন হঠাৎ সৌরভী এল।

বললে—হ্যাঁ বাবু, আপনি আমার নামে
কি বলেছেন শুননি? আমি আপনার দরজার
খাতিব বেলার গিয়ে টোকা দিবেছি?

—সে কি কথা?

সীতানাথবাবু চমকে উঠলো। যেন
জগৎকরে এমন কথা বলতে পাবে না সীতা-
নাথবাবু এমনি মূখের ভাব।

বললে—তোমার নামে আমি বলেছি:
হি হি, এমন কথা কি আমি কখনও বলতে
পারি সৌরভী? তুমি কত ভালো মেয়ে
তা আমি জানি নে? কে বললে শুননি:
কোন হারামজাদী বললে এ-কথা? সিন্দু-
বালা বুঝি?

—সিন্দুবলা কেন হবে? ওই সরল
হারামজাদী। সরলা হারামজাদী ডে.
আমার ভালো দেখতে পারে না, আমার নামে
গিয়ে লাগিয়েছে বউরাণীর কাছে।

—বউরাণী?

বউরাণীর কথা শুনই সীতানাথবাবু
একটু আড়ষ্ট হয়ে উঠলো।

বললে—বউরাণী শুন কি বললেন?

সৌরভী বললে—বউরাণী? বউরাণী
তোমার কান-পাতলা মানুষ নয় গো যে যে-সে
বলে তাই শুনবে।

সীতানাথবাবু মূখে হাসি বেবোল।

জিজ্ঞেস করলে—বউরাণী বুঝি খুব
ভালো-মানুষ গো সৌরভী?

—খুব ভালো মানুষ গো বাবু, খুব
ভালো-মানুষ। বউরাণীর মত অত ভালো-
মানুষ হয় না।

সীতানাথবাবু বললে—তাহা, তোমার
বউরাণীর বড় কম্? না গো সৌরভী?

সৌরভী বললে—কেন, কম্? কিসের গা?
কম্? কেন হতে পারে?

সীতানাথবাবু বললে—কতাবাবু তো
বাড়িতে শোয় না, তাই বলছি—

—তা নাই বা শুলো, বউরাণী গা-ভবা
কত গরনা তা তো জানেন না। অত সোনা-
দানা পেলে সোয়ামীর দুঃখও ভোলা বাব!

সীতানাথবাবু বললে—তা হাজার গরনা
থাক, তবু তো বাছা মেয়েমানুষের মন বলে
কথা। মেয়েমানুষের মন কি গরনা পেলে
ভবে গো?

সৌরভী বলে—খুব ভরে গো, খুব
ভবে। গরনা হেন জিনিস, বে পেলেছে সেই
বোঝে ও আপনি বোঝেন না—

বলে হাসতে হাসতে সৌরভী অন্দর-
মহলে চলে গেল।

সোদিন সীতানাথবাবু ভেতরে খেতে
গেল। বনমালী এসে এক গেলাস জল দিয়ে
চলে গেল। একপাল কি তার আগে ঝগড়া
করাছিল গলা চিরে।

মাথব দস্তব বাড়িতে কিএব যত মেল,
তোমনি বেরলবে পাল। এক-একটা
বেরালের চেহারা যেন পশমের তৈরি।
খাবার সময় পাতের চারপাশে গোল হবে
বসে থাকে। একটু তসাবধান হলেই মাছের
টুকরোটা ছোঁ মেরে তুলে নেবে তারা।

প্রথম প্রথম সীতানাথবাবু মেবোছিল
একটা বেরালকে।

—বেবো, বেবো এখন থেকে, বেবো—
বলে এক লাথি ছুঁড়েছিল বেরালটা
লকা করে। লাথি খেয়ে বেরালটা ছিটকে
গিয়ে পড়েছিল একেবারে উঠোনের নদামি
ওপর।

হাঁ হাঁ করে দৌড়ে এসেছিল সুরলা।

—ও কি কবলেন বাবু, ও কি কবলেন?
সীতানাথবাবু বললে—দেখ না সরলা,
দেখ না বেরালটার কান্ড, পাত থেকে আশত
মাছটা তুলে নিয়ে গেল একেবারে—

সুরলা বললে—তা বলে আপনি
সুন্দরীকে লাথি মাঝবেন?

—সুন্দরী? সুন্দরী আবার কে?

সবলা বললে—ওর নাম তো সুন্দরী।
সুন্দরী কত আদরের বেরাল বৌরাণীর,
তাকে আপনি হেনস্থা কবলেন?

বলে তাড়াতাড়ি নদমাথ কাছ গিয়ে
কোলে তুলে নিলে সুন্দরীকে। আঁচল দিয়ে
গায়ের কাপা মছে নিলে।

বললে—আহা বে, কেন তুই এমন
লোকের পাত থেকে মাছ তুলে খেতে গেলি?
তোম কি মাছের অভাব বে?

বলে রাস্তাঘাটে গিয়ে বললে—ঠাকুর,
সুন্দরীকে একটা ভাজা মাছ দাও তো গো,
বড় মাছ খেতে চাইছে—

ঠাকুরও তেমনি। বউরাণীর আদরের
বেরালের মাছ খেতে ইচ্ছে হবেছে, তাতে
আপত্তি করবার সে কে?

সীতানাথবাবু দেখলে ঠাকুর রাস্তাঘাটের
ভেতর থেকে একটা পোনা-মাছের টুকরো
এনে সরলার হাতে দিলে। সবলা সেখানে
আদর কবে করে খাওয়াতে লাগলে।
সুন্দরীকে।

তারপর সীতানাথবাবুর দিকে চেয়ে
বললে—মাছ কম পড়েছে তো মাছ একটা.
ঠাকুরের কাছে চাইলেই পারতেন, তা বলে
অবোলা জীবকে লাথি মারা? এ কী-কি
খারা মানুষ গা আপনি?

এর পর আর সীতানাথবাবু সোদিন বোঁপ
কথা বলেনি ও নিলে।

দরকাব কী বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে ৫২'
বলে। কথা বললেই কথা বাড়ি। তারপর ২০'
একদিন কথাটা মাথব দস্তর কানে নাদ ৫০'
হয়ত তখন খাওয়া-পাওয়া-জাঞ্জল সবকিছুই
উঠে বাবে এ-বাড়ি থেকে।

, বেড়াল তো বেড়াল। বেড়াল দু'টকে
দেখতে পারতো না সীতানাথবাবু কে.ন.এ
কালে।

কিন্তু সোদিন থেকে তাও সহ্য ৫০'ত
লাগলো।

সহ্য না-কবে উপাধও ছিল না। দল
খাষ পরে তাব বেড়ালকেও খাঁতির ব্যবস্থা
হবে। দোকান উঠে গেছে। মাছলা-মকল
হয়েছে জ্বাতিদের সঙ্গে। খাওয়া-পাওয়া
কোনও সম্প্রদায়, তখন আর নেই
সীতানাথবাবু।

শুধু বনমালীকে একদিন ৫০'জন
করাছিল সীতানাথ-হ্যাঁ গো বনমালী,
তোমাদের বৌরাণী কিছু বলে না?

—কাদের কী বলবে দাঃখাবু?

—এই যে এতগুলো কি-কিউড়ি
রাত ঝগড়া করে, এদের কিছু বলে না
তোমাদের বউরাণী? সারাদিন তো কেবল
চুলোচুলি করে এ-ওল সঙ্গে ..

বনমালী বলতো—আজ্ঞে, বউরাণীর
আস্বা বা পেয়ে গেলেই তো সব এই রকম
হয়েছে, এদের আগা-পাতলা চাবুক মাপতে
তবে এরা গারেস্তা হয়—

কিন্তু সোদিন আর এক কান্ড ঘট ঘেঁসে।
বড় অভাবনীর কাণ্ড।

মাথব দস্তবাবু সোদিনও সদলবলে বাইরে
গেছে।

সীতানাথবাবু একা চিৎপাত হয়ে
তক্তাপোবে ওপর শূন্যে ছিল, হঠাৎ বড়ের
মত সৌরভী কি ধরে ঢুকলো।

বললে—হ্যাঁ গা বাবু, আমি নাকি
রাত্তিরে আপনার ঘরে ঢুকে আপনার
বুকে সুড়সুড়ি দিবেছি?

সীতানাথবাবু তড়াক করে বিগল
উঠে বসলো।

বললে—সে কী? তুমি আমার বুকে
সুড়সুড়ি দিবেছ? তুমি আর বুকে পেয়ে
না, আমার বুকে সুড়সুড়ি দিতে বাবে কেন?
সৌরভী তখন মার-মুর্তি!

বললে—হ্যাঁ, তাই তো মাগী বললে। কী ঘেমার কথা মা!

সীতানাথবাবু বললে—সত্যিই তো ঘেমার কথা। আমারই তো লজ্জা করছে শুনেছি ছি ছি—

সৌরভী বললে—ভাতারখাকী সম্বন্ধে মাগী, আমার নামে নালিশ বোরাণীব কাছে। আমি পোতাখালির নস্করবাড়িবে মেয়ে, পেটের দায়ে পরের বাড়ি গভর খাটেতে এসেছি—

তাবপর সীতানাথবাবুর হাতে ধরে টানতে লাগলো।

বললে—চলো তো বাবু, একবার চলো তো আমার সঙ্গে—

বলে সেই আস্তাবল-বাড়ি থেকে হিড়-হিড় করে টানতে টানতে একেবারে অন্দর-মহলের দিকে নিয়ে চললো।

সীতানাথবাবু বললে—এ কী কাণ্ড দেখে দাঁকনি—

অন্দরমহলের সদর-দেউড়ি পৌঁছবে একেবারে বারান্দায় গিয়ে পড়লো। তারপর সেখানেও পার নেই। একেবারে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো।

কোথা দিয়ে ঢকে, কোথা দিয়ে বোঁকে যে কোথায় নিয়ে চললো টানতে টানতে তার ঠিক নেই।

সীতানাথবাবু বত বলে—ওগো সৌরভী—ছাড়ো—ছাড়ো—

কিন্তু সেদিকে সৌরভীর ঝেঁয়াল নেই। সে তখন এক-নাগাড়ে গালাগালি দিয়ে চলছে সরলাকে। অথচ সরলাকে কোথাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

কিন্তু হঠাৎ ভেতর থেকে একটা মেয়েলি গলার মিষ্টি শব্দ এল—কী রে সৌরভী, কী হয়েছে?

বলতে বলতে একজন বউ একেবারে মূখোমুখি এসে দাঁড়ালো। আর সামনে সীতানাথকে দেখেই টপ করে মুখে ঘোমটা টেনেই পাশের ঘরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আর সীতানাথ অবাক হয়ে এক মুহূর্তের জন্যে শূন্য সেই মুখখানা দেখতে পেল। মানুষ যে এত সুন্দর হয় তা যেন কল্পনা করা যায় না। ফটোগ্রাফার সীতানাথ খানিকক্ষণ পতঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। তাবপর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সব কিছু যেন ভুলে গেল।

নীতাব মা এতক্ষণ বসে বসে শুনছিলেন। বললে—ঠিক যেমন লিখেছেন, তেমন সব ঘটেছিল, এতটুকু বাড়িয়ে লেখেন নি আপনি।

বললাম—এ-সমস্ত কিন্তু আমার কল্পনা—

ভদ্রমহিলা বললে—হয়ত নিছক কল্পনা। কিন্তু একেবারে খাঁটি সত্য ঘটনা। আমি মার কাছ থেকে এ-সমস্তই শুনছি।

—আপনার মা এ-বাড়ির ব্যাপার জানলেন কী করে?

ভদ্রমহিলা বললে—বহুদিন পরে তো ওই মাথব দত্ত তাঁর বাড়ি থেকে আমাদের বাড়িতে দিয়েছিলেন, তখন সব গল্প বলেছিলেন আমার মাকে। মা ছিল বলেই শেষ-জীবনে সীতানাথবাবু আগ্রহ পেরেছিলেন আমাদের বাড়িতে—

বললাম—সে তো আমি লিখেছি—

ভদ্রমহিলা বললে—আপনি যা লিখেছেন তার পরেও অনেক ঘটনা ঘটেছে, যা আপনি জানেন না। সেইটে বলতেই তো আপনাকে ডেকেছি—

বললাম—বলুন না শুন—

ভদ্রমহিলা বললেন—আমার মায়ের তখন বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ছোটভাইএর জন্যে খুব কষ্ট হলো মনে। কাকা-জ্যাঠারা মামলা-মকদ্দমা করে ভাইকে বাড়িতে দিয়েছে, এটা খুব কষ্টের—

একদিন সীতানাথবাবু বসে আছে তার নিজের ঘরখানায়।

হঠাৎ একজন ভদ্রলোক খুঁজে-খুঁজে এলেন দেখা করতে।

দরোয়ানকে জিজ্ঞেস করলেন—এখানে সীতানাথবাবু বলে কেউ থাকে?

দরোয়ান সঙ্গে করে নিয়ে এল ভদ্রলোককে।

সীতানাথ চিনতে পারলে না। দাঁদির বিয়ের দিন শূন্য একবার দেখেছিল ভাণ্ডার-পাতকে। তারপর আর সময়ই পারানি দেখা করবার।

ভদ্রলোক বললেন—আমি আপনার দাঁদি মনোরমার স্বামী—

—ও, আপনি আমার ভাণ্ডারপতি বললাম মূখোমুখি?

ভদ্রলোক বললেন—হ্যাঁ, আমি আপনাকে নিতে এসেছি। আপনার দাঁদিই আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে—

সীতানাথ বললে—কিন্তু আমার তো এখানে কোনও অসুবিধে নেই—

—কিন্তু পরের বাড়িতে কেনই বা আপনি পড়ে থাকবেন? বরানগরে ভাষার নিজের বাড়ি। অনেক ঘর পড়ে রয়েছে। দরকার হলে আবার ফোটোগ্রাফির দোকান করুন।

সীতানাথের একবার কী যেন মনে হলো।

কিন্তু সেটা সামলে নিয়ে বললে—কিন্তু আমি তো এখানে ভালোই আছি—এখানে তো আমার কোনও অসুবিধেই নেই—

ভদ্রলোক বললেন—হাজার হলেও আমাদের সঙ্গে আপনার যে-সম্পর্ক এঁদের সঙ্গে তো আপনার সে-সম্পর্ক নয়। হাজার হলেও এঁরা পর।

সীতানাথের তখন বড় অভিমান হয়েছিল নিজের আত্মীয়-স্বজনের ওপর। তখন আর কারো সঙ্গে দেখা করতেও ইচ্ছে হচ্ছিল না।

বললে—দাঁদিকে বলবেন তেমন দিন যদি কখনও আসে তো নিশ্চয়ই যাবো তার কাছে। দাঁদি ছাড়া তো সংসারে আমার আপন বলতে কেউ নেই—

অগত্যা বললামবাবু উঠে দাঁড়ালেন। আপনার দাঁদিকে গিয়ে তাহলে ভাই-ই বলি?

সীতানাথ বললে—হ্যাঁ, দাঁদিকে গিয়ে বলবেন দাঁদি আমার কথা ভুলে যায়। দাঁদি যেন মনে কবে আমি যাবা গেছি—

কথাটা রুঢ় শোনালো বড়।

সীতানাথ কথাটা বলেই আবার বদলে নিলে।

বললে—বলবেন, আমি একবার যাবো দাঁদিকে দেখতে, একটু সময় করে নিয়ে যাবো—

ভদ্রলোক বললেন—তাহলে তো খুবই ভালো হয়, আমার ঠিকানাটা তাহলে দিয়ে দাঁদি আপনাকে—

বলে নিজের ঠিকানাটা একটা কাগজে লিখে দিবে গেলেন।

দিয়ে যাবার সময় বলে গেলেন—তাহলে যাবেন কিন্তু আপনার দাঁদি খুব খুশী হবে—

ভদ্রলোক চলে গেলেন। কিন্তু সীতানাথবাবু তখন ওই মাথব দত্তর বাড়িতে পুরাপুরি আটকে গেছেন। রোজ দুপুর-বেলা চোব-চোব ভহার, দুপুর বেলা দিবানিদ্রা আর রাতে জাগরণ।

সেদিন থেকে সৌরভী খেয়ে দেয়ে আসার পর একটা কুব পান দিয়ে যেতো।

সীতানাথবাবু প্রথম দিন অবাক হয়ে গিয়েছিল।

বলোচ্ছিল—পান? পান কী হবে যে?

—তুমি খাবে বাবু, তোমার জন্যে পান এনেছি—

সীতানাথবাবু জিজ্ঞেস করলে—কে দিলে পান?

—আজ্ঞে আমি।

বলে আর দাঁড়ালো না সৌরভী।

সীতানাথবাবু ভেবেছিল পান দিয়ে সৌরভী খানিক দাঁড়াবে, দুটো কথা বলবে, একটু মিষ্টি করে বলবে, কিন্তু কিছুই কবলে না।

সীতানাথবাবু জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ রে সৌরভী, ও কে রে?

সৌরভী বুঝতে পারলে না।

জিজ্ঞেস কবলে—কে? কার কথা বলছো বাবু?

—ওই যে সেদিন বাড়ির ভেতরে মূখোমুখি দেখা হয়ে গেল?

—ওমা, ওই তো আমাদের বোরাণী,— সীতানাথবাবু অবাক হয়ে গেল।

বললে—কর্তাবাবু বউ?

তা সেই পান দেবার পর থেকেই সুবু হলো। কেন এক অলক্ষ্য নির্দেশে সেই-ই সুবু হলো সীতানাথের নৈশ-বিহার।

তখন আব আগে থেকে নোটিশ দিতে হয় না। যখন মাথব দত্ত বেরিয়ে যান তখন তাড়াতাড়ি খাবার দিয়ে দেয় ঠাকুর। বনমালী ডাকতে আসে।। খেয়ে উঠে সীতানাথ ঘরে এসে তৈরি হয়ে থাকে।

তখন সব ফাঁকা। বাগানটার কববী গাছটার ওপর একটা চাপা ঝাপসা অন্ধকার জমাট বেধে আসে।

সীতানাথ নিজের ঘরের দরজাটা খুলে
অন্দরমহলের রাস্তাটার দিকে চলে বসে
থাকে।

অনেক রাতে সৌরভী একটা পান নিয়ে
আসে।

সীতানাথ বলে—কী রে সৌরভী, বাবো?
সব তৈরি?

সৌরভী বলে—হ্যাঁ, সব তৈরি—

তাবপর সেই অন্ধকারে টিপি-টিপি পায়ে
সীতানাথেরও রুঁকিগণী উন্মার পালা সুরু
হয়। ওদিকে যখন মাধব দত্ত নৈহাটি কিম্বা
মাহেশ কিম্বা খড়দ' গিয়ে ফুঁটিতে জেমে
কাটিয়ে দেয়, তখন তারই অন্দর-মহলে সুরু
হয় আর একজনের জাগরণ। মাধব দত্ত তা
টের পায় না।

অন্ধকার রাতে যখন ঘাসের বুকের মধ্যে
অন্ধু গজায়, করবী গাছের ডালে ফুল
ফেটে, তেমন সীতানাথও নতুন জীবন
খুঁজে পায় মাধব দত্তর অন্দর-মহলের তারই
শোবার ঘরের মধ্যে।

কিন্তু পরের দিন আসরে যখন সবাই
গোল হয়ে বসে, তখন এক একদিন
চাটুজের সীতানাথেরও ডাক পরে।

মাধব দত্ত বলে—কী গো সীতানাথ
কেমন আছো?

সীতানাথ বলে—আজ্ঞে ভালো—

মাধব দত্ত বলে—ছাই ভালো। ভালোটার
তুমি কী বুঝলে শুন? ভগবান রাত সৃষ্টি
করেছে ফুঁতি করবার জন্যে, তুমি সেই রাতটা
কি না বুঝিয়ে নষ্ট করছো? তোমার মত
আহম্মক তো আমি দোঁখানি হে—

সীতানাথ সিবিনে মাথা নিচু করে থাকে।

মাধব দত্ত বলে—ফুঁতি করে নাও হে,
ফুঁতি করে নাও। যে-কটা দিন যৌবন আছে
সে-কটা দিন শ্রুৎ ফুঁতি করে নাও, কী
বলো চাটুজের কালকের খড়দ' কেমন ফুঁতি
হলো আমাদের বলো তো সীতানাথকে,
বলো না। সীতানাথ একটু শুনুক—

সীতানাথ তবু মূখ নিচু করে সব
অপমান সহ্য করে যেত।

নীতার মা বললেন—এ পর্বস্ত বা
লিখেছেন সবই ঠিক আছে—কিন্তু তারপরে বা
লিখেছেন সেখানটাই মেলেনি—

বললাম—এব পরই তো একদিন যরা
পড়তে পড়তে বেঁচে গেল সীতানাথ—

ভদ্রমহিলা বললেন—সে তো সেদিন খুব
বৃষ্টি হয়েছিল বলে। মাঝপথ থেকে মাধব
দত্ত গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরে এল। আর খবর
পেরেই সীতানাথ বোবাণীঘর ঘর ছেড়ে চটি-
জোড়া সেখানে ফেলে রেখে চলে এল, আর
পরদিন কতটা আসরে বসে হেসেই খুন—

মাধব দত্ত বললে—জানো চাটুজের, কাল
শ্রুতে গিয়ে কী দেখি জানো, দেখি আমার
শোবার ঘরে সীতানাথের চটি-জোড়া।

চাটুজের অবাক, নন্দাকিশোরও অবাক,
কিন্তু সীতানাথের মূখে—কিন্তু কোনও
উজবাচা নেই—

আজ্ঞে সীতানাথ, বেডালে তোমার
চটুজোড়া নিয়ে চলে গেল আর তুমি কিছ
জানতে পারলে না? তোমার কী বকম
ঘুম গো? শেষকালে দেখছি কোনদিন

তোমাকেও টেনে নিয়ে যাবে ঘর থেকে, তুমি
বোধ হয় নিজেও তা টের পাবে না—

কিন্তু মৃদুকিল হলো বৃন্দাবন হবার
পর।

মাধব দত্তর ছেলে বৃন্দাবন। বৃন্দাবন
দত্ত।

বৃন্দাবন হবার পর থেকেই মাধব দত্ত
ছেলে বলতে অজ্ঞান। ছেলেকে নিয়েই আসরে
বসে। ছেলের মূখে গড়গড়ার নল পুরে
দেয়।

নীতার মা বললেন—ওইটেই ডুল
হয়েছে আপনায়—

বললাম—বেন, কীসের ডুল?

নীতার মা বললেন—আপনি দেখিয়েছেন
যে, ওই বৃন্দাবন সীতানাথবাবুই ছেলে—

বললাম—আমি ভো ভাই-ই কল্পনা করে
নিরেছিলাম। ভাই তো যখন বৃন্দাবনকে
মজা করে তামাক খাওয়াতো মাধব দত্ত, তখন
আপনি করতো সীতানাথ—

সীতানাথ বলতো—ওর মূখে গড়গড়ার
নল দেবেন না কর্তাবাবু, ছোটবেলার
তামাক খাওয়া ভালো নয়—

মাধব দত্ত বলতো—দেখছো, কেমন
চালাক-চতুর হয়েছে আমার বেটা, এই
বয়েসেই তামাক খেতে শিখেছে—

সীতানাথ আঁতকে উঠতো।

বলতো—শরীর খারাপ হবে বৃন্দাবনের,
তামাক খাওয়া ভাল নয় কর্তা—

মাধব দত্ত রেগে যেত। বলতো—তামাক
খাওয়া ভালো নয়? তুমি কী বা-তা বলছ?
তামাক তো আমিও খাই, আমি খারাপ হয়ে
গিয়েছি? খবরদার বলছি আমার ছেলের
ব্যাপারে তুমি আব আমাকে কিছ বলতে
এসো না—

নীতার মা বললেন—এখানটাও ঠিক
লিখেছেন বাবা, কিন্তু ওই বৃন্দাবন তো
সীতানাথবাবুর ছেলে নয়।

—সীতানাথবাবুর ছেলে নয়? তাহলে
কি মাধব দত্তর ছেলে?

নীতার মা বললেন—না বাবা তাও নয়,
তাও নয় ওই বৃন্দাবন হলো বলবাম
মৃদুজের ছেলে—

—বলবাম মৃদুজের? সীতানাথবাবুর
বোনের?

—হ্যাঁ, তবে শুনুন সবটা।

বলে তিনি বাকিটা বলতে আরম্ভ
করলেন।

মাধব দত্তর শেষ-জীবনটা সত্যিই বড়
কষ্টের। মরাজীবন পৈত্রিক সম্পত্তি
উড়িয়েছে। সাবাজীবন স্বাস্থ্যের ওপর
অমানুষিক অভ্যাস করে গেছে। রাতের পব
রাত জেগেছে। মোসারের-খোশার-দেয়া সাবা-
জীবন তাকে ঘিরে টাকা শ্রুত নিষেছে।
এ্যাটর্ন-উকীলরাও বা পেবেছে যেমনভাবে
পেবেছে টাকা ঠিকরে নিয়েছে। সম্পত্তি
বেনামীতে কিনে নিষেছে।

তখন সব গেছে মাধব দত্তর।

গাড়ি পেছে, মোসাহেববা গাছ সম্পত্তিও
গেছে। সেই হুসেন মিরা বাইম বয় গেছে।
চাটুজের চলে গেছে, নন্দাকিশোরও চলে

গেছে। নৈহাটি, খড়দ', মাহেশ যেখানে যত-
কিছ সংসার ছিল সবই শেষ হয়ে গেছে।

শ্রুত ছিল সীতানাথবাবু। সীতানাথ
রায়।

সীতানাথ রায় তখনও কোনও রকমে
টিকে ছিল আস্তাবল-বাড়ির ঘবখানার মধ্যে।
টিম-টিম করে টিকে ছিল তখনও।

এমন কি যে অন্দর-মহলের বউবাণী,
সেও চলে গেছে একদিন। তাকে নিয়ে গিয়ে
শ্মশানে পুড়িয়ে এসেছে মাধব দত্ত। শ্মশানে
গিয়ে খুবই কেঁদেছে। কেদে কেদে মাধব
দত্ত চোখ ফুঁলিয়ে ফেলেছে।

তখন একমাত্র ভরসা বৃন্দাবন।

বৃন্দাবন দত্ত। মাধব দত্তর একমাত্র
ছেলে।

ভদ্রমহিলা বললেন—কিন্তু আসলে
বৃন্দাবন মাধব দত্তর ছেলেই নয়—

বললাম—তার মানে?

ভদ্রমহিলা বললেন—মাধব দত্তর ছেলেই
হয়নি, মেরে হেরেছিল—

আমি অবাক হয়ে গেলাম।

বললাম—সে কী?

ভদ্রমহিলা বললেন—হ্যাঁ—তাহলে
শেষের সবটা শুনতে হবে—বলে তিনি
শেষটা নিজেই বলতে লাগলেন। অত বড়
বাড়ি, অত সম্পত্তি। সব যখন গেছে তখন
একমাত্র ভরসা ছিল বৃন্দাবন।

কিন্তু বৃন্দাবনও তখন মাধব দত্তর মত
গোলাম হয়ে। বৃন্দাবন বড় হয়ে ঠিক
মাধব দত্তর মত মোসাহেব বাথলে। ঠিক
মাধব দত্তর মত মেহেমানুব পুষত
লাগলো। নৈহাটি, খড়দ', মাহেশ সব
জারগার একটা করে সংসার পাতলে।

সীতানাথবাবুর বড় কষ্ট হতে
লাগলো।

একদিন মদ খেয়ে বাড়ি ফিরতেই
সীতানাথ ধমক দিলে খুব। মাধব দত্তর
সামনেই ধমক দিলে খুব।

বললে—এসব কী কবছো বাবা, এ-সব
করা কি ভালো? এসব ভালো নয়—

মাধব দত্তর কাছে খবরটা গেল।

একদিন ডেকে পাঠালো মাধব দত্ত।

সীতানাথ কাঁপতে কাঁপতে এসে
হাজির।

সীতানাথ বললে—আমাকে ডেকেছেন
দত্ত-মশাই?

মাধব দত্ত বললে—তুমি বৃন্দাবনকে
কী বলেছ?

সীতানাথ বললে—আজকাল বৃন্দাবন
বড় মদ খাচ্ছে, মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরছে,
তাই বলছি। ওর ভালোব জানেই বলছি—
ধমক দিয়ে উঠলো মাধব দত্ত।

বললে—তুমি ওর ভালো-মন্দ দেখবার
কে? আমি ওর বাপ, আমি বুঝবো ও
ভালো করছে কি মন্দ করছে—

—আজ্ঞে, আপনার ছেলে হলেই বা,
আমারও তো বয়েস হয়েছে, আমিও তো
ভালো-মন্দ বুঝতে পারি। এই বয়েসেই
এত মদ খাওয়া কি ভালো।

—খাশো!!!

চিৎকার করে উঠলো মাধব দত্ত।
বললে—বেঁবিরে যাও আমার বাড়ি
থেকে, বেঁবিরে যাও—যাও বেঁবিরে এখান—
যাও—

আর সেইদিনই সীতানাথ দত্ত-বাড়ি
ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল। এতদিনকার
আশ্রয় ছেড়ে কোথায় যাবে সীতানাথ?
কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেবে? তখন অনেক
কয়েস হয়ে গেছে তার। তখন আর সমর্থ্য
নেই শরীবে।

তবু চলে বেতে হবে। মাধব দত্ত
হুকুম। মাধব দত্ত বাড়ি। সে-বাড়ি ত

নগরের বাড়িতে এসে আশ্রয় নিলো
সীতানাথ।

একদিন বাইরে থেকে ডাক এল—
দিদি—ও দিদি—

মা দৌড়ে গেল বাইরে। দেখে ছোটভাই
এসেছে—

—দাদা তুমি?

সীতানাথ বললে—হ্যাঁ রে, আমি—

আমি কাছে ছিলাম। আমাকে দেখেই
সীতানাথবাবু আদর কবলে। কিন্তু স্বাস্থ্য
তখন তাঁর ভেঙে পড়েছে। একেবারে
ভেঙে পড়েছে। আর ভালো করে তখন



থাকবার তখন তার আর কোনও আশ্রয়
নেই।

সেই সম্মুখবেলা ফড়েপুকুর স্ট্রীটে
মুখে এক-কাপড়ে সীতানাথ রায় আস্তে
আস্তে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল এক নিমেষে।

—তারপর?

গুপ্তমহিলা বললেন— তারপর আব
কোথাও জায়গা না পেয়ে আমাদের ববা-

আব দাঁড়বার ক্ষমতাও তার নেই। সেই যে
শুরে পড়লো, আর তাঁর ওঠবার ক্ষমতা
ছিল না।

আমার মনে আছে শুরু চূপ-চাপ
শুরে থাকতো সারাদিন।

ওদিকে বন্দাবনের বিয়ের দিন। বন্দা
বনের বিয়ের বন্দোবস্ত হয়েছে।

সীতানাথের তখন শেষ-অবস্থা এবে-
বাবে।

বললে—জানো দিদি, আজকে বন্দা-
বনের বিয়ে—

—তা হোক, তুমি এখন চূপ কবে
থাকো। ডাক্তার, তোমাকে চূপ করে শুরে
থাকতে বলছে—

সীতানাথ বলতো— কিন্তু দিদি,
বন্দাবন তো কিছুই জানতে পারবে না।
আমি মরে গেলে সে তো কিছুই বুঝতে
পারবে না—

—তা না বুঝুক, তুমি চূপ করে
থাকো।

সীতানাথ তবু বলতো—জানো দিদি,
মাধব দত্ত ওকে মদ খেতে বারণ করে না—
অত মদ খাওয়া কি ভালো? আমি ওই
কথা বলেছিলাম বলেই আমার ওপর অত
বাগ—

দিদি বলতো— তুমি ও-সব নিয়ে আর
ভাবো না অত—

—ভাববো না?

সীতানাথের চোখ দুটো ছল-ছল করে
উঠতো।

—ভাববো না আমি? তুমি বলছো কী?
বন্দাবন কি আমার পব?

দিদি ধমক দিয়ে উঠতো।

বলতো—আবার ওই সব কথা?

সীতানাথ বলতো—কিন্তু সত্যিই হলো
না দিদি, বন্দাবন কি আমার পব? আমি
কেন বন্দাবনের এ-সর্বনাশ কবলাম?
শুরে শুরে কথা বলতো আর কাদতো
সীতানাথ।

বলতো—আমারই পাপের জন্যে ওই
এই রকম হলো, জানো দিদি। আমি
নিজেও কষ্ট পেলাম, তোমাকেও কষ্ট
দিলুম—

—আমার কষ্টের কথা থাক।

সীতানাথ বলতো—দিদি, তুমি আমাকে
ক্ষমা করো দিদি, আমাকে ক্ষমা করো।

—তুমি কী করেছ যে তোমাকে ক্ষমা
করবো?

সীতানাথ বলতো—কিন্তু দিদি, আমি
যে তোমার সর্বনাশ করছি, তোমার যে কত
বড় লোকসান করছি। এ আমি কেন
করতে গেলাম? আমার বোধহয় সম্পত্তির
লোভ ছিল দিদি। সত্যি বলছি দিদি
আমার মনের ভেতরেও বোধহয় সম্পত্তির
পাবার লোভ ছিল—প্রতিশোধ নেবার লোভ
ছিল—

বলতে বলতে উত্তেজনার সীতানাথ
অজ্ঞান হয়ে পড়তো।

আর তখন ডাক্তার ডাকতে হতো।
ডাক্তার এসে ওষুধ দিয়ে যেত।

কিন্তু, ওদিকে মাধব দত্তর বাড়িতে
তখন শেষবারের মত আবার নহবৎ বেধে
উঠেছে। নিজে বাবার আগে একবার শেষ-
কালের দপ্ করে জ্বলে ওঠার মত।

মাধব দত্তর একমাত্র সন্তান বন্দাবনের
বিয়ে।

আদালত তখনও আছে। মৃত্যুর কঠোর
গড়গড়াটা এগিয়ে যাবে। কিন্তু মাধব দত্তর
আগেকার তেজ তখন আব নেই। কাজেব
খুঁত হলে আর তেমন রোগে ওঠে না

আগের মত। চারপাশে কেউ থাকে না। ফাঁকা নাচ-দববা। শুধু সেই ভোল আছে। সেই সম্ভাবনায় নাচ-দববাবে একবারের মত এসে তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে।

মাথায় ঢাক পড়ে গেছে। মূখের চামড়া ঝুলে কুঁচকে গেছে। সেই বাবার চুল সব নিঃশেষ হয়ে গেছে। হাত কাঁপে, একটু অসাবধান হলেই গড়গড়ার নলটা হাত থেকে খসে পড়ে যায়।

একদিন তো পারের ঠেলা লেগে গড়গড়াই উঠে গিয়েছিল। কসকেব আগনে পড়ে গিয়েছিল ফ্যাস। সেদিন যে মাধব দত্ত নিজেই পড়ে যায়নি তাও তার ভাগ্য বলতে হবে।

তা মাধব দত্ত নিজে পড়ে গেলেই হয়ত ভালো হতো। কিন্তু কপালে কণ্ট থাকলে কে খন্দাবে।

সেই অভাবনীয় কান্ডটাই ঘটলো। কখন স্যাক্সা এসে হাজির হলো নাচ-দববাবে।

এসে যথাবীতি প্রশংসা করে বসলো। মাধব দত্ত জিজ্ঞেস করলে—হলো সব গল্পনা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, কতামশাই। সব তৈরি করে এনোই—

—দেখি? কখন স্যাক্সা একে-একে সব গল্পনা দাব করে শেষতে লাগলো।

দস্তবৎশের একমাত্র কুলভিলকের বিয়ে। গল্পনা বড় কম নয়। হার, ভাগ, বালা, চুড়, বদল, কানপাশা, মাকুড়ি, কত রকমের সব গল্পনা—গল্পনার কি শেষ আছে? দস্ত-বাড়ির ছেলের বউ দেখে কেন কেউ না বলে যে মাধব দত্ত কনেকে সাজিয়ে-গাছিয়ে ধরে তোলেনি।

—আব সেই গিঁমমার কুড়ি ভিন্ন নেকলেসটা দিয়েছিলেন, সেটার লকেটের ভেতরে এই কাঁচ একটা ফোটা ছিল, এইটে দিতে এলুম—এই নিন—

মাধব দত্তের মূখ থেকে গড়গড়ার নলটা খসে পড়লো।

—গিঁমমার নেকলেসের লকেটের ভেতর থেকে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি সেই নেকলেসটা দিয়েছিলেন, বলছিলেন ওটা ভেঙে বোমাব একটা নতুন ডিজাইনের নেকলেস করে দিতে হবে—

—লকেটের ভেতরে ছবি ছিল? কার?

—এই দেখুন না। কাঁচ ফোটা বৃকণ্ডে পাবিছ না।

কল লকেটটা এগিয়ে দিলে, ফোটাটাও দেখাল।

মাধব দত্ত সোজা হয়ে বসে দেখে গিয়েই চমকে উঠলো। এ-সে সীতানাথের ফোটাগাফ। বউরাণীর নেকলেসের লকেটের ভেতরে সীতানাথের ছবি কেমন করে এল, কে দিয়েছে?

সঙ্গে সঙ্গে যেন বাজ পড়লো মাথা ওপর।

কিন্তু হবত বাজ পড়লেও অত চমকে উঠতো না কেউ।

মাধব দত্ত চিৎকার করে উঠলো— সীতানাথকে ডাকো—

আদালত আলি মদখ কাঁচু-মাচু করে বললে—আজ্ঞে, সীতানাথবাবু তো নেই—

মাধব দত্ত বললে—নেই তো যেখানে আছে সেখান থেকে ডেকে নিয়ে এসো—

কিন্তু তখন আর সীতানাথকে কে খুঁজে পাবে? কোথায় আছে সীতানাথ কে জানতে পারবে?

কিন্তু খোঁজ খোঁজ তাকে। খুঁজে বাব কব। যেখান থেকে হোক, যেমন কদ হোক, জীবিত বা মৃত, সীতানাথকে খুঁজে বার করা চাই-ই চাই। কতামশাইএল হুকুম।

মাধব দত্ত তখন পাগলের মত সাবা বাড়িময় খুঁজছে।

পাগলের মত বউরাণীর ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র তহনছ করে বেড়াচ্ছে। হুকুম দিলে—নবং খামাতে বল—খামাতে বল—

বাড়ির মাথায় নহবতীর বাজাতে আরম্ভ করছিলেন বেহাগ। নিখাদে পৌঁছেই সব হঠাৎ থেমে গেল।

বন্দাবন দত্ত, তাবই বিয়ে, সে বাবার কন্ড দেখে অবাক।

বাবার সামনে যেতেও সাহস পায় না। তবু জিজ্ঞেস করলে—কী হলো? কী হলো বাবা?

হলো তোমার মাথা আর মূন্ডু— বীরা আত্মীয়-স্বজন বাড়িতে বিয়ে উপলক্ষে এসেছিল, তাবাও হক্চক্চর গেল। এ-সব কী কান্ড। ভবে ভয়ে কেউ আর মাধব দত্তের মূখের সামনে আসতে সাহস পেলে না।

মাধব দত্ত চিৎকার করে বললে— আদালত, আমার বন্দুকটা দে—

বন্দাবন বললে—আমার কথাও ওপর কথা? দে, বন্দুকটা দে—

তাবপর সেই বন্দুক নিয়ে মাধব দত্ত পাগলের মত ঘোরাঘুরি করতে লাগলো। সবাই অস্থির। কাকে গুলি করে মাধব কে জানে?

হঠাৎ বনমালী এসে হাজির হলো হাঁফাতে হাঁফাতে।

বললে—হুকুম, সীতানাথবাবুকে পাওয়া গেছে—

—ডেকে আন শযতানকে, আত্মব কাছ ডেকে নিয়ে আয়—

বনমালী বললে—আজ্ঞে, তিনি এখন রুমো-মরো, বিছানায় শুয়ে আছেন, উঠতে পারছেন না—

—কোথায়? কোন্ চুলোয় শুয়ে আছে।

—আজ্ঞে বনানগরে। তাঁর ভূমিপতি বড়। ভূমিপতি বলরাম মদুজেন্ডে বাড়ি—

—তা চল সেখানে। আমি যাবো।

গাড়ি এল। মাধব দত্ত তাতে উঠে বসলো। ছাদের ওপর আদালত আলিও বসলো। বনমালীও উঠে বসলো পাগে।

মাধব দত্ত হুকুম দিলে—চালাও—গাড়ি চালাও—জোবসে, চালাও—

নীতাব মা বললেন— তারপর তো আপনি সবই লিখে গেছেন—

ওদিকে সীতানাথবাবুর তখন শ্বাস-কণ্ট হচ্ছে। ডাক্তার এসে বসে আছে, আশ্রয় নেই তখন। অঘোব-অচৈতন্য অবস্থা। দীর্ঘ ভূমিপতি বসে আছে। আমিও বসে আছি—

হঠাৎ মাধব দত্ত এসে হাজির হলো।

বললাম—ও-ও তো আমি লিখেছি—

নীতাব মা বললেন—আপনি লিখেছেন মাধব দত্ত বন্দুক ভাগ করে গুলি করে মারলো সীতানাথবাবুকে। কিন্তু সীতানাথবাবু তার আগেই মাথা গেছে। কিন্তু পাবেটা লিখলেন 'না কেন? তারপরেই তে. অসল ঘটনাটা ঘটলো।

সেই আসল ঘটনাটাই বললেন নীতাব মা।

বললেন—অনেক বছর ধরে সেই খুনের মামলা চললো। মামলা চললো মাধব দত্ত আর বলরাম মদুজেন্ডের মধ্যে। এককালের বনেদী বংশ ফড়েপুকুরের দস্ত-বংশ। প্রথমে নীচের কোর্ট, তারপর হাইকোর্ট, তারপর সুপ্রীম কোর্ট।

মোটকথা আমি অত সব কেবটেব ব্যাপার বুঝতুম না। কিন্তু জলের মতন পয়সা খরচ হতো তা মনে আছে।

শেষকালে একদিন আদালতের রায় ফেরাল। বায় বেগোতে আমি মাধব দত্তের এই বাড়ি পেয়ে গেলাম। ততদিনে মাধব দত্ত মাথা গেছে। মাধব দত্তের বংশের তখন আর কেই জীবিত নেই। বন্দাবন দত্ত একদিন আত্মহত্যা করে সব বংশ জুড়োল।

আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম সব শুনে।

বললাম—আপনি এ-সম্পত্তি পেলে কেন?

নীতাব মা বললেন— আদালতের রায়ে প্রমাণ হলো বন্দাবন দত্ত আসলে মাধব দত্তের নিজেই ছেলে নয়। মাধব দত্তের স্ত্রীর মরে হয়েছিল। আব সীতানাথবাবুর দিদিরও একটা ছেলে হয়েছিল। সীতানাথবাবু সেই ছেলেকে বদলি করে মাধব দত্তের বাড়ি ঘরে রেখে মেরেটাকে নিয়ে এনোছিল দিদির কাছে—

—কেন?

—তখনকার দিনে মেয়েবা তো বাপের সম্পত্তি পায় না তাই।

জিজ্ঞেস করলাম—আব সেই মেয়ে?

নীতাব মা বললেন—আমিই সেই মেয়ে গা। আমার কপালে অনেক দুঃখ ছিল, তাই এতদিন পরে এখনও বেঁচে আছি। আপনাব গম্পটা পড়ে তাই নীতাকে বলেছিলাম আপনাকে ডাকতে। আগাগোড়াই ঠিক লিখলেন। শেষটায় আব কেন ভুল করে—তাই—

হঠাৎ বাইরে কড়া নড়ে উঠলো।

ভূমিহীলা বললেন—ওই বোধহয় নীতা এল—

তাবপর ডাকলেন—ওবে ভূতো, দরজা খুলে দে, দিদিমাণ এসেছে—

—শেষ—

সৌদীন সম্মুখাবলী একজনকে টেলিফোন কবডে গিয়ে টেলিফোনের পাতা ওলটাতে ওলটাতে আবেকজনের নাম নজরে পড়ে। থানদার, নীলকুমার। বিশ্ববিখ্যাত নাম।

বহুকাল পূর্বে গোলদীঘির ধারে তাঁব সঙ্গে একবার আলাপ হয়েছিল এক বন্ধুর সৈজিন্যে। কবেকার কথা। তাঁর মনে থাকার মতো নয়। সেকথা তাঁকে মনে কবিয়ে দিতেও হবে না। রিং করে নমস্কার জানিয়ে শুধু এইটুকু বললেই চলেবে যে, “মীনকেতন মল্লিক আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী। আপনি কি আজ এখন ফ্রী আছেন?”

“কী আশ্চর্য!” টেলিফোন ধবন মিসেস থানদার। “মীনকেতন মল্লিক কি আপনি? আপনার নাম যে আমার স্বামী বাব বাব বলেন। খুব খুশি হবেন আপনাকে দেখে। চলে আসুন। চলে আসুন ভাঙ্গ একদুন। মিসেস মল্লিককেও নিয়ে আসবেন। আমি দেখতে চাই।”

স্নেনওয়েড নয় তো কী! একটু আগেও মনে হয়নি যে নীলকুমার থানদারের ওখানে একবার কল করা উচিত। ছেলে-বোলা থেকেই ওঁর লেখা পড়ে মৃদু। আব উনিও যে মীনকেতনের লেখার সমঝদার এটাও লোকমুখে শোনা।

“যাবে অধ্যাপক থানদারের ওখানে?” মীনকেতন জিজ্ঞাসা করেন তাঁর স্ত্রীকে। “হ্যাঁ খেয়াল হলো, একটা এনগেজমেন্ট কবে বসলুম। মিসেস থানদার তোমাকেও নিয়ে যেতে বলেছেন। জানো বোধহয় যে ভদ্রমহিলা অস্ট্রিয়ান।”

সৌদীন সম্মুখ্য বেরোবার কল্পনা ছিল না। তবে বাড়ীতে কাজ ছিল। শিউলি একটু ভেবে নিয়ে বলেন, “আজ্ঞা। কিন্তু বেশীক্ষণ থাকতে পারব না। মর্শিদাবাদের জন্যে গোছগাছ করা শেষ হয়নি। তোমরা তো দলিল হয়ে থাকাস। আমবাই ভূগি। কোথায় কলকাতায় এসে দু’দিন গুছিয়ে বসব, তা নয় আবার দলিল।”

“সাব আর আসব।” মীনকেতন কথা দেন। “এটা একটা কার্টাসি কল। উনি এককালে আমার হাবো ছিলেন। আমিও ভেবেছিলাম ওঁরই মতো নিজের লেখনীর দৌলতে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াব। শুনতে পাই উনিও আমার লেখার পক্ষপাতী। কাজটা তা’হলে আজকেই চুকিয়ে দেওয়া যাক। পরে আবার কবে কলকাতা আসা হবে কে জানে।”

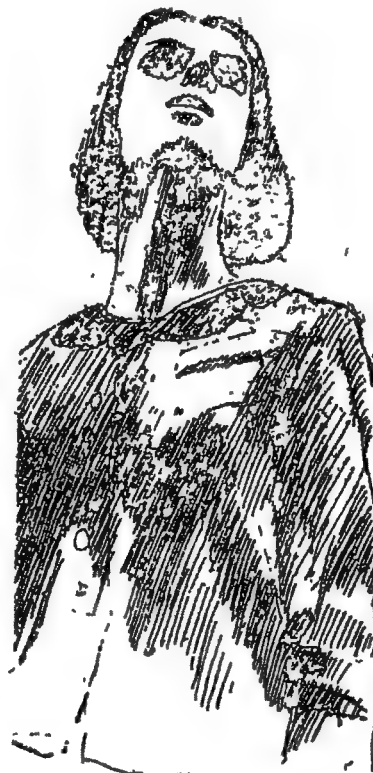
থানদার দম্পতি মল্লিক দম্পতিকে বাহু মেলে স্বাগত করেন ও ভিতরে নিয়ে যান। বাড়ী না বলে গ্রন্থাগার বললে বাড়াবাড়ি হয় না। ওটি যেন একটি ধনভান্ডার আশ ওঁরা যেন দুটি যথ। অমূল্য সম্পদ আগলে বসে আছেন।

“খুব ভালো করেছেন আজ এখন এসে।” অধ্যাপক বলেন, “অবিলম্বে আমেরিকা রওয়ানা হওয়ার জন্যে পরোয়ানা পেরেছি। কাল থেকেই গোছগাছ শুধু কবে দিতে হবে। এবপরে আর কারো সঙ্গে আশ্রাপ করার সময় পেতুম না।”



একা দোকা

অনুদীপ্ত
রায়



“আমিও মর্শিদাবাদ বওয়ারা হওয়ার জন্যে পরোয়ানা পেরেছি।” মল্লিক বলেন।

“ওঃ তাই নাকি! তা হলে তো আজ না হলে আর দেখা হতো না কে জানে কতকাল! হ্যাঁ, আমার খুব ইচ্ছে ছিল আপনাকে দেখতে। খুব খুশি হয়েছি আপনি এসেছেন।” থানদার বলেন পাশাপাশি আসনে বসে। লেমন বার্লি সামনে রেখে।

“আমিও কম খুশি হইনি। তবে আপনাকে মনে কবিয়ে দিই যে বিশ বছর আগে একদিন গোলদীঘির ধারে আপনার

সঙ্গে আমার পশ্চিম করিয়ে দিয়েছিল আমার বন্ধু রতীন।”

“ওঃ রতীন! হ্যাঁ, রতীনকে আমার খুব মনে আছে। কিন্তু আপনার কথা কই মনে পড়ছে না। খুব খুশি হয়েছি আপনাকে—আপনাদের দু’জনকে—দেখে। এখন কী লিখছেন? এই পার্টিশন নিয়ে কিছু লিখবেন না?” থানদার বলেন।

“আমার বুক ভেঙে গেছে, অধ্যাপক থানদার।” মল্লিক কাজবোজ করেন।

“আমরা জাতকে জাত ছিঁচকাঁদুনে। যেখানে সিভিল ওয়ার দরকার সেখানে পার্টিশন কবে বসে আছি। তা নিয়ে আবার কান্না! তবে কার্দিবই যদি তো ইংরেজকে যেতে দিল কেন? আরো কিছুকাল ওর বটেব ভলাব থাকলে পারতিস। রক্তহীন অশ্রুহীন শ্বেদহীন স্বাধীনতা কে কবে পেয়েছে!” অধ্যাপক দুঃস্বপ্নে বলেন। কিন্তু ভলে ভলে সক্রম।

ওদিকে মিসেস থানদার মিসেস মল্লিককে বলাছিলেন যে আপাতত এক বছরের জন্যে বাওয়া হচ্ছে, সম্ভব হলে দু’তিন বছরও থেকে যেতে পারেন। দুর্ভাবনা এই পৃথিবী-পত্রের হেফজত ও বন্ধাবন্ধন নিয়ে। সারা-জীবনেব সম্ভব। আব তো কিছু জমেনি। বখনি বা হাতে এসেছে বই কিনে হাত খালি করে দেওয়া হয়েছে।

“আর একখানা ওয়ার অ্যান্ড পীস লেখা যেতে পারত।” অধ্যাপক বলে বাক। “কিন্তু কোথায় সেই ওয়ার? আর সেই পীসই বা কোথায়? এ যে না যুদ্ধ, না শান্তি। না ট্রাজেডী, না কমেডী। এ নিয়ে বাঙ্গাবিতা ছাড়া আর বী লেখা যেতে পারে! কিন্তু আমাকে মাফ কব্বেন। আমি সাহিত্যের লোক নই।”

শিউলি চেখে চেখে টেলিগ্রাফ করেন যে আব দৌর নয়, এবার উঠতে হবে। মীনকেতন উঠি উঠি করছেন এমন সময় দরজার বেলা বেজে ওঠে।

মিসেস থানদার তাঁর স্বামীকে বলেন, “কাউন্টস এরিকা ও তাঁর স্বামী।”

“একসকিউজ মী” বলে অধ্যাপক অপ্রার্থনা করতে ছুটে যান।

“একসকিউজ মী” বলে অধ্যাপক-জারাও তাঁর পিছু পিছু যান।

কাউন্টসের সঙ্গে বিনি প্রবেশ করেন তিনিও কোন না অস্ত্রিয়ান কাউন্ট হবেন। কিন্তু কাছে আসতেই বোঝা যায় তিনি অস্ত্রিয়ানও নন, কাউন্টও নন। থানদার তাঁর পবিচয় দেন, “ডক্টর ঘোষাল।”

(২)

কেউ ভোলে কেউ ভোলে না।

“আপনি আমাকে চিনতে পারলেন না, আমি কিন্তু আপনাকে চিনিছি, মিস্টার মল্লিক! আমি কি আপনাকে ভুলতে পারি, না ভুলব কোনোদিন?” কবম্বনের পর মল্লিকের হাত ছেড়ে বেন না ঘোষাল।

“চিনি চিনি মনে হচ্ছে, কিন্তু নেহাৎ আপসাতাবে।” হাত ছাড়িয়ে নেন না মল্লিক।

“আচ্ছা, এইবার মনে করিয়ে দিই। প্যারিসের সেই ‘রাশিয়ান রেস্টোরাণ্ট’। কার্তিক সামন্ত। নলিনী ভট্টাচার্য। পবন ৮৮বতী। সহদেব ঘোষাল।” ঘোষাল খেই খরিয়ে দেন।

কার্তিককে মনে পড়ে বইকি। পরামর্শকেও। কিন্তু বাকী দু’জনের চেহারা ঠিক মনে আসে না। মল্লিক চেষ্টা করেন।

“আচ্ছা, আবার মনে করিয়ে দিই। পনের বছর আবার আপনার সঙ্গে দেখা। আপনি আমার হোটেলের ওঠেন। বিদ্যায়ের সময় আমাকে একখানি বই উপহার দেন। আপনারই লেখা। তাবপব আঁব আপনাকে দেখিনি। কবে দেশে ফিরলেন তাও জানতে পাইনি। উনিশ বছর পবে আপনাকে এখানে দেখতে পাব আশা করিনি। কী আনন্দ!” তিনি বার বার ঝাঁকানি দিয়ে বলেন।

“বসুন, বসুন। আপনারা বসুন।” অধ্যাপক তাঁদের ধরে নিয়ে বসিয়ে দেন। হঠাৎকালে পানীয়া আসে। দু’জনে দু’জনের গলাসে গলাস ঠোকিয়ে বলেন, “টু ইউ।”

“এবার চিনেছি।” মল্লিক স্মিত হেসে বলেন। “আমাব বই আমি আঁব কাউকে দিইনি। ওই একজনকেই দিগেছি। কিন্তু দেশে ফিরে এসে আজ অবধি তাঁর সন্ধান পাইনি। কবেক বছর পরে তাঁর প্রথম নাম যে সহদেব সোঁটও ডুলে বাই। শব্দ ঘোষাল বললে কেই বা বুঝবে কোন্ ঘোষাল। প্যারিসফের্তাদের দেখলেই জিজ্ঞাসা কবি, বলতে পারেন ঘোষাল এখন কোথায়? সেই যে ঘোষাল বলে একজন ছিলেন। ডাক্তারি পড়তেন। রোগামতন। কালো না হলেও ফবসা নন। বেঁচে না হলেও লম্বা নন। কন্টেস্টে চালান। দারুণ খাটেন। কিন্তু কেউ বলতে পাবেন না কোথায় সেই মানুসটি। বেঁচে আছেন কি না কে জানে! সামন্ত তো শুনোঁছ মায়া গেছেন। শব্দে এত কণ্ঠ হলো!”

ঘোষালও অক্ষণেস কবেন। “হাঁ বা শুনছেন তা ঠিক। সামন্ত আঁব নেই। আমিই যে বেঁচে আছি এর জন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ। আর আমাব স্ত্রীকে।”

তা হলে এই সেই ঘোষাল। কিন্তু এঁকে দেখে কী করে বেউ চিনবে যে ইনিই তিনি। দিবি মোটোসোটা গোলগাল। ফরসা না হলেও ফরসার দিকে। তবে লম্বা বলা যায় না। মাথায় বহুড়নি। প্যারিসেব একটা স্নোথো হোটেলের নিজেব হাতে রেখে খাবার দিন গেছে। সমস্ত বুজোঁয়া। অভিজাত বংশে বিবাহ। এ কি সোজা কথা। গরিবের ছেলেব ববাত বলতে হবে।

“চলুন, আমার স্ত্রীৰ সঙ্গে আলাপ কবিগে দিই।” ঘোষাল তাঁর বন্ধকে তাঁর স্ত্রীৰ কাছে নিয়ে যান। কাউন্টেন্স তখন শিউলির সঙ্গে কথা বলছিলেন।

ঘোষাল মল্লিকের ও মল্লিক ঘোষালের পরিচয় দেন। উজ্জ্বলিত ভাষায়। মহিষাব

হথাবীতি “পবম প্রীত হলুন আপনাকে দেখে” বলে দু’চারটি বাক্য বিনিময় করেন।

ঘোষাল মল্লিককে নিয়ে স্বস্থানে যাবে আসেন। ওদিকে অধ্যাপক কার সঙ্গে টেলিফোনে লেকচার শব্দ করে দিগেছেন ও তাঁর পরী রায়েব থানা তদাবক করছেন। মনে হয় আজ এ বাঙালীতে ডিনার ও ঘোষালবা নিমন্ত্রিত অতিথি।

কথা বলতে বলতে বোঝা গেল যে, এঁরা ভারতের স্বাধীনতার অপেক্ষায় ছিলেন। স্বাধীন ভারতের রূপ দর্শন করতে এসেছেন। বথ দেশার সঙ্গে কলা বেচাও আছে। ঘোষাল সুইজারল্যান্ডের এক প্রখ্যাত ঔষজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হবে সম্ভবী স্টেট ইন্টার্নে উঠেছেন। ইতিমধ্যে জন্মস্থান ঘুরে আসা হয়েছে। সেটা এখন পাকিস্তানের সামিল। আরো দু’তিন দিন কলকাতায় অবস্থান। তারপর মাদ্রাজ, বম্বে, নিম্নী হয়ে সুইজারল্যান্ডে প্রত্যাভর্ন। হাঁ, বিমানযোগে।

চমৎকার একটি সাকসেস স্টোরি। না? আসলে কিন্তু তা নয়। ঘোষালই আপনা হতে তাঁব পদ্রাতন বন্ধকে তাঁব জীবনের কথা বলেন।

“দেখলেন তো আমাব স্ত্রীকে। কেমন লাগল, বলুন।” এইভাবে আবম্ভ হয়।

দীর্ঘাণী তম্বাী সুগঠিতা, কিন্তু সুললিতা বলা চলে না। সুন্দরী, কিন্তু সুন্দরী বললে বেশী বলা হয়। কাউন্টেন্স এ ক্ষেত্রে কাউন্টকন্যা। কাউন্টের যদি সাতটি কন্যা থাকে সকলেই কাউন্টেন্স। তা হলেও কাউন্টকন্যা তো বটে। কোন্ বাঙালীর ভগ্যে কবে একজন কাউন্টকন্যা লাভ হয়েছে!

“আপনি একজন সৌভাগ্যবান পুরুষ। আপনার সৌভাগ্যেব জন্যে আপনাকে আমি অভিনন্দন করি। ঘোষাল, ইউ ডিড ইট। ইউ ডিড ইট। ইউ ডিড ইট।” মল্লিক ফুঁটি করে বলেন ও আঁব এক দফা করমর্দন করেন।

“সৌভাগ্য আর দুর্ভাগ্য একই মূদ্রাব এঁপঠ ওঁপঠ, তাই মল্লিক। আপনি শব্দে, একটা পিঠই দেখছেন। চাঁদেরও উল্টো পিঠ আছে।” তিনি কিসেব ইণ্ণিত দেন কে জানে।

“তাই নাকি!” মল্লিক কৌতুহলী হন। সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভাষিত।

“আমাব দুই বিয়ে।” বলেই ঘোষাল চুপ করে যান।

“আঁ। দুই বিয়ে।” মল্লিক প্রায় লাফ দিয়ে ওঠেন আঁব কী। ধরে নেন যে এই লোকটা দেশেও একটি বিয়ে কবে রেখে যায়। সৈদিন বোধহয় তাঁকেই দেখতে মেহেরপুঁব হাওয়া হয়েছিল। ছি ছি! কাউন্টকন্যাকে এমন কবে ঠকানো!

“আমাব দুই বিয়ে, কিন্তু একট ‘বী।’ ঘোষাল ভেঙে বলেন। আঁব মূঢ়কি হসেন। বেমন ভবব হয়েছেন ম লক!

“একই বোঁ! সে কেমন করে হয়!” ওঃ হিন্দু মতেও আরেকবার বিয়ে করেছেন আপনাবা। বুঝেছি।” মল্লিক আশ্চর্য হয়ে স্থির ভাবে বলেন।

“না। ওই একই মতে। আমার স্ত্রী বোমান ক্যাথলিক। আমি অবশ্য হিন্দুই বয়ে গেছি, কিন্তু ওঁকে হিন্দু করিনি। করা অনায়া। বাব যেটা ধর্ম।” ঘোষাল আরো ঘোষালো কবেন।

“আমি এ রহস্য ভেদ করতে পারবনুন না, ভাই ঘোষাল। একই নাবীকে একই মতে দু’দু’বার বিয়ে কবা আমার কাছে একটি প্রহেলিকা।” মল্লিক স্বীকাব করেন।

“তা হলে শুনুন সবটা।” ঘোষালের গোরচান্দ্রকা শেষ হয়।

(৩)

প্যারিসের এম ডি হয়ে ঘোষাল দেশে ফিরে আসতেই চেরোঁছিলেন দেশেব জন্যে ঘন কেমন কবাঁছিল। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানতে পান যে, প্যারিসের ডিগ্রীকে ভারত সরকার ও তাঁদের অধীন অন্যান্য সরকার। অমনি স্বীকৃতি দেবেন না। ইংলান্ডে গিয়ে আবার পরীক্ষা দিতে হবে। সে রসদ তাঁব নেই।

বেখানে দনাপানি সেখানেই যেতে হয় মানুসকে। তাঁর অদৃষ্ট তাঁকে ইংলান্ডে নিয়ে যায়। দীর্ঘকাল সংগ্রামের পর তিনি সেখানেই স্থিতি পান। দেশে ফিরে আসার সংকল্প ত্যাগ করতে হয়। তিনি চাইলেও তাঁর পেসেন্টরা তাঁকে ছাড়তেন না।

তাঁব পেসেন্টদের মধ্যে ছিলেন এক অস্ট্রিয়ান কাউন্ট। অস্ট্রিয়া হাংগেরি যখন ছয়ভাগ হয় ও রাজতন্ত্রেব দিন যায় তখন অভিজাতদেরও ভাগ্যাবপর্ষ ঘটতে। এই পরিবারটির বেলজিয়ামে কিছু ভূসম্পত্তি ছিল, সেই বাদশাহী আমল থেকে। এঁরা প্রথমে বেলজিয়ামে চলে আসেন। পরে গ্রামের সম্পত্তি বিক্রী করে সেই টাকা পৈশে বর্ণিজ্ঞা নিয়োগ কবেন। কেবল বেলজিয়ামে নয়, তাঁর আশেপাশে যেখানে বাস সুবিধে। এঁবিবাব পিতামাতা আমস্ট বডায়ে বসবাস করেন। ভাইবোন মিলে চাবজন।

এখনি কয়েক ঘর বনেদী পেসেন্ট থাকায় ঘোষালের সামাজিক মর্যাদা বড় হয়। তাঁব সঙ্গে সঙ্গতি বেখে জীবনযাত্রা যানও বাড়ে। লক্ষ্মীও মূখ তুলে তাকান। তা সত্ত্বেও তাঁব পবিগয় পরিকল্পনা ছিল না। দেশে ফিরে এসে একা কোনো একম পসার জমিয়ে তুলতে পারতেন না। বিশেষ করে বোঁ যদি হন ওদেশের মেয়ে। স্ত্রীর খতিরে বিদেশেই জীবনপাত করতে হবে, এতে তাঁর অন্তর সায় দিত না।

অবিবাহিতই রয়ে যেতেন ঘোষাল। অনিদিষ্টকাল। কিন্তু প্রেমের ফাঁস শাভা ভুবনে। কাউন্ট প্যারিসেব সঙ্গে তিনিও একবার অস্ট্রিয়াব টিরেল অঞ্চল উইন্টার স্পোর্টসে বন এখনি দুর্ভাগ্য যে কাউন্ট খেলতে গিয়ে ত্রথম হন। আমস্টারডামে

শ্রমশাস্ত্রিত হলেও তখন থেকে তিনি ইনভ্যালিড। মেরুদেব একজনের বিবেক হতোইল ইংলণ্ডে, আরেকজনের বাকী ছিল। এম্বিকার বিবেক যত ডাডাতাড়ি হয় তত ভাগ্যে। আর বত কাছাকাছি হয় তত ভাগ্যে। ঘোষাল ইতিমধ্যে পারিবারিক দম্ভত পথায় উন্নীত হইছিলে। তার পরামর্শ চাইলে তিনিও সেই পরামর্শ দেন।

কিন্তু পাত্র কে ধায়? অস্ট্রিয়ান আভ-
ধ্যাতও হবে, আমস্টারডামেও থাকবে। তখ
নেহাং ধরজামাই হবে না। এমন যোগাযোগই
না কোথায়? কাউন্টের মনের অবস্থা দিন
দিন খারাপ হয়, তার থেকে দেহের অবস্থা
অবো খারাপ হয়। ঘোষালকে না হলে ও'ব
চলে না। অথচ ডাক্তারের ফী দিতে গেলে
ফতুর হতে হয়।

ইতিমধ্যে সহদেবের উপর এম্বিকার ও
এরিকার উপর সহদেবের আকর্ষণ জন্মে-
ছিল। এরিকার মা এটা লক্ষ করেছিলেন,
কিন্তু অনুরোধন করতে অসম্মত ছিলেন।
আপত্তিটা বর্ণগত নয়, প্রণয়গত। সহদেব
তার নিজের দেশে ব্রাহ্মণ হতে পাবেন,
ব্রাহ্মণরা বর্ণশ্রেষ্ঠ হতে পাবে, কিন্তু
অস্ট্রিয়ার নীল রক্ত তার শরীরে নেই। সেই
ধারা নীল ড্যানিউব নৃত্য করতেন তাঁদের
একজনের দৌহিত্রীর এহেন বর কল্পনা-
তীত। এ তো বর নয়, এ শাপ।

ওদিকে অস্ট্রিয়ান যখন জার্মানীর সান্নিধ্য
হয়ে যায় তখন কাউন্ট পবিবারের হাড়ে চোট
লাগে। ফরে যাবার পথ বন্ধ। ফিবে
গেলে, ফিবে আসার পথ বন্ধ। বন্ধ যে
কেলোদিন বেধে যেতে পারে। বন্ধে তারা
জার্মান সিটিজেন হতে চান না। তা যদি
হন তবে হল্যান্ড বা বেলজিয়ামে হবেন
এনিমি এলিয়েন। পক্ষান্তরে যদি ডাচ
কিবে: বেলজিয়ান সিটিজেন হন তা হলে
অস্ট্রিয়ার বাসভূমিতে হবেন এনিমি এলি-
য়েন। আব বন্ধ একবার বাধলে তার
ফলাফল কী হবে কে জানে। কাউন্টের
ভালোমন্দ হলে এরিকা কি নিরাপদ থাক-
বেন?

এই যখন পরিস্থিতি তখন এম্বিকা তাঁর
মাকে গিয়ে বলেন যে সহদেব ছাড়া আর
কাউকে তাঁর মনে ধরে না। বিয়ের অনুরোধ
না পেলে তিনি নাস' হয়ে বন্ধে আহতদের
শত্রুতা কববেন। নেটা আরো ভয়ঙ্কর
প্রস্তাব, তার চেয়ে কঙ্গ ভয়ঙ্কর সহদেবের
প্রস্তাব, যদি তেমন কোনো প্রস্তাব সহদেব
করেন। সহদেবও ইতিমধ্যে মনঃস্থির করে
ছিলেন। তিনি হাডের লক্ষ্য পায় চেল-
বেন না। এরিকাকেই গহলক্ষ্যী কববেন,
যদি কাউন্ট পবিবারের সম্মতি পান। বলা
বাহুল্য এম্বিকার নিজের সম্মতি যে পাবেন
এটা তিনি জানতেন।

শুভকর্ম সকলের শুভেচ্ছা স্বপ্নে
সমাশ হব। সহদেব ও এরিকা আশাতীত
শুখী হন। বছর খানেক বাদে একটি কন্যা-
সুন্তান এসে তাদের সম্মেলন বাসনা পবিপূর্ণ
করব।

ওদিকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি
পেকে ওঠে। হিটলারের সৈন্য পোল্যান্ডের
উপর আর্পিয়ে পড়ে। দেখতে দেখতে বন্ধে
নামে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশ। হল্যান্ড,
বেলজিয়াম আক্রান্ত হয়। পদানত হয়।
অতটা কিন্তু কাউন্ট পরিবার আশঙ্কা
করেননি। তাই পরামর্শের ব্যবস্থা করে
রাখেননি। নাৎসীদের কাছে মাথা হেঁট না
করে উপায় থাকে না। কাউন্টকেও চিংকাব
কবে বলতে হয়, 'হাইল হিটলার!'

ঘোষাল তখনো ব্রিটিশ সাবজেক্ট। ডাচ
সিটিজেন হলেও যে ইতরবিশেষ হতো তা
নয়। কারণ ডাচদের মধ্যে যারা স্বাধীনচেতা
তাদের উপরেও বিবিন্বেষ আবেগ করা
হয়। কিন্তু ঘোষালকে তাঁদের মতো নজর-
বন্দী না কবে সোজাসুজি কনসেন্ট্রেশন
ক্যাম্পে নিয়ে যায় জার্মানরা। সেখানে তাঁর
উপর নিম্নমভাবে অত্যাচার চলার। তিনি
যখন স্মরণ কবিয়ে দেন যে তিনি একজন
ব্রিটিশ সাবজেক্ট হলেও ভাবতাই আব
ভাবতাই নেতাবা এই বন্ধে অসহযোগী
তখন অত্যাচারের মাত্রা কমে না। বং
আরো বাড়ে। বামন হয়ে চড়ে হাত। কাল
আদ্যমি হয়ে কাউন্টকে বিয়ে। এর চেয়ে
ইংরেজ হয়ে থাকলে 'ক্ষমা' ছিল। জার্মানরা
ইংরেজদের সঙ্গে অতটা দূর্ব্যবহার করত
না। জানত যে বন্ধে হারজিৎ আছে।
ইংরেজরাও একদিন প্রতিশোধ নেবে যদি
জেতে। কিন্তু ভারতীয়রা তো গোলাম,
তারা কি কেনোদিন শোষণ নিতে পারবে?

ইংল্যান্ডে আইন অনুসারে ব্রিটিশ সাব-
জেক্টের স্ত্রীও ব্রিটিশ সাবজেক্ট। সুতরাং
এরিকাও তাই। নাৎসীরা ইচ্ছা কবলে
তাঁকেও জ্বালাডন করতে পাকত, কিন্তু সে
সাহস তাদের হয়নি। খোদ হিটলারের
দেশের মেয়ে। আব কতকালের অভিজাত।
তার স্বামীর উপর অত্যাচারের প্রতিবাদ
করতে গেলে তাঁকে বলা হয়, কে কব
স্বামী, কে কব স্ত্রী। সাদা কালো
স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক স্বীকার কবা হবে না।
ও বিয়ে গিমেই নয়। তা হলে কী? এম্বিকা
রাগে লাল হয়ে যান। তিনি কি তবে
গন্ধিতা? তাঁর মেয়ে কি তবে জারজ?

তাঁর উপর অনববত চাপ দেওয়া হয়
'ডিভোর্স' কবতে। তিনি বলেন, "না।
ডিভোর্সের কোনো গ্রাউন্ড নেই।" তাছাড়া
তার রোমান ব্যাথলিক সংস্কারে বাধে।
এদিকে ঘোষালের কানে মন্ত্র দেওয়া হয়,
ভারতীয়রা তো জার্মানদের শত্রু নন,
অত্যাচারের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে বাবে, তিনি
যদি একটি কাজ কবেন। যদি তালুক দেন।
ঘোষাল সে মন্ত্রণা ধূগাভরে প্রত্যাখ্যান
কবেন। বলেন, 'সত্যিকার আমার' তো
আমরাই। ওই যে স্বাধীনতা ওটাও তো
আমাদের প্রভাবী। আর' কথাটা এসেছে
আমাদের ভাষা থেকে। আমরা শিল
আমার নোড়া আমারি ডাঙে দাঁড়ের
গেড়া।'

এম্বিকাকে ওরা সরিয়ে দেবার চেষ্টা
কবে। পাবে না। ভব দেখিয়েও ফল হয়

না। তিনি অবতোভব। নিজের জন্যে ভব
না থাকলেও স্বামীর জন্যে ভব তাঁর ছিল।
স্বামীকে যদি ফাফাং স্কোরাডের সামনে
দাঁড় কবিয়ে গুলী কবে মাঝে তা হলে
কোন স্বর্ষ সেটা সহ্য হবে! ঘোষালের
বিবৃদ্ধে সাক্ষীপ্রমাণ জোগাড় কবা চল-
ছিল, ডাক্তার হিসাবে তিনি তাঁর ঘেসব
বুগীর প্রাণ বন্ধা কবতে পারেন তাদের
নাকি তিনি ইচ্ছে করে মেরেছেন। কালী
কাছে নববলি দেওয়া, বিশ্ববাকে জীবন্ত দাহ
কবা এই যাঁব ঐতিহ্য তিনি যে ইচ্ছে করাই
মেরেছেন এটা তো স্বভঃসিদ্ধ।

এরিকাকে সহদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ
করতে দেওয়া হতো। সব দিক বিবেচনা
কবে স্বামী-স্ত্রী শেবকালে এই সিদ্ধান্ত
নেন যে আইনের চোখে তারা স্বামী-স্ত্রী
থাকবেন না কিন্তু ভগবানের চোখে
থাকবেন। যতদিন জীবন। সেই জীবনটাই
যাতে নাৎসীদের ফুৎকায়ে নিবে না যায়
তার জন্যে ডিভোর্সের আবেদন করতে হবে।
একদিক থেকে ওটা একটা পরাজয়। কিন্তু
কুকুরের মতো বদনাম নিবে ফাঁসি বাওয়া
কি আরেকদিক থেকে নিবৃত্তিতা নয়?
বেঁচে থাকলে পরে আবার বিবে করা হবে।
নাৎসীরা তো চিরন্তন নয়। জাতি হিসাবে
জার্মানরাও অবনয় নয়। পাচ বছর বাদে,
দশ বছর বাদে বিয়ে আবার হবেই, পালিয়ে
গিয়েও হতে পারে। অবশ্য পবম্পন্দের প্রতি
বিশ্বস্ত থাকা চাই। সেইটাই আসল।

প্রেমের দাবের চেয়ে প্রাণের দারাই
বড়ো, নাৎসীরা যেন এইটুকুই চেয়েছিল।
প্রাণের দাব প্রেমিক-প্রেমিকাও অকারণে
বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে পারে। আবসাড
আব কাকে বলে। জীবনটাই যেন
আবসাড। নাৎসীবাদের মর্মকথা প্রেম-ক্ষেম
বঞ্চে, মহত্ব দল কিছু নেই, কেউ কারো
জনো ত্যাগ করে না। ঘোষালের উপর
অত্যাচার বধ হয়, কিন্তু এরিকাকে প্রলোভন
দেখানো হয় ঘোষালের শূন্যস্থান পূর্ণ
করতে। নাৎসীদের মধ্যে কি সুপুরুষ বা
সুপাত্র নেই? বিয়ে না হতে পারে, ইয়ে
হবে না কেন?

প্রাণের দার প্রেমের অমরদার প্লানি
ঘোষালকে তিলে তিলে দম্ব করে। নাৎসীরা
তার মনে দৃষ্টাবনার পোকা ঢুকিয়ে দেয়
যে এম্বিকা এখন আবার বিবে কববেন।
এবার স্বপ্রেমীতে না হোক স্ববর্ণে। তালুক
যখন হয়ে গেছে তখন আব দেখা সাক্ষাতের
অনুমতি চাওয়া কেন? আব দেখা হয় না।
তবে দুটি-একটি বন্ধুত্বাপন্ন নাৎসীও
তো ছিল। ওবাই খবরাখবর কয়ে আনত ও
ববে নিবে যেত। ওরাই আশ্বাস দিত যে
এম্বিকা তাঁর জন্যে অনন্তকাল প্রতীক্ষা
করবেন। তিনি যেন ধৈর্য ধরেন ও শান্ত
হন।

(৪)

কী নিদাশ্রু অভিজ্ঞতা! মন্তব্য
কবন গিলক। "অপনার স্ত্রীর চেহারা

সংসারী হলে গেছে। আপনার বেলা কিন্তু হাঁসের গিঠে জল।”

“তার জন্যে,” ঘোষাল হাত বোড় করে বলেন, “আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।”

“আমার কাছে!” মল্লিক বেন আকাশ থেকে পড়েন।

“আপনার দেওয়া বইখানি আমাকে নাৎসীদের ক্যাম্পে নিত্য প্রেরণা জোগায়। বাঁচবার প্রেরণা, ভালোবাসার প্রেরণা। ভালোবাসার উপর বিশ্বাস রাখবার প্রেরণা। আর তো কোনো বই আমার কাছে ছিল না।” ঘোষাল দু-চারটি লাইন আবৃত্তি করে স্মরণশক্তি প্রমাণ দেন।

মল্লিক বেন বিস্মিত তেমন প্রীত, তেমন লজ্জিত। “কী যা তা লিখেছিলুম কাঁচা বরষে। এখন ওসব আমি নিজেই কিবানি করব। এখন আমি পরিপক্ব হয়েছি বো!”

ঘোষালের কাঁহানী শেষ হয়ে এসেছিল। তিনি বাকীটুকু শোনান।

নাৎসীরা হেরে যায়। ক্যাম্পে নিত্য প্রেরণা জোগায়। বাঁচবার প্রেরণা, ভালোবাসার প্রেরণা। ভালোবাসার উপর বিশ্বাস রাখবার প্রেরণা। আর তো কোনো বই আমার কাছে ছিল না।” ঘোষাল দু-চারটি লাইন আবৃত্তি করে স্মরণশক্তি প্রমাণ দেন।

আরেকটি বন্দী। বড় মেরেট ইংল্যান্ড নিয়াপদে আছেন। আর এরিকা কন্যাকে গিয়ে আমস্টারডামেব শহরতলীতে বাস করছেন। মহিলাদেব জনো পোশাক তৈরি করে যা পান তাই দিয়ে সংসার চালান। সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর। পিনলোপির মতো তিনি তার পাণিত্রাধীদেব কৌশলে ঠিকিয়ে রেখেছেন। কাউকেই ধরাছোঁয়া দেননি।

শ্রীতীর্থবার বিবাহের পথ এরিকা ও সহস্রের সুইজারল্যান্ডে হানিমুনে করতে গিয়ে স্থির করেন যে, ইংল্যান্ডে আর ফিরবেন না। সেসব স্মৃতির হাত থেকে পরিত্রাণ চাই। নইলে অসুস্থ মন নিয়ে আরেক্ষর হবে। সুইজারল্যান্ডেও এরিকা-দের কিছু সম্পত্তি ছিল। আত্মীয়তা ছিল। আরেব একটা পল্লী খুলে বাস। মেরেকে বোডিং স্কুলে দেওয়া হয়।

ওদিকে মল্লিকজারার বার বাব টেলিগ্রাফ করছিলেন যে ওঠাবার সময় পার হয় বাচ্ছে। খাবার টেবিলে চারজনের জন্যেই ঠাই করা হচ্ছিল। বাকী দুজন ফালতো। সময়ে সরে না পড়লে কড়া গিল্লী বিবৃত্ত হবেন।

“তা হলে, ঘোষাল”, মল্লিক তাঁর হাত হাত মেখে বলেন, “জীবনটাকে নিয়ে একা-দোকা খেলে গেলেন? একই বো, দুইবার হানিমুনে? শুনেন ঈর্ষা হব।”

“এমন দুর্যোগ যেন আর কারো না

হব, এই আমার প্রার্থনা।” ঘোষাল বার বার ঝাঁকানি দেন। “মল্লিক, আপনার কাছে আমি চিরদিন মনে রাখব। কী ভাগ্য অর্জন দেখা হয়ে গেল নইলে মনের কথা মনেই বসে বেত। বলা হতো না।”

এরপর থানবার দৃষ্টিভর কল্প থেকে বিদায় ও তাঁদের বিদেশযাত্রা বেন শূন্য হর এই কামনা নিবেদন।

“পুনর্দর্শনার চ। পুনর্দর্শনার চ।” অধ্যাপক দুজনকে বলেন। “আমেরিকা থেকে ফিরে আসি, তারপর একদিন আপনাদের নিমন্ত্রণ কল্পে গল্প করব ও গল্প শুনব। মর্শিদাবাদে বেশীদিন থাকতে হবে না আশা করি।”

“কী কবে বলব! ওটা এখন আমাদের সীমান্ত অঞ্চল। উপদ্রব লগেই আছে। সেইজন্যেই তো আমাকে পাঠানো। বুদ্ধিমান বোড়া আমি, যুদ্ধের গল্প পেরে উঠান। কিন্তু তার আগে আমি শান্তির জন্যে প্রাণপণ করব।” মল্লিক অনামনস্ক হন।

মোটবে উঠ শিউলি বদেন, “ঈর্ষা কথায় কী বলছিলেন? বন্ধুর ভাগ্য কাউন্টস বলে তোমার ঈর্ষা হচ্ছে না তো।”

“কী শুনতে কী শুনছে।” মল্লিকের তব কানে কানে বলেন, “একই বন্ধু সঙ্গ দুইবার হানিমুনে শনে কার না চঞ্চ। হয় তা বলে যাকখনকাল বিবাহভঙ্গ কি ঈর্ষার যোগ্য? কী করণ কাঁহানী।”

ছুটিতে বেড়ানোর এই তো সময়!
জীবন চিত্তাহীন অনাবিল
আনন্দে আর খুশির আমেজে
আকাশ যাতায় ভরে উঠছে...
আর আমি এ সি বিমাত
আপনাকে নিয়ে আকাশের
নীলিমায় ডাটা মেলায় জন্যে
প্রতীক্ষা করছে। আমরাই তো
এই বিশাল দেশের বিভিন্ন অঞ্চল
ও মানুষের মধ্যে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি
যোগাযোগ রচনা করছি।



ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস্

৩৯, চিত্তরঙ্গম এভিনিউ, কলিকাতা-১২



তারপর হল একটি হাস্যরসপ্রধান ছোট নাট্যকার অভিনয়। নাট্যকাটি এখান-কাবই একজন উদীয়মান লেখকের লেখা। নাটকের নাম 'রং-তুফান'। একটি মেয়েকে নিয়ে তিনটি ছোকরার নানারকম ক্যাব-ল্যামি। এতেই খুব হাসির রোল উঠল সভায়।

তারপর আবার আধুনিক গান। গাইলে একটি ছোট্ট মেয়ে। বেহালায় সঙ্গ। কিছু শোনা গেল না।

তারপর আবৃত্তি হল—রবীন্দ্রনাথের 'বিজয়িনী'। 'আচ্ছাদ সবসী নীরে' বলেই থেমে গেল ছোটটি। উইসেব দিকে চাইতে লাগল। প্রমটাবেব কথা শুনতে পারিছিল না সে। বার বার থেমে অবশেষে একেবারেই

একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বনফুল

বৃক্ষ পূর্ণিমাকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর এই শহরে একটি উৎসব হয়। সে উৎসবের প্রধান অঙ্গ নাচ-গান। শহরের ছেলে-মেয়েদের মধ্যেই কেউ গান গায়, কেউ আবৃত্তি করে, কেউ সেতার বা এপ্রাক্স বাজায়। দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের ছোট গানও কারও মুখস্থ নেই। হার্মোনিয়ামের উপর 'গীত বিতান' রেখে গান করেন গায়ক-গায়িকা। আবৃত্তি প্রায়ই নিভুল হয় না। হাফপ্যান্ট-পরা বৃক্ষ-শার্ট-গনরে বাঙালী ছেলেরা বৃক্ষ-বন্দনা করেন ফুল বাংলা উচ্চারণ করে। কিন্তু তাঁরা এটাব নাম দিয়েছেন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সুতরাং একজন সাহিত্যিক সভাপতি চাই। কোনও সিনেমা-স্টার গেলে অবশ্য তাঁরা সাহিত্যিককে বাদ দিতেন, কিন্তু কোনও সিনেমা-স্টারের নাগাল পাওয়া সম্ভব নয় এদের পক্ষে। সাহিত্যিকের নাগাল পাওয়াও শক্ত। কেউ আসতে চান না—মুফস্বলের এই শহরে বৈশাখের প্রচণ্ড গরমে। আমরা নিজেই টানাটানি করেন এরা প্রতিবার। সেবার কিন্তু আমি নিস্তার পেয়ে গেলাম। আমার মাস্টারমশাই সেবার এসেছিলেন আমার কাছে। তিনি ইতিহাসেব একজন প্রকাণ্ড পন্ডিত। তাঁকেই অনুবোধ কবলাম সভাপতিত্ব করতে। তিনি প্রথমে বাঞ্ছিত হতে চান নি। বললেন—আমি তো ওসব করিনি কোনদিন। পারব কি? তাছাড়া—আমার

আগ্রহাতিশয্যে রাজি হলেন তিনি শেষ পর্যন্ত।

সভা আরম্ভ হল সম্মান্য সম্মান। আবম্ভ হওয়ার কথা সাড়ে ছটাত্ত। হ'ল সাড়ে সাতটার পর। কাবল বিনি 'হিঙ্গোল উন্মত্ত পৃথিবী' গানটাব সঙ্গ নাচলেন—সেই ভদ্র-মহিলা—এখানকার সবজ্ঞবাবু'র শালী—ঠিক সময়ে এসে পৌঁছতে পারেন নি।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আরম্ভ হল। সেই উন্নতবন্ধা মহিলা টাইট পোষাক পরে দম্যদম্য করে নৃত্য করলেন খানিকক্ষণ স্টেজের উপর। দর্শকদের ভিতর 'সিটি' দিল দু একজন রসিক ছোকরা। নাচ শেষ হতেই তড়তড় করে হাততালি পড়ল। তারপর প্যান্টপরা এক ছোকরা বাঁশের বাঁশীতে বাজালেন রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত গানটি—'সৌদীন দুজনে ঝুলেছিন্দু বনে—ফুল-ডোবে বাঁধা ঝুলনা'। খুব হাততালি পড়ল। তারপর হল একটা কার্যকরচার। একজন বাঙালি'র সঙ্গে একজন মাড়োয়ারি'র ঝগড়া। আনন্দে হই-হই করে উঠল দর্শকবৃন্দ। ঘন ঘন 'সিটি' পড়তে লাগল।

এর পর একটা আধুনিক গান গাইলেন একটি বোকা মহিলা। খুব জমল না। তাব-পব জমল। সবজ্ঞবাবু'র শালীটি আব একটি নাচ নাচলেন—নমো হে নম এই গানটি'র সঙ্গে।

থেমে গেল ছোকরা এবং প্রস্থান করল দ্রুতপদে।

এতেও হই-হই হাসি উঠল।

তারপর সমবেত নৃত্য। চারটি ছেলে আর চারটি মেয়ে নানাবকম মূদ্রা দেখিয়ে দেখিয়ে বোকা লিকালিকে হাত পা নেড়ে বন বন করে ঘুরতে লাগল টেজটা জুড়ে। স্টেজেব গিছনে বৃক্ষদেবের একটা ছবি ছিল একটা ছোট টেবিলের উপর। নাচের ধমকে টেবিলটা পড়ে গেল। ছবির কাঁচ ভেঙে চূবমার।

এতেও তুমুল হাসি।

শেষকালে ঘোষক ঘোষণা করলেন। 'এইবার সভাপতি মহাশয় তাঁর ভাষণ দেবেন', মাস্টারমশাই স্টেজের উপর উঠে হাত-জোড় করে বললেন—তথপনারা যদি অনু-মতি করেন আমি বসে বসেই বলব। বেশী-ক্ষণ দাঁড়াতে পারি না, বরস হয়েছে—

তিনি একটি চেয়ারে বসে চোখ বুজে বলতে লাগলেন। তিনি চোখ বুজেই বক্তৃতা করলেন।

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আজ আমবা পৃথিবী'র অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বৃক্ষদেবের স্মৃতি-অচনা উপ-লক্ষে সামান্য কিছু আনন্দের আয়োজন করেছি। বৃক্ষদেবের সঙ্গে বাঙালী'র ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আমি এই ভাবেব বোধ বঙ্গদেশে যে সব বাঙালী কীর্তমান ছিলেন, তাঁদেরই

সামান্য অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করব। আমরা, বিশেষ করে বাঙালীরা আমাদের গোবিন্দর অতীত সম্বন্ধে উদাসীন। আমরা বর্তমানকে নিয়েই বড় বেশী ব্যস্ত। বর্তমান যুগের রাজনৈতিক নেতা, অভিনেতা-অভিনেত্রী, সাহিত্যিক শিল্পী নামে আমরা জানি, তাঁদের কুলপরিচয় ও হয়তো অনেকের কণ্ঠস্থ, কিন্তু নিজেদের বংশ-ইতিহাস জন্মবা জানি না। অতিবৃদ্ধ-প্রাপ্তময়র নাম করতে বললে অনেকেই হয়তো নীবব হয়ে যাবেন। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীরা যে প্রতিভা বাংলা-দেশকে গৌরবে শিখরে প্রতিষ্ঠিত করেছিল সে প্রতিভার সম্বন্ধেও আমরা উদাসীন। বামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, শ্রীরাম-কৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের মতো দুর্দান্তজন বিশ্বেবিখ্যাত লোকের নামমাত্রই আমরা জানি, তাঁদের সম্যক পরিচয় জানবাব আমাদের তত আগ্রহ নেই।

আমি আজ যে সব বাঙালীদের নাম করতে যাচ্ছি তাঁরা বহুকাল পূর্বে ভারতের বিদ্যুৎ সমাজে বাঙালীর কীর্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আমরা বাঙালীরা, তাঁদের পরিচয় লিপিবদ্ধ করে রাখি নি, তাঁদের অনেক বইয়ের মূল পাম্ফুলিপি পর্যন্ত পাওঁয়া যায় না। তিব্বতীয় বৌদ্ধ আচার-গণ বাংলা ও বিহারের বৌদ্ধ পণ্ডিতদের সহায়তায় অনেক গ্রন্থের তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করিয়েছিলেন তাঁর থেকেই আজ আমরা অনেক বাঙালী প্রতিভাধরের খবর পাই।

পাল রাজ্যে সকলেই বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁদের রাজত্বকালে যে সব বাঙালী পণ্ডিত ও সাহিত্যিকদের খবর পাওয়া যায় তাঁদের রচনা অধিকাংশই সংস্কৃত ভাষায় লেখা। বাংলা ভাষার তখন আঁত শৈশব।

পাল রাজাদের পূর্বেই সম্রাট অশোকের সময় বৌদ্ধ ধর্ম বাংলায় প্রভাব বিস্তার করে। এই সময়েই নারিক বাঙালী প্রতিভা সংস্কৃত-কাব্যে গোড়ী রীতির প্রবর্তন করেন। অনেকে মতে প্রাসঙ্গ্য চন্দ্র ব্যাকরণ-প্রণেতা চন্দ্রগোমিনও বাঙালী ছিলেন। তিনি বৌদ্ধও ছিলেন। তাঁর গ্রন্থ কাম্বীর, নেপাল, তিব্বত ও সিংহল স্বরূপে পড়ানো হত। এই কালে রচিত আর একটি বিশাল গ্রন্থের খবর খ্যাত আছে। সেটির নাম হস্তায়ুর্বেদ। চারি খণ্ডে ১৬০ অধ্যায়ে বিভক্ত এই বিরাট গ্রন্থে হস্তীদের মানবুপ ব্যাধির আলোচনা করা হয়েছে। অনেক ঐতিহাসিকের মতে এ গ্রন্থের রচয়িতা স্বর্ষি পালকায় বাঙালী ছিলেন। ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে তাঁর আশ্রয় ছিল।

প্রাসঙ্গ্য দার্শনিক গোড়পাদ, ইতিহাসে গোড়চার্য নামে অভিহিত হয়েছেন। অনেকে মতে ইনিও বাঙালী। এঁর বিচিত্র গোড়পাদকারিকা শব্দকরের পূর্বেই প্রচলিত বেদান্ত মতবাদ ও মাধ্যমিক শূন্যবাদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এঁর রচনাতে বৌদ্ধ প্রভাব লক্ষ্য করেছেন অনেকে।

পাল রাজাদের 'আমরা' বাঙালী প্রতিভার আরও অনেক পরিচয় আছে।

দেবপালের মন্ত্রী বাঙালী দত্তপাণি চতুর্দে পণ্ডিত ছিলেন। বাঙালী কৈদার মিশ্রও চতুর্বিদ্যাপরোধি পান করে বেদ আগর নীতি জ্যোতিষশাস্ত্রে যে পান্ডিত্যের পবিত্রতা দেখিয়েছিলেন তার বর্ণনা সে যুগের তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ হয়ে আছে।

অনেকে মনে করেন যুদ্রাক্ষস-প্রণেতা নাট্যকার বিশাখ দত্ত, অনর্ঘরাজবৈব কবি যুবারি, চন্দ্রকোণিক নাটকের কবি কেমীশ্বর, কাঁচকবচ কাব্য প্রণেতা নীতি-বর্মা এবং নৈষধ-চরিত রচয়িতা শ্রীহর্ষ—এঁরা সবাই বাঙালী ছিলেন। তথ্য এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে অনেক।

অভিনন্দ নামে আর একজন বাঙালী কবিও খবর আমরা পাই। এঁকে সবাই গোড়-অভিনন্দ বলত। ইনি অনেক বিখ্যাত শ্লোক রচনা করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন বিখ্যাত কাদম্বরী-কাব্য-সার এঁরই রচনা।

পাল যুগের আর একজন কীর্তমান বাঙালী কবি সখ্যাকর নন্দী। এঁর বিখ্যাত কাব্যের নাম 'রামচরিত'।—

দশনশাস্ত্রেও পাল যুগে আমরা একজন প্রসিদ্ধ বাঙালী পণ্ডিতের নাম পাই— তিনি হচ্ছেন ন্যায়কন্দলী প্রণেতা শ্রীধর ভট্ট। অনেকে মতে জিনেন্দ্রবুদ্ধি, মৈত্রেয়-রচিত, বিজয়মতি প্রভৃতি বিখ্যাত বৈদ্য-করণিক এবং অমরকোষের টিকাকার নৃসিংহচন্দ্রও বাঙালী।

বৈদ্যক শাস্ত্রেও সে যুগে কয়েকজন বাঙালী বিজ্ঞানীর অবিস্মরণীয় দান আছে। অনেকের মতে সুবিখ্যাত 'নিদান' গ্রন্থের প্রণেতা মাধব, চরক ও সুশ্রুতের টিকাকার চক্রপাণি দত্ত বাঙালী ছিলেন।

পাল রাজ্যের শেষভাগে আর একজন বৈদ্যক গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়— নৃসিংহের অথবা সুব পাল। এঁর বিখ্যাত গ্রন্থ দুটির নাম 'শব্দপ্রদীপ' ও 'বৃক্ষ-মূর্বেদ'। ওষধে লৌহের ব্যবহার সম্বন্ধেও ইনি 'লৌহপদ্ধতি' বা 'লৌহসর্বস্ব' নামে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। চিকিৎসা সঙ্গ সংগ্রহের লেখক বঙ্গসেনও বাঙালী ছিলেন—অনেক ঐতিহাসিক এই মত পোষণ করেন।

মীমাংসা গ্রন্থও বাঙালী যচনা করেছেন সে যুগে। ভবদেব ভট্টের 'তৌতাতিত-মত-তিলক' এর প্রমাণ।

উত্তর রাঢ় নিবাসী নাবাধণ বচনা করেছিলেন ছান্দোগ্য পরিশিষ্টের 'প্রকাশ' নামে টিকা। ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক বাঙালী অনেক গ্রন্থ লিখেছেন। ভবদেব ভট্টের 'প্রারম্ভিক প্রকাশ' এ বিষয়ে একখানি প্রাসঙ্গ্য গ্রন্থ।

জীমূতবাহন সম্ভবত এঁদেরই সম-সাময়িক, যদিও তাঁর সঠিক কাল এখনও নির্ণীত হয় নি।

জীমূতবাহন প্রণীত 'দায়ভাগ' এখনও বাঙালীর উত্তরাধিকার, স্রীধন প্রভৃতি নিন্দ্রণ করছে। জীমূতবাহনের মত

বাঙালী প্রতিভার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক।

এ যুগে বাঙালী প্রতিভা ও চর্চায় আর একটি বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাই সহজ-ধান বা সহজিয়া ধর্ম। সহজিয়া বৌদ্ধ-ধর্মের এক অপূর্ণ সাহিত্য আছে। তাই অধিকাংশই বাঙালীর রচিত। পালযুগে এই তাত্ত্বিক বৌদ্ধ সাহিত্য বাঙালী প্রতিভার একটি প্রকৃত নিদর্শন।

যদিও পাল যুগের কিছু আগে তবু এই প্রসঙ্গে শীলভদ্রের নাম উল্লেখযোগ্য। শান্তিদেব নামে দুজন এবং জৈতাব নামে দুজন বাঙালী বৌদ্ধ সাহিত্যিকের নামও ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। একজন জৈতাব দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের গুরু ছিলেন। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বাংলায় একজন শ্রেষ্ঠ ও জগৎবিখ্যাত পণ্ডিত—তাঁর লেখা অধিকাংশ গ্রন্থ বঙ্গবান সাধন বিষয়ে।

তিব্বতীয় কিংবদন্তী অনুসারে আরও অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থকার বাঙালী ছিলেন। তাঁদের নাম—দিবাকর চন্দ্র, কুমার চন্দ্র, কুমার বজ্র, দানশীল, পুতালি, নাগবর্ষা এবং প্রজ্ঞাবর্মন।

আজ বুদ্ধজয়ন্তী উপলক্ষে আমি পাল রাজাদের সমসাময়িক কিংবা পাল রাজাদের কিছু আগের বা পূর্বের সময়কার কয়েকজন প্রতিভাবান বাঙালীর সম্মান্য পরিচয় এই ভাবে আপনাদের বলসম— তাই কারণ বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে বাঙালী পাল রাজাদের চারশ বছর ধরে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। এই চাবশ বছরে বাংলায় ও বিহারে বৌদ্ধ ধর্মের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনও ঘটেছিল—বুদ্ধ ধর্মের সহজিয়া-রূপদান তাই একটি প্রমাণ। এই চাবশ বছরে বৌদ্ধ ধর্ম বাঙালী পাল রাজাদের উৎসাহে উত্তরে তিব্বতে ও নৃপুণ যবদ্বীপ, সুমাত্রা, মালয় প্রভৃতি প্রদেশে প্রভাব বিস্তার করেছিল। একজন ঐতিহাসিক বলেছেন—বাংলার পাল যুগে ভাবতে বৌদ্ধ ধর্মের শেষ রক্ষক 'হিন্দু' সমগ্র বৌদ্ধ জগতের শ্রেষ্ঠ সম্মানের আসন পেয়েছিলেন।..."

চোখ বুজে বলেই যাচ্ছিলেন তিনি ক্রমাগত। কিন্তু আমি অবস্থিত বোধ করছিলাম। কারণ সভার লেখকরা এবে একে উঠে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত এক আম ছাড়া 'হলে' আর কেউ ছিল না।

আমি তখন খেতে উঠে গিয়ে হান্টার-মশাইয়ের কানে কানে বললাম—'চলুন, এবার বাড়ি যাই। সবাই চলে' গেছে—"

"ও তাই নাকি—"

চোখ বুজে তিনি ফাঁকা 'হলটা' দিকে একবার চেয়ে দেখলেন। তার পর বললেন— "চল।"

এখন চণ্ডলা হাসেন। ছেলোদের সামনে কথা উঠলে লজ্জা পান। পুত্রবধূরা তুলতে গেলে তাড়া দিয়ে ওঠেন। পাবেন না নাতিনাদের সঙ্গে—

‘চণ্ডলা’ নাম কে দিয়েছিল দিদু? তুমি চণ্ডলা তে হিমালয় পর্বতও তাই।

ছিল রে, ছিল একদিন। বাপের-বাড়ি শব্দবাবুড়ি মাঠেব এপার আর ওপার। শব্দবাবুড়ির পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে মাঠ-পারে বাপের-বাড়ির দাঁড়ি তালগাছগুলো দেখতে পাওয়া যায়। স্বামী একটা জিনিষ মর্মে মর্মে বয়ে নিয়েছিলেন, সম্বন্ধ কাছাকাছি করতে নেই। পুত্রবধূদের তিনি দূর-দূরত্ব থেকে নিয়ে এসেছেন। ছেলোদের তাই বউ নিয়ে অমৃতত উদ্বেগ নেই।

চণ্ডলা তোলা-নাম, ডাক-নাম চুমকি। শব্দবাবুড়ি বাবে—বশর বর্তমান নেই, শাস্তি পালকি পাঠিয়েছেন। চুমকি কোথ? চুমকি কোথা? হিভবন বন্ধে পাত্তা নেই। আমতলা দিয়ে যাবার সময় একজনব মাথার টপাস করে আম পড়ল। কাঁচা আম এমনি এমনি পড়ে না—উপর দুখো তাকিয়ে দেখে, দোডাল ব উপর মেয়ে আরাম করে বসে বিনুকে আমের খোসা তুলে নুন সহযোগে তারিয়ে তারিয়ে খেছে।

কোথার উঠেছিল? পড়ে বাড়ি যে—নেমে আয়। চাপা গলহ বলতে হচ্ছে, শব্দবাবুড়ির বোয়রাগুলাব কানে না যায়। কিন্তু চুমকি নামবে বলে গাছের মাথার ওঠেন। এবং আম ছুঁতে মেরেছে, গাছে চড়ব কীটটা পাছে লোকের অবিদিত থেকে যায়।

ভবনাথ নিজের তখন হস্ত-দস্ত হরে এলেন : নেন্সে অ ব মা, পালকিতে এসে ওঠ। হি-হি, ওরা কী ভাবে বল তো!

চুমকি কালা হয়ে গেছে, শুনতে পায় না। হাতজোড় করছি বাপু, আর নেমে—



প্রজাপতি
মনোজবিন্দু

বাপ হয়ে ভবনাথ সত্যি সত্যি হাতজোড় কবলেন। কাল হলে গেছে চুম্বিক, দেখতে পার ন।

আচ্ছা, ভাবিনীকে গিয়ে বলছি। বুঝি তখন ঠেলা—

ভাবিনী অর্থাৎ হারিভাবিনী—ভবনাথের কনিষ্ঠ বোন। বিধবা, প্রচণ্ড দাবরাব। ভাবিনী বলে না লোকে—বাধিনী। ডকে বাধিনী-দিদি অথবা বাধিনী-পিশি। জ্বরে পড়ে তখন, জ্বরের তডসে কাল সারা রাত ডুল বকেছেন। তা সত্ত্বেও ইচ্ছাভেদে দ্বারে উঠে তাকে আমতলায় আসতে হল। এসে হুঙ্কার ছাড়লেন : নাম্বি কিন' বল—

তা বাধিনী হও বাই হও গাছের চড়ায় বতকল আছি—উঠে তে আসতে পারছ না। একটা আশ্রয় শেষ করে চুম্বিক নিশ্চিন্তে আবার একটা ছিড়ে নিল। বাধিনী চোখের সম্মুখে চুম্বিকই পরে এ জিনিষ—শুধুমাত্র চুম্বিক।

নরমে-গরমে অনেক চেষ্টাতেও নামানো গেল না। কাল রাত্রে ভাবিনীকে যে অবস্থা ঘটেছিল, ভবনাথ তাই কন্যার উপর আরোপ কবে সদার-বহাবাকে বললেন, বউ তোমাদের জ্ববে কোঁকাজে—কেমন করে পাঠাই? একশ-চার উঠেছিল কাল রাত্রে। বেরানকে ভুল করে বুঝিয়ে বেলো।

আপদ বিদায় হয়ে গেলে চুম্বিক ধীরে-সুস্থে নৈম একটা বড় জামবাটি হাতে রোগিণীর ঘরে ঢুকে গেল। আমতলায় উল্লেকনার পরে বাধিনী-পিশি নিঃসাড় চোখ বুজিয়েছিলেন। যেন কিছুই হয়নি, এমনভাবে চুম্বিক বলে, ওঠো পিশি! তর্ক-হক-টাকিক করতে হয় তো কবে নাও। অসুখের মধ্যে বেশি কি আর—বার কতক নমো নমো করে গেলেই হবে।

পিশি তডাক কবে বিছানার উঠে বসলেন : বাট মারব তেঁকে হারামজাদী—

চুম্বিক অকৃতোভার বলে, তা মেবো পিশি। রাস্তার থেকে লম্বনে অচ্ছ, খেবে আগে বল করে নাও। যত খুশি মেরো তখন।

আসন পেতে জমবাটি দিয়েছে সামনে, কলস থেকে জল গড়াচ্ছে। বাটির দিকে তাকিয়ে দেখে পিশি রাগ জড়িয়ে গেল—জামবাটি ভরতি চিড়ে নাথকেকোরা নলেন-গড়ু তব মতমানকলা।

তব্দ সন্ধ্যাচ ভবে জিজ্ঞাস করেন : এত বড় জ্বরের উপর খাবো নলেনগড়ু?

খাও না, কে দেখছে? তাড়াতাড়ি মেখে ফেল, দেখলেও কেউ টের পবে না।

এই জন্যেই ভাইঝিটি এত প্রিয় পিশিমার।

দুরোর দিয়ে পথ সেবন করতে করতে পিশি কোমল কণ্ঠে বললেন, এত বুখি ধরিস, তবে এই কেলেকারি কাশ্ড কেন করলি বল দিকি? পার্লিক ফেবত গেল, শাশুড়ি তোর কি ভাবছে।

চুম্বিক বলে, গাটিনুটি হয়ে পার্লিকর মধ্যে বসা যায় কখনো? তুমিই বলো না পিশি। এইটুকু পথ গিয়ে তাবপরে তিন

সুয়ে ওঠো পিশি, মাঠ ভেঙে একছুটে একদিন গিয়ে হারিঙ্গ হবো।

বাধিনী-পিশি বুঝিয়ে বলেন, ঘরেব কউ বুখি মাঠে ছুটোছুটি করে! লোকে দেখে কি বলবে?

তব্ব বুখি বিধান নেই ঘরের বউয়ের কাছে! বলে, রাস্তায় চলে যাব, কে দেখছে! গিয়ে বলব, নাম্বি দিয়ে পার্লিক-কোরা সঙ্গ সঙ্গ চলে গেছে।

এ হল বিরের পবে। বিরের আগেও বিস্তার কীর্তি আছে। মোক্ষম একটা বল।

চুম্বিকর বাপ ভবনাথের সুন্দরবনে চাৰ্কা। ফরেস্টার তিনি। সুন্দরবন সে আমলে বনি বিশেষ। মধু, সুন্দার ও গরান কাচ, হরিণের চামড়া, ঘর হওয়ার গোলপাতা—এবং উপবি-পাণ্ডার লেখাজোখা নেই।

গভনমেন্ট যদি বলতেন, মাইনে এক পরসাত দেবো না উল্টে বছর বছর সেলামি দিয়ে যেত হ'বে, ফরেস্টারের অভাব হত না তব্দ। ফলে সুভালাভালি চাকরির মেবাদ শেষ হয়ে রিদার করলেন, এ অবস্থা ফরেস্টারের বড় এল্টা আসে না। পু-চার বছর—খুব ঘাগি হলেন তো আট-দশ বছরে চাকরি খতম। তব্বই মধ্যে কাজ গোছানো হয়ে গেছে—বাকি জীবনে এবং পরবর্তী দু-এক পদবুঝে কারো অর চাকরি খেতে হবে না।

ভবনাথেরও তাই। বরখাস্ত হয়ে বাড়ি এসে উঠেছেন। ইট পুড়িয়ে দালান-কেঠা দেবার তালে আছেন। চুম্বিকর জন্য ভাল জল সম্বন্ধ আসছে—একটা তার মধ্যে প্রায় কিকটাক। মেয়ে নেষে পছন্দ করে গেছে ডাবা, দেনাপাণ্ডার ব্যাপারেও রাজি। ছেলে ছেলার পড়ে, সুদর্শন। জেঠা চাকরি সুত্রে মাত্রাজ থাকেন, বড়দিনের খুশে লম্বা ছুটি নিয়ে আসছেন, তিনি উপস্থিত থেকে বিশেষ নিয়ে যাবেন। বিশেষ মাস দিন স্থিথ হয়ে থাকে।

হাতে মস দুয়েকের মতন সময়—চুম্বিক পতএব জন্মব শোখ কুমারীপনা সেবে নিচ্ছে। সে বড় চাটখানি কথা নয়—জল-ম্বল-অন্তরীক্ষ (ঘরের-চাল গাছের-মথা অন্তরীক্ষ বলবেন, তো?) তোলপাড়। বনের উপব পদবানো রাগ, তাড়াতাড়ি শোখ নিয়ে 'নছে—বউ হ'বে অনার চলে গেলে তারপরে আর ঘটে উঠবে না।

তের্ন একজন হল তপন। এককালে পুব জমিয়ে নিয়োছিল। হাই-ইস্কুলে পড়ত, সেট 'চুম্বিকদেব গায়ে। পড়ত মামাব বাড়ি থেকে—মামা ভবনাথেরই জ্ঞাতগোষ্ঠীর মধ্যে পড়েন। দেখা হলেই পুজনে কী বগড়া। ম্বস্কা কি তেঙ্ক?—চুম্বিক যদি চিল ছুড়ল, তপন থাপপ কষিয়ে দিল ছুটে গিয়ে। বাধিনী-পিশি বকাবকা কবতেন, হাসতেনও আবার মূখ টিপে। বরস কম, শব্দ মূখের মালিগালাজে পুরো সুখ ওরা কেমন করে পাবে?

কলেজে পড়বার জন্য তপন শহরে চলে গেল, সেই সময়টা ছাড়াছাড়ি। পাশটাশ করে কিবেছে আবার। এবং মামাব-বাড়ি থেকে ছেলে বরসের সেট ইস্কুলেই মাস্টার

কবছে আপাতত। পুরানো বিরোধ সঙ্গ সঙ্গো ঝালিয়ে নিচ্ছে, কিন্তু বিপদ হয়েছে চুম্বিক এখন বীরতমত সোমন্ত। ঠেঙানি পাছের কখা—চুল ধরে কি কান ধবে দানা, তাড়তও মামা বকে ওঠেন : ছিঃ, বরস হব'ন তোর, লেখাপড়া শিখিসনি?

তপন বিপদভাবে বলে, সে যদি দখ তুমি মামা! বগড়া আব বগড়া। নিতান্ত মূখ ব্যথা করতে লাগল তো মূখ ভাংচাবে তখন। তা-ও পারে না তো হাসবে মূখ টিপে। দেখে পিঙ্কি জ্বালা করে, মেজাজ রাখা দার হয়ে ওঠে।

চুম্বিক বাড়িতেও তর্জনগজর্জন। ভবনাথ বলেন, ডাংগর হয়েছিল না?

চুম্বিক কম্বুণ মূখে বলে, হযোছি তো। তাই মানবে। বগড়াটা তাই নিরুই তো বাবা।

বাধিনী-পিশি কড়া হয়ে হুকুম দিলেন : কথাবার্তা বন্ধ। সাদামাটা কথাও না। তপন ডাকে তো জবাব দিবিবে।

কম হোক কথাবার্তা—কিন্তু একেবারে নিঃশব্দ কলহে কেমন যেন দানা বাঁধে না। মিছারি দানা বাঁধতে, বত সরুই হোক এক-টুকু সুতো চাই। কথা হল সেই সুতো। কিন্তু বাধিনী-পিশির মানা—চোখোচোখি হলেই চুম্বিক ঠোটে কলুপ এটে দেয়।

তারই মধ্যে একদিন তুলকালাম কাশ্ড।

আত্নাদ কবছে চুম্বিক। বেকুব হার তপন 'তাই তো 'তাই তো' করছ। অকুশল তপনেব মামাব-বা ড—সেই হেতু মামা-মামি তো আছেনই, এ বাড়ি থেকে ডব-নাথ ও ভামিনী ছুটে গিয়ে পড়লেন। পড়ার লোকও এসে পড়েছে। দিবা এক জনতা।

তপন বলে, আমাব কি দেখে? লল-মাছেব জাব চাঁব করতে দেখাল বেবে উঠেছিল। পড়ে গিয়ে আমার এমন সুন্দর জার—ঐ দেখুন, ভেঙে চুবমার।

কাতরাচ্ছিল চুম্বিক—কাতরানি থামিয়ে বলে, না পিশিমা, পড়িনি আমি। দাঙ্গা মেরে ফেলে দিয়েছে।

তপন বলে, দিলে তো ঠিকই হত। সোমন্ত হ'লে গেছে নাকি এখন, গলে হাত ঠেকাবার জো নেই। তাড়া দিয়েছি—ভর পেয়ে পা হড়কে পড়ে গেল।

চুম্বিক ভূভাগ করে উড়িয়ে দেয় : শোন কথা! পা হড়কে নাকি পড়ে গেছি—পড়ে যাবাব মেরে আমি। দেখেছে কেউ কখনো পড়তে? বেলো—

সেটা অতিশয় সত্যি। মঠেঘাটে ডাঙাডহবে দাপদাপি কবে বেড়াচ্ছে এত-টুকু বরস থেকে, কেউ কখনো পড়তে দেখেনি।

তপন বলে, তখন যে একহোটা মেরে ছিল, এখন ঐবাত হাতী—

এবং মূখের কথা মাত্র নয়, দু হাত বিস্তার করে মাননসই একটি ঐবাতের আমতন দেখিয়ে দিল।

পা চেপে ধবে চুম্বিক আঃ-উঃ করছিল, পায়ের ব্যথা ভুলে হি-হি কবে হেসে উঠল : হাতী বুঝি পা হড়কে পড়ে! একেবারে গাছ-মুখ। হেডমাস্টার চাকরি দিয়েছেন—



পরের সার্টিফিকেটটা ভাল করে দেখে নেন বেন তিনি।

এদিকে না পেবে তপন বাঘিনী-পিশিকেই শালিস মানল; কথাবার্তা বন্ধ না আমাদের? তুমিই তো মানা করে দিয়েছ।

চুমকি বলে, গায়ে পড়ে ঝগড়া কি বকম দেখে পিশিমা। আমি তো বরাবর তোমার সঙ্গেই কথা বলছি—

বলেই পালের বাথরুম আবার আত্মনাব শব্দ করে দিল। এবং এত জোরে যে বা-ই কিছু বলুক তপন, কারো কানে যাবার উপায় নেই।

জনতার রায় তপনের স্বপক্ষে গেল। ঘটনা যখন তপনের মামার বাড়িতে, চুমকিই এসেছিল—তপন হারান চুমকির কাছে। দাঁষ অতএব চুমকিরই। আব এটুকু পড়ে যাওয়া চুমকি হেন মেয়েব কাছে ভাল-ভালের শামিল। বাড়ি নিয়ে গিয়ে শাইয়ে রাখো। পূরনো ঘি, নিদেনপক্ষে সর্ব্বের তৈল একটু মালিশ করে দিও—রাত পোহালে দেখবে মেয়ে ড্যাং-ড্যাং করে লাফাচ্ছে।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলেছে চুমকি, পায়ে খুব লেগেছে কিনা—বাঘিনী-পিশি ধরে নিয়ে যাচ্ছেন। তপন ঘরে ঢুকছে—দেখা গেল, খোঁড়াচ্ছে সে-ও।

বাঘিনী-পিশি বেগে গিয়ে বলেন, তুমি কিছু কবিস নি, মেনে নিলাম। যেত বেই হোক মেয়েটা এমনখাড়া জখম হল—তাই নিয়ে গ্যাংচারি তুমি? এতটুকু মাঝদম্বা থাকবে না, এ কেমন!

কিন্তু নম্র বলে সবই উড়িয়ে দিয়েছিল—

চলেছে, সেই সশো হোমিওপ্যাথি আনিকা। সারে না, পা টেনে টেনে হাটে চুমকি। শীত-কালের বাবা সহজে সারতে চায় না। সম্ভব ঠিক হয়ে আছে ওদিকে, বিয়ের তারিখ হুত এসে পড়ছে। বাস্তব হয়ে ভবনাথ শহুবেব হাসপাতালে নিয়ে একসবে করালেন। হাড়-টাড় ভাঙুন, ঠিক আছে—কেন গোলমাল পাওয়া গেল না।

চুমকিও শতকণ্ঠে তাই বলে, বাবা কেন উতলা হয়ে পড়লেন জানিনে। বাখা-টখা কিছু নেই—হাটতে গিয়ে শিরায় টান পড়ে একটু।

ডাক্তার অভয় দিলেন : চলতে ফিরতে দু-এক মাসে সেরে যাবে।

ভবনাথ বললেন, আমার যে দরকার, দু-এক দিনের মধ্যে সেবে যাক।

পালের জেঠা মাদ্রাজ থেকে এসে গেছেন। বিদেশ-বিভূষে পড়ে থাকেন, দেশেখবে এসে খাওয়াদাওয়া কবুন, ভাস-পাশা খেগুন—ভা নব, বরনা ধরেছেন তিনিও এবাব কনে দেখে যাবেন।

চুমকি বলে, ঘাবড়াচ্ছে কেন বাবা? বত-বাব খুশি বেনে বান, কনে ভাতে ক্ষরে যাবে না।

ভবনাথ বিরক্ত হয়ে বলেন, সে তো স্বচ্ছন্দে হতে পারত। পায়ে গলদ করে বসে আছি। পই-পই করে বললাম, বিয়ের কনে সমাল হবে চলফেবা কর, কাজ চুকে গেলে যা ইচ্ছে করিস। এই দুটো মাসও ঠান্ডা থাকতে পারবি নে তুমি।

ভাঙ্কল করে চুমকি বলে, চোখ-কান

খানি—তা-ও একখানা পায়ের। বিয়ের কনে লক্ষ্যায় গোল হয়ে থাকব, পা তখানি বেরই করব না দেখো!

এলেন সেই জেঠাবাব, সদলবলে। আর যেখানটা বাথরুম, সেইখানে সম্মা। বাইরে-থাকা মানুষ বলে প্রগতির কথাবার্তা। বললেন, জব্বব কেন আজকালকার মেয়ে? ও সব দিন চলে গেছে, লাফিয়ে কাঁপিয়ে বেড়াবে। দেয়ালে ওটা তোমার ফোটা বুড়ি? নামিয়ে আনো দিকি মা, দেখি ভাল করে।

হাটারই পরীক্ষা—স্পট বেগা গেল। তা-ও কি রয়েসয়ে পা টিপে টিপে গজেন্দ-গতিতে হাটা যাব না? মেয়ে ন্যাং-ন্যাং করে ছুটল—সাধারণ অবস্থার চেয়ে খোঁড়াানা অনেক বেশি। এবং বেশি দৃষ্টিকটু।

জেঠাবাব চমক খেয়ে বললেন, হাটনা মা-লক্ষ্যায় এমন কেন? একটা পা ছোট নাকি?

ছোট কেন হবে? পা পিছলে পড়ে গিয়ে চোট লেগেছে। বাখা আছে।

জেঠাবাব চুকচুক করেন : চোট তো লাগতেই পারে, সেরে যাবে।

গম্ভীর হয়ে গেলেন এর পর। একটা সিগারেট ধরিয়ে উঠে পড়লেন। বাইরে গিয়ে ভবনাথকে বললেন, নির্দোষ হয়ে সারলে একটা পোস্টকার্ড ফেলে দেবেন। দেখে যাব।

লক্ষ্যাসন্ধান ঝেড়ে ফেলল তবু ভবনাথ বিয়ের প্রসঙ্গ তুললেন : বিশেষ মাঘ তো এসেই গেল। মাঘে আব আঠাবোটা দিন।

এখন বিষেখাওয়া কী করে হচ্ছে? পা সারিয়ে মেয়ে খাড়া করে তুলুন, তারপরে।

বাস, ফসল তবে ডাড়াবি-পড়া ছেলে। ভবনাথের বন্ধ লেগেছে। এতদূর এগিয়ে এমন, লোক-জানাজানি হবাব পর সামান্য

পালের বাথরুম বাদ সাধল। চুলোয় থাকগে—সেই ইঞ্জিনায়ার পালের সংগেই তাহলে পাকা-পাতি হোক। খাই বেশি বলে পিছিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু মান-ইচ্ছের প্রধন

জড়িত, টাকার হিসাব কবতে গেলে হবে ন। শূভকর্ম বিশেষ মাঘ না-ও যদি হয়, মাঘ

মাসেব ভিতবেই নিশ্চিত সেরে ফেলব।

পালের জেঠের কাছে ভবনাথ নিজে চলে গেলেন : যা দাবি কবেছেন তাই। ছাড়বেন না যখন, কি কবব। কনে তো দেখাই

আছে—পরের অর্ধেক আগাম নিয়ে লম্পট সেরে দিন। মাঘেব উন, ভবিশে আব তিরিশে

দুটোই বিবেব তাবিখ। যেদিন খুশি।

জেঠ বললেন, আমরা দেখেছি—কিন্তু

তাইকেও একবার দেখে নেওয়া উচিত। চাকার নিয়ে শিগগিবই টাটানগব চলে যাচ্ছে,

বাসা কবে থাকবে। শেষ কলে কোন রকম কথাব ভাগী হব, সে দায়িত্ব নিতে চাই না।

ইঞ্জিনায়ার পাত দুই বন্ধুসহ মেয়ে দেখতে এলো। আসন পেতে চুমকিকে

আগেভাগে বসিয়ে রেখেছে, তা ঘরেই ঢুকল না ওরা। বলে, জামরুলতলার ঐখানটা বসা

যাক, চেয়ার বোম্বি বা হোক কিছু পাতিবে দিন। উনিও চলে তগলুন ওখানে—

হাটিয়ে আনা জাড়া উঠানে নিয়ে আসার

অন্য পদ্ম নেই। অগেভাগে কিছু শূন্যে থাকবে—মতলব পাকিয়ে এসেছে। দুই বন্ধু দু-দিক দিয়ে তাঁক চোখে পায়ের দিকে তাকিয়ে—পদযুগল ছাড়া অন্য কিছুই দৃষ্টব্য নেই যেন। ডাক্তার ফেসেছে—এবং তদৃশ করবার কিছুই নেই, ইঞ্জিনীয়ারটাও ফাঁসল নব্বাঁৎ।

ঘটক একটা পাতের কথা বলেছিল—দোজবরে এবং মুনসেফ। উভয় কারণে ভবনাথ গা করেন নি এতদিন। পূর্বপক্ষেব ছেলেপুলে নেই, তবু আরও একবার টোপের চাড়িয়েছিল তো মাথা। বাজারের পুঝানো ফানিচাব কেনাও গামিল, ব্যবহারে গা ঘিনাঘিন করে। কিন্তু অধিক আপাত চাকবির কারণে। হাকিম বলে হত বড় ব্যতিরই থাক, একেবারে শূন্যে মাইনে—মাসান্তে সরকার বাহাদুর যা দেন, তাই ছাড়া আশা পয়সা উপরি নেই। হাকিম সাহেবের চেয়ে বয়স হাবিমের পেস্কার ভাল। মাইনে ও মানইজ্ঞত যত সামান্যই হোক, বোজগাব দিয়ে খোদ হাকিম সাহেবকেই তিনি কিনে রাখতে পাবেন।

দায়ে পড়ে ঘটককে ডেকে পাঠাতে হল : নিয়ে এসো তাঁদের, মেরে দেখে যান। হাকিম তো হাকিমই নই। দে জবরে—তা-ই বা কি কবা থাকে।

হাকিমের বাপ এসেছেন। বরাবরের মতন সেই এক ফরমস : হাঁটে, দিকি মা—মেজাজ হারিয়ে ভবনাথ বললেন, রূপ-গুণ বিছা লাগে না, শূন্যই হটিনা। বলি, বড় নিয়ে কি রেসে পাঠবেন মশায়?

ভুলোক বললেন, অংগগুলো নিখুঁত চাই তো?

অংগ তো একটা মাত্র নয়। নক-চোখ-মুখ তাকিয়েও দেখলেন না, এসেই পয়সা পায়ের খবর। পায়ের উপর এত রোখ কেন বলুন তো?

বলুন তো কেন?

ভুলোক হাসতে লাগলেন। বললেন, ভাগ্যবান লোক আপনি—বিস্তর সুহৃৎ। উড়ো-চিঠি চলে যায় : খুঁতো মেয়ে—খোঁড়া পা। ভাল কবে হাঁট্টিয়ে দেখে নেবেন।

দোজবরে হাবিম-পাত্র—তা-ও ভেগে পড়ল। একটা জিনিষ পরিস্কার হল, মেরে দেখিয়ে কোন লাভ নেই—পা টেনে টেনে হাঁট্টাই সার। হাঁটার হিসাবে নিখিল-ভাবত পরিক্রমা সারা হবে শেলেও পাট গাঁথবে না।

বাগে গবগর কবতে করতে ভবনাথ উপনের উপর গিয়ে পড়লেন : তোমাব বদ-মায়োসি। বগড় বাটি কবে মানসে—তা-ই বলে এমন শত্রুতা, উড়ো-চিঠি ছেড়ে বিয়ের ভাংচি দেওয়া?

আমি না, অন্য কেউ—

উত্তরে ভবনাথ চিৎকার করে কি বলতে চাইলেন—

ইস্কুল থেকে তপন এই সবে ফিরল। সাবাদিন বকে বকে মুখ তিভো। দড়াম কবে মুখে উপর দরজা দিয়ে সে ঘরে ঢুকে পড়ল।

পব মূহুতেই আতঙ্ক। ঘরে চুপচাপ থাকতে পাবে ন। ভবনাথেরই শেষ নয়, বড়-সেনাপতি এসে পড়লেন বলে। ঘরে নয়,

মামার-বাড়িতেও নয়—হন হন করে তপন একেবারে আপন গট্টে চলল। নিজের বাড়ি, মা হাজির থাকবেন, হাঁক পাড়লে পাড়া-পাড়িশ রে-রে কবে ছুটে আসবে। সেখানে জিনে আসা সহজ হবে না।

বাড়ি দূরে নয়, মাঠের ওপার। ঝলতে গলে এক দৌড়েব পথ। আহ, এই বাড়িই গো—সেকালের চুমকি সেখানে চণ্ডলা দেবী হয়ে ছেলে-বউ নাতি-নাতনী নিয়ে সংসার-ধর্ম করেন, সেকালের গল্প বলেন মুখ টিপে : হসে। এমন তপন শনিব রে শনিবাবে যেত, বিপদ বুঝে আজ আদিনেই বাড়ি হুটেছে।

বাড়ি এসে রেহাই হল না, গায়ে ময়লা মাখলে বমে ছেড়ে বের না। দেখা গেল, ভবনাথ সঙ্গে নেই—মাঠ ভেঙে পিশি একলাই ঝেঁসে আসছেন। বাঘিনী-পিশি। বড়োমানুষ মাঠের ডেলাবনের উপর দিলে ছুটেছেন—গতিক বড় সুবিধের নয়। তপনের রাগ মিইয়ে জল। মনে মনে দুর্গা-নাম জপছে।

পিশি চোখ পাকিয়ে বললেন, ভবকে বাড়ির বের কবে দিইছস?

তপন আমতা-আমতা করে : আমার নামে মিথ্যা-কলঙ্ক পিশিমা, ভাণ্ডি নাকি উড়ো-চিঠি লিখি। তাই বললাম—খুব নয়ম করেই বলেছিলাম, আমি কেন লিখতে যাবো, আর কেউ লিখেছে কিনা ভেবে দেখুনগে।

পিশি প্রকৃটি করে বলেন, আব কে লিখবে?

একাই বড়ি আমি লিখতে পড়তে জানি, মেরেকেও তো শিখিয়েছেন। তার দিকে বড়ি নজর পড়ে না। সে খোখা-তুলসি—আমি পরের বাড়ির ছেলে বলে যত সন্দেহ আমাব উপর।

কণ্ঠস্বর কাদো-কাদো হয়ে উঠল : মূহুতকাল তাকিয়ে বইলেন পিশি। জেরা ছেড়ে দিয়ে বললেন, যে লিখে থাকে লিখুকগে। মেয়েটা তোকেই নিতে হবে।

তপনের না এসে দাঁড়িয়েছেন। শান্ত, নিপাট ভাল মানুষ। মূহুতকাল বললেন, পায়ের কি হয়েছে, শূন্যে পাই—

পিশি প্রাজ্ঞল করে দিলেন : খোঁড়া হয়েছে। দুনিয়াধুদু জেনেছে, তুমিই বা না জানবে কেন?

তপনের দিকে অনিন্দ্যিষ্ট হেনে আবার বললেন, অন্য খোঁড়া বলে বলুক, তা বলে খোঁড়াব খোঁটা তোমাবা কি জন্যে দেবে? ভাল মেয়ে কে খোঁড়া করে দিবেছে, তোমার গুণখর ছেলেকে জিজ্ঞাসা কবে।

তপন তাড়াহাড়ি চাপা দিবে দেয় : থাকগে মা, তুমি কিছু বলতে যেও না। পিশিমা, তুমি মিছামিছি রেগেছ। মা জিজ্ঞাসা কবছেন, খোঁড়া সেইরকমই আছে না মেরেসেরে গেছে খানিক? মানে আগের মতন ছুটোছুটি করতে পারে কিনা জানতে চান।

পিশি বলেন, পাবলে বড়ি বাড়ির মধ্যে চুপচাপ থাকত? সেই মেরেই কট!

তপন একগাল হেসে বলে, মাঠের এপার-ওপার কবতে না—বাঃ, চমৎকার। তবে মা তুমি বাজি হয়ে পড়ে। অন্য বা বলুক, পিশিমা কখনো একবর্ণ মিথ্যা বলবেন না।

‘মা তবু ইতস্তত করেন : খোঁড়া বউ তানব?’

বক্ষে তো সেই। পা-ওলালা বউ এনে কি হত বলা দিকি? রান্না চাপিয়ে দিয়ে একছুটে বাগের বাড়ি গিয়ে উঠত। ভাত পুড়ে ওদিকে কয়ল—

বাঘিনী-পিশি আরও নিশ্চিন্ত করলেন : সাদা-জমিতেই হাঁটতে পারে না, মাঠের ডেলা-বন ভাঙবে সেই মানুষ। আমারই ভাল পা দেখু কুঠেরোগিব মতন হয়ে গেছে।

তবু কিছু সন্দেহ থেকে যায় বড়ি। তপন পূনরাপি বলে, এ পা সারার আশা নেই, কি বলা পিশিমা? আজ বলে নয়, কোনদিনই না—চিরকাল এমন থাকবে।

পিশি বলেন, শহরের হাসপাতালে নিয়ে বিলেতফেরত বড় ডাক্তার দেখাল—সারবার হলে কি পড়ে থাকত এমন? ও তুই কিছু ভাবিসনে বাবা, যেমন আছে ঠিক এমনি থাকবে।

পুরানো রাগ পোষা ছিল, চুমকি এবার সেই শোষ নিয়ে নিল। দুটো মাসে কী আর হত, এ প্রতিশোধ সারা জন্ম ধবে।

বউভাতের দিন দেখা গেল, খরখর করে বউ বাড়িময় পরিবেশন করে বেড়ছে। তপনের মা তাঁক চোখে কেবলই পাখের দিকে তাকাচ্ছেন—এ মেরে খোঁড়া, কোন মহাশয় রটিয়ে দিয়েছিল?

নিবিবিলি পেয়ে তপন এক সময়ে বউকে ধবল : খোঁড়া হয়ে গিয়েছিলে, বাঘিনী-পিশি অবাধ সাক্ষি দিয়ে গেলেন। কোথায়?

ফাঁস কবে নিশ্বাস মোচন করে চুমকি বলে, হয়েছিলান তো। নইলে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হাকিম সব তল গিয়ে ইস্কুলমাস্টারের হাতে পাড়ি।

সারল কিংস?

বিয়ের জল গায়ে পড়ে—তাছাড়া কি বলব। কপাল খারাপ, বিয়ের আগে তাই সারল না—

চোখ দুটো বরের মূখের উপর তুলে চুমকি বলল, তা অমন গোমড়া মুখ করছ কেন? লাভ তো তোমাব—খোঁড়া বউ বিয়ে করলে, একটা দিনই নিখুঁত হয়ে গেলাম।

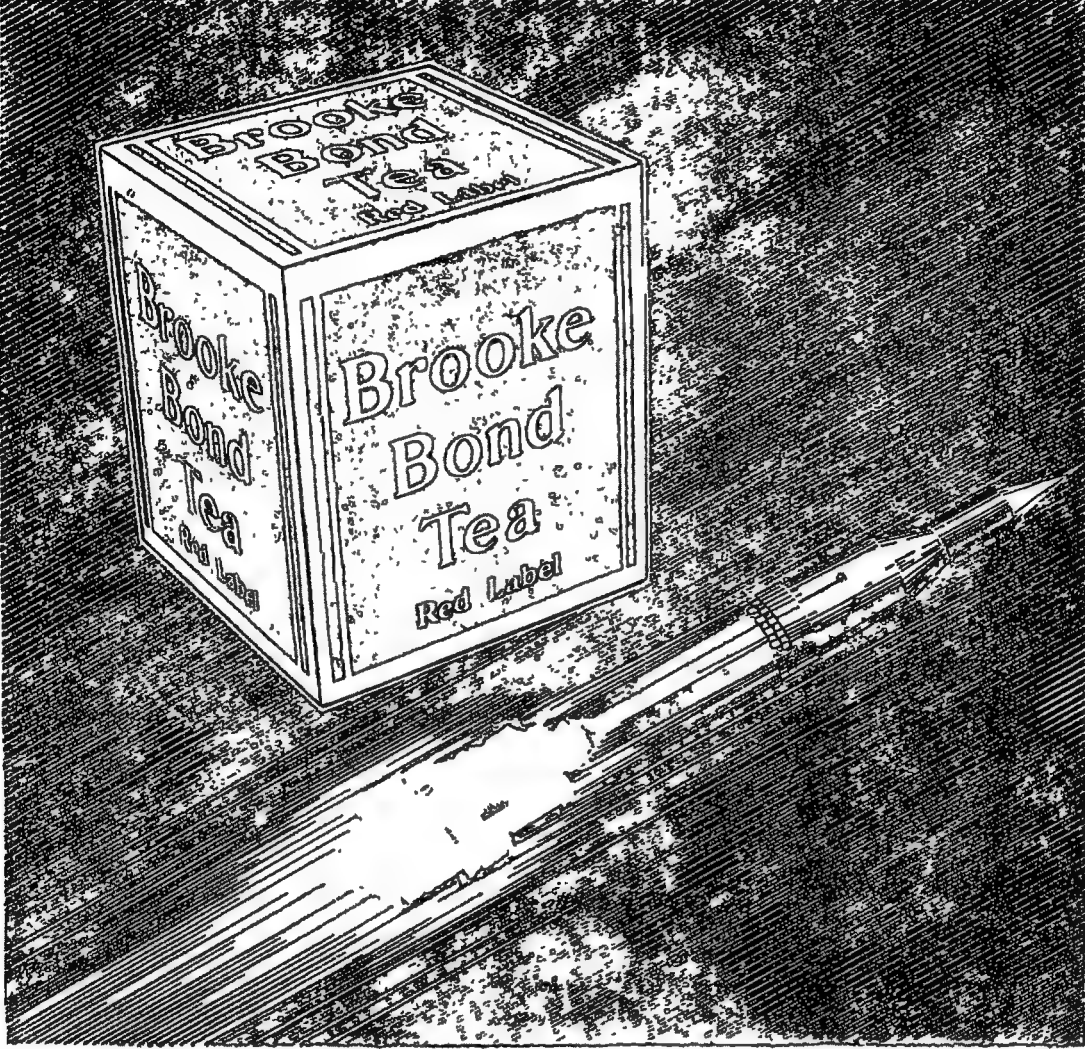
তপন বলে, লাভে কাজ নেই আমার। ঘরে ক’মিনিটই বা থাকবে দু-দুশনা পা-ওলালা বউ। সুখ চেয়ে সোয়ান্তি ছল ভাল—

আবাব বলে, চক্রান্ত করবেছিলে—খোঁড়া তুমি কাম্বিনকালে হওনি। খোঁড়া দেখেই আমি সাহস কবে ছাদনাভলায় নামলাম।

চুমকি হাততালি দিয়ে হি-তি করে হাসে : কী আব করবে বলা এখন। সাত-পাক হয়ে গেছে, চোন্দ পাকেও আব হুঁলে না।

পৌষ গর্জ উঠল তপনের : গোলমাল দেখলে যেদিকে দু-চক্ষু যায় বোরবে পড়ব। তিভুবন খুঁজেও পাতা পাবে না।

নতুন বউ সঙ্গে সঙ্গে বলে, ইট মেরে খোঁড়া করে রাখব। একখানা পা ভ্রুতত। আমার মতন লোক-দেখানো খোঁড়া নয়—ঠ্যাঙ-ভাঙা সত্যি সত্যি খোঁড়া।



পরিচৃষ্টির নতুন জগতে পাড়ি দিন

মন-মেজাজ চাঙ্গা করতে হলে চাই ব্রক বণ্ড রেড লেবেল চা।
 প্যাকেট পিছু ঢের বেশী কাপ মনের মত চা পাবেন।
 ব্রক বণ্ড রেড লেবেলের অপূর্ব স্বাদগন্ধ আপনাকে পরিচৃষ্টির
 এক নতুন দুনিয়ায় নিয়ে যাবে।

শরীৰটো আজ মোটেই ভাল ঠেকেছে না। নাৰে মাৰে যেন কেমন ঘূম-ঘূম একটা ভাব আসছে। কিছুই মনে থাকছে না। কৈমন অসাড় আছন্ন হৈ পড়ছেন। চমক ভেঙে প্ৰিয়বালা তাকালেন একবার ডানপাশেৰ ছোট জানলাটোৰ দিকে। বিকেল হৈছে এল কিনা কে জানে। এক চিলতে রোদ এসে পড়েছে ষাড়ে আর কাঁধে। জানলাৰ একটা পাট বন্ধ থাৰে দিতে পাবলে ভাল হোত। একবার ওঠবাৰ চেষ্টা কবলেন প্ৰিয়বালা। পাৰেন না। কোমৰটোৰ যেন সাড নেই। সামান্য এবটু পাৰ ফেৰবাৰ চেষ্টা কৰলেন। বড়টুকুই বা যথা যাব। দুহাত চওড়া চৌকিখানাৰ ওপৰ শূন্য পড়ে আছেন প্ৰিয়বালা। পাৰ কিবে খোলা দৰজাটোৰ দিকে একবার ডাবলেন। চোখেৰ পাভা দুটি কুণ্ডিত হৈছে নেমে এসেছে। ভাল কৰে দেখতে পান না। সামনেৰ বাৰান্দা দিগে কোন মানুহ চলে গেলে মানুহটোকে আবছা দেখেন, তেন্তে পাবেন না।

এক বড় নিঃশ্বাস ফেলে বিবৰ জোলো চোখদুটো মূলে তাকিয়ে রইলেন বাৰান্দাৰ দিকে। কেউ নেই। বাৰান্দাটো শূন্য খাঁ-খাঁ কৰছে। বৌলিংগৰ ওপৰ বসে একটা বাক একটানা ডেকে চলেছে।

বোমা কি এখনো ওঠে নি? পাশেৰ বড় ঘৰখানাৰ বোমা নিশ্চয় ঘুমোছে এখনো। বীতা কোথাৰ গেল? সেমাই বা গেল কোথাৰ? দেব, বোধ হয় এখনো অফিস থেকে ফেরনি। সব গেল কোথাৰ, কাউকে দেখতে পাজেন না। চোঁচিয়ে ডাকবাৰ মত শক্তি তাৰ নেই।

আব কতকাল শক্তি-সামৰ্থ্য থাকবে? চাৰ কুড়িৰ ওপৰ বহুস হোলা। এখন আব তাহে কি দেখে। খাঁচাটা আছে আব প্ৰাণটা ভেতৰে ধুক্ধুক বুলছে। তব' বতৰদিন প্ৰাণটা না বোঁৰোৰ, ততদিন এনি কবেই সিন-বাত কাটাতে হবে।

বুকেৰ ভেতৰটা কেমন হাঁফ ধৰে উঠছে, বড একা লাগছে। সব গেল কোথাৰ? কেউ কাছাকাছি নেই। এঘবেৰ দিকে ক'উকে তাসতে দেখছেন না প্ৰিয়বালা।

আসতে কেউ চাৰ না। আবাব বড একটা নিঃশ্বাস ফেলেন প্ৰিয়বালা। জাঁকল তিনি যে একা ভয়ঙ্কৰ নিঃসংগ হৈছে পড়বেন, একথা বখনো ভাবতে পাবেন নি। পাঁচ বছৰ আগ পৰ্যন্তও ছেলে-বো নাতি-নাতনী নিষে তা'দেৰ তদাবক কৰে সখে-দখে সকলকে জাঁড়িৰে ধৰে মিলে-মিলে দিন কেটেছে। তখন ভাবতই পাবেন নি যে, মাসেৰ পৰ মাস তাকে বিছানাৰ শূন্য ধাৰতে হবে, উঠে নাচে নামবাৰ শক্তিও থাকবে না। লিচুৰ মত জোলো চোখ দুটোয় গাঢ় বিষম টাৰা পড়ে। প্ৰিয়বালা শূন্য বাৰান্দাটোৰ দিকে ফাল-ফাল কৰে তাকিবে থাকেন।

—বোমা ছো ওঁদিকপালে

আবছা আবছা দেখতে পোলে প্ৰিয়বালা কে একজন বাৰান্দা দিগে সিঁড়িৰ দিকে চলেছে। মোখ হয় বোমা নম্বৰো বীতা।

—কে যাক

—আমি মা

সৰ্বাস্বত্ব

আগে

স্বৰাজ বন্দোপাধ্যায়

বোমাৰ গলাৰ আওলাজ পেলেন প্ৰিয়বালা।

একবার শোন বোমা।

এগিয়ে এল কনক। গোল মূখখানি ঘমেৰ পৰে ঘামে চকচক কৰছে, চোখেৰ কোল দুটো ফুলো-ফুলো, বেশ অটি-সটি দেখানা। একটু মোটা হৈছে কনক।



একটা হাই তুলে কাছে এসে বললে,—
কি বলুন।

—দেবু কি আপিস থেকে ফিরেছে?

বোমার গলার স্বরে বিরক্তি।—কি যে বলেন। তার ফিরতে অনেক দেরী। এই তো সব সাড়ে তিনটে বাজে। প্রিয়বালা আরও কি যেন বলবেন ভেবেছিলেন, সব কক্ষন গুলিয়ে গেল। ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন কনকে দিকে। কি যেন বলবেন মনে আসছে না।

—কি এসেছে। ওকে ঘর খুলে দিই। আসছি আমি। কনক ঘর থেকে বোয়িয়ে চলে গেল। সিঁড়ি দিয়ে নামবার শব্দ পেলেন প্রিয়বালা। এতক্ষণে মনে পড়ল জানলাটা বন্ধ করে দেবার কথা বলা হয়নি। আর হ্যাঁ, শরীর তাঁর ভাল লাগছে না—এ কথাটাও বলা হোল না। গেলো এসে একটা জল দেবার কথাটাও বলতে ভুলে গেলেন।

প্রিয়বালা জানেন, কনক আসছি বলে চলে গেলেও বেশ কিছুক্ষণের ভেতবে আর আসবে না। আবার হয়তো কোন কাজে বাস্তবায়ন পার হয়ে ঘরে যাবার সময় উনি ডাকবেন, আবার এসে দাঁড়াবে বোমা, দাঁড়তে না দাঁড়তেই বলবে, হাই মা, ওদিকে বামার কি হোল দেখিগে হাই। নীচে নেমে যাবে। তার হাসি আর গল্পের আওয়াজ শোনা যাবে। হয়তো পাশের বাড়ির বোয়ের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দেবে।

দোষ নেই, বোমার দোষ নেই কিছু। এতবড় সংসার খাটানীটা কি কম। চারদিকে নজর রেখে কাজ করতে হয়। দেবু, কফি, ছেলেমেয়ের চা, এর আসের স্টু, ওব শাকতোর খোলা। এক-একজনের এক-এক রকমের বাসনা, তার ওপর আপিস, ইস্কুল, কলেজ, কিশোরীদুর্নীতির কামাইয়ের কামেলা। বোমার খাটানীটা কিছু কম নয়।

তবু যদি ওরই ভেতর এক সময় এসে তার বিছানার ধারে এসে দাঁড়াত বসত। পিঠে কোমরে একটা হাত বালিয়ে দিত, দুটো কথা বলত, প্রিয়বালার মনটা হয়তো একটা ঠান্ডা হতো।

একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে প্রিয়বালা পাল ফিরলেন আবার, দোষ নেই বোমাব। অত খেটে-খেটে এসে হয়তো শুরুর পড়তে ইচ্ছে হয়, নয়তো আশে-পাশের বৌ-বুড়ির সঙ্গে একটা হাসি-গল্প করতে ইচ্ছে হয়, তার কাছে এসে বসে তার রোগের ভাবনা ভেবে মন্থ শক্তির বসে থাকতে হয়তো ভাল লাগে না।

বা-হাতট। তুলে কৃপিত কপালেব বিন্দু-বিন্দু ঘাম মুছতে বান প্রিয়বালা। হাত ওঠাতে ইচ্ছে হয় না। দেহটা যেন আজ বড় অবশ লাগছে, অসাড় লাগছে। কেন এমন হচ্ছে কে জানে। কেউ যদি এখার-পাশে আসত, তবে ফ্যানটা একটা খুলে দিতে বলতেন। ফ্যানটা সব সময় খুলে রাখতে চান না প্রিয়বালা। ফানের বাতাসটা ভাল লাগে না মনে হয় যেন ঘরের গবম ছাওয়াটাকেই ঘব্বিসে-পাকিয়ে গায়েব দিকে ঠেলে দেয়। হাতপাখার বাতাস নিজেই কবন রাখ-মধ্যে। আজ আর হাতখানাও ওঠতে ইচ্ছে হচ্ছে না। হাতের আর আছেই বা কি।

বগলেব দিক থেকে কনকই অর্ধ-চামড়া খুলে পড়েছে। হাড়খানা থলথলে চামড়ার মোড়া।

বোমার বয়েসে এই হাতখানা তার কত সুডৌল ছিল, চামড়া ছিল টানটান। হাতের কাঁজিটাও ছিল গোল-নিটোল। শাশুড়ী বলতেন, এমন হাতেই গল্পনা মানায়। দেবুর বাবা দু'গাছি মকবম্বা বালা, গড়িয়ে দিয়েছিল। সত্যি, বালাদুটি পরলে বড় সুন্দর মানাত তাঁকে। দেবুর বাবা বলত, বালা দু'গাছা তোমার হাতে উঠে ধান্য হোল।

ওমনি সব অতীত অতীত কথা বলতে দেবুর বাবা। গল্পনা-শাড়ির কোন সখ তাঁর বাকী রাখেন নি। প্রাতি পুজোর হয় টাঙাইলের শাড়ি নয়তো শান্দিপুরী জরির শাড়ি, নিজে কিনে নিয়ে আসত। মানুসটার সখ ছিল, ক্রমতাও ছিল। টাকা যেমন রোজ-গাব কবত, তেমন খরচা করত। অমন দিল-দরিয়া মানুস সংসারে খুব বেশী চোখে পড়েনি তাঁর।

আজ-কালকার ছেলেদের তেমন সমর্থ্যও নেই, মনও নেই। দেবু কি দিতে পারে না বোমার হাতে দশগাছা বেকী চুড়ি গড়িয়ে। কতবাব বলেছেন প্রিয়বালা। দেবু, হেসে বলে, চুড়ি কি হবে মা, কতকগুলো সোনা গায়ে পরা আজ-কাল উঠে গেছে।

অচ্চ প্রত্যেক বছর পুজোর পরে হয় দাজ্জিলিং, নয়তো মসোবী, তি কাম্মীর বেড়াতে যাবে। এই এক চং হয়েছ আজকাল। কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা বাইবে উড়িয়ে আসা। কি লাভ। ভাবী সোনা-দানা ঘরে আন, টাকাটাও থাকবে, সখও মিটেবে, অসময়ে কাজে দেবে।

তাই বা কাজে দিল কই? দেবুর বাবা শেষটায় বড় কষ্ট পেয়ে গেলেন। দেবু বি-এ পড়ে পেমসনের বটা টাকায় কি আশ সংসাং চালায় যায়। গল্পনার অর্ধেকের বেশী গেল দু'মেসেব বিসেতে। যা কিছু ছিল দেবুর বাবাব অসখে সব গেল। মরবার আগে বড় কষ্ট পেয়ে গেলেন। একটা বড় ডাক্তার এনে তেমন ঢালাও চিকিৎসা কববার সামর্থ্য ছিল না।

মরবার দু'দিন আগে প্রিয়বালাকে বললেন, দেবু বইল, আর এইটি তোমাকে দিয়ে গেলোয়।

একখানি গীতা দিলেন তাঁর হাতে। নিজে আজীবন গীতা পড়তেন। বইটি তাঁর হাতে তুলে দিলেন। এখনো গীতাখান তাঁর বালিশের তলায় আছে। বোজ সকালে আশ সন্ধ্যায় ছোট বইখানা কপলে বকে ঠেকিয়ে আবার বালিশের তলায় খেঁচ দেন প্রিয়বালা। পড়তে পারেন না। প্রথম প্রথম পড়বার চেষ্টা করেছিলেন। পড়ে বুঝতে পারেন না। ববং বইখানি দু'হাতে করে কপালে ঠোকসে প্রথম কবলে প্রাণটা ঠান্ডা হয়। দেবুর বাবাব মন্ত মন্থখান মনে পড়ে যেন। হাসি-হাসি মন্থখানা ওই বইটির সঙ্গে যেন লেগে বসেছে।

প্রিয়বালাকে আশ একটা কথাও বলেছিলেন দেবুর বাবা, মরবার দিন-পাচেক

আগে,—একটা বেশ খড় লাল টকটকে ডালিহ আনতে পার আমার জন্যে?

আনতে পারেন নি প্রিয়বালা। তখন হাতে বেশী পরসা ছিল না। ভেবেছিলেন দু-দশদিন পরে আনবেন। তিনি কি জানতেন যে, দেবুর বাবা তার কয়েক দিন পরেই মরে যাবেন?

সেই থেকে আজ পর্যন্ত ডালিম কখনো খান নি প্রিয়বালা। ও বস্তু আর তিনি মৃত্যু তুলতে পারবেন না।

জানলার দিকে তাকিয়ে প্রিয়বালা হাঁফিয়ে উঠলেন। বুকের ভেতরটা আজ থেকে থেকে কেমন আই-টাই করছে। পিঠটাও বোধ হয় যেমে উঠেছে। আবার বারান্দার দিকে তাকালেন প্রিয়বালা।

সিঁড়িতে পারের শব্দ পাচ্ছেন যেন। খিলখিল হাসিব শব্দ। হাসিটা রীতির—নাতলীর। কলেজ থেকে এল বোধ হয়। বড় সুন্দর নাতলীটি। গায়ের রঙ তাঁরই মত হলুদ বর্ণ, মুখখানি দেবুর মতো চোখা।

—কে দিদি এলি?

রীতা হাসতে হাসতে দাঁড়াল দরজার সামনে। পেছনে ওটি কে? সারের মত প্যান্টুল পরনে, কে লোকটা?

—দিদা আমার ডাকছে?

রীতা ঘবে ঢুকল?

—হ্যাঁ, দিদি, ওটি কে ওখানে দাঁড়িয়ে?

—আমার বন্ধু, স্বপন, ওর সঙ্গে সিনেমায় যাব আজ। দেখা হয়ে গেল, একটা চা খেয়েই বেরোব। রীতা আশ্বর হয়ে দু'দলে উঠল।

প্রিয়বালা কণীকণ্ঠে বললেন, পাখাটা একটা খুলে দিদি দিদি?

রীতা আশ কোন কথা না বলে পাখাটা খুলে দিলে ঘর থেকে বেরিয়ে বাবান্দার প্রান্তে নিজের পড়ার ঘরে এগোল। প্রিয়বালা পাশ ফিরে শুনতে পেল রীতাব গলা—এই ছাড়ো কসভা, দিদা ও-ঘরে রইছে। উত্তরটাও কানে এল,—বড় মানুস, ও সত্য বুঝবে না।

তারপরেই খিল-খিল হাসির আওয়াজ, আর জ্বতো পায়ে সামান্য ছোটোছোটো আওয়াজ।

একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে চোখ বুজলেন প্রিয়বালা। তাকিয়ে থাকতে সাহস হোল না। চোখ বুজে পড়ে থাকাই ভাল। রীতাদিদির কোন দোষ নেই। বয়েস একুশ-বাইশ হবে নিশ্চয়। দেবুর উচিত ছিল আর পাঁচ বছর আগে ওবাঁ বিয়ে দিয়ে দেয়া। যৌবন এলে বয়সের দোষ একটা-আটটা আসবেই। রীতার কি দোষ!

দেবুই বা বিয়ে দেবে কি কবে? এক-কাঁড়ি টাকা না ঢাললে এখনো মেয়ের বিয়ে হয় না। কটা টাকাই বা জমাতে পারে দেবু। খেটে-খেটে হাড় কাঁজ হয়ে গেল ছেলের। তবু কুলাতে পাবে না। কি আশ করবে? ওবও দোষ দেয়া যায় না।

উঃ বড় হাঁফ লাগছে। পাখাটা কি খুব জোরে চলছে? পাখার হাওয়াটা এলোমেলো ঘুরে-ঘুরে নাকে-মুখে লাগছে। ভাল কবে দয় নিতে পাচ্ছেন না প্রিয়বালা। বুকের ভেতরে অনেকটা শ্বাস নিতে পারলে আরাম

হোত। কেমন ফাঁপড় ফাঁপড় ঠেকছে। পাখাটা বন্ধ করে দিতে পাখলে বোধ হয় ভাল হোত। কে এখন বন্ধ কবে দেবে?

চোখ বুজে চুপ করে পড়ে থাকলে অস্বস্তিটা হয়তো কিছুটা কমতে পারে। তাই থাকবে কিছুক্ষণ। জোর কবে চোখ বুজে পড়ে বইলেন প্রিয়বালা। একটু সময় তাঁর আর কোন জ্ঞান রইল না। কেমন একটা অসাড়-অচেতন্যভাবে পড়ে রইলেন। কতটা সময় কাটল কে জানে?

—দিদা, অ দিদা!

জাকটা কানে এল। হাতের ওপর ঠালা দিচ্ছে কে? হাতে লাগে প্রিয়বালা। আস্তে-আস্তে তাকান। সোনা এসেছে। পরনে হাত-কাটা সাট। আব কালো হাফপ্যান্ট, পায়ে ফিতে বাঁধা জুতো। ওই জুতো পরে নাকি মাঠে খেলা কবে?

—তোমার কাছে একটা টাকা আছে দিদা? আমাকে দেবে? বড় ভদ্র দবকার ছিল। প্রিয়বালা নাকের দিকে তাকালেন। বেশ লম্বা-চওড়া হয়েছে, বড় হল ঠিক দেবুর বাবার মত দশাসই চেহারা হবে।

—দাও না, আজকে ম্যাচ আছে, একটা টাকা খুব দবকার।

প্রিয়বালা বলেন,—এক টাকা তো নেই দাদু।

—কত আছে শিপিংর বেলো, ম্যাচের দেবী হয়ে বাবে।

—পাঁচ টাকার একটা মোট আছে।

—অ, গুড। নোটটা দাও, আমি ভাঙিয়ে দিচ্ছি বাব।

প্রিয়বালা কোনমতে টেনে হাতটা উঠিয়ে বিছানার তলা থেকে একটা বড় ন্যাভা বার করলেন, তাতে বাঁধা একটা পাঁচ টাকার নোট। গেরোটা খুলতে পাবলেন না প্রিয়বালা।

—দাও, আমি খুলে নেই। তোমার স্মার্ট হবে না।

গেরোটা একটানে খুলে পাঁচ টাকার নোটখানা নিয়ে ফিতে বাঁধা বটে পরে খট-খট করে বোঁকিয়ে গেল সোনা। সোনা, প্রিয়বালা তাকিয়ে রইলেন নাকের দিকে। আস্তে আস্তে ন্যাভার টুকরোটা বালিশের তলায় গুজে থাকলেন। টাকা পাঁচটা কয়েক দিন আগে তার বড় জামাই তাকে দেখতে এসে ফল খেতে দিয়ে গিয়েছিল। প্রিয়বালা ফল খাননি। ভেবেছিলেন ভাঙিয়ে বেখে দেবেন। দাদু এসে চাইলে আট সোনা এক টাকা মাঝে-মাঝে তাকে দিতে হয়, তাই দেবেন। কিন্তু ভাতান আর হয় নি। সোনা-দাদু আজ পাঁচটাকার নোটখানাই নিয়ে চলে গেল। কদিন আর এ-ঘরমুখো আসবে না দাদু টাকা পাঁচটা ভাঙিয়ে ফেরত চর টাকা তাকে আর দেবে না।

জানে প্রিয়বালা। তবু একটা মাত্র নাকি। ঠাকুরমার কাছে এসে চাইলে কি করে তিনি না বলেন। কিই বা দিতে পারেন তিনি নাকি-নাকিনীকে। থাকত আজ দেবুর বাবা, প্রাণভাবে খাওয়াতে-পরতে পারতেন ওদের। এখন তাঁর দেবার ক্ষমতা কতটুকুই বা আছে? তবু সোনাদাদু তাঁর কাছে আশ্রয় কবে আট সোনা একটা টাকা মাঝে মাঝে চায়, তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে দেন ওকে।

দিনে প্রাণটা ভাল লাগে। টাকা সিকেটা পেয়ে দাদুর মন হাসিতে ভরে ওঠে।

চাইবে বইকি? ঠাকুরমার কাছে চাইবে না তো চাইবে কার কাছে? দেবু শুনতে পেলে বাগ করে। তুমিই পরসাদ দিয়ে দিবে ছেলোটাকে নষ্ট কবলে মা। নষ্ট আত্ম কি হবে। দুটো-চারটে পরসাদ ছেলেপুলে চেয়েই থাকে। দেবুও কি ছোটবেলার তাব কাছে পরসাদ চাইত না? দেবুর কি আর সেসব কথা মনে আছে?

বুকটার ভেতর বড় ব্যথা করছে। পাখার হাওয়াটা আবার অস্বস্তি লাগছে প্রিয়বালা। সোনাদাদুকে বললে হোত পাখাটা বন্ধ করে দিয়ে যেতে। বলা হোল না, মনে ছিল না। আবার কখন কে আসবে? কাকে বলবে। মাথাটা বন্ধনা হচ্ছে। গা হাত প ব্যথার যেন বিষ।

হুশ থাকছে না প্রিয়বালা। মাঝে মাঝেই কেমন বেহুশ হয়ে যাচ্ছে।

আবার চোখ বুজে এল। একই ভাবে পড়ে রইলেন প্রিয়বালা।

কতক্ষণ এভাবে পড়েছিলেন মনে নেই। চমক যখন ভাঙল, তখন দেখতে পেলেন বাবে আলো জ্বলছে। আশ-পাশে কারো কোন সাড়শব্দ পেলেন না। সব জেগে কোথায়? সবাই কি নীচে? ওপরে কেউ নেই? কেউ কি তাঁর কাছে একবার আসতে পারে না। দেবু ফবেছে কিনা কে জানে।

বিষয় চোখদুটো মেল তাকিয়ে বইলেন বাবামদার দিকে।

এতক্ষণ কানে আসছে নীচে থেকে অক্ষট হাসি-গল্পের আওয়াজ। ওবা মিশ্রম খেতে বসেছে। খেতে বসে ওরা হাসে গল্প করে। একটু আনন্দ কবে, আহা তা করুক। সমস্ত দিন খেটে-ঝেটে আসে দেবু, রাতে খেতে বসে আনন্দ করে গল্প কবতে করতে ছেলে বা নিয়ে খার। একটু পবেই ওপরে আসবে সব।

একা-একা শূন্য বারান্দাটাব দিকে ছালো চোখদুটো মেল তাকিয়ে রইলেন



প্রিয়বালা। বুকের ভেতর কেমন দহন মাঝে মাঝে আটকে যাচ্ছে। পবে নিঃশ্বাস টানতে পারছেন না প্রিয়বালা।

ওই তো সব এল। সিঁড়িতে সব পায়ের শব্দ। সবাই খাওয়া মিটিয়ে উঠে আসছে। দেবু ঘরে ঢুকল। লুকি আর 'গেজি' পরেছে দেবু। চোঁকির পাশে এসে দাঁড়াল। দেবুর দিকে চোখ মেলে তাকালেন প্রিয়বালা। দেবুর একখানা হাত ধরে আসতে বললেন,—কখন এলি বাবা?

—এই খানিকক্ষণ আগে। আজ ফিবেতে দেবী হয়েছে মা! অপিসে যা কাজ পড়ছে। যত্ন জল করে দিলে।

প্রিয়বালা ডাকালেন। আহা, সত্যিই তো দেবুর অমন ভরাট মদ্যখানা শুনিকবে গেছে। এত খাটুনী কি দেহে সন্ন? সকালে বেবোয়, ফেরে রান্দিরে।

—একি মা তোমার হাতটা গরম কেন? ও বাবা, এয়ে দেখছি জ্বরে গা পড়ে যাচ্ছে! কপালে হাত বেধে বললে দেবপ্রসাদ।

প্রিয়বালা কানকণ্ঠে বললেন,—ও কিছু নয় বাবা। খেটে-ঝেটে এসেছা, নাও শোওগে।

—দেখি, কাল ডাকাতকে একটা খবর দিতে হবে। বলে চিন্তিত মূখে ঘর থেকে বোঁকিয়ে গেল দেবপ্রসাদ।

কনক বললে,—তবে আজ বাস্তিরে আর আপনার কিছু খেয়ে কাজ নেই মা। এক গেলাস জল রেখে গেলুম। দবকাব হলে আমায় ডাকবেন। একা বাথরুমে যাবেন না। আলোটা নিভিয়ে দিবে যাই।

প্রিয়বালা ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে বইলেন বোমার দিকে।

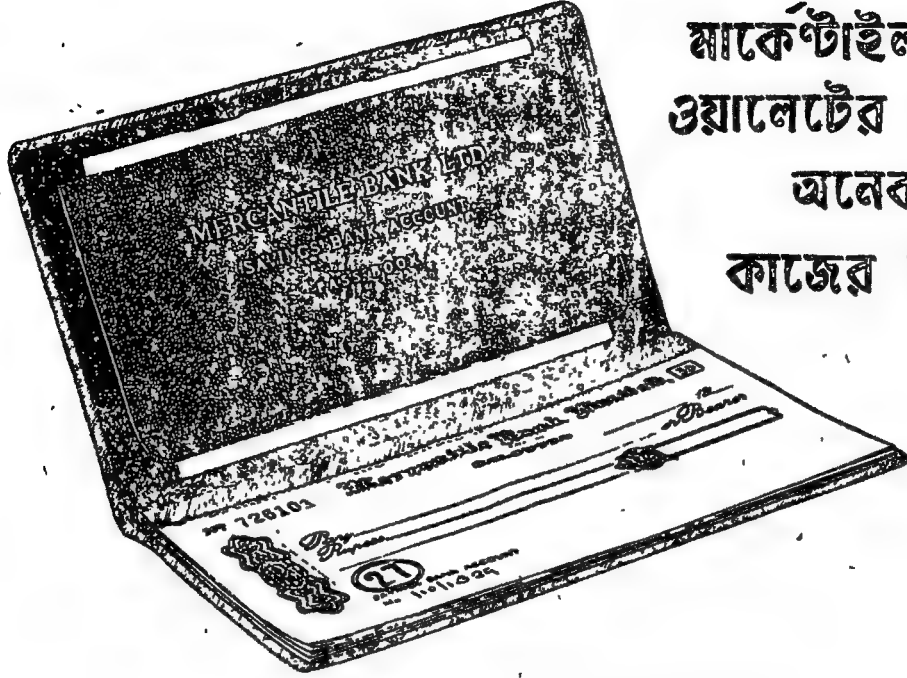
কনক আলোটা নিভিয়ে দেবটা ভেজিয়ে দিয়ে বোঁকিয়ে গেল।

অন্ধকার ঘরে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে বইলেন প্রিয়বালা। শরীরটা আজ ভাল লাগছে না। থেকে থেকে বকের ভেতরটা কেমন করছে ভাল কবে দম নিতে পাচ্ছেন না। দেবু বোমার ভেতর একজনকে এ-ঘরে আজ থাকতে বললে ভাল হোত। বড় একা মনে হচ্ছে, কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে। দেবুর খটুনীর শব্দ। সে থাকবে কি কবে? আব বোমা—?

বাইবে থেকে বোমার গলাব আওয়াজ কানে এল,—কি ভাগা ভাগে বাপদ! তিনটে বছর আমার দেহ পাত হয়ে গেল। আবার জন্ম এল। উঠতে না পারলে বিছানায় বেড-প্যান দাও, খাওয়াও, নাওবাও—!

দেবুর উত্তর কানে এল,—সত্যি তোমার শরীরটা অনেক জন্মেই খাবাপ হচ্ছে। দিন-রাত একটা রুগীর সেবা। মায়েব এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল—।

প্রিয়বালা অন্ধকারে ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে রবেছেন। চোখের কসদুটো বেয়ে দরদর করে জল পড়ছে গালের কোঁচকানো চামড়া ফাকে-ফাকি। বড় একা লাগছে আজ। ভীষণ একা। শূন্য হাত বাড়িয়ে কিছু যেন ধবব চেষ্টা কবেছেন প্রিয়বালা, কিছুই ধবতে পারছেন না। নিঃসীম শূন্য অন্ধকার তাঁকে গ্রাস কবে ফেলছে ধীরে ধীরে। প্রিয়বালা অসাড় হয়ে পড়ে রইলেন।



মার্কেটাইল ব্যাঙ্ক
ওয়ালেটের ভিতরে
অনেক কিছু
কাজের জিনিস
আছে



এর ভিতরে আপনার পাল বই, চেক বই,
সেভিংস ব্যাঙ্কের নিয়মাবলী এবং নগদ টাকা রাখবার
জায়গা আছে (কিন্তু বেশী টাকা নয়—কারণ
নগদ টাকা মার্কেটাইল ব্যাঙ্কে রাখলে আপনি
সুদ পাবেন)। আপনার সুবিধার জন্য অনেক
ভেবে চিন্তে এই ওয়ালেটের ডিজাইন করা হয়েছে।
মার্কেটাইল ব্যাঙ্কের চটপট কাজের এটা একটা দিক।

মার্কেটাইল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

(ইংলণ্ডে সমিতিবদ্ধ)

হংকং ব্যাঙ্ক গোষ্ঠীর একটি সদস্য • ১০০ বছরেরও অধিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন

কলিকাতা প্রধান অফিস : গিলাস্তার হাউস, ৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিঃ-১

স্বামীয় শাখা সমূহ

- ১৫, গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা-১৯
- পি৩৭৫, ব্রুক স্ট্রিট, নিউ আলিপুর, কলিকাতা-৫০
- ২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯
- ২২, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, হাওড়া

MPB/MB/3/67 BEN



“নয়নপথগামী ভবতু মে”

উত্তরামুনি

সুকুমার সেন

সীতার পাতাল প্রবেশের পর রাম যেন অন্যরকম হয়ে গেলেন। তাঁর জীবনের তেজ কমে গেল, রস শূন্য হয়ে এল। রাজ-কার্যে মন বসে না। লক্ষ্মণ নিজের অস্তঃপুরে নির্বিঘ্ন ভবত-শত্রুঘ্ন দিশংহরা। ব্যাপার শেষে বিভীষণের প্রতিনিধি লক্ষ্যায় প্রভুর কাছে রিপোর্ট পাঠালে। বিচলিত হয়ে বিভীষণ সরমাকে নিয়ে অযোধ্যায় চলে এলেন। সরমা রামের ভার নিলেন, বিভীষণ রাজ্যের।

রাম এখন পূর্বাঙ্গে কাজকার্য দায়সারা গোছ করেন। দূপদূরে আহারান্তে যোগ-নিদ্রা সেবন। অপরাজিত শ্রান্তবর্গের সঙ্গে লব-কুলের গান শোন। সন্ধ্যার পর সরমার মুখে সীতার স্মৃতি কথা। দিন একরকমে কেটে যায়।

বিভীষণ স্বর্গের রাজকর্মচারীদের ভূমি-দান করে সরিয়ে দিলেন। লক্ষ্য থেকে তরুণ কমণ্ডি রাক্ষস আনিয়ে তাদের বঁসিয়ে দিলেন বিভিন্ন বিভাগের নায়কত্বে। কিন্তু প্রবীণ রামব-সেনাপতিদের টালানো গেল না। সর্বাধিনায়ক রামের হাতেই রইল। কার্যত বিভীষণ রাজ-প্রতিনিধি ও প্রতি-রাজ হয়ে রাজ্যের হাল ধরে রাখলেন।

লক্ষ্য বিদ্যা শিখে নিয়ে ও সংস্কৃত সংস্কৃতি গ্রাস করে অযোধ্যায় লোকেরা যত্নে রাক্ষস শাসনকর্তার উৎসুক নহ-যোগী হতে পারে সেই উদ্দেশ্য নিয়ে বিভীষণ রামরাজের শিক্ষাবিধি নতুন করে প্রণয়ন করলেন। উত্তম শিক্ষার জন্য লক্ষ্যের পাঠানোর ব্যবস্থাও হল।

বংশকর্তা রঘু দিগ্বিজয়ী দুর্ধর্ষ বীর যোদ্ধা ছিলেন। রাজা দশরথ কিছু যুদ্ধ করেছিলেন বটে কিন্তু তা উল্লেখযোগ্য নয়। ১৫ প্রচণ্ড বীর ছিলেন। একাকী অনেক যুদ্ধ করেছিলেন, লক্ষ্যবিজয়ে মহাযুদ্ধ চালিয়েছিলেন। কিন্তু সে মহাযুদ্ধে তাঁর প্রজা-সৈন্য সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল। তিনি আদিবাসীদের নিয়ে লড়াই করে-ছিলেন। অযোধ্যাবাসীরা অহিংস। তারা জিহবা ছাড়া কোন অস্ত্র পরচোহ ব্যবহার করতে জানতেন না। সেই কারণেই রাজ-ধানীর নাম হয়েছিল অ-বোধ্যা। রামরাজের অধিবাসীরা যে যুদ্ধকার্যে অহিংস (অথিং পার্সিফিস্ট) তা বিভীষণ মনেপ্রাণে জান-তেন। তিনি তাদের যুদ্ধবিদ্যায় তালিম দিতে উদ্যোগ করলেন। যুদ্ধ না করলে যুদ্ধবিদ্যা শেখা যায় না। তাই তিনি রামকে বলে তিন রাজসভাতে তিন দিকে পাঠালেন যুদ্ধোদয়ন ও রাজাবিস্তার করতে। বলা বাহুল্য দশরথের পুত্র রামের

ভাই তাঁরা অজ্ঞা। তাঁরা যে সব দেশ জয় করলেন সে সব বিদ্রোহীদের চমক করলেন সেখানে সেখানে সামন্তরাজ্যরূপে রয়ে গেলেন। কিন্তু অযোধ্যা ছেড়ে এসে তাঁরা স্বাভাবিক করেন নি। কিছুকাল পরে নিজের পুত্রকে প্রতিরাজ করে বসিয়ে তাঁরা তিন ভাই অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

এদিকে বিভীষণ দেখলেন যে, যুব-রাজ্যের কুশ ও লব নাটোয়ানে মগল হয়ে দিনরাত মেতে উঠছেন। অবিলম্বে তাঁদের যুদ্ধবিদ্যা ও রাজনীতি শেখা আবশ্যিক। কিন্তু অযোধ্যায় থাকলে তা হবার যে নেই। সুতরাং অনেক কষ্টে রামকে বুঝিয়ে তাঁদেরও অযোধ্যা থেকে সরিয়ে দেওয়া হল দু'জায়গাতে রাজ্য করে।

রাজসভায় অযোধ্যায় ফিরে আসা-বিভীষণের প্ল্যান অনুসারে বাক্য করা বাধা পড়ল। তবে বিচক্ষণ তিনি, তেবে স্বয়ংলন ভাইদের একে একে এলিমেন্ট করতে হবে। প্রথমেই লক্ষ্যকে, কেননা রামের উপর তাঁর প্রভাবই সবচেয়ে বেশি। বিভীষণের চক্রান্ত এক লক্ষ্য নট-সম্মাসী কালপুরুষ সেজে রামের সঙ্গে গোপনকক্ষে সাক্ষাৎ করে তাঁকে জর্নিয়ে দিলে যে, তিরোধানের সময় হয়েছে। গোপনকক্ষের বাহিন্যের প্রহরী ছিলেন লক্ষ্য। তাঁর প্রতি নির্দেশ ছিল কেউ যেন সে ঘরে না ঢোকে। যখন রাম কালপুরুষের সঙ্গে কথা কইছিলেন, তখন আর এক নট পুবাশা সেজে এসে লক্ষ্যকে হুকুম করলে, আমাকে ভিতরে যেতে দাও, না দিলে শাপ দেব। লক্ষ্য রামের অনুমতি চাইতে ঘরের ভিতরে গেলেন। সেই হল তাঁর অপরাধ। মণ্ডীদের অনুমোদন নিয়ে (তারা কি মঞ্চমুগ্ধ ছিলেন?—) রাম লক্ষ্যের প্রাণদণ্ড বিধান করলেন, তবে ঘাতকের হাতে নয় নিজের হাতে—এইটুকু দয়া দেখানো হল। লক্ষ্যের সরসর জপে আত্মবিসর্জন করলেন।

রাম এখন সিংহাসন ছাড়তে ব্যাকুল। তাঁর ইচ্ছা নাযা উত্তরাধিকারী ভরত রাজ্য হোক। যিনি যৌবনে রাজপাট স্পর্শেও পরিত্যাগ করেছিলেন তিনি এখন তা চাইবেন কেন? ভরত বললেন, কুশ-লবকে অযোধ্যায় পাঠে বসানো হোক। অযোধ্যায় লোক কুশ-লবের প্রতি প্রসন্ন ছিল না রাম হয়ত তা বুঝতেন, অথবা বিভীষণ তাঁকে সেইসকল বুঝিয়েছিলেন। তাই তিনি পুত্রদের তত্ত্বাবধা থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। কুশ গিয়েছিলেন নক্ষত্র বিম্বাপালকুলে। সেখানে তাঁর রাজধানী হল কুশাবতী। লব গেলেন উত্তরে। সেখানে তাঁর রাজধানী হল শরাবতী

বা শরাবতী। উত্তর দুই পুত্র, পুত্রের (পুত্রের) ও তক্ষ, আগেই উত্তর-পশ্চিমে সিংহদেবীর ওপারে যথাক্রমে পুত্রস্বতী ও তক্ষশিলা রাজধানী করে স্থাপিত। লক্ষ্যের পুত্রস্বতী, অগ্নি ও চন্দ্রকুট, পূর্ব-দেশে রাজ্য করতেন। এখন শত্রুঘ্নের দুই পুত্রকে অযোধ্যা থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। সুবাদে গেলেন রঘুনাথ, শত্রুঘ্ন তাঁর বান্দা।

ভরতকে সরিয়ে রামে নিরঞ্জন বসিয়ে রাখা মন দিলেন বিভীষণ। তিনি কাজ-পুত্রের কথা রামকে ভুলতে দেন না। বোধকরি তিনি শেষপর্যন্ত বিভীষণের দায়-ধরতে পেরেছিলেন তাই তিনি তাঁর পুত্র বিভীষণকে রাজ্যচালানোর নির্দেশ পুত্র-ছিলেন। (‘‘শাপিতস্তং সখ্যেন কার্যং ত্রৈ-মশাসনম্’’ প্রজ্ঞাতং কক্ষ ধর্মেন নোত্তরং বহুমহাশি।) অতঃপর এতই উপসর্গ ও নিম্পত্তি যে সংসারত্যাগের উপমাটুকুও আসে না। তখন বিভীষণ তাঁর শেষ চলে চালালেন। অযোধ্যায় প্রজ্ঞাপিত হইয়া কুশ-কু-প্রকৃতিও সে বিদ্রোহে যোগ দিলে। সীতার পাতাল প্রবেশ থেকে যার সূত্রপাত, বিভীষণের কর্তৃগিরিতে বা প্রকৃতিত তা এখন সরসর জগোজ্জ্বলের সঙ্গে মিলে গিয়ে অযোধ্যায় গ্রাস করলে। বাস্তবিক অবশ্যই কুশ-ভরত ও প্রজ্ঞাপিত নিয়ে রাম সরসর প্রবেশ করেছিলেন, সরসর জগোজ্জ্বল সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে বৈকুণ্ঠে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আসল কথা এই। এই বিপ্লবকালীন গ্রাস করতে পেরেন শত্রু দু'জনকে। তাঁরা হলেন হনুমান ও বিক্রমদ।

অযোধ্যায় বান সরে গেলে পর দীর্ঘ ধীরে আবার জনবসতি শুরুর হল। কিন্তু শূন্য প্রাসাদপুত্রীর শূন্যতা ঘোড়ার কে। রাজা না থাকলে রাজধানী হয় না। অযোধ্যায় ভাঙা রাজহাটের ব্যাপারীরা সকলে মিলে পরামর্শ করে স্থির করলে, রামের পরিত্যক্ত সিংহাসনের নাযা অধিকারী তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র কুশকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনতে হবে। এদিকে তপোবন-জন্মা কুশ বিম্বাজনপদবাসী বুনো প্রজাদের নিয়ে আরামে আছেন। বিবাহ করেননি, রাজ্য-ভারও গুরু নয়। নাট-গান অভিনয়ের তাঁর দিন কাটে। তাঁকে তোলাতে হলে যে কোশল প্রয়োজন, অযোধ্যাবাসীরা তা অবলম্বন করলে। অযোধ্যায় প্রের্ত সুন্দরী নটীকে তাঁরা পুত্রদেবীর সঙ্গে সাজিয়ে কুশাবতীতে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁকে বলে দেওয়া হল, গভীর রাতিতে কুশের কাছে গিয়ে অযোধ্যায় দূরবস্থা জানিয়ে তাঁর মন গলিয়ে দেবে।

কুশের দরবারে, আমে ও খাশে, সুন্দরী নারীর প্রবেশ বাধাহীন, অস্তঃপুরে তো কথাই নেই। অযোধ্যাতী স্বাভাবিক রাজ-পুত্রীতে প্রবেশ করলেন, কুশের মরনকক্ষে ঢুকলেন নিঃশব্দচরণে। কুশ উদ্ভাগত। ঘরে দীপ জ্বলছে, বোধহয় তিনি বই পড়ছিলেন। সুন্দরীর বসনবলনের শব্দে তাঁর চটকা ভেঙে গেল। কুশ দেখলেন সুন্দরী নারী। ভয় হল বুঝি বা কেউ বিধবন্যা পাঠিয়েছে। তারপর ভয়ের স্থানে বিম্বর জাগল, নারীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। নারী বললেন, আমি অযোধ্যা নগরীর অধিবাসী দেবী।

তারপর অযোধ্যার নৃসিংহকাহিনী বলতে লাগলেন কাতরভাবে। (সে-কাহিনী আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল)। তিনি বললেন, বড় বড় প্রাসাদ, তাতে অশ্রুত ডান্ধব ও অগ্নবৈ চিত্রাঙ্কন—সব যেন পড়ে ভুতের বাড়ি। কোন কোনটার বন্যজন্তুর বাস, কোন কোনটা রোমে-জলে তেতেপুড়ে তিলে তিলে ক্ষয় হচ্ছে। বড় বড় দীঘি সব পাঁকে ভরতি, তাতে বুনো মোষ আনন্দে ডুবে থাকে, সত্যিই দেখ। রাস্তাঘাটের কথা বলাই বাইরে। রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুশ জীবিত থাকতে হুতুল-রাজধানীর যদি এমন দশা হয়, তবে কিসের রামায়ণ-গান। শুনে কুশ বিচলিত হলেন, তিনি কথা দিলেন অযোধ্যায় ফিরে যাবেন।

কুশের যে কথা সেই কাজ। অযোধ্যায় পা দিয়ে কুশ নগর-সংস্কারের প্ল্যান করলেন। প্ল্যান-মাফিক সংস্কার হল। বোদ্ধ উপচারে মায় পশুবলি সমেত নগর-দেবীর পূজা দেওয়া হল। অযোধ্যাবাসীরা মেতে উঠল।

অনেক টাকা খরচ হল। আরও চাই। আর টাকা জোগানোর সমর্থ্য প্রজাদের নেই। কুশ কুশ মন্ত্রীদেব সঙ্গো পরামর্শ করলেন। মন্ত্রীরা বললেন, ধনী রাজার সঙ্গো বন্ধুত্ব করলে টাকা মিলবে। ঘটনাক্রমে মন্ত্রীদেব ভাবনা মতো ঘুরে গেল। নাগরাজ কুম্ভদেব সঙ্গো কুশের মিত্রতা ঘটে গেল। কুশ, নাগ-রাজের ভগিনী কুম্ভবতীকে বিবাহ করে সে-বন্ধন দৃঢ়তর করলেন। তখন তার কোষাগার ভরে উঠল, রাজ্যও শ্ৰীত হল। কুশের পুত্রসন্তান হল। নাম তার অতিথি। অতিথি যথোচিত শিক্ষা পেলেন। কয়েকটি রাজকন্যা খুঁজে এনে তার সঙ্গো বিয়ে দেওয়া হল। রাজ্য-শাসনভার বৃদ্ধ কুশকেই বহন করতে হল।

কুশের সমাধি প্রতিবেশী কোন কোন রাজার ঈর্ষা জাগিয়েছিল কিন্তু কেউ তাকে বাঁচাতে সাহস করেনি। তার এক মিত্র-রাজার রাজ্য এক পরাক্রান্ত অসুর-রাজ্য আক্রমণ করার বৃদ্ধ কুশকে সাহায্য করতে হয়েছিল। সে-যুদ্ধে অসুর-রাজ্য পরাক্রান্ত ও নিহত হল। কিন্তু কুশও নিহত পেলেন না; প্রতি-পক্ষের অশ্রাব্যতাতে জর্জর হয়ে তিনি অচির প্রাণত্যাগ করলেন। কুম্ভবতী সহস্ররূপে গেলেন। যথাকালে মহাআড়ম্বরে অতিথির অধিবাক নিম্পন্ন হল।

একটি অবচীন পুঁথির বস্তু অবলম্বন করে উপরে বর্ণিত পরাক্র-রামায়ণ কাহিনী-টুকু দেখা হল। পুঁথিটি ছোট এবং পেশ-ভাগে খণ্ডিত। প্রথম পাতার সবপ্রথমে আছে 'অধস্তারায়নং লিখিত' শেষ পাতার সবশেষে আছে 'অতপরা'। পুঁথিপ্রান্তের একটু ইতিহাস আছে। সেটুকু উত্তররামায়ণ-কাহিনীর পক্ষে একেবারেই অবহতর। ইতিহাসরসিকের পক্ষে প্রাসঙ্গিক হবে মনে করি বলছি।

সামান্য কোন কাজে বাইরে চলেছিলুম। গাড়ি রাত নটায় ছাড়বার কথা, ছাড়ল যথ-সময়। আহা! যদি বাঁচতাম হুঁকার।

গাড়ি ছাড়তেই বই বুলবুলে কিন্তু গাড়ির যে আলো তাতে চোখ চলে না। কামরার আমি একলা যাত্রী। দরজা বন্ধ করে শুরুর পড়লুম। গাড়িতে আমার ঘুম আসতে সাধারণত বিলম্ব হয় না। তন্দ্রা এল অসং-কণের মধ্যে। সে-তন্দ্রা গাড়ি হবার আগেই ছুটে গেল। গাড়ি এক স্টেশনে দাঁড়িয়ে। দুটো জানলা খোলা ছিল, তা দিয়ে বোড়ো হাওয়ার জলের ছাট আসছিল। উঠে বসতেই গাড়ি ছাড়ল। আমিও জানলা বন্ধ করে শুরুর পড়ব পড়ব করছি, এমন সময় জানালার ফাঁক দিয়ে বোড়ো হাওয়ার সঙ্গো কী যেন একটা বস্তু সামনের বোঁতে এসে পড়ল। কেউ কিছু ফেলে দিলে মনে করে বাইরের দিকে তাকালুম। দেখলুম গাড়ি প্লাটফর্ম ছাড়িয়ে গেছে। চোখে পড়ল ক্যাবিনের গায়ে স্টেশনের নাম—পানীকুড়া। ভাবনা হল। কেউ বোমা-টোমা ফেললে নাকি। তখন মনে হল আমার যতো নগণ্য ব্যক্তির জন্যে কেনে বোমা নষ্ট করবে। হয়ত পাশের গাড়িতে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি আছেন বিনি উদ্ভিষ্ট। বাই হোক উঠে গিয়ে না ছুঁয়ে বস্তুটি নিরীক্ষণ করতে হল। মনে হল কাগজের বাঁশড়, বোমা বা হাত-গেনেড নয়। মনে অবস্থিত নিয়ে শুরুর পড়া গেল। গাড়ির সোলার ঘুমিয়ে পড়তে বেশি হল না। ঘুম বন্ধন ভাঙল, তখন সকাল হয়েছে, গাড়ি কটক স্টেশনে ঢুকছে। চোখে পড়ল সামনের মেঝে বাঁশড়টি ঠিক তেমনি আছে। ভোজনাগারের লোক চা দিয়ে গেল। চা খেলুম। ট্রে নিয়ে যাবার সময় বেরায়া আমাকে হুঁশিয়ার করে দিলে যে আমার কাগজপত্র ওদিকে পড়ে আছে। আমি হী-না কিছাই বললুম না। আশা করছিলাম কটকে কেউ দেখা করতে এলে তাকে বাঁশড় নিয়ে গিয়ে ব্যবস্থা করতে বলব। কেউ এল না। গাড়ি কটক ছাড়ল।

যথাসময়ে ট্রেন ভুবনেশ্বরে থামল। আমি নামলুম। কুলিকে বললুম বাঁশড়টা ভুলে নিতে। রিটার্নিং-রুমে গিয়ে উঠলুম। হাত-মুখ শুরুর দুইয়ের নম্বর চা-পান করে নিশ্চিন্ত হয়ে সন্তপণে বাঁশড়টা বুললুম। দেখলুম কাপড়টা পুঁথি গোল কপা গোটানো, পুরানো খবরের কাগজে মোড়া। সবদিক খান-বারো পাতা দু'পাঠে লেখা। কাগজ পুরানো নয়, লিপিহীন প্রায় আধুনিক, চোখ বুলিয়ে মনে হল অভ্যাস গ্রন্থ। নামটি বিশেষ কৌতূহলজনক 'উত্তরামায়ণ'। বিষয় যেন রামায়ণের পরি-শিষ্ট। নব আবিষ্কারের আনন্দে মন ভরে উঠল।

তড়াতাড়ি স্নানাহার সেয়ে নিয়ে যে কাজের জন্যে আসা ঠা-সারতে চললুম। কাজ শেষে ফিরে এলুম বেলো দুটোর। ফেরবার গাড়ি সন্ধ্যা সাড়ে ছটায়। এই সময়ের মধ্যে পুঁথি সবটা টুকে নেওয়া সম্ভব নয় বলে আমি ভালো করে পড়ে নিয়ে মধ্যাং নোট করলুম। তারপর সমস্যা হল পুঁথি টি নিয়ে এখন কী করি। ভেবেবো। থেবে পড়ে শুনে এসেছি পরের ট্রা লইলে চুঁরি করা হয়। বড়ি কলছে, এখন তো শ্যাই

সব যখন নিতেছে, তখন জেমাং নিতে দোকটা কী। কিন্তু বালাকালের কান্ধা তো শিথিলমূল নয়। অন্যর বিধা যায় না। মন একবার উপনিষদের বাণী আওড়ায়, "তেন তাতেন ভুজীথা", অর্থাৎ অধিকারী ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে তুমি নিতে পার। কিন্তু যার পুঁথি সে যে ওটি ত্যাগ করেছে, তার প্রমাণ কই। ব্যাপারটা পান-কুড়োর ঘটলেও ফেলা হয়েছে রেলের কামরায়। এতে ত্যাগ বলি কি করে। পর-ক্ষেই মন থেকে কতবোয় বাণী উঠল—উচিত সেই রেকের সেই বোঁগির সেই কামরায় সেই বোঁগিতে পুঁথিটি ৩ মিনি মোড়ক করে রেখে আসা। উচিত একশো-বার। পুরী গিয়ে স্টেশন ইয়ার্ডে রেকটি পাওয়া যাবে, কামরার নম্বরও জানা আছে কিন্তু বোঁগি চিনব কিসে, তার নম্বর তো লিখে রাখিনি। যা উচিত তা অসম্ভব।

এখন কী করি। ভেবে ভেবে ঠিক করলুম এই রিটার্নিং-রুমেই রেখে যাব। তবে এমনভাবে নয় যাতে পুঁথিটি লুপ্ত হয় অথবা অব্যাহতের হাতে পড়ে। কারো হাতে না পড়লে আরো ভালো। ট্রেনিং-টেবিলের একটা ড্রয়ার খুলে নিয়ে তার গিছন দিকে পুঁথির মোড়কটা গুঁজে দিয়ে ড্রয়ার লাগিয়ে দিলুম। এখন গলতান্ডবে হুঁতানন আর সুন্দর ভবিষ্যতে ফানিচান-ওয়াল ছাড়া কেউ ওটি স্পর্শ করতে পারবে না। মন ঠান্ডা হল।

যথাকালে ফিরতি ট্রেনে উঠলুম। কণ্ডাক্টরকে ডেকে কটকে খাবার দিতে বললুম। সে বললে, আজ সোমবার, বিকালের পর চা ছাড়া কিছু মিলবে না—শাস্ত্রীজীর নির্দেশ। মনটা দমে গেল, লাল-বাহাদুর শাস্ত্রীর প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা ছিল, তা কিছু ক্ষয় হল। এতক্ষণ যিদে বোধ করিনি, কিন্তু খাবার মিলবে না শোনামাই কুখানল প্রস্ফুর্নিত হয়ে উঠল। মনকে সান্তনা দিলুম কটকে নিশ্চয়ই গোপাল আসবে এবং খাবার বা হয় ব্যবস্থা করবে। কিন্তু হায়, কটক স্টেশনে গাড়ি ঢুকল বটে, থামতে চায় না। থামল প্লাট-ফর্মের শেষপ্রান্তে অধিকারের মধ্যে। অধিকারে মুখ বাড়িয়ে চেয়ে রইলুম গোপালের প্রত্যাশায়। গোপাল তে আসে না। স্টেশনেও খাবারের ফোরওল নেই। গাড়ি যখন ছাড়ে ছাড়ে, তখন ছুটে ছুটে গোপাল এল। তাকে কোন কথা বলতে না দিয়ে বললুম, গোপাল, দু'পড়ের পর থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। তুমি যা পও—কলা-মুলো কিছু এনে দাও। গোপাল ছুটল। মিনিটখানেক পরে গাড়িও ছাড়ল। আমি কাঁচি এক ঢোক জল খেয়ে শুরুর পড়ি এমন সময় জানলা দিয়ে সবগে প্রবেশ করলে একছড়া কলা। গোপালকে ধন্যবাদ জানাবার অবসর পেলুম না। গোটা-দুই কলা খেয়ে—নিশ্চয় হলোও জল খেলুম। তারপর শয়ন ও নিদ্রা। ঘুম ভাঙল সকালে সাতটা-গাছিতে।

পুঁথির অজ্ঞাত অধিকারীকে কুজুতা জামাছি, ভরসা করি, তিনি আমার বিরুদ্ধে কপিরাইটের মামলা আনবেন না।



নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ছাট্টিব দিনের সকাল হাসি-হাসি মুখ করে অমলেশকে ঢুকতে দেখেই আমার কিরকম রাগ হয়ে গেল।

একটু আগেই কিরে বাজার থেকে। অমলেশের জন্যে হাতছাতি হয়ে বারানি মাছ-গুলার সংগে। সে দেড়-পো কাটা পোনার ভেতরে বেশ নিশ্চিন্তভাবে দু-তিন টুকরো বাসি মাছ ঢালাবার চেষ্টা করছিল—আমি তারপরে বাধা দিয়েছি। তা গ্যাস জনমত আমার পেছনে ছিল (এ-সব ক্ষেত্রে প্রায়ই থাকে) তাই একরাশ গলাবাজির ওপর দিয়েই ব্যাপারটা মিটেছে—মারামারি পর্যন্ত আর এগোতে হয়নি। তারপর সেই কাচকলাওলা। সে বলেছিল, 'জোড়া কুড়ি পরস'—আমি বলেছিলাম, 'দশ পরস'। উত্তরে সে কলার ছড়াটা সরিয়ে নিয়ে বলেছিল, 'তা হলে কাচকলাই খান।' আমি জানতে চেয়েছিলাম : 'কথাটার মানে কী?' সে বলেছিল, 'বাড়ী গিয়ে ভাববেন।' আমি নেহাৎ ভদ্রলোক বলে আর পারের চিটটির একটা পেরেক উঠেছে বলে—লাকটাকে তখনকর মতো কমা করে বাড়ী চলে এসেছি।

তারপর, অনেকক্ষণ ধরে বখন গুম হয়ে ভাবছি, আর কতদিন এমন অহিংস ভ্রমসংক্রান্ত হয়ে কাল কাটানো যাবে—এমন সময় হাসি-হাসি মুখে অমলেশকে অস্বস্তি দেখে আমার গা জ্বালা করে উঠলো।

সংক্ষেপে বললুম, কী মনে করে এই সকালবেলায়?

ধীরে-সুস্থে বসে পড়ে অমলেশ বললে, কেন—আসতে নেই?

—নিশ্চয় আছে। ভগ্নি কট-কট করে ওর মুখের দিকে তাকালুম : বাজার করেছিস?

—বাজার?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, বাজার। মানে পোনা মাছ কিনেছিস? কাচকলার দর করতে চেষ্টা করেছিস?

অমলেশ পকেট থেকে একটা আমপোড়া সিগ্রেট বের করে ধরাতে ধরাতে বললে, বাজার তো আমি করি না, আমার ছোটভাই করে আনে।

বললুম, ট্রেটার।

—ট্রেটার মানে?

—মানে ট্রেটার। সকালে বাজারে যেতে হয় না বলেই অমন হাসিমুখে থাকতে পারছিস।

বিরক্ত হয়ে অমলেশ বললে, বাজে বাকসনি। নিজের জ্বালায় আমি মাথা ঘাচ্ছি—তার ভেতরে তুই খামোতা বকর-বকর শুরু করে দিলি।

—নিজের জ্বালায় মাথা ঘাচ্ছিস? তোর মুখ দেখে তা তো মনে হচ্ছে না। যেহেতু হাসি-হাসি মুখ করে এলি, তাহলে তো সন্দেহ হচ্ছে বেশ পরের পরসায় টোস্ট-অমলেট—

—থাম থাম। টোস্ট অমলেট-হুঃ! এতক্ষণে অমলেশের মুখটা খানিকটা কাচ-কলার দর-কলার মতো হয়ে এল : আমার এখন লাইফ গ্র্যান্ড ডেভ প্রবলেম।

—অফিস থেকে ছাট্টিই হচ্ছে বুদ্ধি? তা মন্দ নয়, তোর মতো বাজে লোককে তাড়িয়ে দেওয়াই উচিত। তুই দেখে নিস অমলেশ, তোদের ইউনিয়ন তোর জন্যে কিচ্ছু করবে না।

অমলেশ এবার চোঁচরে উঠল : তুই থাম থাম কিনা আমি জনতে চাই।

—আমি থামলে তোর লাভ কী?

—অস্বস্তি নিজের কথাটা একটু বলতে পারব। ডান ইয়ার কাচকলা, ফই আপন ইয়ার বাজার, হ্যাং ইয়ার ছাট্টিই—ডাউন উইথ ইয়ার—

ইংরিজিটা বেশ তোড়ে বেরিয়ে আসছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাকে ডাউন করা বাবে,

চটপট সেটা খুঁজে না পেয়ে ধেমে দেল অমলেশ।

বললুম, দারুন চটে আছিস দেখছি। তবে অমন হাসি-হাসি মুখ করে আসছিলা কেন?

—কে বলছে হাসিমুখ? আমি তো দাঁত খিঁচোচ্ছিলুম।

—আই সী।—আমি একটু অনুতপ্ত হলুম : দাঁত খিঁচোলেও কখনো কখনো হাস্যময় মনে হয় বটে। কিন্তু তাকে তো সকালে বাজার করতে হয়নি—তা হলে অত ক্ষেপে আছিস কেন?

—আমায় ইন লভ।

—আঁ।

—কানে কম শুনছিস নাকি আমকাল? বললুম না, প্রেমে পড়েছি?

—এই পরিশ্রম বছর করেনে? আমরা তো জেবোচ্ছিলুম তোর এই দূর্বৃত্ত্য দুর্গ—

—কখনো কখনো দূর্বৃত্ত্য দুর্গেও ডাকন মরে।

—ঠিক।—আমি মাথা নাড়লুম : তেমন তেমন গোলন্দাজ হলে। কিন্তু এই বয়েসে যখন দাড়িতে পাক ধরেছে তখন আবার কার প্রেমে পড়লি অমলেশ? কোনো স্কুলের মেয়ে কিংবা কেবল ডিম-ভাঙা কলেজের ছাত্রী-টারী না তো? তা হলে কিন্তু প্যাড়র ছেলেরা তোকে ঠেঙিয়ে—

—ইয়ু শাট আপ দুকুমার।—অমলেশ ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠল : পাগল পেলি নাকি আমাকে? ভাবনা নেই—তীরও বয়েস সাতাশ আটাশ হবে, বোঁশও হতে পারে।

—তবে আর কি, কিয়র করা। কিন্তু রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করে আমাদের ফাঁকি দিসনি ভাই, একটু থাওয়ার-টাওয়ারাস।

—দাঁড়া-দাঁড়া।—অমলেশ গাল চুল-কোতে লাগল : একটু প্যাঁচ আছে এর ভেতরে :

—পাচি—আমি ব্যাকার হয়ে বললাম :
পাচির মধ্যে কেন ঢুকতে গেলি আবার?
সে গুরুমহিলা কি ভেঁকে পছন্দ করেন না?

—করেন, কিন্তু এবার খুব চিন্তিত
হয়ে অমলেশ নাক চুলকোতে লাগল : তবে
তার মধ্যে একটু ইয়ে রয়েছে।

—ইয়ে? কিসের ইয়ে?

—বলছি। একটু চা খাওয়া তার আগে।

—মালেশ শেষ, গুড়ের চা খেতে হবে
কিন্তু।

—আমিই যেন দু-বেলা চিনির চা
খাইছি।—যুখ বাকিয়ে অমলেশ বললে, ওই
লগ্না গোটা দু-তিন সিঙাড়াও খানস
তো। আজ পাঁচটাটা পাওয়া যায়নি—সকালে
কখন খান-দেড়েক বাজে মাকী কিন্তু
চিরেইহিমু—প্রায় ভুলেই গেছি।

—সিঙাড়া?—আমি একটা ঢোক গিলে
বললাম, আমাদের পাড়ার—কী বলে—মানে
সিঙাড়া তেমন ভালো নয়, কিসব বাদ্য
ভেল-টেল দিয়ে—

—আমাদের পাড়াতেই সেন খাঁটি গাওয়া
খীরের সিঙাড়া নিয়ে কস রয়েছে। দিনের
পর দিন তুই এরকম ছোটলোক হয়ে যাচ্ছিস
কেন সুকুমার? বন্ধুকে আজকাল দুটো
সিঙাড়া খাওয়াতেও দেখছি তোর বুক
দিলি করে।

—তোকে তো আর বাজের কাঁচকলার
দর করতে হয় না!—আমি একটা দীর্ঘ-
নিশ্বাস ফেললাম, তারপর চা আর সিঙাড়ার
ব্যস্ততা করতে বাধা বছরের ভাইপোটাকে
ডাকলাম।

কেশ মন দিয়ে অমলেশ সিঙাড়াগুলো
কেলা, গুড়ের চা-র তলানিটুকু পর্যন্ত
শেষ করল। তারপর পকেট থেকে আবার
একটা আখপোড়া সিগ্রেট বের করে ধরলো।

—এত গোড়া সিগ্রেট গেলি কোথেকে?
—আমি কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলাম :
হাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিস বোধহয়?

—ডোনটে টক নুসেন্স। সিগ্রেটের
মজ দেখাছিস না? ইকনিমি করে খাচ্ছি।
একটা তিনবারে।

—অঃ।

—মরুক গে এসব। আসল কথাটা বল।
বুঝি—আমার একদম ইচ্ছে ছিল না,
নেভার খট অব ইট—তবু তুমি পড়ে
লেলাম।

—গেলি?

—গেলুম।

—আকস্মিক?

—আকস্মিক বলিস কিরে? চাঁদি পবনত।

—তবে তো আর আশা নেই।

অমলেশ মাথা নাড়ল : একেবারে না।
সেইজন্যই তো ছুটে আসতে হল তোর
করে।

—আজ্ঞা, বলে যা।

পোড়া সিগ্রেটটাকে এক টানে আঙুল
পছন্দ নাহিরে আল অমলেশ, সেটাকে
চারের কাপে ছাঁক করে ছেড়ে দিয়ে সিঃ-
এজনের মতো থোকা জেড়ে চারদিক কিচু-
কিচু করে অমলেশ করে ফেলল। তারপর :

—আমি তো—আমি ইন্টারপোলের
সহপাঠী।

—বিলকণ। তোর কোন পিসে ইন্ট-
বোলের বি টীমে একবার চান্স পেয়েছিল,
সেই থেকে হুগলী জেলার লোক হয়েও
তোরা সবাই ইন্টারপোলকে সাপোর্ট করিস।
আর আমার বাবা খাঁটি বরিশালের লোক
হয়েও মোহনবাগানের প্রথম শীল্ড
পাওয়ারটাক ভাঙতের গৌরব বলে মনে
করতেন—সেই থেকে আমরা—

—ধামরে বাপ, তোকে আর পুরোনো
কাসুন্দি বাঁটতে হবে না। আসল কথাটা
বলতে দে। সেদিন হয়েছে কি—মোহনবাগান
ইন্টারপোলের চারিটি ম্যাচ শুনছি
রেজিস্ট্রারে, হঠাৎ—

—হঠাৎ?

হুজুমত করে এক টাক-মাথা বড়ো
ডল্লোক আর তার সঙ্গে ফসী ছিপছিপে
চমকানো একটি মেয়ে—

—তিনি?

—তিনি।

—তারপর?

—ডল্লোক বললেন, মাপ করবেন, আমি
আপনার সামনের বাড়ীর নতুন ভাড়াটে।
খেলার রিবে শুনছিলাম হঠাৎ দুমক করে
রেজিস্ট্রারে বন্ধ হয়ে গেল। তাই আমি
আর আমার মেয়ে তরল আপনায় এখানে
ছুটে এলাম। যদি বসে একটু খেলাটা শুনেন
বাই—আপনার অসুবিধে—

বিলকণ! অসুবিধে আর কি, এতো
আমার সোভাগ্য—এ-সব বলে-টলে তো
ওদের বসালুম। ওরা বসে বসে খেলা
শুনলেন। বিলভ ইট সুকুমার—আমি
দেখলাম, বাপের চেয়ে মেয়েরই খেলার
উৎসাহ বেশি।

—ভাই হয়—আমি মাথা নেড়ে বললাম,
যে ক্রিকেটের ক-খও জানে না, সেই হয়
ক্রিকেটের বড়ো ক্রিকেট। যে কখনো ফুটবল
ছুঁয়ে দেখেনি, খেলার মাঠে খান ইট
ছোঁড়বার জন্যে সেই-ই সবচেয়ে আগে গেঁত
হয়ে থাকে।

—ডোনটে বাী আনশিভল্‌রাস
সুকুমার—অমলেশ চুকুটি করল : দেখলাম,
না খেললে কী হয়, গুরুমহিলা খেলার
শক্তিশন-ওজিশন বেশ যোবেন।

—হুঁ। তিনি, ভিডি, ভিসি।

—মানে?

—কিন্তু না। সাইন্সের ছাত্র, বিশিষ্ট তো
পড়িসনি, পড়ল বুকতে পারতিন। বলে
যা।

—তারপরই একটা মস্ত চেন্নর খেতে
গেলি আমরা।

কিরকম?

—দেখলাম, ওরা মোহনবাগানের খঁচ
সাপোর্টার। আম আর বলতেই পারলাম না
যে, ইন্টারপোলের জন্যে আমার প্রাণটা
অকুপার্য করছে। ভাগ্যিস খেলাটা জু হয়ে
গেল। কিন্তু সেই থেকেই ভাবলাম এরপর
থেকে আমিও মোহনবাগানের—

—ওঁই!

অমলেশ কাতর হয়ে বলল, কী করব
কল, এরকম অবস্থায়—

আমি গুর পিঠে ঢাপড়ে দিয়ে বললাম,
ঠিক আছে—ঠিক আছে, তুমি আর পালা-
মেটার পলিটিক্সে এরকম দল মাঝে মাঝে
বদলাতে হয়। ইন্টারপোল লিখে গেছেন
জানিসনে? 'অমন অবস্থাতে পড়লে সবারই
মত বদলায়।' চানিয়ে যা।

—তারপর আর কী? আলাপ-টালপ
হল। ডল্লোকের নাম কুমুদবাঈ, এল-আই-
সির চাকুরে। মেয়েটিও গ্রাজুয়েট বি-টি—
একটা ভালো কে-জি শুলে কাজ করেন।
মানে এভারিথিং অল-রাইট, কিন্তু—

—কিন্তু এল কোথেকে?

—আরে শুধু ইন্টারপোল মোহনবাগান
হলে তো জানা ছিল না! ওদিকে যে আর
এক ফ্রন্ট! ওয়েল সুকুমার, ললিত সম্মুখে
তোর কী ধারণা?

—চমৎকার।

—বিতাল?

—মন্দ কী!

—বসন্ত?

—লোক সুকুমার নয়। গুর চাইতে বরং
এর দাদা বতীন—

—শাটাপ! অমলেশ দাঁত খিচোলো :
আমি বলছি রাগ-রাগিণীর কথা—তুই আবার
এর মধ্যে কোথেকে বতীনেরকে টেনে নিয়ে
এলি!

—রাগ-রাগিণী!—আমি হাঁ করে চেয়ে
বইলাম।

—আরে সেইটেই তো পাচি। বাপ-মেয়ে
আবার নিদারুণ ক্রাসিকাল গানের ভঙ্গ। আমার
একদিন কী মতভ্রম হল, মানে তোমো শতুল
যেন কিরকম হয়ে যায়—কস করে বলে
ফেলেছি—আমিও ক্রাসিকাল গান বেশ
বুঝে থাকি, মানে এক-আধটু চর্চাও করি।
ব্যান—

বাস—আর বলবার দরকার ছিল না।
পাচিটা এবারে পরিষ্কার বুকতে পারছি।
গানের ব্যাপারে আমি আর অমলেশ দুজনেই
সাক্ষাৎ গম্ভীর। আমি বরং হাঁর-সংকীর্তনের
দলে 'লাগল হারির লুটের বাহার'—টাহার
গাইবার সময় কোনোমতে গলাটা গুলে
দিতে পারি, কারণ তখন সরঞ্জের নজর থাকে
বাতাসার দিকে। কিন্তু অমলেশ—

একটা করুণ কাহিনী মনে পড়ে গেল।
কী কারণে সেদিন একটু আগেই কলজের
ক্রাস ডিজলভ করে গিয়েছিল। একটা ছাকা
বরে ঢুকে আমরা সাত-আটজন আকা
জমিয়েছি, হঠাৎ অমলেশকে গানে পেল।
বেশ দরজাভাবে শুরু করল সে : 'আজ
বসন্ত জাগ্রত ম্বারে, তব অবগুণ্ঠিত স্মৃতি
জীবনে—'

অদূরেই মেয়েদের কন্ঠন-সুন্ম। অম-
লেশের লক্ষ্য সেই-কই খানিকটা ছিল কিনা
বলা যায় না—তার গলা তুমুই পড়ায় আর
উল্লেখ হয়ে উঠছিল। কিন্তু অচিরে তার
গুড়ের আহবানে গুড়িদেশক ছাত্রী সড়-সড়
করে আমাদের ঘরে এসে হাজির হল।

আমরা উদ্ভিজিত হয়ে অমলেশ আর
এক পদা উঠেছি, হঠাৎ একটি ভীষণ ধব-
কই পোকা ছেল :

‘দেখুন!’

ফেফা ইয়ারের ছাত্রী—তপতী সেন
মধুর হাসি হেসে বললেন, ‘দেখুন, কমন-
রুমে আমরা জনবাহুরা আছি। প্রত্যেকে আট
আনা করে চান দিলে ছ’ টাকা হয়। এই
ছ’ টাকা আপনারা নিন—কার্টিনে গিয়ে
সাঁট খান বরং, কিন্তু দয়া করে রবীন্দ্র-
সঙ্গীত বন্ধ করুন।’

টাকা অবশ্য আমরা নিইনি। প্রেস্টিজের
প্রশ্ন তো আছে একটা। তবু সুড়সুড় করে
আমরা কার্টিনেই চলে গেলুম। অমলেশের
মন এত খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে, একটা
কাটলেট পর্যন্ত খেলে না—গল্প হয়ে বসে
রইল। তারপর আমার কানে কানে বললে,
‘তুই দেখে নিস সুকুমার, আমি জীবনে
আর কোনোদিন গান গাইব না এমনকি
বাধরুমে সাবান মাখতে মাখতেও না।’

তারপর—আজ পনেরো বছর পরে—দুম
করে প্রেমে পড়েছে অমলেশ আর ফস করে
বলে ফেলেছে সে ক্লাসিক্যাল গানের চর্চা
করে থাকে। মহাপঞ্চ আর কাকে বলে!

সহানুভূতির বন্যার আমার মন থেকে
কাঁচকাণ্ডালা পর্যন্ত ভেসে চলে গেল। আমি
বললুম, তা হলে?

অমলেশ কান চুলকোতে চুলকোতে করুণ
সুরে বললে সেইজন্যই তো আসতে হল
তোর কাছে। এখন হয়েছে কী জানিস, ও
বাড়ীতে একটু চা-টা খেতে কিংবা গল্প
করতে গেলেই ক্লাসিক্যাল গানের কথা উঠে
পড়ে।

—শুনতে চার না?

—চার না আবার? অনেক কন্টে ঠেকাবে
রেখেছি। বল তেমন মূড় নেই, কিংবা
গলাটা তেমন ভালো নেই, কিংবা সর্দি
হয়েছে। কিন্তু এভাবে কদিন চালানো যায়
বল দিক? শেষে মরীয়া হয়ে বলে দিয়েছি
—আর মাস দেড়েক পরেই তো পাড়ায় নববর্ষ
উৎসব—গানের জলসা হবে, তখন আপনার
ভালো করে ক্লাসিক্যাল গান শুনিয়ে দেব।

—মানে কেটে পড়বি সেই সময়?

—কেটে পড়ব কিরো!—অমলেশ প্রায়
কোঁদে ফেলল : তা হলে তো আমার ইহ-
পরকাল সব গেল! মানে সেই আসরে আমার
ক্লাসিক্যাল গাইতেই হবে—যে করে হোক।

—কী করে গাইবি?—আমি একটু
ভেবে-চিন্তে বললুম, একটা রাস্তা আছে।
মাস্রাতে একা একা দক্ষিণেশ্বরের কিংবা
বরানগরের গঙ্গায় চলে বা সরস্বতীর
ডাকতে ডাকতে সুইসাইড করবার চেষ্টা
কর। সংগে সংগে দেবী শড়াক করে স্বর্গ
থেকে নেমে আসবেন, যেমন করে কলি-
দাসকে বর দিয়েছিলেন, তেমনি করে তোরে
গঙ্গায়—

—ইরাকি করিসনি সুকুমার, এ হল
লাইফ অ্যান্ড ডেথের ব্যাপার। রিয়ালি,
একটা উপায় করা যায় না কোনোরকম? মনে
কর—কোনো ওস্তাদের কাছে গেলুম, তাঁকে
বললুম—মেরে-কেটে তিনটে গান আমাব
কোনোমতে শিখিয়ে দিন আসরে একবার
এই শেখাব গিয়ে নই তারপর—

—তারপর? তরলার সংগে বিয়ে হয়ে
গেলে?

—তখন? এতক্ষণে অমলেশ ফিক
করে হেসে ফেলল : তখন তরলাকে বলব—
গলার ওই বে কী বলে—ল্যারিনজাইটিস
না ফ্যারিনজাইটিস কী হয়েছে—গান গাওয়া
ডাক্তারের বারণ।

হা, ওদিকটা তবে ভেবেই রেখেছে!
অমলেশকে যতখানি গদত ভেবেছিলুম
দেখছি ততটা নয়। অমলেশ উদ্বার বললে,

দেখেই ভাবি হল। অমলেশ সাক্ষাৎ
লুটিয়ে পড়ল তার পারে, দেখা-দেখি
আমিও একটা প্রণাম করলুম।

গোফের ফাঁকে বলরাম একটু হাসলেন :
লজলেন, কী দরকার? জলসা না
কম্পিটিশন?

—আজ্ঞে না, ওসব কিছু নয়—



—‘মাপ করবেন, ভদ্রমি আপনার সামনের বাড়ির নতুন ভাড়োতে’

কোনোমতে যদি খান তিনেক গান—।
তোর জানাশুনো ওস্তাদ কেউ আছে?

—ঠিক জানাশোনা তো কেউ নেই, কিন্তু
সামনের বাড়িওয়াগানেই বলরাম বাগচী
মশাই থাকেন। খুব নামকরা ওস্তাদ
শুনছি। আমার সংগে অবশ্য আলাপ নেই,
দেখিওনি কোনোদিন।

—চল না তাই একবার। বেশি নয়—
ঠিক তিনখানা গান। ব্যাংকে শ-পাঁচেক
টাকা জমিয়েছি, দরকার হলে তাই থেকে
গুরু-দক্ষিণা দেব শ-তিনেক। আর এই দেড়
মাস ঘরে রোজ ঘন্টা চারেক চেষ্টা করলে—
পারব না, কী বলিস?

—কেন পারবি না, চেষ্টার অসাধ্য কী
আছে?—আমি ওকে উৎসাহ দিয়ে বললুম,
দেড় মাস ঘরে প্রাণপণে চেষ্টা করলে
মানুষের লাজ পর্যন্ত বেরিয়ে যেতে পারে,
আর এতো গান। চল তা হলে বলরাম
বাগচীকেই একবার দেখা দাও।

বিরাট চেহারা আর প্রকাণ্ড কাঁজারী
গোঁফ নিয়ে মাঝবয়সী বলরাম বাগচী
বৈঠকখানার বসে ছিলেন। ঘরে ফরাস
পাতা, গোটা দু-তিন ডাকিরা—দেওয়ালে
ঠেসান দিয়ে কটা তানপুরা, আর এক
কোনকর করে জোড়া তবলা-ডুগি। ভরাট
গম্ভীর গলার বললেন, বসুন।

অমলেশ হাত কচলালো : আপনার কাছে
একটু গান শেখবার জন্যে—

—অ। তা দৃজনেই?

আমি সভয়ে বললুম, আজ্ঞে না-না,
আমি নই। এই অমলেশ শিখাবে।

—তা বেশ।—বলরাম একবার ভালো
করে অমলেশের আপাদ-মস্তক দেখে
নিলেন : এর আগে কোথাও নাড়া বঁধা
হয়েছে?

—কী বঁধা?

—নাড়া-নাড়া। বলি, কারো কাছে
তামিল নিয়েছেন এর আগে?

—আজ্ঞে না।—অমলেশ করজোড়ে
বললে, আপনার কাছেই প্রথম।

—হা, আমার কাছেই প্রথম। পাশেই
একটা পানের ডিবে ছিল, তা থেকে এক
সংগে গোটা দুই পান মনে পড়লেন
বলরাম : তাহলে বুঝি স্বয়ংসিদ্ধ? ঘরে
গ্র্যামোফোন রেকর্ড থেকে আধুনিক ছড়া-
কাটা গান গেয়ে থাকেন? আমার কাছে
তো ওসব—

—আজ্ঞে না-না—অমলেশ তটস্থ হয়ে
বললে, আধুনিক গান আমি আদৌ পছন্দ
করি না— মানে গাই না একদম। উচ্চাঙ্গ
সঙ্গীত শেখাব আশাতাই আপনার পরে
এসে পড়েছে।

বলরাম তাঁর প্রকাণ্ড কাইজারী গোঁফে একটু তা দিয়ে বললেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করব। স্কুল ফাইনাল পাশ না করে কি কেউ পোস্ট-গ্রাজুয়েটে ভর্তি হতে পারে?

—আজ্ঞে তা কী করে হয়! —বলরামের কথাটা ঠিক ধরতে না পেয়ে আমি বললাম, তার আগে বি-এ টি-এ পাশ করে—

—সাইট, বি-এ টি-এ পাশ করে বুঝেছেন, আমি হচ্ছি গানের সেই পোস্ট-গ্রাজুয়েট। আগে স্কুল-কলেজ পেরিয়ে আসুন, তারপর আমি দেখব কী করা যায়।

—আপনাকে আমি ছাড়ছি না গুরুদেব। —অমলেশ চট করে বলরামের পা চেপে ধরল। একটা ব্যবস্থা আমার করে দিতেই হবে। নইলে হাঙ্গার-স্ট্রাইক করে পড়ে থাকব আপনার দরজায়।

বলরাম আবার হাসলেন।

—তুমি তো দেখছি নাছোড়বান্দা হে!

—আজ্ঞে মরীয়া।

—বিপদে ফেললে। এরকম আনাড়ী শিখা তো আমি—কিন্তু তোমার বেলায় একটু স্পেশ্যাল কনসিডারেশন করা যেতে পারে বোধ হয়। তানপুত্রা ধরতে পারো?

—আজ্ঞে না।

—এক নম্বর খাজা। তোমাকে নিয়ে যে আমি! —আচ্ছা, এবার একটু হাঁ করো দিকি।

বলরাম অপেক্ষা মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ-পাতাল জোড়া একটা হাঁ করল অমলেশ। আমি ওর আলজিভটা পর্যন্ত দেখলাম।

বলরাম একটা বিকট চুঁকুটি করলেন।

—এটা কী হল?

—আজ্ঞে হাঁ করলাম।

—হাঁ করলে? তুমি তো আচ্ছা ইন্ডিয়ান হে। হাঁ করা মানে কী? তোমার গলার আওয়াজটা একবার শুনিয়ে দাও। একটা তান ছাড়ে—কিংবা ‘সরিগম’ করো। —বলরাম ভীষণ বিরক্ত হলেন। তার বদলে তুমি একটা পেয়ালার হাঁ মেলে দিলে? আমি কি ডেনটিস্ট যে তোমার দাঁত ভুলে দেব? নাও—তান ছাড়ে।

এই হচ্ছে জিরো আওয়ার। আমি রোমাণ্ডিত হয়ে অমলেশের তান শোনবার সেই ভয়ঙ্কর মূহুর্তটির জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। অমলেশ বোধহয় তান ছাড়তেও বাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই আবার সে হুড়মুড় করে বলরামের পায়ে পড়ে গেল।

—তান-ফান বুঝিনে গুরুদেব, ও আমাকে দিয়ে হবে না। আপনি দয়া করে শব্দ দেড় মাসের মধ্যে আমাকে তিনখানা ক্লাসিকাল গান শিখিয়ে দিন, তা হলেই তরলাকে আমি ম্যানেজ করে—বলতে বলতে জিভ কেটে থেমে গেল অমলেশ।

বলরাম এক মূহুর্তে গম্ভীর হয়ে গেলেন। একটু পরে থমথমে গলায় বললেন, কী বললে—কাকে ম্যানেজ করবে?

—ভ্রাতা?

—কাকে ম্যানেজ করবে? —বলরামের স্বর আগে গুরুভার হয়ে উঠল।

অমলেশ একবার অসহায়ভাবে আমার দিকে তাকালো। তারপর বার কয়েক খচখচ করে মাথা চুলকিয়ে নিয়ে বললে, আপনাকে বখন একবার গুরুদেব বলেছি স্যার—তখন কনফেস করেই ফেলি। মানে—আমি একটি মেরেকে—মানে বুঝতেই পারছেন—মানে দেড় মাস পরে যদি তাকে আমি খান তিনেক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত—



“এর আগে কোথাও নাড়া বাঁধা হয়েছে?”

আর বলবার দরকার হল না। ঠিক বোমা ফাটার মতো আওয়াজ হল একটা।

সেই বিরাট চেহারা আর প্রকাণ্ড গোঁফ নিয়ে সিংহের মতো গর্জন ছাড়লেন বলরাম। ইয়ার্কি পেয়েছি। ফর্তি-নর্তির জায়গা এটা? দেড় মাসে তিনখানা ক্লাসিকাল গান? সারা জীবন সাধনা করে যে গানে গলা সাধা শেষ হয় না—ভগবানকে পাওয়ার চাইতেও বা কঠিন, তাই নিয়ে এসেছ ফাজলামো করতে? লুক হিয়ার আধ মিনিটের মধ্যে এই ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে। যদি না যাও—দু হাতে দটো এক মণ মৃগুর নিয়ে আমি ব্যারাম করি—তোমাদের দুটোর ঠাং ধরে একটানে সার্কিউলার রোডে ছুঁড়ে ফেলে দেব।

আধ মিনিটের দরকার ছিল না, পনেরো সেকেন্ডের মধ্যেই একটা কুকুরের ল্যাজ মাড়িয়ে, দুটো ফিঁরিওয়াকে ধাক্কা দিয়ে—মোটর চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়ে—বস্তা শূন্য লোকের গালাগাল কানে এসে পৌঁছবার আগেই, আমরা বাদ-ডুবান পেরিয়ে গেলুম। থামলুম এসে বোস ইন্সটিটুটের সামনে।

হাঁপাতে হাঁপাতে আমি বললাম : দোর-গোড়ার হাঙ্গার-স্ট্রাইক করবি বলেছিল যে :

—ইউ শাটাপ! —অমলেশ বজ্রদণ্ডিতে আমার দিকে তাকালো : কে জানত ক্লাসিকাল গানের ওস্তাদ এমন মারাত্মক হয়? বাপ্‌স্—একেবারে ভীমের মতো জোয়ান!

—না হলে গলা দিয়ে নাদ-ব্রহ্ম বেরুবেন কী করে?

—থাম্, বকিসনি।

—আমি না হয় থামছি, কিন্তু তিনখানা গানের কী হবে?

অমলেশ কিছুক্ষণ চুঁকুটি করে আমাদের দিকে চেয়ে রইল।

—লুক হিয়ার সুরুমার।

—বলে যা। আমি তাকিয়েই আছি।

—খুন চেপে গেছে আমার মাথায়।

ম্যানেজ আমি করবই—তুই দেখে নিস। তরলাকে আমার পেতে হবে—পেতেই হবে—পেতেই হবে—

আমি বললাম, ওয়ান-টু-থ্রী!

—চোপরাও! দেখে নিস আমার ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। মন্ত্রের সাধন কিংবা—বলতে বলতে নিজের আবেগে আর দাঁড়াতে পারল না অমলেশ, একটা যকেটের মতো হিটকে গেল, তারপর তড়াক করে গ্যালিক স্ট্রীটের চলন্ত ট্রামে লাফিয়ে উঠে পড়ল।

বলতে কি, ব্যাপারটা আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলুম। কারণ অফিস আছে, রেশন আনা আছে, বাজারে যাওয়া আছে, দেড়পো কাটা পোনা-টোনা আছে, আর শব্দ কাটা কলাওলাই তো নয়, বেগুনওলা, কিঙ-ওলাও আছে। এইসব অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপারে অমলেশের কথাটা আমার মনেই ছিল না। কিন্তু ঠিক দেড় মাস পরে—ঠিক ওই রকম আর একটা সকালে দম্ত বিকাশ করে সে এসে হাজির।

ওকে দেখামাত্র আমি উৎসাহে চকিত হয়ে উঠলাম।

—কিরে, কী ব্যাপার? ম্যানেজ করে ফেলেছিস?

—পুরুষের প্রতিজ্ঞা—হুঁ-হুঁ! —অমলেশ ধপাস করে বসে পড়ল। তারপর পকেট থেকে একটা কাড বের করে এগিয়ে দিয়ে বললে, তোর নেমস্তল।

—কিসের? বিয়ের?
—না, না, বিয়ের নয়। সে হবে পরে।
এটা জলসার।
—জলসার? কাউটার দিকে তাকিয়ে
আমি চমকে বললাম।
—উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত? অমলেশ চৌধুরী?
তুই?
—আবার কে!
আমি বেকুবের মতো চেয়ে রইলাম।
আর তাই দেখে ভারি খুশি হয়ে মিটিমিট
করে হাসতে লাগল অমলেশ।
—সাঁতা বলছি, তুই?
—কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না?
—না-না, অবিশ্বাসের কী আছে!—এবার
আমার মাথা চুলকানোর পালা : কিন্তু সত্যি,
হল কী করে? ওস্তাদ পেয়েছিল বৃষ্টি?
—খুঁতোর ওস্তাদ। দেখলুম, ওয়া সবই
সমান। শুনলেই চটে যায়। বলে, আধুনিক
গান-টান নিয়ে ওসব ফাজলমি হতে পারে,
কিন্তু ক্লাসিকাল গানে ঢালুক চলেবে না।
আগে খাড়া পাঁচটি বছর গলা সাথতে হবে,
তারপর। ওদের ভাওতার জুলে আমি পাঁচ
বছর বসে থাকি আর কি! এর মধ্যে আমার
চুলগুলো সব পেকে থাক, তরলা একদম
ফসকে থাক—হুঁ! আমার বিরকম যেন
জাবাচাকা লেগে গেল।
—তাহলে গান শেখালে কে?
—আল্লাজ কর-আবার মিটি-মিটি
হাসতে লাগল অমলেশ।
—সাঁতা সঁতাই মাকরাতে গঙ্গায় ডুবতে
গিয়েছিল নাকি? সবসব্বী এসে—
—খাং, ও-সব বোগাস। বৃষ্টিতে পারাঙ্গন
না? ট্যাকটিক্স?
—ট্যাকটিক্স? আসরে গান গাইবি,
তাহলে আবার ট্যাকটিক্স কিসের?—আমার
আরো ধাঁধা লেগে গেল : সেখানে টিক্স
চলতে গেলে লোকে জুতো ছুঁড়ে—
—শাটাপ। সবটা শুনেনে, তারপর
বকর-বকর করিস। ব্যাপার কী জানিস?
মাকে বলে—স্লে-বাক।
—স্লে-বাক?
—এগ্জ্যাক্টলি। সিনেমার চরিত্র
না? মুখ নাড়ছেন হিটো মখামকুমার, আর
ভারি গলায় গান গাইছেন সুমন্ত মুখাজা।
ঠিক তাই।
এতক্ষণে বৃষ্টি একটু সাফ হয়ে এস।
—কিন্তু সে তো সিনেমার। আসরে কী
করে হবে?
—তাও হয়।—সবজাত্যের মতো মাথা
নাড়তে লাগল অমলেশ : সুখমর বিশ্বাসকে
চিনিস?
—না, তিনি কোনোদিন আমাকে সুখ
দিতে আসেননি—আমিও তাঁকে বিশ্বাস
করি না।
—কিন্তু সঁতাই সে সুখমর। আর
লারুণ বিশ্বাসী। সে-ই রাজী হয়েছিল।
—কি বকম?
—আমাদের অফিসে চাকরি করে।
ছেলেবেলা থেকে ক্লাসিকাল শিখেছে, খুব
জালো গাইতে পারে। তার সঙ্গে আবেজমেন্ট
করোঁছ—একশো টাকা দেবো বলাঁছ। ক্রায়ের
সঙ্গে দেড়শো টাকার ব্যবস্থা হয়েছে।

বৃষ্টি না হাদিরাম? আমি একটা তানপুয়া
ধরে মাইকের সামনে বসে থাকব, আর ঠিক
ছ ইণ্ডি পেছনে স্ট্রানের আড়াল থেকে
সুখমর গান গাইতে থাকবে। আমার শব্দ
এক-আখটু হাঁ করলেই চলবে। কিন্তু একদম
সাইলেন্ট।
—লোকে বৃষ্টিতে পারবে না?
স্টেজ প্রায় ডাক থাকবে। আগেই বলে
লেখা হবে, আর্টিস্টের চোখে একটু ট্রাবল
আছে, বেশি আলো থাকলে তার কণ্ঠ হবে।
তারপরে সব সোজা—ক্লিস্টাল ক্লিয়ার।
আমি অভিভূত হয়ে অমলেশের দিকে
চেয়ে রইলাম। প্রেমে পড়লে মানুষের
প্রতিভা শব্দ শুলেই যায় না—কখনো
কখনো সে সাপায়মানও হয়ে উঠতে পারে
বোধ হয়। অন্ততঃ অমলেশকে দেখে
আপাততঃ সেই বকমই সন্দেহ হল আমার।
এবার অমলেশই বেশ মনোমগ্নতার
সঙ্গে আমার গিট চাপড়ে দিলে।
হাঁ করে দেখাচ্ছিস কী? হোয়ার দেন্ডার
ইড এ উইল—জানিসনে? বাস কিন্তু
জলসার। তার আগে চা খাওয়া। আর গোটা
কয়েক সিগাড়া।
—চা গুড়ের। আর সিগাড়া বাদাম তেলে
ভাজা।
—তার মতো ছোটলোক ওর বেশি আর
কী খাওয়াবে?—অমলেশ পকেট থেকে
আবার একটা আখপোড়া সিগ্রেট বের করল :
তাই আনা। তবে তোকে কথা দিচ্ছি, বিয়েটা
হবে থাক, তোকে অন্ততঃ তিনিদিন আমি
চিনির চা আর খাঁটি ঘিয়ে ভাজা সিগাড়া
খাওয়াব।
বাগে বছরের তাইপোকে ডেকে
অমলেশের জন্যে চা-সিগাড়ার ব্যবস্থা করতে
বললাম, কিন্তু বৃষ্টি হতে পারলুম না—
এমন কি অমলেশের বিয়ের পরে চিনির চা
আর ঘিয়ে সিগাড়ার যে প্রসংগে কট রয়েছে
তাহতেও না। অমলেশকে আমার চাইতেও
বেশি ইনটেলিজেন্ট বলে মনে হতে লাগল
আমার। চিরকাল থাকে নিজের চাইতেও
ইন্ডিসটিক বলে জানি—হঠাৎ তার প্রতিভাকে
এ ভাবে বিচলিত হতে দেখলে কোনো ভদ্র-
লোকেরই ভালো লাগে না, কোনো বন্ধু
তো নয়ই। চিরকাল জানি, প্রেমে পড়লে
লোকে মতিমান গর্ভ হয়ে যায়—এ যে

দেখছি থাকেশেরালের ডেরেও ধড়বাক হয়ে
উঠেছে।
তবে আমি আশা ছাড়লুম না। বললাম,
ঠিক ধরা পড়ে যাব।
—কখনো না।
—লোকে তোকে পিটিয়ে তত্তা করে দেবে।
—ইম্পসিবল।—কট-কট করে আমার
মুখের দিকে তাকালো অমলেশ : আবার
তুই যদি বিয়ে করিস—
—আমি বিয়ে করতে যাব কেন? আমার
কী দাম? কিন্তু দেখিস তোর ওই সুখমর—
—তুই তাকে জানিসনে। হাঁ করে
টুকগো।
—হুঁ, একশো টাকার।—আমি মাথা
নাড়লাম : কিন্তু মনে কর—এরপর থেকে
যদি ওই হাঁয়ের টুকগোটি তোকে গ্যাকমেল
করতে থাকে?

অমলেশ ডুবু কোঁচকালো : কি বকম?
—মানে বিলেতে যেমনটা কবে থাকে।
এর পর থেকে প্রত্যেক মাসে নিয়মিত এসে
বলতে থাকবে, যদি আমাকে এখনি কিছু
টাকা না দাও—তাহলে সব ফাস করে দেবে।
যার পাড়ার দ্রাবও যদি ওই ছুতো করে—
অমলেশ ক্ষেপে গিরে চিৎকার করে
উঠল : তুই তো এক নম্বরের ভণ্ডুলয়ার
দেখাছ। খালি কু-ডাক ডাক'ছিস তখন থেকে।
বাকি থেকে একটা বেগবোরা কান্না ফুটে
যাচ্ছিল, কোথায় আমাকে বাক-আপ করবি,
তার খবলে সমানে ঠান্ডা জল ঢালিছিস। হুঁ
ইয়েল সিগাড়া—ডাম ইয়েল গুড়ের চা।
বলতে বলতে চা-সিগাড়া এসে গেল।
এক খাবার দুটো সিগাড়া ফুলে নিয়ে
অমলেশ বলল, অজ্ঞা, এ বাটা তেরক করা
করা গেল। কিন্তু কাউটা ফেরৎ দে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

(শ্রীম-কাণ্ড)

সাধারণ—২৫, কপড়ে—৩০

কথামৃত ভবন

১০।২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী সেন,
কলিকাতা-৬

এ-১০০১০

বিভাগীয় বিপণি

শ্রুতবিবাহের বিচিত্র বেনারসী শাড়ী

ও তেরন, চৌবাঁলন, টিকল, ওয়াশ-এন-ওয়াশ, সিন্ধ এবং তাঁতের শাড়ী, শাল,
আজোয়ান, গাঁজ, মোজা, সোয়েটার, গরদ, তসর, মটকা, সার্টিং, স্টিং এবং

আধুনিক ডিজাইনের ছেলেমেয়েদের তৈয়ারী পোষাক।

বস্ত্র ও পোষাকের অনন্যসাধারণ বিপণি

রামকানাই ষাংমনারঞ্জন পাল

প্রাইভেট লিমিটেড

২১০, মহাশ্বে গান্ধী রোড, বড়বাজার : কলিকাতা : ফোন : ৩০-২৫০০

—কেন?

—তোকে আমার আর বিশ্বাস নেই।
সন্দেশ হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত তুই-ই কাঁসিয়ে
দিবি।

—বটে! —আমার রাগ হয়ে গেল :
তোর জন্যে বলরাম বাগচীর হাতে মার
খেতে খেতে বেঁচে গেছি—শেষকালে আমার
সুপাই এই ব্যবহার? ভালোর জন্যেই
সাধন করে দিচ্ছিলুম, আর তুই উল্টো
বুঝিলি! অলরাইট—নিয়ে যা তোরা কাড়।
আর আমি এর মধ্যে পাড়ায় একটা কোম্পানির
ফল অর্গানাইজ করে ফেলছি। তারা তাদের
কাশনের সামনে গিয়ে খোল-করতাল
ঝাঙ্কিয়ে কীতন গাইতে থাকবে :

‘আমরে যে গান গায়
চিনিলা না তারে হায়—
অমলেশ সে তো নয়

তার নাম সুখমর বিশ্বাস,
আধারেতে মূখ ঢেকে
স্বপ্নের আড়ালে থেকে—
তরলকে দেয় ফাঁকি

একশোটা শড়ীবাজ টোঁটাস!’
সিঁড়ীটা চিবনো বন্ধ করে, অমলেশ হাঁ
করে আমার দিকে চেয়ে রইল। তারপর
কালে, মারাত্মক!

আমি বললুম, হুঁ, অত্যন্ত মারাত্মক।
—মুখে মুখে গান বানালি?

—বানালুম।

—তুই তো দেখছি রবি ঠাকুরের অন্ন
জন্মে দিতে পারতিস।

—পারতুম। বুড়োর ওপর দয়া করে
জোড়ে দিয়েছি।

—তবে আমাকেও জোড়ে দে। —অমলেশ
আকুল হয়ে বললে, তোমার এই দারুণ কবি-
প্রতিভা এতদিন বন্ধন খামাচাপা ছিল তখন
আরো বয়স কিছুদিন থাকুক। তোকে আমি
আরো গোটা দুই কাড় দিয়ে যাব। আর
ওরাল্ড অব অনার—বিহেটো হয়ে গেলে কেবল
খয়ের সিঁড়ীটা নয়, তোকে চাচার হোটেলের
কাউন্স-কাউন্সেটও খাইয়ে দেব—নিশ্চিত।

—ঠিক?

—ঠিক। কিন্তু ওই গানটা—

—আপাততঃ স্টকে রইল। কাউন্সেটের
ম্যাপারটা বুঝে নিয়ে তারপর ব্যবস্থা করা
যাবে।

—হুঁ! —অমলেশ একটা গভীর
বীশ্বাস ফেলল : সন্দেশে বন্ধ-বান্দব
ঝাকাটা দেখছি আদৌ নিরাপদ নয়।

—না, খুব বিপজ্জনক। কিন্তু আমার
অন্য ভাবিসনি। সুখমর হইতে সাবধান।

—সুখমর? সে হীরের টুকরো। তুই
দেখে নিস।

কিন্তু অমলেশের জলসায় আমার গাওয়া
হল না। সেদিনই আবার এক ভাগনীর বিয়ে
পড়ে গেল ব্যারাকপুরে। কলকাতায় ফিরে
তার রাত বারোটা বাজল। গানের জলসা
হরতো তখনো চলছিল, কিন্তু তখন আর
লুপ্তমর মতো অবস্থা ছিল না।

জেরেছিলুম, পরের দিনই আনন্দে বাচতে
লাগতে চলে আসবে অমলেশ। কিন্তু একদিন

গেল—বুধিন গেল—এক সপ্তাহ চলে গেল,
লোকটার আর পাতাই নেই।

খুব উদাস হয়ে আমি ভাবতে লাগলুম,
এই রকমটাই চিরকাল হয়ে থাকে। একবার
গাছে চড়তে পারলে কেই-বা আর চইয়ের
কথা মনে রাখতে যায়। অমলেশের সিঁড়ীতে
হয়েছে, এখন সে কুমুদবাবুর বাড়ীতে বসে
ভালো চিনিলা চা আর তার সঙ্গে সঙ্গে
আরো কী-কী খাচ্ছে কে জানে। আমি যে
তার জন্যে বলরাম বাগচীর হাতে শহীদ
হতে হতে বেঁচে গেছি, প্রাণপণে গুড়ুর চা
আর তেলের সিঁড়ীটা খাইয়েছি, সে-সব কি
ওর আর মনে পড়বে এখন? পাশপাশ—
অনুগ্রহে ফুল!

খুব চটে গিয়ে একবার ভাবলুম, মলবল
না থাক—নিজের কুমুদবাবুর বাড়ীর সামনে
গিয়ে সেই স্মরণিত কীতনটা গাইব কিনা—
এমন সময় আর একটা দূতাবিনা মনে গেল।
ক্যা পড়ে যারিনি তো? সেরেছে তা হলে।
লোকে তো ওর পিঠের চামড়া তবে আর
আমেরা রাখিনি!

হাসপাতালের এমার্জেন্সী ওরাল্ডেই
খোঁজ করব না ওর বাড়ীতেই যাব—ভাবতে
ভাবতে সন্ধ্যাবেলার ওর বাড়ীই চলে গেলুম।
সেখি ওর ছোট ভাই ভণ্ট, বাড়ীর রোয়াকে
বসে নিশ্চিন্তে এক তোড়া তেলতাজা খাচ্ছে।
একটু ভরসা হল।

—তোমার দাদা কোথায় হে?

—ঘরে শূয়ে আছে।

—অসুখ-বিসুখ নাকি?

—না, সে-সব কিছু নয়।

—তবে কি মার-টার—

বেগুনী মুখে পুরতে গিয়ে ভণ্ট, খেমে
গেল ও কী বলছেন?

—না—না—ইয়ে মানে—মানে কোনো
অ্যাকসিডেন্ট—

—অ্যাকসিডেন্ট হবে কেন? এমনিই
শূয়ে রয়েছে। এই তো বাইরের ঘরেই।
যান না।

ঘরে একটা পাঁচ পাওয়ারের আবছা
আলো জ্বলছিল। ঢুকে যেটুকু দেখতে
পেলুম, তাতে মনে হল, একটা কালো-চাদরে
মাথা পর্যন্ত ঢেকে লম্বা হয়ে শূয়ে আছে
অমলেশ। শোওয়ার ভাঁপ দেখে দুকটো জ্বাং
করে উঠল, মারা-টার গেল নাকি লোকটা?
আমি কাঁপা গলায় ডাকলুম : অমলেশ!

একটা কাঁপ উদাস ম্বর শোনা গেল :
কে?

যাক—বেঁচে আছে তা হলে। বললুম,
আমি সুখমর।

—ও—আয়। চেয়ারটা টেনে এই বিছানার
কাছে বোস। —খিয়েটারের শেষ দশো
মুখের নায়কের মতো অমলেশ চি-চি করে
বললে, তিন-চারদিন থেকেই ভাবছি তুই
আসবি।

চেয়ার টেনে বসতে বসতে আমি বললুম,
এসে গেছি। তোরা উইল-ফোর্সের জেরেই।
কিন্তু এই গরমে চান্দর মড়ি নিয়ে ভুতের
মতো শূয়ে আছিস কেন রে? জ্বর-টর নাকি?

—আর জ্বর! আরাম ফিনিশড।

—আ!

—হ্যাঁ, ফিনিশড।

—ধরা পড়ে গিয়েছিলি?

—আদৌ না। খুব সাক্সেসফুল।

কেন—তুই আসিস নি?

—না ভাই, ভাগনীর বিয়েতে আটকে
গিয়েছিলুম।

—এলে দেখতে পেতিস। ক্র্যাপের চোটে
চারদিক কেটে গেল। আর আমার কপালও
ফাটল সেই সঙ্গে।

আমার ধাঁধা লাগল।

—ফাটবে কেন রে? খুলে ব'ওয়ার
কথা তো!

চান্দর কপিঁয়ে ঝোড়া হাওয়ার মতো
নিঃশ্বাস ফেলল অমলেশ : আচ্ছা, তুই-ই
বল, ফাংশন শেষ হতে না হতেই একটা
প্রকাণ্ড ফুলের তোড়া নিয়ে আমার বাড়ীতে
আসবার কী দরকার ছিল তরলার? পরদিন
সকাল পর্যন্ত ওয়েট করলে চলত না?

—ভালোবাসা আর ভক্তি কি ওয়েট
করতে পারে ব্রাদার?

—নির্ভুঁচি করেছ ভক্তি আর ভালো-
বাসার! ঠিক সেই সময়—সেই সুখমর
বিশ্বাস—দ্যাট, ভাইপার—সে আমার কাছে
এসে গ্যাজের গ্যাজের করে খগড়া করছিল।

—সে কি! সেই হীরের টুকরো?

—হীরের টুকরো! —অমলেশ আর
শোকাভিভূত হয়ে শূয়ে থাকতে পারল না,
তড়াক করে উঠে বসল। ঝাঁঝ করে বললে,
হীরের টুকরো! ইয়, আর রাইট সুখমর—
ওটা গোড়া কয়লার চাইতেও খারাপ, ওটা
স্নেক কার্বন।

—হুঁ, বলে যা।

—বলব কী, একেবারে অকথা। জলসা
শেষ হল, সবাই আমাকে কন্‌গ্র্যাচুলেট করছে
দেখে আর সহ্য করতে পারল না—হিংসের
জ্বলে গেল। বাড়ীতে এসে বললে, তিনটে
গানে একশো টাকা দেবার কথা, লোকের
রিকোয়েস্টে চারটে গাইতে হয়েছে। আরো
পাঁচটা টাকা চাই।

—দিতে হল?

—আমি কেবল বলছিলাম, তোমার
কোনো নাম তো নেই—কোনো জলসায়
ডাকেও না, একশো টাকা কোনোদিন গান
গেয়ে পাবেও না। —তাতেই একেবারে
গাঁ গাঁ করে চাচাতে লাগল—আমাকে লসার-
সুইন্ডলার এই সব বলতে লাগল। আর
বুঝিলি, ঠিক সেই সময়—

—সেই সময় ফুলের তোড়া নিয়ে
তরলা?

—করেক্ট! চেঁচামোচি শূনে তো
ধমকে বাঁড়িয়ে গেল। আর কার্বনটা কী
করলে জানিস? সোজা তরলার দিকে মুখ
মুগিয়ে বললে, ফুলের তোড়া দিতে এনেছেন
এই জোড়ারকে? এ তো অম্বকারে বসে
কেবল হাঁ করেছে—আড়ালে বসে গান
গেয়েছে আমি। প্রমাণ চান? একদিন একটা
ভালো মিনি আসুন—আমি সাগরাত
আপনার গান শোনাবি! আর এর গলা
দিয়ে বীদ গানের পা-ও বেরোয়—তা হলে
আমার পকেটে এই পেন্সিল-কাটা ছুরি
আছে, এইটে দিয়ে আমার কান কটান করে
কেটে নেবেন।

—তারপর?

—তারপর আর বলতে পারছি না—
আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, ভাই! আমি ধপাৎ করে মেজেয় বসে পড়লাম। কিছুক্ষণ থা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তরলা—তারপর চশমার ভেতর দিয়ে আমার মুখে যেন শানিকটা আগুন ছড়িয়ে দিলে। আর তারও পরে—

—তারও পরে কিছু আছে নাকি?

—আছে না? করলে কী, জর্নিস?
ফুলের তোড়াটা সোজা সুখময় বিশ্বাসের দিকে বাড়িয়ে বললে, 'আমার ভুল হয়েছিল, এটা তা হলে আপনারই পাওনা।' রাস্কেলটা তক্ষুনি সেটা নিয়ে নিলে, দাঁত বের করে হেসে বললে, 'আমার সঙ্গীত-সাধনা সার্থক হল আজকে। আমার ইচ্ছে করছিল, ও'র দাঁতগুলো আমি গুড়িয়ে দিই।

—দিলেই পারতাম।

—দিতুম। কিন্তু ওটাও বলরাম বাগচারি ছাত্র কিনা কে জানে—কিংবা ক্রাসিকাল গাইয়েরা সবাই-ই বোধ হয় গলা খোলতাই করার জন্যে ডন-বৈঠক করে—লোকটা জোয়ান। তাই রাগটা চেপে গেলুম। কিন্তু ওটার কথা ছেড়ে দে। তরলা কী করলে, জর্নিস? ওকে বললে, গলায় একেবারে মধু ছড়িয়েই বললে, 'কাল সন্ধ্যায় কিন্তু চা খাবেন আমাদের বাড়ীতে।' আর—

—আর?

—আমার দিকে একবার কটমট করে তাকিয়ে, মধু ঘুরিয়ে নিয়ে বললে, বাবা, অনেক রাত হয়ে গেল, বাড়ী চলো।

—ফিনিশড্।

অমলেশ ভাঙা গলার বললে, হ্যাঁ, ফিনিশড্। কিন্তু মেয়েদের ক্যারাকটারটা দ্যাখ্ একবার। কোনো কনশান্স নেই? এক মিনিটে সাইড চেঞ্জ করে ফেললে?

—ও রকম হয়। —আমি গম্ভীরভাবে বললাম, যেমন তুই ইন্টবেগল থেকে মোহন-বাগানে চলে গিয়েছিলি।

অমলেশ খোঁচাটার জবাব দিলে না। শুধু বললে, ওফ্!

আর সেই মুহূর্তে চারদিক কাঁপিয়ে ওস্তাদী গানের জোরদার আওয়াজ উঠল : তেলেনা—তেলেনা—এ তেলেনা—

তৎক্ষণাৎ চাদর মড়ি দিয়ে তত্তপোশে লম্বা হল অমলেশ।

—ওই শুনহিস?

—শুনছি। কিন্তু কী ও?

—কী আর? সুখময় বিশ্বাস ও বাড়ীতে গান গাইছে! —মুহূর্তে নারকও শেষ মুহূর্তে জ্বলে উঠল একবার। পাঁচ পাওয়ারের বাপসা আলায়ে ভরা ঘরে আমি অমলেশের বিকট ভ্যাংচানিটা দেখতে পেলুম না, কিন্তু যা স্বপ্নে পারলাম তাই যথেষ্ট।

অমলেশ যাচ্ছেতাই গলায় বললে, ত্যালেনা—ত্যালেনা—ত্যালেনা! গ্যান গাইছেন। বাড়ির মতো হাঁক ছাড়ছে যেন। ও যদি গান হয়, তবে মেশিন গান আর কাকে বলে!

—কিন্তু ওই মেশিন গানেই তো—

—ইয়েস, অলগ্যাম ফিনিশড্। কিন্তু তুই আর এই করুণ দৃশ্যের ভেতরে থাকিসনে সুকুমার—বাড়ী চলে যা। আমিও এলাহাবাদে একটা চাকিরর চেষ্টা করছি। আর—পৃথিবীর অনেক স্থানী মনীবীর মতো উদাস গলার চরম ব্যাকটি উচ্চারণ করল অমলেশ : অ্যান্ড রিমেম্বার—নেভার ট্রাস্ট এ উরোম্যান—নেভার!

* * *

যুব সম্ভব অমলেশ এলাহাবাদেই চাকরি পেয়েছে, কিংবা নিমতলার শ্মশানে গিয়ে কোনো গাজাখোর সাধুর কাছে পারমাণ্বিক তত্ত্ব লাভ করছে অথবা সেই কালো চাদরটের তলায় একগাল দাড়ি নিয়ে নিদারুণ বিরহীর মতো শূরে আছে। এর যে-কোনো একটাই ঘটতে পারে, কিন্তু আমি আর তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করছি না। কারণ দেড়পো পোনা মাছ না হলে একপো চিংড়ি আছে এবং কচিকলাওলা না থাকলে ঢাড়িশওলা আর পটোলওলা থাকতে বাধা নেই।

তার ওপর যাচ্ছেতাই একটা অবস্থা যাচ্ছে অফিসে। এক নতুন ছোকরা ওপরওলা এসে জুটেছে, যখন-তখন সম্পর্ক বিনা নোটীশেই, রবার-সালের জুতো পায়ে দিয়ে যে-কোনো ডিপার্টমেন্টে ঢুকে পড়বার তার একটা বিশ্রী অভ্যাস আছে। কেউ নিজের চেয়ারে না থাকলে সে কেন নেই এবং কোনো ভদ্রসন্তানের কতকগুলি বা 'বাখরুমে' থাকা উচিত, এ-সব নিয়েও নানারকম কৌতূহল সে প্রকাশ করে থাকে।

আপনার এবং আপনার
প্রিয়জনের জন্য

মদির—মনোহারিণী



পিয়া
সুরভি

প্রস্তুতিত ফুলের মতই আপনাকে
সারাদিন সুবভিত রাখবে

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা, বোম্বাই, কানপুর, দিল্লী

অতএব জীবনে কোনো সুখ নেই।
নিজেরই স্বপ্ন এখনভাবে ব্যর্থ হতে আরম্ভ—
তখন আর অমলেশের কথা ভাববার সময়
পাওয়া যাচ্ছে কী করে। পৃথিবীতে সাতদিন
কত গভীর ট্রাজিডীই তো ঘটে যাচ্ছে, আমি
আমি কার জন্যে কতটুকু করতে পারি।

এর মধ্যে দূরে একদিন ভট্টকে দেখে-
ছিলুম। সে একটা ট্রাম-স্টপের সামনে
দাঁড়িয়ে সিগ্রেটের ধোঁয়া ওড়ানছিল। একবার
ভেবেছিলুম, কাছে গিয়ে তার দাবার খবরটা
জিজ্ঞাস করব, কিন্তু এই দুঃখের দিনে
যেভাবে সিগ্রেটটা ফেলে দিতে হবে মনে
করে সাদিকতা দমন করতে হল।

তারপর—একেবারে বিনা মেঘে বজ্র-
পাতের মতো—

অমলেশ এসে পেঁপেছে গেল।

বোপ-দুরন্ত শাদা পাঞ্জাবি গায়ে—এই
মুহুর্তে বোধ হয় দাঁড় কামিয়ে এল—
চকচক করছে মুখখানা, সেলুনের টিপক্যাল
জনতা-স্নো আর পরিমল পাউডরের গন্ধ
বোঝে মুখ থেকে। আমি কিরকম ঘাবড়ে
গেলুম খানিকটা, ভূত-দেখার মতো করে চেয়ে
বসেছি ওর দিকে।

—তুই।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ—এসে গেলুম।

—আজকেও দাঁত খিঁচোজিস নাকি?

—না, হাসছি। রিয়্যাল হাসি যাকে বলে।

আমি ইন্ডিরটার মতো জিজ্ঞাস করলুম :
এই রিয়্যাল হাসিটা পেলে কী করে?

—আমায় নাক-সন্সকুল।

—আঁ। —আমি একটা বাব খেলুম :
তুই তো ফিনিশ্জ হয়ে গিয়েছিলি।

—রিবণ।

—কী করে? ক্র্যাসিকাল গান শিখে
কেসোজিস? কালোরাং হয়ে গেছিস?

—হ্যাঁ ইরোর ক্র্যাসিকাল—কান্না আপন
ইরোর কালোরাং! —অমলেশ ফস করে একটা
আসেটা সিগ্রেট বের করে ফেলল, এমন কি
একটা আমাকে পর্যন্ত এগিয়ে দিলে। ওর
এই অপব্যয় আর আত্মত্যাগ দেখে আমি
একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম।

অমলেশ বললে, বিষসা বিষমোষধ—
জানিস তো? ওই ক্র্যাসিকালই আমাকে
বাঁচিয়ে দিলে।

আমি হতাশ হয়ে বললুম, 'কিছু
বুঝতে পারছি না। সব ধাঁধার মতো ঠেকছে।

—মাথার ভেতরে সাতদিন তোর কাঁচকলা
হুরপাক যাচ্ছে, বুঝি কী করে? দাঁড় সব
ক্রীয়ার করে দিই। ক্র্যাসিকাল গাইয়ের
ভাদর গানের ব্যাপারে খুব সীরিয়াস হয়—
হয় কিনা?

—খুব সম্ভব।

—আর তাই নিয়ে কেউ একটু হাল্কা
চালে কিছু বললে তারা দারুণ চটে যায়—
হায় কিনা?

—যার না আবার? সেই বলরাম বাগচী
মশাই তো তোকে আমাকে দু-হাতে তুলে—

• অমলেশ বললে, থাক-থাক, আর
বলিসনি, ও কথা মনে পড়লেও আমার রক্ত

জল হয়ে আসে। মোশা—ওতেই কাজ হয়ে
গেল।

—কী করে?

—সেই ঘোর অবিস্বাসী সুখময় বিস্বাস
তো? সে তো খুব জমিয়ে নিলে ওখানে।
একটা তানপুরা বগলে করে প্রায় রাজ
সম্মান ওখানে বাতায়ত আরম্ভ করল—
আর কখনো বাজখাই গলার ত্যালেনা—
ত্যালেনা—কখনো 'নন্দিয়া রে'—বলে চেঁচিয়ে
চেঁচিয়ে পাড়া মাত করতে থাকল। আমি তো
সম্মানবোধের বাড়ীই ছেড়ে দিলুম—সটান
দাঁকশেবর গিয়ে বসে থাকতুম।

—তারপর?

—তারপর আর কী? তুই ঠিকই
বলেছিলি—বে-কখনো ফুটবল খেলোনি,
সেই-ই সবচেয়ে ঘোরতর ফুটবল ফ্যান হয়,
বে ক্রিকেটের ব্যাটেও কখনো হাত ছোঁয়নি—
সেই-ই রেজিয়ার সামনে 'কী ফাইন
লেগ-কাট মেরেছে' বলে হাত তুলে নাচেতে
থাকে। কিন্তু ফুটবলাররা ওতে মাইণ্ড করে
না—ক্রিকেটাররা কোনোদিন মাথাও ঘামায়
না। কিন্তু যেখানে ডাইরেক্ট রিলেগান—
মানে স্রোতা আর গাইয়ে মুখোমুখি—সেখানে
ও-সব চালাকা চলে?

—গো অন।

—বুঝি, বাপ আর মেয়ের কাছে
মোহনবাগানের খেলা বা, ক্র্যাসিকাল গানও
তাই। এক বর্ষ বোকে না, সেইজন্যই
সমঝদার সেজেছে—ওটাও আজকালকার
একটা ফ্যাশান কিনা। তাই দিন কয়েক
সুখময়ের গান শুনেই তারা হররান হয়ে
গেল। তারপর পরশু সম্মানবোলা—

—সম্মানবোলা?

—সুখময়ের গান কেবল আরম্ভ হয়েছে,
আমি দাঁকশেবর হয়ে যাব বলে পাঞ্জাবি পরছি—
হঠাৎ তরলাব হাউমাউ চিংকার : অমলেশ-
বাব, বাঁচান-বাঁচান।

নারীর আত্মনাদ। হোক হলানামসী, তবু
অবলা তো। পায়ে একপাটি জুতো পরেই
আমি ছুটে গেলুম। বাড়ীর ভেতরে জনাৎ-
কনাৎ করে কী সব ভাঙবার আওয়াজ পওয়া
গেল, তারপরেই ঘোঁ-ঘোঁ করতে করতে
একটা বুনো মোবের মতো ঠিকরে বেরল
সুখময়, এক শাকার আমকে তিন হাত হিটকে
দিয়ে কোনদিকে উধাও হয়ে গেল।

ঘরে ঢুকে দেখি, কুমুদবাবু একটা
টোবলের তলায় ঘাপটি মেরে শুকিয়ে
রয়েছেন, আর তরলা মেজের ওপর প্রায়
ফেণ্ট—মানে অজ্ঞান হতে হতে একটুর
জনো সামলে গেছে।

হয়েছিল কী, জানিস? কদিন ধরে
সমানে ওস্তাদী গান শুনে এরা জেরবার
হয়ে গেছে। কিছু তো বোঝে না—রস পাবে
কেথেকে? আর সুখময়ও নিশ্চয় এদের
এলেম বুঝে ফেলেছে—এক-জাঘট, চটেও
ছিল বোধ হয় জানিস তো—গান বদলে
সবচেয়ে বড়ো সাধনা—তার কাছে 'সুন্দর'
মহিলা-টাইলা কিছু না—গানও পরতরং

নাই। কাজেই সেনিন হঠাৎ মাকপথে গান
খামিরে কটকটে গলার কুমুদবাবুকে জিজ্ঞাস
করলে : 'খিমুচ্ছেন যে বড়ো?'

কুমুদবাবু, ধতমত খেয়ে বললেন, না—
ইয়ে, খিমুচ্ছি না তো। মানে গানের ভাবে
চোখ বুজে এসেছিল। আপনি বোধহয়
বাহার গাইছিলেন, না? এমন মিঠে গান—

আর বলতে হল না। 'বকট মুখ ভেঙে
সুখময় ভেঙে উঠল : 'বাহার। না—এ বাহার
আলী নয়, এর নাম করিম শেখ। পড়ি-বড়ির
কারখানার চাকরী করে।'

বাপ-মেয়ে তো থা। সুখময় হেমনি
বিচ্ছিন্ন মুখে তোরিয়া হয়ে বলে চলল :
'কিছু বোঝে না—দুটোরই মগজ একেবারে
নীরেট—কদিন ধরে তবু সমানে টিকর-
টিকর করছে : বাহার-খাম্বাজ-হিন্দোল-
ছায়ানট! ছায়ানট! নটেশাক—টক পালং—কছু
ব'ট—ঘোড়াডান্ডা!'

তরলা বোধ হয় কিছু বলতে যাচ্ছিল,
তার আগেই সুখময় মাথার ওপর তানপুরা
তুলে চেঁচিয়ে উঠল : 'ইউ প্র্যাট—স্পীকি-টি
নট! একটা কথা নয়। অনেকদিন সহ্য
করেছি, কিন্তু গান নিয়ে আর একটাও
ফাজলোমি করলেন—'

তরলা হয়তো বলছিল, 'একটু ভদ্রভাব—'

'ভদ্রভাবে! নেহাৎ ভদ্র লোক বলেই
গ্যান্দিন সয়ে গেছি, আর কেউ হলে খুনো-
খুনি হয়ে যেত। কেবল কটা রং, পান-সে
চেহারা আর মিছরিমাথা বুলি থাকলেই
গানের সমজদার হয়? ফের যদি একটা কথা
বলে তা হলে এই তানপুরার ঘায়ে
দুটোরই মাথা ফাটিয়ে—'

তারপর তরলার চিংকার—আমি
অবলাকে হেল্প করতে গেছি, আর
মেজতে তানপুরা আছড়ে ফেলে ঘোঁ ঘোঁ
করতে করতে উধাও হয়েছে সুখময়।

আমি বললুম, তা হলে—

অমলেশ দাঁত বের করল। নিরুত্তরে।
—সুখময়ের ওপর দাঁত খিঁচোজিল
নাকি?

—না, হাসছি। রিয়্যাল হাসি যাকে
বলে। সুখময়ের ওপর আর রাগ নেই আমার।
ওকে আমি আগের চাইতেও বেশি ভালো-
বেসে ফেলছি।

—আর?

—আর? কাল সম্মান ওদের ওখানে
আমার খাওয়ার নেমস্তম্ভ—তরলা নিজেই
রেখে খাওয়ারে বলেছে। রিপেন্টেন্স—
বুঝি না? আমি ক্র্যাসিকাল গাইতে পারি
না, ওরাও বুঝতে পারে না—সব শেখাবোধ
হয়ে গেছে। ভালো কথা—হঠাৎ কোথেকে
একটা কাগজের বাস আমায় দিকে এগিয়ে
দিলে সুখময় : এতে কটা সিগাড়া আছে—
রিয়্যাল দিয়ে জালা, অডার দিয়ে আনি-হুই
তোর জন্যে। আর চিনির চা-র সঙ্গে ফাউল
কাটলেট—অমলেশ একবার চোখ টিপল :
কটা দিন একটু ওয়েট করতে হবে—
বুঝি না?

আমি সানন্দে বললুম, নিশ্চয়—নিশ্চয়।
প্ল্যাডলি ওয়েট করব।

নিজের সংবাদদাতা

কৃষ্ণ ধর

সাহিত্যের মতো উজ্জ্বল না থাকলেও আজকের যুগে সাহিত্য থেকে সাংবাদিকতা খুব দূরে আর নেই। চিরকালীন বিষয় নিয়ে সাহিত্যের কাজ-কারবার। সংবাদপত্র প্রতিদিনের লিপিকার। প্রতিদিনই সাহিত্য রচিত হয় না, কিন্তু প্রতিদিনের জীবনে সাহিত্যের উপকরণ থাকে ছাড়িয়ে। সাংবাদিক প্রতিদিনের ঘটনাকে তুলে ধরেন, সাহিত্য তা থেকে বাছাই করে নেয় তার বিষয়বস্তু। আজকের যুগে সংবাদপত্রে সাহিত্যের ছায়া প্রতিদিনই কোনো না কোনো ঘটনার বিবরণে প্রতিফলিত হয়। ভগ্নের বিষয় নিয়ে সাংবাদিককে লিখতে হয়, যার প্রয়োজন হয়তো পরের দিনই যায় ফুরিয়ে। কিন্তু প্রতিদিনের জীবনও মহাকাব্যের মালায় গাঁথা এক একটি চমক মূহুর্তের প্রতিবিম্ব। সাংবাদিক সেই অলিখিত মহাকাব্যের রূপকার। তাই এ যুগে সংবাদপত্র হল জীবনের বিচিত্র-দর্শন। সাহিত্যও তাকে সব সময় অঙ্গীকার করতে পারে না।

নিউ ইয়র্ক টাইমসের শিরোভূষণ একটি ঝাঝ। তাতে লিখিত থাকে 'অল দ্যাটস্ ফিট টু প্রিন্ট'—যা কিছ্ ছাপার যোগ্য তাই সংবাদপত্র সাদরে গ্রহণ করবে। সে নিরপেক্ষ। বর্তমানের জন্য ও আগামীকালের জন্য প্রতিদিনের জীবনের ইতিহাস তার পাতায় লিপিবদ্ধ হচ্ছে। কালের বিশাল ও নিম্ন চার্দানিতে কোনটা থাকবে আর কোনটা থাকবে না এ-বিচার তার নয়। তার দায়িত্ব সমকালের নিজস্ব সংবাদদাতার।

সাহিত্য আসবে পরে। নিজে, নিজের সেই চলমান ঘটনাপ্রবাহ থেকে দূরে বসে সাহিত্যিক রচনা করবেন তাঁর সাহিত্যিক্য। সাংবাদিকের ভাণ্ডে এই নির্জনতা বা অবসর অকল্পনীয়। জীবনের দ্রুত তালের সঙ্গে কলম মিলিয়ে তাতে লিখে যেতে হবে পরবর্তনশীল ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়। সে বিচারক নয়, দর্শক। সে সাহিত্যিক নয়, নিজস্ব সংবাদদাতা।

আমাদের মহাকাব্য মহাভারত তো পুরোটােই নিজস্ব সংবাদদাতার বিবরণ। অথ বৃত্তান্তের নিজস্ব সংবাদদাতা হলেন তাঁর সারাধি সঞ্জয়। ব্যাসদেবের করে সঞ্জয় হরোঁছিলেন দিব্যচক্ষু, অদৃষ্টদর্শী। আজকের যুগে ওয়ার কorespondent-এর আদিপতা হলেন সঞ্জয়। রণাঙ্গনের রিপোর্টারকেও সৈন্যকে পে হাক পরতে হয়, আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রও তাকে দেওয়া হয়। 'কলম দূতের মতোই ওয়ার কorespondent-এর অস্ত্র। যুদ্ধবন্দীর মহালা তার

প্রাপ্য। সঞ্জয়ও ছিলেন অবধা, কোনো যুদ্ধ-নীতির চুক্তিতে নয়, দেবতার বরে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে মহা-মহারথীরা নিহত হয়েছিলেন। সঞ্জয় বেঁচেছিলেন শেষ পর্যন্ত। তিনি যে রণাঙ্গনের রিপোর্টার।

সঞ্জয়ের যুগে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বে নিখুঁত বিবরণ আমরা পেয়েছি তা এ যুগের বাধা বাধা ওয়ার কorespondent-দের বিবরণকেও হার মানায়। মহাভারতের আরেকটি চমক বিদ্যুর। তিনিও ছিলেন সংবাদ-সংগ্রাহক। সাংবাদিক ভাষায় আমরা যাকে হালি নিউজ-ম্যান বা কনট্রী তা মহাজ্ঞানী বিদ্যুরের ছিল যথেষ্ট পরিমাণে। পাণ্ডবদের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন তিনি। তাঁর সংগ্রহীত অনেক সংবাদ দিয়ে তিনি পাণ্ডবদের আশেষ উপকার করেছিলেন। বারণাবতে জড়ুগৃহ তৈরী করে পঞ্চপাণ্ডবকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন কুমতি দুর্যোধন তার খবর বিদ্যুরই দিয়েছিলেন যুধিষ্ঠিরকে। আজকের যুগে সাংবাদিকরা যেমন 'স্কুপ-খবর' পেলে তা সমস্ত গোপন তথ্যের চেষ্টা করেন, সংবাদপত্রে না দেওয়া পর্যন্ত, বিদ্যুরও এই গোপন সংবাদ যাতে অন্য কেউ জানতে না পারে তার জন্য স্বেচ্ছা ভাষায় খবরটি দিয়েছিলেন যুধিষ্ঠিরকে। এ যুগে একেই বলা হবে কেকড ল্যাঙ্গুয়েজ। যুদ্ধক্ষেত্রে এই ধরনের সাংকেতিক ভাষাতেই যুদ্ধ-কৌশল নিজেদের মধ্যে আদান-প্রদান করা হয়। যুধিষ্ঠিরও ছিলেন ভাষাজ্ঞানী। বিদ্যুরের ভাষা বুঝতে তাঁর কষ্ট হয়নি।

স্কুপ-খবরও সবসময় সাংবাদিকরা একমাত্র নিজের দায়িত্বে প্রকাশ করতে পারেন না। তাকে নিশ্চিত হতে হয়। এমনি একটি ঘটনা ঘটেছিল ১৯৪৫ সালের ১ আগস্ট। শতাব্দীর নিম্নমতম স্কুপ-খবর সৌদন একজন জাপানী সাংবাদিক নিজের হাতে পেয়েও প্রকাশ করতে বিন্দ্বা করছিলেন।

বেলা তখন নটা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ প্রহর বনিয়ে এসেছে। জাপানের শ্রেষ্ঠ পরমাণু-বিজ্ঞানী যোশিও নিসিনা-র গবেষণাগারে উপস্থিত হলেন জাপ-বিমান বাহিনীর একজন অফিসার। তাঁর চোখে-মুখে নিদারুণ উদ্বেগের চিহ্ন সুস্পষ্ট।

বিজ্ঞানী প্রশ্ন করলেন, কী চাই?

অফিসারটি উত্তর দিলেন, আপনাকে একদুনি সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে যেতে হবে।

যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন অধ্যাপক নিসিনা। এমন সময় সেখানে উপস্থিত

হলেন একজন সাংবাদিক। সংবাদ-প্রতিষ্ঠান ডোয়েই-র প্রতিনিধি তিনি। এক উল্লসের সংবাদ শুনে তিনি এসেছেন। এমন সংবাদ যা বিশ্বাস করা কঠিন, আবার অবিশ্বাস করার মতো সাহস ছিল না তখনকার কোনো জাপানীর। খবরটি প্রচার করেছে মার্কিন যেতার আগের দিন। এক লাইনের খবর : ৬ আগস্ট জাপানের হিরোশিমা শহরের ওপর মার্কিন বিমান থেকে একটি পরমাণু বোমা ফেলা হয়েছে।

পরমাণু বোমা কী বস্তু, তা তখনও সাধারণ মানুষ জানে না; যুদ্ধের সময়কার কড়াকড় সর্বাকছ্ না জেনে-শুনে লেখাও যায় না। সাংবাদিকটি মনে করছিলেন, এটা সম্ভবত আমেরিকার একটি প্রোপাগান্ডা। যুদ্ধের সময়ে এমন হরনমই হয়। কিন্তু সাংবাদিককে তো চুপ করে থাকলে চলবে না। তাকে খবরের সূত্র ধরে সত্য উপনীত হতে হবে। নিজের চোখে দেখতে হবে। সে কারণেই তিনি প্রথমেই এলেন জাপানের শ্রেষ্ঠ পরমাণুবিজ্ঞানী অধ্যাপক নিসিনার কাছে।

অধ্যাপক নিসিনা শুনলেন। বললেন, হ্যাঁ, হতে পারে। এটা খুবই সম্ভব। ততক্ষণে সাংবাদিকের মুখ সাদা হয়ে গেছে। অধ্যাপকের ঠোঁট কঁপছিল। কারণ, তিনি নিজে পরমাণুবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করেছেন। এই বোমা, তিনি জানেন, আমেরিকার পক্ষে তৈরী করা অসম্ভব নয়।

সাংবাদিকটি আর সেখানে দাঁড়লেন না। ছুটে ফিরে গেলেন তাঁর আঁপসে। এখুঁথের বহুস্তম সংবাদ ঘটেছে হিরোশিমায়। তার বিবরণ চাই। সেনাবাহিনীর অনুমতি নিয়ে অধ্যাপক নিসিনার সঙ্গেই সাংবাদিকরা গিয়েছিলেন হিরোশিমায়।

৬ আগস্ট হিরোশিমায় প্রথম পরমাণু বোমা বর্ষিত হল। হতচাকত জাপানীরা প্রথমে বুঝতেই পারেনি ব্যাপারটা কি। একটিমাত্র বোমার গোটা শহর নিশ্চিহ্ন। সেই চরম বিপদের দিনে সরকার সাহায্য নিলেন বিজ্ঞানীর। আর মানুষের সাহায্যে এঁগিয়ে গেল সাংবাদিক। তাকে যেতেই হবে। ঘটনা যত নিম্নম হোক, যত যুঁকই থাক নিজের বিপদের, সাংবাদিককে সৈনিকদের মতোই সর্বাকছ্ তুচ্ছ করে ঠিক ঘটনাস্থলে ফিরে দাঁড়াতে হবে। হিরোশিমা তখন মহাশ্মশান। সামনে প্রসারিত শবচ্ছন্নমহাবেলা। সাংবাদিক সেখানে দাঁড়িয়ে। কী লিখবেন তিনি। কী, তবে আরম্ভ করা হবে এই মহামৃত্যুর জলন্ত মোনের সক্রিয় দৃশ্য। এখুঁথের ভীষণতম সঁও স্টোরি। বিজ্ঞানী দেখতে লাগলেন তাঁর গবেষণালব্ধ জ্ঞানের দৃষ্টিতে। সাংবাদিক দেখলেন হিরোশিমায় মানুষের শেষ-মূহুর্তের ঘনায়মান অশ্রুকারের দৃষ্টিতে। একই ঘটনার দুই দৃশ্যপট।

হিরোশিমা নেই। এই সংবাদ ছাড়িয়ে পড়ল দেশে দেশে। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ বেয়েল। শতাব্দীর বহুস্তম সংবাদ-শিল্পে

নাম। যে-কোনো সাংবাদিকের পক্ষেই এই সংবাদ লেখনির, এ সংবাদ বত বেবনা-দারকই হোক সাংবাদিককে বিভাজিত হলে চলে না। সাহিত্যিকের মতোই সে নিশ্চিত অখণ্ড প্রতিটি ঘটনার স্বাভাবিকভাবে সঙ্গী একান্তভাবে জড়িত। এই মানসিক অবস্থাতেই তাকে লিখতে হল মহানন্দার ৩৩টি নিউজ।

এই হল সাংবাদিকের দায়িত্ব। মানুষ সংবাদ চায়। পৃথিবীর দূরতম কোণে যে-সংবাদ তৈরি হচ্ছে তার বিবরণ সংগ্রহ করে সাংবাদিককে দিতে হবে, জানাতে হবে পৃথিবীর অন্য প্রান্তের মানুষকে। আজকের যুগে খবর ছাড়া কোনো সভ্য মানুষের চলে না। এ খবর শুধু নিজের নয়, নিজের দেশের নয়, সকল মানুষের সকল দেশের। শুধু এ প্রহর নয়, হরতো বা মহানন্দার।

সংবাদের মধ্যে আছে চাঞ্চল্য, আছে চলমানতার শিহরন। সেজন্য সাংবাদিকতার কাজ অনেক মানুষকে আকর্ষণ করে নিয়ে যায় দূরে দূরতরে, গভীরতম বিপদের জায়গায়। ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে নয়, তার কিনারায় দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ লেখার মধ্যে রোমাঞ্চ আছে। একেই বলা যায় আড্ডাভাণ্ডার উইথ পেন, কলম নিয়ে আড্ডাভাণ্ডার করার আকর্ষণে বহু খ্যাতিমান সাহিত্যিক এসেছেন সাংবাদিকের শিবিরে। এসেছেন অনেক রাজনীতিবিদ, কবি, শিক্ষণীও। মহাদুর্ভাগ্যের রাজনীতিবিদ উইনস্টন চার্চিলের বহু বৈচিত্র্যময় জীবনের একটি অধ্যায় ছিল সাংবাদিকতার। যুবক বরসে চার্চিল সেনা-বাহিনীর কাছে এসেছিলেন ভারতবর্ষে। সে সময়ে আফগান যুদ্ধের রিপোর্টও তিনি পাঠাতেন বিলেতের কাগজে। তাঁর রিপোর্ট জারতের একটি দৈনিকেও বেরিয়েছিল। কাগজটির নাম 'পাইওনিয়ার'। এই কাগজেই একসময়ে যুক্ত ছিলেন কবি রাডার্ড কিপলিং। সম্পাদনার ফাঁকে ফাঁকে তিনি কবিতা লিখতেন। সেই কবিতাগুলো ছাপা হত কাগজে। কখনো বা জারগার অভাব কবিতা ছোট্ট দেওয়া হত। তখন কি আর কেউ জানত যে, এই কবি একদিন বিশ্ব-বিখ্যাত হবেন, নোবেল পুরস্কার হবে তাঁর করার।

জওহরলাল নেহরু, নিজে সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। লখনৌর ন্যাশনাল হেরাল্ড তাঁর হাতে তৈরী। এমনও হয়েছে যে, নেহরু তাঁর নিজের সফর ও জনসভার রিপোর্ট নিজে লিখে প্রাতিয়েছেন তাঁর কাগজের জন্য। যিনি মেতা তিনিই রিপোর্টার। এমন নিজস্ব সংবাদপত্র পাওয়া যে কোনো সংবাদপত্রের পক্ষে দৃষ্টান্ত গৌরব।

সাহিত্যিক মানুষ আর্গেন্ট হেরিং-ওয়ে। গল্প-উপন্যাস লিখে তাঁর খ্যাতি। তিনিও সাংবাদিকতার দুর্য্য আকর্ষণ এড়াতে পারেননি। স্পেনের গৃহযুদ্ধের

সময়ে ১৯৩৭ সালে তিনি গিরেছিলেন ম্যানিষ্ট্রের ফ্রন্টে ফ্রান্স-বিরোধীদের সঙ্গে। সেই যুদ্ধের ভিত্তিতে তিনি লিখেছিলেন জনপ্রিয় বহুপাঠিত উপন্যাস 'ফর হুম দি বেল টোলস'। সাহিত্য ও সাংবাদিকতার অপূর্ব মিশ্রণে রচিত হয়েছিল সে কাহিনী। স্পেনের গৃহযুদ্ধের বিবরণ জানতে হলে হেরিংওয়ের এই বইটির নাম প্রথমে মনে আসে। এবার জিরেনামের যুদ্ধের রিপোর্ট লিখতে গেছেন নোবেল পুরস্কারবিজয়ী আরেক সাহিত্যিক জন স্টাইনবেক। সে রিপোর্ট প্রতিদিনের ঘটনাপঞ্জী নয়, একজন সাহিত্যিকের জারেরী। তাঁর সঙ্গে পাঠকের সবসময় একমত নাও হতে পারেন, কিন্তু একজন শিক্ষণী কী চোখে দেখছেন এই যুদ্ধকে তার পরিচয় পাওয়া যাবে স্টাইনবেকের জারেরীতে। স্টাইনবেকের এই লেখা নিয়ে দেশে-বিদেশে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। বিতর্কের কারণ ভিন্নবৈধ যুদ্ধের আদর্শগত সংঘাত। স্টাইনবেক তো শুধু রিপোর্ট লিখছেন না, তিনি তাঁর মতামত ব্যক্ত করছেন এই যুদ্ধ বিষয়ে তাঁর রিপোর্টে।

সাংবাদিক হবেন নিরপেক্ষ, তথ্য-সম্পাদনা অপক্ষপাতী। কিন্তু আদর্শের প্রশ্ন

যখন জড়িয়ে যায়, অনেক মানুষই নিরপেক্ষ থাকতে পারেন না। দ্বিতীয় মহাদুর্ভাগ্যের সময়ে নাৎসীকবলিত ফ্রান্সে প্রতিরোধ-বাহিনীর পক্ষ থেকে অনেক গল্প-পাঁচকা বের হত। বিশিষ্ট ফরাসী কবি সাহিত্যিকরা ছিলেন সেই সব পত্রিকার লেখক। আঙ্গ-বেয়ার কামু ও লুই আরাগ-নাম এ প্রসঙ্গে অনেকেরই মনে আসবে।

একশো বছর আগে সংবাদপত্রের যে চরিত্র ছিল তা থেকে আজকের সংবাদপত্রের চরিত্র অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। মানুষের মর্মে, মন আর মেজাজ যে ভালে বদলাচ্ছে সংবাদপত্র একনিষ্ঠভাবে হয়ে উঠছে তার বিশ্বস্ত দর্পণ। সেজন্যেই বার বার সাহিত্য এসে তাকে ছুঁতে বাচ্ছে। এক সময় ছিল যখন রাজনৈতিক বক্তৃতাই খবরের কাগজের পাতা জুড়ে থাকত। এখনও আম-দের দেশের খবরে রাজনীতিরই প্রাধান্য। কিন্তু অন্য অনেক দেশ রাজনীতির এই প্রভাব কাটিয়ে মানুষের অন্যান্য কর্মের কথায় খবরের কাগজের পৃষ্ঠাকে প্রয়োজনীয় ও অপরিস্রাব করে তুলছে। রাজনীতিকদের সঙ্গে সংবাদদাতাদের বনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এই কারণেই। যখন যেতার বা টেলিভিশনের এত প্রাধান্য ছিল না তখন মর্মেত থাকাই ছিল প্রচারের অন্যতম প্রধান সহায়ক।

প্ল্যাডমোন্ট তখন বটেনের প্রধান-মন্ত্রী। জবরদস্ত রাজনীতিক। ইংল্যান্ডের তখন ভ্রমতমে অবস্থা। ইরোরোশের রাজ-নীতিতেও প্ল্যাডমোন্টের নাম পরলা সারিতে। ফ্রি স্ট্রীটের প্রেস আসোসিয়েশন তখন হবে জন্মেছে। তার প্রথম চীফ রিপোর্টার ছিলেন ওয়াটসন হেপবার্গ নামে একজন স্থানীয় ভদ্রলোক। প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা রিপোর্ট করতে করতে সাংবাদিক মহলে তাঁর একটি ডাকনাম জুটেছিল : মিঃ প্ল্যাডমোন্টের মোটা রিপোর্টার। যেখানেই মিঃ প্ল্যাডমোন্ট যেতেন, সেখানেই অনুযায়ীর মতো দেখা যেত মিঃ হেপবার্গকে। কোনো সময়ে যদি মিঃ হেপবার্গকে পাশে দেখতে না পেতেন তাহলে মিঃ প্ল্যাডমোন্ট প্রশ্ন করতেন : হোরার ইজ মাই রিপোর্টার? মিঃ হেপবার্গ এসে না পৌঁছলে তিনি বক্তৃতা অন্তর্ভুক্ত করতেন না।

এমন যে লম্বা বক্তা উইনস্টন চার্চিল, তিনিও সাংবাদিকদের সঙ্গে বেশ ভাল রোধ লেভেন। যখন তিনি এত নামী হননি সে সময়ের কথা বটেনের পুরনোকাণের সাংবাদিকরা মনে রেখেছেন। তিনি নাকি ফ্রি স্ট্রীটের প্রেস অ্যাসো-সিয়েশনকে ডেকে বলতেন : আজ রাতে আমি একটি গৃহযুদ্ধে ভাষণ দেবো। তার জন্য হাফ কলাম জারগা দেবেন তো! আসুন আমি বক্তৃতার পরেটগুনি একটুনি বলে দিচ্ছি।

একবার একটি বজ্রর ঘটনা ঘটেছিল। দ্বিতীয় মহাদুর্ভাগ্যের পর বটেনে সেবার পাঠের গভর্ণমেন্ট তৈরী হয়েছে।



১৩৭৪

যদি চার্চিল বিহারী সেনের মতো। ভারত-বর্ষের স্বাধীনতা দেবার কথা উঠছে। এটলী গভর্নমেন্ট তার জন্য কথাবার্তা চালাচ্ছেন ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে। কমল সেনার গর্জে উঠে মিঃ চার্চিল যা বললেন খবরের কাগজে তার রিপোর্ট বেরোল : '১৯ শ্রেকেন্ড গভর্নমেন্ট ইজ হাইসালিং মি এম্পায়ার অ্যাওয়ে।

বেতার বক্তৃতার রিপোর্ট শুনে মিঃ চার্চিল প্রেস এ্যাসোসিয়েশনকে ফোন করলেন :

You have reported me as saying that the present Government is whistling the Empire away. What I intended to say was 'the present Government is whistling the Empire' away. But don't change it, Mr. P. A. I like it".

সাংবাদিককে অনেক বাধানিষেধের মধ্যে কাজ করতে হয়। কিন্তু সত্যের খাতিরে নিজে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করতে না পারলে কোনো সাংবাদিকই সত্যকথের দায়িত্ব পালন করতে পারেন না। একটি ঘটনার উল্লেখ করছি এখানে। ১৯৩৯ সালের এপ্রিল। ইরাকোশে যুদ্ধের পরিভাষা শুরু হয়েছে। কিন্তু আসল যুদ্ধের তখনও দেরী।

বুটিশ নৌবহরের 'আক' রজাজ' জাহাজে সাংবাদিকরা নিষিদ্ধিত হয়েছেন একটি বিশেষ ফিল্ম দেখবার জন্য। নৌবাহিনীর বড় বড় কর্মচারী সকলেই উপস্থিত। স্বভাবতই সাংবাদিকরা নৌবাহিনীর প্রচার-চিত্র দেখতে খুব বেশি আগ্রহী ছিলেন না। তাঁরা খবরের গন্ধ খুঁজতে লাগলেন। নকলকে স্বাগত জানিয়ে ফাস্ট লন্ড' অব দি জ্যাড্রিয়ানালি জাল' স্ট্যানহোপ বক্তা সিজিলেন। বক্তৃতার থাকখানে একটি যাকো সাংবাদিকরা সচকিত হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন :

There are others who cannot be with us tonight because shortly before I left the admiralty it became necessary to give orders for the anti-aircraft guns of the fleet to be manned.

জাহাজের সেই প্রেক্ষাগৃহে যেন ডিনা-হাইট বিস্ফোরণ হয়। সাংবাদিক গম্ব পেলেন সংবাদের। একজন প্রবীণ সাংবাদিক উঠে নিয়ে নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট কমান্ডার লর্ড লুইস ব্রাউণ্টারটনকে বললেন : লর্ড স্ট্যানহোপ কি জানেন যে, এখানে সাংবাদিকরা উপস্থিত আছেন? লর্ড লুইস বললেন তিনি খুব ভালভাবেই জানেন। সাংবাদিকরা এ খবর অবশ্যে ছাপতে পারেন।

সাংবাদিকটি তবুও আরও নিষিদ্ধ হবার জন্য জাল' স্ট্যানহোপকেই প্রশ্ন করে জেলে নিলেন যে, এই খবর কাগজে ছাপা হবে কিনা।

সাংবাদিকের এই সতর্কতার কারণ বিবর্তি দেশেরকার সঙ্গে জড়িত। সংবাদ পেলেই তা তিনি জেপে দিতে পারেন না। এম্ম কোনো সংবাদ কোনো দায়িত্বশীল সাংবাদিকই ছাপাতেন না বা প্রকাশকে সাহায্য করতে পারে। পাঠকরা অনেক সময় ভুলের খবর কাগজে লেখতে না পেলে ক্রুদ্ধ হন। কিন্তু সব খবর যে সবসময় ছাপা

যায় না এটা পাঠকদের বোকা উচিত। নিউ ইংল' টাইমসের সেই শিরোনামকাই খাতি : তল পাটস্ ফিট টু প্রিন্ট। সব খবর কি ছাপা যায়।

সাংবাদিকের আরেকটি পবিত্র দায়িত্ব—খবরের সূত্র প্রকাশ না করা। সরকার দাবী করতে পারেন, গোপন সংবাদ বেরোল কী করে। সাংবাদিক তখন থাকবেন মৌন। এমন সাংবাদিককে অনেক গাধুনা সহ্য করতে হতে পারে। কিন্তু সাংবাদিককে বিশ্বাস করে যিনি খবর দিয়েছেন সমাজের স্বার্থে বা জাতির স্বার্থে তিনি তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেন না। সরকার দাবী করলেও না, আদালতের নির্দেশেও না। কয়েক বছর আগে বুটেনে গৃহতরবার্তার এমনি একটি খবর বের করে সাংবাদিককে জেলে যেতে হয়েছিল। কারণ তিনি তাঁর সংবাদের সূত্র প্রকাশে সম্মত হননি। এটা হল সাংবাদিকতার নীতি।

রূপাঙ্গনের রিপোর্টারদের সম্পর্কে জন-বার কৌতূহল সবাই আছে। আমাদের দেশে এ ধরনের রিপোর্টারদের সুযোগ খুব বেশি নেই। চীন ও পাকিস্তানের যুদ্ধের সময়েও আমাদের সাংবাদিকদের যথাস্থানে কুঠি লাইনে যাবার সুযোগ বিশেষ দেওয়া হয়নি। বিশেষে ওয়ার কন্সলপন্ডেন্টদের কোলীনা অজালা। গত মহাযুদ্ধের সময়ে নরমান্ড উপকূলে মিত্রবাহিনীর অভিযান শুরু হলে ফ্রান্সের মুক্তির সেই অজস্র সিনক্লিস রিপোর্ট পাঠাবার জন্য সৈন্যদের

সঙ্গে বহু ওয়ার কন্সলপন্ডেন্ট গিরেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন বিখ্যাত লেখক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে। সৈন্যরা মার-ম্যাড উপকূলে। হেমিংওয়েকে দেখা গেল যে, সংবাদ পাঠানোর চেয়ে সৈনিকদের মধ্যে পারস্পরিক মিত্রতা প্রতিষ্ঠানই তিনি বেশি আগ্রহী। ফরাসি প্রতিরোধ বাহিনীর লোক-দের সঙ্গে যোগাযোগ করে তিনি অবশ্য উৎসাহে মেতে গিরেছিলেন নারসী-শাসিত প্যারিসের সেই মুক্তি অভিযানে।

গৃহযুদ্ধ হারা লেখেন, রিপোর্ট করেন তাঁরা ছাড়াও সাংবাদিকতার অন্য দিক আছে। তাঁরাও সাংবাদিক, তবে তাঁরা কল্প দিলে লেখেন না, ক্যামেরা দিয়ে লেখেন। ফোটো-জার্নালিস্টদের মধ্যে দুনিয়া-জোড়া ব্যাতি অর্জন করেছেন লাইফ পত্রিকার শ্রীমতী মার্গারেট বুরক-হোয়াইট। তিনি নারী, কিন্তু সাহসিকতার ও সাংবাদিকতার নৈপুণ্যে যে-কোন নারী পুঙ্খ সাংবাদিকও তাঁর কাছে হার মানেন। অলোকচিত্রী সাংবাদিক নিজে কিছুই কলবেন না, তাঁর তোলা ছবিই কথা বলবে। এ যুদ্ধের সাংবাদিকতার কথাই চেয়েও ছবির দায় বেশি। হাজার নামে যা বলা না যায় একটি ফোটো সেই অকথিত কথা বুঝে করে তুলতে পারে।

যুদ্ধের সময়ে শ্রীমতী মার্গারেট গিরে-ছিলেন অনেকবার। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্বামী বিখ্যাত সাহিত্যিক এরস্টিন কলডওয়েল।

পূজার দিনগুলি

আরও আনন্দমুখর

হোক----

মগদ অথবা সহজ কিস্তিতে

অনেক রকমের

রেডিও, রেডিওগ্রাম, রেকর্ড
প্লেয়ার, রেকর্ড চেজার রেকর্ড
রিগ্রাউন্ডার, গ্রামোফোন রেকর্ড
ট্রান্সমিস্টার রেডিও, ও রেডিও-
গ্রাম, টেপ রেকর্ডার, এম্প্লি-
ফায়ার ইত্যাদি বিক্রয় করা হয়।

নেরামতের সুবন্দোবস্ত আছে



'ব্লু' ট্রান্সমিস্টার রেডিও।

রেডিও এণ্ড ফাটা স্টোরস

৩৬৯ গবেশকর্ন এডিনব্রি, কলিকাতা-১০, ফোন : ২৪-৫৭১৩



ফটো : অরুণ সেনগুপ্ত

হস্কার ওপর দফার দফার আক্রমণ চলছে নাৎসী বিমানবহরের। লালফোজের প্রতি-
রোধে সে-আক্রমণ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে।
মার্কন দূতাবাসে আশ্রয় নিয়েছিলেন শ্রীমতী
মাগারেট। বিমান আক্রমণের সংকেত বাজা
মাত্র সমস্ত শহর নিঃপ্রাণী। শ্রীমতী
মাগারেট দেখলেন, এই সুযোগ তাঁর।
হস্কার ওপর বিমান আক্রমণের চিহ্ন এর
আগে কোনো বিদেশী কাগজে ছাপা হয়নি।
তিনি নিজের জীবনের বিপদ তুচ্ছ করে সেই
অশ্বকারে পথ হাতড়ে চলে গেলেন দূতা-
বাসের ছাদে। তুলে নিলেন নাৎসী নৃশংসতার
ডকুমেন্টারি চিহ্ন।

এতো গেল সোর্ডয়েট প্রতিরোধের
একদিক। কিন্তু বিনি এই প্রতিরোধের
নেতৃত্ব দিচ্ছেন সেই রহস্যময় বলশেভিক
জোসেফ স্ট্যালিন তো গিয়েছেন ওই সামনের
বাড়িতেই ফ্রেমলিনে। তাঁর ছবিও তো তোলা
চাই। মস্কোতে তখন গিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট
রুজভেল্টের প্রতিনিধি হ্যারী হপকিনস।
সে-ও-লীক হুঁত নিয়ে কথাবার্তা বলার জন্য।
মাগারেট বললেন তাঁকে স্ট্যালিনের সঙ্গে

ছবি-তোলার প্রাপ্যমোটমেন্ট করে দিতে।
হপকিনসের অনুরোধে মলোটভ ব্যবস্থা করে
দিলেন।

শ্রীমতী মাগারেট সেই অবিস্মরণীয়
সাক্ষাৎকারের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর
আত্মজীবনীতে। এর আগে কোনো বিদেশী
সাংবাদিক স্ট্যালিনের ছবি তোলায় সুযোগ
পান নি। উৎসুক আগ্রহে নির্দিষ্ট সময়ের
জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন শ্রীমতী
মাগারেট বুরন-হোয়াইট।

তিনি লিখছেন : যথাসময়ে ফ্রেমলিনের
গার্ড এসে আমাকে নিয়ে গেল সেই প্রাসাদে
যেখানে স্ট্যালিনের আপস। কয়েকজন
সৈনিক এসে আমাকে লিফটে দোতলায় তুলে
ছিল। এক বিরাট লম্বা হলঘর দিয়ে আমি
এগোতে লাগলাম। মনে হয় যেন অন্তত
একশোটি দরজা আমি পার হয়েছিলাম।
প্রত্যেক দরজার পাশে দাঁড়ানো একজন রকী।
আমি দরজা পর হবার সঙ্গে সঙ্গে সে
টেলিফোন করে সামনের দরজার রকীকে
জানিয়ে দিচ্ছিল যে, আমায় যাচ্ছি। দরজার
নম্বর হ্রস্ব কমে আসছিল। ১২, ১১, ১০

এমনি করে। আমি ভাবছিলাম যে, হয়তো বা
১ নম্বর ঘরে স্ট্যালিন আছেন। যাই হোক
দুই নম্বর দরজার সামনের ঘরে আমাকে
অপেক্ষা করতে হল পাঁচ দাঁটি ঘণ্টা।

অপেক্ষার পর শ্রীমতী মাগারেটের ডাক
পড়ল স্ট্যালিনের ঘরে। বিরাট ঘর। আসবাব-
পত্র বলতে লম্বা টেবিল সবুজ ফেলেট ঢাকা।
পাশে একটি বড় শ্বেল। টেবিলের ওধারে
দাঁড়িয়ে সোভিয়েট ভাষাবিশারদ জোসেফ
স্ট্যালিন। পায়ে বুট, পরনে সাধারণ শাকী
পোষাক।

মাগারেট লিখছেন, আমি স্ট্যালিনের
এই গাম্ভীর্য ভাববার জন্য তার সঙ্গে
আলাপ করতে চাইলাম। দোভাষীর মারফৎ
জানলাম যে, তিফলিসে স্ট্যালিনের মায়ের
ছবি আমি তুলেছিলাম। এ কথা শুনে
দোভাষী বিস্ময়ে প্রায় লাফিয়ে উঠে বল-
লেন, ও'র নিজের মায়ের ছবি! ও'র
দাঁড়াকারের ম্যা! কিন্তু স্ট্যালিন একটি
কথাও বললেন না। আমি ও'কে বসতে
অনুরোধ করলাম। কিন্তু তিনি বসলেন না।
ঠিক সেই সময়ে একটি ঘটনা ঘটল। নিচু
হয়ে আমি স্ট্যালিনের মুখের একটি ছবি
তোলায় জন্য দৃশ্যকোণ খুঁজছিলাম, সেই
সময়ে আমার বুকপকেট থেকে ফ্রান্সবালব-
গুলো সব গাড়িয়ে পড়ে গেল কাপেরেটের
মেকের ওপর। দোভাষী এবং আমি তাজ-
তাজ সেগুলো কুড়োতে লাগলাম। এই দৃশ্য
দেখে স্ট্যালিন হেসে উঠলেন। তাঁর
মুখাকৃতির আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটে গেল। মনে
হল যেন তাঁর মুখে ফুটে উঠেছে অন্য এক
ব্যক্তির অমায়িক উৎফুল্ল।

ঠিক সেই মহাতেই মাগারেটের
ক্যামেরায় ধরা পড়ল হাস্যোদ্ভীত
স্ট্যালিনের মুখাকৃতি। সেই ছবি জাপা হল
লক্ষ লক্ষ কপি কাগজে পৃথিবীর নানা
দেশে। নাৎসী-প্রতিরোধের নায়ক জোসেফ
স্ট্যালিনের এই ছবি তুলে মাগারেট সৈনিক
পরম তৃপ্তি লাভ করেছিলেন।

এইভাবেই ছবি তোলা হয়, রিপোর্ট
লেখা হয়। জীবনের তরঙ্গভঙ্গের মতো
তা অনিশ্চিত কিন্তু সুন্দর। কখনো তা
উদ্ভীষ্ট, কখনো তা করুণ।

নবজন্মের সংবাদ যেমন লেখা হয়
সাংবাদিকের কলমে, নিম্ন মতের
কাহিনীও তেমন নির্লিপ্ততার লিপিবদ্ধ
করে যায় নিজস্ব সংবাদদাতা। আজকের
জীবনে সংবাদপত্র যেমন অপরিহার্য,
সাংবাদিকের বৈচিত্র্যসম্মানও তেমন সেই
অপরিহার্যতারই সঙ্গ। প্রতিদিনের মহা-
কাবীর উপকরণ সংগ্রহ করেন সাংবাদিক।
তার কোনোটা ইতিহাসে অবিস্মরণীয়,
কোনোটা বা তালিয়ে যায় প্রতিদিনের জলি-
মলিনতার অশ্বকারে। কোমল ও কঠোর,
ঘৃণা এবং ভালবাসা, কারুণ্য ও নিম্নম-
তার, আসক্তি ও নির্লিপ্ততার জীবনে যে
বিচিত্র দৃশ্যপট প্রতিদিন উন্মোচিত হয়
তার নিজস্ব সংবাদদাতা হলেন এ যুগের
সাংবাদিক, আদি সাংবাদিক দিব্যচন্দ্র
সত্ত্বের আধুনিক উত্তরাধিকারী। সে কল-
কালের হলেও চিরকালের, আজকের এবং
আগামীকালের।

আশ্চর্য পরিচয় ও নরনাতিরাস
বর্ণনামাফে সজ্জিত একটি ড্রইং-
রূমে বসে প্রীমতী আইরীশ
বোনাজি একটি উল্লের জাম্পার
বুনছিলেন। তার নিপুণ হাত দুটি
প্রায় যান্ত্রিক দ্রুততার বনে চল-
ছিল। কিন্তু তার মন উৎকীর্ণ
হয়েছিল বাইরের দরজার দিকে।
সন্ধ্যা প্রায় সাতটা বাজতে চললো,
তবু দেখা নেই। এরকম তো বড়-
একটা হয় না! তবে কি আজ কাজ
থেকে বেরিয়েই সেই পাড়াজনালানো
মেয়েটার পেছনে ছুটেছে?

হরানো বোতাম



বিশ্বনাথ
মুখোপাধ্যায়

এমন সময় বাইরের দরজার চাবি
খোঁজার আওয়াজ হল। বোনাজি ফেলে
আইরীশ তাড়াতাড়ি উঠে এসেন। কিন্তু এ
কী ডেভের চেহারাটা এত উদ্ভাসিত কেন?
পরমহুত্রেই তার চোখে পড়ল তার কোঠের
একটি বোতাম নেই। ডেভের পোষাকে-
আশাকে, চেহায়ে একটুকু চ্যুতি, বা সামান্য-
তম অস্বাভাবিকতা আজ চ'ল্লিশ বছরের
মধ্যে একদিনও তার চোখ এড়ায় নি।
আজইবা তার ব্যতিক্রম হবে কেন? আর
শব্দ কি ডেভ সম্পর্কেই তার সেই সতর্কতা?
—এই বাগানঘেরা চমৎকার কটেজটির প্রতিটি
কোণ, প্রতিটি তাক, আনাচ-কন্যাতে ওপর
তার নজর। সারাটা দিন ক্রান্তিহীন পরিশ্রমে
সব কিছ, সজ্জিয়ে-পুজিয়ে রাখেন তিনি।
অজ্ঞ অবশ্যই তিনি তার দীর্ঘ চ'ল্লিশ
বছরের সাধনার সিঁথিতে গর্ববোধ করত

পারেন। ডেভ প্রায় অনায়াসেই তার বাবুর
মত কৃতী ইঞ্জিনীরার হয়ে একটি দেশ-
বিখ্যাত কারখানার বয়েসে কনিষ্ঠতম
ফোরম্যান।

তবু ইকানীং এ বেহারা মেয়েটার সঙ্গে
পরিচয় হবার পর থেকে ডেভের হালচাল
দেখে তিনি চিন্তিত।

আজো নিশ্চয় তার সঙ্গে একটা কিছ
ঘটেছে। নরতো তার ছেলের সব'না হাসি-
হাসি মুখটা আজ এমন ভার হয়ে আছে
কেন? চোখেই বা এমন বিবর্তিত ভ্রুকুটি
কেন?—এ সব চিন্তার মধ্যেও ঠাট্টা মনে-

মনে ঠিক করে ফেললেন যে, কাল কাজে
বেরুনোর আগেই ওর বোতামটা বানিয়ে
দিতে হবে।

তারপর ঈষৎ অনুযোগের কণ্ঠে বললেন,
‘আজ তোমার বড় দেরী হয়েছে ডেভ!...
তবে তোমার খাবার জামি গরম করেই
রেখেছি।’...কণ্ঠস্বর অপ্রাণ গড় করে ছেলের
মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি
জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আজো তুমি কি রুদেতের
সঙ্গে বেরিয়েছিলে?’

—অন্য দিকে তাকিয়ে ডেভ সে প্রশ্নের
উত্তর এড়িয়ে বলল, ‘হা, আজ জামি আর
কিছ খাবো না। আমার ক্ষিদে নেই।’

মহুতের জন্যে আইরীশ বোতামের
কথা ভুলে গেলেন। ভুলে গেলেন ছেলে
সাবালক হয়েছে। একান্ত ব্যস্তগত
ব্যাপারেও নিঃশব্দ নেবার অধিকার তারই।
সন্মুখে তার কাঁধের ওপর হাত রেখে
অবেগঅস্তিত্ব কন্ঠে বললেন, ‘ডেভ, বাবা
আমার! ওকে ভুলে যাও। আজ কদিন ধরে
ও তোমাকে ব'ড়িশতে গাথা মাছের মত

বেলায়! এবার ওর সঙ্গে সব সম্পর্ক ঘটিয়ে দাও।...বিয়ে করবার মত আর কী কোন মেয়ে নেই?’

এতকণে ডেভ তার মায়ের দিকে তাকাল। কিন্তু সে দুটি তীক্ষ্ণ, চোখ দুটো রম্য। পরমুহর্তে সে প্রায় চীৎকার করে উঠলো, ‘না তুমি চুপ করো। দোহাই তোমার, আমাকে লালিত্যে থাকতে দাও।’ তারপর নঃ হাতে মুখ ঢেকে সে প্রায় কান্না দিয়ে উঠলো, ‘হা ভাগ্য! কেন যে আমি জন্মেছিলাম।’ শেষের কথাটিতে ওইরীনের বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা দপ করে উঠলো। একটা বহুদিনের বিস্মৃত প্রাণ শব্দ। তার মনের মধ্যে বিস্মৃতিপর্শের মত চমক দিয়ে গেল। কিন্তু তিনি তা উৎকণ্ঠা সামলে নিলেন।

ঠিক তার পরের মুহূর্তে তাঁর সামনে ভেসে উঠলো নীলনরনা স্মরণীয় চুল, কণকটি ও পানপুষ্পমালা এক তরুণী মূর্তি। তার নীল নয়নে ঝলক ঝলক, শিখরশব্দের হাসিতে ছাটের তীক্ষ্ণতা—হ্যাঁ মনেই নেই, পুরুষকে তাকিয়ে ও ছাটের তেলবার মত আকর্ষণ তাম্র আছে। কিন্তু তার স্বভাব? দপ করে একটা, দহকা জোখ মস্তকটা বলসে দিলে গেল।

আজ ক’ মাস হলো জন্ম থেকে মেয়েটা এখানে এসেছে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত কত ছেলেকেই না সে চর্যাক পাক খাওয়াগেলো। ডেভ হচ্ছে তার শেষের বিকের শিকার। ওর ও ছাড়াও না করাও দেবে না। কিন্তু ছোক তার ছেসে সাবালক, তবু তিনি চুপ করে থাকবেন, না। তাই ডেভের পিঠে হাত রেখে এবার তিনি খুব লম্বা করে বললেন, ‘ও শূন্য তোমাকে একাই খেলিয়ে বেড়াবে না। ও এমনিভাবে আরো অনেকের সর্বনাশ করছে।’

এবার ডেভ চীৎকার করলো না। ফুপালো না। শূন্য ধীরভাবে মায়ের হাতটা কাঁধ থেকে সরিয়ে একটা অশ্রুত বাগের হাসি হেসে কাঁধ ঝাড়’ নিয়ে ঘরে দাঁড়ালো। পরমুহর্তে সম্মুখে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। আইরীনি দুই পরে দরজা অর্ধাধি গিয়ে আরেকবার কাতর কণ্ঠে বললেন, ‘ডেভ, ডিনারটা খেয়ে যাও। ফিরে এসো।...ডেভ একবার পিছন ফিরে তাকালোও না।

দরজাটা বন্ধ করে আইরীনি একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। তারপর রান্নাঘরে গিয়ে খাবারটা তুলে রাখলেন। দিনের শেষের দুটি-একটি করণীর শেষ করে ড্রইংরুমে এসে বসলেন। উলের বোনাটা ফের তুলে নিলেন। এমারও তাঁর হাত দুটি বিন্দুক নৈশুণ্য ও গতিতে হুলে চললো। কিন্তু তাঁর মন চলে গেল অন্তর। এবার সময়ের উজ্জ্বল প্রায় পশ্চিম-চরিত্র বহন পেরিয়ে। ...সাদা-কালো-বাদামী ছবিগুলি জড়তর বাঁহাগতের ভীড়ে বুটনের ওনসম্মতি তখনো দস্তা স্তরিতর আকৃতি ধারণ করে নি, সেই কালে শ্রীরঞ্জিৎ বন্দোপাধ্যায় ‘শব-পুর্বে ইঞ্জিনারিং পাশ করে আরো বড়

ইঞ্জিনারিং হবার জন্য প্লাসগো আসেন। শেষ পর্যন্ত খুব বড় ইঞ্জিনারিং তিনি হন। কিন্তু দেশে আর তাঁর ফেরা হয়ে ওঠে নি। প্লাসগোতেই ছাটাবন্দ্যার তাঁর সঙ্গে আইরীনের দেখা হয়। বয়সে রাজিৎ অনেক বড় ছিলেন। তবু তাঁদের মধ্যে ভালবাসা হল প্রগাঢ় এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরা বিয়ে করলেন।

রাজিৎের প্রায় সব কিছু তাঁর ভাল লাগতো। কেবল দুটি বিষয় ছাড়া। রাজিৎ সর্বাঙ্গিক ও মাংসাত্মিক প্রচেষ্টায় জাতিগত পরিচয় ও প্রকৃতিকে সম্পূর্ণভাবে পাশে দেবার জন্যে উঠে-পড়ে লাগলেন। নামটা পর্যন্ত বদলে করলেন রণি বোনার্জি। দেশের সঙ্গে সম্মত সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেন। আর তিনি কোন সন্তান চাইতেন না। দুটো জিনিসই আইরীনের অশ্রুত মনে হতো। কিন্তু এ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তিনি করেন নি। তবু এক বিহ্বল মুহূর্তের অসাবধানতার তাঁদের জীবনে সন্তানের আবির্ভাব ঘটলো। আইরীনের জীবনে আবিষ্কারণীয় আনন্দের দিন।

কিন্তু রাজিৎ সেই থেকে কেমন যেন দুঃখে পড়লেন, বদলে গেলেন। এতদিন পর্যন্ত যে জন্মের সঙ্গে সহন্য হবার চেষ্টায় তিনি মোহিতছিলেন তা যেন হঠাৎ ছুটে গেল। আকস্মিক এএ মানসিক জ্বালিততে তিনি যেন এলিয়ে পড়লেন। আর সেই বেদনাদায়ক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে রাজিৎের এতদিনকার আপাত দুর্বোধ্য আচরণের খানিকটা হাঁস পাওয়ার গেল। ধীরকাল তিনি যে মনোমোহনের মধ্যে বাস করেছিলেন তার অনিবার্য প্রতিফলন তার মধ্যে এক বিচিত্র গুরুত্বপূর্ণ দেখা দিল।

যাবার তার মনে হতে লাগলো তিনি যে স্বদেশকে ‘স্বদেশ এবং বিদেশকে স্বদেশ করেছেন তা হচ্ছে সেক্ষেত্র। কিন্তু তাঁর সন্তানের বেলা? তাকে কি তার নিজের আন্তরিক বাইরে সম্পূর্ণভাবে অন্যের কৃত-কর্মের জন্যে আজীবন খেসারৎ দিতে হবে না?

—‘কেন দিতে হবে?’ আইরীনি প্রশ্ন করতেন। পৃথিবীতে সেই কি হবে একমাত্র বর্ণসংস্কার? সে তো এদেশের জল-হাওয়ার, শিক্ষার-দীক্ষার এদেশের সন্তানদের মতই বড় হয়ে উঠবে।...তাহাড়া প্রয়োজন হলে আইরীনি তো ভারতবর্ষে ফিরে যেতে সব সময়ই রাজি। সে প্রস্তাবে রাজিৎ আরো গম্ব হয়ে গেলেন।—ভারতবর্ষের বর্ণ-সংস্কারের জীবন তো মমস্তুদ প্রহসন।

সন্তানের জন্ম হলে রাজিৎের আপত্তি না হোক তর্পনছা সঙ্কেও আইরীনি তার ভারতীয় নামই রাখলেন দেবকুমার। ডেভ সেই নামেরই সংকীর্ণত অপভ্রংশ। শূন্য পরিবর্তিত নাহেই নয় বর্ণে আচরণে সব কিছুতেই ডেভ তার জন্মভূমির তার পট-জন সন্তানের মতই বড় হয়ে উঠতে লাগল। কেউ বলে না দিলে কারও বোধগম্যই উপায় ছিলো না যে তার ধর্মনীতি ভারতীয়

রক্তের ধারা প্রবাহিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত রাজিৎ তাঁর সন্তানের জীবনের পরিণতি দেখে যেতে পারলেন না। ডেভের কৈশোরেই একটি মোটরদুর্ঘটনার তিনি মারা গেলেন।

সেই দুর্ঘটনার দিনের মর্মান্তিক স্মৃতি-মনে পড়তেই আইরীনি সচেতন হয়ে উঠলেন। হাতের বোনাটা কোচের ওপর নামিয়ে রাখলেন। তারপর আনমনে স্মরণোক্তি করলেন, ‘না, না ডেভের জন্মের মধ্যে কোন অসঙ্গতি নেই।’ সে প্রেমের অবদান, দুটি মর-নারীর অন্তরের প্রীতির মিলনেই তার জন্ম। তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

কয়েক ঘণ্টা পরে সেই আইরীনের চোখে একটু তন্দ্রা লেগেছে, জন্ম সজোরে বাইরের দরজাটা খোলার শব্দ এলো। ডিনার সেরে ডেভ প্রায়ই বাইরে যায়। তার ফিরতেও দেয়ী হয়। কিন্তু সে ফেরে আঁত সন্তপণে চাবি খুলে। এরনি বোঝাড়া শব্দ করে কখনো নর। তাঁর সহজাত-সচেতন প্রবৃত্তি যেন বলে উঠলো নিশ্চয় কোন গুরুতর ঘটনা ঘটেছে। তাড়াতাড়ি তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন। রাতিবাসের ওপর একটা ক্রসিং গাউন জড়িয়ে নিলেন। কিন্তু ঘর ছেড়ে বেরবার আগেই একটা পতনের শব্দ পেলেন। ডেভ দরজা খুলে ঢুকেই আহাড় খেয়ে পড়েছে।

কিপ্র পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে আইরীনি তার মাথার কাছে হাটু গেড়ে বসে তার মাথাটা উচু করে তুলে ধরবার চেষ্টা করলেন। সে সবলে তাঁকে জড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলো। তিনি এবার তাঁর কাঁধের নীচে দুহাত দিয়ে তাকে তুলে ধরবার চেষ্টা করে দুটু কন্ঠে বললেন, ‘এ বড় বাড়াবাড়ি করছো! এখনি তোমার ঘরে গিয়ে শূন্যে পড়ো।’

ডেভ এবার তার ঢুলুঢুলু লাগ চোখ দুটি দিয়ে তার মার মুখটা দেখবার চেষ্টা করলো। মদ খেয়ে সে বেহেত মাতাল। তারপর শরীরের সমস্ত শক্তি সংহত করে গটকা মেয়ে নিজেকে জড়িয়ে নিয়ে চীৎকার করে উঠলো, ‘দ্র হও। আমাকে ছুঁয়ো না। তুমি—।’

আইরীনি মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। জীবনে আজ পর্যন্ত শেষের ঐ অঙ্গুলী কথাটা কেউ কখনো তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবহার করেনি। শেষে কিনা তাঁর নিজের ছেলে.....?

‘না, না’ নিজেকে সান্থনা দিয়ে বোঝালেন ও নিশ্চয় আমাকে রুদেং বলে ডুল করছে। এই কুৎসিত পরিস্থিতিতেও একটা কথা জেবে মনটা শূন্য হয়ে উঠলো যে এতদিনে তা হলে ওর ঐ রাগাণী রুদেং সম্পর্কে মোহ ভেঙেছে। তাকে চিনেছে।

এবার কান্না পড়ে স্নেহ ধরবার কন্ঠে বললেন, ‘ডেভ, এ আমি। তোমার মা।’ যেন বিশ বছর আগেকার দুঃস্বপ্ন হোটি



আরও সুন্দর আরও উজ্জ্বল ক'রে তুলুন আপনার চুল



অক্ষমাত্র লক্ষ্মীবিলাস নিয়মিত
ব্যবহারেই তা সম্ভব।

সত্যসাক্ষরতা

লকনের হাত থেকে চাঁচমার জন্য
ক্রিতিমার সময় ট্রেডমার্ক স্মারামচন্দ্র
মূর্তি, পিলফার প্রফ ক্যাপের উপর
RCM মনোছাত্র ও প্রস্তুতকারক
এম.এল.বসু এণ্ড কোং দেখিয়া
লইবেন।



লক্ষ্মীবিলাস

কেশ তৈল

এম.এল.বসু এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা-৩

হেঁচকটাকে হৃদয়ে বাবার নির্দেশ নিয়ে বলে উঠলেন, "বাও হৃদয়ে বাও।"

ডেড আবার কৃদসিতভাবে খিঁচিয়ে উঠলো, "ফের আমার গায়ে হাত দিলে তোমাকে খুন করবো! তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।"

আইরীন কোত্তে ও নিদারুণ অপমানের সম্মুখীন হয়ে সরে এগেলেন। ডেড টলপেট উল্টে উঠে দাঁড়ালো এবং স্থগিত পায়ে টাল খেতে খেতে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। —সম্পর্কে উপস্থাপ্ত হয়ে পড়া আইরীনের স্বভাব নয়। তবু 'সেই মূহুর্তে' তিনি একান্ত বিজ্ঞান ও অসহায় বোধ করতে লাগলেন। এবার কোন প্রবোধ তিনি নিজেকে দেননি? তবু সে করেক মূহুর্তেই জনো। তিনি খালি পাতেই ছিলেন এবং সেই অবস্থাতেই পা টিপে টিপে ডেডের ঘর পর্যন্ত গেলেন। দেখলেন, সে তার বোতাম ছেঁড়া কোটটা কোনরকমে হেঁচক টানে বলে মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর বিজ্ঞানার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো। দরজাটা খোলাই পড়ে গিয়েছিল।

আইরীন নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে শূন্যে পড়লেন। এমন দুঃসহ বিনীত স্মৃতি স্মরণে মাথা ঘনান পর আর কখনো তাঁকে কচাটে হয়নি। —এক কঠিন সাধনার, এত প্রতিজ্ঞাতার মধ্যে এত আশা নিয়ে তিনি হেঁচকে খানুব করে তুললেন সবই কি কার্য হলো?

তারপর আচম্বিতে এক সময় মনের কোন অশঙ্কায় দু'হা থেকে সতর্ক সাবধানে এড়িয়ে যাওয়া, দাবিয়ে বেওয়া একটি লক্ষ্য। তাঁর চক্ষুকে আকর্ষণ করে দিতে লাগলো, তবে কি হাজিরের সেই সন্ন্যাসিক উদ্বেগ সঁজা হতে চলছে!

.....না। কখনোই নয়। ডেডের গিড়-গর্দ বিন্দুল ও গভীর। এত সহজে শেষ হয়ে বাবার নয়। তবুসে এ রূপগণী কখনো। আত তাকে আশা দিচ্ছে, কল তাকে বিশ্বীভাবে ফিরিয়ে দিচ্ছে। হাজির হলো ও ডার তরুণ মনে, এই প্রথম আখাড। ততো সে তো বিচলিত হলেই।...সেই মূহুর্তে আবার ভেতর থেকে তাঁর কঠিন, লীটল শিহরণের মত এক তীক্ষ্ণ প্রশ্ন তাঁর হৃদয়কে বিনীত করে গেল। সেই প্রত্যয়ানের প্রতিজ্ঞা কি এতখানি হওয়া সম্ভব যে সে তার হার সঙ্গে ঐ মর্যাদার গুণন রাক্ষাস করবে? ভালবাসার আনুপাতিক হারট; কি এতখানিই বদল গেছে?

পরদিন আইরীন উঠলেন। বাস পরি-বর্তন করলেন তৈরী হলেন। নীচে গিয়ে প্রভাতের প্রথম কাজ দরজার হাট্টে থেকে ঘরের বোতল আনতে গেলেন। পহলর প্রতিবর্ণিনী শ্রীমতী হাতিও দৃশ্যের বোতল সংগ্রহ করতে এসেছিলেন। আইরীনকে দেখে গল উচ্চৈশ্বর্যে "বাও বাও বাও উঠলেন, 'খবর শুনেছো তো?...সুদেং বিজ্ঞানকে

কে বা করা গলা টিপে মেঝে ফেলেছে?... অনেক রাত্রি পর্যন্ত বাড়ী আসছে না দেখে তার বাড়ীর লোক পুলিসকে খবর দেয়। পুলিস শেষ পর্যন্ত তার লগাট পার্কের ওপরে বাচ' গাছটার নীচে খুঁজে পেয়েছে।' শ্রীমতী হাতি ডাকসাইটে প্রগলভ। তিনি আরো আরো অনেকসব তাকলাগানো তথ্য পরিবেশন করে যেতে লাগলেন। কিন্তু আইরীনের কানে ওর কোনটাই গেল না। তিনি দরজার হাত রেখে টাল সামলাতে লাগলেন। তাঁর মাথা ঘুরছে। চোখের সামনে সব আলো যেন নিভে যেতে লাগলো। আর সেই হঠাৎ ঘনিমে আসা অশঙ্কায়ের মধ্যে রাস্তার দু'ধারের বাড়ী, তাদের চড়ায় চড়ায় টেলিভিশন এরিয়াল, সামনের বাগান-বেড়া, পথের দু'ধারের তরুণীধকা, পার্কের গাড়ির সারি সব যেন ঘন কুয়াশায় অলসুত হয়ে যেতে লাগলো। আর সেই ঘনায়মান অশঙ্কায়ের ভেসে উঠলো সবজ-সাদার মেশানো শিংয়ের তৈরী একটি বোতাম। স্পোর্টস জাম্বোটে বকে কালো সূতার সেলাই ছিঁড়ে ছুটকে পড়া গোল নিটোল একটি বোতাম সহসা তাঁর মানসকে ঢালের মত প্রকান্ড হয়ে উঠলো।

সম্ভবত আইরীনের এই আচম্বিত পরি-বর্তন শ্রীমতী হাতির চোখে পড়ছিল। তাই তিনি চুপ করে গেলেন। আর আইরীন শূন্যতে পেলেন যেন অতিদূর থেকে ভেসে আসা তাঁর নিজেরই কঠ শ্রীমতী হাতি'কে বলছে, "আমি খুব অস্বাচ্ছন্দ্য।.....ওভারে চললো....." তারপর হঠাৎ সচেতন কণ্ঠে, "আমি বাই উনুনে ব্রেকফাস্টের বেকন চাপিয়ে এসেছি।"

কোন রকমে বাড়ীতে ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করে ভাঙে হেলান দিয়ে নিজেকে সামলাতে লাগলেন। ডেড! ডেড ঐ কাজ করতে পারে।

এবার আর কোন সাধনা, মনকে প্রবোধ দেবার মত কোন কিছুই তিনি খুঁজে পেলেন না। মানুস খুন করার কোন কৌতুং নেই, কোন যুক্তি নেই। কোন প্রয়োজনার অজহাতই ঐ বর্ণ্যতম অপরাধের সাফাই হতে পারে না।

তিনি হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। দেখলেন সকালে জানালার ভারী পর্দাগুলো খুলে দিতে ভুলে গেছেন। এই ফুলের জন্যে স্নানিবেশ করলেন। এখন আর তাঁর কোন বিশ্বাস নেই। কী করণীয় তা এখন তিনি নিশ্চিতভাবে ঠিক করে ফেলেছেন। প্রথমে গিয়ে বসবার ঘরের চিমনির আগুনটা জ্বালিয়ে দিলেন। তারপর লজ, কিন্তু দৃঢ় পদে ডেডের ঘর গেলেন। সে তখনো অঘোরে ঘুমাচ্ছে। গাউজার, সাট টাই কিছুই বন্দায়ানি, কাল রাত থেকে একবারও ওঠেনি। আইরীন স্থির হয়ে করেক মূহুর্ত তাঁর ঘুমন্ত ছেলের দিকে তাকালেন। রঞ্জিতের মুখেরই যেন মূর্ত প্রতিবিম্ব। শূন্য ইতিপূর্বা তরুণীদের চিত্তে কোলা জালনো মধুর মত তার রঙ। যেন সবে

দাঁকল ফ্রান্সের সমুদ্রোপকূলে ছুটি কাটিয়ে এসেছে আর চুলে ঘরের চুলের গাঢ় চাঁপা রঙের ছোয়া। দীর্ঘ-সুঠাম স্বপ্ন। ঘুমিয়ে থাকলে মুখে সেই শৈশবের অপাপবিন্দু সারল্য এখনো যেন মনের গভীর থেকে ভেসে উঠে স্থির হয়ে থাকে।

কিন্তু বৈশিষ্ট্য তাকিয়ে থাকার মত সময় আইরীনের হাতে নেই। তিনি কোটটি ভুলে নিলেন। তারপর ঘরের বাইরে গিয়ে আশে আশে ডেডের ঘরের দরজাটি বন্ধ করে দিলেন। নিজের ঘর গেলেন। দেওয়াল থেকে সেলাইয়ের বাক্সটা বের করলেন। ডেড জন্মবার আগে একবার ফ্লোরেনসে বেড়াতে গিয়ে পছন্দ করে কেনা।

কিন্তু মূর্খাকিল হচ্ছে ঐ সবজ-সাদার মেশানো শিংয়ের তৈরী বোতাম আর নেই। সুতরাং বসবার ঘরে ফিরে গিয়ে প্রথমই কিন্তু হাতে বাকি দুটি বোতাম কেটে ফেললেন। তারপর তেজনিভাবেই কাটলেন কোটের হাতার ছোট ছোট চারটি বোতাম। ছটি বোতাম ডান হাতের তালুতে রেখে নিম্পলক দৃষ্টিতে কয়েক মূহুর্ত তাকিয়ে রইলেন। তারপরই সেগুলোকে ছুঁড়ে চিমনির আগুনের মধ্যে ফেলে দিলেন। চূরীর চকিত আগুনটা একটুখানি ফুঁসে উঠলো। বোতাম পোড়ার একটা বিজাতীয় গন্ধ ঘরের মধ্যে গুলিয়ে উঠে মিলিয়ে গেল।

আগুন থেকে চোখ ফিরায়ে আইরীন সেলাইয়ের বাক্স থেকে নানানধরনের অনেক-গুলি বোতাম টীকলের ওপর ঢাললেন। সেই নিস্ততায় ঘরে সেগুলির ছড়িয়ে পড়ার মৃদু শব্দও বিদূলের খিলাখল হাসির মত বেজে উঠলো।

সন্ধানী চোখে তিনি সাতটি বোতাম বেছে নিলেন। তিনটি বড়, চারটি ছোট চামড়ার বোতাম। অনেকটা কোটেরই রঙের, শূন্য এক পোচ ফিলক। বোতাম-গুলিকে মধ্যযথ স্থানে নিখুঁতভাবে বসাতে হবে। কেউ যেন খুঁটিয়ে দেখেও বুঝতে না পারে যে সেগুলো নতুন করে লাগানো। সেলাই হয়ে গেলেই তারওপর আঙুলের উগায় পাতলা তেল কালার জালগা করে ছোঁরা দিতে হবে, যেন এতটুকু খেঁকড় না যায়।

বোতামগুলি বসাতে বসাতে আইরীনের মনে হতে লাগলো যে, তিনি খুনের সাক্ষ্য দৃকোবার চেষ্টা করছেন। অপরাধীকে সনাক্ত করার নর ছিঁড়ে দিচ্ছেন। তা আইন-বিরোধী সমাজবিরোধী।.....করেকবার জোর করে মন থেকে সেই সাংঘাতিক চিন্তাটার মূলেপাড়িনের চেষ্টা করলেন। ফল হোল না। মনটাই শূন্য আরো কত-বিকৃত হয়ে গেল।

তবু বোতাম বসানো হোল। তার সেলাইয়ের সুতার নতুনত্বক মলিন করে দেওয়া হলো। কোটটি হাতে করে তিনি ডেডের ঘর গেলেন। আগের মতই নিম্পলক পদক্ষেপ গেলেন। কোটটিকে ওয়ালোবের



ফটো : প্রশান্ত ভড়

একটি হ্যাংগারে ঝুলিয়ে রাখলেন। আবার আগেরই মত ডেভের বিছানার কাছে এসে দাঁড়ালেন। সে তখনো ঘুমোচ্ছে। আইরীণ তার দিকে তাকিয়ে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপরেই হঠাৎ সরীসৃপের আচমকা স্পর্শের মত বিদ্যুৎ একটা বিরূপ অনুভূতিতে তার মনটা অসুস্থ হয়ে উঠলো। এমনি জন্তুর মত বিবেক ও অনুভূতিহীন তার ছেলে? কাল রাতে একটা খুন করে মাতাল হয়ে বাড়ী ফিরে মাকে অপমান করে আজ বেলা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে। ঘুমোতে পারছে? আর নরঘাতক ঐ ছেলেরই অপরাধ ঢাকবার জন্যে তিনি আইন ও সমাজের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র করছেন।

হঠাৎ তাঁর হৃদয়ে ক্রোধ দগ্ন করে জ্বলতে উঠলো। কিন্তু পরক্ষণেই গভীর বিষাদের দমকা জ্বলো হাওয়ার ক্রোধের আগুন নিভে গেল। একটা উন্মত্ত কান্নার ঢেউয়ে তাঁর শরীরটা দুলে গেল। দু'হাতে মুখ ঢাকলেন তিনি। আইন অনুযায়ী তাঁর ছেলের অপরাধ মৃত্যুদণ্ডযোগ্য। একটা সর্বাঙ্গিক ভয়ে তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন। আর পারলেন না। ঘুমন্ত ডেভের কাঁধ ধরে আস্তে আস্তে ঝাঁকুনি দিলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে বিবর বাড়ীটির স্তম্ভতা বিদীর্ণ করে নীচে কলিংবেল ফুকরে উঠলো। আইরীনের বকের স্পন্দন সেই শব্দে ঘেন রুদ্ধ হয়ে গেল। মুখটা ছাইয়ের মত ফাকাশে হয়ে গেল। কিন্তু এতো ভেঙে পড়বার স্নায়ু শিথিল হবার সময় নয়। তিনি ডেভকে সঙ্গে করে একটা ধাক্কা দিয়ে তুললেন। কানে কানে প্রায় রুদ্ধশ্বাসে ফিসফিস করে বললেন, “ডেভ ওমা তোমার জন্যেই এসেছে!.....

কিন্তু তুমি ভেঙে পড়ো না। কিছুতেই কিছু কবুল করে না।”

সঙ্গে সঙ্গেই এই সাংঘাতিক ঘটনায় নিজের ভূমিকাটা স্মরণ করে বললেন, “আমি তোমার কোটের বোতামগুলো বদলে দিয়েছি।”

ডেভ ডাব ডাব করে তার মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। মনে হলো না সে তার মায়ের কথা ধরতে পেরেছে। ওদিকে এবার শব্দ ঘণ্টা নয়। অগন্তুকে দরজার ধাক্কা দিচ্ছে। তিনি ভাড়াভাড়ী নীচে নেমে গেলেন। দেরী করার অর্থই হচ্ছে সন্দেহকে উল্লেখ দেওয়া।

বাইরে দুজন লোক একজন উর্দিপরা পুলিশ কর্মচারী। অপরজন সাধারণ পোষাকে। রাস্তার ওপারে আইরীণ দেখতে পেলেন প্রতিবেশীরা জট পার্কিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যখানে শ্রীমতী হার্ডি।

অগন্তুক দুজনের মধ্যে সাধারণ পোষাক-পরিহিত লোকটি জিজ্ঞাসা করলেন, “শ্রীমতী বোনার্জি?—আমরা পুলিশের লোক।” উর্দি-পরিহিত ব্যক্তিটি তার অনুসরণ করে যোগ দিল, “আমরা ডেভ বোনার্জির সঙ্গে কথা বলতে চাই। তিনি কি বাড়ী আছেন?”

কর্মচারী দুজনকে ঘরে ঢুকিয়ে তিনি দরজাটা বন্ধ করে প্রতিবেশীদের কৌতূহলী দৃষ্টিকে আড়াল করে দিলেন। তারপর যতটা সম্ভব স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, “হ্যাঁ, সে বাড়ীতেই আছে। এখনো বিছানা ছেড়ে ওঠেনি।” তারপর তাদের ডেভের ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরে ঢুকেই ওয়ালড্রবের দিকে তাব চোখ গেল। বকের ভেতরটা হাতুড়ি পেটানোর মত দপ-দপ করতে লাগলো।... ওমা কি ছেঁড়া সেই বোতামটা খুঁজে পেয়েছে?

উর্দি পরিহিত পুলিশটা ততক্ষণে ডেভকে ঝাঁকুনি ধরে জাগিয়ে তুলেছে। সে উঠে বসলো, প্রথমে তদ্রাঙ্ক চোখ দুটো বার কয়েক প্যাট প্যাট করলো। তারপর দৃষ্টি সংহত করে তাক্সব হয়ে জিজ্ঞাসা করলো। “আরে এ কি? ব্যাপার কি?”

আইরীণ চোখে অর্থপূর্ণ কটাক্ষ নিয়ে এগিয়ে এলেন। কিন্তু পুলিশ কর্মচারীটি তাঁকে আড়াল করে দাঁড়ালেন। ডেভকে উদ্দেশ্য করে বললেন, “কাল রাতে আপনার গতিবিধি সম্পর্কে কয়েকটা প্রশ্ন আমি করতে চাই।”

আইরীণ দেখলেন ডেভের চোখদুটো তীব্র হয়ে উঠলো। কপালে কুণ্ডল দেখা দিল। তার স্মৃতিশক্তি ফিরে আসছে। সে তার মায়ের দিকে তাকিয়ে তিক্তভাবে বললো, “কাল রাতে?...মা এসবের মানে কি?”

“ব্যাপার হচ্ছে...এই ভদ্রলোক দুজন জানতে চান...” আইরীণ বাধা-বাধা ভাঙা কণ্ঠে একটা উত্তর দিতে চেষ্টা করলেন।

পুলিশ কর্মচারীটি আবার ফলে উঠলেন, “আপনি উত্তর দিতে বাধ্য নন। তবে এখন যা কিছু বলবেন তাই সাক্ষ্য-প্রমাণের জন্যে পরে ব্যবহৃত হবে।”

ডেভ হতভম্বের মত তাকিয়ে রইলো। আর তার সেই হতভম্ব মুখের দিকে চেয়ে আইরীনের মন উৎকর্ষ ও আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো। তাহলে...তাহলে ও কিছুই জানে না। ও নির্দোষ! নির্দোষ! নিশ্চয় নির্দোষ! আর ঘাই হোক ডেভ অভিমন্যু করতে জানে না। ওর মূখ চিরদিনই মনের মুকুর! কিন্তু তবু আইরীণ এতটুকু

চণ্ডীলা দেখলেন না। আশ্রয় পেতেই সমর্থ
হয়ে গেলেন।

এবার পুন্নিম কন্ঠচাণীটি দৃঢ়ভাবে
বললেন, “একটু ধুনে হুয়েছে। এবং আমা-
দের মনে করবার কারণ আছে যে, আপনি
সে বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করতে
পারেন, অথবা প্রয়োজনীয় তথ্য আমাদের
জানতে পারেন... আপনিই তো কাল
অকস্মিক থেকে বেরিয়ে ক্রমে বিচারকে
নিরেখে আসেন?”

ডেভের চোখ দুটি আড়ালে বিষমারিত
হয়ে উঠলো। দৃ. হাতে মুখ ঢেকে সে
ফাঁপিয়ে উঠলো, “হা ভগবান! শেষ পর্যন্ত
সে ধূম হয়ে গেছে!”—আইরীনি আবার
মুখে মুখে অনুভব করলেন যে ক্রমশঃ সে
কতখানি ভালোবাসতো।

ডেভ আগের মতই স্তম্ভিত হয়ে বসে
রইলো। পুন্নিম কন্ঠচাণীটি মেয়েটিকে গলা
টিতে মাজার ঘটনাটি সম্পর্কে এবার জানা
তথ্যগুলি বলে দিলেন। তারপর স্বস্তি কণ্ঠে
জিজ্ঞাসা করলেন, “কাল সন্ধ্যার পর থেকে
আপনি কোথায় ছিলেন, কি করছিলেন তা
আমাদের বলবেন কি?”

এককণ্ঠে মৃদু গলায় স্মৃতির সূতো বুনেন
বুনে ডেভ উত্তর দিল, “হ্যাঁ, একথা ঠিকই
যে কাল কাল থেকে বেরিয়েই তার সঙ্গে
আমি দেখা করতে বাই। কারণ তুমি ধূনে
পাই যে, পরের সন্ধ্যাহে সে বাগদত্তা হবে।
তাই অকস্মিক থেকে কোন করে ডাকে আমি
জিজ্ঞাসা করি কথটা সত্যি কিনা... সে
ভেবেছিলো খবরটা আমি ধূম সহজভাবেই
নয়, বরং জীবনের একটি সুখবরের মত
খবরটা সংগেই নেবে। তাই উত্তর দিয়েছিল,
“তুমি ঠিকই শুনিয়েছো।” আমি তখন তার
সঙ্গে বিকেলে দেখা করতে চাই। সে রাজি
বলেই কোনটা নামিয়ে রাখি।

“বিকলে দেখা হতেই সে উৎফুল্ল হয়ে
জানিয়েছিল যে, পরের রবিবার সে তার
লন্ডন শুল অব ইকনমিক্সের সহপাঠী
টিনিদানের এরিক উইলিয়ামসের সঙ্গে
বাগদত্তা হবে...”

“বাগদত্তা হবে?” আইরীনি সর্বাঙ্গ দিয়ে
সব্বাৎ মগ্ন হয়ে উঠলেন। তারপর তাঁক
কণ্ঠে বলেন, “তু. সত্যিও সে তোমাকে এতদিন
যে লয়ে বেড়াচ্ছিলো?”

আইরীনির নিকট একটি বেদনাক্রান্ত
দৃষ্টিভঙ্গি করে ডেভ উত্তর দিল, “সে
সেটাই খোঁজিয়ে বেড়াচ্ছিল! যে রাতিতে
গ্রীষ্মকাল নাটকটি রূপেত্তের সঙ্গে আমার
প্রথম পরিচয় সেই রাতে সেখানে এগিয়ে
ছিলো। ক্রমে তার সঙ্গে আমারও আলাপ
করিয়ে দেয়।

“সে ক্রমেত্তের সঙ্গে দেখা করে আমি
বুঝে আসলাম বন্ধুত্বটা দীর্ঘস্থায়ী করার
চেষ্টা করি তখন সে সামনেই সাড়া দেয়।
কিন্তু সেই সঙ্গে পরিচয় বলে দেয় যে
বন্ধুত্ব কেবল বন্ধুত্বের পর্যায়েরই আমি রাখি।
তার তার বেশি কিছু আশা না করি। কারণ
একটুকুই সে ভালোবাসে।

“...কিন্তু বন্ধুত্বের মত, অন্ধের মত আমি
ভেবেছিলো আমার সহচর্যে লন্ডন তার সেই
টিনিদানের অজ্ঞাত নিম্নোপলব্ধি প্রতি
আকর্ষণে ভাটা পড়বে এবং আসন্নতার
উপলক্ষে আমার মায়ের সমস্ত পরিপাটি
কণ্ঠের প্রতি টান বাড়বে। কিন্তু তা
হয়নি। টিনিদানের সেই তথ্যভরিত
তথ্যের কাছে আমি হেরে যাই। সে তার যে
আমার কাছে কত বড়, কত মর্যাদিত তা
অবশ্য তার কাছে আমি সাধারণত গোপন
করেই রাখি। অথচ সে অবশ্যই বা করা
উচিত ছিল, নিজেকে সসম্মানে সরিয়ে
আনা তা আর কিছুতেই করে উঠতে
পারিনি।

“শেষ পর্যন্ত কাল সন্ধ্যার বন্ধন সে
সব্বাৎ বিম্বাসে আমাকে তার বাগদত্তা হবার
কথা জানায় তখন আমার বৈশেষ্য বন্ধন
ছিঁড়ে যায়। আমি তার সঙ্গে কণ্ডা
করি... তারপর টেম্পল লেনের কাছাকাছি
এসে ডাকে ছেড়ে দিয়ে ছোট পায়ের বাড়ী
ফিরে আসি। তখন প্রায় সাতটা বাজে।
আমার মা হয়তো মনে করতে পারবেন তখন
কটা।”

“সাতটা বেজে পাঁচ মিনিট।” আইরীনি
উত্তর দিলেন। “ও ডিনার বেতে আসতে
দেরী করছে দেখে আমি ঘাড়ের দিকে
আঁকিয়েছিলাম।”

“তারপর?”—পুন্নিম কন্ঠচাণীটি ডেভকে
জিজ্ঞাসা করলেন।

“বাড়ী ফিরে খানিক পরেই আমি ফের
বেরিয়ে বাই। সেজা গিয়ে ট্রাউন পাবলার
টুকি এবং ওই মদের দোকানটা বন্ধ না হওয়া
পর্যন্ত সেখানেই বোমাঙ্ক ছিলাম।”

“বোমাঙ্ক?” সর্বাঙ্গ দিয়ে পুন্নিম কন্ঠ-
চাণীটি প্রশ্ন করলেন।

“হ্যাঁ। কারণ আমি মাতাল হয়ে
পড়েছিলাম। তবে দোকানদার ঠিক সময়টা
বলতে পারবে। কারণ মনে পড়ছে বরজা বন্ধ
করার আগে সে আমাকে প্রায় চৌকি বের করে
দিয়েছিল।”

পুন্নিম কন্ঠচাণীটি তার নোটবই দেখে
বললেন, “আপনার সঙ্গে কাল সন্ধ্যাবেলায়
ক্রমে বিচারের একটা বাগদত্তা মত হয়।
তারপর আপনি তাকে টেম্পল লেনের
কাছাকাছি অর্থাৎ পাকের ওদিকে ছেড়ে
চলে আসেন... এর কোন প্রমাণ আছে?
কোন সাক্ষী? কাছাকাছি কেউ কি
ছিলো?”

“তাহো জানি না। অন্তত লক্ষ্য
করিনি। হয়তো থাকতেও পারে। তবে তা
লক্ষ্য করার মত মনের অবস্থা আমার ছিল
না।”

“তা হলে আপনার বন্ধুত্ব সন্ধ্যার
লেনে কোন প্রমাণ আপনার জানা নেই?”

ডেভের বিষম, উদ্ভ্রান্ত মুখে একটা ছোট
বল হাসি দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল এবং সে
ধীরে ধীরে বলে “অবশ্য আপনারা আমার

কোঠের একটা ছোট্ট বোতাম ধূমের বের
করতে পারেন তা হলে হয়তো একটা প্রমাণ
পাওয়া যায়।.....

“আমাদের বন্ধুত্বটা ও ডাবে একটা
বাগদত্তা মধ্যে নিয়ে শেষ হওয়াটা ক্রমে
চালনি। সে ছল আঁতি মারিওর্ডারের শেষ-
প্রবণা মেয়ে। তাই আমি এখন বাগদত্তা করে
হটাৎ চলে আসছিলাম সে তখন আমার
কোঠের প্রান্ত ঘরে আমাকে খামচে গেল।
আমি অটুত মেয়ে ডাকে সরিয়ে দি। ফলে
আমার কোঠের একটা বোতাম ছিঁড়ে গিয়ে
জামান ছিঁটকে পড়ে।”

“সেই কোঠা কই?” পুন্নিম কন্ঠ-
চাণীটি প্রশ্ন করলেন।

আইরীনির পা দুটো হটাৎ পাথর হয়ে
গেল। ডেভ বললেন, “যদি পড়লে তো
কোঠা মেঝেতেই ছুঁড়ে ফেলেছিলাম। তা
সেটা গেল কোথায়?”

“আমি আজ সকলে ওয়াল-ক্রায়ে ফুলে
কোঁকছি।” আইরীনি লক্ষ্য করে উত্তর
দিলেন।

“সেটা বের করে আনুন।” পুন্নিম
অফিসারটি বললেন।

কন্ঠচাণীটির মত আইরীনি গিয়ে সেটা
বের করে আনলেন। একজন পুন্নিম অফি-
সার সেটি ফুলে ধরলেন। অপরজন বোতাম-
গুলি গুনতে লাগলেন।

“কে এর তো কোন বোতাম ছিঁড়ে
যারনি। সামনের তিনটে ও হাতের দুটো-
দুটো চারটে, সবগুলো সাতটা বোতামই
আছে।” গোনো শেষ হতে পুন্নিম কন্ঠ-
চাণীটি বললেন। ঘরের মধ্যে তিনজন
পুন্নিমই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধবাক
হয়ে রইলো। আর অকস্মিক পৃথিবীর
কলতম শব্দটুকুও যেন মরে গেল।

সেই স্তম্ভতাকে ধর ধর করে কাঁপিয়ে
দিয়ে আইরীনি বললেন, “কোঠা মেঝেতেই
পড়েছিল। আজ সকালে সেটাকে ফুলে
রাখতে গিয়ে দেখি তার একটা বোতাম
নেই। আর ছোট্ট বোতামটা কিম্বা তার
কোন জুড়িও খুঁজে পেলাম না। তাই সব-
কটা বোতামই বদলে দিয়েছি।”

পুন্নিম কন্ঠচাণীটি ঈষৎ হেসে
বললেন, “জি বোনার্জ, অর্থাৎ তুমি
ভালো মাই না পেয়েছেন। এত
সকালেও তিনি আপনার কোঠের সব কটা
বোতামই বদলে দিয়েছেন!!” তাঁর হাসিটা
ও হস্তবা বাগের না প্রশংসার?—ঠিক
বোঝা গেল না। পরকণ্ঠেই তিনি আইরীনির
নিকট জিজ্ঞাসা দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন,
পূরোনে বোতাম কী কোথায়?”

আইরীনির সামনে পৃথিবীটা ফের
দুলে উঠলো। তিনি বললেন, “সেখানে
আমি... আমি সেখানে চিমনির আগুনে
ফেলে দিয়েছি।” ডেভ আতঙ্কিত দৃষ্টিতে
তার হাতের দিকে তাকালো। সে দৃষ্টিতে
তার কণ্ঠ হাহাকার করে উঠলো।

এবার সাপ চুপচাপপরিহিত পুঁলিশ কর্মচারীটি এগিয়ে এলেন। পকেট থেকে একটি ছোট খাপে মোড়া আতসকাচি বের করলেন। বোতামগুলি একে-একে পরীক্ষা করে পন্থীসরভাবে বজলেন, “ওগুলো নতুন লাগানো বলেও তো মনে হচ্ছে না।.....তা ছাড়া যদি হয়ও তা হলেও—অপরাধ লুকিয়ে কোয়ার একটা সচেত্রে প্রয়াস বলে আদালত মনে করতে পারে।”

উদ্দিপরিহিত পুঁলিশ কর্মচারীটি ডেভের দিকে তাকিয়ে বললেন, “আপনি বরং খানাতাই চলুন। সেখানে গিয়েই আপনাকে বক্তব্য পেশ করবেন।”

ডেভ বলল, “বেশ, তাই চলুন। সে বিছানা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলো। ভেঁপী হয়ে চলল। দরজা দিয়ে ওরা তিনজন বেরিয়ে গেল। কক্ষিত হাতে আইরিশ দরজাটা বন্ধ করে এসে কোচের ওপর এলিয়ে পড়লেন। তাঁর মনে পড়লো কাল রাতি থেকে ডেভ কিছুই খারনি। এবারে অন্তর অনন্তপরে মহানন্দুর মত দুলে উঠলো। তিনি তাঁর দোলার আছাড় খেয়ে পড়ে গেলেন।

প্রতিবেশী মহিলারা এসে ঘরে ঘন্টি বাজলেন, করাত্ত করলেন, তিনি উঠলেন না। ক্রমে বেলা বেড়ে যেতে লাগলো। হঠাৎ তাঁর অনুশোচনার মধ্যে তাঁর মনে হলো ডেভ এতক্ষণে হাজতে। হাজত থেকে যাবে জেলে। অপরাধ প্রমাণ হলে খুঁই সম্ভব তার ফাঁস হবে। নরতো বছরের পর বছর সে জেলে কাটবে। আর এখানে লাকুনা ও অপমানের মধ্যে কাটবে তাঁর নিঃসঙ্গ জীবন। ওখানে জেলের কঠোরতাব মধ্যে শৃঙ্খলিত ডেভ বোঝেন প্রৌঢ় হয়ে যাবে। এখানে তাঁর জীবন অকালে বার্থক্য নামবে।

আর সম্ভবত সবই তাঁর একটি ভুলের জন্যে। যদি জীবনে তিনি একটু কম সতর্ক, একটু কম বাস্তবগামী হতেন! যদি ডেভের কোচের বোতামটা ছোঁড়া কোয়ার পর থেকেই সেটা তার মনের মধ্যে খচখচ না করতো!—ডেভ নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও হয়তো এ বোতাম কার্হনীটা মিথ্যে প্রমাণিত হয়ে নির্মম আইনের ভাঙ্গে জড়িয়ে পড়বে।—কথামূলি বতই তিনি ডাবতে লাগলেন ততই মনের আরেক দিগন্তে দীপ্ত সূর্যের মত স্পষ্ট আরেকটা প্রতিজ্ঞার উদয় হতে লাগলো। কোভ ও বিধায়ের জলতরু মেঘ কেটে যেতে লাগলো। মূখের পেশীগুলি হাতের হলো! চোখের দৃষ্টিতে এসা শাণিত ইম্পাতের তীক্ষ্ণতা! ওকে বাঁচাতেই হবে।

সোকা ছেড়ে উঠে তিনি স্নানঘরে গেলেন। অপ্রত্যাশিত মূখ ধলেন, বেশ বিন্যাস করলেন। তারপর গোছাক পরিবর্তন করে সোজা খানার পথ ধরলেন। তাঁর দৃষ্টি সোজা। প্রতিবেশীদের কার, দরজা-জানালা কোন-কিছুর দিকে একবার তুলেও দৃষ্টি-পাত করলেন না।

তিনি তেরোজলেন খানার গেলেই ডেভকে দেখতে পাবেন। কিন্তু কোয়ার

ডেভ। খানার দস্তর জাঁকিয়ে বসে আছেন বিপুল দেহ ও পেছায় গোক নিয়ে এক কর্মচারী। সোজা তাঁর সামনে গিয়ে আইরিশ প্রার এক নিঃশ্বাসে বললেন, “আপনার আমার ছেলে ডেভ বোনালিকে ক্রমে রিচার্ডস নামে একটি মেয়েকে খুন করার জন্যে ধরে এনেছেন। কিন্তু সে নিরপরাধ।”

একটি তালতাই চুপচাপ নিভন্ত আগুনকে একটানে উসুকে দিয়ে কর্মচারী মহোদয় খোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, “হতে পারে। কিন্তু আপনি কি করে জানলেন?”

“আমি তার মা। তা ছাড়া আমার কিছু কনুল কথাবার আছে।”

“কি সেটা?”

“ক্রমেতে আমিই খুন করছি। তার হত্যাকারী আমি। ক্রমেই ছিল অতি ভয়না ধরনের জের। আর প্রায় তিন-চার মাস থেকে সে আমার ছেলেকে বড়শিত পাখা মাহের মত খেলাচ্ছিলো। অথচ ডেভ ভাবে সত্যিই ভালোবাসতো। তাই তার চোখে মম ছিল না, কাজে মন ছিল না, আহারে লুচি ছিল না। এ সব কারণেই জামা সে আমার সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করতে শুরু করেছিল। অকথাটা আমার ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠছিলো।

তাই কাল যখন ওরা কাছের পর পরপরের সাথে দেখা করতে গেল তখন



আমিও তাদের হারান হত অনুদয় করলাম। জীবনের কাল থেকেই আমি ডেভের শেখ নিরোঁছলাম। সে যখন ক্রমেতে টেম্পল লেমের মোড় ছেড়ে দিয়ে এলো তখন আমি তাদের জুয়েই একটা পগুলার গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ডেভ চলে যেতেই পার্কের নিছান উপবনটার কাছাকাছি পেছন থেকে তার টর্শিটা প্রাপ-পূর্ণ চোখে ধরলাম।...শেষ এ বাচ গাড়টার তলার তার সদামতে দেহটা কেলে দিয়ে বাড়ী ঘিরে এলাম।”

“বটে?” মূলেবদ পুঁলিশ কর্মচারীটি একটি কানকি মেরে জিজ্ঞাসা করলেন। সেই কানকিতে আইরিশের সারা দেহে তেমন একটা জলমিতকর শিরোন জেলে উঠলো। কর্মচারীটি এবার চৌবেলো খুঁকে পড়ে বললেন, “তা হলে আপনিই বোম্বার বলতে পারবেন মিস্ রিচার্ডসের হাত-ব্যাগটা কোথায় ছিল? তাতে বেশ কিছু টাকাও ছিল।”

পুঁলিশ কর্মচারীটির দিকে এবার তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে আইরিশ বলল, “আমি চোর নই! সেই ব্যাগ আর তার মর্যেকার টাকার সব কিছু আমি চিমনির আগলে পুঁড়িয়ে ফেলোছি।”

এবার জিজ্ঞাসা গোকলোজা কান করে পুঁলিশ কর্মচারীটি হেলে উঠে বললেন, “তা হলে আপনি অবলা আমাদের সাখ্যা করতে পারবেন যে কি করে এই জ.খ ঘণ্টাটেক আগে একটা দাগী আসামীর কাছ থেকে আমরা মিস্ রিচার্ডসের ব্যাগ, টাকা-কড়ি, ছোট একটা কটোপ্রাক, নাম টিকান। সব কিছু উদ্ধার করতে পারলাম। কেনই বা আমাদের শিকিত কুড়ুর ভাকই সবার করলো আর মিস্ রিচার্ডসের গুলার আড়লের ছাপে সঙ্গ এ খুঁখাত আগমণীটির আড়লের ছাপ মিলে গেল?”

“তা হলে...ডেভ নিশ্চয় সে সম্পর্কে নিশ্চিত প্রমাণ...” আইরিশ তুলন্ত মানুহের নিশ্বাস নেবার মত অপ্রাণ চেষ্টার বলে উঠলেন।

“হ্যাঁ। সে বা বা বলেছিলো তা ঠিকই। মনের দোকানের মালিকও বলেছে যে সাভটার একটু পর থেকে দাত এগারোটার দরজা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত সেখানেই ছিল।...এক বোতামের গলপটার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে এখন বুঝছি কেন পাওয়া যায়নি। তার মায়ের সপ্নেই ঔৎকণ্টা এডখানি তার পক্ষে কিম্বা বিপক্ষে প্রমাণ পাওয়াটা অত সোজা নয়। বা হোক আপনি বাড়ী যান। ডেভ একটু পরেই খালি পাবে, বেজলুর খালি।”

“হ্যাঁ আমি বাই। কাল রাত থেকে ও কিছু খারনি।” বলে আইরিশ পা বাড়লেন। কিন্তু সে কোথায়? কোন কলকাতার অতল গর্ভে? কিন্তু রাষ্ট্রের মত বিপুল বদ কর্মচারীটি একলাফে উঠে এসে ভাক করে ফেললেন।

মেহতাব

নিয়ন্ত্রণ

পশুপতি ভট্টাচার্য

দেহের ওজন কমান্ব কি বাড়ছে অথবা একই রকম আছে তা মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখা দরকার। বিশেষতঃ গ্রীষ্ম বস্ত্র পরার সময় পর থেকে।

একথা বলার কারণ কি? আগে এটা বুঝে দেখতে হবে যে, গ্রীষ্ম বস্ত্র পরার সময় দেহের ওজন স্বভাবতই বাড়তে থাকবে। বাড়তে থাকা উচিত। তার কারণ এই বস্ত্র পরার সময় দেহের কৃত্রিম বস্ত্র পরার কাল সেই সময় বাড়তে বাড়তে এই বস্ত্রের মধ্যে তার সম্পূর্ণ পরিণতিতে গিয়ে পৌঁছবে। সেই বাড়ছে মানে তার মূল উপাদান দেহকোষগুলির সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে, আর কোষের সংখ্যা বাড়ছে বলেই দেহ ছোটো থেকে আকারে বড়ো হয়ে উঠছে। আর কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি বাড়ছে সেই অনুযায়ী দেহের ওজনও বাড়ছে। এই রকম হওয়াই স্বাভাবিক। যদি তা না হয় সেটা অস্বাভাবিক।

গ্রীষ্ম বস্ত্র পরার সময় যদি দেখা যায় যে, দেহের ওজন আগেকার চেয়ে না বেড়ে বরং কমে যাচ্ছে, তাহলে তা চিন্তার কথা। তখন বুঝতে হবে যে, স্বাস্থ্যরক্ষার বস্ত্রে নিচেরই কিছু ত্রুটি হচ্ছে। হয়তো যে প্রকারের ও যে পরিমাণের খাদ্য তখনকার ব্যাসের পক্ষে প্রয়োজন তা শরীর পাচ্ছে না, অথবা পেলেও তাকে সম্যক পরিপাক করে কাজে লাগাতে পারছে না। কিংবা এও হতে পারে যে, কোনো গুরুতর রোগপীড়া শরীরের মধ্যে ঢুকেছে, আর ফলে হজমের বিঘ্ন হচ্ছে, অথবা দেহকোষের ক্ষয় হচ্ছে। কোনো একটা কারণ ব্যতীত এরূপ কখনো ঘটতে পারে না। তখন তার সম্ভাবনা নিয়ে দেখা উচিত যে, কোথায় কি দোষ আছে।

কিন্তু গ্রীষ্ম বস্ত্র পরার সময় পর থেকে একেবারে অন্য কথা। দেহের সম্যক পরিণতি হতে তখন আর কিছু বাকী নেই। কাজেই এরপর থেকে দেহকোষের সংখ্যা আদৌ আর বাড়বে না। সুতরাং কোষের সংখ্যা না বাড়লে দেহের ওজনও আর বেশি বেড়ে যেতে থাকার কথা নয়। কিন্তু বাস্তবের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত কি দেখতে পাই? আমরা দেখি যে বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে বিশেষতঃ বার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল তার ক্রমশ ভুঁড়ি বাড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে ওজনও বাড়ছে। এর কারণ তাদের আসল দেহকোষের সংখ্যা আর না বাড়লেও দেহকোষের সংখ্যা বাড়তে থাকে। দেহকোষগুলি তাদের নিজের নিজের কাজ করছে, কিন্তু দেহকোষের কোনো কাজ নেই, তাই দেহকোষের কাজ মেদবৃদ্ধি করা। সেই

মেদবৃদ্ধির জন্যই মেদবৃদ্ধি দেহের ওজন বাড়ে। সেটা দেহের পুষ্টি নয়, কেবল অনর্থক ভারবৃদ্ধি।

অবশ্য এখানে একটা কথা আছে। সকলের দেহই যে মেদবৃদ্ধির জন্য ভারী হয় তা নয়। দেহের কাঠামো অনুসারেও তা হতে পারে। কারো বা কাঠামোটাই হালকা, কারো বা কাঠামোটাই ভারী। ভারী কাঠামোর মানুষের ওজন একটু বেশি হবেই। তার উপর কিছ মেদ বাড়লে ওজন আরো বাড়বে। তখন তা খুব বেশি ক্ষতিকর হবে না।

কিন্তু পক্ষে কোন বয়সে কতটা পর্যন্ত ওজন হওয়া উচিত? খুব নির্ধারণ করে তা বলা না গেলেও মোটামুটি একটা গড়পড়তা হিসাব দেওয়া যেতে পারে।

যদি দেহের উচ্চতা সাড়ে ৫ ফুট থেকে ৫-৮ ইঞ্চির মধ্যে তার পক্ষে ২৫ থেকে ৩০ বছর বয়সের মধ্যে দেহের ওজন হওয়া উচিত ১৩০ পাউন্ড থেকে ১৫০ পাউন্ড পর্যন্ত। ১৩০ পাউন্ড-এর চেয়েও কম যদি হয় তবে তা দোষের। এবং তার পক্ষে ৪০ বা ৫০ বছর বয়সে বা তদুপরে ১৬০ পাউন্ডের বেশি ওজন হওয়া উচিত নয়, যদি হয় তবে তা দোষের। মেয়েদের বেলাতে অবশ্য এই অনুপাতের কিছু কম হবে, কারণ তাদের কাঠামো পুরুষের চেয়ে হালকা। এ-একটা মোটামুটি হিসাব দেওয়া হলো মাত্র। বিশেষভাবে জানতে গেলে আর কত হওয়া উচিত তার জন্য স্বতন্ত্র চার্ট দেখতে হয়।

কিন্তু কারো কারো ওজন মেদবৃদ্ধি খুব বেশি বেড়ে যায়। সেটা যে তাদের পক্ষে স্বাভাবিক সে কথা তারা নিজেরাই বুঝতে পারে। তাদের স্বাভাবিক কর্ম-দক্ষতা কমে যায়, তারা একটুতে হিম্মত করে, অস্বস্তি বোধ করে। এবং পরে তাদের জীবনীশক্তি হ্রাস পড়ে ডায়েবেটিস বা রক্তচাপবৃদ্ধি প্রভৃতি রোগও হতে দেখা যায়। তাদের সমস্যা থাকতে ওজন কমিয়ে ফেলা উচিত।

দেহের ওজন কমান্ব খুব কঠিন কথা নয়। অনেকে বলে যে খুব বেশি পরিশ্রম করো, তাহলেই ওজন কমে। কিন্তু শ্রমই পরিশ্রমে কতটা ওজন কমাতে পারে? হিসাব নিয়ে দেখা গেছে যে, কেউ যদি আট ঘণ্টা যাবৎ কেবলই হেঁটে বেড়াতে থাকে তবে তার ফলে দু-পাউন্ড মাত্র ওজন কমাতে পারে। কিন্তু এত পরিশ্রম করাও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

এর প্রকৃত উপায় হলো খাদ্যপুষ্টি বদলানো। প্রধানতঃ চারটি জিনিস খাওয়া পড়াগ্য করা দরকার—ভাত, রুটি, চিনি ও

ঘি-মাখন। ভাত-রুটি একেবারে পরিত্যাগ করা যায় না। কিন্তু ভাত বন্ধ করে তার বদলে রুটি খাওয়া যায় এবং ভাত মস্তা কমিয়ে। দু-চারখানি মাত্র রুটি খেলে পেট ভরে না, কিন্তু পেট ভরাবার জন্য আরো অনেক রকমের খাদ্য রয়েছে। নানারকমের তরকারি ও শাকসবজি আছে নানা-রকমের ফল আছে। এগুলি খেলে পেট ভরে অথচ মেদ বাড়বে না। ডিম, মাছ, মাংসও খাওয়া যেতে পারে এবং দুধও খাওয়া যেতে পারে। দুটি মাত্র রুটি খেলাম এবং বাকী অন্যান্য রকমের খাদ্য খেয়ে পেট ভরলাম, এটা ইচ্ছা থাকলে অন্যায়সে অভ্যাস করে নেওয়া যায়। এছাড়া চা-কফি প্রভৃতি খেতে কোনো বাধা নেই, তবে তার সঙ্গে রুটি বিন্দুট আগের মতো খাওয়া ছাড়তে হবে।

চিনি একেবারেই ত্যাগ করতে হবে। চিনি হলো ঘনীভূত শর্করা, এর ইন্সলিন ও মেদ জন্মাবার শক্তি ভাতের চেয়ে অনেক বেশি। তাই চিনি এবং চিনি দিয়ে প্রস্তুত মিষ্টান্নাদি ও চকোলেট প্রভৃতি একেবারেই খাওয়া উচিত নয়। এমন কি চায়েতেও চিনি দেওয়া হবে না, চিনির বদলে স্যাকারিন দিয়ে চা কিংবা কফি খেতে হবে। চিনি বা মিষ্টি কিছু না খেলে চলবে না, এমন কোনো কথা নেই। সবই অভ্যাসের ব্যাপার। প্রথম করেটা দিন মন খুব খুব করবে বটে কিন্তু তার পরে এমন অভ্যাস হয়ে যাবে যে, মিষ্টি খাবার দিকে মনই আর যাবে না। অনেকে শর্কর লেবুর রস দিয়ে চা খায়, স্যাকারিনও তাতে দেয় না। যারা ডায়েবেটিসে আক্রান্ত তাদের সকলকেই চিনি বর্জন করতে হয়, ঠিক সেই-ভাবে মেদবৃদ্ধি কমান্ব জন্যও তাই করতে হবে। দেখানো বুঝতে হবে যে, স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য এই ভ্যাগবৈকার-টুকু করা দরকার। এতেই অনেকটা কাজ হবে। চিনি একেবারে বর্জন করলে দেখতে-দেখতে দুই-তিন সপ্তাহের মধ্যে ওজন কমাতে শুরু করবে।

ঘি এবং মাখন সম্বন্ধেও এই কথা। ঘি এবং মাখনে রীতিমতভাবে মেদ বাড়ছে ফাটি ফুড় বা চর্বিযুক্ত খাদ্য মানেই বাড়বে। সুতরাং চর্বিযুক্ত বৃহৎ মৎস্য বা এরূপ খাদ্যের বা ভেড়ার মাংস খাওয়া বর্জন করতে হবে। ছোটো মাছ, কচি পাঁটার ও মুরগির মাংস খেতে কোনো বাধা নেই। তেলে রান্না জিনিস খেতেও বাধা নেই।

অতএব দেহের ওজন কমান্ব জন্য মোটের উপর প্রয়োজন হলো—ভাত-রুটি খাবার পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া, পানীয়পক্ষ ভাতের বদলে রুটি খাওয়া, চিনি খাওয়া একেবারে বন্ধ করে দেওয়া এবং ঘি মাখন ও চর্বি বর্জন করা। এতেই দেখা যাবে যে, ওজন কমে গিয়ে স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, দেহ বেশ হালকা বোধ হচ্ছে, শরীরের স্ফুর্তি পাওয়া যাচ্ছে এবং কর্ম-ভৎপরতাও বেড়েছে।

যাদের পেটে চর্বি জমে ভুঁড়ি হয়েছিল তাদের পক্ষে হঠাৎ চর্বি কমে গিয়ে পেটটা কুলে পড়তে পারে ও খালি-খালি বোধ হতে

পরে। তার পেটে কেউ বাঁধতে অভ্যাস করলে সে-ভাব থাকবে না।

এই সংগে যদি পরিভ্রমের মাধ্যমে কিছু বাড়ানো যায় এবং কিছু ব্যায়াম ও খেলা-ধুলা প্রভৃতি করা যায় তবে তা আরো ভালো কথা। শরীর চর্চা কমানোর জন্যই নয়, ব্যায়ামে ও পরিভ্রমে মাংসপেশীগুলি সুস্থ হয়ে ওঠে ও সাবলীল থাকে। তবে বেশি বরস হলে বেশি পরিভ্রম করা চলে না, কিন্তু টেনিস, ব্যাডমিন্টন, খেলা অথবা দৈনিক খানিকটা হেঁটে বেড়ানো নিশ্চয়ই চলতে পারে। তাতে শরীর ফিট থাকে।

কিন্তু এ তো গেল দেহভার কমানোর কথা। অপর পক্ষে দেহভার বাড়ানোরও প্রয়োজন আছে, বিশেষত যেখানে অল্পবয়সে অর্থাৎ ত্রিশ বছর বয়সের নীচে দেখা যায় যে, ওজন ক্রমশ কমে যাচ্ছে। ওজন কমে যাবার নানাবিধ কারণের মধ্যে প্রধান কারণ হলো টি-বি রোগ, পেটের রোগ, হজমের দোষ, পুষ্টিকর খাবারের অভাব, অনিয়মিত জীবনযাত্রার অনিয়ম ইত্যাদি। অতএব বিশেষভাবে খেঁজ নেওয়া দরকার যে, ওজন কমানোর কারণ উপস্থিত হয়েছে। কারণ আবিষ্কৃত হলে তখন সেই অনুযায়ী যথোচিত ব্যবস্থা করতে হবে।

যেখানে কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না অথচ শরীর রোগা হয়ে যাচ্ছে, ওজন কমে যাচ্ছে, সেখানে প্রধানতঃ খাবারই সাহায্যে ওজন বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। এ-স্থলে ওজন বাড়ানো মানে কেবল যে চর্চা বাড়ানো তা ঠিক নয়। এস্থলে দেহকোষের সংখ্যা বাড়ানো অর্থাৎ রক্ত-মাসলার পুষ্টিই কাম্য। যারা রোগা হয়

তাদের শরীর দুর্বলও হয়, তাদের রক্ত-হীনতাও থাকে এবং চর্চার অভাবে তাদের দেহে উত্তাপ হ্রাসিত থাকে না। এই সকল কারণে তাদের রক্তও সমৃদ্ধ হওয়া দরকার, তাদের দেহকোষগুলির পুষ্টিও দরকার এবং চর্চা বাড়ানোও দরকার।

অতএব তাদের পক্ষে ভাত-রুটি খাবার পরিমাণ বাড়তে হবে, দুধ-মি খেতে হবে, এবং মিষ্টি খাবারও দরকার হবে।

বিশেষ করে তাদের পক্ষে দুধ খাওয়া খুবই দরকার। বেশি খাওয়া সম্ভব না হলেও প্রত্যহ নূনপক্ষে আধ কিলো, বা দুই কাপ। দুধের প্রয়োজনীয়তা এখানে খুবই বেশি। যে-কোন দুধ খাওয়া যেতে পারে, গরুর বা মহিষের, বা চাগলের, বা পাওয়া সম্ভব হয়। এমন কি টিনের গাড়া দুধও চলতে পারে যদি তা মাঠাতোলা না হয়। কিন্তু দুধ চাই-ই। যারা দুধ খেতে নিতান্তই নাজাজ তারা দুই খাবে, ছানা-মাখন খাবে। আমাদের পক্ষে দুধের মতো পুষ্টিকরক খাদ্য আর কিছুই নাই।

দুধ ছাড়া আরো অন্যান্য পুষ্টিকর জিনিস খাওয়া দরকার, যেমন ডিম, মাংস, মাছ এবং নিরামিষাশী হলে সোয়াবিন ডাল, শুটি-বরষাট, বাদাম, পেস্তা, চিনাবাদাম প্রভৃতির স্ফারাও খানিকটা পুষ্টিয়ে নেওয়া যায়।

এই সকল খাদ্যাদির সংগে কিছু ভিটামিনের প্রয়োজন এবং লোহা প্রভৃতি কিছু খাতব পুষ্টিরও প্রয়োজন। বীথাকর্প, পালং-শাক প্রভৃতি থেকে এবং টাটকা ফল থেকে এগুলি মিলতে পারে। অন্যথা এরূপ মিষ্টি

রকমের ভিটামিন এখন কিনতে পাওয়া যায়, তা খেলেও বেশ উপকার হয়।

এছাড়া আরো কিছু ব্যবস্থার দরকার। প্রথমে দেখতে হবে যে, অতিরিক্ত পরিভ্রম, অতিরিক্ত পড়াশোনা করা, অতিরিক্ত রাত-জাগা প্রভৃতি কিছু আছে কিনা। এগুলিকে কমাতে হবে। পরিভ্রম কমিয়ে ফেলতে হবে বটে, কিন্তু সেই সংগে কিছু স্বাস্থ্যকর ব্যায়াম অভ্যাস করা ও ঘুড়ি বারুতে বেড়ানো দরকার। অতিরিক্ত চা-পানের বা হুমপানের অভ্যাস থাকলে তা কমিয়ে ফেলা দরকার। আর সবচেয়ে বেশি দরকার মানসিক দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ প্রভৃতির নিবারণ। দুশ্চিন্তাতেও মানুষকে কাহিল করে।

আর একটি জিনিস বিশেষ দরকার—মুক্ত-বায়ুতে নিদ্রা খাওয়া। দরজা জানলা এতে বন্ধবরের মধ্যে বারো শোর তাদের দেহ ঐ-বায়ুর অভাবে স্বাভাবিকই শূন্য হয়ে থাকে। অল্পবয়স্ক ছেলেনুদের মধ্যে অনেক সময় দেখা গেছে কেবল দরজা-জানলা খোলা রেখে মুক্তবায়ুতে শোজানোর ব্যবস্থা করে তাতেই তাদের দেহের ওজন বাড়তে শুরু করেছে। মুক্তবায়ুর যেমন স্বাচ্ছন্দ্যকর গুণ আছে তেমনি পুষ্টিকারক গুণও আছে। আর মুক্তবায়ুতে শুলে সর্দি কাশি প্রভৃতি রোগের বন-ঘন আক্রমণ থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়। অনেকে মনে করে যে এটা ডাক্তারদের একটা বুলি মাত্র, কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। যে কেউ পরীক্ষা করে দেখবে সেই বুঝবে।



জগীষ

মৌখিক দেবী

স্বা



ভারবেলা ঘুম ভাঙতে না ভাঙতেই বিবিদিদির মনে পড়ল সেবার জন্মদিনে বাবা ওকে কেক দেন নি। বাবার জন্মদিনে সবাই মিলে রঙপুরের টাউন হলে মিটিং করেছিল। শহরের যত মানগণ্য লোক কেউ বাধ ছিল না। সবাই চাঁদা দিয়েছিল, সবাই এসেছিল। পার্ভীপুরে আর লালমণিরহাটে তখন আতাব আলি রেলের কের্টারিং দেখবার জন্য এসেছিল। আতাব আলি সেই এক সময়কার পেলেটির লোক। সেই যখন পেলেটির দোকান ফিরপো-রা কিনে নেন নি তখন থেকে আতাব আলি পেলেটিং।

বিবিদিদি শুনছেন এমন কেক তৈরীর হাত কারো ছিল না আর কি বছর, বড়দিনে-ইস্টারে-নতুন বছরে হগসয়েবের বাজারে নতুন নতুন কেকের নক্সা দিয়ে আতাব আলি অনেক টাকা পেত।

বাবার জন্মদিনেও আতাব আলির তৈরী কেক আসত। এই এত উঁচু, কতরকম নক্সা করা, গাঁজের মত কোনটি, কোনটি বা কুঁড়ে-ঘর, দেওয়ালের নক্সার চিনির রসে ভেবানো লাল টুকটুকে চেরী ফল আটা, দেখেই মনে হয় খেয়ে নিই।

বাবা যখন থাকতেন না তখনো কেক আসত। রঙপুরের লোকেরা সেবার আতাব আলির খোজ পেয়ে ওকে ফরমান দিয়ে এত এত কেক আনিয়েছিলেন। বিবিদিদি তখন কত ছোট? আট না নয়? বাবা কেক আনবেন বলে অনেক রাত অবধি জেগে রাসে-ছিলেন। কিন্তু বাবা এলেন অনেক রাতে। গুপ্তবাবুদের বড় ঘোড়ার গাড়ী চড়ে। বিবিদিদির ঘরের দিকে একবারও না এসে জতো মশমশ করে সোজা মা-র ঘরের দিকে চলে গেলেন, এখনো মনে আছে।

(উ প ন্য স)

‘তুমি কি শূন্য হাতে এসেছ?’ মা-র গলা তীক্ষ্ণ ছিল।

‘তোমার জন্যে মালা এনেছি।’ বাবার নিশ্চয় আনন্দ হয়েছিল নইলে লোকজনের সামনে একথা বলবার মানুষ তিনি ছিলেন না। তিনি কেন, তখনকার সবমানুষই কাজকরবার লোকজনের কান বাঁচিয়ে কথা কইত। কি-চাকরের সামনে হড়বড়িয়ে কথা কওয়া মোটে কেতা ছিল না।

মালা মানে ফুলের মালা, মানপত্র, তাছাড়া সোনার জলে বাঁধাই ‘দেবীচৌধুরাণী’। দেবীচৌধুরাণী আর ভবানীপাঠক রঙপুয়ের লোক ছিলেন, সবাই বলত। তাই রঙপুয়ের কেউ মান্য-গণ্য এলে ‘দেবীচৌধুরাণী’ দেওয়ার ফ্যাশন হয়েছিল।

‘আমার জন্যে মালা?’ মা আস্তে বলেছিলেন।

‘হ্যাঁ গো!’ বাবা নিজেই কাচের আলমারী খুলেছিলেন। মানপত্র দাও আর সভা ডাক আর বাই কর, কাঁচের আলমারী খুলে দু’ দণ্ড না বসলে, একটু না খেলে বাবার ঘুম হত না।

‘সুদর্নীতির জন্যে কেক আনবে বলেছিলে!’ মা একটু বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন।

বাবা আরো বিরক্ত হয়েছিলেন। দড়াম করে দরজা টেনে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। শেষ কথাটা বলেছিলেন ‘সুদর্নীতি আর সুদর্নীতি! শুনতে শুনতে...’

ওঁদের কথাবার্তা আর শুনতে পাওয়া যায় নি কিন্তু মত-দূর শোনা যায় বিবিদিদি দরজায় কান পেতে শুনছিলেন। তারপর কে’দেকেটে কখন যে মেঝেতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন কেউ জানে না।

আজ বাবার জন্মদিনে হঠাৎ সেই কথা মনে পড়ে গেল। মনে পড়তেই দুঃখ হল। এখনো কেন যে দুঃখ হয়, আর কোথায় যে কোন দুঃখ বেঁচে থাকে বিবিদিদি তাই তো বুঝতে পারেন না। নইলে বাবার বয়স আজ, এই সাতষটি সালের দোসরা জন্মবার



ঠিক আশী বছর হবে, বিবিদিদির বয়স পৌষ মাসে পঞ্চাশ পেরিয়ে একশর পড়েছে। কবে বাবা জন্মদিনে কেক আনেন নি সে-কথা মনে করে এখন দুঃখ করে কি হবে কে জানে, কিন্তু এই সব ছোট ছোট জিনিসই বিবিদিদির এখন মনে থাকে।

বিছানা ছেড়ে উঠলেন, পায়ে চটি পরলেন। আস্তে আস্তে দেওয়াল-আলমারীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। দেওয়াল-আলমারীর ওপরে আয়না বসানো, বিবিদিদির চিরুনি, তেল, অন্ন বা বল টুকটুক সব এখানে থাকে। এখানেই বেতের ডুলিতে বিবিদিদি ওকলো-মিষ্টি, কাজুবাদাম, চিনেবাদামের তালি, জুরো কত কি লুকিয়ে লুকিয়ে রেখে দেন। যখন কেউ থাকে না তখন দোর বন্ধ করে টুকটুক করে খেয়ে নেন। আজকাল ওর সবসময়ে খিদে পায়, মন খাই-খাই করে, কিন্তু বাণী যে কি কড়ানিয়মে রেখেছিল ও'কে। এই মেপে-মেপে খেতে হবে, সবেম শেখ বয়স হয়েছে, কি রুচি রুচি কথা। হাবার আগের দিন-যে-কথা বলে গেল সে কথা এখনো বিবিদিদির মূকে বিঁধে আছে।

দশমীর দিন বলে দুটো নিমাক ভেজে নিচ্ছিলেন। ভাজা-পোড়া খাবেন না, এ সব নিয়ম! আর বিবিদিদি মানতে পারেন না।

কিছু কিছু আচার নিয়মকে এত অর্থহীন, এত বাজে মনে হয়েছে তার, এত অশ্লীল।

বাণী দেওয়াল খুলে কি খুঁজছিল।

‘কি করছ?’ বাণীর গলার আওয়াজ কার মত? এত অসহিষ্ণু। এত রুচি কেন? বিবিদিদি তো জানতেন গলার আওয়াজ শুনে বুঝে নেওয়া যায় মানুষটি উন্নত কত, সচ্চরিত্র কি না, কেমন শিক্ষাদীক্ষা।

ভাগ্যে তার মেয়ের গলা শুনে কেউ চিনতে আসে নি বাণীকে। তা যদি হত তাহলে আর দেখতে হত না।

‘নিমাক ভাজছি।’

‘কেন?’

‘দশমীর দিন...’ বিবিদিদির বড় লজ্জা করেছিল। বাণী এ লজ্জা হল কেন? মানুষের খাওয়া-দাওয়া নিয়ে কি এত কথা বলতে আছে? বলাটা অশ্লীল নয়? বাণী কেন বিশ্বাস করে নি, তাই দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল।

বিবিদিদি পিঠিতে দুটিখানি তুলে নিয়েছিলেন। পরম গরম খাও বাণী, ভাল লাগবে।’

বাণী একটু হেসেছিল। তারপর নিচু, বিবাক গলার বলে-ছিল ‘মা, স্বামী, আমার সুখ-শান্তি, আমার সান্না, সব তো খেয়েছ মা। এখনো তোমার খাওয়ার কথা এত ভাল লাগে? লজ্জা করে না?’

বিবিদিদি অনেকক্ষণ বোকে নি বাণী কি বলল। তারপর আস্তে আস্তে বলেছিলেন ঐক্যিক শরীর থাকে না বাণী, তোমার শরীরও থাকবে না। আমার মা-র কথা আমি তোমার মূখে শুনতে চাই না। তবে তোমার বাবার নাম আমার সামনে কর না। তার জীবনেও আমার কোন অংশ ছিল না, তার মৃত্যুর কোন দায়িত্বও আমার নয়।’

‘কেন নয় সে কথাই তো জানি না।’

বাণীও তারই মেয়ে। মানুষের তৃতীয় পুরুষ না কি মাতামহ বা পিতামহের মত হয়। বাণীর ভেতর দিয়ে বিবিদিদি কাকে দেখতে পাচ্ছিলেন?

‘এ কথার মানে কি বাণী?’

‘আমার বাবা একলা দায়ী ছিলেন, তোমার অথবা তোমার বিখ্যাত বাবার কোন দোষ ছিল না একথা আমি কোনদিন বিশ্বাস করি নি মা।’

‘বাণী!’

বিবিদিদির মাথার ভেতর জ্বালা করছিল, চোখের সামনে অশ্রুকার ছড়ি যাচ্ছিল। কে তার সঙ্গে কথা বলছে? এ কি তারই মেয়ে? স্নেহ না কি নিন্দাময়ী হয়। সন্তান যেমন হোক কুমাত্র

না কি হতে নেই। তাহলে বাণীর ওপর তার মন বিষিয়ে যাচ্ছে কেন?

‘তোমার ষোল বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল, সেও আজকের কথা নয়। কেন, কেন তুমি মানিয়ে নিতে পারনি তাবলে আমার জন্য লাগে।’ তোমার বয়সী একজন মেয়ে...

‘আমার বয়সী?’

বিবিদিদি নতুন করে অবাক হয়েছিলেন? পঞ্চাশ বছর বয়স কত বয়স? এ কি তার ঠাকুরার সময়কার কথা? সাত বছরে বিয়ে, চোদ্দ বছরে বাবা কোলে এসেছিলেন। চৌতিশ বছরে শাদুড়ী হয়ে ঘরভরা নাতি-নাতনী রেখে পঞ্চাশ বছরে যখন মরে গেলেন তখন সবাই বলেছিল ভাগ্যমানীর মরণ এইরকমই হয়। পাকা চুলে সিঁদুর পরে বড়ী চলে গেল।

সিঁদুর-আলতায় ঠাকুরার পারের ছাপ একখানা বড় কাগজে নেওয়া হয়েছিল। বিবিদিদিদের রাজসাহীর বাড়ীতে ঠাকুরঘরে সেটি টাঙানো থাকত।

তখন দিনকাল অন্যরকম ছিল। আজকাল পঞ্চাশ বছরে কে বড়ী হয়? কাগজ-পড়লেই তো বিবিদিদি জানতে পারেন আজকাল মানুষের আয়, বাড়ছে, মানুষ বাঁচে বেশী। আজকাল কেউ পঞ্চাশে পা দিলে বড়ী হয় না। সে সব কথা জেনেছেন বলেই তো বিবিদিদি স্বস্তি পান। নইলে কোথায় বিয়ে হয়েছিল, কোন অজ-পাড়ায়। উচ্চ বংশ, ছেলে ঢাকরী করে ভাল আর জোতদারীর পরস, এ ছাড়া বাবা আর কিছু দেখেন নি। বিবিদিদি জানতেন বাবা আর কিছু দেখেন না, কেননা বাবা বিবিদিকে জন্মের মত শিক্ষা দিচ্ছিলেন। মেয়ের মধ্যে তিনি এমন কিছু দেখেছিলেন যা জীবনেও দেখবেন বলে আশা করেন নি। বিবিদিদি জানতেন বাবা বিয়ের ভেতর দিয়ে শোধ নেবেন।

সেখানে একটি দুটি নয়, পুরো পাঁচটি বছর ধরে বিবিদিদি কত ধান ভেনেছিলেন, কত কাজ করেছিলেন, পৌষ মাসে উঠোন বউরা না নিকোলে ধান ঢালা হত না। পূজোর সময়ে পিঠি জেলে তারা, ছোট ছোট বউরা বড়ী দিদিশাদুড়ীর সঙ্গে বসে রাত জেগে জেগে লাউ কুটতেন।

যে লাউটিতে একটু, বাঁচি থাকত, সেটি আদখান! করে কেটে গোরুর গামলার ফেলে দিতে হত। এই সব করে করে লাউখন্ট কুটে হত। দিদিশাদুড়ী, শাদুড়ী সবাই গালে হাত দিয়ে বসে বসে শব্দ শব্দ কাড়তেন। শরতের হিমে উঠানে কাঁচি করে করে কোটা তরকারী রাখা হত।

পিঠি কনকন করত, আঙুল অবল হয়ে আসত, ঘূমে চোখ ঢুলে পড়ত।

‘উনি রাজেন্দ্রনাথদী, তাই ঘূমে ঢুলছেন!’ দিদিশাদুড়ী বলতেন। রাত দুটো-আড়াইটেয় ছুটি মিলত। তখন আবার ঐ দিদিশাদুড়ীর হাটুর বাতের বাথার জন্যে গোবর-নুনে ফুটিয়ে আকন্দ পাতা দিয়ে তাপ দিয়ে দিতে হত। আকন্দ পাতা আর গোবরের তীব্র কটু গন্ধ, আরো কিছু কিছু গন্ধ, এখনো বিবিদিদির নাক লেগে আছে।

শব্দ পরিপ্রভা আর পরিপ্রভা। ভূতে পাওয়ার মত কাজ করে চলতেন বিবিদিদি, যেন কেউ না জানতে পারে তার মনের কথা। হাড়কাটা পরিপ্রভা করেছেন এক সময়ে সেইজন্যেই কি এখন মাঝে মাঝে মনে হয় তার বয়স একশো-দুশো হয়ে গিয়েছে?

তবু তো এখন কত ভাল লাগে, কত সুখ হয়ে হয় নিজেকে। হাটের বাথার মাঝে মাঝে ভুলে যান বিবিদিদি।

বাণীর কথায় কিন্তু সব মনে পড়ে গিয়েছিল। একটু আশ্চর্য হয়ে, অনেকখানি দুঃখ পেয়ে বিবিদিদি কান্নাছিলেন, বাণী, আমার বয়স তোমাদের চেয়ে বেশী একথা ঠিকই... সেই জন্যেই বলি, তুমি যা জান না তা বিচারের চোখে দেখো মা। তোমার বাবা আল স্বর্গে গেছেন...

‘আমি স্বর্গে যাব না!’

বাণী তো তাঁকে বিধে কথা বলছিল, কিন্তু বাণীর বুক কি বিধছিল। ওর মুখ কেন কাকাশে হলে যাচ্ছিল? আর স্নেহ যদি নিম্নগামী হয় তাহলে তিনিই বা কেন মেয়েকে বুক জড়িয়ে নিতে পারছিলেন না?

‘আমি জানি না তাঁরা স্বর্গে গেছেন কি না। আমি জানি না আমাকে কোনদিন কিছু যেন হয় নি কেন। আমার বাবার অধিকার আছে সে কথা তোমার কখনো মনে হয় না?’

‘অধিকার?’ বিবিদিদি আশ্চর্য হইয়াছিলেন, কিন্তু উত্তেজিত হইয়াছিলেন বলে তাঁর গলা ভীষণ ক্রুদ্ধ শুনিয়েছিল। উত্তেজনার বিস্ময় আর নিদারুণ ক্রোধ দুটোর অভিব্যক্তিই কি একরকম?

বাণীও কেঁপে গিয়েছিল।

‘হ্যাঁ, অধিকার। আমি জানতে চাই তোমার বাবার কথা। আমার বাবার কথা, আমি পূর্ণ সত্য জানতে চাই।’

পূর্ণ সত্য? হা ভগবান, সত্য কি নিষ্কলঙ্ক, শূন্য, পবিত্র যে তুই তার চেহারা দেখতে চাস বাণী? সত্যের চেহারা বড় ভয়ঙ্কর বাণী, বড় বীভৎস, বাপ-মেয়ে স্বামী-স্ত্রী স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা, প্রত্যেকটা সম্পর্কের, প্রত্যেকটা আত্মগের আরেকটা চেহারা আছে।

সে চেহারা বড় ভয়ানক বাণী, এখনো আমি চমকে চমকে উঠি, এখনো আমি যমোতে পারি না, তুই কিছু জানতে চাস না।

বিবিদিদির মুখ দিয়ে অবশ্য একটি কথাও বেরুল না।

‘হাজার হলেও, ওঁদের প্রতি... যদিও বাবাকে আমি দোষ দি, তোমার বাবার স্নেহ-ভালবাসা পাই নি। তবু ওঁদের স্মৃতির প্রতি আনুগত্যবশতই তো আমি নিজের সুখ-শান্তি বিসর্জন দিচ্ছি, দিচ্ছি না?’

‘ওতে সুখ হত না তোমার।’

‘মানুষ দাম দিলে জিনিস চায়, চায় না?’

বাণীর বাবা বাপের আসুখ-বিসুখে সাহায্য করছিলেন বলে অনন্ত উৎকলের ময়ের কাছ থেকে অন্যরকম দাম আদায় করেছিলেন। দামের কথা বলিস না বাণী। এক এক মানুষ দাম বলতে এক এক জিনিস বোঝে।

‘তবিত্যতের কাছে ওঁদের স্মৃতি উজ্জ্বল এবং পবিত্র রাখবার জন্যে আমার কাছ থেকে তুমি ভীষণ দাম নিয়েছ মা।’

বাণীর নাকের পাটা ফুলে গিয়েছিল। ফসী কপালে নীল শিরা দপদপ করেছিল। বাণীর হাড়সর্বস্ব শত চেহারায় বাপের রঙটুকু বহু আছে, নইলে ওর দিকে চাওয়া যেত কি?

‘ওতে তোর সুখ হত না বাণী।’ বিবিদিদি অক্ষুণ্ণ বলেছিলেন। অনেক দিন পরে ওঁর বুকের বাঁ পাশে ব্যথা চিন্টিচন করাছিল। ওখান আনা আছে কি না কে জানে। হাড়ল নেই ওঁকে ওখান নেই বা কে?

‘তুমি কি করে জানলে মা? তুমি, তুমি তো কখনো সুখ পাও নি। তাই আমাকেও সুখী হতে দিলে না।’ বাণীরও কি বুক ব্যথা? যেন যন্ত্রণার ও চেঁচিয়ে উঠেছিল। তারপর দুঃস্বপ্ন করে নেমে গিয়েছিল।

বাণী, ফিরে আর, বাণী, আমি তোকে সব কথা বলব। বিবিদিদি বলতে চেয়েছিলেন, বলতে পারেন নি। অত সহজ যদি হতো পারতেন, অত আলগা যদি করতে পারতেন নিজে। তাই তো পারেন নি বিবিদিদি। সন্তান হবার সময়েও শরীর ভিলে করতে পারেননি। দারুণ কষ্ট পেরিয়েছিলেন। তখন শিশুমঙ্গল নাম হয় নি কি হয়েছে। সন্ন্যস্তী ঘাইক সেখান থেকে আনানো হয়েছিল। একটা

করকে আনানো করে দেওয়া হয়েছিল। সন্ন্যস্তী পালকরা, ইংরেজী-জানা পিসি ঘাই। শরীর আলগা কর, ব্যথা আসতে দাও, শরীর অলস করা, সন্ন্যস্তী বলে যাচ্ছিল। কিন্তু বিবিদিদি শরীর আলগা করতে পারেন নি। অনেক চেষ্টার অনেক কষ্টে বাণীকে পৃথিবীর মুখ দেখানো হয়। আর বাসরঘরে সে কি অভিজ্ঞতা। বাণীর বাবার হাতল ওঁর হাতে এসে পড়তেই ভেতর থেকে যেন আসল বিবিদিদির বেঁকেবেঁকে শব্দ করে কে আলগে ফেলেছিল।

জীবনেও সে বাঁধন আর খোলে নি। ‘রমলা, রমলা তুমি কি পাষণ? রমলা, তুমি আমাকে দয়া কর।’ বাণীর বাবার সেই অশ্রু, আবেগে ভাসা কান্নাভরা গলার স্বর জীবনে দু-একবার মাত্র শুনিয়েছেন বিবিদিদি, কিন্তু তাতেও নিজেকে আলগা করতে পারেন নি।

যদি পারতেন তাহলে কি হত? স্বামীর গলা শুনবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অতীত জীবনের অবিচার, অনন্ত উৎকলের ‘মতের সিঁদুর-পরা চেহারা, সর্ব যেন বিবিদিদির মনে হুঁড়োহুড়ি করে ছুটে এসেছিল। সারাজীবনের অবিচার, এত স্নেহহীনতা, এত হুকুম, ‘রমলা তুমি কি পাষণ! রমলা দয়া কর।’ শোনবার সঙ্গে সঙ্গে বিবিদিদি কি করে ভুলে যেতেন?

হয়তো, হয়তো তবু সব ঠিক হয়ে যেত, সব অবশ্য ঠিক হয় না, আধাআধি ঠিক হয় আর তাই নিয়ে মানুষ দিবা কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু বিবিদিদির বাবা আস্তে আস্তে সিঁড়ি ধরে নেমে এসেছিলেন।

‘বিবি। হাসনে।’ বাবা চেঁচিয়ে বলেছিলেন। তাঁর বাবা! যে বাবা ঘোড়ার গাড়ী চড়ে নিজের শরীর পাত করে পরের সুখ-শান্তি-আরামের ব্যবস্থা করে বেড়াতেন। পথের কুকুরের গারে বা দেখলে ওখান না নিলে শান্তি পেতেন না। অন্যের চোখের জল মোছাবার জন্যে বিনি রাতের পর রাত জেগে কাজ করতেন, নথিপত্র দেখতেন।

সেই বাবা বিবিদিদির বিবাহিত জীবনে চিরদিন একটা বিরট পাষাণের মত চেপে বসে ছিলেন। ওঁদের স্বামী স্ত্রীর ডিলমাট্র মিটিংয়ের সম্ভাবনা দেখলেই বাবার শরীরে পুনরো বহু কেঁপে উঠত।

কিন্তু স্নেহ না কি নিম্নগামী। তা যদি হবে তাহলে বিবিদিদি বাণীকে কিছু বলতে পারেন নি কেন? কে তাঁর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়েছিল?

বাণী চলে বাবার অনেক পরে বিবিদিদি নাকে কটু গন্ধটা পেয়েছিলেন। স্টোভে তেল ছিল না বেশী, স্টোভ নিতে বাবার পর কেরাসিনের ঘোঁরাটে গন্ধ। কড়াইয়ে দালনা জুড়ে বাবার গন্ধ। বিবিদিদি নিম্নিক ডাকছিলেন।

‘বাণী ফিরে আস।’ বলবার চেয়ে স্টোভ থেকে কড়াইটা নামানোই বিবিদিদির বেশী দরকারী কাজ মনে হয়েছিল।

বাণী নয়, বনবাণী। বিবিদিদির বাবার দেওয়া নাম। বাণীর বাবা কোন নামটায় সেন নি। দিলেও সে খুব আশ্চর্যের কথা হত।

বাণী ফিরে আসে নি। বাণী ওর পিসীর বাড়ীতে গিয়ে উঠেছিল। যদিও পিসী কোনদিন ওর খোঁজখবর নেন নি, তিনিও দাদার অনুগত বোন, কিন্তু কিছুকাল হল, বিশেষ করে অবস্থা ফিরবার পর থেকে তিনি ঘনঘন বাণীর খোঁজ নেন।

বিবিদিদি জানেন এ শব্দ তাঁকে অপমম্ব্য করবার জন্যেই। বাণী মাকে দেখতে পারে না, বাণী তার মাতামহকে সহ্য করতে পারে না, ননদ সেগুলোকেই ভাঙাল।

নানাভাবে বাণীকে, হয়তো উনিই বুঝিয়েছেন বাণীর মা বাবার প্রয়োচনার স্বামীর সঙ্গে দুবাহার করেছিলেন।

বিবিদিদি জানেন না বাণীকে ওর পিসী - আরো কি কি বলেছেন কিন্তু নিশ্চয় এমন ভিজ্জিকাজ, মিষ্টি মিষ্টি কথাতে বিষ ছড়িয়েছেন যে, বাণীর মনে হয়েছে উনিই ওর একমাত্র মিত্রপক্ষ।

ভাবতে গিয়ে বিবিদিদির মন আরো কঠিন হয়ে গেল। স্বভাবের ঐ একটা জায়গায় বাণী দুর্বল। দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বন্ধু সাজাতো তো এক ধরনের নোংরামি। বাণী সে নোংরামিতে প্রভুর দের কেন?

তিনি, তিনি তো কখনো মানুষকে দুর্দমনের বন্ধু সেজে কাছে আসতে দেন নি। দুখ একলা সইতে শিখেছিলেন, দুখের সময়ে নিজের সঙ্গে নিজে একলা থাকতে শিখেছিলেন।

বাণী বলে, 'সেইজন্যই তুমি এমন কঠিন হয়ে গিয়েছ মা, এত কঠিন হতে নেই।' আরো কত কথা বলে বাণী। তারা এত কঠিন হয়, নিজেকে শাসনে রাখে তারা নাকি মা বল, বাবা বল, স্বামী, সন্তান, কারো কাছেই নিজেকে ঢেলে দিতে পারে না। ঢেলে দিতে পারে না বলে ভালবাসতেও পারে না, ভালবাসাও যায় না।

তারা নাকি দুর্ভাগা, স্বার্থপর। বাণী বলে, তাঁর মেয়ে বাণী। যে মেয়ের জন্যে বিবি-দিদি নিজের বাবার সঙ্গেও ঝগড়া করেছেন কতবার। 'স্নেহ নিম্নগামী বিবি।' সাতুদার গম্ভীর গলা হয়ে পড়ল। তাই যদি হবে তাহলে আজ, বাবার জন্মদিনে, বাণীর কথা ভাবতে ভাবতে বিবিদিদি মনের মধ্যে স্নেহ খুঁজে পেলেন না কেন?

নিজের জন্যে ও'র কথা পেল। উনি ভালবাসতে পারেন না, নরম হতে পারেন না, নিজের স্নেহহীনতা থেকে কে ওকে বাঁচাবে? তবে কি বিবিদিদি আস্তে আস্তে ছোটবেলা মৈদিনীপুরে দেখা সেই উপাস গাছের মত হয়ে যাচ্ছেন?

উপাস গাছের ছায়ার বসলেও মনুষ্য দৃষ্টি পায়। উপাস গাছ যেখানে জন্মায় তার চরিত্রকে সব গাছপালা, ঘাস শূকির প্রভৃতি থেকে থাকে। বিবিদিদির চরিত্রিক থেকে সেইজন্যই ঠিক সবাই সরে গিয়েছে?

তবে বোধহয় বিবিদিদিও উপাস গাছের ছায়ার বসেছিলেন? তাঁর তো মনে হয় কয়েক গিরিছিলেন শূন্য। মৈদিনীপুরের সেই এক জলকর সম্ভাবনা, বাড়ীতে বেন কেউ নেই, কেউ কথা বলে না, সম্ভাবনা তুমিই বিবি-দিদির বকে ঢেপে বসেছিল।

তখনো বাচ্চাদের আসে নি, জন্মগাটক নাম খাজটাউন হয় নি। রেশুদের বাড়ী থেকে খেলা করে ফিরে আসবার সময়ে হ'জব-সারবদের বাড়ীর পেছনে বিবিদিদি উপাস গাছ দেখতে পেরেছিলেন।

লালচে, শক্ত খোয়াই-এর ওপর দাঁড়ানো উপাস গাছ। বিবিদিদির মনে হয়েছিল বড়সে তাঁর দিকে ভালপালা বাড়িয়ে দিয়ে গাছটা তাঁকে কি কেন দিতে চাইছে।

ভর পেরেছিলেন। ভব, সরে আসতে পারছিলেন না। ওখিকে অন্ধকার হচ্ছিল, সম্ভাবনা বৃকে ঢেপে বসেছিল। সাতুদা এসে না ডাকলে বিবিদিদি বেন নড়তে পারতেন না।

সাতুদা বিবিদিদিকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। ফেটে কেটে বসেছিল 'কি দেখছিলেন?'

উপাস গাছ।'

কি বললে?'

রেশু, বলছে।'

বাড়ী।'

সাতুদা গাছটার বৈজ্ঞানিক নাম বলে গিয়েছিল। তারপর বলেছিল এ জন্মের গাছের বাতাসে নাকি বিষাক্ত গ্যাসের পরিক্রম অনেক বেশী থাকে।

তারপর, হঠাৎ, বেন বিবিদিদিকে চমকে দিয়ে বসেছিল, 'আজ আজ চলে যাচ্ছে বিবি। তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না।'

কোথায় বাছ?'

অন্যত্রা।'

কিন্তু গাছটা নিয়েও কানত না।

কোথায় বাছ, কতদূরে। আজ বাবার আশী বছরের জন্মদিনে বিবিদিদি দেওয়াজ-ত-ক-মারীর টানা খুললেন। আজ শরীর খারাপ লাগলে হবে না, আজ তাঁর হাতে অনেক কাজ। এখন টেলিফোন করতে হবে, আর সত্যি কথা বলতে, কি টেলিফোন করতে বিবিদিদির এখনো খানিকটা ভয়-ভয় করে। ফোনের অঙ্কুর দিয়ে ঢাকতিটা যোগানো সব সময়ে ঠিক হয় না। টেলিফোন, লিফট, ওজন নেবার মেশিন, বিবিদিদির কোনটোতেই এখনো অভ্যাস হল না। বাণী ও'কে তিচ্ছ করতে দিত না সে-ও একটা কথা বসে।

টানা খুলে কি বেন খুঁজতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ সাতুদার ছবিটা চোখে পড়ল। বাণী বাবার আগে টানা খুলে নিজের জিনিসপত্রের বের করে নিয়ে গিয়েছে সেই সময়েই কি ছবিটা বেরিয়ে এসেছে না বাণী ইচ্ছা করে বের করে রেখেছে?

নিশ্চয় বাণী ইচ্ছা করে বের করে রেখেছে। বিবিদিদির জেনেন বাণী ইচ্ছা করে কখনো সাতুদার নাম মুখে আন না। কার ছবি, কে তোমার সাতুদা, কখনো জিজ্ঞাসা করে না। বাণী মনে করে সাতুদা বিবিদিদির জীবনে প্রথম পুরুষ। হয়তো ওর বাবার মন ভেঙে যাওয়ার জন্যেও দায়ী। বিবিদিদি মাথা নাড়লেন। বাণী এত ভুল বোঝে কেন?

এখন সাতুদার মুখ আর কিছু মনে পড়ার না। সেই ভীষণ বন্ধুতা, দুঃখ, আবেগের এখন কিছুই অংশীদার নেই। যদি কিছু থাকে, সেই একদিনের ভালবাসা, এখন আরেকজনের প্রতি যেমন হয়ে গেছে আচ্ছন্ন। অনেকদিন ধরে ভালবাসা যায় না, কেননা ভালবাসা মরে যায়। কিন্তু, যখন আর বিশেষ অনেক অনেক বছর বেঁচে থাকতে পারবে। পেটে আসিড হত বলে বিবিদিদির মার পেটের আঁত খুঁড়ে গিয়েছিল। আসিড অথবা ক্ষার যে পাতে থাকে, সে পাতকেই পোড়ায়। বিশেষভাবে বিবিদিদির অনেক বছর ধরে পড়িয়েছে। বিবিদিদি আস্তে মাথা নাড়লেন, চশমার কাচ মুছলেন। সাতুদা এক সময় ও'র চেয়ে চার-পাঁচ বছরের বড় ছিল, কিন্তু এখন ও ও'র চেয়ে বছর তিরিশের ছোট। ঠিক এমনি ছোটই থাকবে সাতুদা, ওর বরস কোমরদিন বাড়বে না।

বাণীর চেয়েও ছোট! মনে করতেই বিবিদিদি হঠাৎ হাসি পেল। আজকাল ও'র মাঝে মাঝে ভীষণ হাসি পায়, হাসি ঢেপে বাঁধতে কষ্ট হয়, কিন্তু হাসতেও কষ্ট হয় ভেতরে আর হাবল তো বলে ও'কে হাসতে দেখলে না কি অন্যদের অস্বস্তি হয়।

হাবল বলে, 'তোমার হাসতে কষ্ট, আমার না হাসলে কষ্ট, অন্যদের কেষ্ট, এত কষ্টের দরকার কি বিবি?'

এখন বকের পাশে আবার খুঁজতে বাধ্য হল। এই সংসারলোই বিবিদিদি বাধ্য কমবার বাড়ি খেলেন। তারপর টানা বন্ধ করলেন।

এখন বাবার কাছে যেতে হবে।

পশ্চিমদিকে যেতে হয়। অন্ধকার পাসেজ, তারপর তিনটে সিঁড়ি নেমে বাঁদিকে ঘুরে বিবিদিদির বাবার ঘর। ঘরে ঢোকবার আগেই একদিকে কোলাহলো বাঘের মাথা, অন্যদিকে ভালুকের মাথা দেখা যায়। দরজার ওপর একটা বিরাট ধনুক কাঠের ট্র্যাকেটে রাখা। বাবা ধনুকটা দিয়ে এসেছিলেন।

ঘাতে একটা চড়া তালো দরজার ওপর জ্বলে। বাঘের কাঁচের চোখের ওপর ফুফু করে মথ এসে বসে। বাণী বলে একজি-বিশালিজম। এখন আর বিবিদিদির বাবার এই সব লোকদেখতাই দেখে বাড়ীর লোকদের হাসি পায় না।

কোথাকার বাঘ কে মেরেছিল, এই একটি প্রশ্নের উত্তরেই বাবা ও'র মাটিকে গলার বলতে আরম্ভ করেন, 'সেই সাইটিশ সালে.....'

আগে বাড়ীর লোকরাও হাসত, কইরের লোকরাও হাসত। বাড়ীর লোকরা এখন আর হাসে না কেননা বাবার দরস আশী হল। একই লোকের একই ঘটনা নিয়ে তিরিশ বছর ধরে হেসে চলা বড় পরিগ্রামের ব্যাপার। বিবিদিদির এখনো হাসি পায় অবিশ্যি, কিন্তু ও'র হাসি দেখলেই তো লোকের অস্বস্তি হয়, কি জ্বালা।

বাবার এই ঘর বাঘ-ভালুকের মাথা আর বাটন সাঁওতালের তাঁর-ধনুক দেখে অনেকদিন আগেই সরমা বলে গিয়েছিল 'উপশয়।' উপশয়?'

গোপন ঘটি। মগয়ার আগে বাঘেরা যেখানে অপেক্ষা করে।'

'মা' হাবল আস্তে বসেছিল।

'উনিও অপেক্ষা করছেন, কি চল বিবি?' সরমা কি মনে করে কি কথা বলে তা যে কোন লোকের পক্ষেই বোঝা মুশকিল।

কিন্তু সেই থেকেই বিবিদিদির অনেক সময়ই কথাটা মনে হয়। উপশয়। বহু বছর ধরে পরিভাষ্য একটা পোড়ো শিকার ঘটি। আর বাবা এক বৃদ্ধ শিকারী। বে-আইনী শিকার করে করে বিনি জগৎজের জন্তু খতম করে দিয়েছেন। অপরাধের ফলে দারোগা বাঁর বন্ধকে কেড়ে নিয়ে গিয়েছে।

'সবচেয়ে আশ্চর্য' হন বাবার ঘর বলতে গেলে বাণীর ঘরের পাশেই। কিন্তু মাঝখানের দরজা খুলে বাতাসে তরবার পথ কাট। পেরেক মেরে বন্ধ। তাই, বাবার কাছে আসতে গেলে এই সুড়ঙ্গ পেরিয়ে তিনটি সিঁড়ি নেমে তবে আসতে হয়। বর্তমানে বাবা নখ-নস্তহীন। তাঁদের সর্বভারতীয় বিপ্লবের প্রাচীন পরিকল্পনাটির প্রয়োজন বিশ বছর আগেই ফুরিয়ে গিয়েছে। অতএব আর কোন শত্রুঘাটি দখল করবার ও রক্ষা করবার প্রয়োজন যদিও এখন শেষ, তবে, গুরুত্বপূর্ণ, সতর্কতার বাবা এখনো একটি দুর্গই আগলান, তাঁর প্রাইভেসি, তাঁর একান্ত জগৎ। এ দুর্গের দরজা বন্ধ হাইয়ের লোকদের জন্যে 'সুস্বাগতম' লেখা পাগোষ পাল থাকে, কিন্তু বাড়ীর লোকদের বেলা বেজার কড়াকাড়।

গম্ব, ও'র বন্ধুত্ব বাণী কিন্তু সময়ে বলে, 'মাঝখানের দরজাটা খুলে ফেল

ও'কে বাইরের কোমরে টেনে আন মা। আসলে উনি ঘরে গিয়েছেন কিন্তু তুমি এখনো খবরটা জানতে ভয় পাও। না কি তোমারও ভাল লাগে?'

কি ভাল লাগে? বাবা কি বলতে চর? আশী বছর ধরে বাবা নিজেই তাঁর একটা চেহারা তৈরী করেছেন, লোককে দেখাবার মত।

'ভেঙে ফেল।' হাবুলও বলে।

কিন্তু কেমন করে? যাবা বলে তারা কি জানে বিবিদের হাট ডায়ালসেটে, পেটে আলসার, গড়ে কুম হর না, তাছাড়া শরীরের চেয়েও তাঁর মন এখন ভাঙা, ক্লান্ত? তাঁর একবার পকেট অসম্ভব। বিবিদি মাথা নাড়লেন। দরজার সামনে আসতেই দেখতে পেলেন শেতলের ফুল-শালীতে রক্তের মত টকটকে লাল বগুন-ভিলিয়া। হলান্দ পদীর গায়ে লাল বগুনভিলিয়া জলজল করছে। দেখেই হৃদয়ে গারলেন নিরাপদর কাজ।

ভারী মন খারাপ হয়ে গেল, একটু নিচু হলেন। চার বছর ধরে বাবা একটু-একটু করে গাছটাকে বড় করেছে। তিন-চারবার তিন-চার রকম মাটি ফেরাসে হয়েছে, এ বছরই প্রথম ফুল এসেছে।

এই বগুনভিলিয়া কেন? বাবার জন্ম-দিনের ফুল চাই তো নিরাপদর কয়েক পা ছোট্ট লোকবাজারে চলে যাব না কেন? সেখানে তো ফুটপাথে সকাল-সন্ধ্যা কালচে লাল গোলাপ, কোকাসমুখ শিমুদের মত বাইরের পাশাড়া শকুন সাপা পশম, বাসরে রাখাবার রজনীগন্ধা বড় চাও তেত পাওয়া যায়। বাবার জন্মদিন আজও নিরাপদর কাছে এত বড় কেন, এবার বিবিদি ফুল জানালার কাছেই বাগীর গাছ ভেঙে নিরাপদ ফুল নিয়ে আসবে? নিরাপদ পরবর্ত্ত তাঁর দলে নয় তাহলে বিবিদি একা কি করে বাবাকে মাঝখানের দরজা খুলে দাঁকনের ব্যাগদায় নিয়ে যাবেন?

বগুনভিলিয়ার পাশাড়া এখন খসে যাচ্ছে, এ ফুল থাকে না নিরাপদ, বিবিদি মৃদু ভাবনা বলালেন। তারপর বাবার হয়ে চুকলেন।

গম্ব, বরষের গম্ব, বরষের গম্ব, পুরনো! ঘি আর হাঁপানির ইনহেলারের গম্ব এ বরষের বাতাস থেকে বেগুন না। এখন 'মেক্সিকো'র কাঁজলো গম্ব ছাঁপিয়ে বরষের গম্ব নাকে এল। নিরাপদ বংশ ভুলিয়ে দিয়ে গিয়েছে।

বরষা আসলে এখনো বাবার চোখ অত্যন্ত সজীব উটকটে। সাদা চুল, হাবুল পড়া কপাল কিন্তু ভুরু এখনো কালো, লোমশ, মোটা। জেম্মী বালাপোষ শরীর ঢাকা। জেম্মী নামী বালাপোষ ছাড়া আর কিছু এখন ও'র গায়ে নয় না। বিবিদি চেয়ার টেনে বসলেন। বাবার খুব কাছে বসতে ও'র ভাল লাগে না, বেধেই অনেকদিনের অনভ্যাসের জন্যে।

পালার টেবিলে চিঠিপত্র, খবরের কাগজ, বিবিদি বছরে পারলেন বাবা রাগ গান্ধীনাতে ঢেঁলি কয়েকটা তাই... হাবুল বলতে সময় নিলেন।

হরিকেশ চৌধুরী ঘেসেই গভীর অসন্তোষের সঙ্গে কিছুক্ষণ ধরে দেখলেন।

'আজকের কাগজ দেখেছ?'

'দেখেছি।' বিবিদির গলা শান্ত।

'দেখেছ?'

'এ বাড়ীতে খুঁটো করে কাগজ আসে।' বিবিদির সর্বশেষ মোটা কম্বলের লেগের মত রাগ খর-খর করে উঠল। মুখের ভেতরেও কোন কম্বলের লোম ভরে যাচ্ছে, গলা শকুনো। কিন্তু নিজেকে তাঁর রীতিমত বকস কম মনে হল। বগড়া হবার আগে আর পরে খারাপ লাগে কিন্তু বগড়া কববার সমস্যাটা বিবিদি বকে খুব সাহস পান।

'ব্যাপারটা কি?'

'বিক্রয়ের ব্যাপার?'

কাল সন্ধ্যার কথা কিছু লেখা নেই কেন? হাবুল কোথায়, অপদার্থটা! হ্যাঁ। লেসার অটোবাস বাবার জন্মদিন বটে কিন্তু আজ গান্ধীজীর জন্মদিন। আগে আগে যখন গান্ধীজীর জন্মদিন উপলক্ষে ছুটি হত না তখন বাবার জন্মদিন দোসরা অটোবাসেই করা হত। কিন্তু এখন বহুদিন ধরে তেসরা অটোবাসই বাবা ফুলের মালা-গিলা করেন।

'হাবুলকে আমি বরণ করে দিয়েছি।'

'বরণ করে নিয়েছে?'

বাবার মুখ লাল হয়ে গেল। ভাগ্যে ও'র হাই রাউন্ডের নেই, তাই বকে। নইলে এখনি হরতো শিগা ছিঁড়ে যেত। কিংবা যেত না। বাবার শরীর অত্যন্ত মোটা এবং মজবুত মান-মশলায় গড়া। তাছাড়া গত বিশ বছর ধরে ও'র দেহকে অত্যন্ত তোমাজে রাখা হয়েছে।

'কেন বরণ করছে জানতে পারি কি?'

বাবার গলা আবার খাদে নেমেছে। কিন্তু এই শান্ত এবং সংযত গলাকে বিবিদি চেনেন।

'আমি জিগেস করছি বাবা...'

বিবিদির গলা একটু কেঁপে গেল। এত বছর বাবে এই প্রথম মুখোমুখি বসে খোলাখুলি কথা। ও রকম করে মুখোমুখি আর কতবার হতে পারে মানব। ব্যুতনকে বাহা মেরেছিল, কিন্তু সামাজিক শৃঙ্খল, চিন্তা শিকার করলেও আসল বাবের সঙ্গে তো ব্যুতন ও'র একবারই মুখোমুখি হয়েছিল।

বিবিদি দেখতে পেলেন বাবার চোখ দপদপ করছে।

এ পরিবারে স্নেহ নিশ্চয়ামী নয়। বাবা তাঁকে স্নেহ করতে পারেননি, চিন্তাও বাগীকে স্নেহ করতে পারেননি বোঝায়। কিন্তু বাগীর জন্যে নয়, আজ নিজের জন্যেই বিবিদিকে কথা বলতে হবে।

'আমি তোমার জিগেস করছি বাবা, আজ এতদিন বাবে এবারকার জন্মদিন তুমি এত কম নোটিশে এতবড় করে করতে চাইলে কেন?'

'করতে চাইলম মানে?'

'মানে তুমি জন্ম দাও?'

'না, আমি জানি না।'

'হাবুল তোমাকে সব বলেছে।'

'কি বলেছে?'

'বলব, সব বলব।'

'আমার জন্মদিন আমি... হাবুল এই কথা বলছে?'

'না। হাবুলের সঙ্গে তুমি কি কথা বলতে, কেন গত তিন মাস ধরে হাবুল এত ব্যস্ত ছিল তা আমি জানতাম না।'

'আমি আমার আত্মজীবনী লিখিনি। হাবুল মনে করে আমার সম্পর্কে বেশ বা জানে তার চেয়েও বেশী জানা উচিত।'

'তোমার সম্পর্কে' নতুন করে ভাববার বা জানাবার কি ছিল আমি জানি না বাবা।'

কেননা, বিবিদির এখন বলতে উড়ে হল বহুদিন তুমি লোকের চোখের সামনে ছিলে। তোমার প্রত্যেকটি কাজ, চিন্তা, ব্যবহার, লোকের চোখের সামনে/ভুলে থকা হত। এখন অনেকদিন তুমি কানে সামনে নেই। কেননা তুমি এখন একটা ভেঙে চাপটার। শান্ত হয়ে একথা মনে নিতে হয়তো তোমার কষ্ট হবে কিন্তু মনে নিতে পারলে সকলেরই ভাল।

সকলের ভাল? বাগীর ভাল, বাগীর, বনবাগীর। কোন কোন সময়ে অবসর নিয়ে হর বইকি, অন্যকে ভাবনা ছেড়ে নিতে হয়।

'তুমি জান না! দেখ বিবি, এটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। এ নিয়ে তুমি মাথা ঘামাও না।'

'আমার ব্যক্তিগত প্রতিটি ব্যাপারে তুমি এত বেশী মাথা ঘামিয়ে বাবা, এত বেশী চিন্তা করছে, যে আজ আমাকেও তোমার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে হচ্ছে।'

'তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে?'

এখন হরিকেশ চৌধুরীর নাকের পাটা কুলে গেল, মুখের হাড় শক্ত হয়ে উঠল।

'তুমি ভুলে যেতে পার বাবা, আমি ভুলে বাইনি।' বিবিদির গলায় কোন কড় বহরের জমানো কড়া হাছাকার করে উঠল। ভোলেননি বিবিদি, সাতুদাকে ভোলেননি। বিবি একবার তুমি হ্যাঁ বল, আমার তোমার মধ্যে কোন রক্তের সম্পর্ক নেই। তুমি হ্যাঁ বল বিবি, আমি তোমাকে নিয়ে দূরে চলে যাই। তারপর সেই মৃদুস্বপনের রাত। সেই ভরস্কর রাত।

একটি রাতের ঘটনা হরিকেশকে 'শেখ-গোয়ব' খ্যাতি দিয়েছিল, রাতারাতি তাঁর নাম জগতের আগমনের মত ছড়িয়ে পড়েছিল।

একটি দৃশ্যকর্ষনের রাত। সে রাতের পর যখন সকাল হল তখনো সাতুদা রীচীর বাংলাবাড়ীর ছাতে।

গরমকালে ছাতে শোওয়াই নিয়ম ছিল, সবাই শূত। সাতুদা যে ঘুমোচ্ছে না, ওরকম অস্বাভাবিক বাড়া খুঁকিয়ে যে কেউ ঘুমোতে পারে না সেটাও অনেকক্ষণ ধরা পড়েনি।

তখন এপ্রিল। বগুনভিলিয়ার মাস। ভোরে বাতাসে বগুনভিলিয়ার লাল পাশাড়া ছাতের ওপর ছড়িয়ে পড়েছিল।

সেইজন্যেই কি বিবিদি টকটকে লাল বগুনভিলিয়া শান্ত হয়ে দেখতে পারেন না? দেখলেই বকের নিচে শকুনো পাড়া সবে গাওয়ার মত খণ্ডখণ্ড সরসর করে নিশ্বাস ফেলে কি? কেন সবে যেতে থাকে? এবে একদিনের জীবন, একদিনের কল্যাণ, এক

দিয়ে দৃষ্টি, কিসের ব্যাধি অমন করে সরে যায়? এখন আর ব্যাধি তীব্রতা নেই, ইচ্ছে করলেও সেই বরষা ফিরে যেতে পারবেন না বিবিদি।

তবু আছে, বাধা আছে, নইলে কেন আজও রাতে কেবলই ঘুম ভেঙে যেতে যায়?

‘কি ভোলানি বিবি, তুমি কি বলতে চাও?’ বাবার গলা শুক, চাপা।

‘কিছুই ভুলিনি।’

‘অকৃতজ্ঞ মেয়ে!’

হরিকেশ চৌধুরী প্রায় চোঁচিয়ে উঠলেন, ‘মানুষ সন্তানের কাছে সাহায্য পার, মানুষ না পার, তুমি, তুমি আমার জীবনে একটা অভিযান। তোমার মা তোমাকে এইরকম করে তৈরী করে রেখে গিয়েছেন।’

‘শুধু সন্তানের দেবার থাকে না বাবা, বাপ-মাকেও ভালবাসা দিতে হয়।’

‘দেওয়া হয়েছিল, যথেষ্ট দেওয়া হয়েছিল। আমার জীবনে তখন এত সময় ছিল না যে তোমাদের নিয়ে... আশ্চর্য!’

বাবা ভীষণ আহত হয়েছেন। মেয়ের জন্যে কি কি করেছেন মনে করতে গিয়ে হঠাৎ একটা ছোট শাড়ীর কথা মনে পড়ল। মল্লিক রত্নের বেনারসী শাড়ী। বেনারস থেকে এনেছিলেন। কিন্তু বিবিকে তো নয়, সেটা বোধহয় সরমাকে না চানেকীকে কাকে ফেন দিয়ে দিয়েছিলেন। বিবিকে নিশ্চয় অনেক কিছু দিয়েছেন, এখন রাগের মাথার কিছু মনে পড়ছে না। ‘কি আশ্চর্য!’ ওর স্বভাবের কোথার একটা বাকানো, পাঁচানো বিকৃতি আছে, সেটা তার শোধগাল না।

‘সে সব কথা থাক!’

বিবিদিও আহত হয়েছেন।

‘তবে কি, কথাটা কি! হাবুল বলেছিল, অনেকের আগ্রহও ছিল, এবার জন্মদিনে একটা বিশেষ থাকবে...’

‘তুমি বলবে তুমি কি কারণে ‘দেশ-গৌরব’ হয়েছিল, এই তো!’

‘ও ইয়েস!’

এখন হরিকেশ হাসলেন। এত স্নানের মাঝে রাস্তাঘাট হল, বই বেরিয়ে গেল, তার নাম নিয়ে যদি এতদিনে কেউ কিছু করতে চায় তাহলে তিনি বাধা দেবেন কেন?

‘তুমি বেগমপুরের কথা জানাতে চাও?’

‘হ্যাঁ।’

‘এতদিন জানাওনি কেন?’

‘এখন আমার বরষা হয়েছে সুনীতি। আমি যে কোনদিন মারা যেতে পারি।’

‘সেজন্যে নয়।’

কেননা প্রতিটি ঘটনাই অনেকগুলো দিক থেকে। এক-একজন তাকে এক-এক চোখে দেখে। উনিশশো বত্রিশ সালে বেগমপুরে যা ঘটেছিল তারও তিনটে তিনটে কেন চাপটে দিবরণী আছে। সত্যীনাথ সেন, বলজাপী, সে মারা গিয়েছিল। অতএব সে কি জানত তা আর জানা যাবে না।

সাতুদা জানত। সাতাফি। কিন্তু সাতুদা আত্মহত্যা করেছিল তাই তার দিবরণী

কিন্তু সত্যীনাথের শ্রী মনোরমা বেঁচে ছিলেন, এই সোঁদনও বেঁচেছিলেন। হরিকেশ বেঁচে আছেন।

‘তবে কি জন্যে?’

‘মনোরমা সেন মারা গিয়েছেন বলেই কি তুমি এতদিন পরে মৃত্যু খুলতে চরোঁছিলে?’

‘বিবি চুপ কর।’

না বাবা, আমি চুপ করব না। হাবুল কেন সরে গেল তা তো তুমি জানতে চাইলে না বাবা।’

‘আমি ওকে ফোন করব।’

‘মনোরমা সেনও চুপ করেই ছিলেন। কিন্তু তারও একটা ভাঙ্গানি ছিল বাবা, বেগমপুর সম্পর্কে।’

‘মনোরমা! মনোরমা কথা দিয়েছিল...’

‘তার কথাগুলো তিনি লিখে দিয়ে গিয়েছেন বাবা। হাবুলকে দিয়ে গিয়েছেন।’

‘বরোঁছি।’

তাহলে তিনি হাবুলকে ফোন করবেন। হাবুল তার কথা শুনবে, তাঁকেই বিশ্বাস করবে। একদিন কি করেছিলেন না করে-ছিলেন সেইজেনোই হাবুল তাঁকে শ্রদ্ধা করত না তা হরিকেশ জানেন। হাবুলকে তিনি তার চরিত্রের দুটো দিক দেখতে দিয়েছিলেন। একটা হচ্ছে তার এই দীর্ঘদিনের নীরবতা, তার সংযম, নিজেকে ভাঁড়িয়ে নাম না কেনকার সংযম।

আরেকটা হচ্ছে তার বিচিত্র, অতি বিচিত্র জীবনের নানা অভিজ্ঞতা। শিকার করেছেন, আদিবাসীদের গ্রামে গিয়ে বাস করেছেন, জঙ্গলের ঠিকানারী করেছেন। হাবুলেরও মনে হয়েছে হরিকেশ মরে যাননি, তিনি জীবন্ত, আশ্চর্য জীবন্ত।

হাবুল ওকে বিশ্বাস করবে। হাবুলের কাছে থেকে, অবশ্য হরিকেশ সেই স্মৃতি পেতে পারেন না, যা একদা সাতাফি তাঁকে দিত। হাবুল কেন, এখনকার কোন ছেলেই ছোঁখ-কান বড় কারকে নিজলা ভাঁড় করে না। অকপটস্বী ছেলেদের স্মৃতি ভাঁড়, তার প্রতি মোহ, এ তার চিরদিন প্রয়োজন হত। মনের নেশার চেয়েও রক্তকে তাতিয়ে তুলত, তাঁকে বাঁচিয়ে রাখত। হাবুলকে তার প্রয়োজন, এক সময়ে সাতাফিকে প্রয়োজন হত। সত্যীনাথ, সত্যীনাথও তাঁকে বিশ্বাস করত।

‘আমি হাবুলকে ফোন করব।’

‘না।’

বিবিদি উঠে দাঁড়ালেন। ভরানক কষ্ট হচ্ছে তার, বকে বাধা করছে। পেঁথিভ্রম ইঞ্জেকশন নিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে পারলে বেশ হত, কিন্তু এখন ঘুমোবার সময় নয়। তাছাড়া তার বাধাতে না কি পেঁথিভ্রমও চলে না।

‘অনেকদিন মানুষের চোখের সামনে থেকেছ তুমি, অনেক ফুলের মালা পরেছ।’

ফুলের মালা পরতে কি অস্বস্তি হয়, তারে গাধা হলে গলার চামড়া খসে পড়ে।

‘আর কেন বাবা। এবারকার জন্মদিনে তুমি যে যে কথাগুলো জানাতে চাও, যার অনেকখানি লোকে একদিন বিশ্বাস করেছে, আমার ভুলেও গিয়েছে, তুমি জান কি না

জানি না, আমি জানি তার সবটুকু সত্যি নয়।’

‘বিবি।’

‘মিথো, মিথো সব বাবা। এমন কি বাঘের চামড়াটাও মিথো, শুটুন স্তম্ভারই দোষে মরোঁছিল। মানুষ হিসেবে এত অসম্পূর্ণ হয়ে অসাধারণ, মানুষ হিসেবে তুমি নাম জাহির করে যেতে চরোঁছিলে বাবা, সেইজেনোই আমি এবার জন্মদিনের উৎসব বন্ধ করে দিয়েছি। এর পরেও তুমি যদি কাউকে ডাক, তাহলে আমি ওদের সব কথা বলে দেব।’

‘বিবি, তুই পাগল হয়ে গেছিস।’

হরিকেশের দৃষ্টি হল। বিবি তার জীবনের একটা লজ্জা এবং পরাজয়। চেহারা সাধারণের চেয়েও সাধারণ, বরষার আগেই বড়িয়ে যাওয়া, রুগ্ন। কিন্তু মাথাখারস না হলে এত অপ্রকৃতিস্ত কি হয়? তার শরীরে এবং স্বভাবে এতই প্রবলতা ছিল যে বহু সন্তান, বিশেষ করে ছেলে চরোঁচলেন তিনি। কিন্তু বপালে ঐ এক মেয়ে। ভগবানের অথবা ভাগ্যের ঠাট্টা।

‘হাবুল আসবে না।’

‘তুই বাণী আর হাবুলের কথা ভেবে আমার ওপর...’

‘সাতুদাকে কি তুমি ভুলে গেলে বাবা?’

বিবিদি উঠে দাঁড়ালেন। বুকের বাঁশিকে কি চিনচিনে বাধা। অপচয়, কি বিরটি অপচয়। আজ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে সাতুদা বাঁচির বাড়ীর ছোটছোটে শুরুর আছে। বাবাই তাকে ভুলে গিয়েছে কিন্তু বিবিদি ভোলেননি। তার নাম ভালবাসা নয়, ভালবাসার চেয়েও বড়, প্রেমের চেয়েও অল্প, এক প্রবল, প্রচণ্ড অভিজ্ঞতা। একদিন বিবিদিকে বড় করে দিয়েছিল, বড়ো করে নিয়েছিল, বকে ভেঙে দিয়েছিল।

বুকে বাঁ হাত রেখে, প্রায় টলতে টলতে বিবিদি বাবার ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। বাবার ঘর থেকে তার নিজের ঘরে যেতে হলে বার-বার এই অশুকার সড়ুগা পেরিয়ে যেতে হয়। দু’পাশের ঘরের ঘর হাতড়াতে হাতড়াতে যেতে হয় আর বুকে যখন এ রকম বাধা থাকে তখন মনে হয় আর যেতে পারলেন না, আর নিজের ঘরে অথবা বাণীর কাছে পৌঁছানো হল না। হাবুলকে সাবধান করতে হবে। বাবাকে নিয়ে যারা বেশী মেতে ওঠে তারা কেন ফন শেষপর্যন্ত বাঁচে না। বাবা কোন না কোনভাবে তাদের নষ্ট করে ফেলেন।

হরিকেশ নিরাপদকে ডাকলেন। হাবুলের কোন নম্বর দিলেন। বললেন, ‘আধঘণ্টা বাদে ফোন করবি। বলবি আমি ডাকাছি।’

সুনীতিকে সরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু মনোরমা কি বলে গিয়েছে হাবুলকে? অস্বস্তি, কি অস্বস্তি। মানুষকে দেখ, শেষ অবধি চেনা যায় না।

নইলে পঁয়ত্রিশ বছর চুপ করে থেকে মনোরমা মৃত্যু খুলল, আর তাও হাবুলের কাছে? হরিকেশ ঘন ঘন ‘বোঁভিজা’ টানতে লাগলেন। নিশ্বাসের এই কুটুং হাড়া শরীরের আর কোথাও হরিকেশ বিশেষ বড়ো হননি।

হঠাৎ হারিকেশের মনে হল সুনীতির মেয়ের কথাটা জিগসাস করা হয়নি নিরাপদকে। হাড়টোড়া, শব্দ, জেদী আর এক-গুয়ে। জাস্ট লাইক সুনীতি। এমন একটা মেয়ের জন্ম দিন যার দিকে তাকাতে পর্যন্ত ইচ্ছে হয় না হারিকেশের। একমাত্র ওরই হেতর দিয়ে তার নাম বেঁচে থাকবে। এ কথা মনে করতেও কি কষ্ট? বাণী ও'কে দেখাত পরে না সে কথা হারিকেশ ভাল করেই জানেন। বাণীর প্রতিও ও'র বিন্দুমাত্র স্নেহ নেই। বাণীর চোখ দেখলে ও'র সবচেয়ে অস্বস্তি হয়। বাণীর চোখ ওর বাবার চোখের মত। অবিকল। বাণী না হয়ে হাবুল যদি ও'র নাতি হত? সুনীতির বদলে সরমা যদি ও'র মেয়ে হত? রাজনীতি বা সাহিত্য বা যে-কোন কৌরবারের পক্ষে একটি স্নেহপরায়া সন্তান সন্তান থাকা দরকার। ভাল স্বামী বা ভাল প্রেমিকের চেহারার এদেশের মানুষকে বেশীদিন আকৃষ্ট করা যায় না। কিন্তু তার মত পার্শ্বলিক কৌরবার বাদে, তাদের পক্ষে বড়ো বরসে নির্ভর করবার মত একটি সন্তান থাকা ভাল।

বহুজনেরই থাকে। ছেলে না হলেও ক্ষতি নেই। মেয়েবা পর্যন্ত ব্যক্তিগত গাঁবন, স্বামী-সন্তান-সংসার সব ফেলে দিয়ে বিখ্যাত এবং বাক্য বাবাদের ডান হাত হয়ে ঘোরে। হারিকেশের কপালে সে সুখ নেই। ভাল পিতা তিনি কি করে যেন সন্তান যদি বিব হয়?

মতামত, অসম্ভব মতামত প্রতিটি বিষয়ে, একেবারে ছোটবেলা থেকে। ওর ছোটবেলাটা উনি ব্যস্ত থাকতেন। কিন্তু সুনীতির মার কি উচিত ছিল না দেখা মেয়ে হাতে বাবাকে প্রশ্নাভক্তি করে?

বিশেষ করে বাবা যখন হারিকেশ। বিবি এ কথা ভেবে দেখে না কেন এই বাংলাদেশে, যেখানে মানুষ কাজকেই বেশীদিন গ্রন্থা করে না, যেখানে মহাপুরুষদের নামে আজ কেবলো খেয়াল, সেই দেশে আজ এত বছর ধরে তার নামকে কেন কলঙ্কিত করেনি, তার কোন গোপন কেরি বের করেনি সেটা কত বড় কথা?

বিবি বলে গেল সতীনাথের হত্যার ব্যাপারে মনোরমারও একটা নিজস্ব ভাষণ আছে।

থাকবে, জাশনু থাকবে। তা যে থাকবে তা কি হারিকেশ জানেন না? এখন না হয় বিন্দবের, সন্দাসবাদের, সমস্ত এবং অহিংস-অভ্যুত্থানের নামে মানুষ ঘামে না। এখনকার মানুষ না হয় কোনমতে বচিবার চেষ্টায় ক্যাপা কুকুরের মত হনো কিন্তু একসঙ্গে তো দিনকাল অনারকম ছিল।

যখন সম্যাসবাদী হওয়া, রাজনীতি করা গবেঁধ কথা ছিল? তখনো একটি ট্রেন বোমা পড়লে, একটি সাহেব অথবা পুলিশের লোক মরলে, নিজেদের মধ্যেই কতরকম জাশন শোনা যেত। সেইজেনোই তত ফুলবাড়ী টেকারী লুট মামলার এগারো-জনের মধ্যে আটজনই বেঁচে আছে, অথচ তিনজন তিনরকম জাশন-এ বই বের করল। হুজুর ওরা কেউই মিথ্যে বলে না, সত্য

জিনিসটাই পায়ার মত, অশ্বির, চপল। তার স্নেহ শব্দ ও শ্বারী চেহারা নেই।

হারিকেশ জানেন, সবই জানেন। দীর্ঘদিন তিনি চুপ করে আছেন, চুপ করেই থাকতেন। মানুষের চোখের সামনে এখন আর হারিকেশ চৌধুরীর নতুন কোন পরিচয় নেই। হাবুলের কাছে তো কই কোন কথা তিনি লুকোননি।

কয়েকদিন আগে তাঁদের কথা হয়েছিল। সুনীতিও সামনে বসে ছিল। শব্দ মুখ করে চারটে কাটা দিয়ে ভাস্কর্য গোলমালে দেখতে কি যেন হুনিছিল। হয়তো মোজা। উল-কাটা নিয়ে সুনীতির ও-রকম গভীর মনোযোগ দেখলে হারিকেশের দুঃখ হয়। পদ্মাল একামটা কোন বয়স না কি? একটা মেয়ে, সে বড় হয়ে গেছে, কাজ করে যাওয়াচ্ছে। তুই কুঁতড়ে বাবের মত লাকিয়ে বেড়া না কেন? উল আর কাটা, বস্ত্রতা সূতো আব গ্রাশে, কি বড়োটে কি জঘনা।

পদ্মাল একার হচ্ছে নতুন করে বাঁচার ব্যয়স। ছেলেমেয়ে বড় হয়ে যায়, সসারের চেহারাও গুঁড়িয়ে নেওয়া যায়, এই সময়ে নতুন উদ্যমে শ্বিতার যৌবনে প্রবেশ করা যায়।

হাবুলকে অবশ্য হারিকেশ সে কথা বলেননি। এই ঘরে বসেই কথা হাঁজল। কথা বলতে বলতে হারিকেশ নিটোল, স্মিট, সোনালী রসে টুন্টপে কমলালেবুর একটি একটি কোয়া তুলে গালে ফেলছিলেন। দেখেই বোকা যাঁজল বয়স বাই ছোক, উনিই এ ঘরের মধ্যে থাকে বলে তরুণতম। হাবুল বিশেষ করে মুগ্ধ হাঁজল। এ বকম তারিয়ে চেখে, উপভোগ করে কমলালেবু খেতে ও কাজকে দেখেনি।

“আমি কিছু, না হাবুল, ন্যাচারেলি মানুষ আমার ভুলে গিয়েছে। দেখ না, আমিই আমাকে ভুলে গিয়েছি।”

হারিকেশ শিশুর মত হাসলেন। সত্যি, আমি বড়োর প্রেমে পড়ে যাঁজ হাবুল ভাবলে।

“আমার অবাক লাগে.....” হাবুল একটু সম্পৃচিত।

“কিসে অবাক লাগে?”

“আপনি এত তরুণ রয়ে গেলেন কি করে।”

হারিকেশ শিশুর মত সরলতার হাসলেন। তারপর বললেন “কি জান হাবুল, এ দেশের লোক চাকরীতেও একস্টেনশান চায়, আবার মানুষের কাছে খাতিরও একস্টেনশান চায়। কবে লিখোঁছ, কবে কি করেছ, কবে সায়েব তাড়িয়েছ, এখনো সেজনে মানুষ আমাকেই খাতির লেখোঁছে চলবে?”

সুনীতি নির্বাক। যেন কটকটে সবুজ আর বেড়ালের লাজের মত ছাইরঙা উল মিলিয়ে মেয়ের মোজা বোনা গাড়া ওর অন্য কোন কাজ নেই মরেও তেরনি। একটু ঠান্ডা লাগলেই হাঁচিকানি। পারে গরমমোজা না পরে নাকি ঘামোয় না। নিরাপদর কাছে উনি সব থবর পান।

হাবুল কোন কোন সময়ে অতি ভাল-মানুষ। সহজে ওর মাথার কথা ঢোকে না।

তাই ও ব্যস্ত হয়ে বললে, “লেকি। উই মাস্ট অন্যর আওয়ার পাস্ট।”

“নিশ্চয় হাবুল। তবে অতীত বিষয়ে আমরা উদাসীন এ কথাটার ওপর বড় বেশী হার্প করা হয়েছে। জানলে? ও'দের অন্যর কর, মান দেখাও, বিল্ড দেম স্ট্যাচুয়। আই সে, স্ট্যাংগল না সিটি উইথ স্ট্যাচুয় অব ডেড মেন।”

“রিয়াসি।”

“তাতেই যদি লান্টি পাও তো তাই কর। বড় ডোনট, নেগলেকট, ইওর প্রেজেন্ট।”

“সেইজেনোই কি পরেশ কান্নাজাত...”

“হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওর লাদা হার্পারকে মেবোঁছিল দিনাজপুরে। চমৎকার হাকবাক খেলত যে। পরেশ বলছিল এ যে কি যেন রাস্তাটির অধিকাংশ না কি খতীনের নামে করে দেলে। আমি বললাম তার নামে আছে? ও বললে সতেরনের নামে। আমি বললাম নেক পরেশ, দূটো পাবলিক ল্যাভেটরী, একটা পেছপ-খানা, সম্ভাব্যে ফুটপাথে উনেনের বোঁরা, রাতে জুয়েথেনা, আর কয়েকটা মরা ফোঁপরা রেইনট্রি, এই তো রাস্তা। তা সতেননাবাবুকেই বা তোমরা কি অন্যর করেছিলে, অতীতকেই বা কি সম্মান দেবে। আমি তো বলি রাস্তাটা যদি রাস্তার মত হয় তাহলে একটা পাকা হাঙ্গরজাদার নাম থাকলেও আমার আপত্তি নেই।”

হারিকেশের এ বরনের শব্দ বাবহারে হাবুল চমৎকৃত গাঁজল। কেননা অনেক বড়োলোক আছে যারা জীবনভোর কতকাত করে, বড়োবয়সেও নোংরা এবং আলগা কথা বলতে ভালবাসে। হারিকেশ তাঁদের দলে পড়েন না। লোকটা সত্যিই চমৎকার।

হাবুল একটু হাসল।

হারিকেশ একটু হতাশ হয়ে বললেন, “বোধ হয় এদেশে তরুণ হওয়ার চেয়ে বড়ো হওয়া ভাল।”

“কেন?”

“বড়োরা স্টেজ ছাড়তে চায় না হে। গরম দেশ, শরীর তাড়াতাড়ি পাকে কিন্তু অন্যদিকে হয়তো এ দেশে দাঁখি পাকতে দেরী হয়। নাভালক আর কমে না। দেখগে, প্রতিটি ব্যাপারে, বারাই ওপরে আছে তারাই সস্তর বছরের বড়ো। এ দেশে মানুষ প্রথমে শিশু থাকে পরে বড়ো হয়। ইউথ থাকে বলে, সাবালক অর্থাৎ অ্যাডাল্ট ম্যানহুড এ দেশে আসে না।”

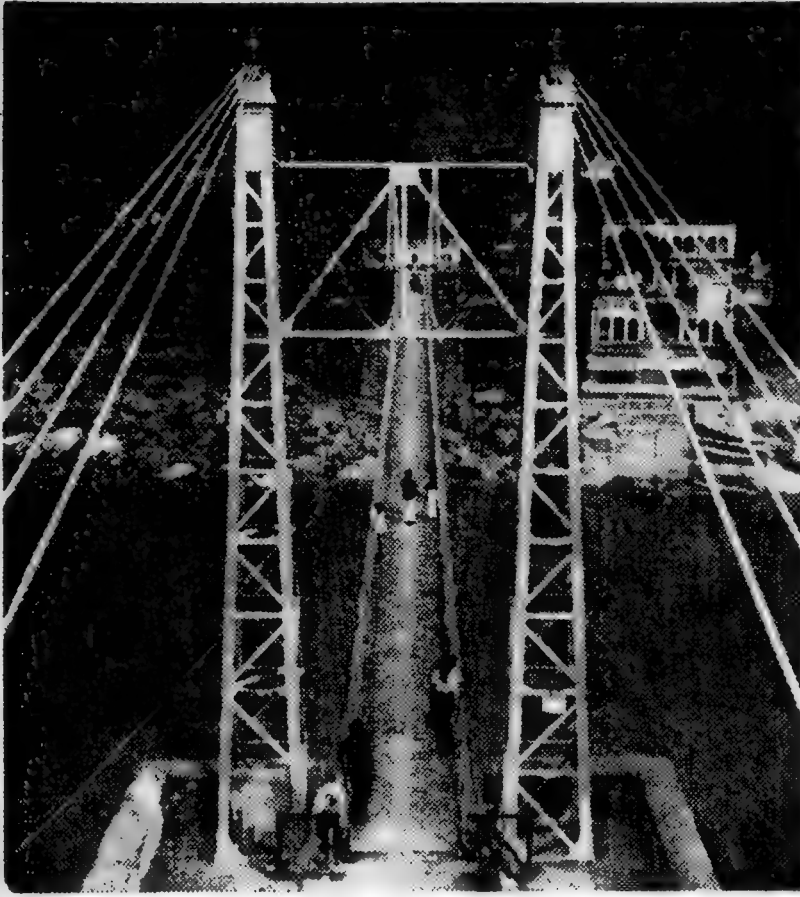
গলার স্বর এখনো স্মরণ। এ জাতি অল্পবয়সে আরো কত ভাল ছিল। হাবুল মনে ভাবছিল বিবি বাবার ওপর এত চটা কেন।

হারিকেশ হঠাৎ বললেন “জামি ঠিক সময়ে সরে এসেছি জান? সেইজেনোই বোধ হয় তোমরা আমার ওপর খুশী।”

হাবুল বলল, “আপনার কথা এক বিষয়ে আলাদা।”

“কিসে?”

হারিকেশ ধারালো ছোট ছুরি দিয়ে কলা টুকরো টুকরো করতে লাগলেন।



ছটো : সাগর সিক্ত

কজা। সবুজ খোসা, একটু কালচে, কিন্তু কি পুষ্ট আর মিষ্ট। শালিনী বলছিলেন নাগপুরে ওদের কলার বাগান আছে, 'বিত্তিকুল অয়েজারি টা'। হারি (মুসৌরীর ওয়েভার্লিতে পড়েই ও হরিকে হারি বলত) 'হু কম!'

শালিনী এমন করে বলত যেন মৌসুমী-পুরে দক্ষিণ-পশ্চিম বেতাল ফরস্ট রেঞ্জের পাশেই ওদের নাগপুরের কমলালেবু আর কলার বাগান।

"কাম হারি, কাম!" শালিনী অন্যর করে বলত। বেতালে টার্নে এসেছিল ওর শ্বামী, দস্তায়ে মাধোক কাভে। শব্দ নিরামিষ খেয়ে আর সময়মত পুজোপাট করেও একটা মানুষ যে কি পরিমাণ সাহসী হতে পারে, ঠাণ্ডা মাথা, তা ঐ কাভের মধ্যেই হরিকেশ দেখেছেন।

আশ্চর্য, আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। সতীনাথ নিহত। মনোরমা কোথায় কেউ জানে না, সাত্যিক আত্মহত্যা করলে, হরিকেশ শিকার করতে চলে গিয়েছিলেন বেতালে। ঐ বনেই গা-ঢাকা দিয়েছিলেন বলা চলে। সেই সময়ে কাভে আর শালিনী আর তিনি, আর হ্যাঁ, ভেতরে কোথাও ডাকবাংলার ফায়ারসেলসের উপর একটা জোলা পায়স বাচ্চার ছবিও ছিল। ওদের ছেলে।

সেই সময়ে শালিনী, শালিনী ঠিক মনোরমী ছিল না, কিন্তু বৌদি ও'কে বের

করে দিয়েছিল বাড়ী থেকে সেদিনকার কথা মনে আছে।

"নাগপুরের মাটিকে সান্ত্বনা সরল বলে হারি। কমলালেবু হয় তাই ভয়ানক চুনা, শক্ত মাটি। আমি নাগপুরেরই মেয়ে।"

কাভে জানত না, হয়তো কেউই জানেনি। হরিকেশের কোন কোন মনুষ্যের দুর্বলতা দেখেও শালিনী কিছুই বলেনি কাউকে। বলেনি যে, তার প্রমাণ পেয়েছিলেন হরিকেশ অনেক পরে।

কাভে আর শালিনীর বড় ছেলে আমি' অফিসার, পূর্বফ্রন্টে যাবার আগে ও'র সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। কেকিডাচুল, মাঝারি লম্বা, কটা চোখ, কাভের মত সর্বদা একটু একটু হাসে।

"আমি গোপাল দস্তায়ে কাভে। আপনি আমার বাবাকে জানতেন।"

ছেলেটি একটু হেসে বলেছিল "আমার বাবা-মা আপনার কথা বলে দিলেন। আপনি তো এখন বিখ্যাত লোক।"

"ও নো!"

কাভে আর শালিনীর ছেলেকে আপ্যায়ন করতে হরিকেশ বাসন্ত হয়ে পড়েছিলেন। নিরাপদকে বলেছিলেন "জানিস, ওর বাবা তখন গভর্ণমেন্ট অফিসার। তবু আমাকে আশ্রয় দিতে ভয় পাবনি একটুও। দারুণ খাতির করেছিল রে।"

গোপাল স্মিতমুখে হরিকেশের বাসন্ততা দেখাছিল।

"তোমার বাবা এখন কোথায় থাকেন?"

"বেলগাঁও।"

"মা ভাল আছেন?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি কি একা?"

"না। আমার আরো তিনটি ভাই আছে।"

"মা বাবা তাহলে খুব জড়িয়ে পড়েছেন বল।"

"না। ও'রা তো আশ্রমে থাকেন।"

"আশ্রমে?"

"স্বগীশ্রম-বেলগাঁও।"

"সত্যি?" হরিকেশের কি রকম অবাক লাগল। শালিনী আর কাভে। নিরামিষ খেত, পুজোও করত। কিন্তু ও রকম হঠাৎ বহু মরাঠাই করে। সবাই কি আর বয়স হলে স্বগীশ্রমে যায়? 'হয়তো ওদের উনি ঠিক চিনতে পারেননি। যদিও সে কথা মনে হলে ও'র খারাপ লাগে।

ছেলেটি কফি খেয়ে বিদায় নিয়েছিল। ও'কে দেখে হরিকেশের মনে এই বয়সে আবার দুঃখ হয়েছিল। জীবন মানে পুত্র-সন্তান। দস্তায়ে মাধোকের ছেলে গোপাল দস্তায়ে। কাভে চিরদিন ওর ছেলেদের মধ্যে বেঁচে থাকবে। এক অকৃতজ্ঞ প্রৌঢ়া মহিলা হরিকেশের মেয়ে। আরেকটি অচেনা গোমড়ামুখো শ্রমীলোক হরিকেশের নাতনী, তাবতে গেলে কি দুঃখই না হয়।

ইটাই মনে পড়েছিল সামনে হাবুল বসে আছে। সুদীর্ঘ কখন উঠে গিয়েছে।

"বুড়ো হয়ে গিয়েছি হাবুল। মন কোথায় চলে গিয়েছিল জান?"

"কোথায়?"

"বেতালের জঙ্গলে। জান বোধ হয় ওখানে সরলটেন্ট-এ দেখা গিয়েছে ভাত জাতের মহুরা হতে পারে, কিং-সাইজ।"

"মহুরা।"

"এ গ্রেট বুন। মহুরা মানে কি শব্দই লিকার হে? ওর বিচি থেকে তেল হয়, তেলটা সাবানে লাগে। শাসটার লিকার হয় দারুণ লাভ। কি বলছিলাম বল ত?"

"আপনি নয়, আমি বলছিলাম।"

"কি?"

"আপনার কথা আলাদা। কেননা আপনার রাজনীতির জীবনটা কিছুই না। অত্যন্ত সংকীর্ণ। তার আগে ও পরে আপনি প্রচুর সম্মান পেয়েছেন দেশবাসীর কাছ থেকে। আপনার পক্ষে ফ্রান্সিসান আসা সম্ভব নয়। সেইজন্যই হয়তো আপনি নিজের সম্মান নিয়ে চুপ করে থাকতে পেরেছেন।"

"আমি ঠিক সময়ে সরে এসেছিলাম হাবুল। আই হ্যাভ দ্য স্টেজ সেন্স।"

"আপনি বখেপ্ট সম্মান পেয়েছেন।"

"হয়তো। তুমি তো জান হাবুল, সবই জান।"

আজ দোসরা অকটোবর হরিকেশ চৌধুরীর সবগুলো কথাই মনে পড়ল। সব জানে হাবুল, তবু সবকিছুর পর এমন তি ঘটল যে মনোরমা সেনের করেকটা কথায় হাবুল চুপ করে গেল? নিরাপদ ও'কে ডেকে

মাথাধরা ?

২টো অ্যানাসিন খেলেই তাড়াতাড়ি আরাম

বেই মাথা ধরে অননি শরীর আনন্দান, অবসাদ আর ক্লান্তি। যেজান খিটখিটে হয়ে একটুতেই রেগে বেতেও পারেন। তকুনি দুটো অ্যানাসিন খেয়ে নিন—দেখতে দেখতে ৪-ভাবে হাতে হাতে ফল পাবেন:

- ১) অ্যানাসিন মাথাধরার ব্যথা সারাবে তাড়াতাড়ি
- ২) অ্যানাসিন ক্লান্তি দূর করবে তাড়াতাড়ি
- ৩) অ্যানাসিন অবসাদ কাটাবে তাড়াতাড়ি
- ৪) অ্যানাসিন অস্থিত্ব খোঁচাবে তাড়াতাড়ি

তার কারণ, চিকিৎসকের নিরাপদ ব্যবস্থাপত্রের মতই প্রতিটি অ্যানাসিনে একাধিক ভেষজ। অস্ত্র যে কোনো ব্যথা-উপশমকের চেয়ে এদেশে তাই সবচেয়ে বেশী চলে অ্যানাসিন।

এরপর যখনই মাথা ধরবে অ্যানাসিন খাবেন। অ্যানাসিনে সর্দি আর ইনফ্লুয়েন্সা, দস্তশূল আর গারের ব্যথাও সারে। হুতরাং অ্যানাসিন কাছে রাখবেন।

সব সময় দিতে বলবেন অ্যানাসিন।

অ্যানাসিন

চের ভালো
কারণ ৪ ভাবে
কাজ করে



Regd. User: Geoffrey Manners & Co. Ltd.

ASPIA-21R

আনন্দ সব বলবেন ওকে হরিকেশ, সব সত্যি কথা।

সন্ধান চুল্লীর বাক, হরিকেশ হাবুলের কাছে থেকে সেই আবিষ্কৃত, মোহাবিস্কৃত ভাঁজ চান যা একদিন সত্যিই তাঁকে দিত। এই একমাত্র দুর্বলতা তাঁর। ওদের মোহাবিস্কৃত ভাঁজ ও'র রক্তে রক্ত মদের চেয়ে অনেক বেশী কাজ করেছে এতদিন। যেন অ্যালকোহল প্রভাবে ও'র রক্তকে আগুনের মত জ্বালিয়েছে, সোনার মত উজ্জ্বল করেছে।

বিবি ও'কে সত্যিকার কথা বলল। সত্যিকার তিনি ভুলে গেছেন। সত্যিকার হরিকেশ চৌধুরী কেমন করে ভুলবেন? ও'র কথা মনে হলোই বেন আজও সেই বাধা, সেই নিদারুণ কোভ হাহাকার করে ওঠে। বাতাসের প্রতিধ্বনির মত। যদিও তেমন করে আর প্রতিধ্বনি জাগে না। বরষ হয়ে গিয়েছে তাঁর। শরীর ক্লান্ত, জীর্ণ। বহুদিন আগে হরিকেশ সাগরস্নেহে, শীতের রাত শেরশাহের সমাধিতে বাতাসের কন্ঠা শুনিয়েছিলেন।

বাতাস এখন কমে গিয়েছিল, কান্নাও ঘেমে এসেছিল। হরিকেশ এখন আর কোন সুখে বা দুঃখেই তেমন করে বিচলিত হতে পারবেন না।

তবু সত্যিকারি কি নিদারুণ অপচয় কি বিরাট ক্ষতি। তাঁকে ভালবাসত বলেই সত্যিকারি আত্মহত্যা করেছিল। কিন্তু কেন সে তাঁকে লিপ্সুরের প্রতিভা মনে করত, কেন তাঁকে মানুষ, সামান্য, সামান্য মানুষ কেনে অতবড় আঘাত পেল। ভাবতে গেলে এখনো হরিকেশের দুঃখ হয়।

বিবি। বিবি তাঁকে দোষী করে। তোব ভালবাসাই যদি তার কাছে সব হত, তাহলে সে কি মরত? তোর বরষ তখন কতটুকু? কতটা ভালবাসা সত্যিকারি তুই নিতে পারতিস বিবি? আমি ও'কে ভালবেসেছিলাম, এত ভালবেসেছিলাম যে ও'কে ভুলবার জন্যে আমাকে অনেককিছু করতে হয়েছিল আর সেকেন্দো আমি নিজেকে কখনো কন্ঠা করিনি। আর আত্মহত্যার মত পাপ। বার চোখে বড় পাপ হয় না। মানুষ আর সব করতে পারে, আত্মহত্যার অধিকার তার থাকে না। পানিশেবল। ইন্ এন্ট্রি কোর্ট অফ ল। আত্মহত্যা মানে ন্যাক রেনে অধিকার নেমে আসে। সত্যিকারি কি তাই হয়েছিল?

সেই একটু ভারী কাঁধ, স্থির উজ্জ্বল চোখ, অসম্ভব নরম ট্রোট, হরিকেশ এখন এই ঘরের কোথায় প্রাচীন সমাধিতে বাতাসের হাহাকার শুনতে পেলেন। এ ঘরে তো বাইরের বাতাস ঢোক না। তবে বাতাস নয়, বাতাসের স্মৃতি। হাহাকার নয়, হাহাকারের স্মৃতি। আজ, জন্মদিনের সকালে মরুভাওয়া অতীতের স্মৃতিতে অবসন্ন হয়ে হরিকেশ চেয়ারে থপ করে বলে পড়ে ঘন ঘন ইন্-হেলার টানতে লাগলেন। হাবুল কি সত্যিকারি কথা সব জানে?

11011

হাবুল বিবিদি আর সরমা হাবুলের ঘরে বসেছিলেন। বিবিদি কিছুক্ষণ হল ছুটে এসেছেন, রান্নার দিকশা লাড় করিয়ে

য়েছে এসেছেন। আজ, বাবার জন্মদিনে বাড়ী ছেড়ে একটুখনির জন্যে আসতেও ও'র রীতিমত সাহস দরকার হয়েছে। এখন ও'র মুখ বিষন্ন, একটু রাগী রাগী, একটু হতাশাও আছে।

‘ভেবেছিলাম বাণী তোমাদের এখানে আসবে।’

‘হ্যাঁ। বাণীর আত্মসম্মান নেই? ও তোমারই মেয়ে তো।’ সরমা বিবিদির সঙ্গে কপড়া করবার জন্যে মনে যাচ্ছেন।

‘হাবুলও জান না।’

‘আমি তো ভেবেছিলাম ও'র পিসির কাছে যাবে।’

‘সেখানে যাবনি।’

‘তুমি কি গিয়েছিলে খোঁজ করতে।’

‘হ্যাঁ।’ ঘন খুঁইয়ে বিবিদি সেখানেও গিয়েছিলেন। বাবার জন্মদিনের উৎসবই যদি বন্ধ করে দিতে পারেন বিবিদি, তাহলে বাণীর জন্যে ও'র পিসির কাছেই বা যেতে পারবেন না কেন? আজ কেন তিনি মিথো মান নিয়ে বসে থাকবেন?

‘ওরা কি বলল?’ সরমা স্টোভের দিকে চোখ রেখে বললেন। স্টোভে আলু-মটর-শুটি-ডিম একসঙ্গে সেপ হুচ্ছে। এ বাড়ীতে খাওয়াদাওয়ার ব্যাপার, বিশেষত সকালে বেশ একটু জমকালো। বিবিদি জানেন সরমা এখন শুটি-মাখন-চীজ-আলু মটরশুটি ডিম-নাসপাতি-চা-কাফ সব নিয়ে বলবে।

‘ওরা, মা এবং ছেলে সকাল নটায় ঘুম থেকে ওঠে, দশটার চা খায়। তারপর যে বার কাজে বেরিয়ে যায়। শুধু মা আর ছেলের সংসার। কিন্তু ওদের ঘরবাড়ী দেখলে মনে হয় এইমাত্র ওরা নতুন বাসায় এল।’

বিদ্যানার ওপর বর্ষাতি। খাটের নিচে রেকর্ডপ্লেয়ার, ড্রেসিংটেবিলে মাখনের কোটো, সবচেয়ে অবাক কাণ্ড হল ওদের আলমারিটা। জামাকাপড় তো সমস্ত ঘরে গড়গড়ি যায়। এ আলমারিটার কি রং সরমা তা বিবিদি ভেবে পান না। হাবুলের দামী ক্যামেরা, টেপরেকর্ডার, সেবার বিলতে থেকে সরমার জন্যে আনা অত দামী ফারকোট সব বাইরে। লোহার আলমারিতে ফিল্ম আর থিয়েটারের ওপর বিলতে থেকে আনা হাবুলের কয়েকটা বই। সরমার উপ-বোনার কাটা এক পাদা। আর কতকগুলো ওষুধ-বিষুধ হারিজন্যিতে ভরা।

সরমা বিবিদির সঙ্গে এক বয়সী। ও'র চেহারার বরষ এখনো কম, তবে চুল পেকেছে আর এখন ও'কে অনেকটা মেরু-ডাকাডের মত দেখায়।

তার কারণ ও'র চোখে সবদা কালো চশমা থাকে, এখনো আছে। এখনো সরমা কুঁচিরে কাপড় পরেন। হাবুলের বাবার প্রতি প্রাধান্যবশত রঙীন কাপড়টা আর পরেন না। তবে বাহারী পাড়ের কাপড় পরেন। চোখ খারাপ হওয়াতে চশমা নেবার দরকার হয়েছিল, এদিকে রোদও কষ্ট হত। তাই সরমা পাওয়ার দেওয়া হালকা কালো চশমা করিয়ে নিলেন।

হাবুল বলে, ‘রাত কালো চশমা পরে ঘরে বেড়ালে লোকে তোমার রুকু ডাকবে।’ ‘ডাবুক!’

সরমা অকুতোভয়। ও'র বাড়ি অত্যন্ত সোজা এবং সাদা। হাবুলের বাবা মারা যেতে সবাই খনন দরছাই করে তাঁড়িয়ে দিয়েছিল, তখন কি লোকেরা তাঁদের বাঁচাতে এসেছিল? দীঘাপতিয়ার ইন্সকুলের ক্লাস ফোরের বিদ্যে নিয়ে তাঁকে কষ্ট দুঃখ করে ছেলে মানুষ করতে হয় নি?

‘তা বলে তুমি রুকু হবে মা?’

‘তা কেন! তবে আমার কথা হচ্ছে লোকেরা আমার কথা ভাবে নি, আমিও লোকের কথা ভাবব না। বাস!’

কখনো উল যুনে, কখনো চামড়ার কাজ করে, কখনো ইনসারেসের দালানী করে সরমা ছেলেকে পাড়িয়েছেন। ভাল ছাত্র করেছেন। এখন হাবুল চারশো টাকা রোজ-গার করে কিন্তু সরমা এতদিনে আরেকটা কাজ খুঁজে পেয়েছেন। মেয়েদের কি একটা কো-অপারিটিভের ফোকাল দেখা-শোনার কাজ।

আরেকটি কাজ সময়ে অসময়ে বিবি-দিকে ধমকানো। এখন স্টোভ নিভিয়ে টেবিলে খাবার সাজাতে সাজাতে সরমা বললেন ‘বাণীর পিসী কি বললে?’

‘বাণীর খবর তো জানেই না। তারপর আমাকে কথা শোনালে। বললে বাণীর বাবাও আমার জন্যে দুঃখ পেয়েছেন। বাণীও আমার জন্যে দুঃখ পাবে। বললে বাণী ওখানে গেলে ওরা মাথার করে রাখবে।’

‘তুমি কি বললে?’

‘কিছুই না।’

‘বাণীর পিসিকে তুমি জিগ্যাস করলে না কেন বাণীর জন্যে ওরা কে কি করেছে, এক কলকাতায় বাস, তোমার খোঁজ কবে নিয়েছে?’

‘কি লাভ হত সরমা?’

কেননা মানুষ স্বভাব পাগলিতে পারে না, স্বভাবই মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। বিবিদি নিজের স্বভাব বদলাতে পারেন না, বাণীর পিসীই বা পারবে কি করে? রুড় রুকু ব্যবহারে কি এসে যায়, তবে বাণীর পিসি বড় বিধে বিধে কথা বলতে পারত।

আঁতে যা দিয়ে দিয়ে। কই জ্বাতে তো কোন ক্ষতি হয় নি। ও'র সন্তানরা ও'কে ছেড়ে যায় নি, ও'র চারদিক থেকে সংসার স্মনহীন হয়ে ওঠে নি। আজই দেখে এলেন কি ঘন দিয়ে বাণীর পিসি বাণীর বাবার ছবিতে ফুলের মালা পরায় রোজ-রোজ। যেখানে ছবিটা আছে সেই ঘরেই ও'কে বসিয়েছিল।

‘বাণী নেই, আমি উঠি’ বলে বিবিদি উঠে পড়তেই বাণীর পিসি বলল, ‘তোমার বাড়ীতে দাদার ছবি নেই বোধহয়।’ তাই বাণীর জন্যে ঠিক এই ছবিটার কপি করিয়ে রেখেছি বউঠান। বাণী নিয়ে যাবে।’

‘ছবি আছে। তবে দেবরাজে থাকে, ফুল দেওয়া হয় না।’ কেন বললেন কে জানে। ও'র কাছে এ ধরনের কথা বলা মানেই হল ও'কে আরো বেশী কথা বলবার সুযোগ দেওয়া।

উত্তরে বাণীর পিসি বললে ‘জা তো বটেই, ও বাড়ীতে আর কে ফুল দেবে বল।’

দাদার কথা ভাবলে দুঃখ হয়। জীবনেও শান্তি পেল না, মরণও.....।

বিবিদির জিগেস করতে ইচ্ছে হল অনন্ত উকিলের মেরের কি হল? ছবিতে ফুলের মালা পরাবার কথা ও তারও কিন্তু সপ্তে সপ্তেই, এরকম কথা মনে হল বলে নিজের ওপর ঘেন্না হল।

সরমাকে বলতে গিয়েও বিবিদি কিছ, বললেন না। সরমা যথেষ্ট ভাল, কিন্তু খ্যাপাটেও বটে। তাছাড়া এখন ওর ওপর উন্নয়ন চটা।

‘তুমি কি এখন বেরবে সরমা?’

‘কেন, তুমি হাবুলের সঙ্গে কথা বলবে?’

‘পরকার ছিল।’

‘আজ কো-অপারেটিভ বন্ধ। একটু, বাজারে যাই। সরমা ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। যেতে যেতে একবার ফিরে তাক করে বললেন, ‘বাণী এলে কি করব বিবি, তাঁড়ের দেব?’

‘আমি কি বলব সরমা?’

বিবিদি কিছুক্ষণ চোখ নিচু করে আঙুলের কাঁপান দেখলেন। আঙুল একটু কাঁপে, ঠোঁটের পাশ নীলচে হয়ে যায়। একদিন আঙুলগুলো ছোট্টটির উঠবে, হাটের রাউপারিং মেশিন বন্ধ হয়ে যাবে। প্রতিটি রক্তবাহী শিরা বলে বসবে আজ ঢাকা বন্ধ। আর শরীরে অস্থিরতা ঢুকবে না। রক্তের কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রত্যেকটা প্রধান শিরার মুখে মুখে বিধের মুখোমুখি এঁটে শক্ত হয়ে চেপে বসে পড়বে। ঠোঁটের নীলচে ছায়া ঘন বেগুনী হয়ে মুখে ছড়িয়ে পড়বে। যে কোন সময়ে, যে কোন জায়গায় সৈনিক আসতে পারে। ভাবতে গেলেই পেটের ভেতর কি যেন লাফিয়ে ওঠে, মরে যাওয়ার কথা ভাব পান বিবিদি। এখন কি ওর সে বরস আছে, এখন যে-কোন অকস্মিক বশে প্রাণটা বিপর্যয় করা যায়?

তারপর চোখ তুলে দেখলেন সরমা চলে গিয়েছে। হাবুল ওর দিকে চেয়ে আছে। হাবুল আর বাণী প্রায় একবহনী। হাবুলের মুখ ও গায়ের রং অসময়ের বাধা-কাঁপির মত ফ্যাকাশে। একটু কুঁজো হয়ে বসে হাবুল, আস্তে হাটে, আস্তে কথা বলে। বিধবা মায়ের অচিন্তাচাপা ছিলে হলেও সরমা ওকে যথেষ্ট ছেড়ে রেখে রেখে মানুষ করেছে। ফলে হাবুল মিনিমিন বা কুচুটে হয়ে যায় নি। সরমার মত ছেলেও একরোখা হতে পারে সময়ে-অসময়ে। তবে একটা কথা হচ্ছে, ওর স্বাস্থ্য ভাল নয়। আরেকটা কথা কি, আত্মীয়স্বজন নিজের বলতে কেউ নেই বলে ওর মা-র দিকের লোকজনের প্রতি ওর একটা দুর্বলতা আছে।

সরমা সেটা পছন্দ করে নি। গোড়া থেকেই করে নি। শূন্য বিবিদির সঙ্গে যাওয়া-আসাতে ওর খুব উৎসাহ ছিল। সরমা আর বিবিদি দুজনেই, বয়সের এই বিকলবেলায় নতুন করে বন্ধুত্ব পাতিয়ে আরাম পেয়েছিলেন, হাবুল বলেছিল, ‘আমি তোমায় না কি ছোটবেলা বিবি বলতাম?’

‘হ্যাঁ হাবুল।’

‘এখনো তাই বলব।’

‘তুমি কেন, আরো অনেকে বিবি বলত। এই তো বাণী, আমার কতদিন অন্ধি বিবি বলেছে। যা শোনে ছোটরা তাই বলে।’

হাবুল বা বাণীর চেয়ে সরমা আর বিবিদি যেন উৎসাহ পেয়েছিলেন বেশী। একটা বয়সের পর একটি ভাল ও স্থায়ী বন্ধুত্বের প্রয়োজনটাই সবচেয়ে বেশী মনে হয়। মেয়েতে মেয়েতে বন্ধুত্ব হওয়া অতি বিরল। হাবুল দেখতে পেল সরমার উৎসাহ, বিবিদির বাড়ী ঘনঘন আসা-যাওয়া।

‘রিমালি।’ হাবুল অবাধ হয়ে এক দিকের গাল দুবার কামিয়ে ফেলেছিল। সরমা বলেন মেয়েরা একসঙ্গে হলে সাধারণত এত অসার কথা বলে যে, ওদের কথা শোনার চেয়ে বাড়ীতে শূরে বই পড়া অনেক ভাল। সেই সরমা বিবিদির মধ্যে কি খুঁজে পেলেন কে জানে।

‘বিবি মোটেই কথা বলে না।’ সরমা একদিন ঘোষণা করে বসলেন।

‘কেন?’

‘তা ছাড়া, বিবি খুব স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে।’

‘তুমি যদি একটু স্থির হতে শিখতে মা।’ হাবুল দেখতে পেল আজ সরমাকে ভুতে পেয়েছে। আসনা থেকে ডাক করা এবং না-ডাক করা জামা-কাপড় সব ফেলে দিয়ে সরমা বললেন, ‘তোমার অভ্যাস এত মন্দ হাবুল, যে এ ঘরে লোকজনকে আনতে আমার লজ্জা করে।’

তারপর হাবুলের জামাকাপড় শূন্যে লাগলেন। আজকালকার জামার তো ডাকের বলাই নেই। কোনটা কাচা, কোনটা অকাচা তা সরমা শূন্যে ঠিক করেন।

এখন সরমা হাবুলের ওপর চটা, বাণীর ওপর চটা, বিবিদির উপরও চটা। হরিকেশের ঘরে, হাবুল যেত, উনি কখনো যেতেন না। হরিকেশের বিষয়ে হাবুলের আগ্রহ হয়, আর তাই থেকেই নতুন করে আলাপের সূত্রপাত। কিন্তু হাবুল যেন সরমাকে বলল, ‘মা আমি বাণীকে ভালবাসি ওকে বিয়ে করব।’

সৈনিক সরমার কামা পেয়েছিল, কি যে করলে হাবুল বলে চেআরে বসে পড়ে ছিলেন উনি।

কেননা উনি বুঝতে পেরেছিলেন এর পরিণাম বহু দূর অন্ধি গড়াবে। বিবির সঙ্গে সম্পর্ক বিধিয়ে যাবে। হরিকেশ জানতে পারলে আরো কুৎসিত ব্যাপার হবে কেননা সাত্যিকর ব্যাপারটা সরমা কখনো ভোলেন নি।

সরমা চলে যাবার পর, হাবুল আর বিবিদি কিছুক্ষণ দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে বইলেন। হাবুল উন্মত্ত হয়ে দেখল বিবিদির চোখে কিসের উত্তেজনা।

‘তোমার এত ছোটোছোট্ট করা উচিত নয় বিবি। আফটার অল, রাডু হ্যাভ এ ব্যাড হাট। আমাদের বাড়ীতে তুমি মরে গেলে বাণী আমার কমা করবে না।’

বিবিদি দেখলেন হাবুলের চেহারা এখন রীতিমত প্রসন্ন, যেন বুড়িয়ে গেছে

ও রাতারাতি। বিবিদি জানেন হাবুল ভীষণ নীতিবাদী ছেলে। দারুণ গোড়ামি ওর কোন কোন বিষয়ে।

‘বাণী খুব একটা ভাববে না হাবুল।’ বলতে বলতেই বিবিদির লজ্জা হল। বিবিদি হাবুল আর ওর মধ্যে একটি বগের তফাৎ। বিবিদির জীবন হরিকেশই কখনো সামনে থেকে, কখনো পেছনে থেকে নিরন্তর করেছেন। হাবুলকে সত্যি বলতে কি উনি চেনেন না। বাণীকেও চেনেন কি?

‘ভাববে।’ হাবুল হাই তুলল।

‘তুমি কয়েক দিন যাও নি।’

হাবুল যেত, বাবার কাছে বসত। তারপর বিবিদির ঘরে এসে বসে বলত ‘তুমি কি স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ছিলে বিবি?’

‘কেন?’

‘সব খুলে রাখ জানলা দরজা।’ এত রোদও তোমার ভাল লাগে।’ একদিন বিবিদির ঘরে বসে বসে হাবুল বলল, ‘জান, সমস্ত ব্যাপারটা ভারী মজার। মা তোমার বাবার ঘরটাকে ব্লোছিল উপশয়। এখন আজ ডেজ গো বাই আমার শূন্যই মনে হয় হি ইজ রিয়ার্সি অ্যান্ড ওল্ড ওল্ড হান্টার।’

‘উঃ।’ বাণী বিরক্তি জ্ঞানিয়েছে। হরিকেশ সংক্রান্ত কোন কথাই ও শুনতে চায় না। হাবুল দেখেছে হরিকেশের যেমন জেদ, তাঁর ঘরে রোদ বাতাস ঢুকবে না, ঢুকলেই নাকি শ্বাসের কষ্ট হয়। তাঁর ঘরে বসে বাণীর কথা বা বাণীর বাবার কথা বলা চলবে না, শুনলে ওর বিরক্তি হয় বাণীরও তেমনি বাঘা জেদ আছে।

হরিকেশ বাঘের মত সতর্কতার ওর দুর্গ আগলাচ্ছেন, বিবিদি সমান সতর্কতার এ ঘরের রোদ আগলাচ্ছেন, যে বায়ু দুর্গ নিয়ে পড়ে আছে। বাণীরও নিশ্চয় কোন আগলো রাখবার দুর্গ আছে, হাবুলেরও আছে, না কি অনেক দিন বাদে ‘কাসল’ বইটা আবার পড়ল বলেই হাবুল সর্বকছুর সঙ্গে দুর্গের উপমা দিচ্ছে?

হাবুল বলল, ‘উনি একজন দুর্গ শিকারী। ওর উপশয় ছেড়ে আমি একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গ দিয়ে তোমার এখানে চলে আসি বিবি। ও ঘরটা এত অন্ধকার, এ ঘরটার এত আলো সব যেন কেমন সিম্বলিক। আসলে মাঝখানের সুড়ঙ্গটার ব্যালেন্স থাকা ছিল। ওটা তো কনেকাউং লিঙ্ক।’

ওই শেষ। তারপর আর হাবুল বিবিদির ঘরে যায় নি। বিবিদির এখন কষ্ট হল। হাবুলকে উনিও ভালবেসেছেন।

‘তোমাকে কষ্ট দিতে হাবুল...’

হাবুল ওর কথা শুনল না। কি ভাবতে ভাবতে বলল, ‘বিবি তুমি আমার কে?’

‘কে মানে?’

‘তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি। মা তোমার কে?’

‘তোমার মা-র দিদিমা, আমার মা-র দিদিমা বোন হতেন।’

‘আপুজ বোন?’

‘না! জ্ঞাতি!’

হাবুল বলল, ‘সম্পর্কটা তাহলে যত কাছের মনে করা গিয়েছিল তত কাছের কিছু নয়। তোমরা এমন করেছিলে যে মনে হয়েছিল...’

‘কি মনে হয়েছিল?’

‘মনে হয়েছিল ইনসেপ্ট!’ অনেক কষ্টে হাবুল কথাটা উচ্চারণ করল আর বিবিদি এই শব্দটি শুনলে প্রচণ্ড আঘাত পেলেন কেনেও ওর ফোড়া ফেটে মাওয়ার মত আয়াম বোধ হল।

‘আমার দিদিমার দিদিমা, বাণীর দিদিমার দিদিমা জ্ঞাতি বোন হতেন! তাহলে বাণীকে কি বলেছিলে তুমি বিবি? শুনোছি তিনপুরের কেটে গেলে বিয়ে হতে পারে। এখন আইনও হয়েছে। তা ছাড়া এ রকম সম্পর্ক, এক সময়ে হয়তো সম্বন্ধ করেই বিয়ে হয়েছে। বাণীকে তুমি কি বলেছিলে?’

‘বলেছিলাম আমি সমর্থন করতে পারি না। কেননা সম্পর্ক বাই হোক, দুই পরিবারে বোণামোণ অনেক দিন অবধি খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। বলেছিলাম তোমরাও যাকে বলে কাজিন, তাই-ই!’

‘বেচারী! বাণী! একে ও ভুল্লকর শিউরিটান, ভীষণ মর্যাদা, তাতে তোমার কথা ওর কাছে না!’

‘আমার কথা!’

‘ও ইয়েস। তোমার কথা ও মানতে চেষ্টা করে। তাহলে আমি একথা বলছি না ও তোমার ভীষণ ভালবাসে!’

‘হাবুল, আমি বলেছিলাম আমি সমর্থন করি না। কিন্তু আমি তো ওকে মানা করি নি হাবুল। তোমরা আমার মতামতের জন্যে অপেক্ষা করতে গেলে কেন?’

‘ময়ের ব্যাপার বিবি, দাড়ি কামারের সময়ে যা পড়ে সেও তো কেরানীরই রক্ত। মূখে বাই বলি না কেন, মায়ের আশীর্বাদ পেলেই মর্যাদা কারেজ পাই, বুঝলে না?’

‘কিন্তু হাবুল!’

‘যাক গে, বাণী আর আমার কথা ভুলে যাও। ইম্মার সেক্সস সামিথিং বিবি! হাবুলে বিছানার ওপর থেকে বর্ণাতি সরল। কাগজ, অজর কাগজ, একদিনের ‘হিতবাদী’ আর ‘বাম্‌ব’ থেকে শব্দ করে কত কি। হারিকেশ চৌধুরী।

‘এখন আর কালকের উৎসব করবার কোন মানে হবে না বিবি!’

‘আমি জানতে এলাম তুমি কি আমার ওপর রাগ করছে?’

‘কেন?’

‘আমি উৎসব হতে দিতে চাই না বলে?’

‘না! তোমরা দুজন দুজনকে অপছন্দ কর, ঘেমা কর তাতে আমার কিছু আসছিল না, যাচ্ছিল না। তোমার ঘরে একটা অ্যাক্সেসস অয়েলপেটিং আছে। শুনোছি তোমার মামা-র আঁকা!’

বিবিদি অবাক হলেন। মামা-র আঁকা ‘পূরীতে সুবাস্ত’ খারাপ ছবি? এক সময়ে তো মামাকে সবাই খুব প্রশংসা করত।

‘ছবিটা ঘরে রাখবার অধিকার তোমার আছে। ঠিক তেমনি, মূ. আশু দ্য ওল্ড

ম্যান আর এন্টাইল্ড টু ইয়ের হোয়েড না কি রাগ বিবি না বিবেশ? আমি বদার করি নি। আই হ্যাভ রিহালি অ্যাডমার্ড দ্য ওল্ড ম্যান।’

‘জানি।’

‘এই হতভাগা জন্মদিনের উৎসব! হয়তো আমার বোকা উচিত ছিল বিবি। কিন্তু আমি চেয়েছিলাম এটা একটা স্পেশাল অকেশন হয়ে উঠুক। ওর যা বয়স, তাতে মানুষ যে কোন সময়ে মরে যায়।’

‘হাবুল তুমি ভুল কোর না...’

‘ভুল করছি না আমি। আমি তো জানি ওকে সবাই মোটামুটি প্রশ্রয় করে। আর ওর জীবনটা সবশব্দ খুব ইন্টারেস্টিং। উনি তো আর একজন রাজনীতিক কর্মী মাত্র নন। রাজনীতিতে ওর সহানুভূতি ছিল। তখনকার অনেকের মত টাকা-পরসা দিয়ে সাহায্য করতেন এইমাত্র। ভবু একটি সম্মানজনক কাজ উনি করেছিলেন বিবি। ওকে সবাই দেশগৌরবও করতছিল।’

‘হ্যাঁ, বলেছিল।’

‘এতদিন বেগমপুরের কথা উনি কিছুর বলেন নি। হঠাৎ এবার আমার বললেন কেন কোন বিষয়ে উনি এতদিনের দীর্ঘ নীরবতা ভাঙতে চান। হোজাই, দ্যাটস এ ম্যাজিকাম পীস। উনি নিজেও ম্যাজিকাম পীস বিবি। কেন এতদিন বাবে ওর এই শব্দ সঙ্কল্প? আমি ওকে হিউমার করাই স্থির করলাম। কেননা লোকটাকে আমার আশ্চর্য লেগেছে। এত অশ্রুত ভাইটাল!’

‘এখন তো আর তুমি ওকে ঠিক সে রকম অ্যাডমার্ড করছে পারছ না হাবুল?’

‘হয়তো।’

‘সেটাও ভুল করবে। ওকে বত অ্যাডমার্ড করছিলে হয়তো। উনি তার বোণা নন। কিন্তু যদি ওকে খুব মন্দ ভাব তাহলেও ভুল করবে।’

‘আমি বোকা নই বিবি!’

‘ভাল!’

‘তুমি কেন বাধা দিতে চেয়েছিলে বিবি?’

‘আমি!’

বিবিদি কিছুক্ষণ শূন্যচোখে চেয়ে রইলেন। হাবুল, আমি একদিন উপাস গাছের কাছাকাছি গিয়েছিলাম একথা বলার কি কোন মানে হবে? মানে হবে না। হাবুলের মনে হবে উনি রোমান্টিক হচ্ছেন। এই এক মুস্কিল বিবিদির। ওরা এত অন্য সব জিনিসে বিশ্বাস নাস্ত করতে গিয়েছিলেন, এমন সব ভুল ভুল মূল্যবোধকে ভালবেসেছিলেন যে এখন যা বলতে যান হাবুলদের কাছে সবই রোমান্টিক মনে হয়। ওরা মানুষের আরো শক্ত-সমর্থ হওয়ার পছন্দ করে।

বাবার সঙ্গে ওর দীর্ঘদিনের মূন্ধ। বহু সহস্র বহু লক্ষ বছরের। বাবা ব্যাধের মত চিরনিই কোন না কোন উপশর থেকে বিবিদির জগতের ওপর, জীবনের ওপর বিঘ্নিত তীর হুড়ে আসছেন একথা বললে হাবুল বলবে ও লিটারেচার ফেড জেনারেশন! ওদের সময়ের এই আরেকটা

গণ্ডগোল। অত্যন্ত সুরক্ষিত নিরাপদ জীবন ছিল। বেকারী অথবা মহামারী অথবা দূর্ভিক্ষ ছাড়া অন্যকিছুর প্রহর ওরা টের পেতেন না। চোখের সামনে এক ইংরেজ ছিল বটে তাদের বিরুদ্ধেই সকলে এক হত। ভাবত এর নামই একা।

কোনদিকে কোন বয়স্কমন্যতা ছিল না। সবই ভাবে ভরা, আবেগে ভাসা। কিছুর কিছু এদিক-সেদিক বাদ দিলে রোমান্টিক সাহিত্যেরই প্রভাব ছিল বেশী। বিবিদিরা তাই পড়েই খুশী থাকতেন। হয়তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ না বাধলে সাহিত্যের সুর কোন দিনই পাশ্চাত্য না। যদিও, বিবিদি মনে করেন কি তৃতীয় দশকে, কি চতুর্থ দশকে, রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহও আরেক জাতের আবেগ দিয়ে শব্দ হয়েছিল। অবশ্য আবেগ ছাড়া না কি সাহিত্যে হাওয়াবলও আসে না।

কিন্তু এ সব কথা হাবুলকে বলে কি হবে? বিবিদির এত সব অপ্রাঙ্গণ কথা মনে হলই বা কেন?

‘বিবি কথা বল!’

হাবুল জানতে চায়, বাণীর মতই সত্যি কথা জানতে চায়।

‘আমি মনে করি হাবুল...’

‘কি মনে কর?’

‘বাবা যথেষ্ট সম্মান পেয়েছেন। ওকে আজ নতুন করে, জীবনের শেষে একজন মহান মানুষ বা সম্পূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে সম্মান দেওয়ার দরকার নেই।’

‘হোআই!’

‘কেননা সে সম্মান উনি দাবী করতে পারেন না।’

‘কেন পারেন না বিবি? মনোরমা সেনের চিঠিতে বা লেখা আছে সেইজন্যে বলা?’

‘না!’ বিবিদি চেয়ার চেপে ধরলেন। আর প্রশ্ন কোর না হাবুল। বিবিদির চোখের সামনে এখন টোবলের কাগজের প্রতিটি রঙীন কুড় ফেটে ফেটে যাচ্ছে। ওদের মূখ আছে, ওরা কথা বলতে চায়। বিবিদির মনে হল প্রতিটি কাগজের কুড়ির মূখ উনি হাত চাপা দিয়ে বন্ধ করে দেন। কথা কয়ে না। বিত্তী, বিত্তী, বিত্তী তোমাদের লালচে মূখ।

‘তবে কেন বিবি? অযোগ্য লোককে সম্মান আমরা অনেক দিয়েছি। আজও দিই। মূর্তি তুলি, ছবি টাঙাই। উনি না হয় তাদের মধ্যেই একজন হতেন?’

‘হাবুল, আমাদের সময়ের মানুষরা মানুষকে দেবতা বানাতে বাস্তব থাকত। তোমরা মানুষের সে ইমেজ ভাঙতেও ততটাই বাস্তব থাক। সব আমি তোমরা বলতে পার না হাবুল, শব্দ আমার মনে হয় কোন না কোন সময়ে আমরা যা সত্য মনে করি তা কাজে করবার সংসাহস থাকা উচিত। আমি যদি মনে করি বাবাকে আজ টোটাল ম্যান বলে নতুন একটা খ্যাতি দেওয়া অনুচিত তাহলে আমি সেটা করব বইকি!’

‘টোটাল ম্যান!’

‘তোমার কাছে আমারও অনেক কথা শেখা। একথাটাও। তাছাড়া আমার তোমাকে

একটি কথাই বলবার আছে হাবুল। উনি টোটাল মান হয়তো বিন। কিন্তু তা বলে তুমি ওকে সম্পূর্ণ অমানুষও ভেবে বোস না।

না। তা ভাবব না। বাদও, বাদও কি জান বিবি, ও সব বেগমপুর বা কি না কি তাতে আমার মন আর কতটুকু আকৃষ্ট হতে পারে বল? বিশেষ করে গত বিশ বছরের পর। ও সব কাজকর্ম লোকের মনকে আর আকৃষ্ট করে কি? স্বাধীনতার পরও কতজনই শহীদ হল, কি বল। আমি ও'র মধ্যে তবু একটা টোটাল মানকেই দেখতে চেষ্টা করি।

‘কেন হাবুল!’ এখন বিবিদির ভয় করছে। হাবুলকে ক্রমেই সাতুদার মত মনে হচ্ছে কেন?

‘কেননা আমরা বাবা এই সাতুদারি সালে তিরিশের কোঠার পৌঁছিয়েছি, আমাদের ট্রাজেডী তোমরা বোকা? আমার মত জেলে, কেবল আলাদা রাজনীতিতে মাথা না মট্টিয়েও যে মানুষের সর্বাঙ্গিক ভালো হওয়াতে বিশ্বাস রাখতে চায়? বার অনেকটা ওল্ড ফ্যাশনও। হয়তো রক্তও আত্মীয়তার মঙ্গলকের প্রতি প্রাচীন আনুগত্য আছে। তাই ভালবাসবার সময়ে বাপীকেই ভালবাসে। আমাদের ট্রাজেডী হল, আমরা খানিকটা নিম্ম। তবু আমরাও টোটাল মানকে খুঁজি বিবি।’

কেননা আমাদের চারিপাশে এত বিচলিত থাম, এত ভাঙা মূর্তি, এত রবিশ এত অশ্রুজনা। আমরাই তো টোটাল মানকে খুঁজব।

‘মাকে তোমার সেই মানুষ মনে হয়েছিল হাবুল?’

‘ভারতে গেলে একটু বোকা বোকা লাগবে। কিন্তু ও’র ‘আত্মসম্মান’, এই নাম ভাঙবার চেষ্টা না থাকা, উনিও আমার চোখ দিয়েছিলেন বিবি।’

‘সত্যি হাবুল!’ বিবিদি আর কিছু ভেবে পেলেন না। সাতুদাদের সময়েও সে রকম এখনও সেই একই রকম। মানুষকে এত উচুতে তোলবার কি আছে?

‘বাপী যদি তোমার কাছে আসে হাবুল.....’

‘আসবে না বিবি।’ হাবুল কাগজপত্র গুলোতে লাগল।

‘যদি আসে, ওকে আমার কাছে যেতে বোল।’ বিবিদি খুব আস্তে উঠলেন। কেন মনে হচ্ছে সমস্ত শরীরটা ফাঁপানো কাচের তৈরী। একটু ঠোকা লাগলেই বিবিদি চরমার হয়ে পড়ে যাবেন?

‘একটা কথা বলে বাও বিবি।’

না। বিবিদি ঘাড় নাড়লেন। এখন আর কোন কথা নেই। অনেকদিন ধরে যেন বেঁচে আছেন বিবিদি। অনেকদিন ধরে যেন কথা বলেছেন, অনেকদিন অনেক প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। এখন ভাড়াভাড়ি ফিরে যেতে হবে।

‘বিবি।’

বিবিদি একটু দাঁড়ালেন। এখন তাঁর হাসি পাচ্ছে। তার সেই অশ্রুত, বিলাপকরা হাসি। যে হাসি দেখলেই মানুষ যেন হতা

ভয় পেরে চুপ করে বার। কেননা বিবিদির চোখ হাসে না, মুখের চামড়ার আনন্দে ভাঁজ পড়ে না, তবু শব্দ মুখের ফাঁটুকু হাসতেই থাকে।

‘সাত্যিক তোমার কে ছিল বিবি? কেন সে মরেছিল?’

বিবিদি হাসতে লাগলেন। হাসতে হাসতে ও’র চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। আজকেই সাতুদার কথা বললে হাবুল? তোমার আমি কি বলব? সাতুদা আমার কে ছিল? সাতুদা কেন মারা গিয়েছিল?

‘ঐ ফাইলটাকে জিগোল কর হাবুল।’ ‘হরিকেশ চৌধুরী’ লেখা ফাইলটা দেখিয়ে বিবিদি নেমে গেলেন।

II চার II

নিরাপদ হাবুলকে খবর দিয়ে আসবার পর হরিকেশ ও’র ঘরে বসে নিজেকে গুদিয়ে নিচ্ছিলেন। এই ঘরেরই পাশাপাশি আরেকটা ঘরে নিরাপদ ও’র দু’দু’র খাবার তৈরী করতেন। মাঝে মাঝে ওকে টেলিফোন করতে দেখা হাচ্ছিল। অভ্যস্ত কালো রঙের ওপর অভ্যস্ত সাদা ও ফসি জামাকাপড়। ও’র জন্মদিনের সম্মানে। আশ্চর্য, নিরাপদও কি সব জুড়ে গেল মাকি? দোসরা অক্টোবর তো বাড়ীতে ফুল দেওয়া-নেওয়া, আর কাজ করবার লোকজনের জন্যে একটু ভাল খাওয়া-পাওয়া। আজ কেন ও ভাল জামাকাপড় পরেছে?

টেলিফোন বল, লোকজন যে করজান আসবার তাদের আসা বল, সবই ততসরা। নিরাপদের ভাবান ‘খুব মোজা হবে।’ জা বাবুকে ঘিরে আর কোন ‘মোজাদার’ ঘটনা ঘটে না তাতে নিরাপদ যেন একটু চিন্তিত ছিল। হরিকেশের ঐ ‘বল’ এইটিন এইটি সেভন স্টিল গোয়ার শব্দ শরীরটি আর বেশীদিন নেই এ কথা নিরাপদ জানে। একমাত্র নিরাপদই এ ঘরে থাকে আর রাতের বেলা দেখতে পায় হরিকেশের হী-করা মুখ, নড়বড়ে শরীরের ওপর দিয়ে আরসলা ছেঁটে বেড়াচ্ছে, ঘরের মোঝতে ইন্দুর চরছে।

মাঝে মাঝে ওর তো ভাল হয়ে যায় বাবু শরীরের ভেতরটা হয়তো ফোঁপরা হয়ে গিয়েছে, আর ইন্দুর আরসলা, পোড়োঘরের জীবজন্তু বত ও’র শরীর থেকেই গিলগিল করে বেরুচ্ছে।

ঘরে খাবার আগে বাবুকে নিয়ে আরেকবার ‘মোজা’ হবে কিনা নিরাপদ সেকথা অনেকবার ভেবেছে। তাই, আগার আশায় ও দোসরা থেকেই জামাকাপড়ে সেজে ঘুরছে।

হরিকেশ হাবুল আসবার অপেক্ষায় বসে বসে শব্দ একবার ভেবে নিলেন সুনীতি হাবুলের ওখানে বসে থাকবার অর্থ কি হতে পারে। তারপর মনে মনে একটা হলদে পমফুল ডাববার চেষ্টা করতে লাগলেন। ফরাসী মেয়েটি, ঐ যে হাবুলের সঙ্গে এসেছিল একদিন, ও গলেছিল। যাকপদুরে কি একটা সকলারশিপ নিয়ে এসেছে। দিবি পাতিহাসের মত টাণাটোণা বড়োচাল গুলুগে চোরা। খুব বুঝিমতী। কিন্তু

তাহলে কি হয়, আরেক ছোকরা বুঝিবা ওর সঙ্গে সেটে আছে দেখলেন। বোকা গেল মেয়েটিকে ও বিয়ে করবেই করবে। মেয়েটির জ্বর সব ভাল কিন্তু যোগাটোগে বিশ্বাস দারুণ। যোগে বিশ্বাস থাকটা দোষের নয়, তবে ও সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুতেই বিশ্বাস করে। যেমন, বলে বসলেন, ঐ ছোকরা বুঝিবা না কি ওর পূর্বজন্মের ‘সোল’ আউ। ঈশ্বর জানেন তার অর্থ কি।

তবে আজবাজে, অসম্ভব ফুল ও ফল ভাবলে মন শান্ত হয়। গাঢ় বেগুনি কমলা লেবু, হলদে পম্প বা ঘোর সবুজ ডালিয়া কুলের কথা ভাবলে সাধারণত হরিকেশ মনে মনে সেইসব আশ্চর্য বাগানে চলে যান। ছোটটি সেজে ছোট ছোট রূপালী চড়ই অথবা গোলাপী ফাঁড় ধরেন। দুধের ফেনার মতো সাদা ঘাসে লুটোপুটি খান। আরে মাঝে মনে হয় কারা যেন তাঁকে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে। তিরিশ-বত্রিশ সালের রাগী ছোকরারা দু’দু’র করে ঘাসের নাম দিয়েছিল ‘মা নয় বোন নয় বউ নয় যেন আর কেউ।’ তাদের হাত ধরেই যেন তিনি বেড়াচ্ছেন সেই বাগানে।

কিন্তু আজ মনকে রেখেছোনে এক জায়গায় বসতে গিয়ে কোন হৃদয় পম্প বা সৌখীন ফুল প্রজাপতি নয়, ভীষণ জঙ্গলের কথা মনে পড়ল হরিকেশের, তাছাড়া বাঘের হাঁ। হরিকেশ একটা সেজা হয়ে বসলেন। এই সুনীতিই সুনীতি করে গেল। নইলে বড়ন ও’র দেখে মরেছিল একথা বলতে গেল কেন?

অনেকগুলো কথা কাজকে বলতে পারবেন না হরিকেশ, কিন্তু এখন মনে একটা অসম্ভব প্রত্যাশা লাফিয়ে উঠল। হাবুলকে বলবেন, হাবুলকে। হাবুল দেখুক জীবনের কোন কোন জঙ্গলার স্বাভাবিক তিনি খুলেমেলে করতে পারেন। কান খাড়া করলেন। বহু যত্নেজাশে, জৈন্তোর গরমে, শীতের দু’পরে, জানোয়ারের পায়ের শব্দ শুনেন অভ্যস্ত করা ভৈরী কান হরিকেশের। তাছাড়া বেগমপুরে তো তিনি আসলে এক বুনীকেই ধরতে গিয়েছিলেন। কেঁচো খুঁজতে সাপ বেরুল। বুনীদের পায়ের শব্দও শোনা ও’র অভ্যাস আছে। হাবুল আসছে। হাবুলের পায়ের শব্দ হরিকেশ শুনতে পেরেছেন।

‘এস হাবুল।’

‘কেননা ভাল?’

‘হ্যাঁ। তোমার ডেকে পঠালাম.....’

‘আপনি না ডাকলেও আমি আসতাম অবশ্য।’

‘কি জান হাবুল,—’

‘বলুন।’

‘আমার আজকে বারবার একটি লোকের কথা মনে হচ্ছে।’

‘কার কথা?’

‘আমার একজন পুরনো ট্রাকার। বুন। আজ ও থাকলে খুব খুশী হত।’

কেন হত তা অবশ্য হাবুল জানে না। উৎসব হলে তবে তো খুশী হবার কথা ওঠে। হরিকেশ কি এখানে জানেন না যে কান কোন উৎসব হচ্ছে না?

‘আমি আপনাকে কতকগুলো জিনিস পড়ে শোনাতে চাই। মানে, যদি কোন ভুল-টুল হয়ে থাকে আপনি ঠিক করে দেবেন।’

এখন হরিকেশের মনে একটা আশ্চর্য আনন্দ হল। তাহলে হাবুল ওর কথা রাখছে। ফিল্ম ডিভিশনের লোকেরা কাল আসছে ওর ছবি তুলতে। বাংলা দেশের প্রেস বলতে যা বোঝায় তার সবকিছুই তো ওর চেনাজানার মধ্যে। তাছাড়া হরিকেশ যেহেতু বহুবর্ষিচর জীবন কাটিয়েছেন, সেহেতু ওর জন্মদিনের উৎসবে সবধরনের লোকেরাই কেউ না কেউ আসবেন।

কলকাতায় আর ঢাকায় একসময়ে এক-সঙ্গে প্রাকটীনিং অ্যাডভোকেট ছিলেন কটে। পসারও করেছিলেন। আইনজীবনের বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র করুণাময়কেই ডেকেছিলেন হরিকেশ। লোকটার ‘ভ’ অক্ষরে ধন-বাণ ছিল। প্রথমে ভাওয়াল, তারপর ভাগলপুর, দুটো কেসেই কপাল ফিরে গেল। তারপর ওর সিনিয়র চ্যাটার্জির মেয়েকে বিয়ে করেছিল। সে মহিলার ডাকনাম ছিল ভূতি। ব্রিটিশ সালের পর ও হরিকেশকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

সাহিত্যজীবনের অনেকেই এখনো নড়বড়ে হয়ে বেঁচে আছেন। সকলকে ডাকেননি হরিকেশ, তবু সেই দলটাকে ডাকতেই হল, যারা হরিকেশের সঙ্গে ভাওয়ালের গোবিন্দ কসকে সাহায্য করেছিলেন, চাঁদা তুলেছিলেন, তাঁদের মধ্যে চার, মধুসূদনের আবার বিশেষ একটি সম্মান আছে। চার, মধুসূদন হরিকেশের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘মনোবাণী’র প্রিন্টার ছিলেন।

তাছাড়া কলকাতার কয়েকটি অলংকার, যেমন ‘অর্ধিত হালদার’, ‘ডি এম ক্যানারিজ’, রাধাপ্রসন্ন সেন, এঁদের নাম রাখতেই হয়েছিল। হাবুল ওর নিজের কাগজকে রিভিউ করতে হবে, আর, যেন স্মৃতিচারণ করতে করতে হরিকেশ বেগমপুরের কথা বলে বসলেন।

‘কি জান হাবুল, হরিকেশ কি ভাবতে ভাবতে বসলেন, সুনীতি, তোমার বিবিষায়ী এখনো জানে না আমি কাল কি বলতে চেয়েছিলাম।’

হাবুল ওর কথা শুনল না। ওর সমস্যা কি তাহলে সত্যিই এত কম? ‘এই যে আপনি’, হাবুল একটু খুশীভরা চোখে হাতের ফাইল দেখাল। হরিকেশ খুশী হতে চেষ্টা করলেন। ঐ ঈগল পাখী অঁকা ফাইলটা হরিকেশ চোখুরী। একটা ঘটনাবহুল এবং বিচিত্র জীবনকে ল, সা, গু কবে কবে হাবুল কয়েকটা কাগজের মধ্যে পুরে ফেলেছে?

এই সময়ে দরজা দিয়ে মিষ্টি গন্ধ এল। নিরাপদ ছাড়া সাবা সুরুরার এমন গন্ধ বের করতে কেউ পারে না। তৃপ্ত করে নিশ্বাস নিয়ে উনি হেলান দিয়ে বসলেন। হাবুল কেন বিবির ঐ মেয়েটাকে বিয়ে করতে চেয়ে ছিল কে জানে। এই বাধ্যবাধকতা বসে-বসে হরিকেশ সব খবরই পান। নিরাপদ বৃদ্ধের মত না হলেও ভাল ট্রাকার। সুড়ঙ্গের ওপর থেকে অনেক খবর নিয়েথেন্ডে ও লা করে ইন্দুরের মত চলে আসে, হরি-

কেশের ঘরে এই করে খবর জমা হয়। বিবি যে সাত্যাকির ছবি দেখে, বাণী যে বিবিকে মানা করে না, এসব দরকারী খবর হরিকেশ নিরাপদের কাছেই জেনেছেন।

হাবুল কেন বিবির মেয়েকে বিয়ে করবে? পঁয়ত্রিশ বছরের ওপার থেকে আরেক-জন উদ্ভ্রান্ত বৃদ্ধের গলা তাঁর কানে এল, এখনো আসে। সাত্যাকি কেন বিবিকে বিয়ে করতে চেয়েছিল? হরিকেশ কি নীচু হয়ে বসবেন, হাবুলকে বলবেন ‘চিন্তাকোর না হাবুল। তুমি নাতনী নে’ গুড। একটা ফুলব্রাডেড মেয়েকে বিয়ে কর, গেট হেলদি, ভিগরাস চিলড্রেন।’

কিন্তু হাবুল বোধহয় অতটা খোলাখোলা কথা শুনতে চাইবে না। হরিকেশ সোজা হয়ে বসলেন, চিবুক নিচু করলেন।

‘নাম হরিকেশ চৌধুরী, শিতা পতাকী-রঞ্জন। আপনি ভূতীয় সন্তান?’

‘চতুর্থ বলতে পার।’

‘কেন?’

‘তৃতীয়জন ঘন্টাকয়েক বেঁচেছিল মাত্র।’ হরিকেশের কথা শুনে নিরাপদ বাইরে বসে হাসতে লাগল। বৃদ্ধো দেখছি প্রতিকথার সত্যিকথা বলবে আজ! এ-ও আরেকরকম মজা। মরে যাবার সময় আসছে বলে কতরকম মজাই না করছে বৃদ্ধো।

‘আপনার জন্ম উত্তরবঙ্গে, রাজসাহী দুর্গাবাড়ী, আঠারো শো সাতাশীতে।’

‘হ্যাঁ হাবুল, তবে আমার মনে হয় উত্তর দিক্শনের ওপর খুব জোর না দেওয়াই ভাল। আমি এত জায়গায় ঘুরেছি, বাস করেছি, রাঁচির কাছাকাছিও আমার কয়েকটা জগল ছিল, তাই আমরা কে কোথাকার, এসব কথা ভাবতে শিখিনি।’

‘খুব ভাল। বিশেষ করে আজকালকার দিনে যখন মানুষ দেশ বলেই চোঁচিয়ে জানিয়ে দেয় কোন বংশে আদিবাস।’

‘তোমরা, ইয়াংমানরা অনেক...কি বলব...সম্বন্ধী? না না অসহিষ্ণু...দেখ না, যদি পৃথিবীর সমস্ত ন্যাচারলাইজড সিটি-জেনেরা নিজেদের পরবাসী মনে করতে শুরু করে তাহলে তাদেরও কোন লাভ হয় না আর যেখানে বসবাস করে সে জায়গাটার এপরও খুব সুবিচার হয় না।’

হাবুল একটু হাসল।

‘শিক্ষা রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুল, কিছুদিন বহরমপুর কে, এন, কলেজিয়েট স্কুল। তারপর কলেজে গিয়ে বঙ্গবাসী ল’ কলেজ। বঙ্গবাসী কেন? আরেকটা কথা, আপনার এম্ব্রলস দিতে দিতে উনিশশো সাত হয়ে যাচ্ছে। কেন?’

‘কামলা হয়েছিল। কামলা বোঝ? জন্ডিস’ যাক বলে। বছর ছয়েক রাঁচির বাড়ীতে ছিলাম। সেইসময়েই আমি ছোড়া চটেঁ ঠ্যাং ভাঙলাম বলে বাবা আমাকে বাগে রাখবার জন্যে বৃদ্ধকে পাঠিয়ে দিলেন। সত্যি বলতে কি, বৃদ্ধ ছাড়া বাবারও চলত না। বাবা জমিদার ছিলেন না জোতদার ছিলেন। কিন্তু আমার ক্রাসে জায়গা পাবার জন্যে চারদিকে সম্পত্তি কিনেছিলেন। শিক্ষাবের বোঁকটা অ বশি বেশ নিভেজাল ছিল।’

‘টু ইয়োর বেনিফিট।’

‘আমি আবার অনেককিছু উড়িয়েও দিয়েছি।’ হরিকেশ একটু শুকনো গলায় বললেন। কি এসে যায়! ভাগ্য, যাকে বলে সে ভাগ্য তাঁর পেছন পেছন ফিরত, তিনি কি করতে পারেন? টাকা জমাতে পারেন নি। এখন মেয়ের বাড়ীতে বাস করছেন তাও ঠিক। কিন্তু আশ্চর্য কোনদিন ঠেকে পড়তে হয়নি। যখন যেটি প্রয়োজন সেটি হয়ে গিয়েছে। মেয়েকে এ বাড়ীটা অবশ্য হরিকেশ দেননি। স্ত্রী দিয়েছিলেন। স্ত্রীকে তাঁর বাবা দিয়ে-ছিলেন। সে বংশ আবার হরিকেশের চেয়ে অনেক ধার্মী ছিলেন। যাকে বলে বাঘের ওপর টাগ। হরিকেশ দলিলে দেখেছিলেন কোন এক বিধবার সম্পত্তি এই বাড়ীটা মাত্র চারশো টাকায় কেনা হয়েছিল। শেষবয়সে তাঁকে মেয়ের বাড়ীর একাংশে থাকতে হচ্ছে এই যা লজ্জার কথা।

‘বিয়ে উনিশশো সাত।’

‘ও ইয়েস। এন্ট্রিস পন্নীকা আর বিয়ে একই সংগ, বিশ বছর বয়সে। তারপর থেকেই আমি প্রধানত কলকাতায় থাকতে শুরু করলাম। আমার বিয়ের কিছুদিন বাদেই আমার শ্বশুর মারা যান। বিবির মা ওন্লি চাইল ছিলেন। এ বাড়ীতে সেইসময় থেকেই আমরা বাস করেছি। অবশ্য টানা বসবাস যাকে বলে তা করা সম্ভব ছিল না। বাবা দুর্গাবাড়ী ছেড়ে থাকতে চাইতেন না। কিন্তু ঐ যে ওর মাথায় ঢুকেছিল জোতদার হওয়াটা কিছু নয়, ওঁকে প্রপার ল্যান্ডওনার হতে হবে, সেইজন্যে কতকগুলো সার্টিফিকেট কান্ড করেছিলেন। যেমন ধর মুর্শিদাবাদ-বেগমপুরে বাড়ী কিনেছিলেন, যে বাড়ীতে কেউ কোনদিন থাকতে যাননি।’

কিন্তু সত্যীনাথ বেগমপুরেই মরেছিল। সত্যীনাথ, মনোরমা, উনিশশো ব্রিটিশ। তখন ওর বয়স তো পঁয়ত্রিশ হইছিল, কিন্তু হরিকেশ কি ভীষণ ক্ষেপেছিলেন, উন্মত্ত হয়েছিলেন। লোভে-ভালবাসায়-পরোপকারে-আনন্দ উপভোগে প্রতিটি প্রবৃত্তিতে প্রতিটি আবেগে হরিকেশ সমান উন্মত্ত হতে পারতেন।

‘রাঁচিতে?’

‘হ্যাঁ রাঁচিতেও বাড়ী কিনেছিলেন। কাছাকাছি একটা জগলমহালও। দ্যাট রাঁচি হাউস ওয়াজ নো গুড হাবুল। ওরকম শুকনো জায়গায় বাড়ী, তবু সাতদশতে ছিল, কারো শরীর ভাল থাকত না। আমি ওটা দিয়ে দিয়েছিলাম জানলে?’

না হাবুল, আমি তোমায় সত্যিকথা বলতে পারছি না। গুড ফর ওয়াল প্যারিস ওন্লি। মরবার পক্ষে ভাল। মোরাদাবাদী পাহাড়ের কাছাকাছি বাড়ী হাবুল, কি নিজনি, বাড়ীটা যেন একটা ‘একোয়া’। নিঃসঙ্গ জানোয়ার, যারা একেবারে একা থাকে তাদের ‘একোয়া’ বলে। তুমি একটা শহরে বড়-হওয়া ছোকরা, বই পড়ে পড়ে বড় হয়েছ। পৃথিবীটা এতবড়, বিলেতিটিলেত ঘুরে এলে কি না কি বাগিয়ে নিয়ে, বয়সও কম, তবু ভালবাসবার সময়ে ভালবাসলে তোমারই মত আরেকটা অসম্পূর্ণ রূপ, ভীতু মেয়েকে। তোমরা পোকাম-কাটা, নষ্ট, মোক। বেনোজল

যখন বেরোতে পারে না এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে লাগতে হয়, তোমরাও তেমনি। নিজেরাও পচেনে ভুগছে অন্যদেরও নষ্ট কর।

‘একোলা’ কাকে বলে, জঙ্গলের ডায়া, এ তুমি জানবে না হাবুল। জানতে হলে শরীরের রক্ত আর-বি-সি অনেক তাজা হওয়া চাই। হাই হোক রীচির সে বাড়ী মরবার পক্ষে ভাল। সত্যিকার মরেছিল। রীচির বাড়ীর কাছে সেই জোড়া পাহাড়, উদ্ভত, বড়ল। মাটি কুঁড়ে উঠেছে। অনেকদূরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উপাসনাবর দেখা যায় মোরাবাদীর ওপর। আমাদেব বাড়ীটা নিজনি। এত নিজনি। এত বেশী নিজনি। একোলা। সত্যিকার একটা গুলীখাওয়া জন্তুর মতই পালিয়ে এসে একা মরেছিল।

মরাবাড়ী হাবুল, মরাপাড়া, ‘বুগন-ভিলিয়ার প্রতিটি পাপিড় সত্যিকার ওপর বেছনো, মরাশাল। আমি জানতাম ও বাড়ীর ইটগুলো অন্ধ মরে গেছে। কিন্তু সত্যিকার কি টোয়াল লস। ডোম যখন বললে হাবুর জামাটা নোব, তখন আমি আতকে উঠে ছিলাম। হ্যাঁ ডোম। সত্যিকারকে মড়িঘরে রাখা হয়েছিল আমার জন্যে।

‘নো গুড’ হারিকেশ আরার বললেন। ভয় আছে ওর, অচেনার ভয়। মৃত্যুকে উনি এখনো চেনেন না। মরতে দেখা মানেই মৃত্যুকে চেনা নয়। তাই ভয়। রীচির বাড়ীতে হাবুর কথা কতবার কতজন বলেছে। কিন্তু হারিকেশের মনে হত নিরাপদর কথা সত্যি। সেই যে নিরাপদ বলেছিল, ‘চারবন্ধর বাসে তামা খুলে বাড়ীতে ঢুকলাম, ঢুকেই ছাতে গিয়েছিলাম রাব। দেখেছিলাম সাভাব, ঠিক তেমনি শূন্যে আছে ঘাড় ভেঙে।’ কথাটির ওর ভয় হয়েছিল। নিরাপদ তখন কি মদট দখত। ও যে আবোলতাবোলও বলতে পারে তা হারিকেশ ভুলে গিয়েছিলেন।

হারিকেশের এই ভয়ের কথা নিরাপদর কাছে শুনে বুড়নের সেকি হাসি। ‘বলিস কিরে নিরাপদ। মৃত্যু আগুন দিয়ে চিলতে চড়িয়ে দিলে তো কুন শালাকে দেখলাম না যে উঠে এসে তামুক খেল।’

‘ভারপর?’ হাবুল জিজ্ঞাস করল।

‘বলিছ।’ হারিকেশ মুখ থেকে কতকগুলো অদৃশ্য মাছি ত্যাগালেন। অদৃশ্য হাম মুছেলেন। হাম ওর মোটে হয় না। শব্দভাবে দেবতা অথবা ক্রিমিনাল এই দুজাতের মনুষ্যের ঘাম হয় না। শরীরের ময়লা সহজে বেরতে চায় না। হারিকেশ দুটোর মধ্যে কোনটা?

‘জানলে হাবুল। আজ আমার বারবার বুড়নের কথা মনে পড়ছে। অপ্রাসঙ্গিক জাবেই।’

‘হয়তো অপ্রাসঙ্গিক নয়।’

‘হাকগে, কি যেন বলছিলাম? রীচির বাড়ী, জঙ্গলমহাল। আমাদের সম্পত্তি এইভাবে ছড়ানো ছেটানো ছিল বলে কলকাতার আমার থাকটা বেশ সমীচীন মনে হয়েছিল বাবার। বাবার ছেলে একটি, মেয়ে পাঁচজন। এক ছেলের জন্য বাবা বড়বেশী ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলছিলেন সব। আমার জ্যতিভূত দিদির ছেলেরা বেগমপুরে থাকত, রীচিতে এক জ্যতিভূতাকা। বাবার আশা ছিল আমার

একটিক ছেলে হবে। রাজশাহী-দুর্গাবাড়ীর শতাব্দী চৌধুরী হলে কি হয় রাজাবাদশার মত সম্পত্তি আর বংশ বাড়িয়ে চলাতেই বিশ্বাস করতেন। বিশ্বাস করবে না বহু মেয়েকে বাতিল করে দিয়ে বাবা এমন মেয়ে বেছেছিলেন.....’

বড় জ্যোতিষীর দেখে দেওয়া কোষ্ঠি। তিনি বহুপুত্রের জন্মদী হবেন। পতাকা কেন, হারিকেশেরও কি কম আশা ছিল। তিনি বহুপুত্রের জন্মদী হবেন। হাবুলকে বলতে গিয়ে ওর মনে হল একদা তার মনে অনেক পুত্রের আকাঙ্ক্ষা ছিল একথা আজ বললেও হাবুল মনে করবে এ একধরনের ভালগারিটি। এই এক এনিমিক জেনারেশন। হয় বাঁশের এদিক ধরে ধুলেবে নয় ওদিক ধরে। সাময়িক জ্ঞান বলতে নেই। হয় সরুপ্যাট পরে, মিহিগলার কথা বলে, কিন্নরগারের সগাইকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে সরু হয়ে রইল, নইল এমনই মিলিটারী হল যে এতটুকু যন্ত্র থেকে এত শব্দ আর তুবড়ীবাঁজ বেরতে দেখে সবাই ধাঁ।

ইচ্ছে করে, হাবুলকে অপ্রস্তুত করার জন্যে হারিকেশ বললেন, ‘আমারও মনে হত হাবুল। অনেক ছেলে থাকবে, তাদের ইচ্ছেমত মানুষ করব।’

‘রিয়ালা।’ হাবুল একটু হাসল। ওর জুতোর ভেতর কি যেন কামড়াল। সম্ভবত পিপড়ে।

নিরাপদ গ্যাসের উনোন-নিভিয়ে কি আনবার জন্যে বিবিধর ঘরে ঘাচ্ছিল। যেতে যেতে বুড়োর কথার ওর ভস্ফানিয়ে হাসি পেল। ওকে কেউ জিজ্ঞাস করে না কেন? অনেককম গল্প তো ওও বলতে পারে। ছেলের ইচ্ছে ছিল। নিরাপদকে, বুড়নকে তো খুব বলতেন ঘরভরা ছেলের মত কি আছে বল?

ওরা বলত কি খাবে বাবু?

উনি বলতেন যা জুটবে তাই খাবে। লোকবলই বল।

আরো অনেক ভাল কথা বলতেন। ওদের ঘরে থাকেন, ছোলাশাকের আচার দিয়ে চানি-খাসের দানাসেম্ব খাবেন।

কিন্তু বুড়ন যখন ওর ছেলেমেয়েদের নিয়ে ‘বন্দু’ দেখাতে এসেছিল। হারিকেশ বুড়নকে ‘শাতে’ অর্থাৎ বন্দু বলতেন, শিকারের বন্দু। তখন উলঙ্গ, তেলচুকচুক, ক্রিমি ও লিভারের দোষে পা বাকানো বাচ্চা-গুলোকে দেখে হারিকেশ রীতিমত মিইয়ে গিয়েছিলেন। নিরাপদ জানে, ওর মনে আছে।

হারিকেশের ঠিক সেই কথাটাই মনে পড় গেল। বুড়নের ছেলেপুলেগুলোর কথা। এত কালো, ধামাপেট, দেখে শুনে ওর রীতি-মত কামা পেরেছিল। এরাই কি তার মনের ভ্রমকোঁহণী, সেই অজেন্ন সেনার দল, হু শ্যাল ইনহেরিট না আখ? ওর সায়েব-ডাক্তারবাড় তো বলেছিল ‘দে শ্যাল নেভার ইনহেরিট না আখ’ হ্যারি, উইথ দেয়ার বো লেগুস। ওদের ওষুধ দাও মান, জঙ্গল সাফ করে ফেল। ওদের ভয়ভয়ে বাঁচতে লাও। তোমার তো টাকারসা আছে।’

সত্যি, সায়েবডাক্তার তো। কিন্তু তেই হারিকেশকে ও বৃদ্ধিতে পারত না। বলত তুমি বল সহস্র কাজ এবং অকাজ সবুও ওদের তুমি ভালবাস।

‘বাসি বইকি।’

‘ওদের জন্য অনেককিছু করতে চাও।’

‘চাই।’ চাই চাই, প্রাণ দিতে চাই, মনেমলে আবেগভরে হারিকেশ একখাটা সেসময় প্রায়ই বলতেন। তার জীবনের বেগমপুর-বেতাল অধ্যায়ে সায়েবটা এসেছিল। বাংলাদেশের পোর্টম্যানটো উপন্যাসে যেমন সবকিছুই থাকে, লহরে লহরে উত্তেজনা পাতার পাতার দেশপ্রেম-ইতিহাস-প্রেম-বণ্ডনা আধুনিক ইন্ডিয়াস হয়ে পিবার ওপর প্রতিশোধ নেওয়া। হারিকেশের জীবনেও তাই ঘটেছিল। জীবনের সে প্রেমের চ্যাপটারে হারিকেশ তখন কয়েক বছর এক ভয়ঙ্কর ভালবাসার নিমজ্জিত হয়েছিলেন। একটি মেয়ের প্রতি একমুখী ভালবাসা। পাহাড়ের তরাইয়ের হাতীদের মত হারিকেশের মৌনও একটু, দেবীতে এসেছিল, আর সেই প্রেম হারিকেশকে কপাৎ করে গিলে ফেলেছিল।

সায়েব বলেছিল, ‘করতে চাও? দেন গো অ্যান্ড ডু ইট হ্যারি। হু স্টপস হু?’

হাবুলের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে এখন হারিকেশের মনে হল হয়তো মনে যা হয় তা কোনোদিনই গাড়িয়ে বলতে পারবেন না। ‘হাবুল, অপ্রাসঙ্গিক কথা না হয় থাক।’ ‘অপ্রাসঙ্গিক?’

‘দেখ, আমার জীবনটা এত ছড়ানো-ছেটানো, কত কথা লিখবে তুমি হাবুল।’

‘তাহলে.....?’

‘হা হা হাইলাইটস মনে কর সেই সম্পর্কে জিজ্ঞাস কর।’

‘আপনার জীবনের একটা ব্যাপার আমার আশ্চর্য লাগে।’

‘কি বল ত?’

‘ল’ এবং সাহিত্য, রাজনীতি অথবা ভেরী সেকেন্ডারী, দুটোতেই আপনি আপনার সময়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন।’

‘আশ্চর্য হবার কি আছে? মাইফেল, অভুলপ্রসাদ, চিত্তরঞ্জন সবাই তো করেছিলেন বাপু।’

‘তা হটে.....’

‘আমি জানি তুমি কি বলবে হাবুল। আমি তো ওদের মত গ্রেট নই। এটা কি জান, যদি ল আর সাহিত্য দুটোই তোমার কাছে এত আকর্ষণের হয়ে ওঠে, তাহলে কি রকম দাঁড়ায় জান? লাইফ হ্যারিয়ার গ্লি উইমেন: স্ট্রী, ল’ আর সাহিত্য। তিনজনই তোমার ওপর দাবী জানাতে থাকে, তোমার হাড় চুষতে থাকে-হাবুল। চিত্তরঞ্জন ওরাজ আলটিমেটল ‘ম্যারেড টু পলিটিকস।’ কিন্তু অন্যরা ভুল করেছিলেন। আমাদের সময়কার প্রতিটি লোক, যে যে বিষয়ে প্যাশন, সেই প্যাশনকে নিজেরের ধরুস করতে দিয়েছিল। জীবন নষ্ট হয়ে যেত, দুটো দিককে টেনে টেনেও জুড়তে পারত না, শেষ অবধি মরে যেত। আমি তা হয়ে দিই নি।’

‘এখনো দেয়। নিজেকে ছেঁচে ছেঁচে মরতে দেয়। যারা দেয় তারাই বাঁচে। এক অর্থে তাকেই বাঁচা বলে।’

‘খুব কম হাবুল। তোমরা জীবন সাবধানী, নিজেদের হিসেব করে খরচ কর। আমি ঠিক সাবধান ছিলাম না। আমার কোন দিকেই কোন বিশেষ ঝোঁক ছিল না। শিকারেও সমান আনন্দ পেরেছি, থিয়েটার দেখতেও। আসলে আমি আমাকেই সবচেয়ে ভালবাসতাম। তোমরা যেমন বাস।’

‘সবাই তাই বাসে। অবশ্য আমার কথা এ প্রসঙ্গে ওঠে না, কেননা আমি তো ক্রিয়েটিভ কিছ, করি না, আমি তো রিপোর্টার।’

‘এই তো ক্রিয়েটিভ রিপোর্টিং করছ।’
‘না না। আমি ভেতরে সাই না। উইন্ডো-ক্রানিরের মত জানলা থেকে দেখে চলে আসি।’

‘জড়িয়ে পড় না মানে নিজেকে বাঁচাও।’
‘হরিকেশ হাসলেন। বললেন ‘এই তোমাদের সময়ের গুণ হাবুল। টাইম হ্যাজ টু রু টু সারভাইভ।’

‘বাঁচাটাই তো বড় কথা।’

‘টিকে ধাকা আর বাঁচা এক নর।’

‘আমরা এই বর্তমানের সময়ের সন্তান। কোনমতে টিকে থাকতেই আমাদের কাছে অনেকখানি।’

‘মানুষ কি আরসলা হাবুল?’

‘কেন?’

‘স্ট্রিটের আদি বৃগ থেকে অনেক জীব-জন্তুর চেহারা পাণ্ডিত্যেছে। কিন্তু আরসলা টিকে গেছে। ভেবে দেখ, একদিকে সচ্যতা আর ইতিহাস কি কাণ্ড করে ফেলেছে। অলেকজান্দ্রিয়া, নিনেভ, হরম্পার কথা ভাব। কিন্তু আরসলায় এত চালাক। ওরা বরাবর সাল্লা-নাবমায় অন্ধকারে আবর্জনা খেয়ে লুকিয়ে থেকে টিকে গিয়েছে। কখনো পৃথিবীর অগ্নিগতির সঙ্গে নিজেদের জড়তে যায় নি।’

‘হাবুলের গলা রাগে শুকিয়ে গেল। জ্বালন্ত বলল, ‘দেখুন, আরেকজন উইন্ডো-ক্রানিরের মত বাইরে থেকে আমাদের সময়ের ওপর রায় দেওয়া সোজা। গত বিশ বছর ধরে পৃথিবীতে যে অবস্থা চলেছে, ডায়ালেক্টিক্যাল রেশনাল বে রটেই হয়েছে, তবুও আমরা যদি ইনভলভড হয়ে পড়ি তাহলে বাঁচতে পারব কি?’

‘তা বটে। আমি সেকথা বুঝব না।’

‘এনি ওয়ে, আপনার কথা বলুন।’

‘আমার কথা।’

‘আমিই বলি।’

‘মল।’

‘জতে আপনি দারুণ প্রাকটিশ জমিয়ে-ছিলেন। সাহিত্যেও। তখনকার দিনে বহু সম্মান পেতেন আপনি, বহু সম্মাননা। এখন, সত্যি বলতে কি...’

‘আমার লেখা কেউ পড়ে না, এই হলো তো?’

‘আপনিই তো বললেন।’

‘আরে হাবুল।’ হরিকেশ ছেসে বললেন, ‘এখন লোকে হেম-নবীন পড়ে না, কুমকমল ভট্টাচার্য পড়ে না, অধিক কথা কি,

ক্রাস ফোরের ‘পুরাতন ভূতা’ থেকে বি-এ এম-এতে ‘পদ্মভূত’, ‘রক্তকুবরী’ ছাড়া রবীন্দ্রনাথও পড়ার আনন্দে পড়ে না। সে তুলনায় আমি কে হাবুল? বল?’

‘অতীতকে এই অস্বীকার করা...’

‘আরে বাবা, আমাদের সময়ের কবিতা-লেখক হওয়া সোজা ছিল। মফস্বলে মফস্বলে কাগজ বেহুত। জমিদাররাও পেটের ছিল। আমি না হয় শব্দকটক কিছ, বেশীই পেরেছি। কিন্তু তখন ডেপুটি ম্যুন্সিফরাও রিটারার করলেই পাজা পাজা সাহিত্য করত। সাইকোলজিটা কি ছিল জান? একটা মজার গল্প বলি। আমার এক মামামশ্বরের নিজের খরচে ‘উপন্যাস’ ছেপে ছেপে ‘আনলিড বেনেট’, ‘বিসেসসন’ আরো কাকে কাকে পাঠিয়েছিলেন। আমার বলাইছিলেন, ডি এল, রায়, নবীন সেন, বাস্কম, এ’রাও ‘সিভিল সার্ভিস’, আমিও তাই। আমিও বি-এ পাশ। তাহলে আমি লিখব না কেন?’

‘রিয়াসি।’

‘আমরা যে উইসহও পেতাম প্রচুর। বড় বড় উপাধি পেতাম, মফস্বলে ছেলেরা ঘোড়ার গাড়ী ফলে সাজিয়ে আমাদের চড়িয়ে নিয়ে যেত। গৃহস্থা গিল্লীরা ডেকে নেমন্তন্ন করে ভাইফাটা দিতেন। পাতিতারা জীবনের অশ্রুসজল কাহিনী লিখে পাঠাত। ইনস্ট্রুটেড ইগো। আর আমাদের ইগোতে কি কম বাতাস পড়ত? বহুজন গোপন কথাটি জানিয়ে লিখত এটা নিয়ে গল্প লিখা। যেন আমরা ভগবান। ওদের অমর করতে পারি।’

‘সঙ্গে সঙ্গে লা।’

‘হ্যাঁ হ্যাঁ। বড় বড় কেস-এ কাজও করতাম। মফস্বলে কেস করতে গিয়ে সাহিত্য-দিবাকর খেতাব নিয়ে আসতাম। এ হেকটিক গেম। ইট ওয়াজ নাইন্-হোয়াইল ইট লাস্টেড। বসদিন ছিল, তদ্বিন বেশ লাগত হাবুল।’

‘শুধু সাহিত্যের জন্যে আপনার এই জনিপ্রিয়তা?’

‘না।’

‘হরিকেশ একটু ধামলেন। জল খেলেন। এখন বারোমাসই গরমজল খান তাই জল ক্লানক থাকে।’

‘তাহলে?’

‘বলছি।’

‘অসুবিধে হচ্ছে?’

‘না না অসুবিধে কি। তোমায় অবশ্য তখন সব কথা বলিনি।’

‘এখন বলবেন?’

‘আমার বয়সী লোকেরা বিবাহিত জীবন নিয়ে কিছ, বলে না হাবুল, কিন্তু আমি বিবাহিত জীবনে সুখী হইনি।’

‘তিনি কি খুব সাধারণ ছিলেন?’

‘সাহিত্যরত্নাকর উপাধি পাওয়া সুপদার্থ হরিকেশ, প্রতি রাতে একটু পান করে কাব্য জোখা হরিকেশ, দেওরি স্টেট কেস আর রাষ্ট্র-মাইনিস্টার কেস জেতা মেধাবী আইনজীবী হরিকেশ। প্রত্যেকদিন অজস্র চিঠি আসত, বহু বন্ধুবান্ধবও আসতেন। আর বলতে নেই, কি আদালতে, কি বাডীতে, এত

সেজেগুজে থাকতেন হরিকেশ, তখনকার দিনে যেমনটি রেওয়াজ ছিল। তেমনি ডগা-পাকানো গোফ রাখতেন। ও’র গোফ দেখে না কি বাচাইল বলোঁহল, ‘হু ইজ দ্যাট ম্যান? ও’আকিং লাইক এ রোমান এমপারার?’ বিবির মা কি হরিকেশের কাছে খুব সাধারণ ছিলেন?

‘পায়ে হেঁটে এগিয়ে গিয়ে বাঘ মেরে-ছিলেন তো বটেই, কতবার শুধু শিকারে কুশলতার জন্যেই রাজা-জমিদাররা ও’কে নেমন্তন্ন করেছে, সায়েব ডি-এম বলেছে চৌধুরী না গেলে হবে না। বিবির মা কি খুব সাধারণ ছিলেন?’

‘সাধারণ অসাধারণের কথা নয় হাবুল। মস্ত একটা সংসার থাকত যদি, যদি ও’কে বাস্তব থাকতে হত দেওরভাসুর, খুড়শাশুড়ী, পিসশাশুড়ী, দেবসেবা, নিরিমিশ আমিষ দুটো রান্নাঘর নিয়ে তাহলে ও’র আমার দেখাই হত না। হয়তো সম্পর্কও ভাল থাকত। ও’কে আমি দোষ দিচ্ছি না। তবে উনি ষে-রকম ইমোশনাল ছিলেন তাতে শুধু আমার ওপর দিয়েই সব মেটাতে চাইতেন, অথচ আমার ব্যস্ত থাকতে হত। উনিও রেগে যেতেন।’

‘বিবির পক্ষে কি সুখের লেশব! হাবুল ভাবলে।’

‘মেয়েরা বোঝে না হাবুল। আমার সঙ্গে অনেক জায়গাতেই ও’কে নিয়ে যেতাম। আশ্চর্য! স্বামীর সমানে ও’রও গৌরব হওয়া উচিত ছিল.....’

কিন্তু তা হয়নি। কি অসম্ভব প্রতিরোধ ছিল এ একটুখানি ছিপছিপে শরীরের মধ্যে। তারি কোষ্ঠিতে বহুপুত্র এ সংসারে আসবার প্রতিশ্রুতি থাকলেও তিনি কয়েকটি মৃত সন্তানের পর এ এক হতজাড়া মেয়েকে পৃথিবীতে এনেই কান্দত হলেন। তখনো ও’কে অনুতপ্ত হতেও দেখেননি হরিকেশ। মেয়েরা যদি সুসন্তানের জননী না হতে পারল তাহলে তাদের বেঁচে থেকে লাভ কি বল। যোগ্য, বলিষ্ঠ, বীর সন্তান চাই। তা হয়নি বলেই কি পৃথিবীটা অবাকুত মানুষে ভরে যাচ্ছে না? কিন্তু বিবির মাসেদিকে মাথাই ঘামাতেন না। এমন কি একবার চিবুকে আঙুল রেখে হরিকেশের কথা শুনতে শুনতে এমন কথাও বলেছিলেন ‘তুমি আরেকটা বিয়ে কর না কেন?’

আরেকটা বিয়ে! হরিকেশের সমসাময়িক একদল সাহিত্যিক ছিলেন যারা শুধু মেয়েদেরই দৃষ্ণে অভিমুত হতেন। কে বিশ্বাস হলে, কার ছেলেকে সাপে কামড়াল, কোন পঞ্জীবধুর স্বামী দুটো বিয়ে করলে, তাদের নিয়েই তাঁরা বড় বড় কবিতা লিখতেন। মফস্বলের কাগজে সে সব লেখা ছাপা হত। পাণ্ডুলিপিতেও লেখকদের চোখের জল মাঝে মাঝে ঝরে পড়ত যার তাই দেখে বোঝা যেত একমাত্র টিয়ারল্যান্ড এ সুড়সুড়ি লাগলেই ও’রা কবিতা লিখতে পারেন।

হরিকেশ ও’দের নিয়ে হাসতেন। গোফ-ওয়াল। বড় জুড়োপরা কাঁধে উড়নি ফেলা এই কবিদের দেখলে ও’র আমোদ হত।



পূজো
এলো

প্রতিবারের মত এবারও
মনের অঙ্গনে ঢাকের
বাঁড় শুনতে পাচ্ছে

বোরোলীন

সকলের মনের খবর তার
মুখস্ত। কানে বাজছে ঢাকের
বাঁড়, হাওয়ায় শেফালীর গন্ধ।

-পূজো আসছে।

-এলো বুঝি অচিরেই।



অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম 'বোরোলীন'

উৎসব-দিনেও সকলের মনের

মত বন্ধু, - সহচর।

বোরোলীন হাউস,

কলিকাতা-৩

কিন্তু তাঁনি নিজে? নিজে তো মেয়েদের দুর্ভাগ্যমোচনের হাজারটা সংগঠনের চাঁপা কেওয়া সদস্য ছিলেন, মেয়েদের বহু সভার সভাপতিত্ব করতে ছুটে যেতেন। একাধিক বিবাহের কুফল নিয়ে কম লেখালেখি করেননি। তখনো অনেক ভদ্রসন্তানই এ কাজ করে থাকতেন।

সেই হারিকেশ আরেকটা বিবেক করবেন। বিবির মা বলছিলেন, “আমাদের জামাই তো করেছেন। আর, এ রকম রে হতে পারে তা তোমারও অজানা ছিল না। খোঁজ-ভাজ নিলেই জানতে পারতে। তুমিও কর। পুরুষমানুষের চরিত্র বেরানিশটা কি একটা বলুন?”

তারপর বিবির মা চুল জড়িয়ে পুর করছিলেন। একটু লালচে চুল ছিল তার, কোলানো, ফাঁপানো, পাতলা। চুল জড়িয়ে আঁচড়াতে বলছিলেন, “আমি কিছু মনে করব না।”

হাবুলকে ওর সব কথা বলতে ইচ্ছে হল। হাবুল, মেয়েরা পুরুষদের ভেঙে ফেলে, অপসার্য করে ফেলে। ওরা রাতে ঘেমা করে তার সঙ্গে স্বচ্ছন্দে বছরের পর বছর থাকতে পারে হাবুল, যাকে ভালবাসে তাকে দুমড়ে-মুচড়ে ছেঁড়ে ফেলে। তারপর হাছাকার করে ফিলাপ করে।

হাবুল চিবুকে আঙুল রেখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। কি অস্বস্তি, কি অস্বস্তি। ওরকম স্থির-স্থির হয়ে তাকিয়ে থাকা হারিকেশ পছন্দ করেন না। সাত্যাকি ওর দিকে এ একই দৃষ্টিতে চেয়েছিল, কি অপচয় সাত্যাকি, কি অকারণ অপচয়। এখনো হারিকেশের মনে সে কতটা বাধা মশান-চালার চেষ্টার ব্যর্থতার মত হা হা করে বয়ে যায়।

মনোরমাও তাকিয়েছিল। সত্যিকান্ত সেনের মৃতদেহের ওপর থেকে। মাঝখানে এক বিশাল দেশকর্মীর মৃতদেহ, দু-পাশে দাঁড়িয়ে তাঁরা দুজন। ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনোরমার চোখের ওপর পদা পড়ে গেল, চোখ বোবা হয়ে গেল। তারপর দেখা গেল অকিঞ্চলক চোখের মণি। চোখের পলক, হু, কিন্তু সব কিছু বোবা, ঠেট বন্ধ। এখনো মধু বছরের ব্যবধানে সে চোখের কথা মনে পড়লেই হারিকেশের অস্বস্তি হয়।

“আর কি ব্যাকি রইল বল ত হাবুল?”

“অপার্মি বলুন।” হাবুলের এখন ক্রান্ত লাগছে। এমন ক্রান্ত ও সহজেই হয় তখন ডাক্তার কোনারের প্রেসক্রিপশনের সবজি হাড় খেলেই মনে প্রফুল্লতা আসে। ডাক্তার কোনাব ওষুধ খাওয়ার অভ্যাস করতে বারণ করেছিলেন, কিন্তু হাবুল ওর বারণ প্রায়ই অমান্য করে। আজকাল অনেক সময়েই নিজেকে বন্দী বন্দী মনে হয় ওর। যেন নিজের মধ্যেই নিজে হাবুল কাঁদে ধরা পড়ে হাত-পা বাঁধা হয়ে আছে। এই অবস্থার একটি সবজি বাড়ি কি মৃত্যির স্বাদ সিতে পারে, কি প্রকৃত্তা আনতে পারে শরীরে তা হাবুল কাজে বোঝাতে পারবে না।

তা হাড়, বাপকে ধারা পাপের ভর দেখিয়ে, এই হারিকেশও ভাববেই একজন।

বেচারা বন্দী। ওর বাবা তখনো ছিলেন। দাদু ওর মা-কে কষ্ট দিয়েছেন। বাপার ভাষায় ওরা পাপী। তারপর থেকে বাপার যখন মনে হল হাবুলের ভালবাসা সেও ওর পক্ষে আরেকটা বাড়ি পাশ, তখনই বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে গেল। যেন পালায়ে বাঁচা যায়। যেন পালাতে পালাতে অনেক দূর গেলেও কোন না কোন সময়ে ধরা পড়তে হয় না।

“হাবুল, আমি কি বলব?”

এখন হাবুল মনে থেকে দুর্বলতা কেড়ে ফেলে দিল। হারিকেশকে আর বাঁচিয়ে চলে কোন লাভ নেই। বুড়োবয়সে লোকটা কিছু কিছু মিথ্যা নিয়ে মরে যেতে পারবে না সে বড় দুঃখের কথা। কিন্তু হাবুলের কিছু করার নেই। বিবির বুকে এক কথা ওঁকে সব স্বীকার করতে হবে কেননা ওঁকে বড় হতে হবে শব্দ, ওঁরই জন্যে এ বাড়ীতে কোনদিন সুখ আসেনি। এখন বাপার প্রশ্ন বিবির কাছে সবচেয়ে বড়, আর, বিবির গোলক-ধাঁধার মত জটিল মনে এ ধারণা বন্ধমূল হারিকেশের সবকিছু স্বীকার করার সঙ্গে বাপার সুখী হওয়ার কি যেন একটা যোগাযোগ আছে।

তাহাজ্ঞা মনোরমা সেনের চিঠি। কিছুই মরে না পৃথিবীতে, বত পুরনো হোক না কেন, কোথাও না কোথাও থেকে অতীতের ভূত মাথা তোলে। একটি প্রাচীন, প্রায়কুল-বাওয়া রাজনৈতিক হত্যা। কিন্তু কোথায় তার আরেকটা জার্মান চাপা ছিল বল, এতদিন বাদে হারিকেশের জন্মদিনের উৎসবকে নষ্ট করে দেবার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

“কি বলব হাবুল?” হু ওল্ড ওল্ড ম্যান। হাবুল মনে ভাবল আমার এখন দুঃখ হচ্ছে, লক্ষ্য করছে, যেন আমি উৎসবে সাজানো মৃত্যির গা থেকে কাপড় খুলে নিচ্ছি আমি এত নোংরা। যেন আমি পাথরের মৃত্যির মধ্যে কাদা ছুঁড়ছি আমি এত অসভ্য। কিন্তু অসভ্যতা, নোংরামি তো আমি হরদম করি। ইচ্ছের বা অনিচ্ছের কোন না কোন সময়ে ইতর হতেই হয়। আমি না করলেও আমাকে দিয়ে করায়।

“দেখুন অনেককণ আমরা বসে আছি, অনেক কথাই হল। আপনায় সম্পর্কে জানবার মতো অনেক কথা আমার কাইলে আছে। রাজনীতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটা যোগাযোগ আপনাকে একটা আলো জলপ্রস্রতা দিয়েছিল বললে বোধহয় খুব ভাল বলা হবে না।”

“সে তো নিশ্চয়ই হাবুল।”

“এই যোগাযোগ প্রথমে আপনার সত্যিকান্ত সেনের মাধ্যমে হয়েছিল তো?”

“হ্যাঁ। সত্যি আমার ইস্কুল-কলেজের বন্ধু। ওর সঙ্গে রাজনীতির কতটা যোগাযোগ ছিল আমি প্রথমে জানতাম না। তবে একজন বাঙালী হিসেবে, স্বজাতিই আমার দরুণ সহানুভূতি ছিল হাবুল। তা ছাড়া, যখন আমার বয়স সত্যিই কম, তখনো আমরা পোলিটিক্যাল থ্রাশ দেখতে যেতাম, পড়তাম। আর, বন্ধুদের কথা ডুলে বেও না।”

“বুড়ুন?”

“হ্যাঁ। আমাদের পুরনো ট্রাকার, আমার পুরনো বন্ধু। বুড়নের ঠাণ্ডা চম্পারিগে, বিহারে, মীলহুটির সারেরের জমির ধানের দখল নিয়ে লড়াই গিয়ে সারেরের মূল্যে মরেছিল। বুড়নের বাবা আরো সাংঘাতিক কাজ করেছিল হাবুল। দেশ ছেড়ে পালিয়ে আসবার পর আমাদের মত লোকদের কাছেই ওরা আশ্রয় নিত।”

“তারপর?”

আমি দেওরি স্টেট কেন করছিলাম। মৌনিনীপুর তখন মরমনসিংহের পর সেকেন্ড লাক্সেস্টি ডিস্ট্রিক্ট অফ বেঙ্গল। বাংলা আর উড়িষ্যার মাঝেও মৌনিনীপুর, বাংলা আর ছোটনাগপুরের মধ্যেও মৌনিনীপুর। ছোটনাগপুরের কমিশনার ছিলেন এই সব স্টেটের কাছে ভারত সরকারের প্রতিনিধি। তিনি রাঁচিতে থাকতেন। এই দেওরি ছিল সিংড়য়ে। সিংড়য়ের হো বা লাড়কা-কোল বা লাড়িয়ে-কোল বারী, তাদের তুমি পৃথিবীর আদিমতম কম্যুনিষ্ট বলতে পার। ওরা পৃথিবীর আদিম অধিবাসী, প্রিমিভাল মানুষ ওরা। মার্কস জন্মাবার বহু বছর আগে থেকেই ওরা কম্যুনিজম প্রয়োগ করে আসছিল।”

“কি রকম?”

“রাঁচির বিরশা মন্ডার বিদ্রোহের একখানা রিপোর্ট আমি দেখেছিলাম। রাঁচির মন্ডা, মানভূমের তুইয়া আর লাড়কা-কোলরা গুরিজানালি এক। ওরা সবাই মন্ডা। ইংরেজদের আসবার পর যেমন ওরা ছাড়িয়ে পড়ে, তেমনই বিভিন্ন নাম নেয়। বিরশা মন্ডা কি চেয়েছিল তার একটা ইস্তাহার তৈরী করা হয়েছিল। আমি তার একটা পুরনো কপি রাঁচিতে দেখেছিলাম হাবুল, একজন রিটার্ড পুন্ডিশ-সুপারের বাড়ীতে। লাড়কা-কোলরা আর বিরশা মন্ডার অনুচররা সবাই প্রিমিটিভ কম্যুনিজম-এ বিশ্বাসী।”

“বলুন।” বুড়ো হয়ে গেলেই বোধ হয় মনটা আর গোছানো থাকে না। এত কথাও মনে হয়, হাবুল ভাবল।

“সো নাইস হাবুল। দেখতে দেখতে আমি ইমোশনে কেঁদে ফেলেছিলাম বলতে পার। ডেড রেভল্যুশন, ডেড পীপল, বাট্, না ওআডস্। ভীষণ হলুদ হয়ে গিয়েছিল কাগজটা। আমি বললাম এ কি করেছ, এ তো ১৮৯৯-এর রাইজিং-এর ব্যাপার। এটা রেখেছ? ইসমাইল হাসনে, বললে, ইনটারেস্টিং তাই না? আমি বললাম কোথায় গেলে? ও বললে বিরশা ওতমজ এডুকেটেড। আমি বললাম বিরশাকে দেখেছ? ও বললে হ্যাঁ। অসম্ভব ডিগনিটি ছিল লোকটার। লম্বা-চওড়া নয়, কিন্তু হি হ্যাড দ্য ডিগনিটি অফ দ্য ওল্ড কিংস অ্যান্ড এম্পারস্। কাগজটার কি লেখা ছিল জান হাবুল?”

“কি?”

“মাইন্ড হু। তার আগে মন্ডাদের, লাড়কা-কোলদের, হো-দের, তুইয়াদের অনেকগুলো আন্দোলন হয়ে গিয়েছে।

এখন দেখতে পাই ওদের বিদ্রোহকে কেউ বলছে রেবোলিউন, কেউ আপরাইজিং, কেউ রেভলুশ্যন। তা যে নামেই ডাক না কেন, ফ্যাক্ট রিমেইনস; প্রত্যেকটাই বিদ্রোহ। জান কেন বিদ্রোহ?”

“জানি বোধ হয়।”

“জান না। ওরা হচ্ছে ভারতবর্ষের আদিমতম অধিবাসী। ওরাই প্রথম কম্যুনিষ্ট। জান, জাহাঙ্গীরের সময় এরা প্রথম সরকারকে কর দেয়? তার আগে কত লক্ষ বছর ধরে ওরা কর দেয়নি। তারপরেও ওরা জঙ্গলে থেকেছে, শূদ্ধ সামান্য কর দিয়েছে, তা ছাড়া এক অশুভ ধরনের ল্যান্ডসিস্টেম ফলো করেছে যার তুলনা তুমি আর কোথাও পাবে না। ইস্তাহারে তার সব কথাই লেখা ছিল হাবুল। লেখা ছিল মাটি কেউ স্বেগ নিয়ে আসেনি, কেউ স্বেগ নিয়ে যাবে না। মাটি তার, যে চাষ করবে। লেখা ছিল আমরা খুঁটকাটি, জঙ্গল কেটে বসত করছি। চষতবাটি, বসতবাটিতে আমাদের অধিকার এই রকম, জমির ওপর যা ফলবে তার ওপর স্বয়ং, জমির নিচে যা থাকবে তার তলস্বয়, পাহাড়ের ওপরে আর নিচে, নদীর ওপরে আর নিচে যা আছে সব আমাদের। কোল্‌হান, এই কোল্‌ভূমি আমাদের আমাদের। কেননা আমরা জমিতে প্রথম চোটে দিয়েছি। লেখা ছিল যা একজনের তাই সকলের। সব ধান এক জায়গায় করবে সমাজ, সকলকে ভাত-কাপড় দেবে সমাজ।”

“কর্তাদিন আগেকার কথা?”

“এটা তো ১৮৯৯-এর কথা। তবে ওদের প্রত্যেকটা বিকোভের ভেতরে এই একটা কথাই থাকত। কিন্তু এত কথা বলছি কেন বল ত?”

“দেওরির স্টেটের কথা।”

“হ্যাঁ, দেওরি। বেশ বড় স্টেট। রাজ্যের সঙ্গে চীফকমিশনারএর বনিবনা ছিল না। চীফকমিশনার তখন শীতের সময়ে এই সব স্টেটে ট্যাক্স করতে আসত। সঙ্গে একাট রেজিট্রার আসত আর এই কোল্‌হান, কোল্‌ভূমিতে তো ওরা সিকিউরিটির কড়া বন্দোবস্ত না করে এক পা নড়ত না। যেতে হত হাতীতে। সঙ্গে কাম্প আর লিকার চলত। খরচ দিতে হত স্টেটকে। তা দেওরির রাজা নাচগান, আতসবাজি, খানাপনা সবই করেছিলেন কিন্তু কমিশনারকে প্যালেসে ডাকেননি বা নিজেও দেখা করতে বাননি। বলোছিলেন ও’র গুরুবিয়োগ হয়েছে আর এ অশোচে বিধবীর মূখ দেখতে নেই। কমিশনারের কানে স্বভাবতই কথাটা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে অন্য চেহারায় পৌঁছল। এরপরে আরেকটা কি বড়ার ফরেষ্ট নিয়ে গন্ডগোল বাধে। আমি যখন রাঁচিতে রাজ্যের দেশী এজেন্টের সঙ্গে দেখা করি তখন দেওরির মালিকানা নিয়ে ভয়ানক গন্ডগোল চলেছে। রাজা মারা গেছেন। যে ছেলেকে রাজা করে গেছেন তার সংভাই আর সংঘা নালিশ করেছে বড়োবয়সে লোকটা আপিম ধরেছিল, মাথা খারাপ হয়েছিল, তাই ওর সিলেকশন বৈধ নয়।”

“আপনাকে ডেকেছিল?”

“হ্যাঁ। কেসটার কথা বড় কথা নয়। এখানে আবার সত্যের দেখা পেলাম। আমাদের সত্যিকান্ত সেন। দেখলাম আমার সহপাঠী সত্যী সেন, সত্যিকান্ত দেওরিতে আমি যার হয়ে লড়ব, সেই যুবরাজের ছেলের টিউটর হয়ে বসে আছে। আমি ওর ওখানেই ওঠলাম। ও আমার বললে ওদের গ্রুপের কথা। বললে তোর বাড়ী তো

কাজ করছি। তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা আমার আগেও মনে হয়েছিল। তুমি এখন লক্ষপ্রাপ্ত লোক। টাকা-পয়সা করেছ, তুমি আমাদের সাহায্য করতে পার। পরে বুঝেছিলাম শিকারে বোঁকের জন্যে আমার সঙ্গে সায়েবদের, বা বড় অফিসারদের বেশ যোগাযোগ ছিল, সেটা সবাই জানত। আমাদের রাঁচির বাড়ী,



“তুমি আর একটু বিয়ে কর না”

রাজসাহী জেলায়। রাজসাহীরও যে গ্রাম ছিল একটা পুন্ডিশের ফাইলে তা আমাকে সত্যী বললে। আমি বললাম তা তুমি এখানে কি করছিস বল? ও বললে দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার পর কলকাতায় থাকার আমার ঠিক ঠিক হচ্ছিল না তাই এখানে চলে এলাম।”

“উনশ শ্যাকিশ?”

“হ্যাঁ তোমার মনে আছে দেখছি। আমি বললাম এখানে এসে কি করছিস? ও বললে

বেতোলের কুঠি, বেগমপুরের বাড়ী, এই যে এক-এক জায়গায় এক একটা আস্তানা, এটা, সত্যীদের মনে হয়েছিল বেশ কাজে লাগানো যেতে পারে। আমার সম্পত্তি ওরা চট করে সার্চ করবে না।”

“উনশ শ্যাকিশ! এতদিন বাদে? আমার ধারণা ছিল.....”

“আমি তার আগে থেকেই রাজনীতি করেছি? না না। আমার সহানুভূতি সব সময়ে থেকেছে, আমি টাকা দিয়ে সাহায্য

করোঁছি, বই ছাপানোতে সাহায্য করোঁছি। না না, সিডিশাস বই নয় হাবল। এখন তোমাদের হয়তো হাসি পায়, কিন্তু আমরা তখন গ্রামে গ্রামে, মফস্বলে, কি পুরনো মন্দির উল্লেখ করে, কি মেয়েদের জন্যে ইশ্কুল তৈরীতে, কি ফ্যাণ্টাস্টিক সব স্বদেশী শিল্প দাড় করাতে কি উৎসাহ পেতাম তা তুমি বুঝবে না। আমি তো কোন কাজের মতই যেতাম না হাবল, যে যখন চাইত, টাকা দিতাম। শব্দ, তাতেই যে কি সুনাম পাওয়া যেত, সবাই ধনা ধনা করত, তা তোমরা বুঝবে না।

“না। আমাদের পক্ষে বোধা মুশ্কিল।”
“সত্যী জানত, আমিও সত্যীকে বললাম আমি কি সাহায্য করতে পারব বল? আমার তো একটা পাসোঁনা জীবন আছে ভাট। টাকা খরচ করতে ভালবাসি, মিহি কাপড় ছাড়া পারি না। শীতকালে থিয়েটার আমার দেখাই চাই। বছরে না পারলেও দু'বছরে একবার শিকারে বেরোই। আই অ্যাম নট ইওর ম্যান।”

সত্যীকান্ত সেনের নয়। তবে কার? হাবলের সন্দেহ হল হরিকেশ হরতো চিরদিন হরিকেশেরই থেকেছেন। আর কারো হতে পারেননি।

তাহা ছাড়া তোমাদের, এত দল। এত ডিসেনশ্যন, আমি এমনিতেই জীষণ ব্যস্ত মনেই সত্যী। যখন দরকার, তখন কি আমি তোমাদের সাহায্য করিনি? আমি একটু ক্লান্ত হয়েছিলাম। কেননা তিন বছর আগে নৈহাটির কাল রায় আর ফরিদপুরের মাখন দত্তকে যখন মালাবার জেলে নিয়ে যায়, তখন আমিই ওদের ডিফেন্স দিয়েছিলাম। কম ডেটিনউদের ফ্যামিলিকে সাহায্য করিনি। করোঁছি বলে অহংকার করবার কিছু ছিল বলে আমি আজও মনে করি না। আমার আয়ের অনেকটাই আমার বিনা চেন্টার স্বগত পড়াকী চোখবুজির দুরদর্শিতায়। সে টাকা অদানে অস্বাভাবিক যেতে পারত কিন্তু কিছু ভাল কাজ হাঁজিল সে ফার সো গুট।

“সত্যী সেন কি বললেন?”

সত্যী বললে তোমাকে এগিয়ে এসে কাউকে ডিফেন্স করতে হবে না। একটি মাত্র উপায়ে তুমি আমাদের সাহায্য করতে পার। তোমার বেগমপুরের কুঠি আছে না? বেগমপুর ইজ সো নিয়ার নর্থ বেংগল। পদ্মা পেরোলেই রামপুর বোয়ালিয়া। আমি বললাম কেন? ও বললে আম'স রাখবার জন্যে। তোমার পুরনো লোকজনকে সরিয়ে দিতে হবে। জিনিসগুলো প্রেসাস্। আমি বললাম কে থাকবে ওখানে? ও বললে আমি। আমার হাসি পেল। পেটের রোগে দড়ি পাকানো সত্যী সেন, কবিরাজী চুণ না খেলে বার চেকুর ওঠে সে দেবে অস্বস্তিক পাহার। আমি হাসতে গিয়ে চুপ করে গেলাম।

কেননা সত্যী সেনের চোখে এক ধরনের উন্মত্ততা জ্বলছিল। ফ্যানাটিক চোখ। ফ্যানাটিকজমকে, যে কোনরকম প্রবল উন্মত্ততাকে হরিকেশ ভয় পেতেন। হরিকেশ শিকারী ছিলেন। শিকার মানে ঠান্ডা মাথা। সত্যী চোখ, সাধনাত্মক। হরিকেশ নিজে উন্মত্ত হতেন, মেতে ওঠবার, ভেসে যাবার

বিপদ জানতেন, সেইজন্যই কি অন্যকে উন্মত্ত হতে দেয়ালে ভয় পেতেন?

“আপনি রাজী হলেন?”

“নিশ্চয়। ও যখন বলছে, ও আমার বন্ধু, আমি ওর কথা ফেলতাম না। তা ছাড়া এতে আমার কোন কতিবাঁধি ছিল না। আমারও নিজের জমি ছিল হাবল। তবে সত্যীকান্ত-দের জমি থাকবে না কেন? অল বেংগল আম'ড আপরাইজিং! তা ঠিক না ভুল, ভাল কি মন্দ, বলতে যাবার আমি কে?”

“সবেরা আপনার ওপর চটেতে পারত।”

এখন হরিকেশের চোখ পুরনো সেই শিকারের দিনের মত ঠান্ডা আর বিজ্ঞার হয়ে গেল। যেন উনি সাপ দেখেছেন, অথবা বিষাক্ত কোন পোক। তারপর আরো ঠান্ডা আর বিস্তীর্ণ গলার উনি বললেন, হোআট ডিড আই ক্যোর ফর দেম হাবল? তুমি কি বলতে চাইছ?”

“আপনার সঙ্গে ওদের.....”

“আমরা পুরনো দিনের রোমান্টিক রাজনীতিক হাবল, এখনকার মত দুটো নুশে নু” রকম কথা বলতে শিখিনি।”

“আপনি চটে যাচ্ছেন।”

“ওদের মধ্যে অনেকে শিকারের খেলায় আমার বন্ধু ছিল, ওদের জন্যে আমি বহুবার শিকারের ব্যবস্থা করেছি। যাকে ভাল লাগত তার সঙ্গেই বন্ধুত্ব করেছি। মিশনারী, ডাক্তার, যে কেউ। কিন্তু, একজন ভারতীয় হিসেবে সেদিন সবাই বা ভাবত আমিও তাই ভেবেছি।”

“তাহলে সত্যীকান্ত সেনই আপনার কণ্টাক্ট হ্যাঁ।”

মারা জানবার তারা জানত আর এই যোগাযোগের ফলে আপনি একটা আলগা জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন?”

“বলতে পার।”

“এই সত্যীকান্ত সেনই আত্মহত্যা করেছিলেন বেগমপুরে?”

“দু'ঘণ্টা না ঘটলে ওকে আত্মহত্যা করতে হত হয়তো।”

মনোরমার চোখ, মনোরমার মুখ। মাঝখানে সতীনাথের মৃতদেহ। এত ছোট শরীর থেকে এত রক্ত বেরোতে পারে? হরিকেশ সেদিনও অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। মানু'ষের শরীরে কতটা রক্ত থাকে, কত গ্যালন অথবা কত সে'র সে' হিসেবেও যেন হরিকেশ সেদিন জ্বলে গিয়েছিলেন। মনোরমার চোখ দুটো দেখতে দেখতে আর যেন কিছু মনে ছিল না।

হাবল বলল, “দু'ঘণ্টা, আত্মহত্যা! সবাই শব্দ অফিসিয়াল ভাষা'মতই জানে। পরিশ্রম বছর ধরে কি করে জানা যাবে?”

কেননা এদেশের জলবায়ু আর্দ্র, উষ্ণ, বহু ও উপাদান ক্ষয়কারী। হাবলের এখন ভুলে গেছে পড়া কথাবার্তা মনে পড়ল। এ দেশের জলবায়ুতে প্রাণ বা সত্য আগে মারা যায়। প্রত্যেকটা ঘটনার সত্য সত্যি চেহারাট পালটে গিয়ে গল্পগোল্প। চেহারাট ঠিক থাকে। সেই গল্প গল্প চেহারাটই আমাদের পছন্দ। এদেশে একটি পুরনো মৃত্যু

সংবাদকে হুঁরি দিয়ে চিরলে কতখানি সত্য কথা বেরিয়ে আসবে?

“কি জানা যাবে?”

“মনোরমা সেনের কথা?”

“কি কথা? মনোরমা একটু বাইচড়া, একটু খাপটে ছিল ঝটে...শেখতাপে.....”

“কিন্তু উনি বা বলে গিয়েছেন, তার উত্তর একমাত্র আপনি দিতে পারেন। ও'রা দু'জনই মারা গিয়েছেন।”

“সো?”

“মনোরমা সেন বলে গিয়েছেন আপনি সতীনাথের মৃত্যু ঘটিয়েছিলেন। আপনাকেই তিনি দায়ী করে গিয়েছেন।”

দু'জনই দু'জনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন।

“মনোরমা সেনকে আমি ছোটবেলা থেকেই জানি। বলতে গেলে অনেক আগে থেকে।”

“তিনি আপনাকে দায়ী করে গিয়েছেন।”

“আমাকে।”

“আপনাকে।”

এখন ক্রমেই হরিকেশের নিশ্বাসের কণ্ট হতে লাগল। ক্রমেই বুক ঠেলে উঠতে লাগল তাঁর। মেরো এত কমাইনি হয়। মেরেদের মধ্যে করুণা আর মমতা দেখেছেন হরিকেশবাবু। যাদের মধ্যে দেখেছেন তাদের ওপর ও'র কোন টান ছিল না। বেদানা দাসী ও'কে মহামানব বলত। শব্দ ও'কে একবারটি চোখের দেখা দেখতে পাবে বলে মেদিনীপুর বাজ' হত্যার পরে পরেই কতকগুলো কাগজ-পত্র তার ঘরে লুকিয়ে রাখতে রাজী হয়েছিল। বেদানা দাসী। এক সামান্য স্ত্রী। ও'র দূর থেকে পূজা করাও হরিকেশের ভাল লাগত। ততদিনে ভালোবাসার জ্বর ও'কে মৃদু তেতো করে দিয়েছিল, জীবনে বাঁচবার আনন্দের অনেকটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সামান্য বৈশ্যার অনুরোধে ততদিনে আর তাঁর কণ্টকু বিরাগ থাকতে পারত? আর ঐ দূর থেকে ভাঙি করা। মনের একটা দিক মরে গিয়েছিল। আত্মমরা একটা লোকের কতটা রুচি বেঁচে থাকতে পারে? আর তাঁর মত একটা বর্ণিত লোকের।

যাদের মধ্যে তিনি কমা চেয়েছিলেন, বিবির মা, বিবি, মনোরমা। তারা ও'কে কমা করেনি। শালিনী কমা করেছে বটে। কিন্তু শালিনীর কাছে যখন গিয়েছিলেন তখন তো তিনি অর্ধেকট মরে গিয়েছেন। শালিনী তো তাকে তেমন করে টানেনি, তাই তার কমাকেই বা কণ্টকু মৃত্যু দিতে পারেন হরিকেশ। আর ঐ যে শুনলেন শালিনী আশ্রমে থাকে। ওতেই তো মন বিমুখ হয়ে গেল। নেড়ামাথা, গেরামপরা, দিয়ারিম্ব খাওয়া, ডাবলেই হরিকেশের এত খারাপ লাগে। আত্মমের মিটিমিটে চেহারা পানসে বিধবাদের দল দেখতে এত খারাপ লাগত। যেতেন, টাকা দিতেন, মিটিং করতেন। কিন্তু তারপরই খুব মজা মাংস চুষে চিবিয়ে খেয়ে ফিটন চড়ে বেড়াতে ইচ্ছে করত।

মেরো কমা করে না। ভালোবাসা, প্রেম, মমতা, স্নেহ, সবকিছুর প্রয়োজনই এতদিন না একদিন ঘরোয়া। কমা'র প্রয়োজন

কুরোর না। বিনাস্তে, কোন কথা জিগোস না করে কমা করতে হয় নইলে মানুষ বাঁচে না, পুরুষমানুষ বাঁচে না। মেয়েদের শরীরটা পর্যন্ত মমতা, স্নেহসূধা বিলোবার মত করে তৈরী, অথচ মনে কমা এত কম।

‘আপনার কি কোন কষ্ট হচ্ছে?’

‘না,’ হরিকেশ মাথা নাড়তে লাগলেন। বুড়ো হয়ে যাওয়া, ডানাভাঙা, লোমওঠা, আহত একটা পাখির মত দেখাতে লাগল তাকে। ছাতের নখ পাখির খাবার মজ, কিন্তু কি ভুল। উপশয় ব্যাধের আশ্রয় নেবার জায়গা। কিন্তু পুরনো। পুরনো আর পেড়ে উপশয়ে কসে কসে বুড়ো একটা পাখি হয়ে যাচ্ছে।

এই সময়ে নিরাপদ ছুটে এল। বিবির শরীর অস্থির করছে, বিবিবিদী হাবুলকে ডাকছেন। হরিকেশকেও।

‘আমাকে?’

‘তাই তো বললেন।’

‘না না, হরিকেশ মাথা নাড়তে লাগলেন। ‘তুমি বাও হাবুল। আমাকে দেখলে ও আরো অস্থির হবে। নিরাপদ তুইও যা। যদি কিছু লাগে টাঙ্গে। আমি যাব না হাবুল। বিবি আমাকে.....’

শুকনো ফোঁপানি গলার চেপে নিলেন হরিকেশ। হাবুল চলে গেছে। নিরাপদও চলে গেছে। হরিকেশের বলতে ইচ্ছে হল সকলে বিবি ওকে বুঢ়নের আর বুড়ি সাত্তারিকও মৃত্যুর জন্যে ধারী করে গিয়েছে।

জন্মদিনের দিন তিন তিনটে বুঢ়নের অভিব্যক্তি মাথার নিরে হরিকেশ ঘন ঘন বোজিল টানতে লাগলেন। হাতে করে না মারলেও প্রাণে মারা যায়। কিন্তু বুঢ়ন? বুঢ়নের কথা কি করে বলল বিবি? যদি কারো জন্যে প্রাণ দিতে হয় হরিকেশকে, মাসে কবার কথা। তাহলে একমাত্র বুঢ়নের জন্যেই তিনি প্রাণ দিতে পারেন। বিবি মোরে-ছেলে হয়ে সে কথা কি করে বুঝবে?

II পাঠ II

তখন তাঁর বরষ পঞ্চাশ হয়ে গিয়েছিল। সেটা গ্রিশ বছর আগেকার কথা। ঢেড় জঙ্গলের বাঘ মারবার জন্যে তিনি ঠিক তৈরী ছিলেন না কিন্তু বুঢ়ন বলেছিল মারকা তারুণ, বড় বাঘ। অত্যন্ত কখনো-সখনো বুঢ়ন সাঁওতালী বলত, আবার হিল্লীও বলত। রাজসাহী-দুর্গাবাড়ী থাকবার সময়ে ও সাঁওতালী লিখতেও শিখেছিল। তারপর বলেছিল একোরা। যে জানোয়ারকে তার দল ছেড়ে যায়, একা থাকে সেই হয় একোরা। ঢেড়ের বাঘ তখন তারা জোরান তবুও, প্রাণের মিছন মাসে সে একোরা হয়ে গিয়েছিল। সেইজন্যে হরিকেশ তাকে মারতে রাজী হয়েছিলেন কেননা তখন তিনিও একোরা হয়ে গিয়েছিলেন, সবাই তাকে ছেড়ে গিয়েছিল। একোরা জানোয়ারের চেয়েও একোরা পুরষের নিঃসম্প্রদা ভীষণ হতে পারে। একা থাকবার ভয় মানুষকে খেয়ে নেয়, হরিকেশকেও খাচ্ছিল। তিনি রাঁচি থেকে টোড়ী, টোড়ী থেকে কেড়গোরা, রাজো হয়ে টোড়ীতে চলে এসেছিলেন।

বুঢ়ন বলেছিল, অত মদ খাস না।

তিনি বুঢ়নকে গাল দিয়েছিলেন।

বিলী, জখনা ভাষার গাল দিয়েছিলেন, কেননা বিবির মা ওকে আরো জখনা অপমান করেছিলেন। বিবির মেয়ের অসুখ হয়েছিল, বাসী হয়ে যাচ্ছিল। বিবির বর ওকে নিতে এসেছিল, উনি তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কেননা বিবির বর আরেকটা বিয়ে করে বিবিকে ভীষণ অপমান করেছিল। বিবির মা বলেছিলেন, তুমি দাকস। বিশ্ব-নিঃস্বাস ফেলে ফেলে বিবিকে সুখী হতে দিলে না। যাও, তুমি যাও!

এমন করে বলেছিলেন। যেন বলে দিয়েছিলেন, তুমি একোরা হয়ে যাও। তোমাকে আমরা চাই না।

সেইজন্যে হরিকেশ একোরা বাঘের বোঁকে খাচ্ছিলেন। এই প্রাণে বিষ্টি ছিল না। গরম, কি ভীষণ গরম। নাজার জল শুকিয়ে যাচ্ছিল আর কতবার তিনি শিকারের নিয়ম ভুলে গিয়ে, যেন ইচ্ছে করে ভুলে গিয়ে জল খাবার সময়ে জানোয়ার মারছিলেন। জঙ্গলের পাশ থাকলেও ঠিক এভাবে পাশ ব্যবহার করতে নেই। বলতে গিয়ে ইসমাইল এত অপমানিত হয়েছিল যে টোড়ী থেকেই সে রাঁচিতে ফিরে যায়। হরিকেশ ওকে কাওরাতও বলেছিলেন। ডরপোক, ভিত্ত, মেয়েছেলে।

কিন্তু বুঢ়ন ওকে ছেড়ে যারিন আর বুঢ়ন যে ছেড়ে যাবে না তা হরিকেশ জানতেন কেননা বুঢ়নের রক্তে ঐ দোষ ছিল ও বিপদের সময়ে ছেড়ে যেতে জানত না। হরিকেশ জানতেন, বুঢ়ন ওকে ছেড়ে যাবে না কেননা বুঢ়নের বাবা একবার ঢেড়ের আদিবাসীদের কিষাড়, প্রভু হয়েছিল।

বুঢ়নের বাবা প্রভু হয়েছিল, বলেছিল, চাঁদ নেই সূর্য নেই আমি এখন তোদের প্রভু। বলেছিল জেটোদের, ঐ সারোবগলোকে আমরা মানব না। বুঢ়নের বাবা বৈদ্যশো আদিবাসীকে নিয়ে গিয়ে রাতের হাটালার উঠেছিল। রাতো তখনো খুব বড় গ্রাম, ফি বছর সেটলমেন্টের ডাবু পড়ে। ওরা বলেছিল, তাল্য পইসা খাজনা দিব না আর চারপাশের জঙ্গলের পাড়া ভেঙে দিয়েছিল।

পাড়া ভেঙে দিতেই খবর চলে গিয়েছিল ডালটনগজে, রাঁচিতে। ডুরান্ডা থেকে পলটন এসেছিল আর বিদ্যা গ্রামের বৈগা (পরোহিত) এসেছিল নন্দলাল দারোগার সঙ্গে।

কিষাড়টাকে ডাক, দারোগা বলেছিল।

তুই ওকে মারিব না ও এখন কিষাড় হয়েছ, বৈগা বলেছিল।

তুই কিষাড়টাকে ডাক।

দারোগা আবার বলেছিল, কেননা, তখন ওরা দলে দলে হাটালার আসছিল। জঙ্গল থেকে উকুনের মত বিড়বিড় করে বুড়োবুড়ী, জোরান ছেলে, জোরান মেয়ে, ন্যাংটো বাচ্চা সবাই আসছিল। সবাই মজা দেখতে আসছিল, কেননা, ততদিনে সবাই জেনে গিয়েছিল জেটোরা চাঁদ সুখের চেয়ে অনেক বড়। জেটে, জমিদার, মহাজন, জোক্তার, তশীলদার ওরা সবাই চাঁদ সুখের চেয়ে বড়, চাঁদ সুখের চেয়েও বেশীদিন থাকতে এসেছে। এ কথাও তারা জেনে গিয়েছিল।

তবু তারা আসছিল কিষাড় দেখতে। আসছিল পাতাভাঙার খবর পেয়ে।

তারাও বলেছিল, কিষাড়টাকে মারিব না। বলেছিল ও এখন বৈগা হয়ে যাবে, দেবতার ভর হবে ওর উপর। একবার যে প্রভু হয় সে আর মানুষ হতে পারে না। এই একটি নিয়ম।

কিষাড়টাকে ডাক, নন্দলাল দারোগা বলেছিল, আর যেই বুঢ়নের বাপ সামনে এসেছিল সেই ও বন্দুক দেগে বসেছিল। আর বন্দুক খাবার সঙ্গে সঙ্গে বুঢ়নের বাপ বলেছিল মা হো!

বুঢ়নের ডাক। অনেকদিন আগেকার ডাক মা হো! এই ডাক শুনলে আর তুমি চুপ করে থাকতে পার না। মা হো! অনেকবার মালদ হতে আদিনার মসজিদ ধাক্কা খেল করে নিয়েছিল সেই সাঁওতালদের, নতুন গান্ধীও দারোগার গুলি খেয়ে বলেছিল মা হো!। হাত দুটি শুনো ছুড়ে দিয়ে বুঢ়নের বাপ বলেছিল মা হো! আর তখনই এরা তীর ছুঁড়ে চেয়েছিল কিন্তু ওরাও গুলি ছুঁড়েছিল। এরা তীর ছুঁড়েছিল এরা গুলি ছুঁড়েছিল। এদের তীর ওদের গুলি রাতের রাতাসে ঝাঁক ঝাঁক উড়ছিল। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি তীর ছেঁড়া কল হয়ে গিয়েছিল। বুঢ়নের বাপকে ওরা গরুর গাড়ীতে বেঁধেছে-দে লাতেহার নিয়ে গিয়েছিল আর এদের তীরখনক, বশী, টাঙ্কি কেড়ে নিয়ে ন্যাংটো করে ছেড়ে দিয়েছিল।

ঠিক সেইজন্যেই বুঢ়ন বিপদের নন্দো হরিকেশকে ছেড়ে যেতে পারত না, কেননা, ওর বাপ একবার, আঠারো বছর জলা মাকু হয়েছিল। একবার প্রভু হলে সবাই জেনে যায় তার রক্ত ভীষণ খাট। তার রক্ত সোনো। তার রক্ত ধান। তার রক্ত ধরটা, বউটা, ছেলেটা। তার রক্ত গাইবলদ। সেইজন্যেই বুঢ়ন কোনদিন অবস্থা ফেরাতে পারেনি। জঙ্গল-মঙ্গলের ভেতরে কুম্ভা গিয়ে, ভিল, কুম্ভা, সুরগুজো, অড়হর চাব করে অতি কয়েক সংসার চাকাত আর সবসময়ে সে একটি গানই গাইত—

মানওয়ার জিউর সুখ দুখাত

পেরে আকান।

অর্থাৎ মানুষের জীবন সুখে দুখে ভরা। কি সুখে, কি দুখে, কি কোলে ছেলে নচাতে নচাতে, কি শিকারের শব্দের জাল ছাড়তে ছাড়তে বুঢ়ন ঐ একটি গানই গেরে গিয়েছে। দুটো গান আর তার শেখা হয়নি। গলার গান আসবার অনেক আগেই যেন রক্তে রক্তে বুঢ়ন জেনে গিয়েছিল মানওয়ার জিউর সুখ দুখতে পেরে আকান, মানুষের জীবন সুখে দুখে ভরা।

ঢেড়ীতে বুঢ়নই হরিকেশকে পাখি দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল কেননা এই বাঘ শব্দ একোরা নয়, ভীষণ শরতান। বাঘের ভেতর অপদেবতা ঢুকে গেলে যেমন হয় তেমনি শূর্ত, আর ঢেড়ীর জঙ্গলের ভেতরে পাঁচ-সাত ক্রোশ বেড়ে সে নিভরে ঘুরে বেড়াত।

একা বুঢ়ন জানত তার বাহান সাহান-ভাগান কোথায়। এই একোরা বাঘের বাহান ছিল কোলাই-নালায় পাশে এক পরিভা

বনকাহারীতে। সেখানে সে রাতে থাকত।
বৃন্দ বলেছিল বাঘটা শয়তান।

আর সাহান? কোথায় ঘোরের ঘের?

গাই-বলদের চরগাহ, চরবার জায়গায়।

ভাগান?

বৃন্দ দশটা আঙুল মেলে দেখাত
ওর অন্তত দশটা পালিয়ে বাবার জায়গা
আছে।

বৃন্দ বড়ো হয়ে যাচ্ছিল কিন্তু চোড়ার
বাঘ মারবার সময় সঙ্গী হবার সম্মান সে
কাউকে দেয়নি এমন কি হরোয়াকেও না।
হরোয়া শুধু সঙ্গ সঙ্গ আসছিল।

বাপ একবার প্রভু হলে ছেলে বিপদের
সময় আর কারো ওপর ভার দিতে
পারে না।

তা ছাড়া, হয় ও আমাকে মারবে নয়
আমি ওকে মারব বৃন্দ বলত। কেননা, গ্রামের
লোকেরা বৃন্দকেই দায়ী করেছিল। বৃন্দ
থাকতেও বাঘ মারা পড়ছিল না তাই বৃন্দকে
তারা দোষ দিচ্ছিল।

আগের দিন বাঘকে জখম করা গিয়েছিল
মাত্র। জঙ্গলে হাঁকরা করে বাঘকে তাড়িয়ে
মাচার দিকে আনবার চেষ্টা করা হচ্ছিল
কিন্তু হাঁকোয়ারা সাহস করে এগোতে
শারছিল না, যদিও হরিকেশ বলেছিলেন
বাঘের সাড়া মাত্র পেলেই গাছের ওপর যে
থাকবে বসে আছে তারা ইসারা করবে।
তবুও হাঁকোয়ারে তেমন জোর ছিল না। এই
একোরা বাঘ গত দু বছর মিথুন মাসেও
বাঘনীর শৃঙ্খলে বায়নি আর এই
অস্বাভাবিক আচরণে গায়ের লোকেরা বেশী
ভয় পেয়েছিল। এইটি নিরম নয়। বাঘ
নিরম ছাড়া কাজ করে কেন? তাছাড়া গত
দু মাসে পরসার দাম আরো কমে গিয়েছিল,
রোজ দু' আনা পরসার পাবে জেনেও তারা
মলে হুড়ি পাচ্ছিল না। গত সনের
অজন্মা, এ বছরের দুর্ভিক্ষ খরা, দুর্ভিক্ষের
ভয় না থাকলে তারা রাজ হত কিনা বলা
যায় না। বৃন্দ ডেকেছিল কলিই তারা
এসেছিল।

তবু বাঘ এসেছিল। একজন 'রুক'
গাছের ওপর থেকে ইসারা করেছিল আর তার
আগেই হাঁপাতে হাঁপাতে, বাদামী জোরাকাটা
শরীর নিয়ে বাঘ এগিয়েছিল। কি যেন
অস্বাভাবিক হচ্ছিল তার, পা ফেলতে অসুবিধে
মারবার পর হরিকেশ দেখেছিলেন পায়ে
নিচে বড় পোড়া ঘা। জঙ্গলে ওরা আগুন
দিরেছিল সম্ভবত তাতেই একটা থাবা পড়ে
যায়।

বাঘকে হরিকেশ জখম করেছিলেন কিন্তু
কোথায় গুলি লেগেছে তা বৃন্দেতে পারেননি।
শুধু রক্ত দেখে দেখে খানিকটা এগিয়ে আর
যেতে সাহস করেননি। হাঁকোয়ারদের বলা
ছিল বাঘের বাঘ আছে, ক্রুউ যেন গাঁ ছেড়ে
জঙ্গলে না আসে।

পরদিন ডোরে বৃন্দ আর তিনি আর
হরোয়া যাচ্ছিলেন। বৃন্দ বলেছিল, বাঘ তার
মাহানে বাবে। বৃন্দ একটু একটু হাসছিল
কেননা বৃন্দ এই বাঘের স্বভাব ও অভ্যাস
জানত। অতি সন্তপণে, নিশ্বাস চেপে চেপে
তারা যাচ্ছিলেন কিন্তু ছোট টিলার নিচে না
শেষে কোনো পর্যন্ত বৃন্দের সন্দেহ হয়নি।

একটু উচোন একটা পাথরের পাশ থেকে
ভনডন করে মাছির ঝাঁক উড়ে যেতেই
বৃন্দেতে পেরেছিল।

‘মার গুলি!’

বৃন্দ চোঁচরে উঠেছিল। কিন্তু সেই
হাঁকরা মূখ, সেই ঘোলাটে চেখ, সামনের
জংঘা আর ডান চোয়ালের ঘা সত্ত্বেও সেই
ভীষণ ক্ষিপ্ততার ঝাঁপিয়ে আসা সব দেখে
হরিকেশ ভয় পেয়ে থেমে গিয়েছিল। ঘা-
খাওয়া বাঘ শিকারে প্রতিটি সেকেন্ডের দাম
আছে কিন্তু প্রায় আটশ সেকেন্ড তিনি
নড়তে পারেননি।

‘বাবু!’ বৃন্দ চোঁচরে উঠেছিল কিন্তু
তার আগেই বাঘ ওর ওপর থাবা ফেলেছিল।
তারপরও হরিকেশ ভেবে পাননি কি করবেন
আর হরোয়া ওর হাত থেকে বন্দুক কেড়ে
নিয়ে গুলি করেছিল, কেননা হরোয়া
দেখছিল থাবার আঘাতে বৃন্দের মাথা
গলার নলী প্রায় ছিঁড়ে পেছনে লটকে
পড়েছিল। বাঘের চোয়াল ভাঙা না থাকলে
বাঘ নিশ্চয় দাঁত বসাত কিন্তু চোয়ালে সে
ক্ষমতা ছিল না। হা বৃন্দওয়া! হরোয়া
জঙ্গলফাটা আত্মনাদ করেছিল। বাঘের
নিচ থেকে বৃন্দকে বের করতে প্রায় বেলা
কেটে গিয়েছিল সকলের কেননা গুলি
থাবার পর বাঘের শরীর এমন একটা খাঁজ
আটকেছিল যে সেখান থেকে বের করা বেশ
কষ্টকর। গুলির শব্দের পর হরোয়ার হা
বৃন্দওয়া রে! শব্দে হাঁকোয়ার ভয় পেয়ে-
ছিল কিন্তু হরিকেশ বন্দুক তুলে ফাঁকা
আওয়াজ করে জামিয়ে দিয়েছিলেন বাঘ
মারা পড়েছে।

হরোয়া কিছু বলেনি। হরোয়া ওর
ভাগেও শিকারে এসেছে তাছাড়া রাজসাহী-
বর্গাবাড়ীর উত্তরে নলার মাঠে ও বৃন্দের
সঙ্গে চিতাবাঘ মেরেছে, শূওর মেরেছে।
হরোয়া জানত হরিকেশ ভরপোক নন, তবে
কি ভয় পেয়েছিলেন, না বৃন্দের নিয়তি,
হরোয়া কাউল কিছু বলেনি। এমনকি
বাঘের কপালের গুলিটা যে হরিকেশের
নারা নয় সে কথাও হরোয়া বলেনি।

কিন্তু একজন ‘রুক’ দেখেছিল, ‘রুক’,
শূণ, বারু কিছু দূরে দূরে গাছের ওপর
বসে থাকে। জানোয়ার এল কিনা ইসারা
করে বাহলে দেয়, বলে দেয় জানোয়ার দেখা
যাচ্ছে কিনা। দেখলেও ‘রুক’-এর মনে
হয়েছিল দুর্ভিক্ষ দেখছে কেননা সেও
হরিকেশকে দেবতা ভাবতেই অভ্যস্ত ছিল।
ওর হাতে বন্দুক, বৃন্দকে বাঘ ভক্তমণ
করছে, ওর মনে হচ্ছিল ও ভুল দেখছে।
যখন উনি ওপরে বন্দুক তুলে ফাঁকা
আওয়াজ করতে লাগলেন তখন ওর মনে
হল সব ঠিক আছে।

কিন্তু বৃন্দের বউ বলেছিল, ‘ওর সঙ্গে
তুই গেলে ও তোর প্রাণ বাঁচাত। এবার
তোর সঙ্গে ও গেল। ওর বন্দুক কাছ
ছিল না, তোর বন্দুক ছিল। তুই কেন
ওকে দেখলি না?’

বলেছিল ‘তোর বাপ থাকলে দেখত।’
বৃন্দের বউ। বৃন্দ কিষাড়ের ছেলে কিন্তু
বৃন্দের বউ মানুষের মেয়ে। বৃন্দ যে
কথা জানত মানওয়া জিউই সুখ-দুখে

পেয়ে আকানা, জেনে শান্ত থাকতে পারত
বৃন্দের বউ তা জানত না। ও ভীষণ
চোঁচাত, চুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে বৃন্দকে গাল
দিত। বলত বড় শিকারী! বাঘচালা সাপ-
চালা জানে! তাই পেটে ভাত জুটে না।

ভাতের মানে অবশ্য ভাত নয়। কেননা
রাঁচির বাড়ীতে বা জঙ্গলমহলের কুঠিতে
থাকবার সময় ছাড়া বৃন্দরা ভাত কমসময়েই
খেত। ভুট্টা কখনো সেম্ব করে কখনো
গুড়ো করে লেই বানিয়ে খেত সবাই।
বৃন্দের বাড়ীতে তবু বন্দুক ছিল। কিন্তু
ওর মত এরকম অনেক লোক ছিল বাঘের
পাখিব সমস্ত সম্পত্তির দাম বোধহয় পাঁচ
কি ছ’ আনা পরসার, ভাত বাঘের কাছে
স্বপ্ন।

সেইজন্যই বৃন্দ গান গাইত মানওয়া
জিউই সুখ-দুখেতে পেয়ে আকানা? বৃন্দের
বাড়ীতে গিয়ে ওর বউয়ের কান্না শুনে ওর
ছেলেমেয়েদের আছাড়পিছাড় দেখে কিন্তু
হরিকেশের দয়া হয়নি। বরঞ্চ কেন যেন
ক্ষেপে গিয়েছিলেন। এত সাধারণ গরীব,
হতভাগা মানুষেরা বৃন্দের আপনজন।
বৃন্দ ওদের চেয়ে অনেক ওপরের মানুষ
ছিল। ওর রক্ত কি পবিত্র, কি খাঁটি ওর
ঠাকুরদার স্মরণে ক্ষেতে চম্পারপের সাগরবা
নীল বৃন্দে দিয়েছিল আর বর্ষা হাতে ছুটে
যেতে সাগরবা ওকে গুলি করে মেরে বসে-
ছিল। বৃন্দের বাবা আরো বড় কাজ করে-
ছিল, সে কিষাড় হয়ে গিয়েছিল আর
গুলি খেয়ে বলেছিল মা হো!

বৃন্দের রক্ত পবিত্র, খাঁটি। বৃন্দের
রক্ত ধান। বৃন্দের রক্ত মাটি, বউ, ছেলে,
গাই-বলদ। বৃন্দের রক্ত গান। সেই একই
গান, মানুষের জীবন সুখ আর দুখে ভরা।
সুখ আর দুখ। দুটো কুনকের মাপ
কখনো সমান কখনো অসমান। মানুষের
জীবন সুখ আর দুখে ভরা।

সেইজন্যে হরিকেশের রাগ হয়েছিল।
নিষ্ফল, ভীষণ ক্ষোভ। আশপাশের জঙ্গল
বৃন্দ নিজের হাতের তালুর মত চিনত।
কত জন্তু, কোথায় বৃন্দো মোঘের চরগাহ।
এবার শীতের পাখী চোঁচি নালায় কোন
দিকে বসছে। চোঁড়ের বাঘের জোড়া যে
মানী ছানাটা হয়েছিল সে পালামো সাউথ
ওয়েস্ট-এ রাবার কোন জঙ্গলে থাকে। সব
জানেন বৃন্দ। জঙ্গলে ও নিঃশব্দে ছায়ার মত
ঘুরতে পারত। শিকারের সময়ে ছায়ার
চেয়েও চুপচাপ থাকতে পারত। কমিশনার,
ডেপুটি-কমিশনার রাঁচ থেকে শিকারে
যেতে হলে শুধু বৃন্দকেই চাইত।
হরিকেশের তাই, ভীষণ রাগ হয়েছিল।

চোঁড় থেকে রাতো, কি নিবিড় জঙ্গল,
কোথাও কোথাও ঝোপ এত ঘন যে তার
ওপর পা ফেলে রাখা ছেলেরা হেঁটে চলে
যেতে পারে, ফাঁকে পা পড়ে না। এই
জঙ্গলে হরিকেশকে বৃন্দ প্রথম সেই
নিঃসঙ্গ বাইসনকে দেখিয়েছিল। বলেছিল
গওর। জঙ্গলের মধ্যে জলাশয়। বৃদ্ধ এক
সময়ে গ্রাম ছিল কিংবা জনপদ।

বৃন্দ বলেছিল বগীরা এদিক দিয়ে
আসত বলে জঙ্গলে মাটির কেঁদা বানিয়ে

মানুষ বাস করতে আসত। কিন্তু এসব জরিগার যা হয়, ক্রমে জঙ্গল এসে বসতি গ্রাস করে ফেলে। সেখানেই এক গম্বুজাটো দাঁড়ির পাশে সেই একোরা গওর দাঁড়িয়েছিল। জঙ্গলের ফাঁকে শরতের বোদ আসত। উজ্জ্বল। সেইখানে যেন ছবিতে আঁকা সেই একোরা গওর দাঁড়িয়েছিল। অতি সন্তপণে বুটন আর হারিকেশ গাছে উঠে পড়েছিলেন। একোরা গওর, তার নিঃসঙ্গতাকে বড় ভয়ঙ্কর আক্রোশে বঁকা করে। মানুষকে ওরা কোনদিন বিশ্বাস করেনি।

সেই বুটন!

বুটনের মধ্যে হাহাকারা কোভ নিয়ে হারিকেশ ফিরে গিয়েছিলেন। রাত্রে থেকে টোড়ী, টোড়ী থেকে রচি, বুটন একটা কথাও না বল গুয়ে গুয়ে আসছিল। ক্রমে ওখ গায়ে গম্ব হয়ে যাচ্ছিল। চিত্রের চড়াবার সঙ্গে সঙ্গে ওর গায়ের ফোঁসকা মোটে ভস-ভস করে জল বাকিয়ে এসেছিল। মানুষের শরীরে কতটা জল থাকে? না রক্ত জল হয়ে যায়? বুটনের যে রক্ত থান, যে রক্ত মাটির ওপর থানগোলা, বুটনের কোলে ছেলে, সে রক্তই কি অত তাড়াতাড়ি জল হয়ে গিয়েছিল?

কলকাতার ফিরে এসে হারিকেশ কাউকে কোন কথা বলেননি, শুধু নিজের ডানহাত দেখিয়েছেন। এই হাত তখন এমন বিশ্রোহী হল কেন, এই হাত কি তখন মরে গিয়েছিল? বিবি কান্দছিল। বিবি বুটনকে ভাল-বাসত। কান্দতে কান্দতে বলেছিল, 'তুমি তোমার হাত দেখছ কেন? তুমিই কি বুটনকে মেরে ফেলেছ?'

'কে বললে?' হারিকেশ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠেছিলেন। তখন বিবির মধ্যে জরের হাসি দেখতে পেয়েছিলেন। তখন বিবি বুটনকে পেরে গিয়েছিল তিনিই বুটনকে মেরে ফেলেছেন।

ম্যানওয়া জিউহা সুখ-দুঃখতে পেরে থাকনা।

ম্যানওয়ার জিউহা সুখ-দুঃখতে পেরে থাকনা।।

বুটনের গান। বুটনের বাবার দেওয়া তাঁর-কান্দুকা ওর বড় হারিকেশকে দিয়ে দিয়েছিল। অনেক টাকা দিয়েছিলেন ওকে হারিকেশ, হাত টাকা বুটন জন্মে দেখিনি।

টাকা দিতে দিতে, বুটনের বড়ের চেয়ে হাসি দেখতে দেখতে হারিকেশের বুক পড়ে গিয়েছিল। টাকা। কি সস্তা, কি খেলো ক্ষতিপূরণ বল, কি ইনজারিজেন্সি। কিন্তু মানুষ টাকাই দেয় কেননা আর কিছ, দেবার থাকে না।

আর হারিকেশের মত মানুষ। স্নেহ দিতে, মমতা দিতে, হৃদয় দিতে যে লোক এত ভয় পায় সে টাকা ছাড়া আর কি দিতে পারত?

ধীরে, অতি ধীরে হারিকেশ তাঁর চোখ বুজলেন। এঘরে আলো আসে না। এঘর অন্ধকারে থাকে। এঘর অন্ধকার। এখন হারিকেশের বয়স আশী হয়ে গিয়েছে। সর্বশেষ শরীরে মনে যেন ফটল হয়ে গিয়েছে হা-হা করা ফটল। এখন রাতে তাঁর গায়ের ওপর ইদুর আরসলা চরে বেড়ায়। কিন্তু

এই সব ফটলে এখনো কোন কোন বাতাস বয় বা হারিকেশের কোভ, দুঃখ, অনুতাপ। বুটনের শোকে এখনো হারিকেশ মাঝে মাঝে সে বাতাসকে কান্দতে শোনেন।

হারিকেশ চমকে উঠলেন। নিরাপদ এসেছে, দাঁড়িয়ে আছে।

স্নান।

হারিকেশ হাত বাড়িয়ে দিলেন। এখন গরমজলে স্নান করতে হবে। নিরাপদ স্নান ফারয়ে দেবে। নিরাপদের হাতে ও'র শরীর ভেড়ে দিয়ে স্নান করতে করতে হারিকেশ বুকে গায়ে ও হাতে কোন ভালবাসা নেই। এত বছরেও নিরাপদ ও'কে ভাল-বাসতে পারেনি। বোধহয় কৃতজ্ঞতাবোধও নেই। শব্দে কৃতজ্ঞ হয়ে মানুষ বেশীদিন থাকতে পারে না।

।। ৬ ।।

বিবিদির ঘরে হাবুল বসেছিল। বিবিদিকে কোরামিন দিতে হলনি কিন্তু ডাক্তার মৃত্যুকি বলে গেলেন, বিবি, তুমি যদি বাচতে চাও, তাহলে এই হঠাৎ উত্তেজনা, হঠাৎ বোরের গড়া, হঠাৎ ফেপে ওঠার অভ্যাস বন্ধ করতে হবে।

'আমি বাচতে চাই।' বিবিদি ছোট্ট গলায় বললেন। যেন বললেন, 'আমি লজ্জিত চাই।'

'চাইলে ডাক্তারের কথা শুনতে হবে।'

'শুনব।'

'ও'কটা খেও। আর, বিকেলের দিকে ঘরে একটু নড়াচড়া করতে পার কিন্তু তার বেশী নয়।'

না।

হাবুল অত্যন্ত বিরত বোধ করছিল। আসলে সে জানে বাণী কোথায় আছে, অন্যতর এখন মনে হচ্ছে জানে।

ওর বন্ধু, আমিতার বাড়ী। আমিতারা বাড়ী ছেড়ে দিয়েছে, অবশ্য সেক্ষমা বাড়ী-অলাকে জানানো হয়নি। আমিতারা এখন দিল্লীতে। জিনিসপত্র সব হাবুল আর বাণীর দেবার কথা ছিল, হাবুল টাকাও দিয়েছিল কিছু। বাণীর কাছে একটা চাবিও আছে।

নিশ্চয় বাণী লেখেন। আজকাল নাকে হুকুই বাণী ওখানো যায়।

গালে হাত রেখে ঘরের বেওয়াল দেখে। বেশী চিন্তায় ডুবে গেলেই বাণীকে টারো জম্বা। অথচ সে কথা বললে বাণী চটে যায়। কিন্তু বিবিকে কি করে বলা যাবে এখন বাণীকে বুঝে আনা গেলেও যেতে পারে? হয়তো বিবি উত্তেজিত হবে। আর, বিবির শরীর এত খারাপ যখন তখন হাবুল ওকে ছেড়েই বা যায় কি করে? মাকে কোন করবে?

'হাবুল।'

'কথা বল না বিবি।'

মা-না আমি ভত অসুস্থ নই।

'একটু আগে তো ভিট্রিম লাগিয়েছিল।'

বিবিদির চোখ থেকে দু ফোঁটা জল পড়ল। বিবিকে হাবুল এত ভালবাসে কেন? বাণী সব জানতে চেয়েছিল হাবুল। 'কি?'

'সাতুদার কথা।'

'ও।'

'তুমি যখন বললে বাণীর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি.....'

'হু।'

সাতুদা আমাদের বাড়ীতে কত বছর বসে এসেছিল জান? যোল বছর বসে। আমি, তখন বেশ ছোট। মা আমার জন্মের পর খুব অসুস্থ হয়েছিলেন।'

বিবিদির এখন মনে হয় মা হয়তো মা হতে চাইতেন না। নিটোল শরীরের খুব গর্ব ছিল তার, সেই শরীর ভেঙেচুরে যেত বলেই কি? না মনের কোথায় বাবার সঙ্গে একটা জম্বা অভিমান, একটা প্রতিরোধ ছিল বলে? প্রতিটি সন্তান জন্মবার আগে অসুস্থ হতেন, জন্মবার পরেও। ভেতরের গড়নে কি একটা দোষও ছিল তখনকার দিনে ডাক্তার মৃত্যুমোহন দাস দেখেছিলেন। কিন্তু দক্ষ তো। এখনকার মত এত চিকিৎসা, এত ব্যস্ততা হয়নি। কিন্তু মা যে মা হতে চাইতেন না একথা বিবিদি মরে গেলেও হাবুলকে বলতে পারবেন না। ওর খারাপ লাগবে। ওরা এমনিভাবেই মানুষের এতকম ব্যস্ততা দেখে আজকাল, তার বোকা আর বাড়িয়ে কি হবে?

'তখন নাকি আমি সাতুদার মত দুখ খেয়েছিলাম। উনি আমার পসীমাম জা ছিলেন। রাজসাহী দুর্গাবাড়ীর বাড়ীতে থাকতেন। ও'র নিজের কেউ ছিল না।'

'স্বামী ছিলেন না?'

'ছিলেন। তিনিও এই গ্রামেই ছেলে। রাজসাহী টাউনে ওকালতিও শুরুর করেছিলেন। সেবার কি একটা যোগদানের সময়ে খুব কলেরা লাগে শহরে। সাতুদার বাবা ডলান্টারদের কতাই হয়েছিলেন। তখন কলেরা চিকিৎসা করতে গেলে ছিল না। শুনছি সাতুদার বাবা আর ও'র এই যোগদতি, যে হয়েছিল বলে ওর মার দুখ আমি খেতে পেয়েছিলাম, বুজিয়ে একদিন আগে-পরে মারা যান।'

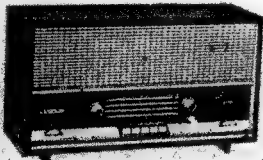
'তারপর তোমাদের বাড়ী।'

'হ্যাঁ। তবে ওটাকে ঠিক আমাদের বাড়ী বলা সাজে না। আমরা দেশে থাকতে যেতাম না কখনো-সময়। যেতাম মাত্র। হারা থাকতেন তাঁরাই বাড়ীর সবাই ছিলেন। বাবার মেরে বলে আমার কোন বিশেষ জায়গা ছিল না। অবশ্য, আমি দেশের বাড়ীতে এত কম গিয়েছি।'

বাবাকে সবাই খুব সম্মান করত। মা দেশের বাড়ীতে থাকতে চাইতেন না। যে কদিন থাকতেন সে কদিন খুব আনন্দ করতেন। কিন্তু নিজেকে থেকে যেতে বা থাকতে চাইতেন না। বাবাকে সবাই প্রাণের রক্ত বলত। ও'র বই নিয়ে ও'র জেতা কেস নিয়ে, ও'র রাজনীতিক অন্তরীণ বাণীদের সাহায্য করা নিয়ে সবাই গর্ব করত। ও'র স্বভাবের অনস্বিকুলোকে ওরা ইচ্ছে করেই দেখত না। মা হয়তো সেটা পছন্দ করতেন না। তাছাড়া ও'র সাতুদার এক মাসীরও এই গ্রামেই বিয়ে হয়েছিল। রাজসাহী-দুর্গাবাড়ী গ্রাম হিসেবে মৃত বড়



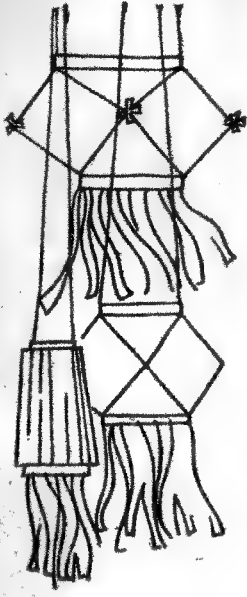
মারফি মডেল
টিএ/টিইউ ০৮২৪
মূল্য : টা. ৩২০.০০*



মারফি মডেল
টিএ/টিইউ ০৭৭৬
মূল্য : টা. ৪৬৬.৬৭*

* সর্ব ভারতীয় মূল্য (মহারাষ্ট্র বাদে)
এক্সাইজ ডিউটি সমেত কিন্তু ব্যাটারী ছাড়া।
বিক্রয়কর ও অন্যান্য স্থানীয় কর অভিবিক্ত লাগে।



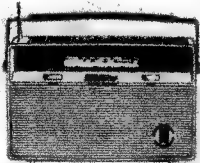


মারফি আপনার পূজার উৎসব সঙ্গীতের মূরে ভরিয়ে তুলুক

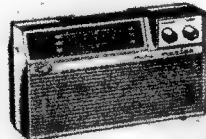


বাড়ির সবাইকে গানবাজনার চাইতে ভালো উপহার আর কি দিতে পারেন আপনি? বাড়িতে একটা মারফি এনে দেখুন সবসময় কিরকর আনন্দের স্রোত বইছে। দেখবেন সবাই সঙ্গীতে এতোই ভরিয়ে যে মারফি সেট ছেড়ে কেউ উঠতেই চাইছে না। এতে গানবাজনা ও কথাবার্তা এতো অবিকল ও স্পষ্ট শোনায়...দূরত্বের কথা ভুলে গিয়ে মনে হয় যেন সারাবিধ আপনার কাছে ঘরা দিয়েছে।

আজই আপনার কাছাকাছি মারফি ভীলারের কাছে চলে আসুন। রেডিও কিংবা ট্রানজিস্টর যেটাই হোক, একটা না একটা আপনার মনের মত হবেই হবে। আর দাম যেখানে ১২৫ টাকা থেকে শুরু হয়ে ওপরে উঠেছে সেখানে বাড়ির কোনো একটা মারফি না থাকার কোন কারণ নেই...বিশেষত এমন রেডিও যেটির চেহারা সুন্দর এবং অন্তর দরদী।



মারফি মডেল টিবি-০৮১৬
মূল্য : টা. ৪১৫.০০*



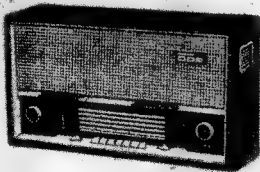
মারফি মিনি-মাস্টার,
মডেল টিবি-০৮১
মূল্য : টা. ৩০৩.০০*



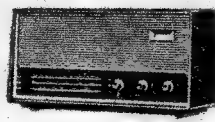
মারফি মিনি ২,
মডেল টিবি-০৮৯
মূল্য : টা. ২৪০.০০*



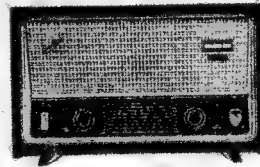
মারফি ম্যাজিসিয়ান,
মডেল টিবি-০৮৯
মূল্য : টা. ১২৫.০০*



মারফি মডেল টিএ-০৩৬
মূল্য : টা. ৬৬৮.৩০*



মারফি মনিটর
মডেল টিএ/টিইউ-০১০
মূল্য : টা. ৩০৩.০০*



মারফি মডেল টিএ-০২৬
মূল্য : টা. ৬৬৮.৩০*



মারফি মডেল
টিএ/টিইউ-০৭৭
মূল্য : টা. ৫৪১.৬৭*



murphy মারফি গৃহকে আনন্দমুখর রাখে!



ছিল। ব্রাহ্মণ পরিবারই ছিল একেশ্বর বৈশ্বী।
গামে দুটো হাইস্কুল, জল পোস্টাফিস,
এমন কি অত্রাই নদীর ওপর দিয়ে পাকা
রাস্তাও ছিল একটা।

সাতুদার এই মাসীর কথা উঠলেই সবাই
হাস্যহাসি করত, নইলে হুপ করে যেত।
বিবিদির এখনো মনে পড়ে তাঁর এক
ধরনের অশালীন রূপ। হলুদ ফসি রঙ,
খুব চপল চোখ, কথাকওয়া চৌঁট, কথা
কওয়া শরীর। অনেক পাগু খেতেন, অনেক
গরনা পরতেন। কাজের বাড়ীতে এলে
ডিরিশ-চরিশখানা মাছ অবহেলা খেতেন।
অত্যন্ত মাছ বিশেষত বোয়াল মাছ খেতেন
কলে ও'র মুখ কি রকম লালচে হয়ে
থাকত। প্রতিমা বিসর্জনের অঙ্গাঙ্গিক,
গাণেশ, আলাদা আলাদা বের করতে হত
বিবিদিসের বাড়ীর গাঁতের এতই বড় হত।

কি বছর গণেশ তুলে ও'র কোড়ে
দেওয়া হত, আর তাই নিয়ে বেন কি
একটা হাস্যহাসি হত। এই মহিলা প্রত্যেক-
বার বাবাকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন, চুল
দিয়ে বাবার পা সোজাতেন, বাবার পাদোদক
খেতেন। বাবাকে নাকি উনি দেবতা মনে
করতেন। কিন্তু মা ওকে, তারামাসীকে
দেবী মনে করতেন না। বাবার সঙ্গে ও'র
বিরোধ কথা হয়েছিল তারপরেও এত বাড়ী-
বাড়ী মাজামতি যা পছন্দ করতেন না।
তাছাড়া তারামাসী ভাতার সোহাগী,
কাঁচা ব'বতী এই ধরনের কতকগুলো কথা
কবহার করতেন যা শুনলেই মার কান-মুখ
লাল হয়ে যেত। বাড়ীতে আর কেউ এ
রকম কথা বলত না।

বিবি, তোমার ঘুম পাচ্ছে?

না হাবুল, দেশের বাড়ীর কথা
ভাবছিলাম।

ভাবতে ভাল লাগে তাই না?

না হাবুল, বড়তে পারি না, ছোট-
বেলার পর যদি একবারও না যেতাম তাহলে
কি হত বলতে পারি না, কিন্তু আমারও
তো লগে, কাছই বিয়ে হয়েছিল।

কাছই?

পালেশ গ্রাম। মাঝখানে আত্রাই ধর্ম-
রাজার জিটে। বরেন্দ্র সোসাইটির স্ট্রেকার
দিয়ে ঠিক করলে ওটা বোধ মঠ।

শাল্যাপালি গ্রাম।

হ্যাঁ। নদীর ওপর রাস্তা। তবুও পাঁচ
বছর ওখানে ছিলাম একবারও দর্গাবাড়ী
হাইনি।

কেন?

বিবিদি তার উত্তরে আমার বললেন
পালী আসবে না হাবুল? আসলে
হাবুলকে তার বলতে হচ্ছে হুজ না
কিরকম ভুতে পাওয়া হয়ে গিয়েছিলেন
বিবিদি। ও'রা মৌদীনীপুর থেকে রাঁচি
এসে পৌঁছলেন কিন্তু বলতে গেলে স্টেশন
থেকেই কোনো ডাক্তার ও'র মা-মেয়েকে
নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন কেননা
ও'দের মোরাদাবাদী বাড়ীতে সাতুদার
ভাড়াহাওয়া করেছিল। বাড়ীতে পলিশ
সাতুদাকে মড়কুরে রাখা হয়েছিল, বাব
এসে না পোঁছনা পর্যন্ত। বাবা যে বরেন্দ্র-
পুর বাসেন তা এক সাতুদার জানও আর

কেউ জানত না। বাবার জন্যে উকিলবাংরা
অনেক ফলের মাথা এনেছিলেন তাই দিয়েই
সাতুদাকে ঢেকে দেওয়া হয়। নিরাপদ এসে
এসেন্স চেয়ে নিয়ে যায়, তখনকার গাড়ির
ঠাণ্ডা হত না। গরম, চারদিক বন্ধ, কচলার
গুঁড়া আর নুন মাখিয়ে রাখা হয়েছিল।
সেই দু'ম্বনের শব্দ। তারপর অনেক
বাক্যে বাবার প্রশ্ন। 'সাতু তোমায় কি
বলেছিল?'

বিবিদি নিরুত্তর। তখন ও'র বয়স মাত্রই
যোল, বাবা কি সে কথা মনে রেখেছিলেন?
কি বলেছিল, সাতু তোমায় কি বলেছিল,
জিগেস করে করে বাবা জবাব পাননি।
যেমন করে জেলে প্রশ্ন করে বাবাও তাই
করেছিলেন। একই প্রশ্ন বার-বার তখনরত।
বিবিদি শুনেননি ওরকম করে প্রশ্ন করলে
নাথায় বন্দো হয় আর বন্দগার হয়ে মানুষ
বদ বলে দেয়। কিন্তু বাবাকে তিনি কি
বলতেন? সাতুদা তো তাঁকে কিছু বলনি।
তাঁই কি এই জঘন্য প্রতিশোধ? মেয়ে ও'র
কি শোধ দেয় বাবা? নিজেকে কে অত
ডালবাসে? ছোটবেলা দেখেছিল পালের
গামের ছেলে, কুলনি বংশ, রাজসাহীতে
ল্যাক্স চাকুরে। প্রচুর খান, জমিজমা, গাই-
বলদ। সমস্ত পরিবারের মধ্যে একমাত্র
শিক্ষিত ছেলে হওয়া, শব্দে থাকার দু'ম্বা
পাওয়া, হাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরমা
পাওয়া এর কোনটাই বাণীর বাবার ক্ষেত্রে
ভাল ফল দর্শারিনি।

বিবিদির নামটা আঁকি উনি পালটে
নিয়োগিলেন, রমলা নাম দিয়েছিলেন।
বিবিদির সেটা খুব খারাপ লাগেনি কিন্তু
ও'র যখন জেনেছিলেন তখন উকিলের
মেয়ের নাম রমা তখন ও'র দুঃখ হয়েছিল।
বাণীর বাবার কল্পনাশক্তি কোনদিনই খুব
হুড়ানো ছিল না।

না। পাঁচ বছরের মধ্যে দু'গোলাঘড়ী
হাননি বিবিদি, কলকাতার আসেননি। প্রাণ-
পনে চেষ্টা করেছেন আর চেষ্টা করেছেন।
হয়তো চেষ্টা করতে করতে বিবিদি একদিন
শান্তি পেতেও পারতেন কিন্তু সবমুহুরে
ও'র কাছে কাজের জায়গায়, সাগরশাড়ার বাসায়
অনন্ত উকিলের মেয়ে ছিল। সে তো আগেও
'হল, বাবা কেন খবর নেদনি। ওকেও তো
তিনি শেষ আঁকি দিয়েই করলেন এ খবর
কি হচ্ছে কহলে আগে জানা যেত না? ও
বিরে যে একদিন না একদিন হবেই
সেটুকু তো বাবা জানতে পারতেন।

বিবি তুমি কি ভাবছ?

হাবুল তাঁর সামনে বসে আছে। হাবুল
তাঁর ছেলেরই মতন। যদি বাণীকে বিয়ে
করত তাহলে তো ও'র ছেলের, ভাগ্য
নিত। ও'দের বিরোধ কথা শোনবার সঙ্গে
সাপা বিবিদির পেটের ভেতরে কি যেন গাট
পাকিয়ে উঠেছিল, সমস্ত ভেতরটা বাপ
দিয়েছিল, কেন কে জানে?

কোন মানে খুঁজে পেলাম না,
বুঝলে বিবি?

কিসের হাবুল?

এই তোমার, যাকে বলে বাণীর বাবার
ও'র অতটা বিশ্বাস হওয়ায়, বাপার
জান, তোমাদের বয়সী যে সব মেয়েদের

তখন একটু-আধটু লেখাপড়া শিখে মাপ
ঘুরেছিল তার সবাই বোধহয় নিজেকে
কুমদিনী ভাবত। ব্যাপারখানা ভাব, পুরুষ-
মায়েই মধুসূদন!

বিবিদি রাগতে গিয়ে ছেনে ফেললেন।
একটা অনারকম হাসি। তেমন অস্বস্তি
জাগানো নয়। হাবুল হাসছে।

'আমি তা ভাবতাম না হাবুল।' বিবিদি
হঠাৎ খুব ছোটমেয়ের গলায় কথা কইলেন।
যে সর ছোটমেয়েরা অন্ধকার দেখলেই
হাতের আঙুল চেপে ধরে, ছুতের গংগ
শুন ভয় পায়।

বিবিদি বললেন, 'আমার বাবা ছিলেন
সেটা ভুল বেও না। বাণী এখনো আমাকে
দোষ দেয় ও'র বাবা যখন নিতে আসেন
আমি ঘাইনি কেন। ততদিনে...'

ততদিনে অনন্ত উকিলের মেয়ে মাপ
গিয়েছিল আর বাণীর দিকে চেয়ে বিবিদি
আরেকবার চেষ্টা করতে তৈরী ছিলেন।
বাবার এই স্নেহহীনতা দায়িত্বহীনতা। কিছু
কিছু টাকা দিয়ে দায় সেয়ে দেওয়ায় অব
এই সবকিছুর থেকে বেরিয়ে যেতে পারলে
হয়তো, কিছু একটা হত। পরনো বালক
শ্রমাই করে কি মানুষ কাজ চালায় না?
ভাবতে গেলেই অবিশ্বাস রচিত হা লাগে,
গা বিড়বিড়িয়ে ওঠে।

'তোমাকে ওখানে যখন বিয়ে দিলেন
তখন তুমি কিছু বলনি?'

'না, হাবুল। বলবার কথা তখন ভাবাও
হাননি।'

কেননা সাতুদা ছিল। সাতুদার
ব্যাপারটা বিবিদিকে এমন প্রচণ্ড আঘাত
দিয়েছিল যে তিনি সেন বন্দগার বোবা হয়ে
গিয়েছিলেন। কি রকম ঝিয়ে হল, মা কত
কাদিলেন, চোঁচালেন, কিছুই যেন মাথায়
ঢুকাইল না বিবিদির। ভুবু, যার কথা
ভাবলেও শরীরে পোকা হেঁটে যেত, তাঁকেই
স্বীকার করে নিতে হরতো পারতেন। এর
মধ্যে যে বাণীও ছিল। বিরোধ স্বামী
রুচিতে মেলেনি, ওরা অমানুষ, আরেকজন
মেয়েছেলের কথা চেপে রেখে বিয়ে দেয়, এর
প্রতিটি কথাই সত্যি। তেমন বাণীও তো
সত্যি। আর বিবিদি বোধ হয় সেই একবার
বাবার খপ্পর এড়িয়ে পালিয়ে যাবার একটা
পথ দেখেছিলেন। পথ অথবা গন্তব্য জায়গা
কোনটাই মনোমত ছিল না। কিন্তু সবকিছু
আর বিবিদি ফিরে পেতেন কি করে, তাই
যাওয়াই ঠিক করেছিলেন।

'রমলা, রমলা এস রমলা।' একজন
পুরুষ তাঁকে অমন তপসহারজাবে চাইছে
তাতেও যেন কোথায় নাড়া লেগেছিল। মা
হলে মনের শরীরেও কিছু কিছু পরিবর্তন
হয়। সেই একবার হয়তো কোথাও তিনি
প্রয়োজনের মানুষ হয়ে ওঠবার একটি মাত্র
সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু মাঝখানে বাবা
ছিলেন।

মামী মানুষ। দেশগামের গৌরব। তাঁর
গৌরব রক্ষা করা মেয়ের সুখের বা শান্তির
চেয়ে অনেক বড় ব্যাপার ছিল। তাই যাওয়া
হল না। আরার বিবিদি বাবার বাড়ীর
অন্যতম শোভা হয়ে গেলেন। মেয়ের ফুল,

কাঠের গুড়ো ঠাসা ডানামেলা পাখীর মত। ভদ্র, কথা-না-কওয়া এক দুঃখী মেয়েছেলে, বিখ্যাত বাবার জনহাত হয়ে বেড়ানোই তার জীবনে সব।

অনেক, অনেক বছর বাবার ইচ্ছাপূরণ হয়ে থাকা গিয়েছে। অনেক জন্মদিন করা হয়েছে ও'র। বাণী যখন বিব্রোহ করেছে, তখন বাণীকেও বিবিদি সরিয়ে দিয়েছেন। বাবা সুখী হোন, বাবা যা চান তাই হোক।

শুধু এবার, এবার আর পারলেন না। হাবুলকে কি সে কথা বলা যাবে? যতটা বলা যাবে ততটাই বলা যাক।

“হাবুল কি বলছিলে?”

“এই বিয়েতে মতামতের কথা।”

“তখন কেউ মতামত নিত না হাবুল।” দরজার কাছ থেকে সরমা বললেন। রীতিমত বিরক্ত চেহারা, ঝানকটা যেমেছেন। বললেন, “বিবি, হাবুলকে অত প্রশ্ন দাও কেন?”

“মা!” হাবুল ভারী অবাক হয়েছে।

“হঠাৎ চমকে ওঠার কিছু নেই হাবুল। উনি নিরাপদকে দিয়ে আমাকে ফোন করিয়েছিলেন।”

“কে, বাবা?”

“তাই তো মনে হল।”

“না, আমি বলছিলাম,” হাবুল বললে, “ভেবেছিলাম ও ভুলে যাবে।”

“মাকগে, আমি বসছি। হাবুল তুমি বাণীকে একটা খবর দাও।”

“হাবুল জানে বাণী কোথায়?”

“জানতে চেষ্টা করতে পারে।”

হাবুল বললে, “উত্তেজিত হয়োনা বিবি, আমি বাণীকে খবর দিচ্ছি।”

“খবর দিচ্ছ, বাছ না?”

“না। আজ এ বাড়ীতে ওল্ডম্যানের সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল বিবি, সে কথা ভুলে যেও না। যত যাই হোক, উনি খুব আশা করেছিলেন কাল, হয়তো শেষ-বারের মত ও'কে নিয়ে একটু হই-চই হবে, হঠাৎ উনি অনেক নতুন কথাবার্তা বলবেন। ও'রা যে রাজনীতি করতেন, তার চেহারা এখন যা, যে সে চেহারা ভাঙতে আর দুলে না। তবু, ও'কে সবাই আমরা আড্ডামার করছি। কেননা ও'র রেকর্ড ক্রীল উনি এতদিন আগেই সরে গিয়েছেন বলে।”

“হঠাৎ সে কথাগুলো মিথ্যা মনে করছ কেন হাবুল?” সরমা জিগ্যেস করলেন।

“এবার যেন কেউই চার্লি মা। বিবি চার্লি, মনোরমা সেন চার্লি টু লেট দা ওল্ডম্যান হ্যাভ হিজ বিট অফ ফান। কেন চার্লি সেটা আমার জানতে হবে না?”

“তুই কি মনে করছিস বল?”

“আমি... আমি...” হাবুল মাথা নড়তে লাগল। হাবুল, ভাঙলে যে হাবুল মচকায় না, সর্বদা যে বম'অটা হারিকউলিস্ সেজে তার আড়ালে বসে থাক, সেই হাবুলের মুখ দুঃখে ভরা। ও আঘাত পেরেছে। এত বড়ো লোক করেকটা মৃত্যু নিয়ে করেকটা মিথ্যা বলেছে বলে হাবুল দুঃখ পেরেছে। হাবুল শুধু সব হওয়াতে নয়, দৃষ্টি হিংস্রভাবে সব হওয়াতে বিশ্বাস করে।

“আজকাল এত কম জিনিসে শ্লেয়ার টিকে থাকে।”

হাবুল আবার বললে। এই বৃথ বাণীকে পাপের ভয় দেখিয়েছেন। হাবুলের একান্ত সুখশালিত নষ্ট করে দিয়েছেন। তা দিন। তবু অটুট থেকে, মাথা উঁচু রেখে, শ্লেয়ার টিকে থাকতে থাকতে উনি শ্লেয়ার সলি চলে গেলেন না কেন? লাল-আলো যুথের ওপর থাকতে থাকতেই কেন স্টজ ছাড়লেন না?

“তুই কি মনে করছিস জার্নি না হাবুল। ও'র কি বলবার আছে সেটাও শুনিস। হয়তো উনিই বলতে পারবেন যা করছিলেন তার কতটা সফল ছিল, কতটা অসফল।”

“কিন্তু মা, বিবি যে বলে.....”

বিবিদির মুখ থেকে এখন রক্ত সরে গেল, হাতে মুখ ঢাকলেন। বললেন, “তুমি বাণীকে খবর দাও হাবুল। তোমাদের দুজনেরই হয়তো.....তোমাদের দুজনের কাছেই আমি দোষ করছি হাবুল।”

বিবিদি চোখ ঢেকে বসলেন। ফোটা ফোটা জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। বৃকের ভেতর থেকে যেন গলে গলে নেমে যাচ্ছে কি। বাবা যদি সেনহানীতার দোষে দোষী হন তাহলে বিবিদিও দোষ করেছেন। নিজে সুখ পাননি বলেই কি বাণীকে অমন করে বাধা দিয়েছিলেন? সাতুদাকে কি বিবিদি ভালবেসেছিলেন? তার নাম কি ভালবাসা? যদি তাই হবে তাহলে সাতুদা ও'কে ভালবাসে জেনে কেন বৃকের ভেতর পবিত্র জরে শিউরে গিয়েছিল?

“সরমা তুমি জানতে সাতুদা সত্যি কিছ, আমার ভাই ছিল না।”

“জানতাম বিবি।”

“আমি নাকি ওর মা-র দুঃখ খেয়েছিলাম সরমা, আমার সে সব কথার কিছু মনে ছিল না।”

“বিবি কথা বল। বললে তোমার অনেক হালকা লাগবে বিবি।” সরমা মুখ ফিরায়ে নিলেন। অসুস্থতার আবেগে বিবি এতদিন বাসে কথা বলছে তিনি শুনছেন এর মধ্যে কোথায় যেন কি লক্ষ্য পাবার ব্যাপার আছে। হাবুলকে মিছেমিছি দুঃখ দেবার জন্যে বিবিকে বকতে এসেছিলেন সরমা কিন্তু হাটের রুদীকে কিছ তুমি অসুস্থের সময়ে বকতে পার না। বিবি স্বাভাবিক হও, চোখ চেয়ে দেখ ওদের কষ্ট দেবার সত্যিই কোন অধিকার নেই তোমার এ কথা বলে যা কি লাভ। মানুষ কি তার স্বভাবের মেশে দেওয়া লক্ষণের গন্ডি পেরোতে পারে? শুধু, আস্তে আস্তে সেই গন্ডি কবে জমে, শক্ত হয়ে পাথর হয়ে দেওয়াল তুলে দেয় মানুষ জানতেও পারে না।

“কথা বল বিবি।”

“মা মরে যেতে ও এসেছিল সরমা। তখন ওর বয়স ধর যোল। আমার বয়স বড় জোর বারো। আমাদের বাড়ী এমন ছিল না যে তার মতো বাইরের কাজকে টেনে আনা যায়।”

বাবা আর মা-র মধ্যে ব্যক্তির বৃথ। সে কি ভীষণ বৃথ। বাবার সবকিছুর সঙ্গে একটা অন্যজীবনও ছিল। হয়তো, হয়তো সেটা দোষের নয়, অশ্রুত সৌন্দর্যের মাপমাঠিত। কিন্তু মা সইতে পারতেন না। বলতেন, “তোমার যাইরেটা শুধু ছিল না।” হয়তো সবটা ছিল না নয় কিন্তু দুজনে দুজনকে কখনো শান্ত হয়ে, নম্র হয়ে দেখতে জানতেন না। দেওয়াল উঠে ব্যাঙল সারে সারে। শুধু দেওয়াল। বিবিদি তার বাইরে দিয়ে একা একা ঘুরে বেড়াতে। মাঝে মাঝে উর্কি দিয়ে দেখতেন বাবাকে ঘিরে জড়ি গাড়ী, সভা, মানুসজন, উৎসব। বাইরের বাড়ীতে। ভেতরের বাড়ীতে মা তার অভিমান নিয়ে অটল, মৃত্যুর মত স্থির। ডাক্তার বসেছিল মন গুমরে গুমরে থেকেই মা-র বৃকের ব্যাধাটা অমন সর্বশেষ হয়েছিল।

“তবু সাতুদা এসেছিল। বাবার কাছে এসেছিল। বাবার জন্যে ও রাজসাহীর ইস্কুলে পড়তে পেরেছিল। ওর মা-র শেষ সময়ে চিকিৎসা হয়েছিল। বাবাকে ও সেবতা মনে করে এসেছিল।”

“উনি তো করতেন বিবি। কতজনের জন্যে।”

“হ্যাঁ।”

হঠাৎ বিবিদি অবাক হয়ে গেলেন। তার গর্ব হল কেন? বাবা অনেকের জন্যে অনেক করেছেন বলে? তিনি তো বাবাকে ভালবাসেন না?

“সাতুদা মুখচোরা ছিল, অসুস্থ লাভুক। আমার সঙ্গে ছাড়া কারো সঙ্গে কথা বলতে ওর অনেকদিন লেগেছিল।”

শুধু বিবির সঙ্গে কথা বলতে ওর বেশীদিন লাগেনি। একমাত্র সাতুদাই বলত “তোমার বৃথ একা-একা লাগে তাই না বিবি? ও'রা দুজনই এত ব্যস্ত থাকেন?”

মা-ও যে ব্যস্ত থাকতেন। মা-র দুঃখ নিয়ে, অভিমান নিয়ে, বিব্রী ব্যক্তিহাড়া রাগ নিয়ে মা ক্ষাপাঘৃহের মতো বাবার চারিদিকেই ঘুরতেন। বাবা সম্বোধনো মদ খান সবাই জানত কিন্তু মা প্রত্যেকদিনই তাই নিয়ে কে'দে, রেগে এক-একটা কাণ্ড বাধাতেন। সাতুদা সেইজন্যে বিবিদির সঙ্গে কথা বলত, বেড়াত।

“আস্তে আস্তে ও আমাদের বাড়ীর একজন হয়ে গেল। আর, বেগমপুরের বাড়ীতে সতীজেরা বাবার পর থেকে সাতুদা মাঝে মাঝে ওখানেও যেত। বাবার অনেক গোপন কাজ, দরকারী কাজ ও'কে দিয়ে বিশ্বাস পেতেন। মৌদীনীপুরে প্রথম সারের ম্যাজিস্ট্রেট খন হবার পর বাবা বোধ হয় কাছারীর বারে বসে জানতে পেরেছিলেন, নাকি শিকারের সময়ে সারের ডি, সি বলেছিল শীপিংই একটা ধর-পাকড় হবে। বাবা শিকারে যাচ্ছিলেন, সাতুদাকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দিয়ে নিজে শিকারে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

বিশ্বাস করতে করতে সাতুদা বাবার সঙ্গে এমন করে জড়িয়ে গিয়েছিল, এমন

অন্য হারে গিয়েছিল যে মা-কে কোনদিন
অমায় না করলেও বাবাকে দৃষ্টি দেবার
জন্যে ওকেই ও দারী করত।

“অনেকদিনের অনেক কথা সরমা.....”
বলতে বলতে এখন বিবিদির মনে হল
কিছুতেই সাতুদার কথা সুরমা-কে বোঝানো
যাবে না। সবটুকু খারি, সবটুকু পবিত্র,
অন্য গভীরতার ভরা বিষয় চোখ বিবিদি
আর কোনদিন দেখেননি। সব যেন কতদূরে
চলে গিয়েছে, কোথায়, কেন বিবিদির জীবনে
কোনো কিছু এমনি অলীক মনে হয়।

শুধুমাত্র এখন বিবিদি রাঁচির সেই
বাড়ীতে বান, পেট খুলে ঢোকেন, দু-
মোহাবাদী পাহাড়ের চূড়ো দেখতে পান,
বাড়ীটা এখন নিশ্চয় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে,
একবার তখনই সাতুদাকে সত্যি মনে হয়।

প্রতিটি মুকালিশটাস গাছ, প্রতিটি
আমলকী অজমানে মৃৎ করিয়ে থাকে।
অশ্বকর পাড়া, অশ্বকর বাতাস বিবিদির
পা জড়িয়ে ধরে, কল তুমি ভুলে গিয়েছ।
তুমি সাতুদা, তোমাকে আমি ভুলতে পারি
না, বিবিদির ভেতর থেকে কামা গুমরে ওঠে।
তোমার জন্যে এখন আমার চোখে আর জল
আসে না কিন্তু যুগান্তালিয়ার ঝাল ফুল
আমি এখনো তোমার কথা মনে না করে
দেখতে পারি না। তোমার হাত দুটি ধরে
আমি এখনই জানতে বাই তুমি কেন চলে
গেলো সাতুদা তখনই দেখি আমার হাত
তিন বছরের পুরনো লতার জড়িয়ে যাচ্ছে,
আমার চাক্ষুসকে কেউ কোথাও নেই, শূন্য,
আজকের বাতাস। আমি চমকে জেগে উঠি।
তুমি আমাকে বাখা দিয়ে একদিনে ছোট
থেকে বড় করে দিয়েছিলে, বে প্রথম বয়সক
বছর সেই, তাকে মেরো ছেলে না।

যার কি অভিজ্ঞতা দিয়ে বয়সক করে
দেখায়। হুত্ব। নিরন্তর। ফাঁকি। সারা
জীবন যে কখনো জানত না বিবিদিকে সে
অসম করে কখনো করে চলে গেল কি করে
সে কথা বিবিদি এখনো কত সময়ে ভাবেন।

“সত্যিকার তোমার বিষয়ে করতে
চেষ্টাছিল।”

“হ্যাঁ সরমা।”

“তোমার বাবা দেখনি।”

“না। হঠাৎ বলাইলেন এর নাম পাপ
করা।”

“তুমি অবাক হয়েছিলে?”

“দুঃখ অবাক হয়েছিলাম।”

“আমার কথার?”

“প্রথমে সাতুদার কথার। তারপর বাবাব
কথার।” তারপর আর অবাক হওয়ার সময়
ছিল না। সব কি রকম গোলমালে হয়ে
গিয়েছিল। এত দুর্বোধ্য, এত নিষ্ঠুরতার
ভরা। বোঝা যায় না বলেই কি মানুষের
কিছু কিছু ব্যবহারকে নিষ্ঠুর মনে হয়?

“তুমি তুমি ঠিক কখনো বিবি.....”

না সরমা, আমি জানি না। সাতুদাকে
আমার সবচেয়ে আপনজন মনে হত। তা
বৈশ্ব সত্যি, তেমনি এ কথাও সত্যি ওকে
কোনটি জানতাম, তারচেয়ে অন্যরকম
কখনো ভাবতে পারিনি। কিন্তু কি জান,
আমার শূন্য মনে হয় সাতুদা সেই যে সেবার

বাবার সঙ্গে বেগমপুরে গেল-কিন্তু বৈশ্ব
ওর খটকা লেগে গিয়েছিল।

কি: উদ্ভ্রান্ত হয়েই না। সাতুদা
মৌদীনীপুরে ফিরে এসেছিল। কিসের ভাবে
যেন ওকে পিষে ফেলাছিল। বাবারও কোন
কি হয়েছিল, সাতুদাকে সর্বদা চোখে চোখে
রাখাছিলেন। সাতুদা আর বাবার একটা কথা
মনে আছে বিবিদির। সাতুদা বলেছিল
“উচিত হবে না। আপনি এ কাজ করবেন,
না।”

বাবা হেসেছিলেন। বন্দুক সাফ করতে
করতে বাবা হেসেছিলেন।

“আপনি বলুন আপনি যাবেন না।”

বাবা বলেছিলেন, “তোমার বোধ হয়
যুগ হয় না তাই না সত্যিকার?”

“না।” সাতুদা কি ফুপিয়ে কাঁদছিল?

“যুগের ওষুধ খাও না কেন?”

“না।”

“তুমি মাত্র রাখতে পারছ না সত্যিকার।”
বাবার গলা কি নিরন্তর। যেন মজা
পাচ্ছিলেন বাবা।

“আমি আপনাকে.....”

“তুমি যুগ্মেতে বাও সত্যিকার।” বাবা
আদেশ করেছিলেন।

তারপরদিনই সাতুদা সেই আশ্চর্য
কথাটা বলেছিল, “আমার সঙ্গে চলে যাবে
বিবি? অনেক দূরে চলে যাবে?”

বিবিদির এখনো শূন্য মনে হয় সাতুদা
ওকে বাঁচাতে চেয়েছিল। যেন কিসের থেকে
বাঁচাতে চেয়েছিল।

তাই এ অসম্ভব প্রস্তাব। কত বয়স
ছিল সাতুদার? কুড়ি, একুশ? কোন সহায়-
সম্পর্গ ছিল না, ছিল শূন্য একটা অশ্রুত,
যন্ত্রণাভরা উদ্ভ্রান্ত ভাবগে। ভয়ঙ্কর ভেঙে
গিয়েছিল, যন্ত্রণা পাচ্ছিল। ও যাকে দেখত
মনে করত সেই হারিকেশকে ভয় পাচ্ছিল,
সাতুদার কি হয়েছিল?

কিছু জানা যাবে না। নিরন্তর। ফাঁকি,
বিরাট ফাঁকি। সাতুদা মরে গিয়েছিল।
বিবিদি এক খালি বড় হয়ে গিয়েছিলেন।
কিন্তু বাবার মৃত্যুর ওপর, মার মৃত্যুর ওপর
কথা বলবার সাহসও একবার দেখিয়ে
গিয়েছিল।

বলেছিল, “কেবো আমার মা’র দুঃখ
থেকেছিল তাইই ও আমার বোন হয়ে যার
না এ-কথা আপনারাও জানেন।”

“এ হয় না, এ অস্বাভাবিক।”

“বা হচ্ছে তার কোনটা স্বাভাবিক?”
সাতুদা যেন ধমকে উঠেছিল। তারপর
বলেছিল, “বিবিকে তাহলে সিরিয়ে দিন,
অন্য কোথাও সিরিয়ে দিন, বিবি মরে
যাবে।”

বাবা বলেছিলেন, “কোথা! নানারকম
দারিদের ভার নিয়ে নিয়ে ও আর পারছে
না।”

“না, আমি আর পারছি না।” বলে
সাতুদা বেরিয়ে গিয়েছিল ঘর ছড়ে।

মৌদীনীপুর থেকে ওরা সবাই রাঁচি
হাটের সব ঠিকঠাক। কিন্তু বাবা কেন যে
কলকাতা থেকে বেগমপুরে চলে গেলেন,
সাতুদা কেন একা রাঁচি গেল, বিবিদির কেন

একদিন দেরী করে গেলেন, বিবিদি এখনো
বুঝতে পারেন না।

“জান সরমা, সাতুদার আত্মহত্যার একটা
ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন বাবা। বলেছিলেন, ওর
মস্তিষ্ক ভেতরে ভেতরে ছিঁড়ে যাচ্ছিল।
ও বুঝেছিল এই অবস্থায় যদি কখনো
পুলিশ ওকে ধরে তাহলে ও নাকি নিজেকে
চূপ করিয়ে রাখতে পারত না আর সে
কথা ও নিজেই বুঝেছিল। তাই আত্মহত্যা
করে পালিয়ে গেল।

“কেউ জানতে চাননি?”

“কেউ না। দেশের কাজের সঙ্গে বাবা
বৃত্ত থাকত, সে সব ছেলেদের আত্মহত্যা
করটা খুব বিরল ছিল না। তা ছাড়া বাবা
বলেছিলেন। বাবার কথা কে অবিশ্বাস
করবে বল?”

তুমি বিশ্বাস করেছিলে?”

“না, কোনদিন না। পুলিশকে বাবা অন্য
কারণ দেখিয়েছিলেন। প্রেমে ব্যর্থতা।
একটা বানানো গল্প ফেঁদেছিলেন বাবা?”

“পুলিশ বিশ্বাস করেছিল?”

“নিশ্চয়। বাবার কথা অবিশ্বাস করবার
চিন্তা কেউ করতে পারত না। শূন্য আমি
বিশ্বাস করিনি। আমি জানতাম বাবাই কোন
না কোনভাবে সাতুদার মৃত্যুর জন্যে দায়ী।”

এখন বিবিদি কান্ডিতে লাগলেন।
চোখের জল কি এত তেতো হয়? কেন
বিবিদি আজ এ সব কথা বলছেন? বাবার
বয়স তো আশী হল, বিবিদির একাম। আজ
এ সব কথা ভেবে কি লাভ হবে?

“আমি কি হয়ে গিয়েছি সরমা!”
বিবিদি কান্ডিতে লাগলেন, “কেন আজও মনে
হয় বাবা জানতেন সব? আমি বোধহয় বড়
নিচে মেমে গোছ সরমা।”

বলতে গিয়ে চমকে গেলেন। বাবা ওর
ওপর অবিচার করেছেন, অনেক বছর ধরে
বিবিদির এই কথা ভেবেই অভ্যস্ত হয়ে
গিয়েছে, কিন্তু তিনিও বাবার ওপর অন্যায়
করছেন কি না তা ভো ভেবে দেখেননি।

কি জটিল, কি গোলমালে সব। বিবিদি
চোখ মুছেলেন। সরমা এতক্ষণ ধরে গরমজল,
চামচে গোসাস ঘটঘট করে কি একটা তৈরী
করছিলেন এখন বলেছেন, “একটু দুধ-চা
যাবে বিবি?”

“দুধ-চা?”

“আমি সব সময়ে থাকে’সে রাখি,
ঘরতে ফিরতে খেয়ে নিই বিবি। তুমিও
খেয়ে দেখ না, বেশ কলকায়ক।”

“খাব?”

“খাও। তাছাড়া তোমার শরীরও ভো
একম ভাল লাগছে তাই না বিবি?” সরমার
গলা একটু অনামনস্ক।

দুধ-চা গলা দিয়ে পেটে নামবার সঙ্গে
সঙ্গে শরীর দিয়ে মিষ্টি উত্তাপ ছড়িয়ে
পড়তে লাগল, শরীর খারাপের ওপর চা
খেতে দেখলে জন্মের মতোই খুশী হইতেন
না। মৌদীনীপুরে সাতুদার একবার জ্বর
হয়েছিল। মৌদীনীপুরে সবসময়ে পক্ষজ-
ডাক্তারকে খবর দেওয়া হত। পক্ষজডাক্তার
কখনো খেতে দিতেন না জ্বরের সময়ে,
খুব উপোস করাতেন। চিকিৎসা কত যে

পালটে গিয়েছে দিনে দিনে। কিন্তু সরমা, কি ভাবছ?

‘সরমা, কি ভাবছ?’ এখন একটা উদ্ভাপ, আরাম, স্বস্তি, সরমার জন্যে মনের ভেতর নতুন একটা টান, সরমা আমার ছেড়ে যেয়ো না। আমার বরসে এখন মন শুধু বন্ধু খোঁজে। কতজন ভাগ্যবান তাদের বাবা, মা, ছেলে-মেয়ে সকলের সঙ্গে সকলের বন্ধুত্ব হয়।

সরমা সত্যিই কি ভাবছিলেন। এখন বললেন, ‘বিবি, একটা কাজ করবে?’

‘কি সরমা?’

‘হাবল আর বাণীকে বলতে পারবে যে ওরা কোন দোর করেনি? কি জান, হাবল গত কদিন ধরে অস্বাভাবিক বেশী চিন্তা করেছে বন্ধুতে পেরেছি কি একটা কেন ওর ভেতরটা বিবিরে পড়ে। এই পাগটদের কথা, এ তোমাদের বাড়ীর কথা বিবি ওতে আমার বিশ্বাস নেই। তাছাড়া, হাবল তো আমারই হাতে গড়া ছেলে। আমি জানতাম ওর পক্ষে খুব বড় একটা অনায়াস করাও সম্ভব নয়।’

‘সরমা.....’

‘তাছাড়া বিবি, বাণীর বোধহয় ত্রিশ হল, হাবল তার চেয়েও কিছু বড়। বরস ওদের জন্যেও খেমে নেই। আমার ব্যাপারে বিশেষত এই সব ব্যাপারে তুমি কেন কথা বলতে গিয়েছিলে বিবি?’

উদ্ভাপ চলে যাচ্ছে, স্বস্তি চলে যাচ্ছে, বিবিদি যেন দেখতে পেলেন সরমা কি তাড়াহাড়ি দূরে চলে যাচ্ছেন। কাছে এসেছিলেন কি? যে বরসে বন্ধুরে সরকার সবচেয়ে বেশী সে বরসেই বন্ধু পাওয়া যায় না।

‘আম্মীরে, মধ্যো...বাবা বলেছিলেন...’

‘আম্মীর! বিবি, তোমার বাবা নন, তুমিই সবচেয়ে বাধা দিয়েছ বেশী। মেরেকে ধরে সরিয়ে দিয়েছ। মেরেকে দূরে সরিয়ে দিয়েও হয়তো তুমি যাঁচতে পারবে কিন্তু আমি.....’

সরমা খেমে গেলেন। বুচিহীনতা, কি হুচিহীনতা। কি অসভ্যতা বল। ওর মেরের জন্যে ওর কষ্ট হবে না, আমিই একা স্নেহময়ী মা, এ ধরনের কথা বলা কি অপারিসম্মি বোকামি। সরমাদের কো-অপারেটিভে অনেক ধরনের মেরেরা আসে। সুখী-সুখী, চাকরীকর, রাজনীতিকরা। হারা আমার ছেলে, আমার মেয়ে আমার বাৎসল্য বলে গাবিরে মরে বড়ই খবরাজা চেহারা হোক না কেন, তাদের চিরদিন ভীষণ অসভ্য মনে হয়েছ সরমা।

বিবি কিছু মনে কোর না। সময়ে সময়ে আমরা সকলেই নিচে নেমে যেতে পারি। সরমা একটা হাসতে চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন বিবি একটা বৃন্দো।

বিবিদি বিনা প্রতিবাদে চোখ বুজলেন। হুম যদি এত সহজেই আসত। চোখ বুজবার সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে হল এখন ওর ওপর বিশেষণ শব্দে থাকবার সময় নেই।

সরমা পানির লসে বইলেন। বিবির হরের প্রত্যেকটা দরজা আর জানলা খোলা।

শরতের বোদে তাত কিছু কম হয় না। যেমন তাত, তেমনি চোখবলসানো বলতানি। এখন চারদিক থেকে রোদ আসে বলে পদীর রং বলসে যায়, বইয়ের শক্ত মলাট বেঁকে যায়, ধর যেন হা-হা করে। প্রচণ্ড গরমেও বিবিদি জানলা খুলে পাখা চালিয়ে শব্দে থাকেন। এখন সরমার মনে হল একবার হারিকেশের সঙ্গেও দেখা করে আসা দরকার।

হাজার হলো ওই জন্মদিন। খুড়ো বরসে কেন, ছেলেবরসেও জন্মদিন করা ব্যাকামি মনে হয় সরমা, বাড়বাড়ি মনে হয়, ভবু তো লোকে করছে। একটা মালা আর খানিকটা চন্দনে যদি আজও হারিকেশের আনন্দ হয় তো হোক না। খুড়ো, খুড়োর একটা মিউজিয়াম পাস, সে যা চায় তা হতে দিলেই হত। ভাবতে ভাবতে সরমার মনে হল হাবল হয়তো বাণীকে খবর দিতে নিজেই চলে গিয়েছে। ভেবে দুঃখ হল। আমকদিন অবধি হাবলের ভালবাসা সরমা একা অধিকার করে আছেন। এখন জায়গা ছেড়ে দিলে সরে যেতে আনন্দ হয়, আবার দুঃখও হয়। কেবল মনে হয় বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন।

।।সাত।।

‘আমি একজন বঙ্গ বিদ্বান।’ মনোরমা-সেনের চিঠির প্রথম লাইন। হাবল এখন থেকে বেগিরে যাবার সময়ে কাগজগুলো ফেলে গিয়েছিল তাড়াহুড়োতে। স্মান করে, খেয়ে, শাদা নরম পাজিবি আর বম্বাই সুপ্পা পাজিমা পরে চেআরে বসতে গিয়ে হারিকেশ দেখতে পেরে গেলেন। এখন হারিকেশ এই সিনেক্স লাইপ-পাজিমা পরেই সবচেয়ে আরাম পান। নিরাপদ এমন চমৎকার গেরো দিলে দেব যে কিছুতে খসে পড়ে না।

এখন, খাওয়ার পর ওর পড়া উচিত বইলে খাবার হজম হতে চার না, কানের পাশে, মাথার পেছনে ভীষণ সড়সড় করে। হাশিমি মানেই তো অ্যালাজি। কে যেন বলেছিল আসেনিক চিকিৎসার সেরে যায় কিন্তু নীলরতন সরকার বলেছিলেন, ‘হাশিমি সারবে কিন্তু একজিমা হবে।’ বুড়ো না কি একই অ্যালাজি, ভাই-বোন। হারিকেশ যে তখন আসেনিক চিকিৎসা করাননি এখন সেজন্যে নিজেকে ধন্যবাদ দেন, নিজের সুবুদ্ধিকে।

বুড়ো হওয়াটাই তো একটা অভিশাপ। কেন মানুষের ইচ্ছামত হয় না। শরীর শক্ত থাকতে থাকতে চলে যেতে পারে না? হাশিমিটার জন্যেই হারিকেশের লজ্জা করে। তারপর যদি হাতে-পায়ে একজিমা জখম দান থাকত, দিন-রাত গলা দিয়ে কফ উঠত অথবা ডায়বেটিসের জন্যে শরীর সুটকা হরে যেত তাহলে হারিকেশ কি করতেন?

‘আপনি ওটা নিজেই পড়বেন?’

হাবল হাসে আছে। ঘরের কোণে, গা-চলা চেঁচালে। কোথা থেকে যেন কারে খবর দিলে ও হস্তচলিত হয়ে এখানে এসে। হারিকেশের হাতে কাগজটা দেখে একটাও দৃষ্টিতে খেঁচ না, শুধু বিবির হাটু জলজ,

‘এত ছোট ছোট লেখা আপনি কতকাল ধরে পড়বেন?’

এখন হারিকেশ বললেন, ‘হ্যাঁ, নিজের পড়ব। তুমি যা বললে তাতে তো আমি বুনে প্রতিপন্ন হই। তা বাড়ারপর সবসময়ই অভিযোগটা জানতে পারে হাবল।’

হারিকেশ হাসলেন কিন্তু হাবল বলল উনি ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়েছেন

‘আমি একজন বঙ্গ বিদ্বান।’ হারিকেশ খুড়ো বুচিকালেন। ‘এই এক ধরনের লেখার অভ্যাস রয়েছে হাবল। পড়ান-বাড়ি বছর আগে ভীষণ চলত। বঙ্গজননী বোকা হার, কিন্তু বঙ্গসরবা, বঙ্গবিদ্বান। এসব কথার মানে কি বল?’

‘সাহিত্যের প্রশ্ন আমরা পরেও আলোচনা করতে পারব।’

‘ও!’

হারিকেশ গম্ভীর হয়ে গেলেন। মাপান-কাইং প্লাস কাগজের ওপর রাখলেন। হারিকেশের চেআরের হাতলে পড়বার অলো লাগানোই থাকে। মোটা কাচের নিচে সরবার পর প্রায় দরোখা অক্ষরগুলো হুটখ চীৎকার করে উঠল।

‘আমি এখন শব্দগত জোপী। যাঁচব এমন ভরসা করি না।’ হারিকেশের হাত আবেগে কাঁপতে লাগল। মনোরমা তাকে একবার জালাননি কেন? কেন একবার যেতে দেয়নি? তার টাকা নেবার কথা তো মনোরমা ভাবতে পারত না। তাগো, যে ভাইপোর কাছে মারা গেছে সে যাকোটা বুদ্ধি রাখে। টাকা বলা, পরমা বলা, সবই হাত পেতে নিয়েছিল। হারিকেশ জানেন মনোরমা ভুলে ভুলে মারা গিয়েছে উবু, মনোরমার নিজের হাতের লেখার কাগজগুলো পড়া কি কষ্টকর, কি দুঃখ হয়।

‘আমার স্বামী জন্মের সত্যিকার সেনের মতো বিষয়ে আমি কয়েকটি কথা জানাইতে চাই। আপনি মনে করবেন এত-কাল গতে এখন আর এ প্রসঙ্গ কেন। কিন্তু এই কথাটি লইয়া আমি বাঁহার কাছেই গিয়াছি তিনিই বলিয়াছেন এ অতীত প্রসঙ্গ তুলিয়া লাভ নাই। আমার স্বামীর সহকারীদের মধ্যে বাঁহার-হানিষ্ঠ ছিলেন, এমন কি দেউলটির ফণী নাম অর্থাৎ আমাকে চুল করিয়া থাকিতে বলতেন। এখন আমার একটি বাসনা হয়, একবারটি প্রমাণ হোক, আমার স্বামী বিশ্বাসঘাতক ছিলেন না। আমি সামান্য রোগী, সঙ্গীতি নই। ভলমতে কথাটি যে প্রমাণ এবং প্রচার করি, সে সাধ্য আমার নাই। মাননীয় হারিকেশ ভৌমস্ট্রীক এক সময়ে সকলে খুব মান্য করিত। তিনি আমার স্বামীর পাঠ্যবস্তুর বন্ধু। তাঁহার মত আর কেহই জানে না সত্য কি, মিথ্যা কি.....’

মনোরমার চিঠি। তখন বাংলা ইস্কুলে খব ভাল বাংলা চিঠি লিখতে শেখানো হত।

‘আর, পড়লেন না?’

‘পড়ব।’

উনি এখন সত্যিকার সেনের মতুর লিখার সত্যি কথা প্রকাশ করার চেষ্টা করছিলেন, তখন যদি ইচ্ছে করলেই সব

জানতে পারতেন তাঁরা একটুও এগিয়ে আসেননি কেন? ভট্টমহিলার বয়স তখন তো কমই ছিল। অসহায়, বিধবা.....

‘একুশ বছর বয়স ছিল। সতী ওর চেয়ে চম্বিশ-পঁচিশ বছরের বড় ছিল।’

‘কেউ ওকে সাহায্য করেননি কেন? তখন আপনি অনেক ওপরে। আপনি কি পয়সাকে কোন চাপ দিয়েছিলেন?’

হরিকেশ নিরুত্তর।

‘চাপ দিয়েছিলেন? আমার জানতে ইচ্ছে করে, মানুষ নিজের একটা দুর্বলতা ঢাকবার জন্যে আরেকজনের ওপর কি নিম্নম অবিচার করতে পারে। আপনার কি মনে হয় আপনি মনোরমা সেনের ওপর জাস্টিস করেছিলেন? বলেন না! আপনি তো ল নিয়ে অনেক ঘটনাঘটিত করেছেন। জাস্টিস নিয়েও।’

‘আমি ওকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম হাবুল। কিন্তু ও চলে গিয়েছিল।’

‘সাহায্য? জাই গড! উনি বলছেন, আপনি ওর স্বামীর মৃত্যুর জন্যে দায়ী। শী ওআন্টেড দ্য ট্রুথ টু কাম আউট! দ্য স্ক্রীমিং ট্রুথ। আর আপনি বলছেন, আপনি ওকে সাহায্য করতে গিয়েছিলেন।’

‘তাতে ওরও ভাল হত না হাবুল।’

‘তা তিনি জানতেন। জেনেও তিনি যা সত্যি, তা প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। আই জাভমারার হার!’

হরিকেশ মাথা আর ঝাড় মূছলেন।

‘জানেন উনি কিভাবে মারা গিয়েছেন?’

‘শুনেছি অসুখ হয়েছিল।’

‘ইনটেস্টিটাইনে ক্যানসার। তার বম্বুশাটা বোঝেন? আর ওর অবস্থার লোকের ঐ অসুখ হওয়া মানে বলতে গেলে বিনা চিকিৎসায় মারা গেলেন।’

তাহলে মনোরমার জাইপোটা বম্বুজাত। গলা সাফ করে, চোখ মুছে মুছে মনোরমার নাম করে যে টাকা নিয়ে যেত তা মনোরমার কাছে লাগেনি? আরেক রকম জাস্টিস। হরিকেশের শেষ কটা দিন বিষয়ে দেওয়া। এখন কি আর হরিকেশ ইচ্ছে করলেও বেগুনী আনারস, গাঢ়, নীল জুই ফল, কমলা রঙের ঘাস ভাবতে পারবেন? স্বপ্নে ছোটটি হয়ে গিয়ে স্বপ্নের বাগানে ছোটো ছোটো করতে পারবেন? বড়োবয়সে সুখের আরামের, স্বস্তির খুব বেশী কিছু থাকে না। যা থাকে, ঐ স্বপ্নটুকু, তাও নষ্ট করে দিচ্ছে হাবুল। কত লোকই তো না খেয়ে মরে, বিনে চিকিৎসার মরে, বোমা খেয়ে মরে আবার বোম্ব খেয়েও মরে। হরিকেশের সেকথা জানবার দরকার কি? দরজার ওপর বৃষ্টির তীর-খনক টাঙিয়ে রেখেও খুব একটা লাভ হল না। ঘরের দরজা দিয়ে সবই ভেতরে ঢুকে পড়ে আজকাল। এঘরে বৃষ্টির গানটারও কোন মানেটোনে নেই। মানুষের জীবনে দুখ আর অশান্তি এত বেশী।

‘আপনার কি কিছুই বলার নেই?’

‘আমি সত্যকে খুন করিনি হাবুল। ডোন্ট বী আবসার্ড।’

‘কি হয়েছিল?’

‘কি হয়েছিল!’ হরিকেশ হঠাৎ সাহস বুজিয়ে পেলেন। হাজার হলেও এটা ডেড স্টোরি। হাবুলে নিশ্চয়ই ব্যবহার করবে না।

‘মনোরমাকে আমি সতীর আগে থেকেই চিনতাম।’

গুড্ডাদের ধরে নিয়ে যাওয়া মেয়ে মনোরমা। বরিশালে যখন কেস ওঠে ওর নাম ছিল গীতা। হরিকেশ বলে যেতে লাগলেন। হরিকেশ কেস করেছিলেন। কলকাতা থেকে তাঁকে আনানো হয় কেননা তখন জানা গিয়েছিল এর পেছনে একটা বড় দল আছে। তাদের চক্রান্ত অনেক দূর অবধি ছড়িয়ে বেছামো ছিল।

‘তখনকার সমাজ কিছু কম কঠোর ছিল না। ওকে কিরিয়ে নেবার কথা কেউ ভাবতেও পারত না। আমি ওকে কলকাতায় এনেছিলাম, আশ্রমে দিয়েছিলাম।’

মনোরমা নামও তাঁরই দেওয়া। মনোরমা ওকে প্রস্থা করত, ওর কাছে ওর ঋণ শোধ হবার নয়। হরিকেশ যদি তার বিনিময়ে কিছু স্নেহ চেয়ে থাকেন, কিছুটা সহানুভূতি, তাতে অন্যায় কি ছিল? কিন্তু সত্যিকান্ত সেন মনোরমাকে বিয়ে করল। শব্দ সিঁদুর পরিচয় হাতে দুটো কালী-ছাতের শাখা পরিচয় সত্যিকান্ত ওকে কিনে নিল।

হরিকেশও বলেছিলেন, সত্যিকান্ত মহানুভব। কিন্তু মনোরমার মূখের সে উজ্জ্বল শান্তি, নির্মল আনন্দ দেখে ওর হিংসে হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন মনোরমা কোনদিন তাঁকে সত্যিকান্তের মতো প্রস্থা করবে না।

‘তারপর সত্যিকান্ত বেগমপুরে গেল।’

বেগমপুরের কুঠিতে সত্যিকান্তের কাছে আস্তে আস্তে অনেককিছু জমা হইছিল। বন্দুক, পিস্তল, গুলি, বোমা বানাবার বারুদ।

হরিকেশ ঘন ঘন যেতেন। একদিন মনোরমা বলেছিল, ‘আপনি তখন আসবেন না।’

‘কেন মনোরমা?’

‘আপনার বম্বুকে জিগোস করবেন।’

সত্যিকান্তের মনে কি তখন সন্দেহ ঢুকে গিয়েছিল, ভীষণ সন্দেহ? সত্যিকান্ত কেন তাঁকে কিছু বলেনি? হাবুলকে তিনি কেমন করে-বলবেন সত্যিকান্ত তাঁকে আর মনোরমাকে কি অদ্ভুত তীর দৃষ্টিতে দেখত।

সত্যিকান্ত বলেছিল, ‘আমি ওকে সন্দেহ করতে পারিনি ভাই।’

‘তুমি একি বলছ সত্যিকান্ত?’ হরিকেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

‘তুমি ওকে যা দিয়েছ, ওর জন্যে যা ত্যাগ করেছ.....’

‘ওতে কি ভাল হয় হরিকেশ? মনোরমার দিকে যখন তাকাই তখন আমার বয়সের কথা মনে হয়, আমার স্বাস্থ্যের কথা মনে হয়। শব্দ কৃতজ্ঞতা দিয়ে ওকে আটকে রাখা কি আমার পক্ষে উচিত?’

সত্যিকান্ত বৈদ্যবাটির প্রাচীন বংশের ছেলে, কতব্যকে ও অনেক বড় বলে জানত। সেইজন্যে মনোরমাকে বিয়ে করেছিল বটে কিন্তু মনোরমার যৌবন, সৌন্দর্য, লাবণ্য, মাঝে মাঝে ওকে সংশয়ের অস্থির করত। হরিকেশ জানতেন এ সংশয়ের কোন ভিত্তি নেই কেননা মনোরমা সত্যিকান্তকে পূজা করার মত করে ভালবাসত। কিন্তু সেকথা সত্যিকান্তকে বলেও তিনি বিশ্বাস করতে পারেননি।

হরিকেশকেই যে সন্দেহ করেছিল সত্যিকান্ত তা তিনি কেমন করে জানবেন? দলগত কারণে হরিকেশের প্রতি সত্যিকান্ত কৃতজ্ঞ ছিল। কিন্তু শব্দ কৃতজ্ঞতা দিয়ে একান্ত সম্পর্ক গড়ে তোলা টিকিরে রাখা বড় কঠিন। সত্যিকান্তও পারেনি। যদিও,

মুসংবাদ
গুরুত্বপূর্ণ বার্তার নির্ভরযোগ্য সূত্র
স্বয়ং রাজ্য স্বতন্ত্র আপনাদের সন্তানকে
স্বাধীনতার দ্বারা আনন্দিত করুন। তাদের
নিজের দ্বারা আনন্দিত করুন।

বোম্বোম্ব কলম
সমিতা বসু
কোম ৩৫-২০০৫ (সকাল ৯টা অবধি)
বোম্বোম্ব বসু ফ্রেড এ্যাণ্ড
ইলফাট ফুল
৩৫ বাম্বোম্ব বসু লেন, কলকাতা ৬
৩৫৫৫-৩৫৫৫ (৩৫৫৫-৩৫৫৫)

**বিবাহে, উৎসবে
ও নিত্য প্রয়োজনে**
পদ্মা ফোয়ার্স
আমরা "পদ্মা ফোয়ার্স" মুর্শিদাবাদ, স্টেশন সীল ও
অন্যান্য বহু মূল্যবান শাড়ী-এক-বস্ত্রের রোডিমেন্ট
ও মিল বস্ত্রের আয়োজন।
ফোন: ৩৫৫৫-৩৫৫৫
মিয়াল: ৩৫৫৫-৩৫৫৫

রাজনীতিক কর্মী হিসেবে সত্যিকান্ত ইঙ্গিতে গড়া ছিল, তবুও পারেনি।

তারপর আমি মনোরমার চিঠি পেলাম। চলে আসবার পর। ও আমাকে যেতে লিখেছিল।

সত্যিকার যেতে বারণ করেছিল। সত্যিকার, মনোরমাকে দু-একবার দেখেই কি বুঝেছিল কে জানে, ও ধরেই নিয়েছিল সত্যিকান্ত সেনা বদলে বাছে আর তার কারণ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। হরিকেশ।

একা সত্যিকার বুঝেছিল উনি গেলে সর্বনাশ হবে, একটা বিরাট সর্বনাশ। সত্যিকান্তের বিষয়ে কথা বলতে গেলে হরিকেশ যে-রকম কঠিন হয়ে উঠতেন, মনোরমার সঙ্গে কথা বলতে গেলে যে-রকম আবেগে ছেঁসে যেতেন, তাই দেখেই সত্যিকার অনেকদূর অগ্নি বুঝে নিয়েছিল। ততটা বোধহয় হরিকেশও বোঝেন নি।

যাবেন না, আপনি যাবেন না, সত্যিকার বারবার বলছিল, কি করতে হবে বলুন, আমি করব। কিন্তু মনোরমা বিপন্ন, মনোরমা তাঁকে ডেকেছে, হরিকেশ সত্যিকার কথা শোনেন নি।

যে কথা উনি সত্যিকারকে বলতে পারেন নি, অথচ ভেতরে ভেতরে শুনিয়েছেন, তা বললে হয়তো সত্যিকার আত্মহত্যা করত না। সত্যিকান্ত মত পালটাচ্ছিল। এতদিন মনে ওর মনে হচ্ছিল ও না করছে তা ভাল। ওটা কোন পথ নয়। সত্যিকান্ত অহিংস হয়ে জানে সে ভয় হরিকেশ করেননি। কিন্তু সত্যিকান্ত কি করবে, কি করতে পারে, তাও জেবে পারেনি।

আর এ ছোটখাট আর্মারী, তারই না কি হবে? হরিকেশ কোন কথা শোনেননি।

বেগমশহুরে যখন গেলাম, কি দেখলাম জান?

সত্যিকান্ত প্রায় অপ্রকৃতিস্থ, উদ্ভ্রাণ। ওর মধ্যে তখন দুটো যুদ্ধ চলেছে। একটা হচ্ছে রাজনীতিক। ও আমার বললে, এতদিনে ছেঁবে ডেবে ও দেখতে পাচ্ছে, এ দেশে কোন সম্প্রদায় আত্মত্যাগ সক্ষম নয়।

আপনি কি বললেন?

আমি জানতে চাইলাম ও কেন একথা বলছে। ও বলতে লাগল, আমাদের বিপ্লব মানে শত্রু ইমোশান, নশ্বুই ভাগ ব্যর্থতা। মাকে মারতে যাও, তাকে মারতে পার না। যুদ্ধ করতে না করতে সব বিশৃঙ্খল করে ফেল। তাছাড়া, শত্রু-প্রত্যাগস্ত যন্ত্রের আবেগ-প্রবণ রোমান্টিক ছেলেদের দিয়ে রাজনীতি করলে এই হবে। আমাদের চাষা কই, আমাদের শ্রমিকরা কোথায়, আমাদের রাজনীতিক চিন্তায় আধুনিকতা কোথায় বলে সত্যিকান্ত চেঁচিয়ে উঠেছিল।

ওর কথায় যুঁজি ছিল, হয়তো যুঁজি ছিল। কিন্তু শত্রু তো আদর্শের সংগ্রামই নয়, ওর ব্যক্তিগত জীবনেও যে ভীষণ লেশের ঢুকেছিল। দুটো একসঙ্গে হয়ে ওকে ফোঁপিয়ে তুলেছিল।

মনোরমা আমাকে বললে এখন কি হবে? উনি বলছেন অমস নষ্ট করে

ফেলবেন? আমি সত্যিকান্তকে বললাম, ত্রিক আছে সত্যী। রু গো ইওর ওন ওরে। লীভ দিক্স থিন্স টু মী। ও বললে জা হবে না। বিপ্লবী কখনো কত'বা ছেড়ে পালিয়ে যায় না। আমার জিম্মার এগুলো এতদিন থেকেছে। আমি এগুলো নথ' বেগলে পেয়েছে দেব। আমি বললাম যে ম'হ'তে তুমি মত ধালিয়েছ সত্যী, সেই ম'হ'তে তুমি আর বিপ্লবী নও, তোমার আর কত'বা নেই?

সত্যিকান্ত বললে, তবে কি তুমি বিপ্লবী?

না। আমি কখনো সে ভানও করিনি, তুমি জান।

তুমি আমার কত'বায়ের কথা বলবার কে? তুমি একটা দৃষ্টিগত বদমায়েস। এক পাসেন্ট কাজ করে একশো পাসেন্টের মত সম্মান আদায় কর?

আমি বললাম, সত্যী, তুমি পাগলের মত কথা বলছ। আর, এসব কথা তুমি আমার বলতে পার না।

কেন বলতে পারি না?

কেননা কথাগুলো মিথ্যে।

মিথ্যে? মনোরমা তোমার চিঠি লিখে ডেকে আনায় নি? মনোরমা তোমার আসা-যাওয়া, এই অনবরত আসা-যাওয়ার ফলে এখন শত্রু তোমাকেই...

না! মনোরমা চোঁচিয়ে উঠেছিল।

সত্যী, তুমি পাগল হয়ে গিয়েছ। আমি বললাম। আমি ওকে ভীষণ ভয় শেরেছিলাম হাবুল। সত্যীর চোখ আর প্রকৃতিস্থ ছিল না।

ও বললে তাহলে তুমি আমার গুলি কর। হ্যাঁ, আমার তুমি বললে। বললে আমি যদি পাগল হয়ে গিয়ে থাকি, তুমি আমার গুলি কর। আমি বললাম, না সত্যিকান্ত। ও বললে, তাহলে আমি তোকে মারব হরিকেশ, আমার বুকে ভীষণ বন্দুগ। তোকে না মারলে আমার শাস্তি হবে না। ও বন্দুক তুলেছিল। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। ওর চোখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ও আশ্বেত আশ্বেত আমার ওপর থেকে বন্দুক ফিরিয়ে নিলে। বললে, নাউ আই শ্যাল বী অ্যাট পীস।

সুইসাইড?

কল ইট সো। নিম্নের মধ্যে আমি ওর হাত চেপে ধরেছিলাম, বন্দুক ম'হ'তে কেড়ে নিচ্ছিলাম, কিন্তু সেই ঝটকা দিতেই গুলি ছুটে গেল। মনোরমা, মনোরমা আমার বললে, আপনি ওকে মোরে ফেলছেন।

তখন নিজের বুকের দিকে তাকিয়ে সত্যিকান্তের মতদেহ সামনে রেখে হরিকেশ বুঝতে পেরেছিলেন, সত্যিকান্তের ইচ্ছা মিথ্যে নয়। তার বুকের এক জায়গায় একটা হিংস্র আনন্দ বন্দুক করে লাফাচ্ছে। মনোরমার দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন বাবা, সুবিধাবল্লভ। হরিকেশ পালিয়ে এলেন।

একজন ডেকার্টারের মতো ঘটাবার জন্যে, আর্মারী বাঁচাবার জন্যে আপনি অশ্রু সন্ধান পেলেন।

হ্যাঁ। কিন্তু কাউন্ট দ্য লস্ট। সত্য সুইসাইড করে বললে। আমাকে কিছু বলতে দিলে না। আমাকে ও বা মনে করেছিল, আমি তা নই, এই জলাশয় ও মরে গেল, হাবুল।

ইজ লিস দ্য হোল স্টোরী?

ইয়েস। তুমি এখন যাও।

হাবুল কাগজগুলো হুচিহুচি করে ছিঁড়ে ফেলল, বেরিয়ে গেল। হরিকেশ ম'হ'তকে বসে রইলেন। ও'কে বুড়ো একটা কত'বিক্ত পাখির মত দেখাচ্ছিল, সত্যিকার পাখি।

অনেক, অনেক পরে বিবিবি হরিকেশের ঘরে এলেন।

বাবা!

বিবিবি!

আমি তোমার শোবার ঘরে এলাম বাবা। নিরাপদ ওদিকে আছে।

তুমি?

হ্যাঁ বাবা। বিবিবি নিচু হলেন।

বিবিবি, প্রশ্ন কেন?

আজ তোমার জন্মদিন।

না, ও কথা থাক।

বাণী তোমার জন্যে সন্দের চাপর এনেছে বাবা, কাল তোমার দেখাব। আজ তুমি শোও।

তোমার শরীর খারাপ বিবিবি!

এখন ভাল আছি।

হরিকেশ দেখতে পেলেন বিবিবি গলায় একটা বড় হার পরেছে। সম্পূর্ণ শাদা ধান, হাতে ম'হ'তের বালা। কোনদিন পরেও না। ওর খালি গলা খালি হাত দেখতে ওর খারাপ লাগে, তবু পরতে না। ওর মত বরষাই হোক, ওর কাছে বিবির বরষা বেশী হবে কি করে?

হরিকেশ বিজ্ঞানায় শুলেন। বিবিবি আশ্বেত আশ্বেত জানলা খুলে দিতে লাগলেন একটা একটা করে। জানলা দিয়ে শরৎকালের সম্মা আসতে লাগল, আশ্বেত, হিংস্র হয়ে। একটু একটু বাড়ানে হরিকেশের করফর চুল নড়তে লাগল।

আলো নিভিয়ে দিলেন বিবিবি। এখন ঘরে আর কিছু নেই। এখন শত্রু সম্মা। হীরের হার পরে বিবিবি একা জেগে বসে রইলেন। অন্ধকারে হরজার কাঁক থেকে ছোট ছোট ইন্দুর বেরিয়ে এসে বিবিবির পায়ে কাছ দিয়ে খেলা করতে লাগল। হাঁপানির ওষুধ ছাড়াই হরিকেশ বুঝেছেন নিশ্বাসের শব্দ বোঝা গেল।

(সমাপ্ত)

বাংলা সাহিত্যে দেবীর বিচিত্ররূপ

রথীন্দ্রনাথ রায়

মেঘদূতের বিরহী যক্ষকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে, বর্ষা শেষ হওয়ার পর এক উজ্জ্বল শরৎপর্ণিমা রাত্রিতে প্রিয়র সঙ্গে তাঁর পুনর্মিলন হবে। বর্ষা এখানে বিরহীচেতনার চিরসহচর, সন্ত-শরণ—আর শরৎ অনাগত মিলনের স্বপ্ন। বর্ষার মেঘমল্লার আকাশ শরতের সোনালি রোদে ভরে ওঠে, কাশফুলের শূভ্রতার সঙ্গে মিশে যায় নীলোজ্জ্বল আকাশের ঐশ্বর্য। বাহ্যপ্রকৃতির এই আনন্দলীলার সঙ্গ মনুষ্য মিলিয়ে দেয় তার অন্তরের সংরাগ। প্রকৃতির এই পরিপূর্ণ মহিমার পটভূমিকার ব্যঙ্গালীর রোম্ভ উৎসব দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপূজার উৎসবের দিকটাই চিরদিনই প্রাধান্য লাভ করেছে। শস্য-সম্পদ-শক্তিরূপী মায়ের আগমনী উৎসব অথবা বিজয়োৎসবের সঙ্গ তাকে যুক্ত করা হয়েছে। শস্যোৎসব ও পার্বতী উমার ধারা সংস্কৃতির বিচিত্র প্রবাহে এক যুগ্মবেশীর সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে যেভাবে দুর্গপূজা অনুষ্ঠিত হয়, তা সম্ভবত ষোড়শ-শতকে প্রচলিত হয়েছিল। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে রাজা কংসনারায়ণ ন-লক্ষ টাকা ব্যয় করে মূর্তি তুলে দুর্গাপূজা করেছিলেন। বাংলাসাহিত্যে শারদীয় দুর্গাপূজার বিচিত্র প্রসঙ্গ বর্ণনায় সমৃদ্ধ। ব্যঙ্গালীর জীবন-মানস ও ধ্যানধারণার সঙ্গ এই দেবীর সংযোগ কতখানি নিবিড় তা বাংলাসাহিত্যে নানাভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলাসাহিত্যে দুর্গোৎসবের যে বিচিত্র ব্যাখ্যা আত্মপ্রকাশ করেছে, তার মূল ধারা তিনটি: সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক।

মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে দেবীকে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে। আশ্বিনে অম্বিকা পূজা প্রসঙ্গে তার বিহরণ উৎসব আনন্দের সঙ্গ নারীহৃদয়ের আনন্দবেদনাকে যুক্ত করা হয়েছে। ষোড়শ শতকের শেষদিকে দ্বিজমাধব তাঁর 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' কাব্যে ব্যাখ্যামণী কুল্লরার দারিদ্র-বিভ্রম্বত জীবনের বেদনাপ্রসঙ্গে শুনিয়েছেন:

আশ্বিন মাসেত বামা জগৎ সুখময়।
দুর্গার আনন্দ হেতু নাহি চিন্তা ভয়।।
বীণা বাঁশী বাজায় কেহ কেহ গায় গীত।
অমের কারণে প্রভু সদায় চিন্তিত।।

আশ্বিনের উৎসবমুখর দিনে 'ছাগ, মহিষ, মেঘ' বলিদান হতো, দেবীর প্রসাদমাৎসের প্রাচুর্য চারদিকে। তার ফলে ব্যাখ্যামণী কুল্লরার কাছ থেকে কেউ মাসে কেনে না। ধনবানের গৃহিণীদের অঙ্গে উত্তম বসন, অথচ কুল্লরার পেটের চিন্তা। এ চিত্রও ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকের মূল্য-পাঠ্য

সংঘাতের যুগের। মুকুন্দরামের পঞ্চবেশক-দক্ষ বাস্তবসচেতন দৃষ্টিতে এ চিত্র এড়ায় নি:

আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করে জনে জনে।
ছাগ মহিষ মেঘ দিয়া বলিদানে।।

উত্তম বসনে বেশ করয়ে বসিতা।
অভাগী ফুলরা করে উদরের চিন্তা।।
কেহ না আদরে মাংস কেহ না আদরে।
দেবীর প্রসাদ মাংস সবাকার ঘরে।।

আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে মধ্যযুগে যে প্রাসঙ্গিক বর্ণনামূলক আছে, তাতে সেযুগের সমাজচিত্র যেমন উন্মোচিত হয়েছে, তেমনি উন্মোচিত হয়েছে নারী-মনের বিচিত্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ। আশ্বিন মাসে 'নবদুর্গার পূজা' দেখে মনসার মনে কিভাবে চাঁদ সন্মগনের কাছে পূজা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল, সে-কথা জানিয়েছেন শ্রীহট্টের মনসামঙ্গল-রচয়িতা কণ্ঠীবর দত্ত:

আশ্বিন মাসের দিন নবদুর্গার পূজা।
সবারে পূজিল চান্দ রাজা।।

চান্দে ঘোরে না দেয় পুষ্পপানী।
মোরে গালি পাড়ে চান্দে-লম্বজাজি

কানী গো।।

রাখার বিহবেদনার মধ্যেও 'অশ্বিনে অম্বিকা পূজার' বিচিত্র প্রসঙ্গ ছড়িয়ে আছে। কবি শোচনদাস রথের বারমাসীতে লিখেছেন:

আশ্বিনে অম্বিকা পূজা সুখী সব নারী।
কাঁদিয়া গোপগাই আমি দিবস শবরী।।
ভাগবতের অনুবাদকর্তারাও দুর্গাপূজার ধর্মচরণ ও আনুষ্ঠানিক পূজাবিধির কথা উল্লেখ করেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর কবি শ্যামদাস বলেছেন:

আশ্বিনে অম্বিকা পূজা এই তিন পুরে।

আমরা আরোপি বট বনুনার তীরে।।

অখণ্ড শ্রীফলদল আগুরু চন্দনে।

অনেক আরতি কৈনু গৌরী দিলোচনে।।

মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে দেবীর একটি লৌকিক রূপান্তরও ঘটেছিল। উমার হিমালয়দুহিতারূপে জন্মগ্রহণ থেকে আরম্ভ করে শিবের সঙ্গ বিবাহ পর্যন্ত আখ্যায়িকা মূলত কুমারসম্ভব কাব্যের দ্বারা প্রভাবিত হলেও লৌকিক উপাদান ও মানবীয়তার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। কৈলাসবাসী যোগীশ্বর শিব এখানে ভাঙধোর ও মাতাশে পরিণত হয়েছেন। অকর্মণ্য বৃদ্ধ মাতাল স্বামীর দারিদ্র্যলিপ্তিত সাংসারিক জীবনের তাল সামলানো দরিদ্র-গৃহিণী গৌরীর পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। সতী দেহভাগ করে উমারূপে হিমালয়ের ঘরে জন্ম নিয়েছেন। পৌরাণিক চারিত্র্যগুলির মানবীয় রূপের মধ্যে ব্যঙ্গালী গৃহজীবনের

ছায়াপাত ঘটেছে। দৈনন্দিন জীবনের খুঁটি-নাটি বর্ণনার মধ্য দিয়ে শিবগৌরীর দাম্পত্য জীবনের যে ছবি ফুটেছে, তা যেমন বাস্তব তেমনি কৌতুকরসোজ্জ্বল। দেবীর এই লৌকিক রূপের সবচেয়ে আন্তরিক পরিচয় পাওয়া যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি রামেশ্বরের 'শিবায়ন' কাব্যে। শিব এখানে ভিক্ষুক। এই বৃদ্ধ ভিক্ষারী যখন ভিক্ষা করে বাড়ি ফেরেন, তখন 'হাভাতের ঘবের' দুই ছেলে কার্তিক-গণেশের মধ্যে সেই ভিক্ষা নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু হয়। এই কলহ দৈনন্দিন ব্যাপার। তা ছাড়া বড়ো স্বামীকে ভাং বেটে দিতে হয়:

পার্বতী বলেন আর পারি নাহি ব্যাও।

পোড়া ভাঙ পুড়া সিন্ধ ফাঁকি রাখা ব্যাও।।
স্বামী-পুত্রের ঝগড়ার পরে 'গণেশের মা' খেতে বসেছেন। সঙ্গ দু-একজন সিংগনীও আছেন। গল্পগুচ্ছের ও কৌতুক পরিহাসে 'ভোজনপর্ব' পরিসমাপ্ত হয়। ব্যঙ্গালী কবির সরস লেখনী মুখর হয়ে ওঠে:

সহচরী সঙ্গের কারি পসারিয়া পা।

গ্রাস গড়ে গিরিসুতা গণেশের মা।।

মধ্যখানে মহামায়া সখী সব পাশে।

অনমুখে উপকথা আরম্ভিয়া হাসে।।

*

দেবীকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে যে বিপ্লোয়তন সাহিত্য রচিত হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শাস্ত্রগীতিকবিতা। শাস্ত্রগীতিকবিতার চরম অভিব্যক্তি ঘটেছে আগমনী ও বিজয়া গানে। এই গানের গীতিধর্মিতা, কাব্যগুণ ও সর্বজনীন আবেদন অসম্ভাব্য। ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন: "জনগণ প্রাচ্যময় দেবীকে অসুন্দরানী মূর্তিতে দেখেন—কিন্তু ঐ পর্যন্তই; তাহার পরে তাঁহার স্থির নিশ্চিত রূপে জানেন, আসলে আর কিছুই নয়—উমা মায়ের স্বামীগৃহ ছাড়িয়া বৎসরান্তে একবার কন্যারূপে পুত্রকন্যা'দ লইয়া বাপের বাড়ি আগমন। তিনিদিন বাপের বাড়ি উৎসব-আনন্দ—তাহার পরেই আবার চোখের জলে বিজয়া—স্বামীর গৃহে প্রত্যাবর্তন। গণমানসের এই সত্যকে অবলম্বন করিয়াই তাঁ অম্বাদের এত 'আগমনী-বিজয়া' সংগীতের উদ্ভব।"

বাংলা শাস্ত্রগীতিকবিতার উদ্ভব-লক্ষণ অষ্টাদশ শতাব্দী। এই শতাব্দীর সুস্পষ্ট সমাজ-চিত্র শাস্ত্রপদাবলীর পটভূমিকা রচনা করেছে। শিশুকন্যাকে গৌরীদান করে স্বামীর ঘরে পাঠানো হতো। সমাজের মধ্যে দেখা দিয়েছিল কোলীন্য প্রথার অনিবার্য কুফল। সহায়সম্বলহীন বৃদ্ধ পতির গলায় বরমালা দেওয়া হতো। অপরিণত-বৃদ্ধ শিশুকন্যাকে স্বামীর ঘরে পাঠিয়ে মায়ের মনে যে উবেগ ও ব্যাকুলতার সৃষ্টি হতো, আগমনী ও বিজয়া গান তারই অপ্রতিমিত কাব্যরূপ। ব্যঙ্গালী কবিরা দেবীর দনুজদলনী ঐশ্বর্যমূর্তির বেমন তত্ত্বরূপ নিগূহ করার চেষ্টা করেছেন, তেমনি স্নেহবাৎসল্যের করুণধারার তত্ত্ব



ফটো : অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

যিক করেছেন কন্যাপিণী দেবীকে। দেবীকে কেন্দ্র করে শাক্ত-গীতি কবিরা সাধন-সঙ্গীত ও লীলা-সঙ্গীত দুইই রচনা করেছেন। লীলাসঙ্গীতের প্রমুখ অভিযান্ত্রিক ঘটেছে আগমনী ও বিজয়ার পদাবলীতে। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রমুখ সাধক কবি থেকে শুরু করে কবিগানে, টম্পার, পাঁচালিতে, যাত্রার নানাভাবে এই সুর ছড়িয়ে পড়েছে। শিবের ঘরে উমার দুঃখের কথা ভেবে মা মেনকার হৃদয়বেদনা তাঁর হয়ে ওঠে—তিনি বলেন :

শিবের নাইক পিতামাতা, কে বাকিবে
মায়ের বাথা,
কারে কবে দুঃখের কথা, আমার

পারিবারিক চিত্র ও গাহস্থ্য ভাবের এমন নিখুঁত ছবি বাংলাসাহিত্যে বিরল। গাগল ভোলা ভাঙড় হলেও গৃহিণীকে ছেড়ে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই গৃহিণীর পিতালয় মাওয়ার প্রস্তাব শুনে তিনি বলেছেন :

জনক-ভবনে যাবে ভাবনা কি তার।
আমি তব সঙ্গে যাব কেন ভাব আর।।
এদিকে মা মেনকা দুঃস্বপ্ন দেখেছেন, উমার সোনার রং যেন কালো হয়ে গিয়েছে। স্বামী বিব্রল হয়ে অনেক অভিযোগ করে তাকে মেয়ে আনতে পাঠিয়েছেন।

আগমনী গানে মা ও মেয়ের মিলন-দৃশ্য আবদার অভিমান অনুযোগ স্নেহ-বাংসলাকে গভীরতর করে তুলেছে। মা মেয়েকে শিবলয় সম্পর্কে অনেক খুঁটিনাটি কথা জিজ্ঞাসা করেন। স্বামীর সোহাগ ও পতিগৃহের ঐশ্বর্যের কথা হয়তো কিছু বাড়িয়েই বলেন। শিবকে নিমন্ত্রণ করে আনা হয়নি, উমার মনে এজন্য ক্ষোভ আছে। তাই মা যখন শিবের কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন, তখন উমার ভাবান্তরের একটি অসাধারণ অচ্যুত মিথাকল্প চিত্র

এঁকেছেন বশিষ্ঠ-সহচর সে যুগের অন্যতম চিন্তানায়ক অক্ষয়চন্দ্র সরকার :

উমা বলে, আছেন ভাল, চোখে দেয় অঞ্চল
বলে, চোখে কি হলো, আমার চোখে
কি হলো।

মাতা ও কন্যার মিলন-দৃশ্য, মাতার আবেগ-রুদ্ধ কণ্ঠস্বর রামপ্রসাদের একটি প্রসিদ্ধ গানে রূপ পেয়েছে :

গদগদ ভাব ভার, স্বরবর আঁখি করে
পাছে কারি গিরিবরে, অমনি কাঁদে
গলা ধরে।

পুনঃ কোলে বসাইয়া, চারু মৃদু
নিরাশ্রিয়া

চুম্ব অরণ অধরে।।

বাঙালী কবি দেবীর রণরঙ্গিণী নশভুজা মূর্তির কথাও একেবারে বিস্মিত হতে পারেন নি। মেয়ের মধ্যেও তাঁরা দেখেছেন বিশ্বমাতার ঐশ্বর্যময়ী মূর্তি। বিস্মিতা মেনকা তাই মেয়েকে দেখে গিরিরাজকে বলেছেন :

গিরি, কার কণ্ঠহার আনিলে গিরিপরে?
এ তো সে উমা নয়—ভয়ঙ্করী হে,
দশভুজা মেয়ে।

ক্ষণমিলনের পরেই বিদায়-লগ্ন ঘনিয়ে আসে। নবমীর রাতি তাই আসন্ন বিচ্ছেদবেদনায় সুরুণ। এই রাতিকে বিলম্বিত করার জন্য দীর্ঘতর করার জন্য মা মেনকার ব্যাকুল মিনতি স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবযুগের বাংলাকাব্যেও এই আসন্ন বিরহের করুণ-রাগিণী ধ্বনিত হয়েছে। মধুসূদন তাঁর চতুর্দশপদী কবিতায় মেনকার এই হৃদয়-ব্যাকুলতাকে প্রকাশ করেছেন :

যেয়ে না, রজনী, আজি লয়ে তারাদলে।
গেলে তুমি, দয়ামরি, এ পরাণ যাবে।
উদিলে নিদ্রার রবি উদয়-অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে।

কবি নবীনচন্দ্র সেন লিখেছেন :

ষেও না, যেও না, নবমী রজনী,
সন্তাপহারিণী লয়ে তারাদলে।
গেলে তুমি দয়ামরি, উমা আমার
যাবে চলে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর নাট্যকারদের মধ্যে অনেকেই হরগৌরীর কাহিনী নিয়ে ভীতি-রসাস্রিত পৌরাণিক নাটক রচনা করেছেন। গিরিশচন্দ্র তাঁর আগমনী গীতিনাটো উমা-মেনকার স্নেহ-সম্পর্কে নাট্যরূপ দিয়েছেন। তাঁর অনেক পৌরাণিক নাটকে শাক্ত-গীতি সমিবেশিত হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর সাধক কবির কণ্ঠে যে সঙ্গীত অধ্যাত্মবাদ ও মানবীয়তার ধুম্রবেণী রচনা করেছিল, তাই কবিওয়ালা পাঁচালিকার ও যাত্রাচরিতাদের হাতে লৌকিক ভাবনায় সমৃদ্ধ হয়েছে। ঊনবিংশ শতকের কবিদের কবিতায় ভাবে বাজনার সেই সুর কাব্যরসে সমৃদ্ধ হয়েছে।

*

দুর্গাপূজা ও দুর্গামূর্তির বিচিত্র ব্যাখ্যা দিয়েছেন ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সাহিত্যসাধকেরা। এই সময়ের পত্রপত্রিকার দুর্গোৎসবকে ঘিরে বিচিত্র সমাজচিত্রও উদ্ঘাটিত হয়েছে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার তৎকালীন সমাজজীবনের উপর দুর্গোৎসবের প্রভাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে : “বিদেশী কর্মস্থান হইতে বিদায় লইয়াছে, বহুদিবসের পর গুরুজনের স্মরণ দর্শন করিবে, পরী উৎসুক মনে পথের পানে চাহিয়া আছে, তাহাকে সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিবে; শিশুগুলি চটুল নৈত্র প্রতীক্ষা করিতেছে, তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিবে, এবং বন্ধুবান্ধব দূরে আছেন, তাহাদিগকে পাইয়া সুখী হইবে; এইজন্যই দুর্গোৎসব মহোৎসব।” দুর্গোৎসবের মধ্যে আমোদপ্রমোদ ও উৎসবের দিকটিই প্রধান্য

লাভ করেছিল। এই আমোদপ্রমোদের টেউ সাহেবপাড়াতেও গিয়ে পৌঁছত। লড় রুইভ সদলবলে দেওরান নবকৃষ্ণের বাড়িতে আসতেন। এই যুগের ব্যাপ্যাক রচনা-পদ্যের মধ্যে দুর্গোৎসবের নানা কৌতুককর বিবরণ পাওয়া যায়। টেকচাঁদ ঠাকুর তার 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত রাখার কি উপায়' রচনায় এমন দুটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন, যা থেকে সেকালের সমাজের ছবি পাওয়া যাবে :

"কথিত আছে, অন্য এক বানিয়াদী মাতালবাবু মদে মত্ত হইয়া দশমীর দিবস প্রতিমা বিসর্জনকালীন নৌকার দাঁড়িয়া রোদন করিতে করিতে বলিয়াছিলেন—“আরো মা চললেন—মায় সগে কি কেহ বাবে না, আরে বাটা ঢাকী তুই বা”—এই বলিয়া ঢাকীকে জলে ফেলিয়া দেন। ঢাকী ভাসিতে ভাসিতে বহু ক্রেশে বাঁচিয়াছিল, আর তার মাটির দিক দিয়াও হাইত না। আর এক ভক্ত মাতালের কথা অন্তর্ভুক্ত। সেই মাতালের নাম—সিংহ। তাহার বাটাতে পূজা হইবে, বস্তীর রায়ে উঠিয়া প্রতিমার নিকট বসিয়া কোপে পরিপূর্ণ হইয়া সিংহকে বলিলেন—তথ্যে বেটা সিংহ। তুই নকল সিংহ, আমি আসল সিংহ, তুই বেটা মার পদতলে কেন? এই বলিয়া সিংহকে ভাঙিয়া আপনি চাদের মন্ডি দিয়া সিংহ হইলেন। প্রাত্যহিক পুরোহিত আসিয়া দেখিলেন বাটার কড়া স্বয়ং সিংহ হইয়া রহিয়াছেন। তিনি আস্তে আস্তে বলিলেন—মহাশয় ওখানে কেন? কড়ার নেশা ছুটিয়া ছিল, সেখানে হইতে আস্তে আস্তে উঠিয়া অধোমুখে বৈঠকখানার গিয়া বসিলেন। গুরু পুরোহিত সকলে বলিতে লাগিলেন—কড়া বড় ভক্ত, না হবে কেন? সিংহ বংশ।"

আমোদপ্রমোদ ও লঘুচিন্তার পাশে দেবীকে কেন্দ্র করে যুগ-চেতনায় আত্মপ্রকাশ করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগৃত জাতীয়তাবোধ ও দেশমাতৃকার ধ্যানধারণাও এই মূর্তিকে ঘিরে এক সময় শিল্পরূপ পেয়েছিল। মন্মথী দেশ চিন্ময়ী মাতৃ-

মূর্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমিই ঋষি বশিষ্ঠের ক্রিয়াদৃষ্টিতে দশপ্রহরণধারিণীতে পরিণত হয়েছেন। অধোমুখ, নেশাখোর, ভবমুগের কমলাকান্তের হৃদয়ে বশিষ্ঠচন্দ্র সেই চিন্ময়ী মাতৃমূর্তির বন্দনা রচনা করেছেন তার কমলাকান্তের দস্তারে :

"চিন্মিয়াম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মন্মথী—মাতিকারিপণী—অনন্তর-ভূষিতা—একশে কালগর্ভে নিহিতা। রত্ন-মণ্ডিত দশভূজ—দশদিক—দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রুবিমর্দিত বীরজন কেশরী শত্রু নিষ্পীড়নে নিযুক্ত। এ মূর্তি এখন দেখিব না—আজ দেখিব না, কাল দেখিব না—কালপ্রোভে পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব—দিগভূজ, নানাপ্রহরণধারিণী, শত্রুবিমর্দনী, বীরেন্দ্র-পৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বিদ্যাবিজ্ঞান মূর্তিময়ী, সগে বলরূপী কান্তিকের, কার্যসিদ্ধিরূপিণী গণেশ, আমি সেই কালপ্রোভে মধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।"

কমলাকান্তের দস্তারে যার সূচনা, আনন্দমতে তারই পরিণতি। জ্যোৎস্না-লোকিত রাত্রিতে নিজের প্রান্তরে ভবানন্দের মুখে বন্দেমাতরম গান শুনে মহেন্দ্র প্রশ্ন করেছিলেন : "এ ত দেশ, এ ত মা নয়—।" তার উত্তরে ভবানন্দ বলেছিলেন : "আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিই স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি জন্মভূমিই জননী।" জনহীন অরণ্যে সত্যানন্দের মহেন্দ্র সিংহকে সেই দশপ্রহরণধারিণী শত্রুবিমর্দনী মূর্তি দেখালেন। শ্রীঅরবিন্দ বশিষ্ঠচন্দ্রের মাতৃমূর্তি ও স্বদেশচেতন্য সম্পর্কে বলেছেন :

"He perceives that the third element of moral strength must be the infusion of religious feeling into patriotic work. The religion of patriotism.—this is the master idea of Bankim's writings."

দেশমাতৃকার সগে শক্তিরূপিণী এই দেবীমূর্তি মিশে গিয়েছেন। ধর্মসংস্কারের সগে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে। শ্বৈজেন্দ্রলাল তার সুবিখ্যাত গানে বলেছেন :

জননি, তোমার বকে শান্তি
কণ্ঠে তোমার অভয় উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অম,
চরণে তোমার বিতর মূর্তি।
জননি! তোমার সন্তান তরে
কত না বেদনা কত না হর্ষ!
জগৎপালিনি! জগৎতারিণি!

জগৎজননি! ভারতবর্ষ! বঙ্গভঙ্গ আলোড়নের যুগে বাঙালী কবিদের অনেকেই স্বদেশচেতন্য প্রকাশ করতে গিয়ে দেবীমূর্তির আশ্রয় নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সুস্পষ্টভাবে তথাকথিত পৌরাণিক চেতনার দ্বারা প্রভাবিত না হলেও দেশপ্রেমের গানে তিনি যে ঋণধারিণী ত্রিনয়নী দেশমাতৃকার রূপ কল্পনা করেছেন, তার মূলে পৌরাণিক ইমেজকে অস্বীকার করা যায় না—

ডান হাতে তোর ধর্মজ্বলে
বাঁ হাতে করে শঙ্কাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি
ললাটে নেত্র আগুনবরণ।

অবশ্য বাংলাদেশের আগমনী-বিজয়া গান ও কুমারসম্ভবের উমা-মহেশ্বরের বিচিত্র ভাবানুগুণ রবীন্দ্র-সাহিত্যে অসামান্য মহি-মায় আত্মপ্রকাশ করেছে। হরগৌরী বিষয়ক গান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বাংলার লোকগীতিকার মর্মরহস্য উদ্‌ঘাটিত করে-ছেন। শরৎকালের ঋতুরূপের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়েও কবি বলেছেন : "মাটির কন্যার আগমনী গান এই তো সোঁদীন বাজিল। মেঘের নন্দিনী শিঙা বাজাইতে বাজাইতে গৌরীশারদাকে এই কিছুদিন হইল ধরা-জননীর কোলে রাখিয়া গেছে। কিন্তু বিজয়ের গান বাজিতে আর তো দেরি নাই। শ্মশানবাসী পাগলটা এল বলিয়া, তাকে তো ফিরাইয়া দিবার জো নাই—হাসির চন্দ্রকলা তার ললাটে লাগিয়া আছে, কিন্তু তার জটায় কামার মন্দাকিনী।"

রবীন্দ্রনাথের হাতে উমা-মহেশ্বরের পৌরাণিক, ধর্মীয় ও সামাজিক রূপ প্রাধান্য লাভ করেনি। কিন্তু তিনি এই আখ্যায়িকাকে অবলম্বন করে যে রসব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাকে নবসৃষ্টি বললেও অত্যন্তি হয় না। চিত্রকল্প ও অলংকারনৈপুণ্যে কবির এই রসভাষা এক অসামান্য সারস্বত অভিব্যক্তি। অর্থালংকার ও চিত্রকল্পের নিপুণ প্রয়োগে কবির রোমাণ্টিক কল্পস্বপন যেমন সুদূর-প্রসারী, তেমনি অর্থবহ :

তুমি যেন মহাকাল সমুদ্রের তটে
নিত্যের নিশ্চল চিত্তপটে
দেখেছিলে চঞ্চলের চলমান ছবি,
শুনোছিলে ভৈরবের ধ্যানমাঝে

উমার ভৈরবী।
পৌরাণিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনাকে অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথের হাতে দেবীকাহিনী অলংকরণ, চিত্রকল্প ও রসব্যাখ্যার দিল্পরূপ পেয়েছে।



হিমালী গ্রিসারিন স্নান

—সকল ক্ষুদ্রে সমান ঔষধোণী!

শীতের দিনে চর্মরোগ, পরস্রবাসে
রিক্ত তেনায় শরীর জ্বাড়াই।



হিমালী প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-২



স্বর্গ

লীলা মজুমদার

স্বর্গে ঢোকা অনেকে যতটা সোজা মনে করেন, আসলে তা মোটেই নয়। খুব খানিকটা সত্যি কথা বললে আর পুণ্য কাজ করলেই যদি স্বর্গে যাওয়া যেত, তাহলে তো আর ভাবনাই ছিল না। সেখানেও লোক গিজগিজ করত, পপুলেশন এক্সপ্লোশন হত, তারপর রায়ান কাড, দুধ-ক্যানটিন, ক্রীম-ছানা বন্ধ, বুনোহাঁস মরে সবাড়, শেষটা হয়তো পাশপোর্ট ভিসা লোহ'র পরদার নো এন্ট্রি লেখা। সুখের বিষয়, স্বর্গে ঢোকা বড় শক্ত। শক্ত, কিন্তু অসম্ভব নয়। সব ভালো লোকেরা সেখানে ঢুকতে পারে কিনা জানি না, তবে খুব ভাগ্যমন্ড না হলে যে সেখানকার চৌকাঠ ডিঙানো যায় না, এটা ঠিক। স্বর্গে মন্দদের যদিবা স্থান হয়, বোকাদের হয় না। যদিবা কোনো ক্রমে তারা একবার ভিতরে সেঁধোতে পারে, তবু সেখানে দিক থাকবার জো নেই। আমি গিয়েছি তাই এত কথা বলতে পারছি। এর বেশি কিছু বলতে চাই না; যার বা খুশি মনে করতে পারেন। তবে গিয়ে অবধি আমার যে বরাতটা খুলে গেছে এটুকুও বলা উচিত।

বর্ষাকালে একেবারেই সম্ভাব্য আসে, বখন আকাশ পৃথিবী ধুয়ে-মুছে একটা ঠান্ডা ভিজ স্যাঁস্যাঁতে ছাই রঙের ধোয়ায় মিশে একাকার হয়ে যায়। পায়ের নীচে অপ্রত্যাশিত জায়গা থেকে কুলকুল করে জলের স্রোত বইতে থাকে, একশো বছরের পুরনো সোঁদা একটা গন্ধ নাকে আসে। তখন যদি গায়ে যথেষ্ট আবরণ না থাকে, পেটে ভাত না থাকে, কপালে চাকরি না থাকে, টাকাকড়ি না থাকে, মনে আশা না থাকে, ঘরে ঠাই না থাকে, আর বন্ধ যদি কেউ কোথাও

থেকেও থাকে, সে খোঁজ না নেয়, ঠিক সেই সময় যদি জুতোর তলাটা খসে ভেসে যায় আর পায়ের তলার কাদের খাওয়া মাছের কাঁটা খচ করে বিঁধে যায়, তাহলে তখন স্বর্গে যাবার জন্য নিজেকে তৈরি করতে হয়।

আমারো ঠিক তাই হয়েছিল। চোখে অন্ধকার দেখছিলাম, পৃথিবীতে দাঁড়বার একটু জায়গা পাচ্ছিলাম না, সেই ভিজে কাদায় অনুতাপে ব্যথার অন্ধকারে পথের ধারে পলেক্সতার-ওঠা পুরনো একটা দেয়ালের উপর হুঁড়ু খেয়ে পড়লাম। ছেঁড়া জামার গলা দিয়ে ঢুকে আলাদা আলাদা চার-পাঁচটা বরফের মতো ঠান্ডা জলের স্রোত আমার পিঠ বেয়ে নামতে লাগল। সবীগে কাটা দিয়ে উঠল। জলে ঝাপসা চোখে দেখতে পেলাম দেয়ালে একটা নীল এনামেলের সাইনবোর্ডে ছোট ছোট সাদা ডাক্তার কপোরেশনের না কার যেন নোটিশ বুলছে, তার লেখা ভালো করে পড়া যাচ্ছে না, আন্দাজে মনে হল—এখানে আশা করিও না। হাসি পেল। আশা কাকে বলে?

ঠিক তখন হাতের চাপে দেয়ালটা সরে গেল। আমি হুঁড়ু হুঁড়ু করে আলাম ভর একটা শুকনো জায়গায় গিয়ে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালটা আবার বন্ধ হয়ে গেল, বড়বড়ির শব্দও কানের ভিতর থেকে দূর হয়ে গেল। তার বদলে অপূর্ব একটা গন্ধ আমার নাকের দুটো ফুটোই ভরে গেল। আরেকটু হলেই অজ্ঞান হয়ে পড়তুম। যাচ্ছিলাম, তবু তারি মধ্যে, ঐ হাত-পা কিম্বা কান বোঁ-বোঁর মধ্যেই টের পেলাম যেমন করেই হোক, আমি স্বর্গে পৌঁছে গেছি। এমন কি, ঘরের কানে তাল লাগা হটগোলের মধ্যেও দেয়ালে লটকানো একটা

নোটিশ দেখলাম, স্বর্গধাম। স্বর্গাধিকারী—শ্রীভগবান।

শ্রীভগবানের প্রকাশ্য পাশেলিটির জন্য আমার অনেক বছরের জমানো রাগ এক মুহূর্তেই কেটে গেল। সত্যি কথা বলতে কি, স্বর্গে যাবার আমার তখন কোনো যোগ্যতাই ছিল না। সংস্কৃত জানি না, গড়ের মাঠে অন্য লোকের গোরু দূরে কতবার দুধ খেয়েছি, আরো কত অন্যায় করেছি, সে-সব এখন মনে করতেও আমার লজ্জা করছে। তবে ঐ কথা বা বলছি, এ-সবের সঙ্গে স্বর্গে যাওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই।

এসব কথা অবির্ভা তখন মনে করার সময় ছিল না। খালি মনে হচ্ছিল পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে; তা থাকবে, এখানে মাটি দিয়ে কি হবে? টাল সামলে উঠতে যাব, কে যেন আমার পশ্চাৎভাগের নিচে একটা উঁচু কোঁটা টুল গুঁজে দিল। আমি তাতেই বসে পড়লাম। এ কেমন জায়গায় এসেছি, যার বেটি দরকার, না চাইতেই জুটে যায়।

ছেঁড়া জুতোর কাদা ছপছপ করছে, সবীগে বেয়ে জল করছে, এই কি স্বর্গে যাবার ব্যবস্থা? কোথা থেকে একটা নোংরা-মতো ছোকরা এসে পা থেকে জুতোজোড়া খুলে নিয়ে খরখরে ঝাড়ন দিয়ে আঙুলের ফাঁকের জল পর্বন্ত আস্তে আস্তে মুছিয়ে নিল। আরামে চোখ বুজে এল।

কে যেন কক'শকণ্ঠে বলল, দেখছি কি, এবার ওর গলায় একবাটি কালকের সূর্যের গরম করে ঢেলে দাও। ও আমাদের প্রার্থনার উত্তর। আগে ওকে চাট্টা করে তোলে, তারপর অন্য কথা।

ককশি কণ্ঠ বললাম নাকি? স্বর্গে ককশি বা কি আর মোলায়েমই বা কি। সবগণের সব ঘাটই সেখানে সমান মধুর শোনার। নাকে একটা অশ্রুত ভালো গন্ধ এল চোখ বুজই হাঁ করলাম। কে যেন আমার গলায় একটা একটা করে অমৃত ঢেলে দিতে লাগল। তার স্বাদের কথা আর কি বলব নোনতা নোনতা, টকটক, বাগ্‌বাগ, মিষ্টিমিষ্টি। মনে হল হয়তো মুরগি দিয়ে তৈরি।

আন্তে আস্তে আমার মস্তিষ্ক গায়ে প্রাণ ফিরে আসতে লাগল। দু'বার হাটলাম, তিনবার নাক টানলাম। অমনি চারদিকের ভিড়ের সবাই মহাবাস্তব হয়ে উঠল। 'ওকি, হাট কেন? এখানে এসে ব্যায়াম করলেই তো হয়ে গেল। আঁ! করছি কি, তোমাদের কাকুলতাটা তো বেশ, ভিজ়ে কাপড় ছাড়ানি!'

সঙ্গে সঙ্গে কি আর বলব, কারা আমাকে তুলে ধরে মৃত্যুতীর মধ্যে জামা-শালজা ও এক দম্পত্য দম্পতির সামনেই ছাড়িয়ে যা যবে, রক্তরসে লাল বানিয়ে ফেলে, সঙ্গে সঙ্গে শুন্যে গোলি ইজেক্ট চটি পরিবেশ দিল। তাতে আমার এতটুকুও এসে গেল না, স্বর্গে আবার লজ্জা-ঘৃণা-ভয়ের জায়গা কোথায়?

মাথাটা ততক্ষণে প্রায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। চোখ খুলে চাইতে পারলাম। সামনে বাক দেখলাম, সে যে এ-পৃথিবীর নয়, তা আর বলে দিতে হবে না। অমন লাল টকটক দশাসই টেটবুর চেহারা এ-বিশ্বের জগতের নয়। বতটা লম্বা ততটা চওড়া, বকের উপর চারের ট্রে বসানো চলে। এক চাল কোঁকড়া লালচে তুল জড়িয়ে হাত-খোঁশা করে মাথার উপর উঁচু করে বাঁধে। কান পর্যন্ত টানা বড় বড় কালো চোখ। চোঁটটিতে—না, চোঁটের কথা না-ই বললাম। বরস? স্বর্গে আবার বরস কি, সার? সেখানে অনন্তকালের হিসাব। হয়তো আরমানি কি আয়েলো ইন্ডিয়ান বলতে পারেন, কিন্তু তাতে হয়েছোটা কি? স্বর্গ কিছ, হিন্দুদের একচেটিয়া এলাকা নয়। হিন্দু কিছ, হিন্দু ছিলেন না।

স্বর্গ সম্বন্ধে এতাবকাল যা যা শুনে এসেছিলাম, এখন সে-কথা মনে করে হাসি পেল। অবিশা তখনো আমি স্বর্গের স্বর্গের খিড়কিদের খোলা পেয়ে পাক্ষর অরখি পেঁছেছি। তা-ও নিশ্চয়ই কারো তুলের জন্য এবং একটু পরেই বোঝা গেল কার বা কাদের তুল। তবু এর মধ্যে বললাম এখানে কেউ জানা ব্যাপটিয়ে, বাঁগা থাকিয়ে, মধু খেয়ে দিন কাটায় না। এটা স্বর্গের পাক্ষর। এখানে সারি সারি উঁচু উঁচু আঁচ গনগন করছে, তার উপর বড় বড় হাঁজা চেপেছে, তার সঙ্গশে ঘরের বাতাস মো-মো করছে। সে আর করবে না? স্বর্গে কেউ খালি পেটে থাকে না। পঁচিশ-ত্রিশজন লোক হাতা হাতে ছুটোছুটি করছে। কারো নর, কেউ ন্যাড়া, কেউ বড়ো, কেউ ছোটো। স্বর্গে যে বাছবিচার নেই সে-কথা বলাই বাহুল্য। নইলে যে

কারণই হক আমি এসে পড়লাম কি করে, আমি বাক বাড়ির লোকে দু'দর করে তাড়িয়ে দিয়েছে।

সেই দশাসই মানুষি আমার কাঁধ ধরে একটা, বাকি দিয়ে বলল, 'ফিলিং বেটার?' পারে—আর শব্দ চোন্দ কেন, আরো ইংলিশ শব্দে এতটুকু চমকলাম না। ভারত সরকারেরই যদি চোন্দ ভাষা চলতে বাজবার কথাও মাঝে মাঝে শোনা যায়—তাহলে স্বর্গে নিশ্চর খেলের সব রসনাই সুযোগ পায়।

মেম বলল, 'তাহলে ছুরিটুকুগুলো আনক। যথেষ্ট ধার আছে আশা করি? কাজটা খুব সহজ নয়। তোমার জন্য আমার সহানুভূতিও হচ্ছে। দেখি তোমার হাতটা! মেম আমার ডান হাতের গুলটা টিপে টিপে দেখতে লাগল। আমার রক্ত হিম। তবে কি স্বর্গে শব্দ, শব্দ ছাড়া অন্য জিনিসও আছে? দড়াম করে মেমের পা জড়িয়ে ধরলাম। সে ভো অবাক; একটা যেন খুঁশিও হল; টোল-খাওয়া গালদুটো আরো লালচে হয়ে উঠল। 'ফিক্ করে একটা, হেসে কনায়সে আমাকে টেনে তুলে বলল, 'নো টাইম ফর থিরেটার, ম্যান। এবার কাজে না লাগলেই নয়। স্বর্গে' কি আর সময় নষ্ট চলে? এ দেখ, তোমার কাজ অপেক্ষা করে রয়েছে।'

চেয়ে দেখি দেয়াল ঘেঁরে অন্তত পঞ্চাশটা বুনে হাঁস গাদা হয়ে রয়েছে। আমাকে আর কিছু বলে দিতে হল না। সুখের সময় অমন অনেক বুনা হাঁস শিকার করেছি। তারপর পালক ছাড়িয়ে ঘি-মশলা মাখিয়ে, কাঠি কুটিয়ে, কাঠের জ্বলে জ্বলে খেয়েছি। স্বর্গে এসেও তার স্বাব জ্বলিনি। জলচৌকি টেনে বসে পড়লাম।

কাজটা খুব সহজ নয়। সহজ কাজের জন্য কেউ কিছু স্বর্গেও যায় না। পালক-গুলো গোছাগোছা টেনে-ছিঁড়ে ফেলে দিতে হয়। মাঝে মাঝে গরম জলে চুঁবিয়ে নিতে হয়। তবু যদি কালো কালো গোড়া থেকে যায়, তাকে আগুনে বলসে নিতে হয়। পঞ্চাশটা হাঁস ছাড়ানো চাটখানিক কথাও নয়। শেষের দিকে মেম এসে আমার পাশে মোড়ায় বসে সাহায্য করতে লাগল। মাঝে মাঝে তার খোঁপা থেকে খসে-বাওয়া দুটো-একটা কোঁকড়া তুলের পুঁছি আমার গালে লেগে যাচ্ছিল।

হঠাৎ একটা খটকা লাগল। মেমকে বললাম, 'স্বর্গে মলে হাঁসরা যায় কোথায়?' মেম ফিক্‌ফিক্‌ করে হেসে বলল, 'নিশ্চর পৃথিবীতে যায়।' বললাম, 'এতগুলো দিয়ে কি হবে?' মেম বলল, 'হাঁস দিয়ে যা হয়। ভোজ হবে।' 'কার জন্য ভোজ?' 'মেম ভো হাঁ! 'কার জন্য আবার? মালিকের জন্য।' 'মালিক কে?' 'মেমের হাত থেকে হাঁস পড়ে গেল। 'মাই গড, স্বর্গের মালিক কে তাও জান না?' অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, 'জানি, জানি, শ্রীভগবান তো?' মেম হেসে কেঁজল। আমিও হাসলাম। আমি যে আবার হাসতে পারি, তাও তুলে গিয়েছিলাম।

ততক্ষণে হাঁস রেডি। জনা-পাঁচেক লোক এসে দেখতে দেখতে পঞ্চাশটা হাঁসকে এ-ফেঁড় ও-ফেঁড় শিকের চাড়িয়ে, ঘি-মশলা দিয়ে, বলসাতে লেগে গেল।

আমার ঘাড় পর্যন্ত টনটন করছিল। মেম আমার পাশের টুলে বসে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'দেখলে কি না? তখনি বলেছিলাম, প্রেমের জন্য কিছ, হাঁসের কাবাব অপেক্ষা করে থাকে না। থাকগে, অ্যান্টনি যেখানে খুঁশি, বাক খুঁশি সঙ্গে নিয়ে থাক। তার জন্য মালিকের ভোজ বন্ধ থাকবে না। ডেবেছিল আমার বুকও ভাঙবে, চাকরিও থাকে। স্বর্গের চাকরি অত সহজে ধার না। তাহাড়া সমুদ্র থেকে হত ভালো মাছ ধরে আনা হয় জলের নিচেও তত ভালো মাছ পাওয়া যায়।' এই বলে মেম আমার দিকে চেয়ে এমন করে হাসল যে সত্যি সত্যি মাথা ঘুরে আমি ঐ অত উঁচু টুল থেকে দূর করে পড়ে গেলোম। তারপর আর কিছু মনে নেই।

বখন জ্ঞান হল, তখন টের পেলাম সকাল হয়েছে, জানলা দিয়ে এক ফালি রোদ এসে আমার বিছানার চাদরে এসে পড়েছে। আমার বিছানার চাদর বললাম নাকি? আমার আবার এরকম গোলাপী ফুল আঁকা বিছানার চাদর হল কবে? আমার বিছানাই নেই, আবার বিছানার চাদর কিসের! হারি বিছানা হক, তার পাশে ছোট টেবিলে কাচের গোলসে সাজানো লাল গোলাপের তোড়া। তার দুটো-একটা পাপড়ি খসে আমার রান্নিগের উপর পড়েছে।

ভগবান, এই তবে স্বর্গ, আমার মতো অভ্যাসকেও এখানে এনে ঢোকালো! হা ভগবান! অমনি মিমি-মেমের নাম মিমি বলেছি কি?—হুটে এসে আমার কপালের জলপটি তুলে নিয়ে বলল—'মাই গড, অত জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলো না, আমার ভয় করে।'

গোড়াতেই বলেছি না, সেই যে একবার অন্য লোকের তুলের জন্য দমজর খোলা পেয়ে স্বর্গে ঢুকতে পেরেছিলাম, আর আমাকে ফিরে দেখতে হয়নি। অন্য লোকের তুল মানে অ্যান্টনির তুল। সে সেই যে শিল্পনাকে নিয়ে খিড়কি-দোর দিয়ে জল-কড়ে বেরিয়ে গেল, আর তার পাক্সা নেই। স্বর্গ থেকে বেরনো হত সহজ, ঢোকা তত সহজ নয়।

অ্যান্টনির জায়গায় আমি বহাল হলোম। দেখতে দেখতে মিমির ভাঙা বুক জোড়া লেগে গেল, খাতায় সই দিয়ে একদিন তারে বিরে করে ফেললাম। তারপর তার জমানো টাকা আর আমার রোজগারের টাকা দিয়ে আমরা স্বর্গস্থার কিনে ফেললাম। মিমি তার নাম বদলে মিমিজ্‌ হাউস করে দিল। সত্যি করে বলুন স্যার, এত কম খরচে, এত ভালো খাবার আর কোথায় পেতেন? কি বললেন? শ্রীভগবান কোথায় গেছেন? কি জানি, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ দেখা কখনো হয়নি। মিমি হয়তো বলতে পারে।

স্বপ্নে দেখি পুরাতন মিতাদের ॥

বিষ্ণু দে

মেঘেরা জড়ার গিরিচুড়াদের, গিরিচুড়া বাঁধে মেঘেদের,
নিচে ঐ নদী আসনার মতো বিকিরিত করে স্বচ্ছ।
পশ্চিম গিরিমৌলিতে ঘুরি, হৃদয় আমার চঞ্চল
দক্ষিণাকাশে তাকিয়ে, স্বপ্নে দেখি পুরাতন মিতাদের।

আমার মনে বাঁচে অনেক মিতা,
কেউ বা পুরাতন, বহু নতুন।
মেঘে জড়ার বটে চুড়াও আমাদের।
স্বপ্নে খোঁজে তবু সারাটা দিভুবন।
নেতাও আমাদের হাজার চিত্তা।

হে গিরিচুড়া, শোনো, তোমরা গড়া
আজকে স্বপ্নকে আকাশস্পর্শী।
কেন যে আমাদের হৃদয় অনীহার
অসাড় আশ্বমে-জাগায় জড়োসড়ো!
হুড়াও আলো-ছায়া স্বচ্ছ নদীতে,
হব না কেন বলো ঐকালদর্শী?

জড়াক গিরিচুড়া সাহসী মেঘেদের,
মেঘেরা চুড়াধারী অসীম অভরে
নামায় হিম-নদী হাজার বাহুতে,
তা দেখে মৃত্যুর দসাদানবেরা
পালার বানচাল গুপ্তি পাতালে।
বোমারু বানে ভাসে সে হিমবাহতে।

বিশ্বের যত গিরিচুড়া বাঁধে বিশ্বের মেঘমন্ডে।
আসনার মতো হৃদয়ের মতো নদী ঝলসাক স্বচ্ছ।
পূর্বপশ্চিমে গিরিমৌলিতে অবাক তাকাই, দুর্জয়
দক্ষিণাকাশে ইতিহাস মাত্রে, স্বপ্নে দেখেছি মিতাদের।

শিশু-বিষয়ক ॥ সঞ্জয় ভট্টাচার্য

১ ॥

এখন পালিয়ে যেতে চাই
বাবহৃত মেয়েদের ভীড় থেকে, ফুলের বাগানে।
আশ্রয় শিশুরা দিতে জানে,
ফুলের বাগানে আছে সে-সম্ভাবনাই।
ফুলের বাগানে আছে স্মৃতি :
অবিস্মরণীয় প্রতিকৃতি ॥

২ ॥

বিকেলের স্বচ্ছ রোদ একটি শিশুর খেলাঘর।
সেখানেই বাই অতঃপর
লেনদেন শেষ হয়ে গেলে।
তার সে বিকেলে
কোনো কথা কথা বুঝি নয়
কোনো দেখা দেখা নয় আর,
কথার দেখার এক ভিন্ন পরিচর
নিরে আছে সে ঘরসংসার ॥

কবিতা

দিগ্বিজয় ॥ অরুণ মিত্র

শব্দগুলোকে আমি দারুণভাবে সাজিয়েছিলাম।
মিল অমিল সমস্ত নিয়ে এক দুর্ধর্ষ বাহু। লড়াই শুরু হতেই
সেটা প্রমাণিত হল। দিনদুপুরে আমি সূর্য টালিয়ে
দিলাম। নিকষ কালোর আমার চোখ শতসহস্র
পতন দেখল। নোঙর-করা কত নৌকো দড়িদড়া ভিড়ে
স্বর্নাশে ভেসে গেল।
আকাশ বাতাস আমি আওয়াজে
আওয়াজে দলে দলে পাকিয়ে দিলাম। কিছু রাস্তাঘাটে
এককালে চলাফেরা করতাম। সেগুলো ছেঁতান
হল। মারামারক নেশার আমার রক্ত নাচতে লাগল।

কোনো মূহুর্তে আমার শরীরটাকে হয়তো
একলা বিছানায় আমি শোয়াতে চেয়েছি। নেশাটা
একটু পাতলা হয়ে এলে এমন হয়েছে। কিন্তু নতুন
শব্দকে ছুঁয়ে আমি আবার পরাক্রান্ত হয়ে উঠেছি।
আমার বিছানাও এক রণক্ষেত্র, এটা বুঝে আমি
খাঁপিয়ে পড়েছি। সেও এক লড়াই বটে! ঘর্মাক্ত
হয়ে আমি একের পর এক অবরোধ ভেঙেছি, কণায়
চড়ে অন্ধকার সুড়ঙ্গে প্রবেশ করেছি, কল্পনা
যতখানি যেতে পারে আমি হাড়মাংসের
আড়ালকে বিধ্বস্ত করেছি। এবং তারপর
রসিয়ে রসিয়ে আমার বিক্রমের আস্বাদ নিয়েছি।

কিন্তু কার সঙ্গে এতক্ষণ লড়লাম? কে জানে
কার সঙ্গে? অথচ আমি বে লড়েছি তাতে
সন্দেহ নেই। এখনো উন্মাদনা আমার স্নায়ুতে
ঝমঝম করছে। আমার ক্ষমতাকে তো আমি
জাহির করেছি। বাহবার জন্যে আমি
দরাবরই প্রস্তুত ছিলাম। অক্ষরের ঝঞ্জনায়
দিগ্বিদিক বাজিয়েছি এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে
বাহবা শুনিয়েছি। আরও শুনিয়েছি। তবে ময়দান
আর জঙ্গল বড় প্রবঞ্চক। হাততালি একজনর,
না, লাথলাথের, ঠিক ধরা যায় না। আমার
বিজয়ী চোখ এখন আমি উপরে ঘুরিয়েছি।
সেখানে নাকি তারা থেকে তারায়
হার টাঙানো হয়।

একটি শব্দ ॥ দিনেশ দাস

গভীর রাতে সাইরেনের মত কার কণ্ঠস্বর :
“আমি সব ছোট করে দেব
মাটিকে পিষে ছায়া করে দেব
ছায়াকে করব হাজার গুণ ছায়া।”

শব্দটা আমার ঘরকে জোরে নাড়া দিল
আলোগুলো গেল নিভে
তারার মত মাটিতে আছড়ে পড়ল
বজ্রের মত শব্দ করে উঠছে
বারুদের মত জ্বলছে
আমার হৃদয়ের দরজা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

আওয়াজটা যেন পাগলের মত
নিজের ঘরেই আগুন দিচ্ছে
নিজের শরীরকেই যেন
টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলছে।

ফুলগুলি করে যাচ্ছে ॥

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

ফুলগুলি করে যাচ্ছে আলগোছে পাতার আড়ালে,
ফুলঝরাবার দৃশ্য আমি কতোকাল দেখিনি এমন।
কেনই বা ফোটে আর করে যায় এমন অকালে,
কেন মৃহুতের জন্যে মোহময় এট উন্মোচন।
বাইরে ভীষণ এক কুয়াশার চিহ্ন চতুর্দিকে,
এখন হয়তো কোনো যাদুকরী নিজের কুহকে
অন্ধকার নিয়ে আসবে, নিমেষে সমস্ত রঙ ফিকে,
পাতা ঝরবার ঋতু সিন্ধু হবে আঘোজিত শোকে।
ফুলগুলি করে যাচ্ছে আলগোছে পাতার আড়ালে,
মাটিতে তাকালে বেশ ভয় হয় এতো ঝরাফুল
কী করে তুলবে তুমি ওই ছোট ফুলের সাজিতে,
মনোজ্ঞ ভঙ্গীতে এসে যদিও বা সান্নিধ্যে দাঁড়ালে।
বস্তুত সমস্ত ক্ষণ ফুল ফোটে করে অন্তরালে,
বাসনার ফুলগুলো ফোটে আর টুপটাপ করে;
চুম্বনের চারুচিহ্ন যখন বিস্ময় হয়ে জ্বলে,
বুকে শূন্যে ঘুমোবার ঋতু করে ক্ষুধা পরিসরে।
ফুলগুলি করে যাচ্ছে, ভীষণ অস্থির কিছ, বুকে
অবিরল করে যাচ্ছে, অতোটুকু ফুলের সাজিতে
কতোই বা তোলা যায় বুক করে অনন্ত অসুখে।

ট্রামে বিচিটেতে ॥ হরপ্রসাদ মিত্র

ইচ্ছেকে বলি—উঠো না, হেঁটো না চূপ চূপ।
আশার বাসায় ডিম ফোটাতে না প্রাণপাখি।
ছন্দে দোলার মন্ত্র শিখিছে কান-দুটো,
গদ্যে সুযোগ নেই, তাই গানে ওস্তাদি।

ট্রামে যেতে-যেতে যেমন ভেতরে খুব ভিড়ে
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শব্দ দৃপ্তপাশের পাখিকদের
হাজার হাজার পায়জামা-খুঁতি-শাড়ির ঘের
দেখছে সবাই, কারো মূখ দেখা অসম্ভব—
তেরনি আমরা সময়ের রেল

শ্যামবাজার—

খুঁজতে-খুঁজতে
ধাক্কায় নামি চিংপরে।

বিচিটে, ও ভাই বিচিটে যে এলো কালীতলায়,
নেমো না, নেমো না জগদম্বা তো সব জানেন।
মাঝে মাঝে তিনি তোমাকে আমাকে সকলকেই
কাছে টানবার জন্যেই শূন্য দূরে ঠেলেন।

ইচ্ছেকে বলি, উঠো না, হেঁটো না, —সব বৃষ্টি।
কার রুমালে যে এ পোড়া দেহের ঘাম মুছি!

মহামায়ার খেলা ॥ হরেন্দ্রনাথ সিংহ

বিদ্যা ও অবিদ্যা মায়ী রহস্য জীবনে—
প্রণয়ে পিরীতি প্রেমে পূজার খেলায়
নিভুতে নিকটে আসে কুপায় কায়ার;
প্রেয়সী প্রেয়সীর পা ছলে যে সরমে।
হেরেছি আনত আঁখি অতৃপ্ত নয়নে,
দুর্দিনের খেলা ঘরে বেসাতি-মেলায়,
এঁরা প্রেমে আঁখি ঠারে ডাকে, কাছে আয়;
দেহের বন্ধনে রব মিলনে শয়নে।

দোটোনায় ভেসে চলি আসক্তির স্রোতে,
মনে মনে জানি এ তো শব্দ ‘অভিনয়’।
মহামায়া রঙ্গ করে আলোয়া আলোতে,
প্রণয়ের পরীক্ষায় জাগায় বিস্ময়।

ক্ষণেক মিলনে কত মৃদু আঁখি দহে,
আরাধ্যা মানসী তুমি অনন্ত প্রণয়ে।

মহত সফরী ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

না-দেখা তারাকে খোঁজা ॥

কামাকীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

থাকি ঘুমে থাকি ঘুমে মহত ভূমিতে ঘুমে প্রাত্যহিকে ঘুমে
কমঠ দুপরে দিশ্ব স্বপ্নঘোরে রাস্তা ব্যস্ত স্বপ্নই জারক
কথার কাঁথায় নকশানামাবলী-মুড়ি রক্তে তন্দ্রার আরক :
চমকে জাগি দিন যেই মুখ ঢাকে পশ্চিমের পীতাক গোধুমে।
থাকি ঘুমে। ভাঙে ঘুম গ্রাবে মাঝে আনে ছেদ বিরলমৌসুমে
কুচিং শব্দ বা গান নৈশক্যা কখনও চোখ ঈষৎ স্মারক
কোনো ফুল পাখির উড়াল মগ্নচেতনোর চকিত ধারক
থাকি ঘুমে। স্থির জলে ঢিল পড়ে ফাটে ঘুম বদ-বদ-কুম-কুমে।

আর অমনি ভাঙে স্বার। পায়ে পিবে মুছাহত ইন্দ্রিয়গ্রহরী
বদ্বিধর অগল টুকরো অনগল জলমাটিআকাশউল্লাস
উদ্ভাস বন্যায় বন্য ফুলপাখিশব্দস্বপ্নবিষ্মেকারিত বোধি :
আমার ভিতরে আমি জেগে উঠি, দেশকাল-ইতিহাস-নদী
আমাকে ভাসায় ভেলা কপালে লাগায় কণি কণেক নিবাস।

তারপর থাকি ঘুমে, ফের সেই স্বপ্ন স্বপ্ন মহত সফরী।

না-দেখা তারাকে খোঁজা। এই তার সবচেয়ে দান
মনের ধূসর ক্ষেতে একটি প্রমাণ
নাম, নাম, শব্দ এক নাম।

নাম তো হারিয়ে যায়
আশ্বিনের ধান-শীষে ফাল্গুনের সবুজ পাতায়।
নাম ওড়ে আকাশে-আকাশে
তমিপ্রাঙ্গ জীবনের তাঁর-ছোঁয়া গুচ্ছ-গুচ্ছ কাশে।
সে-আকাশে পেঁছবার চাবি
দেবে তুমি?
দেবে তুমি একটি ভরাট ক্ষেত জল হলছল
স্ফটিক চোখের দীপ্ত স্বপ্ন-রোদ্রোজ্জ্বল?

বন্দী, জেগে আছে ?

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

চরাচরে অন্ধকার, নিঃশব্দ নিশীথে ডাক ওঠে :

বন্দী, জেগে আছে?

বন্দী কি ঘুমোয়? নাকি জাগরণই তার বন্দীশালা

মাথার ভিতরে জ্বালা যাবজ্জীবন পল অনপল

পদক্ষেপে শিকলের শব্দ—তার নিঃসঙ্গতা অন্ধকূটার

ভিতরে স্বপ্নের মতো রোদ এসে

জানায় অস্তিত্ব, এ কি নির্ভরতা—যে রয়েছে চিরকাল

জেগে, তাকে প্রদ

বন্দী জেগে আছে!

যে রয়েছে চিরকাল জেগে তার হিঙ্গ্র কঠিন মুখ

গরাদের ফাঁকে চেয়ে থাকে, তারও কপালের নিচে

প্রশ্নের জ্বলন্ত দুই শর;

সমূহ প্রকৃতি থেকে যে-রয়েছে দূরে তার আঁধারে কলসানো চোখ

প্রেমের নিহৃত শিল্পে, পণ্যে, শিপাসায়, লোভে

অত্যন্ত ঘুমন্ত সব মানুষের খেলাঘরে

প্রতিপ্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়।

স্বাধীন? স্বাধীন?

উনিশ ঘণ্টার ঝুলনকে—মা ॥

নবনীতা সেন

তোমার প্রথম রাতি ঝুলনপূর্ণিমা হরে এলো।

কেমন নিঃশব্দ ছিল জননীর অন্তরমহলে

ইঠাৎ কী ভেবে ছুটে চলে এলি বিস্মৃত ভুবনে

এখন কী করে তোকে আগের মতন ভুলে রাখি

সর্বত্র আড়াল দিয়ে অমোঘ, দুর্ভেদ্য বাহতলে!

সহসা পড়েছো এসে অস্বহীন, নগ্ন রণাঙ্গনে

এখানে সশস্ত্র, ধৃত সৈন্যেরা ছুটেছে এলোমেলো

এবারে সম্মুখবৃন্দ দীক্ষা নিতে হবে তোমাকেই।

ঝুলনপূর্ণিমা রাতে একবিপ্লব জ্যোৎস্নানোক নেট—

কার মণিবশে তুই বোঁধে দিবি তোর শাদা রাশী?

সামুদ্রিক ॥ অরবিন্দ গুহ

সমুদ্রের সঙ্গে মতোমুখি দেখা হবে,

সমুদ্র তো খুব দূরে নয়।

দুঃখ পেলে তোমার দুঃখের পল্লবে

জলবিন্দু দেখে মনে হয়

সমুদ্রের সঙ্গে দেখা হলে ভালো হত।

যে কোনো মহতের স্বেতে পারি।

অনেকের কাছে আমি সমুদ্রের কত

স্মৃতিচিহ্ন দেখি—রকমারি

বাঁলি, নানা পাথর, বিন্দুক, টুকিটাকি।

সমুদ্রপ্লান না করে কেউ

ঘরে ফেরে? আমি একলা বাকি, একলা বাকি—

সমুদ্রের বড়ো-বড়ো ঢেউ

আমারও নাগাল পাবে, তাড়াতাড়ি যাব।

সমুদ্র তো খুব কাছাকাছি।

যাবার আগে তো কিছু সাজাব-গোছাব,

সংসারী মানুষ, ঠিক আছি।

খুব বৃষ্টি হলে কলকাতার রাস্তাঘাট

ভুবে যায়, লোকমুখে শুনিনি :

কলকাতা সমুদ্র হল। তোমার কপাট

বন্ধ থাকে। আমি দিন গুনি।

সমুদ্র যেখানে ছিল, সেখানেই আছে,

এ আর এমন কী বিস্ময়।

তোমার গলার ব্যঙ্গ শুনিনি, আস্তে, কাছে :

সমুদ্র তো খুব দূরে নয়।

বেহেতু পশুপতির নাম কবিতা ॥

রাম বসু

বালুতে স্বপ্ন চরণ চিহ্ন
গোলাপের আঁচা কতের মূখ
নিহত বৃক্ষে অন্তরীক্ষে
চেতনা আমার নির্বাসন।

খোলা দরজায় করাঘাত কেন?
হে নিম্নদ কাল ভিতরে এসো
করডল-খুঁত আমলকি দ্যাখো
ক্রান্তি রেখায় অনাবৃত।

পৃথিবীশব্দ জলস্তম্ভ
বাড়বানলের আলোর কণা
দীপিত চৌটে নিয়েছি ছিনিয়ে
আমি যে প্রেমিক হে প্রহেলিকা।

জানিনাকো কিছুর আছে কি নেই
আছি আমি আছি নির্বাসনেও
আছে আদি কাদা কুমোরের ঢাকা
অপরিস্রবের ললিত তাপ।

জাড়া মৃত্যু: নৈখতবাসী
প্রবল, তোমার সলীল তাল
তুঙ্গ শিখরে: হে প্রহেলিকা
নির্বাসনেও স্পর্ধা তাই।

অন্ধকার ॥ উমা দেবী

পরম প্রশান্তি অন্ধকার,
অন্ধকার অনন্ত বিস্মৃতি।
চন্দ্র-সূর্য-জ্যোতিষ্কেরা বৃন্দবৃন্দের মতো
অন্ধকার সমুদ্রে বিলীন।
আমারও তুলনা এক অন্ধকার।

অন্ধকারে শরীর ডুবিয়ে
ভেসে উঠি স্ফীতকার-ক্রমণ বিস্তার—
পৃথিবী আকাশ আর অন্তরীক্ষ নিঃসীম গভীর,
এমন কি বৃদ্ধকা বা রিরংসাগে সম্পূর্ণ বিলীন।
স্বাসরোধকারী এক নিরেট সৌরভ
যেন রূপ পেতে চায়—
আর তাঁর বাসনার তাপে
ফেটে গিয়ে, ফেটে গিয়ে,
অন্ধকার হয়ে যেন আকাশে ছড়ায়।

পরম প্রশান্তি অন্ধকার
পরম প্রশান্তি অন্ধকার
পরম প্রশান্তি অন্ধকার
রূপহীন কবন্ধ-আকার!

ভোরের সোনার থালা ॥

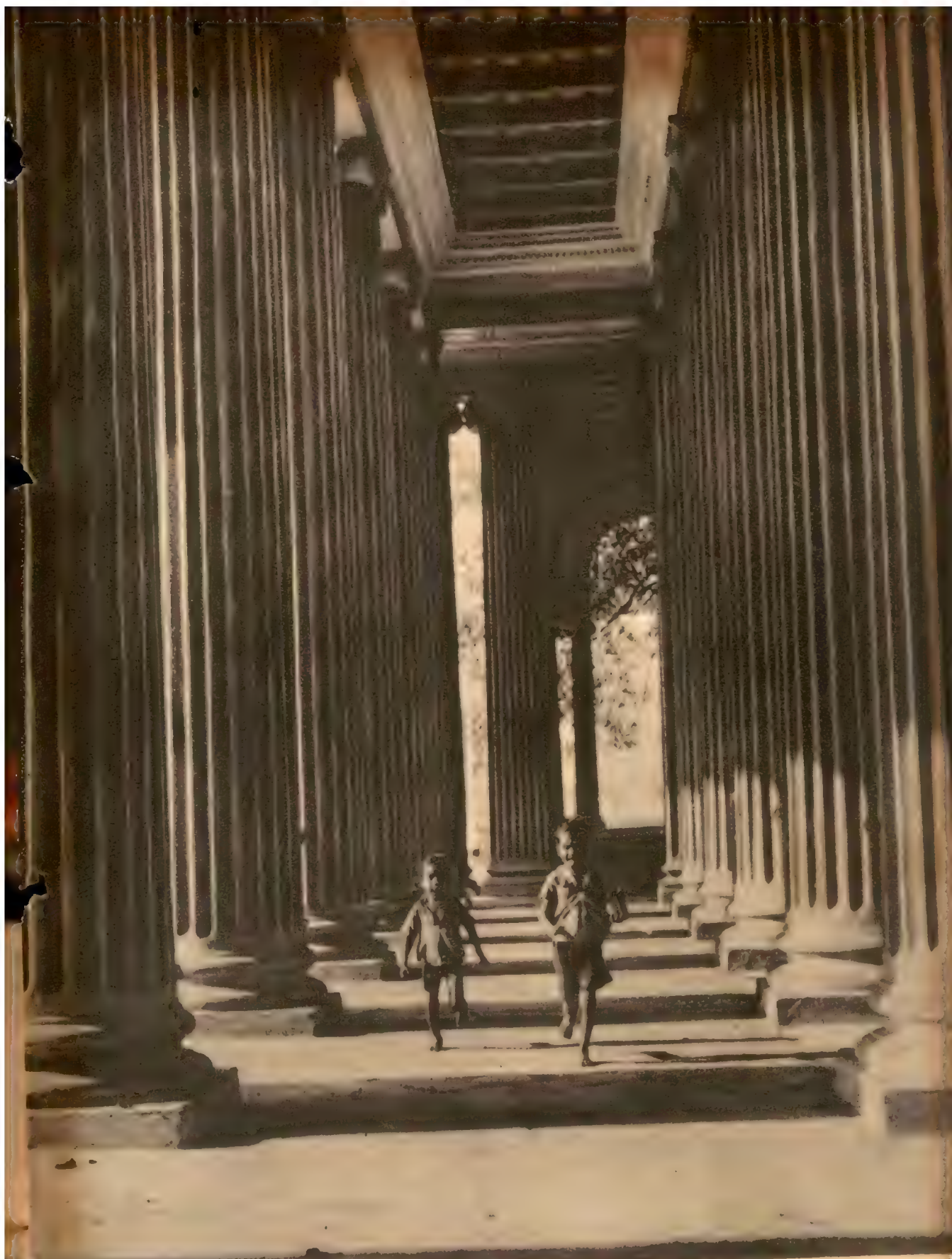
মৃণাল রায়

ভোরের সোনার থালা ভিজে গেল
বিকেলের বিষম বৃষ্টিতে।
কাঁধে শ্রেণ বনরাজি স্নানে আত্মহারা,
চারিদিকে ওড়ে পাখি আনন্দিত পাখা,
মানের নিভাজ সবুজে হাওয়া
কেন মেঘশিশু খেলাঙ্কলে গড়িয়ে গড়িয়ে গিয়ে আকাশে হারায়।
লাভাঝোপে গুটিকয় মেঘলা রঙের ব্যাং
বর্ষাটকে মর্নুত করে আকুল আবেগে।

হায় এ আনন্দ আমার তো নয়!
জল সমাধিত বৃক্ষ নই আমি,
যেবন গেলেও ভাসব না চোখের জলে,
হৃদয়ে ধরে এক ডালে অন্য ডালে ফুল
ফোটার বিবিধ রঙে। আমার আনন্দ
সম্মত স্থলিত নভোচ্যুত নক্ষত্র সমান,
সোনার সোনার থালা ভেসে যায় বিষম বৃষ্টিতে।
আমি রোজ ঘটিবাটি প্রবজন সমাধি নিয়ে
প্রেমের আধারে বসে কাঁদি।।

শ্রমণ ॥ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

তবে আমার এখন থেকে জেগে-থাকার আমৃত্যু-ভূমিকা—
নিসর্গের যেমন জাগরণ
সন্তাপের ভিতরে জ্বলে প্রাণণী মেলার ধারায় ভিজে
মাঘের তুষারতুষানলে জ্বলে-ভিজে
যাত্রাকাল, সারা জীবন:
যেন একাই অনেক হয়ে যোজন-যোজন চলতে থাকা,
আকাঙ্ক্ষা যেই বিভক্ত হয় অম্নি ভীষণ অনাসক্ত,
পাংশু মোমের মিঁছল থেকে অতর্কিতে শিখাসংঘ
প্রতিষ্ঠিত আকাশ বোপে;
বৃক্ষ-রিক্ত ভিখারীদের জড়ো-করা শূকনো পাতায়
হিরণ্যহোম:
ভিখারীদের মধ্য থেকে ফেরা যেমন বাতুলতা,
ফিরিয়ে নিতে এল আমার প্রিয়জনতা, তবুও আমি
কী-নির্বোধ, জন্মাবো না জন্মাবো না বলতে-বলতে
মাত্রা ভুলে আলোর কেন্দ্রে টলতে থাকি,
যেন একবার আলো জ্বালালে আলোর দলে নাম লেখালে
কিছুতে আর ফেরা যায় না—বলে আমার বোনের হাতে
ফিরিয়ে দিই হলুদে পাখি।।



শূন্যতার প্রাণ ॥

সুকুমার রায়



ଉତ୍କଳର ଶକ୍ତି
ଫଟୋ ଗ୍ରାହକ

অসাধ্য চেউয়ের মধ্যে ॥

জগন্নাথ চক্রবর্তী

অসাধ্য চেউয়ের মধ্যে অনগল
দুখে-আলতা দুখে-আলতা আহা!
মুখ জল আকাশে সিঁদুর
বিস্ফারিত, সমস্ত সংসার
পারায় মাখানো কাচ। কার মুখ?
শব্দ-চুপ কার কথাকলি
মুখের হৃদের মধ্যে আধো-ডোবা
দুখে-আলতা দুখে-আলতা আহা!

এখন গবাক্ষ ভিজ়ে,
অন্ধকার; দুইহাতে খরস্রোত ঢাকা,
কণ্ঠের ছত্রাকগুলি ভুঁইচাঁপা।
হাস্য মুখ!
অসাধ্য চেউয়ের মধ্যে শব্দ অবনত।
‘কথা কও’—ঠোট থেকে ক্রমাগত
ব্যজনার রং ধূয়ে ধূয়ে
দুখে-আলতা দুখে-আলতা আহা!

প্রথম যেদিন থিয়েটার দেখতে ॥

শান্তিকুমার ঘোষ

প্রথম যেদিন থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলে
কী সুন্দর লাগছিলো তোমাকে
হাত-পাখার বাতাসে চুলগুলো উড়েছে স্বপ্নের মধ্যে
অপেরা-কাচের ভেতর দিয়ে যুবকরা দৃষ্টি ছুঁড়ে
দিলো তোমার দিকে
গর্বে তোমার আঙুলগুলো চেপে ধরলাম আমার হৃৎপিণ্ডে
ভাবলাম এ নাটক মিলনান্ত না হয়ে পারে না
পালাশেবে সুখী দর্শকরা হাই তুলতে তুলতে
ফিরে যাবে যে বার ঘরে

আজ খোলা আকাশের নীচে নাট্যশালা
ভূমি পা রেখেছ দুর্গপ্রাকারের মতো পাহাড়ের ধারে
কুরাশার নদী হচ্ছে উপত্যকার ফুল
কোড়া হাওয়ার চাবুক-হানা চুড়ার তুষার
প্রেরণায় উঠে যায় যাত্রী অভিযাত্রী দল

শব্দ ছড়িয়ে...

ভিতর-বাড়ি ॥ মৃণাল দত্ত

একটা ভিতর-বাড়ি ছিল সেইখানে কার শরীর ছুঁয়ে
বাঁচতে গিয়ে উল্লাস ফিরে আসি আবার—শূন্যতা
তুলতে গিয়ে বাহির-বাড়ির লোকালয়ে হারাতে যাই, ফিরে আসি,
সেইখানেও শূন্যতা।

ঘরে স্বজনবন্ধু নেই, বাইরে দেখার দৃশ্য নেই—

রক্তে কারো আত্মীয়তা
স্পর্শ করে জ্বলতে গিয়ে আলগোড়
সুখ কিম্বা সুখের পদী, ছোঁয়ার জন্যে হাত বাড়াই
ভিতর-বাড়ির নিখর বোবা মৃণতা।

টিকিট ॥ তরুণ সান্যাল

দশ পয়সায় খাঁজে খাঁজে ঘুরে যাচ্ছে যন্ত্রের হুইল
শব্দ করে ছাপ পড়ে
দৌড়ে নামছে আমার টিকিট
ধোঁয় জাফরির তারে হলুদ রোম্ভের চিলতে
হঠাৎ ছোঁচিল

জন্ম না মৃত্যু না, নয়
উল্লাস হৃৎকার ছুরি উপদ্রব চুরি রাহাজানি
কতটা ওজন কিলোগ্রাম, সঙ্গে বাণী
‘সাবধান বন্ধুদের’, আর
ফাউ ছবি সিনেমা তারার

য়েন থেকে নেমে কলকাতায় মাঝে মাঝে
ওজন জানতে চওলা, এই
রোমক্‌পে কতখানি গ্রামের, নদীর গন্ধ
কতখানি বৃকের মধ্যের নীলাকাশ
কত জোর টেলিগ্রাফ তারের শব্দ শব্দ হাওয়া, এই

টিকিট ঘুরের মধ্যে দৌড়ে আসে কোনেদিন, দেখি
—বিশাল যন্ত্রের দাঁতে ফাই হুইল আমার করেটি
চতুর্দিকে লাল নীল সবুজ আলোর দপদপ
এই যে টিকিট, ঝপ
নিচে নেমে আসছে হলদে লালে ছাপা
খিল খিল ঘোবন
সেই উল্বেগ, সানাই

এ টিকিট হাতে নিয়ে বন্ধুদের দেখা যায় না
এ টিকিট হাতে নিয়ে ঘুরে আসা যায় ভবিষ্যৎ
অসীম কালের বাতারাতে
শব্দগুলি ধূয়ে ধূয়ে
রেশনের চাল থেকে সবলে কাকর বাহি হাতে

শব্দ ফাটা ভাঙা শব্দগুলি
পেছনে ছড়িয়ে যায়
চীনাবাদামের খোলা
ট্রেনের রাস্তায়
অন্ধকার খোলা বৃক হা হা করে
তারার প্রান্তরে

কার হাতে দিয়ে যাবো
কোন নোটবকে কি তারিখে
এই সব রেখে যাবো লিখে
মুহুর্তের স্নান সাধ্য সাধ্য
আনন্দ আমার
এই বিবাদ আমার
এই আনন্দ বিবাদ ॥

বাড়ি-বদল ॥ শরি চট্টোপাধ্যায়

বাড়ি-বদল করতে আমার ভীষণ ভয়

চিরকালের চেনাজানা এঁদো পচা গিলি হারিয়ে,
অনেকের কাছে তো রাজপথ ভারি আদরের

অ্যাসফল্ট-রোড, পাম অ্যাভিনিউ—

দুপাশে নীল নতুন আলোর
ভুলোর মতন হাওয়ায় সঁতার।

অনেকের মতন আমার এ-সবে সায় নেই,

আমার খাঁচা গরিবমানার আপাদমস্তক টোকা—

ছেঁড়াখোঁড়া পেন্টুল পরনে,

লোকটাও সার্বক,

বুটে-হাতে খালি-পায়ে এল্টে-পর্বন্ত কাপড় কাঁকা

বর্ষার ময়দান পার হয়ে বাই...

তোমরা যাকে বলে : ওরিজিন্যাল—

নাঃ, তেমনও আমি নই।

স্বভাব ঢেকে পেটকাপড়ে পরের বাড়ি থেকে

ধার আমি আনতে পারি না,

ছ'কো-বরদার বলতেও আমি

রেশনকার্ডের কত্তা, তাও আমি

নামের ডগার বাতিল খ্রী-টুকু লাগাতে পিছপাও নই।

যাক, যা বলছিলুম—বাড়ির কথা,

সেই আমি হঠাৎ বাড়ি বদল করে বসেছি।

ভেতরে-ভেতরে ইচ্ছে—এই নতুন-পাওয়া বাড়িতে

আত্মহত্যার কাউটা

সেরেই নোবো;

এখানে নেই পুরোনোর অনুন্নয়-বিনয়, পিছটান,

দেখে-সাবার জন্যে দুদিন সবুজ করা।

সুতরাং, অব্যাহত মৃত্যু এখানে আমার রোখে কে?

বন্দনা ॥ শংকর দে

যে তুমি নিঃশ্বাস থেকে মিলিয়ে রয়েছো, বন্ধ তার

প্রাণীপের মতো উজ্জয়িনী, শুধু জানে

সেহেরই অন্তরে মৃগ-বন্ধ যে কস্করী তারই প্রাণে

কেন মূক অন্ধর প্রকৃতি—

নে-তুমি দু'হাতে হাত জেবলে ধরো

যে তুমি আঁধার থেকে দেখাও আমাকে কলমূলে

যে তুমি পথের থেকে অন্যপথে নিয়ে যাবে বলে

এসেছো যেখানে নেমে, জলে অর্থা ভরে দুই হাতে

যে তুমি অলক্ষ্য থেকে আমাকেই করো ধর্মচ্যুত

তুমি ধর্ম-স্বাধিকার, তুমি চির জ্যোতিষের ভিতরে অগ্রদূত

প্রতি অস্ত-কৃষ্ণ-সখী, তোমাকেই বন্দনা করোঁ।

এক যুগ পর এক বন্ধকে ॥

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

বন্ধু-বর, এই তবে পতাকাবিহীন বালা, এই যে বালা-কা
এরই নিচে জল, নীলকুঠি, দূর শহরতলীর কঙ্কাল
নিশ্চিত রয়েছে, যদি মূখের গড়নও যায় চুরি—
কতি নেই, দেখো আছে, সেই করতল!

অথবা সে সবও নেই, ভিজা দিন, চিহ্নহীন ভিটা...

নিঃসঙ্গ সাইকেল ঘোরে মফঃস্বলে রক্তিম ধূলায়

থামার বাড়ির গোল শরীর এখনো

উঠেছে উদাস খেন তিন গায়ে, দূর নিউটাউনে

বাঁশের সাঁকোর সে কি অনায়াস পারাপার

সেই থেয়া, হাত ধরাধরি-করা অনন্ত কোমল...

এসব কিছুই আর আপাতত আমাদের নয়,

এ যে জাহাজ আর জাহাজের পাটাতন—সেও আমাদের নয়,

আমাদের নয় ঐ মনুমেন্ট, চিড়িয়াখানার আলিপুর,

হাওডায় সার্কাস, কিংবা কফি হাউসের জন্য সমগ্র জীবন,

কলেজ স্ট্রীটের এই দশতলা সেনেট বিল্ডিং,

সেও আমাদের নয় আজ!

হাঃ হাঃ কিছুই নয় আমাদের, তবু আমরা এতোকাল পরে

পরস্পর পেয়েছি সাক্ষাৎ—ওহে কবিবর, এতোকাল পর

যথার্থই আমাদের কিছুবা মিলেছে।

ঘোড়সওয়ার ছুটে গেলে ॥

শান্তনু দাস

চতুর্দিক অন্ধকারে মালভূমি কে'পে কে'পে ওঠে

কারা খেন সমস্বরে বলে ওঠে—সামাল...সামাল...

ঘোড়সওয়ার ছুটে যায়, লাল ধূলো শব্দ হয়ে ঝরে

বিমর্ষ প্রহরে

কে'পে উঠলে নোড়ো-সিংহাসন।

কে'পে ওঠলে নোড়ো-সিংহাসন।

অথর্ব অনড়ে শিরা, যতবার নড়বড়ে হাতে হাত রাখি

পাঁজরাগুলো শব্দ করে ওঠে, মনে হয়

তামাম পৃথিবী জুড়ে অস্তগামী যবনিকা আলো

দিকচক্রবালে মিশে গেলে

অনন্ত অনাদিকাল প্রহরের কর গুলে গুলে

স্তব্ধ হ'ব :

শেষবার দেখে যেতে হবে—

ফুলগুলো একে একে ঝরে পড়ে গেলে

দ্রুমর আসে না,

রোদগুলো কালো হয়ে গেলে গেলে এলে

শিশির ফোটে না,

হাজার প্রেমিক যদি মাথা খুঁড়ে শিলা ভেঙে দেয়

বসন্ত নীরব হয়ে থাকে :

সব দেখে যেতে হবে বৃন্দ চোখে এই জন্মান্তরে

চতুর্দিক অন্ধকার, মালভূমি কে'পে কে'পে ওঠে,

ঘোড়সওয়ার দ্রুত ছুটে গেলে, অন্তরালে

কে'পে ওঠে নোড়ো-সিংহাসন।

ছোটনাগপুরের যাত্রী ॥

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

তাকে জানি, সে নয় দীক্ষিত কোনো দার্শনিক কিংবা বড় কবি—
ক্ষুধানিবৃত্তির দৃশ্যে কি করে বা উৎসের প্রতীক হবে নিজে!
সে তো অতি সাধারণ মানুষ, ঐ চূর্ণ জলপতনের চলচ্ছবি
দেশভ্রমণের মূল্যে তার কাছে দূর হ্রদের মত ভিজে।

তুমি কবিদার্শনিক এই ফোয়ারার থেকে অবদ্বৈতের দূরে
কক্ষের একা বসে থাক জ্যোৎস্নার আপন উজ্জ্বল বিস্তারণে,
তার কথা ধর্তব্যে এনে না, সে শব্দে ছুটির ট্রেনে
গরীব চাকার ঘুরে ঘুরে
এসেছে হঠাৎ এই পাথরফাটানো শব্দে মৃত্যুধারা মিশ্র সম্মোহনে।

হয়তো কোনো কবিতাই পড়ে না সে, অথবা সে দেখেনাক' বুদ্ধি
সাংকেতিক রোদ্রে আঁকা তুমুলবিপুল চিত্রে
ঢল-নামা জলের আঘাত,
সে অতি সামান্য লোক পূজার বোনাস তার
আহ্নাদের পোকা-কাটা পুঁজি
তাই ভেঙে এসেছে মন্তব্যহীন দেখে যেতে রাঁচীর প্রপাত।

নিজেকে নিয়ে ॥ আশিস সান্যাল

আমি কোন অন্ধকার বনের আড়াল দিয়ে ভেসে যাচ্ছি?
আমি কোন নিভৃত নিজনে
একাকী বিপন্ন আজ? যতোদূর উন্মিলিত দূর চোখে তাকাই
দেখি স্তম্ভ বনস্পতি। পুঁপুঁপিত কান্টার
ক্রমশঃ দূরের দিকে প্রসারিত।

এ কি প্রলম্ব প্রতিধ্বনি? সর্বস্ব হারানোর
আকাশ প্রেমিক বন্ধু, আজ আমি অভিযন্তা চলছি কোথায়?
কোন উত্তরণে? অনেক সূদূরে
নক্ষত্রপুঞ্জের থেকে এ কোন আহ্বান
উচ্চারিত। মন্দিরে মন্দিরে
বিদায় বেজার ধ্বনি পারাদিন আলোড়িত বিদায় বেলার।

বিদায় আকাশ বন্ধু, প্রথমে রৌদ্রের ধ্বনি বিদায় বিদায়।
নিজেকে নিঃশেষ করে কখনও বিজনে
ক্ষয়ে যাচ্ছি ক্রমাগত। কোনোদিন আর
ফিরবো না স্মিহাহীন। তোমাদের ভালোবেসে
জাগাবো না প্রতিহত শফেদ কান্টার।।

পতন ॥ পবিত্র মৃত্যুপাধ্যায়

হলদে পাতারা বাতাসে উড়ছে কিসের গান
হাতুড়ি ঠুকছে বৃকের পাথরে কালের কর্মকার
খোদাই করছে পতনের রাজপথ—

ভেঙে যায় সব স্বপ্ন ঘনালে অন্ধকার
ওই পথে বাজে কালপুরুষের অশ্বকুর
বৃকের মধ্যে ভূতের নাচন প্রাণান্ত
পতন বাজায় মাদল বাজায় মৃদঙ্গ

আহা এই কাল আকাল হিমেল বাতাস বয়
বৃকের খাঁচার গোন্ধের সাগর ছড়ায় বিষ
কশাই শানায় ছুরি

পতন জড়াক ড্রাগন যেনবা ভয়ংকর
মুখ থেকে পড়ে ছিটকে আগুন তরলবিষ
আমার চামড়া শোখীন জ্বতো মূল্যবান
হাড় গুঁড়ো হলে ধানের সার
পতন বাজায় মাদল ঘনায় অন্ধকার

সম্প্রতি আর ভিখারী সাজাও নিজের শব
মোমাবতি জ্বলো কফিনের চার পাশে
ফুলের বাগান মাতায় শ্মশান গম্ব
হাজার দিনের হাজার স্মরণিত কথা গোরবে জ্বলছে
বৃকের উপরে পতন গড়ায় স্টিমরোলার

একা রাজপথে হাটে হতাদের কবি।

কে তবে এখন ॥ গণেশ বসু

বৃকের ভিতরে কার ছায়া কাঁপে, কার
সমস্ত সৈকত জুড়ে আনাগোনা
দীর্ঘশ্বাস স্মৃতি করে, ভয়ানক তোলপাড়, চোখ
অশ্রুর গভীরে যেন, স্নান, ছেঁড়ে, হো-হো অন্ধকার
চারদিকে, সম্ভাবনাহীন
লালচে ভয়াল দাঁতে বিধ্বস্ত বন্দর।

আমিও কি নিরাশ্রয় অবশেষে?
বিগত দিনের সব প্রতিশ্রুতি, ভালোবাসা বেবাক লোপাট
লিফটের খাঁজে খাঁজে? কিশোরী বয়স
শব্দ করতলে বিভীষিকা, দাবদাহ, প্রবল ধিক্কার?

কে তবে এখন দেবে ভালোবাসা, রৌদ্রবাসভূমি?

সংস্কার ॥ সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

খুবই ভাল আরম্ভ করেছিলাম; আমি
ঈশ্বর, অনীশমঠ, তোমার প্রীতির জড়ো করে
বাজিয়েছিলাম কালবৈশাখীর ঘন্টা।
যেন বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি যেন শমীসবুজের নিবিড় সন্তাপে
একইসঙ্গে ভিজ়ে যায় মাটি ও মানুষ।

যেন কে কাকে সাজাবে শস্য, এই অনাদিকালীন
দোলাচলে সূর্য ও প্রশ্নবোধক, যে প্রশ্নে কখনো
চুষন থাকে নি বলে কবিতার মতো কোনো

সংসর্গ জাগে না, জাগে না বলেই এখনো প্রত্যহ
মানুষের সূত্রভাত প্রথম ঘোষণা করে

সামান্য পাখির মতো কাক,

কুলের সংসার বতো টারটার ফুটে উঠতে চার।

ভালবাসা, আমি খুব ভাল আরম্ভ করেছিলাম

কিন্তু জয়দেবের অতীত ঈশ্বর গোপনে এসে

শেষ পংক্তি নিজে লিখে দিয়ে বান নি বলেই,

জন্ম অসমাপ্ত আজো

অসমাপ্ত মৃত্যু: তারা প্রবাদের মতো লোভী

জনতাগতীর কোনো সংস্কার হয় নি।

প্রতিশ্রুতি, বৃকের মধ্যে ॥

চন্দ্র গুহঠাকুরতা

তোমার জন্যে অনেক কিছু নিয়ে আসবো কথা ছিল
মাগর থেকে রঙীন বিন্দুক শব্দ কিংবা মৃত্যু গেলে
কথা ছিল তোমার জন্যে নিয়ে আসবো ঘর করে
ফেরার পথে লাগায় তাড়া ব্যস্তবাগীশ প্রবল হাওয়া।

মথুরাতে ডাকছে স্মৃতি হিসেবপত্র গুছিয়ে নিতে
কার জন্যে কোনটা নেবো ভাবতে ভাবতে সকাল আসে
দরজা ঠেলে পূর্বের হাওয়া, চোঁচিয়ে বলে, স্মরণ আছে
এবার কিন্তু অনেক কিছু সঙ্গে নিয়ে ফিরতে হবে।

অনেক কথা রেখেছিলাম কাল রাতেও বৃকপকেটে
তোমার জন্যে বিন্দুকগুলো হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেল
মনে করতে চেষ্টা করি ঝাউবনে না সাগরতীরে
হঠাৎ কেন শূন্য বুলি হয়ে উঠলো ভীষণ ভারী

গভীররাতের রেলগাড়িতে সঙ্গী হল প্রতিশ্রুতি
ফেরার পথে বৃকের মধ্যে বনঝনিরে বাজতে থাকে।

বারো বাজলেই ॥ মণীন্দ্র রায়

বারো বাজলেই সমস্ত দিক প্রতিধ্বনিত
শব্দে কাঁপে, রোদ্দুরের কেনার নিচে
ঘনায় ছায়া, সূর্য আকাশ-উপত্যকায়
চালুর সীমায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ তাকায় পিছে।

বারো বাজলেই বোরো ধানের কাদায়, কিম্বা
লেদ-মেশিনের ছাঁপপাকে, যেখানেই হোক,
মানুষ যেন গমকে দাঁড়ায়, পাশের মূখে
দেখতে পার সে চোখের মধ্যে আরেকটা চোখ।

বারো বাজলেই মাতাল জাগে। রাগিপীরা
আরনা পেতে ঢুল বাঁধে, টিপ দেয় কপালে।
ট্রাম চলে যায় দূরের বাকি সাপের মতো;
শুলোর নৈরে চড়ুই ফেরে রাতের ডালে।

তখন, জানো, আসো যদিও, বারো বাজলেই
এক নিমেষের অমাবস্যা তীরের মতো
হৃদপিণ্ডে যায় বিধে। আর অন্ধকারে
নিজের খোঁজই হাতড়ে বেড়াই ইতস্তত।

তখন দুপুর কাঁপে, এবং শিকের ফাঁকে
চিড়িরমানায় বাঘ ডাকে, আর জোয়ার জলে
বাঁড়ির মধ্যে ঢেউয়ের জিহবা, বারো বাজলেই
হঠাৎ শূন্য বৈঠা বৃকের অন্যতলে।

অপমানের মত লাগছে, কিন্তু উপায় নেই।

তবু এটুকু গাম্ভীর্ণ্য দরখাস্ত সে করে নি। দরখাস্ত ও পক্ষ করেছে।

না, সুরূপা প্রাণিনী নয়, কখনোই নয়। দেশ একটা গর্বের ভাব করে তাকাল সে ছবিটার দিকে। ভাবল লোকটা কী নিলাজ। একেবারে ছবি পর্যন্ত পাঠিয়েছে। সুরূপা ইচ্ছা করলে এক কথায় বাতিল করে দিতে পারে।

কিন্তু তার হয়ে কাগজে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল সেটা কি আবেদন নয়?

মোটাই নয়। শব্দ বলা হয়েছিল একটা চাকরি খালি আছে। যোগ্য ব্যক্তি আবেদন করতে পারো। বিজ্ঞাপন আবেদন নয়। এ নয় যে মিহিরের বিজ্ঞাপনে সুরূপা দরখাস্ত পাঠিয়েছে।

তবু, তবু, অপমানের জ্বালা যায় না গা থেকে।

বাউলী

অমিত্যুবহার

স্নেহপুত্র



তার ছায়া শব্দে দত্ত সেদিন ভালোবাসা নিয়ে করল। সুমন মালহোত্রা তো বাপ-মাকে না জানিয়ে পালিয়ে গেল প্রেমিকের সঙ্গে। আজকাল সমাজের মূল্যবোধ পড়ে গেছে। কোন মেয়ে আর পণ্যের মত পছন্দের বিষয় হতে চায়? কলেজের বাইরেও এ সব মূল্যবোধ নিয়ে কত সে বক্তৃতা দিয়েছে। কিন্তু তার নিজের জীবনে এতদিনেও একটি প্রেম এসে না।

কত পুরুষের সঙ্গেই তো জীবনের চলতি পথে দেখা হল কিন্তু কাউকেই দায় করানো দূরের কথা, ডাকবার মতও মনে হল না।

পথই বাড়তে লাগল। দিনই চলে যেতে লাগল।

শেষে সেদিন মণিবাবু বললেন, কাগজে বিজ্ঞাপন দিই।

সুরূপা তদপাতি করে নি। বিশ্বের পায় প্রেম হবে এ যেমন অনিশ্চিত, প্রেমের বিষয় টেকসই হবে এও তেমন অনিশ্চিত। শব্দ, চোখ বুজে অন্ধকারে রূপ দেওয়া।

সুরূপা বিজ্ঞাপনের ড্রাফটটা নিজেই দেখে দিয়েছিল। ভাষাটাকে দিয়েছিল একটা কঠোরতা করে।

ভেবেছিল কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া যাবে না।

অনেক দিন পর, শেষকালে, এই সবমানে এসে হাজির। এই একটাই।

মিহিরের ছবিটার দিকে তাকাল সুরূপা। কী রকম অভদ্র-অভদ্র মনে হল ভুললোককে। কী রকম হ্যাংলো, গায়ে-পড়া! কী দরকার ছিল এমনি হাত-পাতার।

আবার মনে হল একটাও যদি দরখাস্ত না পড়ত, কী রকম নিঃস্বের মত দরখাস্ত হয়তো নিজেই। তবু তো এ লোকটা তার কিছুটা মর্যাদা রেখেছে। তার বিবাহিত-বাতাকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

আর, হতই গায়ে-পড়া মনে হোক ছবিতে ভুললোককে ভালোই দেখাচ্ছে।

তবু একটা অচেনা পুরুষ তার স্মারক হবে জীবতেও গা-মিমাঁষায় উঠল। প্রেম করে নিয়ে করলে প্রথম কয়েকটা রাই তো অনন্তত স্মৃতিতে কাটাড়—কিন্তু এ তো

দস্যুতা। কে জানে প্রেমের বিরের মিলনের রাতে হয়তো আকাঙ্ক্ষার কম পড়ে গিয়ে মোহভঙ্গ হত — কে জানে অপরিচিত স্বামী'র সঙ্গেই প্রথম মিলনে বেশ নতুনত্ব কিনা।

লোকটা ছবিতে কী রকম পস্টারপিস্ট তাকিয়ে আছে দেখ না।

ছবিটা না পাঠলেই বোধহয় মিহিরকে সম্প্রান্ত লাগত।

কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে ওর বিশেষ সৌন্দর্য নেই। মিহিরের তরফ থেকে দরখাস্তের সূত্রে একটা অনুরোধ এসেছিল, যদি আবেদন গ্রাহ্যের মত হয়, যেন মেয়ের ফটো পাঠায়। কাগজে-কলমে আবেদন গ্রাহ্যের মত নিঃসন্দেহ, বিদেশী ফার্মে 'এগারো শ' টাকা মাইনের একজিকিউটিভ অফিসর — তাই মণিবাবু, সুরুপার ছবি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং বিনিময়ে চেয়েছিলেন মিহিরের ফটো।

সত্যিই তো এতে ভুল্লোকের দোষ কী। তবে কী রকম যেন অপরিচ্ছন্ন লাগছে সুরুপার। কী রকম যেন স্থূল, মাংসল। বিজ্ঞাপনের পর ভুল্লোক তার ঠিকানাঃ একটা গোপন পত্র পাঠাতে পারত না? সেই গোপন পত্র থেকেই হয়তো প্রেমের জন্ম হত। প্রেমের থেকেই আসত অবধারিত।

বিরের আগে প্রেম নেই—মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে সুরুপার। যেন পুজার আগে নন্দন নেই।

কিন্তু তাই বলে গোপন পত্র! সেটা কি সব হত, শালীন হত? তেমনভাবে ভাব করতে গেলে প্রশ্নায় কিছু কম পড়ত না?

না, এ ছাড়া উপায় নেই। আর কোনো কাজ-পুণি নেই। এটাই ভদ্রতম উপায়।

'কী বল, রাজি আছি লিখে দি।' মণিবাবু মেয়ের সম্মতি চাইলেন।

সে কী, সুরুপা ভড়পে উঠল : 'ভাল করে আরো একটু খোঁজ-খবর নেবে না?'

'তা তো নেব। নিয়োগছি। ওরাও নিচ্ছে।'

ওরাও নিচ্ছে! গা জ্বলে গেল সুরুপার।

জিজ্ঞেস করল, 'খোঁজ নিয়ে কী জানতে পারল শুনি?'

প্রেমের বিরোভেও পক্ষরা কতটুকু নিতে পার?'

'ওরা আর কী জানবে!' মণিবাবু হাসিত হলেন : 'ওরা তো তোর ছবি নিয়েই পছন্দ করেছে। তারপর জেনেছে তোর প্রফেশন—'

আবার রাগ হল সুরুপার। 'মাত্র ছবি নিয়েই পছন্দ? লোকটা কী রকম হাভাতে!'

দাদা, ছবি তো পাঠিয়েই ছিল পছন্দ করে জানো। যদি অখাদ্য বলে ফেরত দিত হলে সেটা বেশি সম্মানের হত কী? তবে একজন দেখল সুনজরে। এতে রাগ আর মানে হয় না।

কিন্তু এত বয়স পর্যন্ত ভুল্লোক বিরের নি কেন?' প্রশ্নটা করল বটে সুরুপা, কিন্তু নিজের কানেই বিসদৃশ ঠেকল।

'কাল পরিপক্ব না হলে কিছুই হবার নাই।'

সত্যি, আরো ভালো করে খোঁজ নাও।' 'জা নিচ্ছি।'

সুরুপার আশা ছিল একটা কিছু টুটি বা কলঙ্ক বেরিয়ে আসবে।

কিন্তু, আশ্চর্য, বা খবর পার তাই চিত্তাকর্ষক। তাই উৎসাহবাজক।

সবচেয়ে সুখবর শাশুড়ি নেই। শ্বশুর থাকলেও সে জন্মশেদপরে বড় ছেলের কাছে থাকে। মিহির থাকে একলা চৌরঙ্গি পাড়ার ফ্ল্যাট নিয়ে। আসরবাঙলা ফ্ল্যাট।

এ তো বাঙালীর প্রেমের বিরের পরিবেশ। সম্বন্ধের বিরো তো ডরান্ডরিত যৌথ সংসারেই ভালো ছিল। অটেল নির্জনতার একটা অচেনা পুরুষের সঙ্গে দিন কাটানো কী ক্রান্তিকর হবে না জানি।

কিন্তু এখন আর ঠেকাবে কী দিয়ে? ঠেকাবে বলেই কি বিজ্ঞাপন দিয়েছিল?

ছবি পাঠিয়েছিল? আর বিজ্ঞাপন তে স্বামী'রই জন্যে, প্রেমিকের জন্যে নয়।

'বিরের দিন ঠিক করে একেবারে চিঠি দিই।' মণিবাবু তত্ব কণ্ঠে বললেন, 'তুই কলেজ থেকে ছুটি নে।'

যদি প্রেমের বিরো হত তবে কে জানে বাবা-মাকে এত আনন্দিত দেখতে পেত কিনা। যদি বেলাইনে যেতে হত কে জানে ও'রা কী ভাবে নিভেন, আশীর্বাদ করতেন কিনা।

দূর! প্রেমের কাছে আবার বাবা-মা, বাড়ি-ঘর! সে সব দিন আর নেই। সে সব মূল্যবোধ কবে বিদায় নিয়েছে।

শ্বশুর উপায় নেই বলেই বাবা-মাকে খুঁশ করতে হল।

'কিছু দাবি-দাওয়া করে নি তো?'

'না কিছু না।'

এটাও তো প্রেমের বিরেরই ভূমিক। হবার মত। কিন্তু সম্বন্ধের বিরো এমন ফাঁকির সাহায্যে চায় সে কোন নিরামে।

'আমার সাধামত আমি মেয়েকে দেব বলেছি। ওরাও ওদের বউকে সাধামত সাজিয়ে নেবে।'

কী অত্যাচার। আবার সেই দিক ভাবতে সুরুপার ব্যস্ত হয়। সে একটা কলঙ্কের তথ্যাপিকা, একটা গল্পনা-শাড়ির পট্টলি হয়ে বিরের পিঁড়িতে কনে সেজে বসবে। ঘুরবে সাত পাক!

বিরোটা প্রেমের পথ হল কত সংক্ষেপে হত, শোভন হত, সম্ভ্রান্ত হত!

কিন্তু জীবনে পথ কি প্রশ্ন? না ভ্রান্তি প্রশ্ন? এও আবার নিজেকে জিজ্ঞেস করে সুরুপা।

বাই কলো, বিরের পর যখন দিল্লিতে ফিরে আসবে তখন নিশ্চয়ই কলিগ-রা, ছাত্রীরা জানতে চাইবে, এ বর জোটালে কী করে? উত্তরে বলবে, ও আমার প্রথম জীবনের মনোনীত। দীর্ঘ দিনের প্রতীক্ষার পরেই মিলন সম্ভব হল।

প্রেম থেকে পায় নি, খোলা বাজার থেকে কুড়িয়ে এনেছে। এ বলতে গেলে মান থাকবে না।

উপায় নেই, সুরুপাকে কলেজ থেকে ছুটি নিতে হই।

শুকা দেখার দিন ঠিক হল। তার দিন দিন পর বিরো।

যেদিন কনের দল কলকাতার রওনা হবে

তার একদিন আগে মিহিরের একটা চিঠি এল। লিখেছে সুরুপার দাদা বিভূতি'র কাছে।

একটা ছোট্ট খবর আপনাদের জানাতে চাই। আমি করেক বছর আগে বাথরুমে পা পিছলে পড়ে বাই। তার জন্যে ডান পায়ে ছোট্ট একটা অপারেশন করতে হয়। ফলে ডান পা-টা আমি একটু টেনে চলি। সেটা কিছু নয়, তার দরুণ চলতে বা ছুটেতে আমার কোনো অসুবিধে হয় না। তবে এটুকু খুঁত যখন আছে তখন আগেই জানিয়ে রাখা ভালো। কিছু গোপন করা ঠিক নয়। চিঠি নিয়ে বিভূতি মণিবাবু'র কাছে গেল।

মণিবাবু চিঠিটার কোনো মূল্যই দিলেন না। যদি একান্তই কিছু মূল্য থাকে সে হচ্ছে পাট সং। একটা উঁচু মাইনের একজিকিউটিভ অফিসরের পোয়েন্ট যখন আছে তখন এ টুটিটা অলোচনারই বিষয় নয়। সুরুপাকে জানিয়ে কাজ নেই।

এখন এতদূর এগিয়ে কলকাতা বাওয়া কষ্ট করা যায় না। সেখানে গিয়ে নিজেরাই তো দেখব স্বচক্ষে।

যখন টেনে ছাড়ো-ছাড়ো তখন বিভূতি সুরুপার কানে-কানে বললে, 'আমি তো যাচ্ছি না, মিহিরের ডান পা-টা তুই দেখিস একটু খোয়াল করে।'

সুরুপার হামার বাড়িতে এসে উঠলেন মণিবাবু।

পাথের দল পাকা দেখতে এল।

উপায় নেই। সেজে-গেজে ঘাড় নিচু করে বসতেই হল সুরুপাকে। যদিও তার আর এখন বাতিল হয়ে অপদস্থ হবার ভয় নেই তবে এমন একটা আনত ভঙ্গি অস্বস্তিকর। তবে ব্যাপারটার মধ্যে ব্যতিক্রম এই যে স্বয়ং মিহির এসেছে।

দৌধি সুরুপাকে। সুরুপাও দেখে। দিবা চোখ তুলে দেখল সুরুপা।

ছবিতো যা দেখেছে তার চেয়ে চতুর্দগ্ধ সুরুপার। বলশালী চেহারা। মুখে-চোখে দক্ষতার ছাপ। সপ্রতিভ সৃশালীন ভুল্লোক।

সুরুপার ইচ্ছে হল জিজ্ঞেস করতে, এমন একটা মামুলি সড়ক দিয়ে না এলে চলত না? জীবনে আরো তো অনেক গলি-ঘাঁজি ছিল, প্রেমের অলি-গলি। সে সব রাস্তায় বেড়তে বেরিয়ে দেখা হয়ে গেলে এমন কী দোধের হত?

সুরুপাকে দেখেও মৃদু হল মিহির। জানে সে গার্ল-গাইডের দলনেত্রী, সাইকেল চালাতে পারে, ঘোড়ায় চড়ে পারে—পারুক, কিন্তু বিরের সভায় না হলে এমন একটি লাবণ্যলেক্ষা হয়ে কখনোই দেখা দিতে পারত না। মনে হল পাত্রীর ব্যক্তিত্বে অনেক সব অদ্ভুত রূপ থাকে যা এমন একটা বৈবাহিক পরিবেশেই ধরা পড়ে।

সুরুপার তো সেইখানেই আপত্তি। এখন তাকে দেখে কে বলবে সে একটা এম-এ পাশ বিখ্যাত অধ্যাপিকা। মনে হচ্ছে যেন লবণের লতা। ধরম-ধরম কিছুই জানে না। তুলসী-খোলা গগণাজল। সম্বন্ধের বিরো বলেই এ গ্রাম্যতা তাকে মেনে নিতে হচ্ছে। সে অসুপার।

পারাপক শাড়ি-গরনা নিয়ে এসেছে।
সাজানো ট্রেগুনো দেখতে সুন্দর মনে
লাগল না। প্রেমের বিয়ে হলে সমস্ত শ্রুতি
হত। তবু বড়ো মেয়ের জন্যে অন্য এত
সব চটকদার সজ্জার উপহার তাকে সার
দিতে হচ্ছে এতে তার আপত্তি। সে কি
শাড়ির আলমারি, না গরনার সেক-ভল্ট?
অবশেষে একটা প্রালজুড়ানো প্রস্তাব
করল মিহির।

‘আসুন কাল গ্র্যান্ড আমবা মিট করি।
চারের টেবিলে একটু আলোপ-সালোপ হোক।
আমার অফিসের গাড়ি আছে, তাইতে নিয়ে
আসব, তবু শেপীয়ে দেব।’

বেশ আধুনিককালের সঙ্গে খাপ-
খায়ানো প্রস্তাব।

কথটা অবশ্য সরাসরি সুন্দরপাকে
হলো না। সেটা সত্যি বিধি নয়। বললে
সুন্দরপার মামাতো দাদা শরদিন্দুকে। আর
শরদিন্দুর স্ত্রী সুস্মিতাকে।

শরদিন্দু রাজি হল। রাজি করল
সুস্মিতা-সুন্দরপাকে। বরষেকরা মেনে
নিলেন, বন্ধলেন এটা নিপাতনে লিখ।

অফিসের গাড়ি নিয়ে বেরল মিহির।
সুন্দরপার তুলে নিল।

ড্রাইভার শিওলালের পাশে মিহির।
পিছনের সিটে শরদিন্দু, সুস্মিতা আর
সুন্দরপা।

গ্র্যান্ড পেপীয়ে গাড়ি থেকে নেমে যখন
মিহির ফুটপাথের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে
তখন সুন্দরপা লক্ষ্য করল মিহির ডান
পাটা একটু টেনে চলেছে।

চাকতে সুন্দরপার সমস্ত রক্ত মাথার
উঠে পড়ল।

কই কল তো কিছই লক্ষ্য করেনি।
দোতলায় উঠে এসেছিল, নেমে গেল সিঁড়ি
দিয়ে, বিসদল কিছই চোখে পড়েনি তো।
কেউ তো কিছই বললে না। আর, আশ্চর্য,
সুন্দরপার ভালো করে মনেই ছিল না
কথটা। কেন, ছিল না? অর্থাৎ নিচুমুখে
বসে থাকার জন্যে, না, কি লোকটার রূপে
আজ্ঞহইরোছিল বলে?

খাবার টেবিলে বসে সবাই দেখল
সুন্দরপা নিরেট কাঠ হয়ে রয়েছে।

‘কী হল ঠাকুরবাঁ?’ সুস্মিতা জিজ্ঞেস
করলে।

‘দারুন মাথা ধরেছে।’

‘চা-টা খাও, জেড়ে যাবে।’

‘না।’

‘কেন, আপনার কী হল?’ জিজ্ঞেস
করল মিহির।

সুন্দরপা উত্তর দিল না। দাঁতে-দাঁত
দিয়ে রইল।

‘আপনি কি অসুস্থ?’

‘অসুস্থ? আর আপনি?’ সুন্দরপা
আগুন হয়ে উঠল সুন্দরপা: ‘চিট!

সুইন্ডলার!’
মিহির হতবাক হয়ে গেল। বললে,
‘সে কী, আমি কী করলাম?’

‘আমি কী করলাম! খোঁড়া হয়ে বিয়ে
করতে চান, আবার বলেন কিনা আমি কী
করলাম!’

‘খোঁড়া? ও কিছ নয়। খুব খুঁটুরে

না দেখলে ও বোকা যায় না।’ মিহির
নয়ল মনে বললে, ‘ডান পাটার সামান্য
একটু জামেজ—’

‘বোকা যায় না!’ খোঁড়াকে বোকা না
গেলেও ল্যাংড়াকে ঠিক বোকা যায়। আপনি
ল্যাংড়া। ল্যাংড়াকে কে বিয়ে করবে?’ কটকা
মেরে উঠে পড়ল সুন্দরপা।

শরদিন্দু খ। সুস্মিতা মাটির সঙ্গে
মিলে যেতে পারলে বাঁচে।

‘আপনি দয়া করে বসুন। উত্তেজিত
হবেন না।’ মিহির হাসি-হাসি মুখে করল:
‘বিয়ের চান ভেঙে দেবেন, তাতে কী?
পাটিটা ভাঙবেন কেন?’

‘না, আমি বসব না। আমি বাড়ি যাব।
দাঁজ চলে যাবে।’

‘কিন্তু বাড়ি ফিরতে একটা গাড়ি
লাগবে তো?’

‘আমি ট্যাক্সি করে চলে যাব।’
সুন্দরপাই যদি চলে যায় তা হলে
খাকল কী!

সুন্দরপার পিছে-পিছে সবাই নেমে
এল।

নামামাই ট্যাক্সি মিলল না।
মিহির বললে, ‘চলুন আমার গাড়িতে
করেই আপনাদের পৌঁছিয়ে দিই। আমি
যখন নিয়ে এসেছিলাম আমারই কের দিয়ে
আসি উচিত।’

উপায় নেই। দিবা গাড়িতে গিয়ে
উঠল সুন্দরপা। গাড়ি তো খোঁড়া নয়।
পিছনের সিটে আবার অমনি তিনজন
বসল। ড্রাইভারের পাশে মিহির।

‘এ তোমার খুব অন্যায় হল।’
অসুস্থে বললে সুস্মিতা।

‘অন্যায় হল?’ স্বর নামিয়ে রাখতে
পারল না সুন্দরপা: ‘একটা জীবন নষ্ট করে
দেবার ষড়যন্ত্র করেছিল সেটা থেকে বাঁচতে
গাওয়া অন্যায়? কোটা বুলিয়ে দিয়ে খোঁড়া
পা চাক-হ—আমি বরষতে পারিনি? কী
দারুন প্রতারণা!’

মিহির বলতে পারত আমি তো গোপন
করিনি, আমি তো আগেই জানিয়েছি
আপনার দাদাকে। কিন্তু বললে কী হবে?
বিরোধি যখন ভেঙে গেল তখন আর তকের
মায়া বাড়িয়ে লাভ নেই।

মিহির ওদের ঠিকঠাক পৌঁছিয়ে দিয়ে
এল।

বাড়িতে ফিরে এসে ব্যাগ খুলে পাঁচটা
টাকা শিওলালকে বকশিস দিতে চাইল।
‘এই নাও। তোমার আজ অনেক পাটনি
গেছে।’

শিওলাল নিল না, ফিরিয়ে দিল।
কুণ্ঠিত মুখে বললে, ‘আপনি সাকসেসফুল
হতে পারলেন না—বকশিস নেব না।’

প্রত্যেক ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া আছে।
সুন্দরপার ঐ আচরণের পর তার সমস্ত
আত্মীয়-সংসার খিল্লারে কেটে পড়তে
চাইল। এমনি করে নিজের পারে নিজের
কুড়ল মারা দাঁখনি কখনো।

‘আমি একটা ল্যাংড়াকে বিয়ে করতে
পারব না।’

না করল। কিন্তু তাই বলে হোটেল
এমন ফেলেকারি করা কেন? সিন কম
কেন? ছি-ছি-ছি, কোনো কারণে যদি বিয়ে
করতে ইচ্ছে না হয়, সে তো শান্তভাবেই
ভদ্রভাবেই জানানো চলে। কত বিয়ে তো
বিরের পিঁড়িতে বসার পরও ভেঙে যায়।
এ কি একজন অধ্যাপিকার ব্যবহার?’

অন্যায় হয়ে গেছে—বরষতে পারছে
সুন্দরপা। অপরাধ স্বীকার করতে সে আর
কুণ্ঠিত নয়। হ্যাঁ, ওরকমভাবে না বললেও
চলত। গোড়াতে মাথাটা ধরে কেটেই এমন
কান্ড হল। পাটির শেষেও মোলারেম করে
বলা যেত। সুন্দরপাকেই বা বলতে হবে
কেন? পরদিন কাউকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে
তো হত পারের ঐ ডিক্লেয়ারেশন জেনো আমাদের
মন উঠে না। তাছাড়া আমাদেরই দোষ
হলোই খবরটা আগে পেয়েও পাকা দেখার
আগে বাচাই করতে চাইনি। না, প্রভারপার
লেশমাত্র নেই।

সুন্দরপার মধ্যে অনুতাপ জেগেছে। হ্যাঁ,
মাত্রাতিরিক্ত হয়ে গেছে। প্রচণ্ড হয়ে গেছে
আঘাত।

কিন্তু ভাগ্যের হাতে এ আঘাত নিখাল
হবে না। কোনো আঘাতই বৃষ্টি বর্ষ নয়।

এ আঘাতের থেকেই প্রেম জেগেছে।
এবার আর তবে বাধা কোথায়, জঙ্গল
কোথায়?

সুন্দর করে মিহিরকে একটা চিঠি
লিখল সুন্দরপা। চিঠি লিখতে পারল
সুগোল সুযোগ নিরীতিই জাঁটিয়ে দিয়েছে।
শান্তম্বরে প্রত্যাখ্যান করে দিয়ে এ চিঠি
লেখার দরকারই হত না। বরষের রক্ত
আঘাত দিয়েছিল বলেই তো এ চিঠি এত
সহজ হল।

‘মুহুর্তের তুলে আপনাকে আঘাত
দিয়ে ফেলেছি। আমাকে কমা করুন।
আমার জব্বা বড়ো জেনো আমি সত্যিই
অনুতাপ। অন্যায়বোধের ফলস্বরূপ আমার
দিন-রাত দুঃখ হয়ে উঠেছে। আপনি কমা
না করল আমার শাস্তি নেই। চিঠি
উত্তর পেলেই বন্ধব আমি আপনার কমা
পেরেছি।’

কমার থেকেই পেনে আসবে।
পেনেইর সুগো আকাশকা মিলিয়ে প্রেম।

মিহির ঠিক উত্তর দিল: ‘না, আমার
মনে কোনো প্লান নেই, কোন্ড নেই—তাই
কমার কথা অবাস্তব। জীবনে নম্র হওয়া
স্পষ্ট হওয়াই তো সুস্থতা। তাই আপনি
শুধু সজ্জায় সুন্দর নন স্বাস্থ্যে সুস্থ হোন।’

আবার চিঠি লিখল সুন্দরপা।
আবার উত্তর।

যেমনটি সুন্দরপার কমা ছিল।
থেকে মকুল, মকুল থেকে ফল আর কমা
থেকেই ফল।

ভাগ্যের কোনো আঘাতই হল না
কমার ভাসিয়ে নের বটে কিন্তু প্রকল
শস্য এনে দেয়।

তবে আর কী! প্রেমের জাগরণ হল
এবার খুঁজি হোক, অশুখই হোক, দুঃখ
হোক, দরিদ্রই হোক, তাকে বরষ

নিত হৃদয়ের আর বিদ্য নেই।

অভিলষিতের জন্যে সুদূরপা মাইলের পর মাইল হাঁটতে পারে।

হ্যাঁ, আপনাকেই বরমাল্য দেব। পারের ঐ ছোট্ট গ্রুটিটার জন্যে কিছু এসে বাবে না। বাইরে প্রকাশিত বলেই তার প্রতি বিরাগ কেন? ভিতরে কার কী গ্রুটি আছে তার কে খোঁজ রাখে?

তা ছাড়া যখন ভালবাসা জেগে গেছে তখন কোনো গ্রুটিই আর হিসেবের মধ্যে নেই।

বিরের পর যদি একসিঙ্গে পায়ে চোট লাগত তা হলে কী করতাম? ফেলে দিতাম, না, ছেড়ে চলে যেতাম? না, সেবা করতাম প্রাণ দিয়ে?

সত্যি আমাকে একবার সেবা করবার অনুমতি দিন। আপনি যে গয়না-শাড়ি দিয়ে আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন সে-সব যে আপনি ফিরিয়ে নেননি তাইতেই আপনার আকাঙ্ক্ষার স্বাক্ষরটি রয়ে গেছে। সত্যি, তাই নয়? আমাকে আপনি চান না?

উত্তরে লিখল মিহির :

নিশ্চয়ই, আপনিই আমার মনোনীতা। আমার প্রথম ও শেষ। আপনাকেই চেয়েছি, আপনার জন্যেই প্রতীক্ষা করে আছি। জীবনে নানা দুর্ভোগ আসে, তাতে দুর্ভোগের আড়ালেও যে মায়ামুখ নিত্য-জ্যোতি আছে তার অবসাদ নেই।

ভুললোক কেন সন্দের লিখতেও পারেন—সুদূরপার মনে হয়। এ আর কিছুই নয়, ভালোবাসাই লেখাচ্ছে। ভালো-বাসা জাগলে মুক ও বাচাল হয়, পাপাও গিরিলক্ষ্মণ করে।

তবে দিন স্থির করুন।

মিহির দিন ঠিক করে চিঠি লিখল।

আপনার অসুবিধে নেই তো?

হ্যাঁ, প্রেম হলে যেমনটি হত। কোনো কলুষ্টান নেই আড়ম্বর নেই। শুভ-বিবাহের মার্কা-মাত্র নিমন্ত্রণপত্র নেই। চাক-চোলা না গিড়িয়ে সস্ত্রান্ত স্তম্ভতার মাধ্যম শব্দ, সিঁদুর লাগিয়ে আসা।

কলকাতার বাচ্ছি বাবা। একটা বড় কাজের ইনটেরভিউতে ডাক এসেছে।

মণিবাবু, শব্দ, জিজ্ঞেস করলেন, 'কবে ফিরাবি?'

দিন সাতকের বেশি দেরি হবে না।

প্রেমের বেলায় যেমনটি হয়ে থাকে। একেবারে বিরক্ত করার পর বাড়িতে এসে বাবা-মাকে জানাবে। বাবা-মা বিস্মিত হবেন। আরো বিস্মিত হবেন যখন দেখবেন জামাই সেই মিহির চৌধুরী, তাঁদেরই সেই নির্বাচিত পাত্র।

একাই চলল সুদূরপা। রেকর্ডিস্ট অফিসে দ্রুত কোনো ব্যবস্থা করতে না পারে, কালীঘাটে বিয়ে সেরে নেবে। পরে সে বিরোধ রেকর্ডিস্ট করে নেওয়া হবে।

মিহির লিখেছে, এ নিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না, আমি সমস্ত ব্যবস্থা পুরো করে রাখব।

এবার সুদূরপা আমার বাড়িতে ওঠেন। বন্দু, তপতীর বাড়ি উঠেছে।

গ্র্যান্ডে আবার খাবার টেবিলে বসেছে দুজনে, সুদূরপা আর মিহির। তৃতীয় ব্যক্তি নেই—না, তপতীও নয়—তৃতীয় ব্যক্তি না থাকলেই তো প্রেমের পরিস্থিতি।

দুজনে অনেক কথা বলল, অনেক হাসল, খেল পেট ভরে। এখনকার এই পরিপ্রেক্ষিতেই তো জীবনকে বলা যায় উপভোগ্য, আরামগম্ভীর।

চলুন, আপনাকে আমার গাড়িতে আপনার বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে তগসি।

এক আসতে হবে বলে একটা ট্যাক্সি করে এনেছিল সুদূরপা, এখন ফেরবার সময় মিহিরের গাড়িটাই তো সমীচীন। তপতী যদি দেখে তো দেখবে, অর্থ করে তো করবে। উচ্চারিত প্রেমে আমার কুণ্ডা কিসের?

চলুন। মিষ্টি হেসে উঠে পড়ল সুদূরপা।

ফটপাত দিয়ে হেঁটে মিহির যখন গাড়ির দিকে যাচ্ছে তখন সুদূরপা লক্ষ্য করল মিহিরের বাঁ পা-টাও খোঁড়াচ্ছে।

গাড়িতে উঠে সুদূরপা বললে, 'আপনার বাঁ পায়ে চোট লাগল কবে?'

আজ আর ড্রাইভারের পাশে বসার মানে হয় না। সুদূরপার পাশেই বসল মিহির। বললে, 'আগে আমরা, যেদিন গ্র্যান্ডে এসেছিলাম সেইদিন।'

'সে কী, কী করে চোট লাগল?'

'বা, আপনিই তো সেদিন ছুঁতে মাজলেন।'

'আমি? ও মা! আমি কী মারলাম!'

'পাথর! সেই সব দুরন্ত গালাগাল।'

'ছি ছি, আপনি এখনো সেকথা ভুলতে পারেন নি?'

'না, না, আমি ভুলে গেছি। আমার কিছু মনে নেই। আপনিই ভুলতে পারেন নি।'

'কেন, আমি আর কিছু বলেছি?'

কিন্তু পরে বলবেন। অস্ত্রগুলো শানানোই আছে, পরে ছুঁড়বেন। দাম্পত্য জীবনে যখনই অসুবিধে বোধ করবেন তখনই ছুঁড়বেন। খোঁড়া! ল্যাংড়া! পুণ্ডু! আজও আপনি আমার বাঁ পায়ে খোঁড়াই দেবে। অমেক অহংকারে আপনার দৃষ্টিতে পুণ্ডুতা এসেছে—দুই পুণ্ডুর মিলন শাস্ত্রে লেখে না। সুতরাং, ভয় নেই, আপনাকে আপনার বন্দুর বাড়িতেই রেখে আসছি।

তপতীর বাড়ির দরজায় নামিয়ে দিল সুদূরপাকে।

তারপর নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে চলল মিহির।

পৌঁছিয়ে দিয়েই ড্রাইভার শিওলাল লম্বা হাত বাড়াল : 'আমার বকশিস!'

'বকশিস? ও, হ্যাঁ—' মিহির ব্যাগে হাত রাখল।

'ডবল বকশিস স্যর।' শিওলাল হাসল : 'আজ আপনাকে সাকসেসফুল।'



আমার কণ্টক আশাপূর্ণা দেবী

হ্যাঁ বিয়েটা সেই আদ্যাকালের মতো ঘটকের ঘটনো হলেও, মেয়ের সম্মতি নেওয়া হয়েছিল বৈ কি।

তা এরকম বিয়ের ক্ষেত্রে বোধহয় সেই আদ্যকালেও নেওয়া হতো মেয়ের মতামত। সরাসরি গুরুজনেরা জিগ্যাস না করলেও, লম্বাজনেদের মাধ্যমে সংগ্রহ করে ফেলা হতো ওটা। অতএব একালে তো হবেই। জিগ্যাস-বাদ না করে মেয়েকে দোজবরে বরের হাতে তুলে দেবার সাহস কোন মা-বাপের হবে?

সীতার মা-বাপেরও হয় নি সে সাহস, মেয়েকে তাঁরা জিগ্যাস করেছিলেন। এতে দুটো ভারের লাঘব হয়েছিল তাঁদের। এক হচ্ছে দায়িত্বের ভার, আর দুই হচ্ছে অপরাধ-বোধের ভার। সীতার মত মেয়েকে সসন্তান এক বিপন্নীর হাতে তুলে দিতে অপরাধ-বোধের বোঝা ভারী হয়ে ওঠে বৈ কি।

অথচ উপায় কি?

গরীবের বিস্তর জ্বালা!

সীতা সেটা বুঝতো, তাই সীতা একথা ভাবে নি, মা-বাবা আমাকে জলে ফেলে দিচ্ছেন।

সীতা এ বিয়ের সম্মতি দিয়েছিল। বর দ্বিতীয়শ্রমক এবং তাঁর একটা ছেলে আছে জেনেও দিয়েছিল। না দিয়ে কি করবে? সীতার মনের মধ্যেও যে সেই অপরাধবোধের ক্ষার। সীতা যে দেখতে সুখী, সীতার যে দ্বন্দ্বিতা ভাল, এবং সীতা যে বলতে গেলে সবক'মে পারদর্শিনী একথা সীতা কবে থেকে যেন ভুলেই গিয়েছিল, সীতার শব্দ মনে বিধেছিল তার বয়েস বেড়ে বেড়ে আটশে পেঁছেছে বিয়ে হচ্ছে না, আর সে দুটো-চারটে পাশটাস করতে পারে নি বলে এখনকার মেয়েদের মতো টাকা ঘরে এনে বাবার সুবাহা করতে পারছে না।

বাবা কেন পড়ায় নি, আর বাবা কেন বিয়ে দিতে পারে নি, এগুলো বাবার কতকা ছিল, এমন আধুনিক কথা ভাবতে শেখে নি সীতা, অথবা সে ভাবনা মনে এসে গেলে তাকে ভাড়াভাড়ি চাপা দিতে হয় এটা শিখিয়েছিল, তাই সীতাকে যখন জিগ্যাস করা হয়—সীতা বলে ঠিক আছে।

তাছাড়া এ জীবনেই বা সীতার আকর্ষণীয় কী আছে?

মা-বাপের সংসারটাকে নিপুণভাবে পরিচালনা করছে সে, ছোট ভাই-বোন-গুলোকে মায়ের বাড়ি স্বল্পে পরিচর্যা করছে, আর তার বিনিময়ে মা-বাপের কাছ থেকে কিছু প্রশংসা আর কিছু কৃতজ্ঞতা পাচ্ছে, এই তো? আর কি? আর কিছু না।

বরং পিতাপিতা ছোট ভাইটার আক্লেশ দৃষ্টির নীচে পড়ে আছে, কারণ দাঁদি বিরাজিত থাকতে নিজের বিয়ের বাসনা প্রকাশ করতে পারছে না সে।

অতএব সম্পূর্ণ একটি 'সেকেন্ড-হ্যান্ড' বয়েই বা ঠিক থাকবে না কেন, তবু তো একটা বর পাবে সীতা? যেটা নাকি বিধাতার বরের নিদর্শন। যে বরের আবার এই কলকাতার বাইরে মফস্বলে চাকরী, আর রেলের চাকরী বলে বদলীর চাকরী! তবে? নিত্য নিত্য বৈচিত্র্যের স্বাদ নেই তাতে?

সীতার দৃষ্টির অগোচরে কোন এক সময় কোন একটা মেয়ে, (বৈধ আইনের বলেই) লোকটাকে উচ্ছিন্ন করে রেখে গেছে, একথাটা ভেবে ভেবে মনে মনে ঝংঝড়িতরে লাভ নেই, লোকটার যে বয়েস এখনো চল্লিশ হয় নি, এটাই হচ্ছে সার কথা।

আর ছেলে?

ভাতেই বা কি? এই এতগুলো ছোট ভাই-বোনকে মানুষ করে তুলল না সীতা? সেইভাবে নিলেই হয়! মন হচ্ছে 'মহাশয়' তাকে-মা সওয়ারে সে তাই সুর। একটা বাচ্চা ছেলেকে খুব বেশী গুরুভার ভাববার কী আছে? সীতা তাকে ম্যানেজ করে ফেলবে।

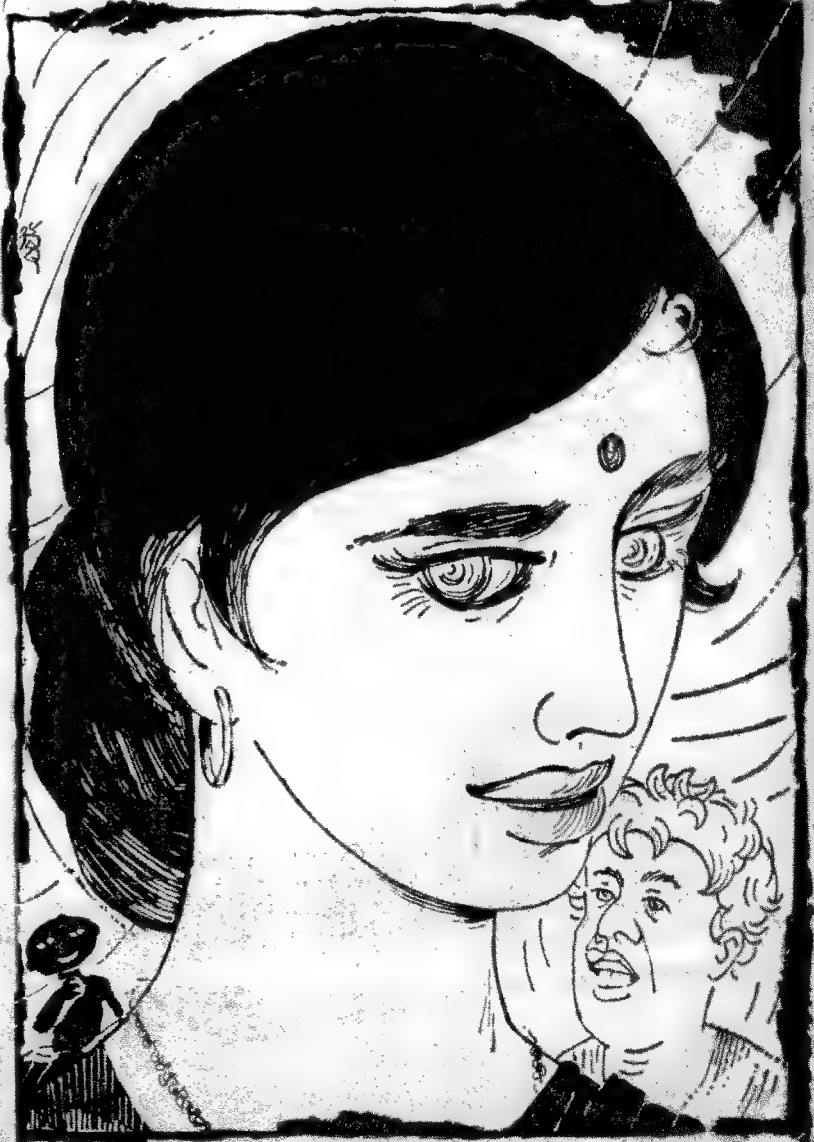
অতএব ঠিক আছে।

দিন চারেকের ছুটি নিয়ে কলকাতার এক আত্মীয়ের বাসায় উঠে বিয়ে করেই বৌ নিয়ে কর্মস্থলে পাড়ি দিল নিখিল, ফুল-শয্যার অনুষ্ঠানটা ঠিকমত হল না। কারণ সেই নির্দিষ্ট রাতটা কাটলো রেলগাড়ীতে।

নিখিলের রেলের 'পক্ষ' আছে, কিন্তু এমন কিছু 'কন্ট্রি-বিল্ড' চাকর সে নয় যে, ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড ক্লাসের পাশ থাকবে। থার্ড রেকের চাকরী, থার্ড ক্লাসের পাশ। অতএব—রেলগাড়ীতে একটু স্বচ্ছন্দ দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকাবারও অবকাশ হল না।

একেবারে সেই কোয়ার্টার্সের বাসা।

ছোট ছোট দুখানি কুঠুরির কোয়ার্টার্স।



কিন্তু ছোটতে কি এসে যায়? সীতার কাছে এই বিশাল বিশাল অগাধ! পুরো সাম্রাজ্য, আস্ত একটা সংসারের সর্বস্ব সম্বল।

তাছাড়া বাসাই ছোট, তার আবেষ্টনটা তো সীতাদের কলকাতার বাড়ির মতো বেঁধে মাঝার ভূমিকাধারী নয়। ঘর ছোট কিন্তু উঠোন বড়। জানলা ছোট, কিন্তু আকাশ বড়। বাগান নেই কিন্তু ফুল ফোটার মত জমি আছে ফেলাছড়ায়।

সীতার যদি ফুল ফোটার ক্ষমতা থাকে তো ফোটাও ফুল।

সীতা জানতো ফুল ফোটার মন্ত তার জানা আছে। তাই সীতা সেই ফুল ফোটার লক্ষ্য নিয়েই ঢুকেছিল এ বাসায়। যে ঘানার সামনে একটা কুচ্ছাড়ার গাছ, আর পিছনে দু-দুটো সজনে গাছ।

সীতা মোহিত হয়ে গিয়েছিল।

কুচ্ছাড়ার লাল, সজনে পাতার কিরী-কিরী, কী অপূর্ব। কী অপূর্ব। তাছাড়া উপরি লাভ সজনে ডাঁটা। যেটা নাকি সীতা-দের বাড়ির বিশেষত্ব। তা বিশেষত্বই। নইলে ছেলে-বড়ো সবাই সজনে ডাঁটার ভক্ত, এ আবার কাদের বাড়িতে হয়?

সীতার তিরিশের কাছের মন তৎক্ষণাৎ ভেবে নিল, এদের তো রেলের ভাড়া লাগে না, হঠাৎ হঠাৎ কোন ছুটির দিনে চলে বাওয়া হবে কলকাতায়, নিয়ে বাওয়া হবে ডাঁটার পর্বত। দু-দুটো গাছ, কম তো নয়। তাছাড়া-সময়ও তো অগাধ থাকবে সীতার, আড়াইটে মানবের সংসার, আচার আমসৎ বাড়ি এসব করবে বসে বসে।

নতুন তেঁতুল দিয়ে সজনে ডাঁটার আচার—ওমা, ওমা এ কী! পালের বাড়ির পিছনের উঠোনেই যে একটা তেঁতুল গাছ! আশ্চর্য! ভগবানের এত করুণাও তোলা ছিল সীতার জন্যে।

নিখিলের মসনেপোতার কোয়ার্টারের দরজার এসে দাঁড়িয়েই ভগবানের করুণার বিমোহিত হল সীতা! তারপর ঢুকেই সীতা তার তিরিশের কাছের অপ্রতিভতা নিয়ে বলে উঠল, 'কই আমার ছেলে কোথায়?'

রিহাসাল দেওয়া ছিল, তাই উচ্চারণটা হয়তো একটু যান্ত্রিক শোনালো, কিন্তু জড়তার আভাস মাত্র ছিল না।

নিখিল একটু বেন চমকলো, কারণ এই দিন দুই তিনের পরিচয়ে তাদের মধ্যে কথা বেশ কিছু হয়েছে বটে কিন্তু ছেলের কথা হয় নি একবারো। নিখিলই তোলে নি, কারণ নিখিল ভেবে রেখেছিল রাগির নিড়তে নিবিড় সান্নিধ্যের মধ্যে, আদরে দিশেহারা করে দিয়ে ওই 'পরের ছেলের' মা হওয়ার প্রতিশ্রুতিটা আদায় করে নেবে নববধূর কাছে। কিন্তু নববধূর তাকে টেকা দিল।

বললো, 'কই আমার ছেলে কোথায়?'

অন্তর্যমিত্ততার বিগলিত নিখিল এই গ্রহিমারীকে অবহিত করলে দিল 'কোথায়'।

নিখিল ছুটি নিয়ে কলকাতায় যাবার সময় এখানের এক পরিচিত বন্ধুর বাড়িতে রেখে গেছে ছেলেকে, ঠিক করা আছে

আজকের অনুষ্ঠানটা মিটিয়ে নিয়ে কাল আনবে তাকে।

'আজকের অনুষ্ঠান' অর্থাৎ 'ফুলশয্যা'। হোক আটশ আর আটশিশ, আর হোক তাদের মধ্যে একজন 'সেকেন্ড হ্যান্ড' তবু দুজনের চোখে চোখে ফুটে ওঠে এমন একটি মধুর রোমাঞ্চময় দৃষ্টিসুখ, যা একেবারে আনটাকা আঠারো আর আটশের মতই।

তা অনুষ্ঠানটাও হল প্রায় ওই টাটকা-দের মতই। একজনের তো সাধবাসনা আশা আবেগ সবই মজুত ছিল, তার কাছে নব-স্বাদই। আর অপর জনের? তার আবার 'পূর্ব' অস্বাদিত' স্বাদের অভাবজনিত তীব্র ক্ষুধা।

কাজে কাজেই—

কাজে কাজেই সকালবেলা দুজনের চোখ মুখেই নিতান্ত নবীনদম্পতির উজ্জ্বল আবেশের আভাস, আর আগামী সম্ভাবনার চঞ্চল ঔৎসুক্য।

ছেলের কথা তোলে নি কেউ, চায়ের পেয়ালার সাজিয়ে বসেছে দুজনে।

সমস্যা করে হাড়পাকা সীতার পক্ষে এক বেলাতেই সব কিছু মূঠোর এনে ফেলা কিছুই শক্ত হয় নি। ডিশে বিস্কিট এগিয়ে দিয়ে সীতা প্রশ্ন করতে বাচ্ছিল 'সকালে কি ভূমি শুধুই বিস্কিট খাও?' হল না প্রশ্ন করা, বাইরে একটা সাইকেল রিকশার আওয়াজ পাওয়া গেল, তার সঙ্গে কেমন যেন একটা অমানুষিক চীৎকার।

টেবিল তেলে চায়ের পেয়ালার কাং করে চেয়ার ছেড়ে উঠে গেল নিখিল, সঙ্গে সঙ্গে ভীত রুস্ত সীতাও। তারপর ঘটনাটা বুঝতে পারলো সীতা।

ছেলে এসেছে।

তারপর আরো কিছু বুঝতে পারলো। বুঝতে পারলো নিখিল তাকে ঠাকিয়েছে।

অমানুষিক চীৎকারপরায়ণ যে ছেলটাকে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে এল নিখিল, তাকে কি 'বাচ্চা ছেলে' আখ্যা দেওয়া যায়? যে 'বাচ্চাটির মাথার' আর লালিত্য কল্পনা করেছে সীতা 'ছোট একটি ছেলে আছে' এ খবর জেনে পর্যন্ত।

এ ছেলের বয়স দশও হতে পারে পাঁচও হতে পারে। বয়স বোঝবার উপায় নেই বিকৃতগঠন মাখাসর্বস্ব একটা 'জড়' ছেলে। যার কণ্ঠ থেকে ওই অমানুষিক চীৎকারটা উঠছিল; বাপের স্পর্শে খেমেছে, তার বদলে মুখ দিয়ে লালার ঝরছে।

সজের বয়স্ক। মহিলাটি উদাত্ত গলায় বলেন, 'এই নাও বাবা তোমার ছেলে। বহুকষ্টে এই কটা দিন রেখেছি। নাতির হাতের কীলচড় খেয়ে সবাপ্পো কালিশটে পড়ে গেল। কাল রাত্তিরেই বোমা আর সুবোধ জ্বরদম্পিত নিয়ে আসছিল, আমিই অনেক করে নিবৃত্ত করলামই বাল্যযত্নই হোক, একটা শুল্ককাজের দিন। নিখিলেরই না হয় পুরনো, বৌটার তো নতুন। তা' এই রইল মা তোমার ছেলে। শুভাগা আসহার।'

মহিলাটি সীতার দিকে এগিয়ে আসেন, বলেন, 'আসো বৌ এনেছে নিখিল। এখন

দুজনে একশো বছর পরম্পর নিয়ে সুখে বরকসা করো।'

চলে যান ব্যস্ত হয়ে। ধুলোপায়ের।

বাড়ির কতাগিনী কারুরই মনে পড়েনা মারথেন্সে কালিশটে পড়া মানুষটা 'অমনি-মুখে' চলে গেল। অথচ বাড়িতে প্রচুর মিষ্টি মজুৎ! সীতার বাবা অনাক্ষুণ্ণ বিশেষ দিতে পারেন নি বলেই বোধকরি মিষ্টিটা বেশী দিয়েছেন মেয়ের সঙ্গে।

সঙ্গে দিয়েছেন।

কিন্তু মেয়ের জিভে।

তা' তিনি তো জানতেন তাও দিয়েছেন।

তবে নিখিল সেটা জানতে পেল না।

নিখিল তীব্র ভিত্ত কট, কষারের সং-মিশ্রণে গঠিত একটা স্বাদ পেল।

'এই তোমার ছেলে!'

নিখিল অবশ্যই ঝরপরনাই অপ্রতিভ হয়েছিল, নিখিল তাই মাটিতে পা ছাড়িয়ে বসে থাকা চুলবিহীন মস্ত মাথা আর ছোট ছোট হাত-পাওয়া ছেলের দিকে আর তাকাতে পারে না! অন্যদিকে তাকিয়ে বলে, 'হ্যাঁ ইয়ে একটু রুস্ত মত! তাছাড়া এই ক'দিন পরের বাড়িতে অম্বরে—'

সীতার কণ্ঠে ধাতব সুর, 'কদিনের অম্বতের চেহারাই বটে! কত বয়সে ছেলের?'

নিখিল মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যায়, নিখিল তাই বোকাটে এলোমেলো উত্তর দেয়, 'বয়স! বয়স তো ওই। ওর মা কখন গেছে, তখন বছর তিনেকের!'

'ওর মা কখন গেছে, তার সন তারিখ আমার জানা নেই!'

হঠাৎ নিখিল শক্ত হয়ে ওঠে।

ল্যাজ মাড়ানো কুকুরের মত হঠাৎ 'দেউ' করে ওঠে।

'তা' ওর বয়সের সাল তারিখই বা জান-বার কী দরকার আছে তোমার?'

'না : দরকার কিছু নেই!' সীতার গলায় এবার বিদ্রূপ করে, 'শুনোছিলাম কি না একটা কচি বাচ্চা আছে। তা' তমাদের ওখানে আট দশ বছরের ছেলেকে, 'কচি বাচ্চা' বলে না তো, তাই জিজ্ঞেস করছি।'

'আট দশ! বললেই হল আট দশ।' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে চলে যায় নিখিল।

সকালের সব সোনা পেতল হয়ে যায়, সব রং রং-হীন, সব সুর কেসরো।

ছন্দটা গাঁথবার আগেই ভেঙে ছাড়িয়ে পড়ে।

সেই ভাঙা শব্দগুলো তীক্ষ্ণ টুকরো হয়ে বি'থতে থাকে, 'ও আমার ঠাকিয়েছে। ও আমার ঠাকিয়েছে।'

কিন্তু ঠাকিয়েছে কি নিখিল শুধু তার স্ত্রীকেই।

নিজেকে ঠাকারিনি?

নিজেকে কি লোভ দেখায়নি ও, 'তোকে সুখ দেব, তোকে উল্লাস দেব। তোকে প্রাণ দেব।' লোভ দেখায় নি, 'তোকে কুখার খাদ্য দেব, তুকার জল দেব, পুরনো দিনের স্বাদ দেব।'

দেখিয়ে হল।

এই লোভ দেখিয়ে দেখিয়েই সাত বছর মৃত বিবর্ণ নিশ্চৈতন্যে তুলে ফেরে চৌপার পরিরোহিত, ফুল ছড়ানো বিছানায় এসে ফেলাছিল।

কিন্তু এখন?

এখন কী মনে হচ্ছে?

পারবে তাকে এসব দিতে?

কোথায় সে আশ্বাস? হার কাছে ওই উপকরণগুলো, সে যে 'পাথর' হয়ে বসে আছে।

সৈনিক—প্রথমদিন, তখনকার মতো কোনও রকমে ভাতকটা গলার ঢেলে ছুটে চলে গিয়েছিল নিখিল। যখন সীতা এসে ওর সামনে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে বলেছিল, 'ওকে একা আমার কাছে রেখে দাও—মানে? আমি ওর কী জানি?'

তখন গৌরামল দিয়ে পালিয়েছিল।

বলেছিল, 'জানাজানির কী আছে?'

থাবে বসে থাকবে, এই তো? আজ একটু জট্টাপাটা হয়ে গেল, কাল থেকে আমিই ওর সব কিছু করিয়ে দিয়ে থাকো।'

নিখিল অফিসের দেয়াল হয়ে বাওয়ার ভানে ব্যস্ততা দেখাচ্ছিল, কিন্তু সীতা নবোদা হলেও নবীনা নয়। সীতা সজনে গাছের কিরকির দেখে মুগ্ধ হলেও সঙ্গে সঙ্গে সজনে ডাটার সঙ্গে সর্বে-বাটার মধুর মিলন কল্পনা করে বসে। তাই সীতা আরো পথ আগলে বলেছিল, 'ওর সব করিয়ে নিতে হয় তা হলে?'

কী মুশ্কিল। তাড়াহাড়ির সময়—সব মানে আবার কী হাতী ঘোড়া? চান-চানগুলো করিয়ে দিতে হয়, ভাতকটা খাইয়ে দিতে হয় এই তো।'

হু! তা এতদিন এই ছোট সহজ কাজটুকু নিজের চালায়ে এসেছে তা হলে?'

নিখিলের স্মৃতি পোরষ জেগে ওঠে, 'তা আমি বাপ, আমি দেখবো না তো কে দেখবে? যে কবছর ওর দিদিমা ছিল দেখেছিল। তা ও তো গত বছর মরে জন্ম করে রেখে গেল আমার।'

'ওঃ বোঝা গেছে রহস্য! সীতা পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ায়, 'বোঝা গেছে এতকাল পরে আবার গলার মালা দেওয়ার রহস্য!'

প্রথম দিনের প্রথম ইতিহাস এই।

নিখিল যখন সন্ধ্যার কণ্ঠস্বরকে ধরে ফিরলো দেখলো ছেলেকে পাশের ছোট ঘরটার মেজের পাতা বিছানায় শুমাচ্ছে। বিছানাটা ফর্সা।

দেখে চোখ জড়িয়ে গেল নিখিলের।

বুঝলো রাগটা ভেঙেছে। তবু হতই হোক একটা মেরমানুষের প্রাণ তো, অবোধ অসহায় একটা জীবকে কি আর মারামারি করে থাকতে পারবে? অগের হাতে খায় না ছেলেরা, খেয়েছে কি না কে জানে। তবু জিগোস করতে সাহস হল না। পরিচিন্তিত নষ্ট না হয়।

শামুড়ী মরে পর্বত এই বছর খানেক হলো নিজের কাছেই আনতে হয়েছে ছেলেকে, অর প্রতিপদে বিবর্ণী হয়ে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে হয়েছে।

সকালে রেখেবেড় ছেলেকে নাইয়ে খাইয়ে তবে নিজে খেয়ে অফিস যাওয়া; ফিরে এসে আবার সেই কাজ। সারাদিনের মতো ঘরে চাবিবন্ধ করে রেখে যেতে হয়, সেই ঘরের মধ্যেই হাবা সারাদিনের বাবতীর কৃত্য করে রেখে দেয়, এসে সেই ঘরও পরিষ্কার করতে হয় নিখিলকে।

খেয়ে না-খেয়ে মোটা মাইনের চাকর রেখেছে কলেক্টার, কিন্তু টেকাতে পারেনি। 'দুশ্ন অসহায়' হাবার প্রকৃতিদত্ত সহায় হাত-পা-দাঁতের কবল থেকে তারা পালিয়ে বেঁচেছে। তা' ছাড়া-হাবা বাপের হাতে ছাড়া খারও না তো।

শেষ পর্বত পাড়ার লোকে সংস্কারমূলক দিয়েছে 'বিবরে কর।'

বিবরে?

শিতার পক্ষের বৌ এসে দেখবে ওই অবোধ ছেলেকে?

আহা ছেলার না দেখুক অছেন্দারও দেখবে। দেখতে রাখা হবে। তাছাড়া বাড়িতে একটা মানুষ থাকলে এমন গরু-ছাগলের মত খেঁচাড়ে বেঁধে রেখে যেতে হবে না তো? বৌ তো আর চাকরের মতো চাকরী ছেড়ে পালাবে না।

কোঁটা কোঁটা জলে পাথর গলে।

আর এতো দারোপড় পাথর করে রাখা মন।

'বিবরে' শব্দটাকে সহনীয় করে ফেলার পর থেকেই দেখে-মনে যেন নতুন জোয়ার আসে, হাবার জনের খাটুনীগলো তেমন আর গায়ে লাগে না, রামাঘরকে মনে মনে সেলাম জানায় আর বলে, 'আর খাটতে পারছো না—আমার।'

তারপর পাড়ার গিন্নীর কাছে ছেলে রেখে বিবরে করতে যাওয়া। চারটি দিন হাবার দার থেকে মুক্ত হয়ে নিখিল যেন নবোদবন ফিরে শেয়ে ছিল, নিখিল হাবার কথা প্রায় ভুলেই দিয়েছিল।

নিখিল ফুল-শস্যের রাগিরে আশ্বাসে বিহবল হয়েছিল।

সকালে একটা হুস্পতন ঘটে গেছে বটে। কিন্তু আবার এখন যেন মনে হচ্ছে নতুন হুস্প কবিতা রচিত হয়েছে। হাবা পরিষ্কার ঘরে ফর্সা বিছানায় নিশ্চিন্তে শুমাচ্ছে। এর চাইতে সুন্দর কবিতা তবু কি আছে?

অতএব আর হাবার প্রশ্ন নয়।

খেয়েছিল কি না? বেশী জমলাতন করেছিল কিনা, এসব কথা থাকুক কাল সকালের জন্যে। এখন অসন্ন রাগি তার মোহময় তীর আকর্ষণে টানছে। সে আকর্ষণে স্রোতের মূখে কটোর মত ভেসে বাবে দীর্ঘদিনের কুখ্যত মানুসটা।

এখন অতএব শুধু রামার তারিফ করা; একদিনে সন্ধ্যার শ্রী ফিরে যাওয়ার তারিফ করা।

সীতার রাগ পড়েছে দেখা যাচ্ছে।

সীতা মৌনবস্ত নেয়নি।

সীতা সব কথা উত্তর দিয়েছে।

এমনকি সীতাও এখানের দুবের তারিফ করেছে।

খাওয়ারাওয়ার পর রাগে শূতে এসে আবার নিখিলের তারিফের পালা।

সীতার ব্যবস্থাপনার তারিফ।

'ওর বিছানা মাটিতে করে বুম্বির কাজ করেছে। খাটে শোওয়ালে পড়ে যাবার ভয়। বলে যাইনি তোমায়, তবু নিজে বুঝে—সীতা ভগবান যে আবার আমার ভাগ্যে এত সুখ লিখেছিলেন ভাবিনি।... মাঝখানের দরজাটা একটু আধ ভেজানো থাকবে, হাবা জগলে টের পাওয়া যাবে।'

সীতা এতক্ষণে কথার উত্তর দেয়।

বলে, 'টের পাওয়াই যাবে, আমি তো ওখানেই শোব।'

একী ভয়ঙ্কর অভিশাপবাণী! যেন অমোঘ শক্তিতে স্বেচ্ছায় এসে দাঁড়ালো।

নিখিল ততনাদ করে উঠলো এই আবিভাবকে।

'তুমি ওখানে শোবে!'

হ্যাঁ সেটাই ভালো। রোগা ছেলে যখন।

নিখিল ওর হাত চেপে ধরে কাছে গেল, 'পাগল! ও তোমার গিগে সারারাত নড়ে চড়ে না। মেহাৎ খিদে পেলে কি তেঁস্তা পেলে—'

'জা সেনময় সজাগ থাকই ভালো।'

সীতা পাথর। সীতা হাতটা ছাড়িয়ে নেয়।

নিখিল তবে এ পাথরের কাছে পরাস্ত হবে? পাগল।

নিখিল এবার হাত ধরে না; পুরোপুরি মানুষটাকেই সাপটে ধরে, 'আর তোমার খিদে তেঁস্তার কি হবে?'

'সেটা এতদিনেও মরেনি?'

ভারী তীর আর তীক্ষ্ণ বিদ্বেষ সীতার।

কিন্তু বিদ্বেষে বিচলিত হলে তো সবই গেল। সেই সারারাত দেয়ালে মাথা ঠোক।

তাই নিখিল আবেগে উদ্ভাল হয়, 'না দেয় না, মরেনি। ও কি মরবার?'

'নিজে থেকে না মরলে মারতে হবে।'

নিখিল এবার কোতুকুলে জোর ফলায়, 'ইস্ মারতে হবে বৈ কি! মারবার জনেই বুঝি তোমায় এনেছি? তুমি তাকে খাইয়ে দাইয়ে আরো তাজা করে তুলবে—'

না! সীতা কঠোর হাতে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে ছোট ঘরটার ঢুকে বসে। দেয়ালের ধারে যে সরু চৌকিটা ছিল তাতে শূয়ে পড়ে।

তবু ভাল যে ছেলের বিছনাতাই নয়। নিখিল অতএব তথ্যের বেহারা হয়।

ঠিক আছে আমিও এই ঘরেই শোবো। 'চৌকিটা দেড় ফুট চওড়া।'

'তাতে কি? নিখিল বিগলিত হাস্য চোখ নাচার। 'খাি হয় নুজন, তেতুল পাত্তে নুজন।'

'তুমি এখানে শূতে এলে, আমার বাধ্য হয়ে রামাঘরে গিয়ে শূতে হবে।'

'তার মানে তুমি আমার কাছে—' দুঃখে আবেগে গলা বুজ্জে আসে নিখিলের।

কিন্তু সীতা অনমনীয়। সীতা মমতা-হীন।

'আমার স্বরূপ লাগছে তুমি যাও।'

‘খারাপ লাগবে না গো লাগবে না। প্রথমটো একটু ইয়ে হবে গেছে কিনা—মানে জানতে না তো ছেলেটা রংগ। তবে বাত কিছুটি করে না—একেবারে।’

নিখিলের কথা শেষ সবার সুযোগ পার না।

রাত্তি যে কিছুটি করে না, সেই জীবটা হঠাৎ জেগে উঠে রোগগ্রস্ত কুকুর বেড়ালের মত চাঁৎকার করে ওঠে।... ভাষাহীন আত্ম-নাদ। বোঝাবার উপায় নেই কী সে চায়। কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলেই হাত পা আর দাঁতের স্বচ্ছতা ব্যবহারে বিবর্তিত করে দেবে থাকে। সীতা দাঁতদাঁত চেপে এই দৃশ্য দেখে কিছুক্ষণ। তারপর নিখিলকে বাড়ির মুখে ফেলে রেখে বোধকরি ‘রামাঘরেই’ শূতে যায়।

অতএব নিখিলের দ্বিতীয় রাত্টিটা একটা ক্রৌঞ্চ মত ‘নিং’ নিয়ে নিখিলকে কমিউ দিতে দিতে একসময় বিদায় হয়।

কিন্তু শব্দই কি স্মিত্যের রাতি?

হাতীর, চতুর্থ, পঞ্চম, আরো অনেক?

না, রাতির রূপ আর ফিরে পায় না নিখিল।

গোয়ার হাটা ‘মড়রমড’ ঘুমোলেও সীতাকে উদাসীন রাখ না। অবেধ সম্পর্কের মত লাকোচুরি করে ‘বথালভেই’ হাঁস চারিতার্থ হতে পারতো সে, তাই হলে নিখিলও এর সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলতো, ‘কত জন্মের শত্রু ছিল ও আমার!’ বলতো, ‘যে স্বপ্নে গেছে, সে তোকে নিয়ে যায় না কেন?’

কিন্তু সীতা উদ্যমাক্রান্ত।

সীতা রক্তমাংসের শত্রু সীতাকার করতে রাজী নয়।

‘জা’ হয়তো একেবারে চলে যায় না, তবু এক দরজা দিয়ে ঢেকে। রক্তের আগুন মোজাজের ঘরে পৌঁছে জবলিয়ে পুড়িয়ে থাক করে দেয়।

জিভ নর আগ্নেয়গিরি।

ছেলেটাকে হিঁচড়ে হিঁচড়ে চাল করার, খাওয়ার, আর তার পদাঘাত থেকে আত্মরক্ষা করতে করতে দাঁত দাঁত পিঁবে চাপা চোঁচানি চোঁচার, ‘কত জন্মের শত্রু ছিল আমার ও আপল তো মরে না! বিনি স্বপ্নে গেছেন, তিন তার পোষা-জানোয়ারটি নিয়ে যেতে পারেন নি সপো!’

বলে, ‘জন্মের হাতেই একদিন খুন হবি তুই, এ আমি দিবা চক্রে দেখতে পাচ্ছি।’

বলে, ‘রাত পুইয়ে একদিন দেখি তুই নেই, তো হারির লুট পই।’

বলে আর বড় বড় গাল দিয়ে ভাত গিলিয়ে দেয়।

সীতার মা বাপ তাইকোনেরা যদি সীতার এই চেহারা দেখতো? নিশ্চয় তারা বলতো সীতা মরে প্রেতিনী হয়ে ঘরে বেড়াচ্ছে।

সীতার ধরসটা আকাশ থেকে ধীরে ধীরে উন্নতিশেষ দিকে না এগিয়ে ভরানক একটা লাফ দিয়ে উলপুটালে পৌঁছে গেছে।

কিন্তু নিখিলও তো মানুষ?

আছাড়া অশ্রুত বাসনার জজরিত খৌঁকি হয়ে বাওয়া মানুষ! দিনের বেলা ওই উন-পঞ্চাশ বছরের বড়টাকে দেখলে তার সবার্গে বিবর্তিত। সেও সমানে সমানে চোঁচার, ‘ও মরলে তুমি হারির লুট দেবে? এই জন্য আনা হয়েছে তোমাকে? ভেবেছি কি তুমি? ঘর-কল্যা করবার জন্যই আনা হয়েছে তা’ মনে রেখো। পরপর বলছি আমার ওই রংগ ছেলেটাকে ছুঁমি গাল দেবে না।’

সীতা তেমনি চাপা আকাশে বলে, ‘দেবো গাল, একশোবার দেবো! ও মরলে আমি হারির লুট দেবো।’

নিখিল ভেড়ে উঠ বলে ‘খবরদার! চুপ।’

সীতা বলে, ‘কী করবে তুমি আমার? করবে না চুপ।’

আগুন জ্বলে দ্বটো দ্বটো চাকটে চোখে।

যেন দ্বটো খাঁচার পোরা বাহ।

খাঁচাটা খোলা শেলের পরস্পরকে হিঁচড়ে ফেলবে! কিন্তু খোলা পাচ্ছে না। সভাতার শিক দিয়ে ঘেরা! ভাঙতে হলে পড়া জান-জানি হয়ে।

হয়তো সীতা এমন অনমনীয় না হলে, অবস্থা অন্যরকম হতো। হয়তো ওই অবেধ সম্পর্কের মত ‘বথালভেই’ হাঁস চারিতার্থ হতে পারতো সে, তাই হলে নিখিলও এর সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলতো, ‘কত জন্মের শত্রু ছিল ও আমার!’ বলতো, ‘যে স্বপ্নে গেছে, সে তোকে নিয়ে যায় না কেন?’

কিন্তু সীতা উদ্যমাক্রান্ত।

সীতা রক্তমাংসের শত্রু সীতাকার করতে রাজী নয়।



তাই নিখিল বিবর্তিত গলায় বলে, ‘খবর-দার তুমি গাল দেবে না ওকে।’

আর সীতা স্বপ্নে স্বপ্নে বলে, ‘দেবোই তো গাল। ও মরলে আমি হারির লুট পই। সকালে উঠে দেখি যেন মরে কাঠ হয়ে আছে।’

জড় ছেলেটা কথার মানে বুঝতে পারেনা, কিন্তু ডাবের পাত্রে। তাই সীতার গায়ে কালসিটের দাগ মিলিয়ে না, সীতার একখানা কাপড়ও আন্ত থাকে না। সীতার রঙের চুলগুলো ক্রমশই অস্তিত্ব হতে থাকে।

তবু এমনটা বুঝি কোনোদিন হয়নি।

‘কপাল কেটে রক্ত বেরোয়নি কোনোদিন সীতার। পা দিয়ে তৈলতে তৈলতে রোম্মাকের ধারে তৈল দিচ্ছেল, টাল সামলাতে পারল না সীতা।’

সীতা কপাল চেপে উঠে দাঁড়াগো।

বাস্তব হয়ে ছুটে আসা নিখিলের দিকে একটা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রামা-ঘরে ঢুকে খিল বধ করে দেয়।

কিন্তু রামাঘরে খিল বধ করে বসে যে সত্যনের ছেলের খাবারে বিবর্তিত, একটা কি সীতাই কেউ ভাবতে পারে?

অতঃ সেই অজান্তেই ঘটনাটাই ঘটলো।

সীতার মনোবাক্স পূর্ণ হলো।

সকালে উঠে দেখা গেল ‘মরে কাঠ হয়েই’ রয়েছে হাটা।

বিবর্তিত! বিবর্তিত! আর কি? নইলে বলা নেই কওয়া নেই। হঠাৎ এমন! দুগুই ছিল হাটার। ভাড়াভাড় মরবার কথা ছিল না। আরও কত ভুগবে, কত ভোগাবে তবে তো—

নিখিল তাই পাগলের মত ছেলের বিজ্ঞানা ঘরে গড়াগড়ি করে, ‘ওরে কোন রূহাপাপী—এমন কাজ করলো রে! ওরে আমার মরা ছেলে রে! ওরে দৃষ্টির বিষে বিবে আর গালাগালির বিষে বিবে জীর্ণ হয়ে গেল ছেলেটা! ওরে বা বললো—তাই করলো!’

সীতা অবশ্যই কাঁদছিল না, সীতা ও-ঘরের দিকে তাকিয়েও দেখছিল না। নিখিলের মস্তা চড়াগা দেখে বলে, ‘চোঁচিয়ে পাড়ার লোক জড়ো করে কোনো লাভ আছে?’

নিখিল ভেড়ে উঠে বলে, ‘লাভ? এখন আমি লাভ লোকসান দেখতে বসবো?’

‘তবে চোঁচাও।’

বলে উঠানটা বাঁট দিতে লাগে সীতা। নিখিল উঠে আসে, রংগ গলায় বলে, ‘বুঝ-লাম ও তোমায় খুব জ্বালাতন করছিল, তবু তুমি বিবর্তিত দিয়ে যাবো?’

সীতা হাতের কাজ থামায়, সীতার চোঁটে একটা বিচির হাঁস ফুটে ওঠে, সীতার একটা বিচির দৃষ্টি।

সীতার সেই দৃষ্টি, সেই হাঁস যেন নিখিলের বুকের মানে কেটে ভিতরে বসে যায়। তবু গলায় স্বরটা স্থির থাকে। সাহসটাও পুরোদমে। নইলে বলতে পারে কখনো ‘তা আস্ত হার কী আছে? বাঁধ থাকলে পথের কাঁচাটা কে না সরতে চায়?’

কদিন আগে কাব্য করে কাগজে লিখেছিল, 'বরষার ভাঙ্গা নেই'। আর লিখেছিল 'প্যাচপেটে গরমে কলকাতার মানসিক জীবনযাত্রা অচল হতে চলেছে। কলকাতা-বাসী, ঘানের এয়ার কন্ডিশন ঘর নেই, থেকে থেকে তারা চাতক পাখির মত আকাশের দিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু আবহাওয়া আর্পিসের ভবিষ্যৎবাণী বিশ্বাস করলে বলছে হবে বরষার আপাতত ভরসা নেই।'

কলকাতার জনসমুদ্রের একটি প্রাণীও এই অসহ্য গরমে বর্ষা চায়নি বললে অবিশ্বাস্য বিস্ময়ের ব্যাপার হবে।

কিন্তু সত্যিই একজন চায়নি। অমিতা সরকার চায়নি। চায় না।

শবে, তাই নয়, কাগজের হা-হাডাশ পড়ে রাগ করে কাগজটা ছুঁড় ফেলে দিয়েছিল। আকাশের বুকে কালো ফরাসি বিমানের দেখলে বুকের তলার এক অসহ্য গুমটে ছটফট করতে থাকে সে। আর, আকাশ ভেঙে বাদলের ধারা নামে যখন, ওই বুকের ভিতরে একটা জ্বলন্ত শব্দ হয় তার তখন।

..... আকাশ-ভাঙা এক বর্ষার রাতে একজনের হাতে এই জীবনের সর্বস্ব সপ্নে দিয়েছিল অমিতা সরকার। সেই ঘনঘটা দুর্যোগের রাতে মহা অশ্রুজলের মধ্যে এক অস্তিত্বশূন্য মিলন সম্পন্ন হয়েছিল তার।

চোখ বুজলেই সামনে ছবির মত জীবন-বাস্তব আর বোঁদন-বাস্তবের একটা মিছিল দেখতে পার অমিতা সরকার। পুরনো, পরি-ত্যক্ত, কিন্তু সমস্ত সত্তা থাক করে দেওয়ার মত সজীব। অমিতা সরকার দেখতে চায় না। তবু দেখতে হয়। মিছিলের মতই সার বেঁধে আসে ওই ছবির দল। বর্ষার দিনে বা রাতে সবথেকে বেশি আসে।

*

.....রিকেল থেকেই সেই একদিন আকাশ দুর্যোগে ছেয়ে ছিল। কালো কালো মেঘগুলো এসে এসে আকাশের কালো আন্তরগটা ঘন ভারী পুরু করে তুলেছিল। তারা প্রলয় নামাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। মাঝে মাঝে জলদ গুরু-গুরু ডাক শোনা যাচ্ছিল।

রিকেল থেকে অমিতা সরকার কতবার সেদিন আকাশ দেখেছিল, ঠিক নেই। বৃত্ত দেখেছিল, উল্লাসে ভেতরটা ততো ডরে উঠেছিল। ওই প্রলয় আশীর্বাদ ছাড়া আর কিছু

ভাবেনি সে। ও চাইছিল আদ্যক প্রলয়, আকাশ ভেঙে পড়ুক। সন্নিহিত এই রাতে সে সব পারে, অথবা সব হারাবে। তাই আশা আনন্দের মতোও বুকের ভেতরটা দুরুদুরু কাঁপছিল তারও।

দুটি প্রবল-গগী পুরুষের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল অমিতা সরকার। না সরকার তখনো হয়নি, দাঁড়িয়ে ছিল অমিতা চাটুজ্ঞ। তাদের একজন তার দাদা, আর একজন সমীর সরকার। দুজনের জোহান্স টানায়ে'চড়ার প্রাণান্ত দশা অমিতার। এই দুর্যোগের রাতে ওই অসহ্য টানায়ে'চড়ার চড়ন্ত ফলসারা হয়ে থাকে। অস্তিত্ব হবার কথা। অমিতা আশা করেছিল সমীর সরকার জিতবে। চেমেছিল, সমীর সরকার জিতুক।

জয়ন্ত দাদাকে সেও তখন জীবনের পরম শত্রু ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছিল না।

চন্দাল মগী দাদা তার প্রতিজ্ঞার কথা গুলিয়ে দিয়েছিল অমিতাকে। বলেছিল,

মুশে যদি সত্যিই এভাবে চুন-কালি দেয় ও হয় তাকে কেটে দেখানো করবে, নরতো সমরকে। পারলে দুজনেই। স্বদেশী করতে গিয়ে একবার ফাঁস হতে হতে বেঁচেছিল দাদা, এবারে না হয় আর বাঁচবে না। কিন্তু তার কথার মড়চড় হবে না।

আর একজনেরও তেমনি মেজাজ। ওই সমীর সরকারের। মূখের ওপর সে দাদাকে অপমান করেছিল। বলেছিল, খুন করা হবে না, তবে বৃদ্ধিভ্রংশ হলে আত্মহত্যা করে বসতে পারে বটে। তখন অমিতাকে সামুখ্য দিতে বেশ বেগই পেতে হবে তাকে। কারণ দাদা যেমনই হোক, তাকে অমিতা ভালইবাসে মনে হয়।



দাদার হুমকিতে অমিতা ভয় পেরেছিল। রক্ত চড়লে সে রক্তপাত করতেও পারে। আবার আর একজনও কম নয়। অমিতার এক-এক সময় সন্দেহ হয়, 'অসবল' মিরের নামে দাদা এমন মারমুখি, নাকি ওই অপমানের ফলে।

এক সময় দাদার কথাই ছিল সমীর সরকার। সমীরের বাবা তখন ব্যবসার জন্য টাকা করেমি। দাদার রাগের আবেগ কারণ আছে। তার মতে সমীর সরকার শুবু গোয়ার নর, অপশাসিত। নিজের গাফিলতিতে বাপের ওই চাল, ব্যবসা ডুবিয়েছে নাকি। কিন্তু ব্যবসার সমীর সরকারের উদ্যম কম সেখান অমিতা। দুর্যোগের মধ্যে লোকটা হেঁচ-চকতি ভালবাসে। আর ভালবাসে সিনেমা ক্রিয়েটর।

ফিস স্টুডিওতে ঘোরাফেরা করে, আন্ডা দেয়। এই সব বলে তার চরিত্র সম্পর্কেও অমিতাকে সম্বন্ধ করে তুলতে চেষ্টা করেছে দাদা।

কিন্তু পুরুষের মেজাজের সঙ্গে লোকটার এই গোছের কৃতির যোগেও অমিতার উল্টে ভালই লাগে।

বাই হোক, অমিতাকে নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সংসারে একটা অশান্তি পুঁট হলে উঠছিল। সেই থেকেই রক্তাক্ত হওয়ার আশঙ্কা। চোখের দেখাসাকাতও, বন্ধ। কিন্তু সত্যি বণ্ড কিনা দাদার সেই সন্দেহ। তাই অনেক ভেবে অমিতাকে দীর্ঘদিনের জন্য বাইরে এক আত্মীয়ের কাছে পাঠিয়ে দেবার সঙ্কল্প করেছিল সে। পরের দিনই সেই যাত্রার তারিখ। দাদার মুখের ওপর আশঙ্কিত করার সাহস অমিতার হয়নি।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে অমিতা বিদ্রোহ করছিল।

সময়ের সঙ্গে যোগাযোগ সত্যিই বন্ধ ছিল না। অমিতা তাকে শেষ সিদ্ধান্ত দেবার কথাই বলেছিল। বলেছিল, বাইরে পা দেবার আগে সে যদি তাকে এ বাড়ি থেকে বাইরে নিয়ে যেতে না পারে তাহলে এ জীবনে সে অসুখ আর বোধহয় হবে না।

সময় সরকার কথা দিয়েছে ওকে নিয়ে বাইরে চলে যাবে। বাইরে গিয়ে ঘর রাখবে তারা। সেই ব্যবস্থার দিকেই এগোচ্ছে সে। তারপর খুব সংগোপনে ঘর ছাড়ার দিনকণ্ঠ তিক হয়েছে।

এই সেই দিন। এদিনে এই দুঃখের তাই আশীর্বাদ অমিতার কাছে। মানসে যখন ঘর ছেড়ে, লব্যা ছেড়ে নড়তে চাইবে না, সেই সন্দেহই অমিতা ঘর ছাড়বে।

তাই ছেড়েছে।

রাতের প্রলয় আগে ভরাবহ রূপ নিয়েছিল। বাড়ির একটি প্রাণীও যখন জেগে নেই, অমিতা নিঃশব্দে তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথে নেমেছে। ও-রাস্তার জল জমে না বলে রক্ত। অত রাতে আর অমন দুঃখের রাস্তারও জনমানব নেই। বাড়ির হাপটার সম্ভার আগেই রাস্তার আলো-গুলো নিভে গেছে।

দুটো মোড় ছাড়িয়ে তৃতীয় মোড়ে সময়ের গাড়ি অপেক্ষা করছে। নীচে দরজা খুলে অমিতাকে ভেতরে টেনে নিল সে। মাড়ে তিনশ টাকা গুনে ওই গাড়ি তিক করেছে সময়—টেনে নয়, হতদর সম্ভব গাড়িতেই কলকাতা থেকে দূরে চলে যাবে তারা।

সময়ের বাহুর মধ্যে ঘর ঘর কাঁপছিল অমিতা। এমন কাঁপনি আর জন্মে কাঁপনি। সেটা দুঃখের—দরদর খানিকটা বটে, কিন্তু সবাপা পাতলা কাগজের মত ওয়াটার প্রফ মোড়া তার—তাই খুব বেশি ভিজছে এমন নয়। তবু অত কাঁপছিল কেন সময়ের বন্ধে দেরি হয়নি। এক হাতে তাকে খুব কাছে আগলে রেখে ফিস-ফিস করে সান্দ্রনা দিয়েছে, ভয় কি, আমি তো আছি।

দুনিয়ার এই একটাই বেন ভরসার কথা আছে। সামনে চালক বসে, কোনো অজুহাতে সে ফিরে তাকাবে কিনা সে দুঃখ পর্বন্ত অমিতার নেই। দু হাতে তাকে আঁকড়ে ধরে অমিতা শূন্য ঠক ঠক করে কোঁপেছে।

অনেক—অনেকক্ষণ বাদে সে কাঁপনি থেমেছে। তারপর তার ভালো লাগতে শুরু করেছে। তার ভিজে বর্ষাতির জলে সময়ও ভিজে গেছে প্রায়। সেটা খুলে ফেলে সময়ের গা থেকে বসেছে। তার পরের কাঁপনিটা ভালো লাগার কম্পনের মত। কলকাতা ছাড়িয়ে গাড়ি যত দূরে গেছে, ততো বেশি ভালো লাগেছে তার।

সময়ের পাশে বসে গাড়িতে আগেও তো কম পথ পাড়ি দেবনি। কিন্তু এত ভালো আগে কখনো লাগেনি। এমন রোমাঞ্চও কোনদিন অনুভব করেনি।

এটাই একমাত্র বিলাস অমিতার। এই গাড়ি চড়াটা। দাদার সঙ্গে বেড়িয়েছে, সময়ের সঙ্গে তো কত বেড়িয়েছে ঠিক নেই। তার একমাত্র সাথ, নিজের একটা ছোট গাড়ি হবে একদিন। কড় দামী গাড়ির স্বপ্ন সে আর দেখবে কি করে। ছোট গাড়ি হলেই খুশি। সেই ছোট গাড়িতে তাকে নিয়ে সময় কোথা থেকে কোথায় পাড়ি দেবে এক-একদিন ঠিক নেই। জবতেও ছোট সময়ের মতই রোমাঞ্চ তার। তার এই সাধের কথা সময় জানে। সে কথা দিয়েছে, ঘর বাঁধার দু বছরের মধ্যে গাড়ি একটা করবে—করবেই।

কিন্তু বাদল-ঝরা এই রাতে অমিতা সে-সব কিছু ভাবছিল না। ও শূন্য একান্ত প্রিয় সান্নিধ্যে বসে ছিল। তবুও মনে হয়েছিল পুরুষের এই রাত আশীর্বাদ, জীবনের আশীর্বাদ তার।

ঘর বেঁধেছে ইউ পির কোনো এক জারগায়। সে ঘর সুখেরই হবে মনে হয়েছে দুজনের—নিরবচ্ছিন্ন সুখের। সেখানে এক পুরুষো বন্ধু ছিল সময়ের—আগে থাকতেই তার সঙ্গে যোগাযোগ করা ছিল। গাড়ি ছেড়ে দিয়ে শেষের পথটুকু তারা টেনে এসেছে। কনুয় বাড়িতে উঠেছে। বন্ধুটি আবগারী দপ্তরের পদস্থ কর্মচারী। প্রণব ঘোষ। সেই হে-চৈ করে ফিরে দিয়েছে দুজন্য, তারপর দেখেশুনে দুজনের একটা আশ্তানা যোগাড় করে দিয়েছে।

কিন্তু যৌবন-বাল্যের আবেগে টান ধরেছে এক বছর না যেতে। তার প্রধান কারণ উপব্রত সংস্থানের অভাব। সময়ের হাতে কাঁচা টাকা মস্ক ছিল না। বন্ধু প্রণব ঘোষের সঙ্গে পরামর্শ করে ব্যবসায় নেমেছিল সময় সরকার আর রাতারাতি বড়লোক হবার স্বপ্ন দেখেছিল। পুঁজির টাকা অধিকার বেশি করা হয়েছে তার, ব্যবসায় মার খেয়েছে।

অনেক ভেবে-চিন্তে আবার অন্য ব্যবসা ধরেছে, অল্প পুঁজি খাটিয়েছে তাতে। ওই থেকে এখন গ্রাসাচ্ছাদন চলেছে বটে, কিন্তু এই ব্যবসারও স্তিমিত ভবিষ্যৎ। অমিতার নিজের গাড়ি কেনার স্বপ্ন রয়ে দূরে রয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু যখন-তখন গাড়ি চড়ার আনন্দ থেকে সে একেবারে বঞ্চিত হয়নি। কারণ প্রণব ঘোষের গাড়ি আছে। সে এসে হানা দেয় অমিতার গাড়ি চড়ার নেশার সেই সমজদার বটে। দুজনকেই ছোট মেয়ে তুলে নিয়ে প্রায়ই গাড়ি ছোটায় সে। কখনো বা অমিতাকে একলা তুলে নিয়ে। সময় ব্যবসার চিন্তায় আর দুঃশ্রুতির ব্যস্ত, তাকে সবদা পাওয়া যায় না।

প্রণব ঘোষকে অকৃত্রিম সুন্দরই ভাবে সময় সরকার, তবু অমিতার সঙ্গে খিটখিটের বাঁধে প্রায়ই। একগুয়ে রগচটা মানুষ, এক এক সময় মাত্রা ছাড়ায়। সেটা বেশি হয়, প্রণবের গাড়িতে বেড়িয়ে ফেরার পর। অমিতা বন্ধুতে পারে, সমস্ত দিনের ক্লান্তির পর মানুষটা তাকে না পেয়ে বিগড়ায়। ভাবে আর বেরবে না—অন্তত একা না। কিন্তু দিনকতকের মধ্যেই হাঁপিয়ে ওঠে কেমন। তার ওপর প্রণব ঘোষের অন্তরঙ্গ জুসুম। সঙ্কল্প ভুলে আবার হয়ত বেরিয়ে পড়ে একদিন।

এরই মধ্যে বর্ষার দিনে বা বর্ষার রাতে অমিতার আনন্দে কাঁত একটু। লোকটার মেজাজ বদলায় তখন। কাছে আসে, ওকে কাছে পেতে চায়। বর্ষার সঙ্গে দুজন্যই ওদের নাড়ির যোগ।

এই যোগ থাকল না শেষ পর্বন্ত। তিন বছর না যেতে ঘর ভাঙল। এমন করে ভাঙল যে সেটা আর জোড়া লাগার আশাও থাকল না।

তার আগে ওই ঘরে অনটনের হারা আঘাে বিস্তার লাভ করেছে। কিন্তু সেই কারণেও নয়, অমিতা হাঁপিয়ে উঠেছিল লোকটার অসহিষ্ণু উপর মূর্তির ক্রমশ মশন প্রকাশ দেখে। অমিতার প্রতিটি চলন-বলন পর্বন্ত বাকা চোখে দেখতে শুরু করেছিল সময়।

প্রণব ঘোষের পাগলামিতে পড়ে সত্যিই ফিরতে রাত হয়েছিল সেদিন অমিতার। প্রথমে কার বার সে ফেরার তাগিদ দিয়েছিল, কিন্তু তারপর নিজেরই কেমন নেশা ধরেছিল।

সময় চুপ করে সহ্য করলে অমিতা নিজেই অসহ্য হত। কিন্তু তার বদলে এমন কটকটি শুরু করল যে, অমিতারও শেষপর্বন্ত মেজাজ ঠিক থাকল না। খানিক বচসার পরেই সময়ের শব্দ হাতের পাঁচ আঙুলের দাগ পড়ে গেল অমিতার গালে।

পরের দিন সন্ধ্যায় গাড়িতেই নিশ্চুপে কলকাতায় রওনা হল অমিতা। সময় সরকার তখন কমন্সলে বসে ব্যবসায় হিসেব দেখছে।

প্রণব ঘোষের কাছে এসে কলকাতা যাবার টাকা চেয়েছিল অমিতা—সেটাই কাল হল। সব খবরই রাখত প্রণব ঘোষ, অমিতাও গোপন কিছু করেনি। এমনকি গালের একটা দিক যে সকাল পর্বন্ত লাল হয়ে আছে, তাও দেখিয়েছে। প্রণব ঘোষ তবু

বোকাতে চেষ্টা করছে একটু, তারপর চুপ করে খানিক ভেবেছে কি। শেষে বলেছে, সম্ভাব্য গাড়ি, সময় মত স্টেশনে আসবে, আমি ব্যবস্থা করে রাখব।

ব্যবস্থার কোনে কার্পণাই করেনি বটে সে।

দুজনার এক কল্ট ক্লাস কুপেতে তাকে তোলা হল দেখে অবাক সে। প্রণব ঘোষ তাকে বোঝালো, যেভাবে যাচ্ছে এই ব্যবস্থাই নিরাপদ। কিন্তু গাড়ি ছাড়ার পরেও সে নামলো না দেখে অমিতা সরকার বিমূঢ় বাস্তু হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি হল, আপনি নামলেন না, গাড়ি যে ছেড়ে দিল।

জবাবে প্রণব ঘোষ বলেছে, একজন মহিলাকে এভাবে একা ছেড়ে দেওয়ার মত পাগল সে এখনো হয়নি। কলকাতা পৌঁছে দিয়ে ফিরবে।

অমিতা নির্বাক।

মত রাত হয়েছে ততো অশান্তি বেড়েছে তার। যে অশান্তিতে ভিতর পড়ছে তাই ফিরে পর্বত চিন্তার অবকাশ নেই যেন তার। এই লোকটার অস্তিত্ব এমন করে অমিতা আর কখনো অনুভব করেনি বাকি।

রাত তখন কত জানে না। অশান্তি আর ক্লান্তিতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল তাও জানে না। স্বপ্ন দেখল, একটা ক্ষণিক মনোভ্রমে তাকে আশ্চর্যের জড়িয়ে ধরেছে, আর নিঃশব্দে গ্রাস করতে আসছে।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসতে গিয়েও পারেনি। স্বপ্ন নয়। আঁকড়ে ধরেছিল। গ্রাস করেছিল।

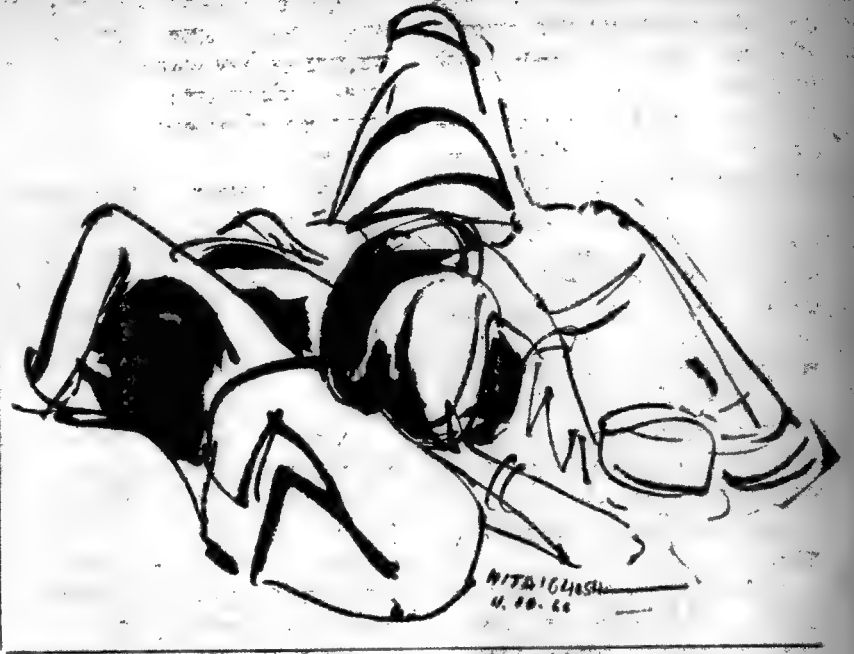
*

পাঁচ বছর কেটেছে তারপর। যেখানে থাকে সেটা ভুললোকদের বসতি-বসতি বলা যেতে পারে। যারা জেনে থাকে, তারা এই-টুকুই জানে স্বামীর সঙ্গ কোনো কারণে বিচ্ছেদ হয়েছে, সেটা আর সহজে জোড়বার নয়। অনেকের অনেক রকম জটিল কুটিল দাঁষ্ট এড়িয়ে চলতে হয়। অমিতা এটুকু ভাবিতক বলে মনে নিয়েছে।

এই পাঁচ বছর রেডিও কারখানার প্যারিং-বক্স ডিপার্টমেন্টের দ্বিতীয় সহ-কারী একশ তেতারিশ টাকা মাইনের অমিতা সরকার তার বিগত জীবনের অনেক স্মৃতি মুছে দিতে পেরেছে। কিন্তু পাঁচ বছরের পাঁচ-পাঁচটা বর্ষ এভাবে কেমন করে? অমিতার স্থিরজীবনে অস্থির চাঞ্চল্য যদি কখনো দেখা যায় তো সে এই বর্ষার সময়।

কিন্তু পাঁচ বছর বাদে এই অস্থিরতার পূর্বসূরী অকস্মাৎ নির্মূল একদিন।

শহর কলকাতা বাকি ভেসে গেছে সেন্ন। বেশির ভাগ পথ জলের তলায়। হাট, জল ভেঙে খুব মন্দার গতিতে টাল-গজের বাস্তবতার দিকে চলছিল অমিতা।



সর্বাগ সপসপে ভিজ। আশপাশে আরো অনেকে জল ভেঙে চলেছে—দুপাশের দোকানের ধারে ধারে জলের মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছে অনেকে। দাঁড়িয়ে অমিতাও ছিল, কারণ অত জলে হাটা শক্ত। কিন্তু এত ভিজছে যে বহুজনের জোড়া-জোড়া অন্য দৃষ্ট দৃষ্টি ক্রমাগত তার সর্বাপেক্ষে বিখ্যাত। তাই জল ভেঙেই চলেছে সে—আর, ও চলেছে বলেই অনেকে সপ-সপ পা ফেলে ঘনের আনন্দে সঙ্গ নিয়েছে। ঘরে না পৌঁছানো পর্বত ওদের এই দৃষ্টিভোজ থেকে অব্যাহতি নেই।

হঠাৎ স্থানগত মত দাঁড়িয়ে পড়ল অমিতা। রাস্তার মাঝের আরো গভীর জল ভেঙে বাকবাক একটা মস্ত দামী গাড়ি ঠেলে নিয়ে চলেছে এক দম্পল ছেলে-ছোকরা। দেখলে চোখ জড়োর এমন দামী গাড়ি—জলে এগুন ডুব-ডুব বলেই হরত ঠেলে নিয়ে যেতে হচ্ছে। আর সেই গাড়ির শিঙ্কনের গদীতে গা ডুবিয়ে বসে আছে সময় সরকার।

অমিতার জলে-ভেজা দেহে বাকি বিদ্যুৎ খেলে গেল একপ্রস্থ। সে সত্যি দেখছে কি স্বপ্ন দেখছে ভেবে পাচ্ছে না। সময় তাকে লেখেছে। দু চোখ তার মুখের ওপর চোখের ওপর ধমকেছে একপ্রস্থ।

অমিতা নিস্পন্দ, বোবা।

গাড়ি হার, ঠেলেছে তাদের কি হুকুম করে সময় সরকার শিঙ্কনের কুশনে গা এলিয়ে দিল।

গাড়িটা অমিতার চোখের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল।

আস্ফটিক আনন্দে হৃৎপিণ্ডটা এত আতলাকি করছে সময় সরকারের যে গাড়িটা

এগিয়ে যেতেই স্থির হয়ে বসতে পারছে না আর। এমন আনন্দের ব্যাপার জীবনে আর কি ঘটেছে?

... স্টুডিওতে ঢুকলেই শূন্য গাড়ি দেখে ছবির মেজাজী প্রবোজক মারতে আসবে হয়ত। রাগ করেই নিজের গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল এক্সট্রা বোগানদার সময় সরকারকে। ছবির জন্যে ভিজের মেয়ে যোগাড় হয়নি বলে মাথার আগুন চড়োইল তার। হুকুম করেছিল, বৃষ্টি-ফিল্ম জানি না, সে করে হোক সাত-আটটা মেয়ে অস্তত যোগাড় করে আনতে হবে—ছবির শট কামাই যেতে পারবে না। যোগাড় যদি না হয় তাহলে তোমার একদিন কি আমার একদিন, আগে কেন হৃৎ ছিল না?

সাত আটটা ছেড়ে এই বৃষ্টিতে দূটো বরেনসকালের ফেরেও একত্র করতে পারেনি এক্সট্রা বোগানদার সময় সরকার। প্রবোজকের মেজাজ ইতিমধ্যে ঊষা না হয়ে থাকলে চাকরি পর্বত চলে যেতে পারে তার।

বাকি সময় সরকার পরোয়া করে না আর। প্রাপ্তি যা হয়েছে তা শব্দ সেই জানে।

জলের মধ্যে তেমনি দাঁড়িয়ে আছে অমিতা সরকার। তার ভিজে শরীরের আনাচে-কানাচে কত জোড়া চোখ বিখ্যে এখন, হৃৎ নেই।

এক বর্ষার অমিতার পাওরাটা সম্পূর্ণ হয়েছিল।

আর এক বর্ষার তার হারানো সম্পূর্ণ হল।

রিজ খেলা শেষ।
বন্ধু-বান্ধব বিদায় নিয়ে ফিরে চলেছে। আমি
উঠব উঠব করে গাড়িমাস করছি।
এমন সময় এল বসন্ত।
তাকে দেখেই স্বাগত জানাই।
—হঠাৎ আগমন?
—আগমন নয়, আবির্ভাব!
—আগমন পরে আবির্ভূত হলে কী মনে করে?
—হ্যাঁ, মনে নিশ্চয়ই কিছু আছে বৈকি! আবার
তোমার এই লালগোলার বাড়ীতে আমার কিছুদিন
দখল চাই।
—উদ্দেশ্য?
—উদ্দেশ্য মহৎ। অর্থাৎ কিছুদিন গা-ঢাকা
দেওয়া—
—বলি, ব্যাপার কী? খুন জখম করে এলে না কী?

ডোডা কপাল ডোডা বাঘ ধীরেন্দ্রনাথ বাঘ



—তার চেয়েও বড়—দাম্পত্য কলহ।
—আরে, ওটা যে বহুদায়ক জঘন্যক্রিয়া—
এটা আর কে না জানে?
—হাই কেন বল তোমরা, এটা তার
জারী অন্যায়। ফুটপাতে গয়মছা-পেতে-বসা
কোন এক হতভাগা গণকর নাকি আমার
হরস্কেপ দেখে বলেছে—শিকার করতে
গিয়েই আমার মৃত্যু, তাই যখনই শিকারে
হাই, আমার স্ত্রী কান্নাকাটি করে পাড়া
মাতিলে তেলেন। শব্দ কী এই, আমার

দু-দুটো ভাল সখের বন্দুক কেড়ে নিয়ে
তার নিজস্ব গাড়রেজ আলমারীতে চাবিবন্দ
করে রেখেছেন। কী অত্যাচার, বল ত!
জীবনে আর কোন সখ থাকলো না, মাত্র এই
শিকারে যাওয়ার অভ্যাসটাই টিকিলে
রেখেছি, তাতেও যদি বাগড়া দেন তাহলে
শব্দ “সেই পদপল্লব” ছাড়া আর কি করব,
বলতে পারো?
—হ্যাঁ, পারি বইকী? হার মেজেটীকে

সাক জবাব দিও তুমি বরং
বিষ খেয়ে মরবে, তবু শিকার
ছাড়বে না।

—নাঃ, সে সাহস আমার
নেই, বরং তাতে উল্টো ফলই
ফলবে। আমার কথা শুন
সে নিজেই বিষ খেয়ে বসবে
—হা সেন্টিমেন্টাল। একবার
শিকারের কথা নিয়ে কথান্তর
হওয়ার ফলে একটা কুকান্ড
হয়ে গিয়েছিল আর কী?

—কুকান্ড? সে আবার
কী?

—হ্যাঁ, আমি হঠাৎ এসে
পড়ার সে বস্ত্র, ‘হাও, আমি
মরতে বসেছি, এবার বস্ত্র
পারো শিকার কোরো, কেউ
বারণ করতে আসবে না। এই
দেখ, ঘুমের পিল এতগুলো
খেয়ে ফেলেছি—আর এই
চিঠিটা পড়ে দেখ।’

—কী সর্বনাশ!
তারপর?

—চোখে অন্ধকার
দেখলাম, আর তখনই ভয়ের

চোটে শপথ করে ফেলি যে জীবনে
আর কখনো শিকার করবো না। তারপর
ভাস্করের কাছে গিয়ে ঘটমাক পাম্প করে তবে
ভাঁকে রন্ধে করি। মাঝে মাঝে আমারই বিষ
খেতে ইচ্ছে হয়—কিন্তু সাহসে কুলোয় না।
শিকারবিহীন জীবনে বেঁচে থেকে লাভ
কী?

—তাহলেই বোঝ, মরব বলেই মরা
লাগে না—কোনো বান্ধব খাটিয়ে, বুদ্ধি
দেখিয়ে এ কাজ সম্ভব নয়। সাময়িক

বেয়ালের ঘোঁকিই এসব অবটম ঘটে। থাক, ওসব ব্যক্তি কথা। তাহলে, এখন যা বুকলাম, তুমি আমার কাছে কিছুদিন থাকবে বলেই তোমার বোনের কাছে মিথো করে ছুটি নিয়েছ আর আমাকে তোমার চুরি করে শিকারে নিয়ে যেতে হবে, এই তো?

—যা বলেছ ভাই, একেবারে আমার পেটের কথা টেনে বের করেছ—স্ট্রীকে আমার বক্ত ভয়। একমুহুর্ত যদি আমাকে শ্রুণু মনে কর, আপত্তি সেই—কিন্তু যদি আমার সেই রকম কিছু একটা কেলেকারী করে বসে, তবেই গিরেছি আর কী!

—তাহলেই ভেবে দেখ, বন্ধু, এটা কী আমার পক্ষে সম্ভব? আমার সম্বন্ধে কী ধারণা তবু হবে বল ত? না ভাই, আমি অক্ষম।

বসন্ত বেশ জোর দিয়েই আমাকে বোঝাতে চাইল—

—আমাদের ভেতরকার খবর তো তোমার জানার কথা নয়, অতএব তোমার আর শেষ কী?

—দোস্তের কথা হচ্ছে না, কিন্তু যদি ঘৃণাকরেও জানতে পারে, তবে আমার সেই বিষ খাওয়ার ব্যাপারে এরকম কুশাস্ত ঘটতে কতক্ষণ? আমিই বা তার নিমিত্ত হতে বাই কেন? তারচেয়ে একটা কাজ করা থাক। আমি এদিকে শিকারের বন্দোবস্ত করি, হঠাৎ একদিন তোমার বাড়ীতে গিয়ে হাজির হই। তারপর কথায় কথায় তোমার গিন্নীর সামনেই, তার সঙ্গে শিকারের বিষয় নিয়ে যা বটেছে সংক্ষেপে আমাকে জানিয়ে দেব। তখন আমি বা যলবার ডাকি বুঝিয়ে বলব।

বসন্তের মুখ শুকিয়ে গেল। একটা লম্বা নিশ্বাস ছেড়ে বলল।

—অগত্যা তাই হবে, এছাড়া আর উপায় কি?

সেদিনের মত এখানেই শেষ। এক-সঙ্গেই সেদিন নৈশ আহার—তারপর টানা ঘুম।

পরদিন।

বসন্ত রাজসাহীতে রওনা হওয়ার আগে আমাকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিতে ছাড়ে না যেন আমার কথার নড়চড় না হয়। তার সঙ্গে আর একটি বিষয়েও হুঁসয়ার করে দিলে,

—আর দেখ, আমার তিনি খুব বুদ্ধিমত্তী—তোমার এই কল্মসংক্রিয় যেন ঘৃণাকরেও টের না পান।

হাত তুলে অভয় দিলাম,

—নিশ্চিন্ত থাকতে পার, স্বাদার!

—কী মাগাদ আমাদের বাড়ীতে যাবে?

—এই ধর, ও মাসের এই তারিখে। আমার এক বন্ধু চিঠি দিয়েছিলেন, তার জবাব দিয়েছি—উত্তর পেলেই হাজির হবে। সাক্ষাৎ পরিচয় নেই তার সঙ্গে—তবে তিনি আমার বন্ধুর বন্ধু—সেই হিসেবে আমারও বন্ধু।

বসন্ত বিদায় নিয়ে চলে গেল।

দিন কয়েক পরে বহুবাহিত শিকারের অনুষ্ঠানটি এসে যায়। এসেছে

D.F.O. North Chatra Division-এর কাছ থেকে।

আমিও ঠিক এই চৈত্র পক্ষের শিকারের উপযোগী ছইওয়াল জেলে ডিঙিতে উঠে পড়ি। মাঝরা আমার পক্ষের শিকারে নিত্য সহচর, খুব এক্সপার্ট।

সঙ্গে ছিল দুটো রাইফেল আর একটা W.W. Greener-এর Special Full choked shot gun। বহু পুরাতন ভুতা রতিকান্ত আমার নিতাসঙ্গী। তার দিকে তাকালেই সে বুকত আমার কখন কী প্রয়োজন, কিছু বলতে হতো না।

সেদিনের মত খাবার বড় টিফিন কোরিয়ে নিয়ে প্রভুবে নৌকায় ভেসে পড়লাম। জলপথে চখাচখী, বালি হাস, ন্নাইপ শিকার করতে করতে এগিয়ে যাই। ভাঁটির পথ, তাই নৌকা চালিয়ে যেতে বেগ পেতে হয় নি।

পাকিস্তানে পৌঁছানো গেল রাত আটটায়। প্রায় সাত মাস হ'ল আমাদের সোনার বাংলা শিখান্ডিত হয়েছে, তাই বাতায়ভের বিধানবোধ তখনও তেমন কিছু আরোপিত হয় নি।

বসন্তের বাড়ীটা জানাই ছিল—বড়কুটির ঘাটে নৌকা লাগিয়ে ওপরে উঠলাম। রতিকান্ত আর নৌকার দু'জন মাঝি শিকারের সাজসজ্জা আর ব্যাগ আশুত ব্যাগেজ বয়ে আনলে, শিকার-করা পাখী-গুলোও বাদ পড়েনি। সবাই মিলে গলিপথ ধরে এগিয়ে যাই।

বসন্তকে আগেই বলা ছিল যে আমি নৌকাযোগেই রাজসাহী যাব—তাই নির্দিষ্ট দিনে সে আমার প্রতীক্ষার ঘরে কসেই ছুঁফুঁ করছিল। উত্তীর্ণ সন্ধ্যার অন্ধকারেও তার চোখের দৃষ্টি অপ্রান্ত—আমাকে দেখেই ঘর-কটানো চীৎকার করে ওঠে। ততক্ষণে আমরা তার দরজার দাঁড়িয়েছি।

এদিকে সেই চীৎকার শুনেনি তার স্ত্রী জন্মের থেকে ভীতিবিহলে কণ্ঠে ‘কী হল, কী হল, কী হয়েছে?’ বলে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির—আমাকে দেখেই মোমটা টেনে হুপ করে গেল।

বসন্তের স্ত্রী নলিনী আমাকে দেখে লম্বা পেলেও অপরিচিত নয়—ওরা বেশ কিছুদিন লাগগোলায় আমাদের বাড়ীতে ছিল।

কিন্তু সে উদ্দেশ্যে আমার এখানে আসা—তাতে তার লজ্জাকে প্রত্যয় দেওয়া চলে না। আজ এখানে দস্তুরমত একটা অভিনয় করতে হবে—তাই রহস্য করে বল।

—কী, আমার দেখে হঠাৎ নির্বাক হয়ে পড়লে যে, ভূত দেখলে না কী? আমি আজ তোমার অতিথি। রন্ধনে তুমি দ্রোণদী—এটা আমার শোনা কথা নয়, কতদিন লাগগোলায় ঘাস করে খাইয়েছ—আমি ভূর্জনি। পাখী-গুলো শিকার করার সময়ই তোমার কথা মনে হয়েছে। এবার এই পক্ষীমাংস লক্ষ্যের মত রেখে ফেলে ত'। রতিকান্ত ভাল করে ছাড়িয়ে দিচ্ছে। ন-গাক কাজ মেই—আমার ভুতাটিও চমৎকার গাঁথার—এসো, তার চেয়ে আচ্ছা জ্ঞানো থাক তিমজনেই।

রতিকান্ত বন্ধুকগুলো দেয়ালে হেলান দিয়ে রেখেছিল। সেদিকে নজর পড়তেই বসন্ত-বরণী আঁকে উঠলেন,

—সর্বনাশ। আমাকে পাগল কলবেন না কি?

—না দেবী, পাগল করাটা আমার ঠিক অভ্যাস নেই—বরং ওটা তোমাদেরই একচেটে অধিকার। তারপর বল, বন্ধুকগুলো দেখে এমন শিউরে উঠলে কেন?

বসন্ত মাঝপথেই বাধা দিয়ে বললে,

—সে অনেক কথা—ওর সামনেই বলব—তখন তুমি বুঝবে ভূতের চেয়েও বেশী ভয় এসব বন্ধুক বন্ধুদে।

মুখ হাত-পা বুয়ে বেশ করে ন্মান করে দিলাম। তারপর বোরিয়ে এসে যখন ঘরে ঢুকি, তখন দেখি বসন্ত আর তার স্ত্রী নলিনী আমার প্রতীক্ষার ভুইংরুয়ে বসে।

কিঞ্চিৎ জলযোগ করা গেল, তারপর যেন কিছুই জানি না, এই ভাব দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করি—

—কি বলছিলে তখন বন্ধুক দেখে ভূতের ভয়ের কথা?

সুনিপুণ অভিনেতার মত আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বলতে গিয়ে বসন্তের চোখ দিয়ে সঁতা সঁতা দু'এক ফোঁটা জলও গড়িয়ে পড়ল। তারপর সে আমার ঘরে বসে,

—এরকম পাগলামি করলে আমারই বিব খেতে ইচ্ছে হয়।

আমি নলিনীকে বলি :

—এ কী কথা শুনি আজি বসন্তের মুখে! দেখ, আমারও প্রথমটা শিকারের খুব কড়াকাড়ি ছিল—আর একটা ফাঁড়াও নাকি খাঁড়া হয়ে মাছের উপর ছলছিল। তা সত্ত্বেও যখন গুরুজনকে লুকিয়ে পাঁচিল উপকে, পরের বন্ধুক টোটা নিয়ে শিকার করতে লাগলাম, তখন ভাইসই আমার শিকারের সব বন্দোবস্ত করে নিলেন। কৈ, কিছুইত হয় নি। এমনও হয়েছে, বরং মরতেও বেঁচে গিয়েছি। যেখানে মানুষ বাঁচে না, সে সব স্থানে যেন কোন অদৃশ্য হাত এসে আমাকে ঘিরে রেখেছে। তাছাড়া কোন্টীর ফলাফল সব মেলে না। জন্মমুহুর্তের একটুখানি হেরফের হলে গণনা অশুদ্ধ হয়ে পড়ে। ধর, মনের দৃষ্টিতে বাসু যদি বিষ খেয়েই বসে, সেটা কী তোমার নিক দিয়ে ভাল হবে? মানুষ মরিয়া হলে কী না করতে পারে? তুমি তো বুদ্ধিমত্তী, লেখাপড়াও কল্ল, তুমিই বল!

—কিন্তু কোন্টীর ফলাফল কী কখনও মেলে না?

—তোমার স্বামীর মুখে ত' এখনই শুনলাম, যে সে সময় যেসব ফলাফল লেখা আছে, তার একটাও নাকি মেলে নি—তাহলে এটাই যে হবে, তার প্রমাণ কী? কোন্টী না গুন্টীর মাথা! তবে একটা মজার কথা শোন। একদিন একটা নাছোড়বান্দা জ্যোতিষী আমার হাত না দেখে কিছুতেই ছাড়বে না—বাধা হয়ে দেখাতে হল। সে দেখেন্সে ভুইং কুঁচকে আমাকেই কী বললে জানো? আমার নাকি চরিত্রটা বছর দু'বছরই হবে—জরুর সব সয়ে যাবে।

নিলিনীর উক্তি : এও কী একটা কথা হ'ল :

—সে আরও বলেছিল—তবে যদি কিছু পরসী টাক থেকে খসতে পারেন, তাহলে আমি সে খসন করতে পারি। হ্যাঁ—স্বল্প বিধাতাপ্রবৃত্তিই পারে না; তো—

আমি তৎক্ষণাৎ তাকে সদর দরজা পার করে দিয়ে এলাম।

নিলিনীকে বলি,

—গল্পকারদের ব্যাপারটা দেখলে? কুশিখর সঙ্গে উত্তর নাও—তবেই ত বন্ধব—তুমি তার সুখদুঃখের খাতি সহধর্মিণী। এটা কখনো লেখা থাকে না যে বন্দকের গুলিতে বা কন্যাজানোয়ারের হাতে প্রাণ বাবে—আর কোন ধরনের গণনা করে, এরকম কথা লিখেছে?

নিলিনীর সদয় নিঃশ্বাসে উত্তর—

—সেইকম কিছু লেখা নেই। তবে অপমৃত্যু বা ঐ ধরনের কথার নাকি উল্লেখ আছে। বাথ-ভালুকের শিকারেই ত বেশী অপমৃত্যু হয়।

—কে বললে? অস্ট্রাঘাতে, চোর-ডাকাতের হাতে বা দাঙ্গাহাঙ্গামার হরতো করে অপমৃত্যু হয়। টেন কলিশন, মোটর অ্যাকসিডেন্ট—যদি হবার হয়, কত কী হতে পারে। শূন্যলম্ব, বসন্তের জন্মপটিকার সঙ্গে জীবনের কোন ঘটনাই নাকি মিলে না—তবে এত ভুলটা কিসের? শব্দ তোমার স্বামী নয়, আমারই সে বিশেষ বন্ধু, একসঙ্গে এই এতটুকু ছোটবেলা থেকে ইংকুলে পড়ছি—একসঙ্গে শিকার করছি—তোমাদের বিয়ের আগে বসন্ত পরে হেঁটেও বাথ শিকার করত, কিছু কৈ, কিছু হয় নি তো। আর অপমৃত্যু? অপমৃত্যু তো লাড়ী চাপা পড়েও হতে পারে। হরতো পথ দিয়ে যাচ্ছে—এমন সময় একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটা মেটেই অসম্ভব নয়। তোমার সামনেই তো বললে—বিষ খেতে ইচ্ছে হয়—তবে কেন তুমি বসন্তকে শিকারে বেতে দাও না? এতে অন্য একটা বিপদকে ডেকে আনা হচ্ছে কিনা, সেটাও একবার ভেবে দেখ। আমি অবশ্য ওর হয়ে ওকালতি করতে আসি নি। যদি তোমাদের এইসব হাঙ্গামা জানতাম—তাহলে কী এই পথে পা বাড়াই? ভাবলাম একবার তোমাদের দেখে বাই। তুমি ত কচি খুঁকিটি নও যে এক লাড়ি কথা বলে বুঝিয়ে দিতে হবে। নাঃ নাঃ ওসব পাগলামি করে না। ও আমার সঙ্গে শিকারে যাবে।

বন্দুর হয়ে মিথো বলছি কল মনে মনে মূর্তকাল ভগবানের কাছে মঞ্জনা চেয়ে নিলাম।

—আমি অবশ্য শিকারের পথেই তোমাদের বাড়ীতে এসে পড়েছি—আর এখান থেকেই কলকাতার বাব—সেখান থেকে আবার সোজা জীপ করে হিঁদ্রা করেস্টে। আমার নাতিনী বক্তৃতা সমাপ্ত।

নিলিনী শান্ত কণ্ঠে বলল,

—আপনি এখন সাহস দিচ্ছেন—আর আমার বলার কিছু নেই—তবে আপনার জিন্সের দিতে পারি। নচেৎ আমার এতটুকুও সাহস হত না—কী করব, বলুন। আপনি হাসলেন যে বড়? আমাকে যদি দুর্বলচিত্ত

মনে করেন, হ্যাঁ, একশবার স্বীকার করছি—এর শিকারের ব্যাপারে আমি সত্যিই তাই।

—বেশ, আমারই কেরার অব'এ ছেড়ে দাও—আবার তোমার জলজ্যান্ত প্রতিটিকে তোমার হাতেই পৌঁছে দেব।

পুনরুক্তি করি,

—বরু ছাই, যদি খুশাকরেও জানতাম যে তোমাদের মধ্যে শিকার নিয়ে এত কামেলা, তাহলে কী শর্য এ পথে পা বাড়াতো!

আনন্দাতিশয্যে বসন্ত আমার এ প্রীমতীর চরণে গড় হয়ে প্রণাম করে আর কি!

—করে কী, ছিঃ ছিঃ, লজ্জাসরমের মাথা খেয়েছ না কী?

—লজ্জাসরমের মাথা থাকলে হয়ত চিবিয়ে যেতাম—তবে, বল তো বুচারটে ডিগবাজি খাই—

চাপা হাসি ফুটে উঠলেও, বম্বল দিয়ে মুখ মুছে নিয়ে বলি—

—আজ্ঞা পাগলের আভার এসে পড়লাম দেখছি।

—অ্যান্ডিন আমার কাছে গোটা সংসারটাই হয়েছিল Paradise Lost আর এই মুহূর্তে Paradise regained—আমার নাচতে ইচ্ছে হচ্ছে।

করবোড়ে বলি, একেই ত ইয়া গাটা—গোটা আড়াইমণি শরীর, তারপর ঐ গোদা গোরাপারে নৃত্য করলে ভূমিকম্প সুরু হয়ে যাবে। ঐ অপকর্মটি কোরো না, দেখাই তোমার।

আমি গম্ভীর। ওরা দু'জনেই কোরাসে বেশ উঁচু পদারি হেসে উঠলে।

বসন্ত-প্রিয়া বললে, বাই, এবার উঠি, ওদিকে কন্দুর হ'ল, একবার দেখে আসি।

সে বিদায় নিতেই আমি বসন্তের দিকে সটান দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করে দিলাম।

—ওহে দিলে নাও আমার ওকালতির ফিজ—হাইকোর্টের মামলার তুমি খরচা সমেত ডিক্রী পেয়ে গেলে।

বসন্তের পানখাওয়া লম্বা দাঁতগুলো আর কোনও মুহূর্তে ঢাকতে চায় না।

দু'হাত মাথার ঠোঁকে বন্ধবন্ধক বলি, —জেসও-না-জানা হয়ে যে তোর জন্যে এতগুলি দাঁত কথা কললাম, তার জন্যে তুইও আমার নাম করে উপরওয়ালার কাছে কমা চেয়ে নে।

এটা সেটা গল্পের পর এবার নৈশ ভোজনের ডাক এল। আমরা দু'জনেই উঠে যেতে বসলাম। বসন্তের কথা আজ আর ধামতে চায় না।

সেদিন বাস, ওরফে বসন্ত পক্ষীমাংস বেশ চর্চিতচর্চণ করে গিলতে লাগল চরিত্রশূন্য লুচির সঙ্গে প্রায় চারটে পাখী শেষ করে ফেলল—আর তার স্ত্রীকে সাক্ষী রেখে বিরাট উল্কার ভুলে বললে,

—ওকেই জিজ্ঞেস কর—বৌদিন থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়েছেন, এরকম খাওয়া আমি খেয়েছি কিনা—

—বেশী খাওয়াটা বাহাদুরী নয়; ভাতার বিধান রায় একটা দামী কথা বলতেন—বেশী খাবে, কম খাবে; কম খাবে বেশী খাবে।

নিলিনী—এর মানে?

—অর্থাৎ স্বল্পাহারী হলে বেশীদিন ধরে খেতে পারবে আর বেশী খেলে জীবনের কম দিন খাবার সুযোগ ঘটেবে।

এবার বিশ্রামের পালা।

বসন্তকে এখন বিদায় দিতে চাই,

—দেখ ভাই, আজ গোটা দিনমান বড় পরিপ্রাপ্ত। তুমি আজ আর আমার ঘরে থাকার ব্যয়না ধরো না, তোমার আগ্রমে ফিরে যাও। এখানে থাকলেই গোটা রাত বক-বক করবে—আমার ঘুম হবে না।

বসন্তের গাড়াইট।

আমিও 'লম্বা হয়ে নিদ্রা' দিলাম।

পরদিন ঘুম ভাঙতেই দেখি বগলে এসে দাঁড়িয়ে আছেন আমার নিদ্রাভঙ্গের প্রতীকার।

ভগবানের নাম নেবার আগেই নিলিনীর অভিযোগ,

—কাল গোটা রাত কেবল পাগলের মত শিকারের কথা—আমার ছাই ঘুম হয় নি। আর ওসব ভালও লাগে না। সমস্ত খাটি-নাটি সরঞ্জাম, খাকি পোষাক নিজের হাতেই বেশ পরিপাটি করে গোছানো হয়ে গিয়েছে। কতবার যে সুটকেশ খেলে আর কতবার যে কথ করে—

বসন্ত তাকে সংশোধন করে দেয়,

—উঁ হুঁ হুঁ, নিজস্ব সংবাদসতার রিপোর্ট সম্পূর্ণ হল না। তোমার পারে যেমন তেল দিই, তেমনি আমার বন্দকেরও হাতে, পারে, চোখে-মুখে তেল দিয়ে যে তোলাজ করছি—কই, সেটা তো বলো না—?

—দেবী, আমি আগেই জানতাম, তাই আমার ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

ঝটপট উঠে পড়ি। ভোরের কাজগুলো সেয়ে কিঞ্চিৎ জলযোগ করা গেল।

হাটার সময় নিলিনী স্বামীকে ঠাকুরের প্রসাদ খাইয়ে পকেটের বুম্বলের এক কোণে পুষ্প মহাপ্রসাদ স্বহস্তে ঘেঁষে দিলে। তার মুখ ভয়াবহ গম্ভীর—চোখ ছিলছিল। কাল নেহাত আমার কাছে সম্মতি দিয়ে ফেলেছে বলেই আর কিছু বলার সাহস নেই।

আমি আবার তাকে বুঝিয়ে বলি,

—এ সময় মুখতার কুর থাকে না—

তারপরই আবার উপহার বাহুল্যে তাকে ছাসিয়ে দিই। আমাদের দেশের রাজপুত নারী স্বামীকে নিজের হাতে বম'পরিঃ বৃন্দে পাঠিয়ে দিত। তাছাড়া জিজিবাঈ, জ্যাসীর রাণী, এদের নাম নিশ্চয় শুনেন। ওদেশের তো কথাই নেই—একমাত্র পুরুষের তার স্বা হাসিমুখে দেশের জন্যে লাড়াই করতে পাঠিয়ে দেয়। এই দেখ না, কাল গ্রাহম্পর্শ ছিল, তা জেমেশনেও আমি পদ্মার শিকারে বেরিয়ে এসেছি—কই, কী হল? জানো তো—মধ্য এড়াবি কথা? একবার সেই মধ্যানক্রে আমি বাধও শিকার করছি। মনকে দবর্জ করতে নেই। ও কোন নেশাপত্তর করে না, হে হুজোড় নেই—ঐ শিকারটাকেও যদি ওর জীবন থেকে বাদ দিয়ে দাও—তাহলেই হয়ত অপঘাতে মারা যাবে। ওকে ত' আমি বিলকল জানি।

নলিনী কথাটা শুনে শিউরে উঠল, তারপর হাতজোড় করে একটি অনুৰোধ পেশ করলে,

—দেখবেন, আপনি ও'কে নিজের কাছেই রাখবেন।

—সে বা হয় করব—ওটা আমার ওপরেই ছেড়ে দাও। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

—কী হয় না হয়, খবর পার কী করে?

—ঠিক পাবে—বদী সুবিধে থাকে। না পেলেও আহা! নিম্না ত্যাগ করা না। দেখানে ত' আর চলন্ত পোস্টঅফিস নেই। এখন জাহলে আমরা আসি?

আমাদের সম্মুখে সিঁধদাতা গলপের ছবি রাখা—সশীষ ডাব দেওয়া পূর্ণ কুম্ভটিকে প্রণাম করিয়ে নলিনী বিদায় দিলে। বাবার সময় দই-চিনি মধ্যে দিতেও কসুর করে নি।

রাজসাহী স্টেশনে বাবার পায়ে বাস, বললে,

—আঃ আমায় বাঁচালে। শুব, আমি নয়, এই বন্দুকও আররগসেফের কবল থেকে ছাড়া পেয়ে বেন বেঁচে উঠল। আজ কী এক মজির স্বাদ পেলাম, তোমাকে কী বলে যে—

—সুড়সুড়ি দেবে, তার ভাষা খুঁজে পাচ্ছ না, এই তো?

—বাই বল, তোমার প্রতি ওর এই গভীর নিষ্ঠা দেখে আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে। এই তো চাই!

কলকাতার বাড়ীতে পৌঁছে গেলাম, আর পরদিনই অর্থাৎ ১০ই চৈত্র দপুকের খাওয়া-দাওয়া শেষ করে জীপকারের পেছনে

ট্রেলার লাগিয়ে, তার মধ্যে মালপত্র শিকারের মাজসরঞ্জাম তুলে বেলা চারটের সময় আমরা হাজারীবাগ রওনা হলাম।

জীপ গাড়ীতে চলেছি, জ্বাইভারের পাশেই আসন, জানালার বালাই নেই। একটা চোঁমাখার সিগন্যাল দিতেই ট্রাফিক জমে যাওয়ায় গাড়ীটা থেকে যায়। হঠাৎ আমার পাশেই একখানা ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গেই আচমকা খানিকটা জল এসে আমার জামা-কাপড় ভিজিয়ে দিলে। গালের পাশে দু-চার ফোটা ছিটকে পড়ে।

বৃষ্টি নেই অথচ জল এল কেমন করে? ট্যাক্সিটার দিকে নজর করতাই একটা অশুভ দৃশ্য। এক ভদ্রলোক ট্যাক্সির পেছনের সিটে বসে দু'হাত দিয়ে আঁজলা করে জল ছিটোচ্ছেন—তার পাশেই একটি বাছুর।

বিরক্ত হয়েই বলি,

—কী মশার—মজা পেয়েছেন না কী? বাম্বা জল ছিটোচ্ছেন কেন?

বাবুটি মুখ বাড়িয়ে উত্তর দিলেন—জল নয় মশাই, খাটি গোমূত্র।

—জবে তু কেতাব করেছেন, বলি, মাথায় কিছ আছে, না গোবরপোরা?

ভদ্রলোক সপ্রতিভ—হাসিমুখেই উত্তর দিলেন,

—অজ্ঞে, সেটা মাথায় নয়, আমার সর্বশেষ। এই দেখুন না।

বুকলাম, লোকটি হয় পাগল নয় চূড়ান্ত তান্ডি। কিন্তু ট্যাক্সিতে একটা বাছুর নিয়ে চলেছে, ব্যাপারটা রীতিমত নাটক বলে মনে হয় না কী?

—কোথায় চলেছেন?

—সুড়িওতে, টালিগঞ্জ—হাবি উঠবে।

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ একটা সিনা আছে, সবকিছু গাড়ী। গরু নিয়ে আসার ভার আর একজন পেয়েছে, আমার আমার ভাগ্যে বাছুর। কী আর করি মশাই, ঠেলে-ঠেলে কোলও রকমে ওটাকে ট্যাক্সিতে তুলে নিতেই বা কান্ড—দেখতেই পাচ্ছেন আমার পোষাকের অবস্থা—আর ব্যাটার বেন বহুমূত্র, হয়েছে—নামলে আর থামতে চায় না, তাই আঁজলা করে ছেঁতে ফেলতে গিয়েই তো আপনার গরুর ছিটকে পড়ল। তা মাফ করবেন মশাই, এ রকম অ্যাক্সিডেন্ট কলকাতার রাস্তায় আকচা হতে থাকে—আর এতে আপনার কাজেও কোন বিঘ্ন হবে না, এটা ঠিক জানবেন। সবকিছু গাড়ী বাতায় সুলক্ষণ—বাছুরটা দেখে নিলেন, অর্ধেক সিঁধ এখানেই হয়ে গেল—গাড়ী আর কোথাও এক নজর দেখে নেবেন—তাহলেই পূর্ণ সিঁধ—বোরেছেন কি না?

কৌতূহল বেড়ে যায়।

—তা আপনার কোনও পাটটাই আছে না কী?

কপালে ধামপড় মেরে জানিয়ে দিলেন,

—আর বলেন কেন ম'ডার, দুঃখের কথা। একদিন ছায়ালা বখন হিরোর পাট ক'রু—এখন 'জিরো' ডিগ্রীতে পড়ে আছি।

—তাই বুঝি এখন খোরারি ভাপার উদ্যমে মেতে আছেন?

বোমা ফাটার মত বাসুর দরকা হাসিতে আমিও চমকে গেলাম। রাস্তায় রাস্তায় কখন

ফেষ্টিভ্যাল অ্যাকাউন্ট



আগামী বছরের পূজার খরচের জন্য ফেষ্টিভ্যাল অ্যাকাউন্ট খোলার এখনই উপযুক্ত সময়।

প্রতিমাসে টা. ৫ জমা দিলে আগামী পূজার সময় টা. ৬১.৫০ হবে। পাঁচ টাকার গুণিত অধিক পরিমাণ টাকাও জমা লওয়া হয়।

আমরা সেবার সাথে দিই আরও কিছু

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক

অব ইণ্ডিয়া লিঃ



রেজিস্টার্ড অফিস :

৪, ক্লাইভ হাট স্ট্রীট, কলিকাতা-১

কাজে একটর পর একটা প্রবন্ধ ছুড়তে লাগল।

—২, মোগল পাতান হুন্স হল ফাসী পড়ি ভাতি। হীরো না ছাই, ওল কচু মান—সবাই সমান। বোটা অকাল কুন্সান্ড—

ইতিমধ্যে ট্রিকি সিগন্যাল পড়তেই বসন্তরাসিহ ট্রিকি ছুটে চলে জামার জীপ গাড়ীটা তার পাশ কাটিয়ে হাওয়ার সময় দেখি ভদ্রলোক মুখ ঘুঙ্গিয়ে চোখ বন্ধ করে লম্বুরটাকে দু হাতে জাপটে ধরে বসে আছেন।

জীপ ছুটে চলেছে, বাসও আকাশ পাতাল কতই না কথা মাঝে মাঝে ছুঁড়ে মারে, জামিও এক-আধটা বৃহসই টিপ্পনি দিয়ে চলে।

গাড়ীটা কালি হুন্স নয়। গাড়ীটাও কোন কষ্টের নি, তবে মিস্ত্রী না হওয়ার একটা অসুখ আমাকে ছেঁয়ে ফেলেছে। প্রত্যুবেই হাকারামিগ পৌঁছে গেলাম। সেখানকার হোটেল জামাদের ভোজনপথ সমাধা করে থাকলে গিয়ে হাবতীয় খামসাহাবী কেনাকাটা হল। সে রাতে হাকারামিগেই জামার থাকার ইচ্ছা। কিন্তু বাসের জিদ সেদিনই রাতে হিলিরা ফরাস্টে গাড়ি দেবে।

ডাকে বোকাতে চাইলাম—দেব, কাল রাতে একেবারে হুন্সতে পাই নি, শরীরকে একটুখানি বিশ্রাম না দিলে প্রকৃতিই একদিন তৈরি সূদে-আসলে তার পাওনা আদর করে দেবে।

হিতোপদেশ শোনে কে? হেলিকপ্টারের ডবলই বেতে পারলে সে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

কিছাই করে বসলাম—না, কখনই তা হবে না। কাল জাতি প্রত্যুবেই রওনা হওয়া যাবে। ইতিমধ্যে জাহাভারও গাড়ীটাকে তেল গ্রীজ খাইয়ে নিক, ওলও তো খিদে পায়, নইলে পরিখমো যদি বোকে বসো—তাহলেই ইতো-অন্তঃস্বভা নষ্ট :

তাই হল।

পরদিন। অতিপ্রত্যুবে বেরিয়ে পড়লাম। জার পচাশী গ্রাইল পথ। নর্থ চাত্রা ডিভিসনের ডি এক ওর অনুমতিপত্র আগেই সংগ্রহ করা ছিল। হিলিরা পৌঁছতে আর জার পনেরো গ্রাইল বাকী। ডাইনে কুটিল জঙ্গল। নর্থ কুটিল হলও ওখানকার মানুহরা মোটেই কুটিল প্রকৃতির নয়—বেশ খোলামেলা—সহজ, সরল।

কুটিল জঙ্গল রেজারের ইসপেকশন হাট আছে, সেটাও ডিস্ট্রিক্ট ফরেষ্ট অফিসরের আওতাধীন। আমাদের গাশ ছিল হিলিরা ফরেষ্টের। সেখানে পৌঁছতেই ফরেষ্ট অফিসরের সঙ্গে দেখা। বিহারী ভদ্রলোক—অত্যন্ত অমায়িক ব্যবহার, ঘন অরণ্যের সমুদ্র তার অন্তরে লেগেই আছে। পথিকেরে জানলাম, তিনি আগে ছিলেন এক করদ রাজ্যের কোষাধ্যক্ষ। অত্যন্ত সাধু-জড়িত লোক। তিনি পরের দাস আর করতে চাইলেন না, স্বাধীন ব্যবসায় তার বহু ফরেষ্ট সন্নিভ অর্থ লাগিয়ে দিরোজ্বলেন আর অনেক দিনের চেনা এক বন্ধুকে ওয়ারীং পটনার করে নিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। ভদ্রপদ, সচরাস্তর বা হয়, বন্ধু উও

তার ব্যতিক্রম হন নি। ব্যবসায় বিলকুল চাকটা আত্মসাৎ করে তিনিই সত্যিকারের কোষাধ্যক্ষ হয়ে বসলেন। অগত্যা ভীকি আবার সেই দাসুয়েই ফিরে আসতে হল। এখন তিনি ডি এক ও হয়েছেন।

আমি অপরিস্রব হলেও তিনি তার পূর্বজীবনের ঘটনা সংক্ষেপে জানালেন।

ভদ্রলোক সদাশর ও সদালাপী। শিকার সম্বন্ধে বিশেষভাবে কোনও আগ্রহ না থাকলেও খবর রাখেন অনেক কিছু, আর এ সব কাছাকাছি থাকা পোস্তাতে পারেন।

প্রাথমিক আপ্যায়নের অভাব হল না। চা-জলখাবার সবই পেরে গেলাম। ভদ্রপদ আমাদের খানাহারের কোনও অসুবিধাই হয় নি। সব রকম জিনিসই সংগে ছিল। বিহারী ভদ্রলোক জাভে কাম্বুধ, নাম গ্রীষ্মকাল সঙ্গী, কাজেও আমাদের সহায়, কাজেই শিকারের পূর্বসূচীসে অনেক সংবাদই তিনি দিয়ে দিলেন।

এর পর সহায়জীর সঙ্গে আগামী দিনের প্ল্যান নিয়ে আলোচনা করলাম।

জঙ্গল খেদা করতে হবে, তার জন্যে প্রয়োজন মত হাকোরার দল চাই।

সহায়জীর অল্প বাণী—তার জন্যে ভাববেন না, আমি ফরেষ্ট গার্ডকে আগামী পচিশে দিরোজি হাকোরার খবর দিতে কাল সকালেই বিতারনা জাহির হবে।

অতঃপর বিশ্রাম।

দু-দুখানা কাম্বুধ পেতে ভাতা আমার বিছানা করে দিলে। সারাদিনের পথভ্রমে সুনিদ্রার অভাব হয় নি। বসন্ত তার হোন্স-অলের বাঁধন খুলে শয্যা পেতে নিলে আর মিনিট পচিশের মধ্যেই তার নাসিকগর্জন ক্রমেই উচ্চশ্রমে উঠতে থাকে। আমি আমার বিছানা উঠির পাশের ঘরে গিয়ে শূরে পড়লাম।

ভোরে উঠেই প্রথম হাসিমুখে সহায়জী আমাদের সম্মুখে হাজির।

—নমস্কে।

—নমস্কে সহায়জী, আসুন, আসুন, কখন কেরোতে হবে? হাকোরার দল, এসেছে কী?

রামচন্দ্র সহায় সহস্রা বলেন—হাস্ত হবেন না। প্রাতের কাজকর্ম শেষ হোক, ওরাও এসে পড়ুক, তারপর—

আমাদের তৈরী হতে বেশী সময় লাগে নি।

ফরেষ্ট গার্ড এসে সংবাদ দিলে বিতারের দল হাজির। সহায়জী আমাদের সম্মুখেই দলপাটকে তলব দিলেন।

মিশ্রমিশ্রে কালে গাটীগোটা চেহারার এক জোয়ান এসেই কুণিগ করল।

সহায়জী হেঁকে বলেন,—এই তোরা সব জঙ্গল ঘেরাও করে রাখ, ফাঁকা আওলাজ করলেই বিট আরম্ভ করে দিবি—আমরা এই এলাকা হল।

শিকারের সাজসজ্জায় বসন্তকে বেগ মানিয়ে ছা। হাতের বন্দুকটা একবার শূন্যে তুলে ধরে আবার পেটির ওপরে হাত বুলিয়ে দেখে নেয়, গুলী ঠিক আছে কিনা।

জঙ্গলে প্রবেশ করে একটা সুবিধামত জায়গা বেছে নিলাম। সহায়জীও আমাদের সঙ্গে গেলেন।

ফাঁকা আওলাজ করতেই বিতারেরা হে-হে করে এগিয়ে আসে, কিন্তু কৈ, একটা জানোয়ারেরও সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। তবে কী সব জঙ্গল ছেড়ে পালিয়েছে! আরও দু-দুবার জঙ্গল বিট করা হল, কিন্তু কোন জানোয়ারের পাড়া নেই।

হতাশ হয়ে কাম্পে ফিরে এলাম।

এসেই দেখি, আট-দশজন লোক আমাদের অপেক্ষায় বসে আছে। তাদের জিজ্ঞাসা করায় বললে সেদিনই সকালে তাদের বাড়ীর মেয়েরা কোহবারী জঙ্গলে বিড়ির পাতা কুড়োতে গিয়েছিল, ইঠাৎ একটা গুহার মধ্যে রাখের ডাক শুনতে পেরে ভয়ে তার পালিয়ে এসেছে।

বাক—বাখের খবর তাহলে আছে?

আয়োজন নিশ্চল হয় তো হবে না।

সহায়জীকে বলি,—দেখুন, যা গরম পড়েছে, দিন-দুপুরে হাকোরার করলেও গুহা থেকে বাখ এখন বের হবে না। বেলা পড়ে এলে বিকেলের দিকে ওরা স্বভাবতই বেরিয়ে আসে, সে সময় বিট করলে হুন্স সামনে এসে পড়তে পারে, কাজেই তাড়াতাড়ি কিছু নেই।

সহায়জী আমাকে উপদেশ দিলেন—আজ ওখানে গিয়ে পাকাপোক্তভাবেই মাচানে বসতে হবে।

আমিও সায় দিই,—ঠিকই বলেছেন, বাখের খবর যখন পাওয়া গেছে, নিশ্চয়ই প্রভুর সঙ্গে মোলাকাত হবে।

বেলা চারটেয় সময় আমরা জীপ গাড়ী থেকে ট্রেলারটা খুলে রেখে কোহবারী জঙ্গলের দিকে রওনা হলাম। জীপ থেকে নেমে কিছুদূর হাটপথে গেলে তবেই সেই জঙ্গল পাওয়া যায়। সেখানে পৌঁছতে প্রায় পাঁচটা। সহায়জী জানালেন, আমাদের ভাগ্য ভাল, দিন পনেরো আগেই এক দল শিকারী এসেছিলেন, দুটো মাচান তাদের জন্য তৈরি হয়েছিল, সে দুটো ঠিক তেমন আছে, আমাদের কাজও ওতেই চলে যাবে।

আমি একটা মাচানে উঠলাম, সহায়জী আর বসন্তকে খিটখিট হাসে উঠতে বলি। সহায়জীকে বারে বারে অনুরোধ জানাই,—দেখবেন সহায়জী, আমার বন্ধুর সম্পদ তার আপনায় ওপর রইলো। অবশ্য বসন্তও পাকা শিকারী, চমৎকার নিশানা, তবে যখন ওর ভাব নিয়েছি, একটা দায়ব আছে বৈকি! মনে, একটা কিছু বিপদ হয়ে গেলে, ওর সহযোগী আমার ফাঁসির হুকুম দেবে। আমার সঙ্গে একই মাচানে উঠিয়ে নেওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু একপাট শিকারী হিসেবে ওর মূল্যটাও তো আমাকে দিতে হবে, বিশেষতঃ দুটো মাচানের সুযোগ যখন পাওয়া গেছে, কী বলেন?

সহায়জী বসন্তের দিকে মুখ ফিঙ্গিয়ে বলে ওঠেন,—দি গ্রান্ড আইডিয়া, চলুন ওপরে উঠি, আর কথা বাড়ির লাভ নেই।

একটু ব্যাক ফারার করতই বেলা সাতটা পাঁচটা হাকোরার গুরু হল। হে-হে করে

বিটরের দল ছুটে আসে—হঠাৎ কবাজ চান্দোর মত খাশি খাশি আওয়াজ শোনা গেল। ডাক শুনেই বুকলাম চিতাবাঘ, রয়েল টাইগার নয়। চিতা বাঘ আরও বেশী শেরানা। তাই খুব সতর্ক হয়ে আছি। হঠাৎ অপর মাচান থেকে পর পর চারটে আওয়াজ শোনা গেল। বসন্তের হাতে ছিল ৪০৬ উইনডেস্টার রাইফেল। অবলাম, এ আঘাতে জানোয়ারটা নিশ্চয় মারেন হলেছে।

কিন্তু আমার সব হিসেব ভুল করে দিয়ে তৎক্ষণাৎ একটা চিতা বাঘ দুটো মাচানের মধ্যেকার হালকা জপাল ভেদ করে গলা বাড়িয়ে দেয়।

মুহূর্তকাল কিলম্ব না করে বেহন জানোয়ারটাকে দেখা অমানি আমার হলাপুড় এণ্ড হলাপুড় কাঁধের ওপর তুলতে আমার সেইটা যেটুকু নড়ে উঠেছিল, সেটা বোম্বের বামের নজরে ধরা পড়ে গেল।

জানোয়ারটা ধমকে দাঁড়িয়ে আমার দিকে নজর ফেলতেই আমার রাইফেলের গুলীটা খেলস থেকে বেরিয়ে তার ঘাড়ের তলদেশে হুগুণ আঘাত হানলে। চিতা বাঘটা মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ল।

এই রকম একটা সাফল্যে কার না জন্ম হয়। বিটরের কয়েকজন সেই দিকেই ছুটে আসে। মাচান থেকে নেমে আমি ছুটে চিতা বাঘটার কাছে গিয়ে উল্টে-পাল্টে নিরীক্ষণ করে দেখি, বসন্তের গুলী, যদি বেগে থাকে তো কোথায় লেগেছে। কিন্তু আর কোনও বুলেটের চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেল না।

অবাক হলাম বৈকি! বসন্তের সঙ্গে আমি অনেকবাই শিকারে গিয়েছি, অবশ্য তার বিয়ের আগে। কবাজ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। তার বিরের কিছুদিন পর অবশ্য তার বন্দুক বাজেরাপ্ত হয়েছিল। তাই বলে কী এমনটা কখনো হয়!

পায়ে পায়ে বসন্তের মাচানের দিকেই এগোতে থাকি। হঠাৎ তার কথা নিশ্চই খানিকটা অমাননিক ছিলাম। হঠাৎ একটা গলা-ফাটানো চিংকারে চমকে উঠি, ধমকে দাঁড়িয়ে বাই।

বসন্তের দেখা যায় না। সে কিন্তু আমাকে দেখতে পেরেছে। তার হুঁসিয়ারী আওয়াজ শোনা যায়—বাঘ, বাঘ।

—কোথায়?

—তুমি যে পাথরের পাশে, তার সামনেই।

অবলাম নিশ্চয় জখম হয়েছে, কিন্তু সে ত আরও ভয়ানক পরিস্থিতি! কিন্তু আমার কান্ন থেকে কিছুই দেখা যায় না।

সামনের পাথরটার পেছনে প্রায় দশ ফুট উঁচু একটা টিলা। একটু ঘুরে তার ওপর উঠে দেখি, আমি অঙ্গুরি বোথান দাঁড়িয়েছিলাম, তার দু' গজ দূরে পাথরের এ পাশে একটা চিতা বাঘ হাত-পা মেলে পড়ে রয়েছে। টিলার ওপর থেকে নেমে এলাম।

বসন্ত আর সহায়জীও মাচান থেকে নেমে আমার সঙ্গে বোণ দিলে।

বহুদিন পরে, প্রথম সাফল্যে বসন্তের গল্পসব তার—আমার বরাতে দেখলে? চার-চারটে গুলী করেছি, তার মধ্যে দুটো লেগেছে, একটা বাঁদিকের লাগস—এ, আর একটা গুর কাঁধে। দুটো গুলী মিস হয়েছে। তবে এমন এ্যাংগল থেকে গুলী হলেছে যে, চারটে গুলী মিস করাটাও মোটেই আশ্চর্যের ছিল না।

সবাই মিলে বসন্তের কাছে গিয়ে নজর করতই দেখি বসন্তের বগলা এক তিল তুল হয় নি। গিঠ চাপড়ে তাকে কেয়লাং দিই।

প্রচণ্ড আনন্দে বসন্ত আমার এমনি কঠিনভাবে আগটে ধরে যে, বুকের পাজির বুকি ছেঁতে যায়, মনে হল তার পেশীবহুল লোমশ হাতের ঠেঙ্গী চাপে লোহী ভীমও বুকি চূর্ণ হয়ে যেত।

তার হাতের কঠিন ফাঁস থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিলাম।

লোকজন ডেকে বাঘটাকে তুলে নিয়ে আর একটার পাশে শুইয়ে দেওয়া হল। বাস, মেরেছে পুরুষ বাঘটাকে আর আমার শিকার মাগীটা। মাগীটাই খাড়া, পাকা আট ফুট দুই ইঞ্চি পুরুষটা প্রায় ছ ইঞ্চি ছোট। একবার নয়, কয়েকবার মেপে দেখা হল।

সহায়জীকে বলি,—আমি ভেবেছিলাম, একটাই বাঘ, বসন্ত গুলী করছিল, লাগে নি, পরে আমার গুলীতেই উল্টে গিয়েছে।

—আপনি খুব ভুল করেছিলেন।

—হ্যাঁ, স্বীকার করছি ভুল, কিন্তু শিকারের কেউকেটা মিনিই হোন না কেন, আর হতই বৃষ্টি দেখান, তখন এত ভয় কবাব সময় থাকে না, বাঘ দেখলেই ডাইটাল জায়গায় গুলী চলেতে হয়। কিন্তু একধিক বাঘ যে হতে পারে, এটা আমার মাথার আসে নি।

সহায়জীর মন্তব্য,—এ অঞ্চলে যখন কেউ ফল একটা বাঘ তখন ধরে নিতে হবে এক জোড়া চিত্তে বাঘ।

—বড় আজব দেশ তো, একটার মনে দুটো?

—হ্যাঁ, চিত্তে বাঘের ক্ষেত্রে তাই। কাক আপনার মাত এক মিনিটের মধ্যে দু' দুটো বাঘ খতম করেছেন—এ রকম কবাজ শোনা যায়। আপনার খুব জোর বরাত।

তাকে একটা কাবুনি দিয়ে বলি,—এই প্রীরামচন্দ্র যার সহায়, তার জোর বরাত হবে না ও কী?

একটা দমকা হাসির খাঙ্কায় বসন্তের পর্বতপ্রমাণ বগুটা খেন ফেটে পড়ে—

তাকে ধমক দিলাম,—এই অত হাসে না, হাট ফেল হয়ে বাবে!

উৎকট হাসির ফাঁকে ফাঁকে জম্বুট কথ্য,—তা হোক আপত্তি নেই।

—আমার আপত্তি আছে। কারণ আমি তোমাকে জামিনে খালাস করে এলাম, আমার ফিরিয়ে দিতে হবে না? এখন চল, ক্যাম্প ফিরে বাই, নগিনীকে একটা টেলি-গ্রামে বেড়ে নাও, শুবু বে বহাল ভ'বলতেই আছে তা নয়, তুমি আজ ব্যাব্রিয়ারী, শীঘ্রই হুজুরে হাজির হছ।

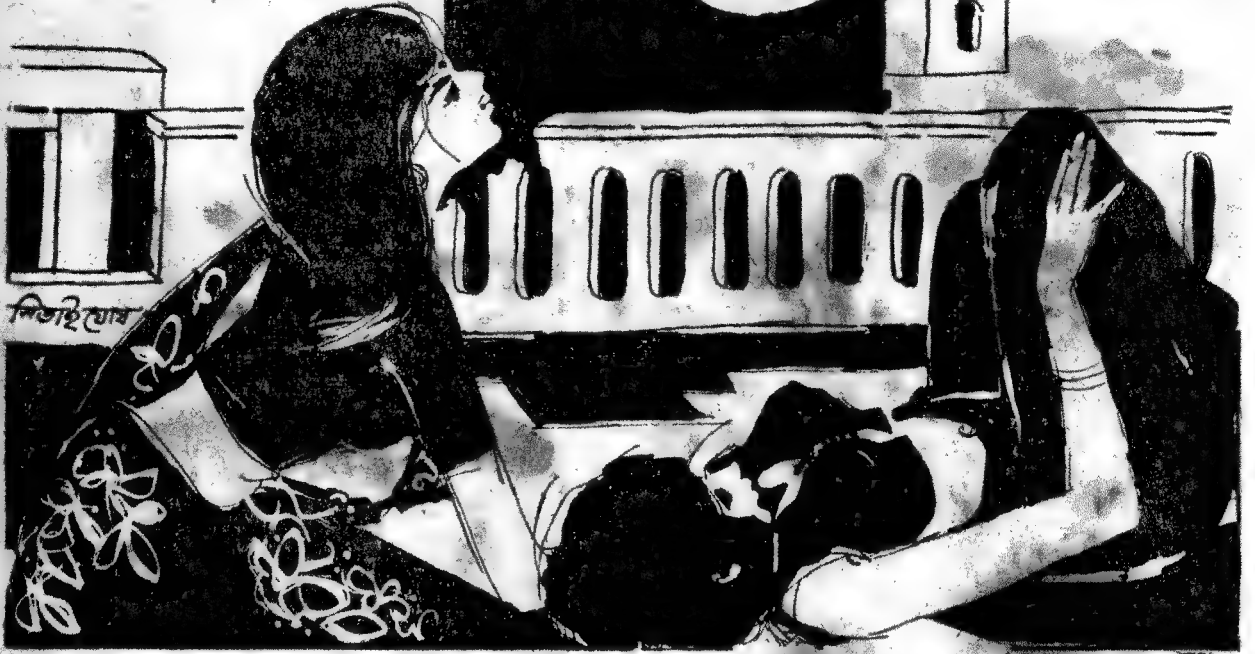
বসন্ত তার সংযত করকলী মাথার ঠোঁকয়ে জবাব দিলে,—বণা আজা করবানি।



০৮/০৫/১৮৬০

দীপ্তি

প্রান্তিক



ছেলের সঙ্গে মেয়ের, পুরুষের সঙ্গে নারীর সেই যে সেই গোপনতম সংযোগ-সম্পর্কটি পৃথিবীর বিদ্যার মাধ্যমে উদ্ঘাটিত হতে আমি বত না বিচলিত শিহরিত হয়েছিলাম, তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী ভীত আর সন্তুষ্ট হয়ে উঠি বৈদ্যন প্রথম এই নিবন্ধ সম্পর্কের প্রথম অভিজ্ঞতা সত্তর করলাম। রহস্যভরা সেই রোমাঞ্চকর সম্মুখি যেন আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। কখনও যে ভুলতে পারবো, মনে করি না। প্রথম অবৈধ দেহবিহার, কেউ কখনও ভুলেছে?

এই আদিমতম সম্পর্ক, কেউ হঠাৎ আবিষ্কার করতে পারে।

প্রকৃতি-নির্মানিত সহজাত প্রবৃত্তি যে কি ধরনের, কেউ কাউকে শেখাতে পারে না। আগ্নেয়গিরি তো লাভা-অগ্নি উল্গারণ করবেই। শলাই-কাঠি জ্বালতে হয় না। সলতে উসকে দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। ক্ষা-স্বভাবশ্রুত, তার বিকাশের জন্য কারও সাহায্য লাগে না। বরষার বর্ষা-ঋতুতে গিরি-নিব্বার আত্মপ্রকাশ করে, কে না জানে। আগুনে যতাহাতি দিলে—

বলতে বাধা নেই, আমরা আবার শহরের মেয়ে।

পৃথিবী-কুখ্যাত কলকাতা শহরের দখিন-অঞ্চলের আধুনিক বিনোদনী আমরা। সকাল সন্ধ্যায় গাড়ুরিয়া লেকের

আলোর অন্ধকারে আমাদের বাওরা-জানো চলে। অধির-অন্ধ প্রেক্ষাগৃহের দর্শক আমরা। যখন কোথাও মিলনের ঠাই মেলে না তখন জোড়ায় জোড়ায় খায়াছবি দেখতে যাই। যদিও ছবি যে কত দেখি, আমরই জানি। আসলে সঙ্গে সাথীটি থাকে, সে ছবির দেখার মত সংযোগ আদপেই দেয় না। বার বার দৃষ্ট করে দেয় মনের একাগ্রতা।

তাই যথাসময়ের আগেই আমরা অনেক কিছু জানতে শিখতে বাধ্য হই।

ইচ্ছা না থাকলেও আমাদের দেখতে শুনতে হয় নানা রকমের অশালীন দৃশ্য আর অসব কথা। শহর অঞ্চলে, বিশেষতঃ কলকাতায়, ছেলে আর মেয়ের যোগাযোগটা যেন ভাত আর ডালের সামিল বলা যায়। শত চেষ্টাতেও শহরে আবার, রন্ধা করা যায় না। শহরের বাসিন্দাদের লজ্জা সরমের বালাই থাকে না। শহরের ধর্মই যেন যেহারা-পনা। এখানে দেখবেন, মেয়েদের পিছ, পিছ, নিলজ্জা ছেলেরা চলেছে। কিম্বা দেখবেন, ছেলেদের আশেপাশে মেয়েরা বোরফেরা করছে। এক চোখের ইঙ্গিত ইশারার সাড়া দিচ্ছে এক জোড়া চটল চোখ। মেয়েদের দেহের জোড়ানি দেখে ছেলেরা হাতছানি দেয়। সবব আহ্বানে নীরব সাড়া মেলে। মৌনতা নাকি সম্মতির লক্ষণ।

পশু আর পাখীতে আছেই। অব্যাহত মিলনে মেতে আছে তারা। কে দেখলো না

দেখলো ফিরেও তাকায় না তারা। আশ্চর্য ওদের যেন ক্রান্তি নেই। ওরা সময় মানে না, অসময় মানে না।

মাটিতে শস্য ফলবেই। দৈনিক সংবাদ পত্র প্রতিদিন প্রকাশিত হবে, যদি মেছা মদ্রাস্ত না বিকল হয়। আমার আপনাই ইচ্ছার অনিচ্ছার স্বাভাবিক নিয়মটা এমন কিছু, পাঁচটে বাবে না। প্রভাত-বেলায় স্ব-উঠবেই। সামকালে অধির নামবে।

সতরং মনে করবেন না, হঠাৎ দৈহিক কামনার অসহ সংশন-জ্বালায় অধীর হয়ে মিলনসুখের অভাবে আমি কোন কল ভোগ করছি। আমার সময় এলো, যখন কৈশোরের অভিজ্ঞতা-অজ্ঞানের পরে আসল খেলায় ডাক পড়লো। সময়ের চেয়ে বল উচিত। দুঃসময়। অবশ্য সেই ছেলেবেলা থেকেই এই খেলার মহলা চালিয়ে আসছি আমি। এবং বলতে বাধা নেই, আমরাই মত পৃথিবীর আরও লক্ষ লক্ষ মেয়ে। যদিও পরে জেনেছি, সে-সব আনাড়ী খেলার কোন ভবিষ্যৎ ছিল না। কেননা, মহলা চলতিত রাহ, আসল অভিনয়-রজনী যে আসবে, এমন কোন প্রতিশ্রুতি একটি ছেলেও কোনদিন দেয়নি। সেই যে সেই খেলা। কোন এক কুন্দ-ঘরের যে-খেলা খেলে পাকাপোস্ত পুরুষ আর রমণী। আমাদের শৈশবের সেই বর-বৌ খেলা।

তখন আমি সব মনোযোগ দিয়ে পেরিয়ে
কলসে ঢেকেছি।

আমার বয়স তখন বোলা পেরিয়ে
গেছে—যতদূর মনে পড়ে। দাঁকিল কলকাতার
তখন আমাদের বসতি-অঞ্চলটার আমাদের
সমবয়সের অসংখ্য ছেলেকের দেখা মিলতো।
তারের দেখতে প্রায় একই ধরনের। জলা
বায়, তারা প্রত্যেকেই প্রায় ঝড়-ঝেঁড়া।
হাস্তার এখানে সেখানে, মোড়ে চৌমাথায়,
অন্ধ-গালির মধ্যে তাদের দেখতে পেতাম
বিচরণ করছে সহাস্য। নয়তো চারের
দোকানের সামনে আঙা জমিয়েছে। সিগারেট
ফুৎফুৎ করে আগাছার মত বাড় তাদের।
জাখা-জাখী। হঠকে রক্তের গোবাক পরনে।
জামা আর পাজিমার বিচিত্র কাটছাটি রঙ।

আমরা মেয়েরা তখন ইখম জোঁগাতাম।
ফার্নেসে আগুন ধরিয়ে দিতাম। কল্লা
ঢালতাম ইখমের বরলারে। প্রয়োজনের
অতিরিক্ত উত্তপ্ত হয়ে উত্তপ্ত হাড়িয়ে দিতাম।
কোন ছেলের যদি কোন অশ্লীলতার ঘরে মিলে
যাওয়ায় মনোযোগ থাকত। আমরা, যোম্যাগিতা
আমরা তাকে অবলীলাস্বপ্নে সপা দান করতাম।
অন্তিমাবকরা জানতেন, আমরা পাঠা বইয়ের
সম্মুখে বেরিয়েছি। নিজের মনোভাব মিলন-
খেলার মনোনিবেশে কেউ বাধা দিলে
ছেলেরা তাকে সুস্থিত বিশ্লেষণের ভর দেখাতো।
মেয়েরা চুপিসাড়ে জানিয়ে দিতো, নিরুদ্দেশে
যাবে। শেকড়ের তলা হারিয়ে যাবে। যখন
হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা।

তখন আমাদের বসন্তের হারণা, মিলন-
লালার কলাবিন হতে পারলেই আমরা
জায়ে উঠতে পারতাম। ভলবাসার ছল-
চাতুরী, দাঁকিল সুখভোগের অসংখ্য বিপদ-
আপদের নিরোপক নিরুদ্দেশে বিজ্ঞানসম্মত
উপায় কটা যে যত শিখতে জানতে পারত,
তার তত বেশী কদর আর মানোন্মত্ত হত।
আদর ভোগ করবে সেই।

এক কথায় এই অগ্নি-মল্লয়ার দিনে
তাই তত দূর আর কদর বৃদ্ধি হবে, যে
জানবে তৃতীয় জন্মের আগমন-আশঙ্কা কোন
কোন উপায়ে ঠেকানো যায়।

অবশ্য আজও বেমন আছে, তখনও
তেমন কোমায়ের বহুত্ব মূল্য ছিল। অন্য-
বাদী জন্মের দাম চিরকালই বেশী। বলতে
লজ্জা নাই, আমাদের দলের মধ্যে প্রায়
সবাইই স্বাম-কাল-পাতের সবিশেষ প্রভাবে
কুমারী হারিয়েছিল। যদিও আমরা ভান
করতাম এমন, যেন আমরা বাগিচার সপা-
ফোটা ফুল। আমরা টাটকা, অনায়াস।

সত্যি কথা বলতে কি, ছাত্র-স্বাধীনতা
অধিকার ঘরে যাওয়ার ডাক পড়লেই প্রথমে
না যাওয়ার চং দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত ঠিকই
গিয়ে হাজির হতাম। বেশ মনে আছে,
বঙ্গবন্ধুর সাংসদবলিতে যেন একটু বেশী
বেশী ডাক পড়তো। আমাদের মধ্যে কে
কত বেশী অতিক্রম, হাতে-কলমে প্রমাণ দিয়ে
ফিরে আসতাম। ফিরতি পথে পরিধানের
শাড়ীতে বিন্যাস টেনে, অচিলে মুখে
কেলতায় মুখে-চোখে ফুটে-ওঠা ক্রান্তি ও
স্বাধীনতার কাল-ছায়া।

আমরা একসাথে এক মিথিলা-কালো
লম্বায়—

এই রকম এক খেলার শেষে আমি যখন
প্রায় টলতে টলতে বাসার ফিরে আসছি,
তখন এক বাড়ীর সদর-দরজায় তার দেখা
পেলাম। খানিক আগে বর্ষা নেমেছে, তাই
হাস্তাটা জন্মানবহীন। সত্যি এক ঘটনার
নারিকা আমি, সাক্ষীও আমি, তাই তখনও
বুকটা আমার কেঁপে কেঁপে উঠছে।
বিবেকের দংশন অনুভব করছি প্রতি ক্ষণে।
পা টলছে নেশাচ্ছত্রের মত।

দেখলাম, দুয়ার আগলে দাঁড়িয়ে আছে
সে। ইতিমধ্যে দেখেছে কেন পাশব দৃষ্টিতে।
অর্থাৎ যদি কোন দিকভ্রমে ঘুরে, শিকারীর
দেখা পাওয়া যায়। হয়তো সে ধরা দিতে
চায়। যোগ্য শিকারীর হাতে আত্মসমর্পণ
করবে। কোন অজ্ঞানের লক্ষ্যে বিশ্ব হতে
চায়। দেখলাম, মাঝে মাঝে আমাকে সে
দেখছে, আড়-নয়নের বাঁকিম-কটাক।

সেও একটি মেয়ে। আমিও তাই।

মনে পড়ে, প্রায় শৈশব থেকেই দেখছি
তাকে। আমাদের পরস্পরের মধ্যে কোন
বিন্দুতা না থাকলেও আমরা উভয়ে চিনি
উভয়কে। মেয়েটির নাম মীরা। আমি বেশ
বড় হতে পারি, এত সোজাসুজি স্পষ্ট-স্পষ্ট
সে কোনদিন তাকায় না আমার দিকে। কেন
কি জানি, তার চাহনি, অগাধপাণী আমার
কেন ভাল লাগলো না। যতই হোক, আমি
তো ছেলে নয়, মেয়ে। আমাকে আকৃষ্ট
করবে কেন মীরা? দেখলাম, সে দুই পৃষ্ঠ
হাত পিছনে তুলে, বুক উঁচিয়ে এসো-
চুলের আলগা খোঁপাটা বধ্যস্থানে রাখতে
চেষ্টা করছে। তখন তার পেট-কটা খাটো
জামাটা আমার চোখে পড়লো। ছাপানো
মুদ্রার জামা। যেন নীল রং-এর জামার সাদা
সাদা ফুল চোখে পড়লো মীরার অনাবৃত
কঁকাল।

হঠাৎ আমার স্মৃতিতে ভেসে উঠলো
অশ্লীলতার সেই ঘটনানা।

মনে পড়লো, মিলনখেলার একটি
শিহরিত মুহূর্ত। কামনার আবেগভরা
একেকটা দৃশ্য। একবার ভাবলাম, মীরাকে
বাথলে দিই সেই অশ্লীলতার ঘরের পথ-নির্দেশ,
ঠিকানা। ভাবলাম তাকে জানিয়ে দিই, সেই
ঘরে আছে কত সুখ, উত্তাপ, বৈচিত্র্য। সেই
সব ছেলেকের মতগলি ভেসে উঠলো
স্মৃতিতে। তাহার-বস্ত্রের হোতা তারা।
আমরা অসম্মিতা অতিথি। মীরাকে সেখানে
পৌঁছে দিলাম। দুই-চার লম্বায় সেখানে
বাসায়ত করলে, আর থাকবে না এই ছট-
ফটানি। মতঙ্গল না ফুলের বৃকে ঠাই
পাওয়া যায়, ততক্ষণই ভ্রমর গজেন তোলে।
মধুর আশ্বাস পেলে আর থাকে না কোন
অস্বস্তি, চাপল্য। তখন শব্দই নিরবধি
মধু পান করো।

আমার মনে পড়লো তাপসকে।

লুকোতে চাই না, সেই আমার দোসর।
যাকে বলে মনের মানব। আমার নিকটতম।
আমরা দুজনে চাই দুজনকে, অদম্য
আকাঙ্ক্ষার লম্বা দেহারা চেহারা তাপসের।

হারালো ফর্সা মুখেটিকালোনাক। বিস্তৃত
কপালের দেব-প্রাপ্ত থেকে পেছন-তোলা
আলবার্ট চুল। সামান্য কৌকড়ালো। তার
দড় আর শর হাতের মতোয় তামি যখন
ধরা পড়ি, তখন আমি যেন ধীরে ধীরে
সকল শক্তি হারিয়ে ফেলি। তার বলিষ্ঠ
বাহুর বন্ধনে পড়িবে বাথার পরিবর্তে বা
পাওয়া যায় তা ভাবায় যেন বাস্তব করা
যায় না।

বাসনা হয়, তাপসকে জেকে এনে
একবার দেখিয়ে দিই মীরাকে। চোখে
দেখা না দেখলে মত মতের কথা হয়তো
বিশ্বাস করবে না তাপস।

—কিগো ভর পেয়েছো নাকি?

প্রথম কথা বললে মীরা। পরিহাসের
হাস্যরসের তার মুখে। মিথিলা কথার সুরে।
কথা বললে কেন লুকোতে গম্ভীরকণা।

—ভয়! আমি বললাম শুনুনো হেসে
বললাম—ভয় ভয় পেতে যাবো কেন?
তাছাড়া ভয় শিকারীর মত মেয়ে আমি
নই।

—মনে হচ্ছে, তুমি যেন হঠাৎ, সাপ
দেখতে গিয়েছো।

আমরা কথা বললে মীরা। তার খাটো
জামার একটা ফুলে-গাওয়া বোতাম অটুত
থাকে লাড়ির ভেতর দুই হাত চালিয়ে।
বোতাম অটুত না ফুলেই ঠিক করা যায় না।
যেন তার বৃকে আছে কি এক মজার
দুন্দুলা সম্ভার। লুকোতে চায়, না দেখাতে
চায় কে জানে।

হাসির জের টেনে আমি বললাম,—সাপ
দেখলেও ভয় পাই না। ওয়ার দেওয়া লোক
আছে আমার কাছে। বিশ্ব-পাথর আছে।

মুখে আঁচল চেপে খিল-খিল হেসে
উঠলো মীরা। নকল লজ্জার জন কর না
হাসতে হাসতে। বললে,—এসো না একদিন
বিকলে আমাদের বাসায়। খানিক গল্প
করা যাবে।

হ্যাঁ না, কিছুই বললাম না আমি।
মীরাকে পাশ কাটিয়ে জামার পা চালিয়ে
আমি। কী লজ্জা তখনও আমার পা দাঁতি
থেকে থেকে কাঁপতে ঠক-ঠক। চোখে যেন
একবার অতি উজ্জ্বল আলো, একবার ঘন
ভ্রমর দেখছি। দেহ যেন চলতে চায় না
আর। বিছানায় এলিয়ে পড়তে চায়।

পরের দিন সন্ধ্যায়, তাপসকে সন্ধ্যায়
আনতে বাধ্য হলুম।

এমন একটি মোহনীয় বিচিত্র পাখীকে
দেখবে না শিকারী তাপস, তা কখনও হতে
পারে না। আমি জানি, এ যেন কল্লি
মীরা দুয়ার-মুখে নিশ্চয়ই থাকবে। হাস্তার
চলন্ত পথিকদের সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে
দেখে। আর জোরান ছেলে দেখলে তো
কথাই নেই। মীরা, আমি কত সন্ধ্যায় লজ্জা
করেছি, নওজোহানদের দেখলেই তার দেহ-
উপচার দেখাতে সচেষ্ট হয়। সন্ধ্যায়
বেসামাল বন্ধুত্ব ঠিকঠাক করতে থাকে।
তার অনাবৃত কঁকাল তখন দৃশ্যমান হয়।
দেহেখা যেন স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।

দেখলাম, মীরা দরজা ছেড়ে রাস্তার
নেমে দাঁড়িয়েছে। সে যেন মৃত্ত বাতাস
পাসের লোভ সামলাতে পারেনি। সবুজ
বাসে আচ্ছাদিত ফাঁকা জমিতে পায়েচরী
করছে মৃত্ত পাখীর মত। ঘন লাল রঙের
শাড়ী পরছে। মীরা যেন কোন জাদুতে
জানতে পেরেছে, এক নাগর আসছে আজ
এই পথে।

—ও আবার কে?

চলতে চলতে চাপা গলার প্রশ্ন করলে
তাপস।

—কেন? কে! আমি জানি না।
চিনি না।

আমি বললাম স্নেহ না-জানার ভঙ্গিতে।

—ঠিক যেন একটা মুরগী। একে ভো
জবাই করলেই হয়। দেখতেও বেশ পুরুন্দু।

শব্দ শব্দে বললে তাপস। ফিস-ফিস
কথা।

সব দিলাম আমি, অন্যদিকে চোখ
ফিরিয়ে। বললাম—মুরগী নয় শুধু। হ্যাঁ,
জবাই করলেই হয়।

কেন যেন একটা ব্যাপটা দিলো মীরা,
পিছনপানে। মাথাটা সজোরে পিছনদিকে
হেলানোয় সঙ্গে সঙ্গে তার গ্রন্থিবিহীন
এলো চুলের খোঁপাটা লটকে খসে পড়লো
পিঠের পরে। এবং অভ্যাসানুযায়ী মীরা দুই
হাত পিছনে তুললো। বুক চিত্তরে উঠলো
কথাম্ব। মিরাত্ত কাটবেল জেতে পড়লো।
মীরার কেশরাশি অস্বাভাবিক হলেও চুলের
মেষা আর প্রশ্ন সত্যিই প্রশংসনীয়। তার
চোখ দুটি বড় বড়। ডীক্‌ নাসিকা। রাস্তার
ল্যান্ডস্কেপের আলোর দেখা যায়, মীরার
গায়ের রঙ শ্যাম। গঠন অতিসঠি।

সে আমাদের দেখছে, বিনা শিখায়।
আমরা যেন অন্য গ্রহের বাসিন্দা। একটু
সংশয় নেই মীরার। মূখে ফুটে উঠছে
জলেহতরা অর্ধ-পূর্ণ মিটিমিটি হাসি। তার
জোখের চাহনি দেখলাম তাপসের মূখপানে
থাকলে গেল। উকলল আমাদের মনে যেন
এক সন্দেহের সোঁতা লাগে। তাপসকে সঙ্গে
না অনলেই মীরা ভাল। আমার তাপস
হাঁদ বেহাত হয়ে যায়। তখন আমার আর
এক তাপসের সম্মানে থাকতে হবে ভাঙা
মনে।

—কি গো, বাসায় ফিরছো না কি?
মিষ্টি সুরে বললে মীরা। বললে,—এত
ভাড়া কেন? কাছে এসো, দুটো কথা বলি।

তাপস দাঁড়ালো না। এগিয়ে চললো।
যার করেক কাশলো ঝক-ঝক। যেন সকল
কাল। আমার অজ্ঞাতে আমি তখন দাঁড়িয়ে
পড়েছি। মীরার মূখোমুখি। শুধু কাছ থেকে
দেখছি মীরাকে। হাকে বলে খুঁটিয়ে দেখা।

—এসো না আমাদের বাসায়। একটু
আড্ডা জমাই।

কথা বলতে বলতে অতি-পরিচিতের মত
আমার একখানি হাত সে নিজের হাতে
ধরলো। কোন উত্তর শোনার অবকাশ নেই
তার। আমাকে টেনে নিয়ে চললো বাড়ীর
ভেতরে। মীরার নগ্ন নগ্ন বাহুর ওলার
আমার হাত। পরশে অনুভব করলাম, দেহ

শুধু তার নগ্ন নয়, পরিপুষ্ট, সুগঠিত।
আকৃতি যেমন, গঠনও তেমন। আকর্ষণও
অনেক মধুর।

আমাকে টানতে টানতে একটি ঘরের
মধ্যে নিয়ে গিয়ে লম্বা এক সোফার ঠেলে
বসিয়ে দিলো। ঘরে মৃত্ত সব পুরানো
আসবাব। ছিন্ন-আবরণের ফাঁকে ফাঁকে
সোফার আভ্যন্তরীণ রূপটা চোখে পড়ছে।
ঘরের বিজলী ভালোয় লেড নেই। আলোটা
সুইচ টিপ জ্বালিয়ে দেয় মীরা। বেতের
একটা মোড়া টেনে বসে পড়ে আমার
কাছাকাছি।

ঘরের এটা সেই দেখতে থাকি আমি।
কাঁচাভা পান্না দেওয়ালের। তেপাল্লাতে
মাখাতার আলোর ফলদানি। রজনীগন্ধার
শুকনো ডাঁটি কয়েকটা পুষ্পাধারে।
দেওয়ালে চলত সালের ক্যালেন্ডারে কম্বর
কে এক সিন্ধবসনা সুন্দরী তারকা। দুটো
তিনটে সেলাইয়ের নমুনা টাঙানো। সাদা
কাপেটে পশমের কাজ। কালো বনাতে
রূপালী জরির তাজমহল। হাবির কোণে
লেখা 'মীরা'।

—মনে হচ্ছে, তোমারই হাতের কাজ।
চমৎকার হয়েছে। শিখেছো বুঝি কারও
কাছে?

ঘরের আড়ল নীরবতা ভঙ্গ করলাম
আমি। প্রশংসার দৃষ্টি আমার চোখে।

যেন লজ্জারাগ ফুটলো তার মূখে।
বললে,—আর হাসিও না তুমি ভাই। হাতের
কাজ না ছাই। সেলাই আমি ভাল জানি
না। চেষ্টা করছি। তাই হয়তো শিব গড়তে
বদীর হয়েছে।

—না না, বেশ ভালই হয়েছে।

তবু আমি বললাম। যদি সে উৎসাহ
পায়, এই আশায়।

অন্য প্রশ্নও ভেলে মীরা। চোখে যেন
তার কোতুল দেখা দেয়। মীরা বলে,
কোথায় গিয়েছিলে? ম্যাচিনি শোয়ে সিনেমা
দেখতে? তোমাকে যেন বড় ক্রান্ত লাগছে।
গরম চা খাবে এক পেয়লা?

আমার মূখে কথা জোয়ার না। লজ্জা
লুকিয়ে ফেলতে চেষ্টা করি। সত্য ঘটনা
ভোঁ বলা যাবে না। একটা কিছু মিথ্যা
বলতে হবে। বিবেকের সংশয়কে উপেক্ষা
করি আমি। বললাম,—সিনেমায় নয়।
গিয়েছিলুম এক বান্ধবীর কাছে। একখানা
নোটবক আনতে। পরীক্ষার শুধু দেবী নেই।
বান্ধবীর দেখা পেলাম না।

—খাও না ভাই এক কাপ চা।

আবার বললে মীরা। কথার শেষে
আমার পাশে এসে বসলো। একই সোফায়।
আমার একটি হাত টেনে নিলো নিজের
হাতে।

—তোমাকে আবার কষ্ট করতে হবে।
থাক, চা আর চাই না।

আমি বললাম, লৌকিকতা দেখিয়ে।

সোফা ছেড়ে উঠে পড়লো মীরা।
বললে—আমাকে কিছুই করতে হবে না।
শুধু বলে আসবো পিসীমাকে। এখন
পিসীমার চা খাওয়ার টাইম।

কথা বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে
গেল সে। আমি একা বসে থাকি। জানলার
বাইরে দেখতে পাই, রাতের কালো আকাশ।
দুটি চারটি তারা সবে দেখা দিয়েছে। দীপ-
শিখা যেন, মিট-মিট জ্বলছে। তাপস এখন
কোথায় গেল কে জানে। হয়তো আমার
পুরে অশুশী হয়েছে সে। তাকে ছেড়ে দিয়ে
মীরার ডাকে সাড়া দিয়েছি আমি।

—পিসীমার কাছেই থাকি আমি। বরজ
মানুষ তিনি। বিধবা। সংসারে কেউ নেই
আর। আমাকে মানুষ করেছেন।

ঘরে এসে কথা বলতে বলতে আবার
সোফায় বসে পড়লো মীরা। এখন কথা
বলছে, যেন একটু চাপা সুরে। থামলো না।
বললে,—কলকাতায় খাম তিনেক বাড়ী আছে
পিসীমার। ভাড়া দিয়েছেন। সেই আয়ে তাঁর
দিন চলে।

প্রথম মৌখিক আলাপ, অথচ মীরা ভাব
দেখায় এমন, যেন কতকালের পরিচয়।
আমার কাছে তার অবস্থা কিছু নেই। কথা
বলতে বলতে আবার আমার একটি হাত
তুলে নেয় নিজের হাতে। যেন খেলার
সামগ্রী আমার হাতখামি। মীরা লোফলসুফি
করতে থাকে হাতটি।

—সবই তবে তোমার? তোমাতেই
বর্তাবে পিসীমার ভূসম্পত্তি

সানন্দে বললাম আমি। দেখলাম, তার
মুখভাবে কোন পরিবর্তন আসে কিনা।

—তা বলতে পারো। আমি অবশ্য
আশা করি না কিছু। আমার ভাই তেমন
লোভ নেই টাকা-কাড়, সম্পত্তিতে। মীরা
বললে হেসে হেসে। খানিক থেমে আবার
বললে,—পিসীমা তো বলেন, বিষয় তো
নয় বিব। থাকলেই জালা।

—না থাকলেও চলে না। বিশেষত
মেয়েদের, বাদের কেউ দেখবার থাকে না।
যাঙ্গ সহায়সম্বলহীন নিরুপায়।

আমার কথায় যেন কান নেই মীরার।
কি যেন ভাবছে সে। কথা বলছে, নেহাৎ
না বললে নয়।

—তোমার সঙ্গে থাকে দেখলাম, সে
তোমার কে হয়? ভাইটাই নাকি? সরাসরি
প্রশ্ন করলে মীরা। ওৎসুকা প্রকাশ করলে।

মনে মনে হাসলাম আমি। ভাবলাম,
আবার একটা মিথ্যা কথা বলতে হবে। আমি
কণেক খমকে থাকি যেন। কথা বলতে
বেশী দেবী হলে পাছে মিথ্যা ধরা পড়ে
যায় এই আশংকায় বলে ফেললাম—দুর্-
সম্পর্কের ভাই।

—ছেলেটি এমনভাবে আমার দিকে
দেখাছিলো, আমি তো লজ্জায় মরি। বতই
হোক আজকালকার ছেলে তো, বাধা নিষেধ
মানতে চায় না।

কথার শেষে ঈষৎ হাসলো সে। শব্দ-
হীন হাসি। মাথাটা হেলিয়ে দিলো সোফার
পাশে। আমার হাতটি রাখলো নিজের কোলে।
অনুভব করি, মীরার দেহ যেন উক। হাতের
তাল গরম। দেখলাম অন্যান্য মেয়েদের
তুলনায়, মীরা অনেক বেশী বাড়ন্ত।
বোবনের রসে যেন টলটল করছে তার
দেহটা। কাঁঠা নেই কোথাও। নগ্ন নগ্ন।

—যা বলেছে। আজকালকার ছেলেরা ভীষণ তলাপা হয়। লজ্জার বালাই থাকে না তাদের। যা মন চায় করে।

কথায় যায় দিল্লাম আমি। খানিক থেমে থেকে বললাম,—ওদের কাছ থেকে যত দূরে থাকো যাক ততই ভাল।

মীরা বললে,—কিন্তু ওরা আবার চুব্বকের মত টানতে পারে। নানা রকমের আর্ট জানে ওরা।

আমি বললাম,—ওরা সবই পারে। এমন কি খন করতে।

—মীরা—আ। মীরা—আ-আ-আ—

ভাঙা ভাঙা কন্ঠস্বর ভাসলো। কাছাকাছি কোথায়। হয়তো পিসীমা ডাকছেন, অনুমানে বোঝা যায়।

—বাই পিসীমা—আ-আ—

অনিচ্ছায় আমার হাতখানি ছেড়ে দিয়ে উঠে পড়লো মীরা। সাড়া দিলো নম্র মিষ্টি স্বরে।

পিসীমা বললেন,—চা হয়ে গেছে। নিয়ে যাও। বন্ধুকে যেন শব্দ চা দিও না। খান কয়েক বিস্কুট দাও। ঐ তেকাটার আছে।

মহিলার কথা কানে আসে। সেকালের মানুষ। আদর আপ্যায়ন জানেন। মেনে চলেন আতিথ্য।

চা-পর্ব শেষ হতে শুন্য পিরিচ-পেয়লা লেখে আসে মীরা। ফিরে এসে আবার বসলো আমার পাশে। আমার গা ঘেঁষে। সহাস্যে বললে,—তোমাকে কিন্তু ভাই আমার ভাল লেগেছে। কি মিষ্টি তুমি! দেখলে কি ইচ্ছে হয় জানো?

—কি?

—যদি অভয় দাও তো বলি।

—মিড্রয়ে বল।

—ইচ্ছে হয়, তোমার ঐ মিষ্টি গালে চুম্ব খেতে।

সত্যিই কথার শেষে আমার গালে একটি আলতো চুম্ব খায় মীরা। বললে,—দেখছি তোমাকেই আমার নাগর করতে হবে। আমি ফুক, তুমি কখা হবে। আমি মজুন, তুমি লয়লা হবে। আমি, রোমিও, তুমি আমার জুলিয়েভা। কি বল?

আমি নির্বাক থাকি। ভেবে পাই না, এই নিলম্বতার কি উত্তর দেবো। তামাসার কথা শুনলে যেমন হাসে, আমিও তেমনি হাসতে—থাকি।

—মৌনঃ সম্মতি লক্ষণঃ—

মীরা বললে, আমাকে এক হাতের বেগুনে জড়িয়ে। আশ্চর্য, মীরা সংস্কৃত ভাষা জানে নাকি! আরও যে কত কি জানে কে জানে।

সত্যিই বেশ খানিক আমি যেন ভুলে থাকি তাপসকে। সেই অশ্বকার ঘরখানা, যেন আমার স্মৃতিপট থেকে মুছে যায়। ভুলে বাই, পাড়ার জোয়ান ছেলেরা। তাদের চুপি চুপি কথায় প্রেম-নিবেদন। তাদের অত্যাচার, উৎপীড়ন, বলপ্রয়োগ।

মীরাকে এখন এই মুহূর্তে যেন মনে হয় বন্ধা-বিদ্রোহ। স্মৃতিমতী বিদ্রোহ। সে যেন কানায় কানায় পূর্ণ ঐদার আর বদন্যতার প্রতীক। সে যেন আমার কাছে

এক কম্পনাতীত। একটি স্বপ্ন। আগেই বলেছি, তাপসকে এখন আমার আর মনে পড়ছে না।

—শুনলে বিশ্বাস করবে না, তোমাকে এখন আমার মনে হচ্ছে, একটি ছেলে। কথা বলতে বলতে আমার গ্রীবায় আবার একটা চুম্ব খায় মীরা। আবার একটি খান, আমার চিবুকে। বলে,—মনে কর তুমি আয়েসা, আমি ওসমান। আমি দেবদাস, তুমি পার্বতী।

—মীরা—আ-আ-আ—

আবার ডাকলেন পিসীমা। সোজা করে। বললেন,—আমি বেরছি এখন। তুমি বাছা বার-দুজাটা বন্ধ করে দাও। খুলে রেখে না যেন। ছিটকে চোরের যা উপাত্ত এ পাড়ায়।

আমি বললাম,—পিসীমা এখন কোথায় চললেন?

সোফা ছেড়ে উঠে পড়লো মীরা। বললে,—হিসসভায় চললেন। নাম-গান,

কীর্তন শুনতে। ফিরতে যার নাম সেই রাস্তার ন'টা।

কথার শেষে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মীরা। আমার বুকের মাঝে এক অস্থির আলোড়ন শুরুর হয়। হাতুড়ীর বা শড়তে থাকে যেন জোরে জোরে। তির্যাস লাগে। কণ্ঠনালী যেন শব্দিকয়ে গেছে। আমি যেন উদ্ভিন্ন হই অসাধারণ।

—চল' ভাই, আমরা ওপরতলায় যাই।

আমার হাত ধরে টেনে তোলে মীরা। সম্মতি বা অসম্মতির ধার ধারে না। দরজার কাছে এক অনুপলের জন্য থামে। সুইচ উঠিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে যায়।

কখন চাঁদ উঠেছে জানি না।

কালো আকাশ, সোনালী রূপ ধরেছে। অগণিত তারা জ্বলছে আকাশে। উজ্জ্বল তারা, দপ দপ জ্বলছে। যেন আগুনের বিল্ড, ঠিকরে ঠিকরে উঠছে। আমার কপালে এসে লাগছে ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া।



উৎসবের
রঙিন দিন
কত রঙিন
শাড়ি

মোহিনীমোহন
কাজিতান মন্ডল
কলকাতা ফ্রী রংসন মলিকতা

ঘরে নয়, ছাড়ে টেনে নিয়ে গিয়েছিল মীরা। কিছুতেই যেন বাধা দিতে পারলো না। অতিভক্তা থেকে জানি, কোন কিছু গোপনীয়তা রক্ষা করতে, ভৃত্যের জনের চোখ এড়াতে, রুম্মম্বার ঘরের চেয়ে মৃত্ত অকালের তলে, নিজের ছাদের মৃৎগণ অনেক বেশী কাজ দেয়।

কতটা সময় যে অতীত হয়েছে, জানতে পারি না।

হঠাৎ দেখলাম, আমরা দু'জনেই অধিন্যস্ত এলোমেলো চুলের বোকা ঠিক করতে ব্যস্ত হয়েছি। জামা আর শাড়ির অসংলগ্নতা ঠিক করতে থাকি। চাঁদের আলোর দেখতে পাই, আমাদের কাপড়ে ছাদের ধূলা-কটো মাখামাখি। আমার মাথায় যেন পাখীর বাসা। আমি যেন হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে উঠছি।

—সত্যিই তুমি একটা মেয়ের মত মেয়ে।

মুখে দু'কটির হাসি ফুটিয়ে বললে মীরা। ফিসফিসিয়ে বললে, —দু'কুমার তাকত আছে। অন্য মেয়েদের মত দু'বল নয় তুমি। কে বলে মেয়ে মাত্রই অবলা!

আমিও ধেমে থাকি না। বললাম, —আর তুমি যেন সত্যিই একটা ছেলে।

খিল খিল শব্দে হেসে উঠলো মীরা। হয়তো আমার কথা মনে ধরেছে।

অতঃপর মীরাকে আর ভোলা যায় না। সেই রাতে নিজদের বাসায় ফিরে কেমন যেন ভাড়াভাড়ি ঘুমিয়ে পড়লাম আমি। গভীর ঘুমের মাঝে কত কি স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্ন ভাঙে নয়, যেন বাস্তব দেখলাম জেগে জেগে। মীরাকে দেখলাম, সে যে অর্ধ-নারী-শব্দ। ঘুমের মধ্যে কিসের যেন মিষ্টি স্বাদ পেলাম তাঁতে। সারা অঙ্গে স্পর্শ পেলাম, নখর আর নরম দেহের। মীরা জানে, কি সেই মিষ্টিতা। জানে এক পিছল গভীর থেকে কোন আলোর শিহর খেলে।

তারপর থেকে আমি বেশ কিছুদিন অন্তর মীরার সঙ্গ দেখা করতাম। যদিও অবশ্য প্রায় প্রতিদিনই মনে পড়তো মীরাকে। একটা সন্তাধ যেতে না যেতে মীরা আমাদের বাসায় এসে পড়তো। এসে আমার কানে কানে বলতো, —আমার রাগা, আমার রাগী, তোমার বিছানে যে আর দিন কাটতে চায় না।

তখন আমি তার সঙ্গ যেতে বাধা হ'তাম। যেতাম যেন মন্ত্রচালিতের মত। মীরার মুখে ফোটে নিলাজ হাসি। অচিলে মুখ ঢেকে হাসি লুকোতে চেষ্টা করে। আমাকে যেন সে টানতে টানতে নিয়ে যায়। স্তম্ভাবের সঙ্গ চলে যেন গাদাবোট। সেই ছাদে উঠে বসে আমরা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়। কখনও আমরা চা-বিস্কুট খাই। কখনও অন্য কিছু নিষিদ্ধ মিষ্টি।

সাধারণ জগৎ আমার আত্মীয়-স্বজন আমাকে দেখতে না পেরে, আমাকে একরকম কেন ভুলেই গেল। সংসারের ছোটখাটো

খুঁটিনাটি থেকে আমি অনেক দূরে সরে যাই। মাঝে মাঝে পাড়ার ছেলেরা আমার আর মীরার আশেপাশে ঘোরাঘুরি করলেও তারা আর আমাদের পাড়া পার না। মাঝে মাঝে দূর থেকে তাপস আমাদের দু'জনকে লক্ষ্য করে হতাশ চোখে। তাপসের প্রতি রাগ হয় না; অনুকম্পাও আসে না।

তারপর। তারপর এক সম্মান মীরা আমাদের বাসায় চলে আসে।

দেখে মনে হয়, সে যেন কেমন অস্থির চঞ্চল। তার মুখ দেখে ধারণা হয়, কিছু যেন একটা জ্বর খবর আছে। দেখতে পাই, মীরা যেন কেমন বদলে গেছে। সাজ-পোশাক, চুল বাঁধার ধরন সবই যেন পালটে গেছে। এমন কি মূখের হাসিটুকু পৰ্ব্বত।

বললাম, —কেমন আছে?

মীরা বললেন, —এক রকম ভালই। খানিক ধেমে মূদ্র হেসে বললে, —পিসীমা তো কিছুদিনের জন্যে বন্দাবনে চলে গেলেন। বিষ্ণুর ভক্ত তিনি, তাই কুকুর লীলাক্ষেত্র দেখতে গেলেন। ফিরতে ফিরতে যার নাম একটা মাস। তার বেশীও হতে পারে। বলে গেলেন, মথুরাতে থাক-বেন কটা দিন। এখন বাসায় আমি একা থাকি। এই দেখো চাবি।

কথার শেষে জামার ভেতর সে একটা নাতিবৃহৎ চাবি বের করে দেখালো, যেন আমার বিশ্বাস অর্জন করতে। মীরাকে তবে এখন বলা চলে, তাদের বাসায় সেই সর্বময় কঠী। এখন সে না খুঁশ করতে পারে। যখন বা মন চাইবে তার। আমারও এখন তার কাছে যখন তখন যেতে কোন বাধা নেই।

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, মীরার কাছে যেতে আর আমার ইচ্ছা করে না। মনে মনে স্থির করেছি, নিজেকে আর নীচে নামাবো না। যদিও অবচেতন মনে নানা কুচিন্তা খেলা করে। তা হলেও আমি তো পশু নয়, আমি একটা মেয়ে।

দেখতে দেখতে কয়েকটা দিন কেটে গেল।

আমি যেন নিজেকে আর সংযত রাখতে পারি না। বেশ ব্যস্ততে পারি, বাধা ভাঙতে চাইছি। সেই রাতেই যখন আমাদের বাড়ীর সকলেই নিদ্রার অচেতন, আমি পা টিপে টিপে বাসা থেকে বেরিয়ে পড়লাম। ইচ্ছা হল, একবার গিয়ে দেখে আসি মীরা একা একা কি করছে। কেমন আছে সে।

রাতির প্রথম প্রহর সবে তখন শেষ হয়েছে।

জ্যোৎস্না-বহল শূন্য রাত। জনাবিরল রাস্তায় জ্যোৎস্না ঠে ঠে করছে। আমি ভাড়াভাড়ি পা চালাই। বিধা আর স্বপ্নের দোলা আমার বুকে। আমি যেন রুম্মম্বাসে লুপ্ত চলেছি। চাপা উন্মেষ আর উত্তেজনার আমার বুকের খর খর কাঁপছে।

দূর থেকে চোখে পড়ে মীরাদের বাসা। অধিকাংশ জানলা-দরজা বন্ধ। বাসিন্দা আছে কি কেউ, সন্দেহ হয়। চাঁদের আলোর দেখা যায় বাড়ীটা। নীরব, নিষ্প্রদীপ। আমি জানি, এই বাড়ীতে আছে এমন একজন, যে আমার আশায়, আমার প্রতীক্ষায় থাকে।

ঠিক মনে হয়, আমি যেন এক এ্যাড-ভেন্ডারে চলেছি।

রোমাঞ্চার শিহরনে আমার যেন ভয় ভয় করে। তবুও একবার যখন বেরিয়ে পড়ছি, আর ফিরতে চাই না। আমি জানতাম, মীরাদের বাড়ীর খিড়কির দরজাটা প্রায় আলগাই থাকে। সত্যিই সামান্য একটু ঠেলা দিতেই দরজা কাঁচ কাঁচ শব্দ তুলে খুলে গেল। আমি একটা স্পর্শের শ্বাস ফেললাম। অন্ধকার সিঁড়ি ভেঙে নিঃশব্দ পায়ে ওপরতলায় উঠে চললাম।

মীরার শয়ন-ঘরের দরজাটা আন্তে ঠেলা দিয়ে খুলতেই মীরা-মীরা গম্ব পেলাম। একটা প্রসাধনী সুগন্ধ ভেসে এলো। গম্বটা যেন আমাকে সাদর আহ্বান জানালো।

ঘরে ঢুকতেই দেখি, সারা ঘরে চাঁদের সোনালী আলো ছড়িয়েছে। নিদ্রামগ্ন মীরার শ্বাসের শব্দ পেলাম। গভীর ঘুমে ডুবে আছে সে। বেশরাস অবিন্যস্ত। মাথার বিন্দুনী ছড়িয়ে আছে শূন্য শয্যায়। মীরার নিবারণ বাহ, বন্ধ, দুই পা সাদাটে চিকন তুলছে। আজ দেখতে পেলাম, চাঁদের অকৃপণ আলোর, মীরা কত বেশী সুন্দর। কত যে মোহনীয়। কমলীয়।

ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে আমার। অত্যন্ত সন্তর্পণে মীরার পাশে বসে পড়লাম। বিছানার এক কিনারায়। এতটা পথ এসেছি। টেনে টেনে শ্বাস নিলাম কয়েকটা। খানিক জিরিয়ে আমি যেন পূজার মন দেবো। মীরাকে পূজা করবো। মীরাকে ভালবাসবো। মীরা আমাকে—

পায়ের কাছে কি ছিল জানি না। উঠে দাঁড়াতেই আমার পায়ের আঘাত লেগে একটা বৈরাসিক শব্দ উঠলো অত্যন্ত। দেখলাম, খাটের নীচে ছিল জলের শূন্য প্লাস। পত্তা উলটে গেছে আমার পদস্পর্শে।

ঘুমের ঘোরে মীরা একটা গভীর শ্বাস গ্রহণ করে। শিহরিত হয় যেন সে। তার পরেই যেন স্বপ্নিন চোখে দেখলো আমাকে সে। ঘুম-জড়ানো চোখে নিষ্কায় কথ্য বলতে থাকে। মীরা বলে, —না না, আজ আর নয় তাপস। আজ থাক। কথা রাখো লক্ষ্মীটি। রোজ রোজ নয়।

ঠে ঠে জ্যোৎস্না ঘরে।

তবুও আমি যেন চোখে অধীর দেখতে থাকি। নিশ্চিহ্ন অন্ধকার। মনে মনে বললাম, হে ধরণী, বিধা হও।

মীরা আমার কোলে তাক একখানি হাত রাখলো। ঘুম ঘুম চোখে আমাকে দেখতে দেখতে বলে—আমার তাপস, মূদ্র, ছেলে মিষ্টি ছেলে—

আশাতোষবাবুকে আমি দীর্ঘকাল ধরে জানি। ভদ্রলোক একটি সওদাগরী অফিসে কাজ করতেন। কাজটা ছিল প্রধানত বাইরে-বাইরে ঘোরা।

প্রথম যৌবনে একটি সমতানের জন্ম দিয়ে তার স্ত্রী পরলোকগমন করেন। ভদ্রলোক তারপরে আর বিয়ে করেননি। পত্নীবিয়োগের আঘাতটা খুবই গুরুতর হয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু সেটা বাইরে বসতে দিতেন না। বাড়ীতে রান্নাবাড়ী, অফিসের যোড়দোড় আর অবসর সময়ে ক্লাবে তাস খেলা এইতেই ভদ্রলোক এমন মেতে থাকতেন যে, বাইরের লোক বুঝতেই পারত না তাঁর হৃদয়ে একটা গভীর ক্ষত দগদগ করছে।

দুটি কাজ ছিল তাঁর প্রিয় : একটি সৌখিন রান্নাবাড়ী, অন্যটা দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান। কচি ছেলের পরিচর্যা তিনি করতে পারতেনও না, করতেনও না। একটি বড়ি কি ছিল, মাতৃহীন শিশুটিকে সেই মানুষ্য করেছে।

ক্রমে ক্রমে খোকা বড় হতে লাগল। খাতা-পেনসিল নিয়ে স্কুলে যেতে শুরু করল। তখন আশাতোষবাবুর কাজ একটু বাড়ল। খুব ভোরে উঠেই রান্না চড়াতে। নিতানতুনতর রান্না। ছেলেকে খাইয়ে, নিজে খেয়ে, অফিস যাওয়ার পথে তাকে স্কুলে পৌঁছে দিতেন। সম্ভার পর ফিরে এসে

কক্স

বান্ধবের সঙ্গে পরিহার করে ঘরের কোণে পড়ার বইগুলির মধ্যেই তাঁর দিন কাটত।

তার ফলে তার স্বাস্থ্যের হ্রাসত কিছুটা অবনতি ঘটল কিন্তু পরীক্ষার ফল খুব ভালো হতে লাগল।

স্কুলের পরীক্ষার ফল বেরুলে প্রথম

মহোদয়ের ব্যক্তিবৃত্তি



প্রথম খোকা বাবাকে হাসিমুখে এলে খবরটা জানাত : বাবা আমি ফাস্ট হয়েছি।

আশাতোষবাবু তখন হ্রাসত রান্না করছেন, কি বাইরে যাবার জন্য বাস গোড়াচ্ছেন, কথটা তাঁর কানে যেত কিনা খোকা বুঝতে পারত না। হাতের কাজ শেষ করতে করতে আশাতোষবাবু বলতেন, আরো মন দিয়ে পড়, আরো মন দিয়ে পড়।

শেষের দিকে খোকা আর পরীক্ষার খবর বাবাকে দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করত

কক্স

নির রান্না, আর তার ফাঁকে ফাঁকে ছেলেকে ডানো। কিন্তু অফিসের কাজের প্রয়োজনে খন বাইরে হাবার ডাক আসত, তখন তিনি ার কারো মন। খোকাকর কথাও মনে থাকত। বাইরে বেছানোর জন্য তাঁর একপ্রপ্থ স্ন-বিছানা সবসময় গোছানই থাকত। গুলি নিয়ে ট্যাকসি করে সটান স্টেশনে। কা বড়ো আঙ্গুলটি মখে দিয়ে সদর

দরজায় দাঁড়িয়ে গম্ভীরভাবে বাবার যাওয়া দেখত। বাপের কিন্তু ছেলের দিকে ফিরে চাইবার অবসরও হত না।

এইভাবেই খোকা মানুষ হতে লাগল। বাপের সঙ্গে সম্পর্ক কখনই খুব ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেলো না। তার ফলে সেও একরকম হয়ে গেল। খেলাধুলা, বন্ধ-

না। এমনকি প্রবেশিকা পরীক্ষায় সে যখন প্রথম দশজনের মধ্যে স্থানলাভ করলে, সে-খবরটাও আশাতোষবাবু ফল বেরোবার অনেক পরে বাইরে-কার কাছ থেকে শুনলেন।

এম এস-সিতে খোকা প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হল। একটা স্টেডিতেই বিদেশী ব্যক্তি পেয়ে সে উচ্চতর শিক্ষার জন্য আমেরিকা চলে গেল।

সে-খবরটা খোকা যখন বাবাকে দিলে, তখন আশাতোষবাবু কয়েক মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তার চোখ দিয়ে, বোধ করি তারও অজান্তে, কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। সে-অগ্র তার মাতা স্ত্রীর উদ্দেশ্যে, কিম্বা পুত্র-বিরহে বোকা গেল না। খোকাকে কাছে এই অভিজ্ঞতা প্রথম। কোনদিন কোন কারণে তার চোখে সে জল দেখেনি।

খোকাকে বিদেশ যাত্রার পর আশাতোষবাবুর একটা প্রকান্ড পরিবর্তন হল। গৃহেয় বন্ধন একেবারেই ছিন্ন হয়ে গেল। তিনি কখন বাড়ি আসতেন, কখন চলে যেতেন, বাড়ির অন্য লোকেরাও টের পেত না। রান্না করার সংখ্যে বেন তার কয়েক গেল। ছুটির দিন যেদিন বাইরের টুরে না বেরোতেন, সেদিন যা হোক দু'টি ফ্রুজিয়ে নিতেন। সোঁখিন রকমারি রান্না কল্যাণ করতেন। সকালে স্নান করে বেরিয়ে যেতেন, ফিরতেন সন্ধ্যার পরে। কোথায় যেতেন, কি খেতেন কেউ জানে না।

যে পাঁচ বছর খোকা বাইরে ছিল, সেই বাড়িগুলো বৃষ্টি আশাতোষবাবুকে আরো প্রবলভাবে পেয়ে বসল।

ঘোরা, ঘোরা, ঘোরা।

আফিসের কাজে কখনও লম্বা, কখনও বা কাছাকাছি ভ্রমণ তো আছেই, মাঝে মাঝে ছুটি নিয়েও বেরিয়ে পড়তেন। কোথায়, তার টিকিট কাটার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি নিজেও জানতেন না।

একটা সন্টকেশ সকল সময় গোছানই থাকত। একপ্রান্ত বিছানা বাঁধাই থাকত। আর থাকত কাঁধে একটা বালি। ঘোরার কথা মনে উদয় হওয়ার পরে বেরিয়ে পড়তে এক মুহূর্তও বিলম্ব হত না।

বন্ধ-বান্ধবে প্রায়ই ঠাড়া করত : তুমি আত ঘোরো কেন? কদিন ছুটি পেলে, খাও-দাও, বিশ্রাম করো। তা না বালিটা কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়লে। কেন এমন কর?

সাধারণত আশাতোষবাবু বন্ধ-বান্ধবের এই প্রশ্নের প্রশ্নের জবাব দেন না। শুধু হাসেন।

কিন্তু সেদিন হাসলেন না। বললেন, কি জানি ভাই। ঘরে থাকতে পারি না।

—বাইরে থাকতে ভালো লাগে?

—তাও জানি না। কোথাও দু'দিনের ওপর তিনদিন থাকতে পারি না। কে যেন সমস্ত সময় আমাকে গুতোয়। ব্যাল, বেরিয়ে পড়ি।

বন্ধুরা বোঝেন, গৃহিণীহীন গৃহের শূন্যতা বোধহয় আশাতোষবাবুকে বেঁধে। তারই জন্য মনের এই অস্থিরতা। তার পরামর্শ দিলেন : আর কদিন বাসেই তো খোকা ফিরছে, ফেরামাত্র তার বিয়ে দিয়ে দাও। ছেলে-বোঁ ন্যাত-ন্যাতনি নিয়ে সংসার করো।

আশাতোষবাবু সম্মতি জানিয়ে বলেন, দেখি।

পাঁচ বছর পরে খোকা ফিরে এল। ছিটখিট ভালে ছিল, সুতরাং একটা ভালো চাকরি পেতে দেখা হল না। আর ভালো

চাকরি পেলে যা হয়, দেখতে দেখতে একটা সুন্দরী ধনী-কন্যা বধূরূপে আবির্ভূত হল।

খোকা বাবাকে অবসর নেবার জন্য জেদ করতে লাগল। অবসর অবশ্য আগেই হয়ে গিয়েছিল, চাকরি চলছিল এক্সটেনশনের ওপর।

আশাতোষবাবুর আর খাটবার প্রয়োজন ছিল না। ছেলে কুতী। তবু চাকরিও বোধহয় একটা অভ্যাস। দীর্ঘকালের অভ্যাস ছাড়তে কষ্ট হয়। তাই ওপর পরের পরসার ভ্রমণের একটা নেশাও আছে। সেইজন্যই বোধহয় আশাতোষবাবু আর একটা এক্সটেনশনের চেষ্টা করছিলেন।

সত্য কথা বলতে কি, আশাতোষবাবু সংসার বলতে তো ওই আফিসই। তাছাড়া রোদে-বৃষ্টিতে, শীতে-গ্রীষ্মে ভ্রমণে এমন ক্লাস্তিহীন ও বিরক্তিহীন কর্মচারী আর কটা পাওয়া যায়! সুতরাং সাহেব জাশ-তোষবাবুর ওপর খুব খুশি হলেন এবং আশাতোষবাবুর আর একটা এক্সটেনশন পেড়ে তাকে কিছুমাত্র বেগ পেতে হত না।

কিন্তু ছেলে বোঁ-এর প্রবল বাধা।

আর কিসের জন্য চাকরি করবো? আপনাকে কি অভাব? খান দান বিশ্রাম করুন। এ-বয়সে মানুষ এই তো চায়।

চাকরিটা কলকাতার বাইরে। খোকা মাঠের ওপর সারি সারি কয়েকখানি বড় বড় হাটাওরলা সংলগ্ন। তাইই একখানি খোকা পেয়েছিল। চাকরি ছেড়ে আশাতোষবাবু তার খুলি-কাম্প নিয়ে একদিন এসে উপস্থিত হলেন। তার শোবার ঘর আগে থাকতেই সুসজ্জিত করে রাখা হয়েছিল। ঘরখানি দেখে ভরলোক খুব খুশি হলেন। চাকর এসে তাঁর জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে দিল। স্নানান্তে চায়ের বাটিটা হাতে নিয়ে ভরলোক বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। সামনেই ফুলবাগান। বাঁদিকে প্রশস্ত সন। একখানি বেতের চেয়ারে বসে ফুলের শোভা দেখতে দেখতে তার মন খুশি হয়ে উঠল।

এই তো জীবন! দৌড়-ঝাঁপ নেই। কর্ম-কোলাহল নেই। শান্ত নিস্তরঙ্গা জীবন। তার ওপর পড়ন্ত সূর্যের আভা লেগেছে। বোমা খাবার নিয়ে এসে টিপারের উপর রাখল। জিজ্ঞাসা করলে, ভালো লাগছে বাবা?

—খুব ভালো লাগছে। এমন সুন্দর অপরাহ্ন আমার জন্য অপেক্ষা করেছিল, এ আমি মন্বন্ডে ভাবিনি। তোমাদের কল্যাণ হোক।

কয়েকটা সস্তাহ চমককার কেটে গেল। সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায় পূজার ঘরে অধ্যায়ন। অবশিষ্ট সময় কখনও ধর্মগ্রন্থ-পাঠ, কখনও ছেলের বন্ধদের সংলগ্ন গল্প-গুজব, কখনও লেনে পারচার, কখনও ব. নিরঙ্কর বসে থাকতেন।

একদিন বোমাকে ডেকে বললেন, তোমাদের বাগানে শব্দই ফুলের গন্ধ। মালী তো আছে। কিছু তরিতরকারী লাগাও না-কেন?

বোমা প্রথমত খেয়ে গেলেন। মালী একটা আছে লটে। আফিসের মালী। মালীর ইচ্ছা সে কল করে ডলে। কি কল করে,

বোমা কিম্বা ছেলে, কেউ-ই সেদিকে দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন মনে করে না।

টোক গিলে বোমা বললে, তা লাগানো চলে।

—চলেই তো। ওদিকে অনেকখানি জায়গা আছে। বেকরদা পড়ে আছে। দাঁড়াও আমি ব্যবস্থা করছি।

চাষের সম্বন্ধে আশাতোষবাবুর কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না। কিন্তু উদ্যমের অভাব ছিল না। মালীদের নিয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি খানিকটা জমি তৈরি করে ফেললেন।

খোকাকে বললেন, গোটা কয়েক টাকা দে তো। একবার কলকাতার বেতে হবে।

খোকা অস্বাভাবিক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কলকাতার। সেখানে কি?

একগাল হেসে আশাতোষবাবু বললেন, কিছু তরকারির বাজি আনতে হবে।

—তরকারির বাজি!

—হ্যাঁ। তুমি দেখিসনি পেছনে-জায়গাটা কোপানো হয়েছে। ওইখানটায় তরকারি লাগান হবে। বা তরকারির দান! লোকে কেন যে জায়গা ফেলে রাখে, অচ্চ চড়া দামে তরকারি কেনে, আমি তো বুঝি না। মানুষ ইচ্ছা করে নিজের দুঃখ টেনে আনে।

খোকা টাকা দিলে। মনে মনে খুব আশোষ উপভোগ করলে। স্ত্রীকে ডেকে বললে, বাবা তরকারি লাগাচ্ছেন, জানো?

লীনা হেসে বললে, ওমা তুমি আত শুনছ! কদিন থেকেই তো মালীটাকে নিয়ে পড়েছেন। কড়া রোদে তাকে দিয়ে হাট কুপিয়ে নিচ্ছেন।

—তোমাদের আর তরকারি কিনতে হবে না।

লীনা হেসে বললে, সে যা হবার হবে। আমার আনন্দ মালীটা জন্ম হয়েছে। খুব কুড়ে হয়ে যাচ্ছিল।

খোকা বললে, কাজের লোক, বাসে থাকতে পারেন না। করুন, করুন। বাধা দিও না।

কেউ বাধা দিলেও না। আশাতোষবাবু, কৃষি সম্বন্ধে বই পড়ে পড়ে মনের আনন্দে তরকারির চাষ আরম্ভ করলেন।

দেখতে দেখতে ছোট ছোট চারা উন্মুল হল। আশাতোষবাবুর মন খুশিতে ভরপুর। সমস্ত দিন থাকেন, থাকেন আর একবার করে গিয়ে ক্ষেতের ধারে দাঁড়ান। হিসাব করেন গাছগুলো কতটুকু বাড়ল। রবি পাতার পর কাঁচপাতা উঠতে লাগল। খোকাকে সময় নেই। বোমাকে মাঝে মাঝে টেনে আনেন আর লকলকে গাছগুলি দেখান।

—জানলে মা, আমাদের তো তরকারি কিনতেই হবে না, প্রতিবেশীদের মধ্যে বিলি করেও ফুরাবে না। আর সেরিক বাজারের তিনদিনের বাসি সন্নিহ! টাটকা ক্ষেত থেকে তোলা জিনিস।

শব্দরূপে আনন্দ দেবার জন্য বোমাও খুব উৎসাহ দেখান।

খোকা বলে, আমরা তো বাবার মন সংসারে বাঁধতে পারলাম না, দেখ যদি তরকারির ক্ষেত পারে।

কিন্তু তরকারির ক্ষেতও পারলে না।

গাছগুলি ঝানিকটা বড় হয়েছে। কিন্তু তখনও ফল ধরেনি। হঠাৎ আশাতোষবাবু একদিন সকালে খোঁকাকে বললেন, গোট-কয়েক টাকা দে ছো খোকা।

—কি হবে? সার? আপনার গাছগুলি বেশ জোরালো হয়েছে।

মাথা নেড়ে আশাতোষবাবু বললেন, না, সার না। আমার গল্গাজল ফুরিয়েছে। একবার কোলকাতায় যেতে হবে গল্গাজল আনতে।

কয়েক মিনিট পরেই ভদ্রলোক একটা সাইকেল আর জলের বড়া নিয়ে রিক্সা করে স্টেশনের দিকে রওনা হলেন।

ফিরলেন হুতাথানেক পরে। খোকা ভাষে জিজ্ঞাসা করতে সাহস করলে না, এত দৌর হল কেন?

আশাতোষবাবু নিজেই বললেন, মোরোটাকে অনেকদিন দেখিনি, একবার দেওঘর গিয়েছিল।

দেওঘরে আশাতোষবাবুর এক প্রাচুর্যপত্নী থাকেন। কিন্তু তার ওপর তারি যে এতখানি টান ছিল কারো জানা ছিল না।

আশাতোষবাবু বলে চললেন, সে সঙ্গে বাবার মাথাও দুম-গল্গাজল দেওয়া হল।

তখনকার মত এই প্রসঙ্গ এইখানেই স্থগিত রইলোও সন্ধ্যার পরে তার জ্বর উঠল।

—আসবার পথে একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হল। অমন মানুষ একালে দেখা যায় না। যেমন কতী, তেমনি গিন্নী। তিনটি ছেলে, তিনজনই কৃতী। বাগ-মাকে তারা প্রত্যেকে একশো টাকা করে দেয়। সেই টাকা দিয়ে ওরা মনের আনন্দে তীর্থ করে বেড়ান।

আশাতোষবাবু আড়চোখে একবার ছেল-বো-এর মুখের দিকে চাইলেন।

তারপরে বলতে লাগলেন, এই সামনের মাসে ওরা যাচ্ছেন অমরনাথ। আমাকেও ধরলেন সঙ্গে যেতে।

খোকা প্রমাদ গুনলে। বললে, আপনার তরকারির ক্ষেত?

বিরক্তভাবে আশাতোষবাবু বললেন বাবা অমরনাথের সঙ্গে তুমি তরকারির ভূগনা কর?

বলে কৃথভাবে সেখান থেকে উঠে গেলেন।

তরকারির ক্ষেত আশাতোষবাবুতে বাঁধতে পারলে না। তিনি অমরনাথ গেলেন এবং কাছাকাছি অনেক তীর্থ। ঘুরে আস-তিনেক পরে ফিরলেন।

লীনা তখন নার্সিংহোমে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেছে।

সদ্যন্ত নাজিকে নিয়ে আশাতোষবাবুর খুব উৎসাহ দেখা গেল। দোলনায় শব্দে শব্দে লিখটি খেলা করে; পাশে একটি চেয়ার নিয়ে বসে আশাতোষবাবু তার কৃষ্ণ-কলাস পরীক্ষণ করেন।

—দেখ দেখ বোমা, বাচ্চু কিরকম করে চাইছে! ঠিক মনে হচ্ছে ও যেন সব বৃত্তান্ত পারে।

—দেখ দেখ, কিরকম ঘামি ছুঁড়ে! যেন দুনিয়াটাকে এক ঘূষিতে হসাতলে পাঠাতে চায়। তোমার ছেলে খুব পালোয়ান হবে।

কিন্তু এও চলল বাচ্চুর অমপ্রাণন পরন্ত।

একদিন রাতে বিছানায় হঠাৎ খোকা লীনাতে বললে, বাবা জ্বাংর উসখুস করছেন।

লীনা বললে, জ্বাংর কি?

—সেই গল্গাজল।

—গল্গাজল?

—হ্যাঁ। ওই গল্গাজলটা আমার ভয়ানক ভয়। বাবার উসখুসের প্রথম প্রকাশ গল্গাজল।

মাসখানেক একটানা বাচ্চুকে নিয়ে বেশ কাটলেন। জ্বাংর ধরেছেন কলকাতা থেকে হয়ে গল্গাজল আনতে। জ্বাংর শব্দ হবে বাউডেলপনা। আমি অবাধ হয়ে বাই কিছতেই ওকল বাঁধা গেল না। মাসের মতের পর থেকে সেই যে বাউডেলপনা অস্তিত্ব করেছে, আমি বাঁধতে পারিনি, তুমি পারান ভেবেছিলাম বাচ্চু পারবে। এখন ভয় হচ্ছে সেও বাঁধি পারবে না।

সত্যিই তাই। আশাতোষবাবু গল্গাজল নিয়ে সাতদিন পর ফিরে এলেন। দিন-দুই পরে খোকাকে বললেন, আমাকে কিছু টাকা দে দেখি। স্বাকার দিকটা ঘোরা হয়নি। ভাবছি ওদিকটার একবার ঘুরে আসব।



এই বাউডেলপনার খোকা মনে মনে খুব আতঙ্কিত পায়। কিন্তু বাবার শেষ বরসের সাথ, বাধা দেয় না। বাচ্চুর সাত বছর বয়স পর্যন্ত এই লেজ। একবার করে আশাতোষবাবু বেরিয়ে পড়েন। তিন-চার, কখন বা পচিশ-মাস পরে ফেরেন। কিন্তু দিন থাকেন, জ্বাংর বেরিয়ে পড়েন।

লেখবন্ধু রামেশ্বর ঘুরে আশাতোষবাবু ফিরলেন। তখন বাচ্চুর বয়স সাত।

খোকার অভিযান হচ্ছে, আফিস থেকে ফিরে সম্মানবোধের সন্ধান করে রাতের খাওয়ারটা খেয়ে নেওয়া। তারপরে কোনোদিন বা ক্লাবে। কোনদিন বা কল-বাস্থ্যের বাড়ি বেড়াতে যায়। ফিরে এসে পাড়তে বলে, রাত দশটা নাগাদ একটা দুধ খেয়ে শূরে পড়ে।

সেদিনও শোবার ঘরে ইটিচেরারে শব্দ শব্দে পড়ছিল। দশটা বাজতে লীনা গেল স্বামীর জন্য দুধ গরম করতে।

দশ মিনিটও হয়নি, হঠাৎ একটা চিংকার উঠল। তারপরেই আর একটা চিংকার।

লীনার গলা মনে হচ্ছে না?

বইটা টেবিলে রেখে খোকা ছুটল রান্না-ঘরের দিকে। রান্নাঘরটা একটা ঘুরে।

লীনার কণ্ঠস্বরই কটে! খোকা ভুটে গিয়ে দেখে ভুলন্ত স্টোভের সামনে লীনা জ্বলছে।

মুহুর্তে কি যেন হয়ে গেল। কোথায় বইল খোকার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি, কোথায় রইল কাণ্ডজ্ঞান। সে খাপিয়ে পড়ল লীনার জ্বলন্ত দেহের ওপর। দু'হাত দিয়ে আগুন নেভাবার ব্যর্থ চেষ্টা।

ছুটে এলেন আশাতোষবাবু। তার চিংকারে ছুটে এলো পাড়াপ্রতিবেশী। এমনকি রাস্তার মোকও।

তখন আগুন নিভে গেছে কটে কিন্তু দু'জনেই অচৈতন্য। এম্বুলেন্স করে তাদের দু'জনকে হাসপাতালে পঠান হল।

কিন্তু কাউকেই বাঁচান গেল না।

খবর পেয়ে কয়েকদিন পরে আমি গেলো। সেই বাগানের সামনে নাস্তিটিক পাশে নিয়ে আশাতোষবাবু বসে।

ভাষলেন লীনা। যেন এ-কথাও তার মনে নন।

আশাতোষবাবু স্বভাবতঃ খুব সদাশয় ছিলেন। তার উৎস মুখটা বোধহয় কখনও হারিয়ে গেছে। অসম্পূর্ণ বয়সে রইলো একটি কণ্ঠও বললেন না। পুত্র এবং পুত্রবধূর শোচনীয় মৃত্যুর কথা আমি তুলতেই সাহস করলো না।

ওঠবার মুখে শিল্পটির দিকে তাক জিজ্ঞাসা করলো নাস্তি:

হঠাৎ আশাতোষবাবু অস্বাভাবিকভাবে অটুহাস করে উঠলেন। বললেন, হ্যাঁ। আমার স্মরণশক্তি।

তারপরেই একটা খেয়ে বললেন, 'কি আশ্চর্য দেখা দিনর, নী আমাকে ওসকল পারিনি পুত্র না, পুত্রবধূও না। বাচ্চুর মুখে এই এককোটি ছেলে জ্বাংরকে দেখে ফেললে।



জন প'রিশ্রমিকের পার্টি। সবার মধ্যে যে সবার পরিচয়-ঘনিষ্ঠতা আছে এমন নয়। একে চারতলা নিয়ে আফিস এমনিই আলাদা-আলাদা তার ক্লাবের সাংস্কৃতিক বিভাগ, জোটেও কম সবাই। আজকের দলে আসার অন্য একটা কারণে কিছু অপরিচিতের ভ্যাজাল এসে পড়েছে। প্রত্যেক মেম্বারের একজন করে সঙ্গী বা সঙ্গিনী নিয়ে আসার অধিকার ছিল, যাতে করে জন-আন্তেই ছিল ক্লাব-গণ্ডীর একেবারে বাইরের। সুচিরা হচ্ছে এইরকম একজন, সে এসেছে তানু বালাসঙ্গী অমলার সঙ্গে।

যেখানে পরিচয় নেই সেখানে আবার ঘনিষ্ঠতর পরিচয়েরই আবেদন বেশি থাকতে পারে, নৈলে রোমান্স জিনিসটা মারা যেত। সুচিরার বেলায় তাই হোল।

পিকনিকের জায়গা ঠিক হয়েছিল স্টেশন থেকে মাইলখানেক দূরে। নিকটতম গ্রাম থেকেও বেশ থানিকটা তফাতেই। একটা বড় পুকুর, প্রায় দীঘিই বলা চলে, তার চারিদিকে আম-কাঁঠালের বাগান। পুকুরের ধারে ধারে লাল শালুক ফুল, ভিড় করে কটে আছে। সম্প্রতিটা আফিসের একজন ওপারওয়ালার, বেশ সুরাক্ত।

প্রায় সমস্ত দিনের প্রোগ্রাম, এমন-মুহুর্ত, অনুকূল পরিবেশ, খুব আনন্দে কাটল। ঘুরে বেড়িয়ে, ছোট ছোট দলে একত্র হয়ে আলাপ-আলোচনার, যে-দলের যা মনোমত। বা বা এসে পড়েছে। সঙ্গীত, সাহিত্য, নাট্য-কলা, আফিস, সমাজ; কিছু রাজনীতিও, পিকনিকে বিসম্বাদী হলেও। প'রিশ্রমিকের একেবারে প'রিশ্রমিক রকম না হোক, একরকমও হওয়ার কথা নয়।

সুচিরা যে-গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে গিয়েছিল, বা যেটা ইচ্ছে করেই বেছে নিয়েছিল সে, তার আলোচনার পরিধি ছিল বিস্তৃত; সুতরাং গোষ্ঠীটিও একটু বড়। এইখানে সুচিরার সঙ্গে ভূপেশের পরিচয় হলো এবং বাদের চোখ-কান আলোচনার বাইরেও সজাগ-সতর্ক ছিল তারা দু'জনে। এ-পরিচয় ঘনিষ্ঠতার পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

সুচিরার বয়স বছর চব্বিশ হবে। ও মোটামুটি এ-পরিবেশে নতুন হলেও যেমন-ভাবে এর যুষ্টি সমর্থন ওর যুক্তির প্রতিবাদ করে আস্তে আস্তে আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করল তাতে বোঝা গেল বেশ সপ্রতিভ। বেশ জানাশোনাও আছে মনে হলো, আর এ-ধরনের আলোচনার অভ্যস্তও।

লগ্ন
বিজয়ী
মুখোপাধ্যায়

আলোচনার মধ্যে দিয়েই ভূপেশের সঙ্গে পরিচয়। তাও ভূপেশ আগাগোড়া এ দলে ছিল না। সকালে আফিস-সংক্রান্ত আলোচনা নিয়েই কাটিয়েছে—ইউনিয়ন, স্ট্রাইক, ম'পিং-ভাতা—এইসব। সুচিরার প্রতি দৃষ্টি গেল খাওয়ার সময়। ঐ অনির্বচনীয়তা। নম্রো মেয়েরাই ক'জনে প'রবেশনের ভার নিজেদের হাতে নিয়েছিল; তার মধ্যে ওর চেয়ে সুন্দরীও ছিল একাধিক, আর সপ্রতিভ বলতে ওদেরই আফিসের দাঁতিত মিত্রই রয়েছে; সুন্দরীও। কিন্তু সুচিরার যেমন কোথায় কী একটা বাড়তি রয়েছে, ধর যার না, ওদের তেমন কিসের রয়েছে একটা যেন অভাবই।

আহারপর্ব শেষ হলে ওরা আবার মোটামুটি আগেকার মতোই দলে দলে আম-বাগানের ছায়ায় ছড়িয়ে পড়ল, আশেপাশে

আলোচনার জের টানতে টানতে। বেরতে যাওয়া, বেলাও পড়ে এসেছে। ঘরেও বেড়াচ্ছে, তবুও একাই বাছোঁট ছোট দলে। ভূপেশ সিগারেট টানতে টানতে একসময় নিরুদ্দেশভাবেই পারচারি করতে করতে সূচিরাদের দলটির সামনে এসে দাঁড়াল। এদের তখন স্ট্রী-পার্বানিতা নিয়ে চলছে। দীপ্তি মিশ্রও রয়েছে এবং স্বভাবতই চরম-পন্থীদের মূখপতী হয়েই। আফিসেরই ট্রাফিক-এক্যাউন্টেন্ট প্রভাত সান্যাল প্রশ্ন করল, “বেশ তো, আপনারা কতটা চান তাই বলুন না।”

“আপনার প্রশ্নটাই অব্যবহ, এর আর জবাব দোষ কি?” — উত্তর করল দীপ্তি মিশ্র। বলল—“দেখছেন? দানের প্রশ্ন আজ চাকরির ক্ষেত্রে থেকে উঠে যাচ্ছে, সেখানে একদল অপর একদলের বেতনভোগী। সেখানে আমাদের মনগান হচ্ছে “প্রাণ্য” উদ্দেশ্য, হতাশা পারি টেনে নতে। সমাজজীবনে তো কেউ কারুর চাকরিও করছে না, এখানে স্ট্রী-পুরুষের মধ্যে অধিকার যতনে সীমারেখার কি আছে?”

—ও যখন বলে, একেবারে অনেকখানি করে বলে, বেশ একটা চ্যালেঞ্জের ভাষা নিয়ে।

“কিন্তু সমাজজীবনের সঙ্গে চাকর-জীবনকে এক করা চলবে?” —এবার প্রশ্নটা সূচিরার।

“কেন নয়?” —একটু চকিত হয়ে চাইল দীপ্তি, তিনজন মিলে, তার মধ্যে একজন বিপদ দলেই। বেশ প্রতিকর হওয়ার কথা নয়।

সূচিরা উত্তর করল—“এইজন্যে নয় যে, চাকরির ক্ষেত্রে অফিসের স্বার্থ আর পুঁজির স্বার্থ অনেকখানি আলাদা, অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পরবিরোধী; সমাজের ক্ষেত্রে স্ট্রী-পুরুষের স্বার্থ আলাদা নয়...”

“আমি একটা কথা বলতে পারি?” —গোড়া সিগারেটের টুকরটা ফেলে দিয়ে প্রশ্ন করল ভূপেশ। দাঁড়িয়ে আছে, সবর দৃষ্টি ওর ওপর গিয়ে পড়ল।

“নিশ্চয় করবেন। আপনি দাঁড়িয়ে কেন? বসুন!” —দলে টানল দীপ্তি।

ভূপেশ একটু দাখা বন্ধ করে আশ্রয়টা স্বীকার করে নিয়ে বলল—“বেশ তো আছি। ওঁকে আমার প্রশ্ন-অবশ্য এটা স্বীকার করে নিয়েই যে অফিস আর সমাজের গঠনে একটা প্রভাব আছে—তবে এটা প্রভাব কোথায় যে একেবারেই তুলনা করা চলে না?”

“প্রভাবটা এইখানে যে একটার গঠন নিছক অর্থের ওপর, কাজ দাও, টাকা পাবে। একটার গঠন মন তার হৃদয়ের ভিত্তিতে।”

“কাজ দিলেও মন পাবে না।” —তৃতীয় মেয়েটি একটু মনস্বরেই টিপ্পনী করল। কারুর সঙ্গিনী হয়েই এনেছে সূচিরার মতো, তবে প্রকৃতির দিক দিয়ে ওর মতো নয়, একটু লাভুকই।

ঐ ধরনের একজন যুবকের কাছ থেকে প্রথমও এল—“মল্ল বলুন না।”

রতনকেই।

বড় করে জবাবটা দিল ভূপেশই, স্পষ্ট-ভাব সূচিরার মুখের দিকে চেয়ে—

“কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, এই হৃদয় আর মনের ভিত্তির ওপর গঠিত সমাজের ইতিহাস কি গোড়া থেকেই স্ট্রী-পুরুষের সংঘাতের ইতিহাস নয়?”

“যাতে আমরাই হার মেনে এসেছি।” —একেবারে উত্তমপূর্ব্বই নিজের ঘাড়ের ওপর নিয়ে সমর্থন জানাল এবার দীপ্তি। পাশেই রয়েছে, মাঝখানে শূন্য তৃতীয় মেয়েটি, একটু হেসেই চাইল ওর দিকে সূচিরা। এবার কি একটু ভেবে নিল, তারপর হাসির সঙ্গেই পিঠটা একটু গুটিয়ে নিয়ে বলল—“হারের বাধা গারে নিয়ে হারকে অস্বীকার করা যায় না আদর্শ, তবে এটা না স্বীকার করেও উপায় নেই যে আদি-অন্ত সমাজের বিরাট ইতিহাসে ঐ গোষ্ঠাকতক আধার ছিল একটা ফেজ (phase); সেগুলো ধরে থাকলেই চলবে না।”

“গায়ের বাধাটা মিলিয়ে এসেছে বলেই কি আপনি মন আর হৃদয়ের এত গুরুগান শুরু করেছেন?” —দীপ্তি প্রশ্ন করল।

“বাধা মরে এলে স্মৃতিটা একটু নরম হয়ে আসবারই কথা।” হেসেই উত্তর করল সূচিরা। বলল—“কিন্তু সে কথা হচ্ছে না। আমি বলছি, হৃদয় আর মনের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলেই আজ দুটি শাখাই প্রায় সমান স্তরে এসে পড়ছে...”

“স্ট্রী আর পুরুষ এক স্তর? ...কোথায়? ...কি বিষয়ে? একটা কেসেরও নাম করতে পারেন?”

—বিরোধীপক্ষ থেকে প্রশ্নের একটু কড়কইল।

“কোথায় নয় তাই বলুন না বন্ধ।” —উত্তর করল সূচিরা।

ভূপেশ বলল—“বেশ, একটা ক্ষেত্রে কথাই ধরা যাক, সেখানে স্ট্রী-পুরুষের সম্পত্তি একেবারে মৌলিক। বিবাহই বসুন বা নিজের নিজের সম্পত্তি-সম্পত্তি বেছে নেওয়াই বসুন—রয়েছে সমান সুযোগ, সমান অধিকার?”

কয়েকজনই সমর্থন করল—ঠিক, এটা তো একেবারেই হৃদয় আর মনের ব্যাপার।

ডাগর চক্কু দুটি আবার উত্তর স্বরূপে একটু ঘুরে গেল সূচিরার, হাসিটুকু তাহেই লেগে এবার অল্প একটু, সন্তোষ। বলল—“আছে বৈকি, সুযোগ অধিকার দুই-ই।”

“মেয়েদের? ...পুরুষদের মতন? ...কোথায়? ...মেয়ে হয়েও কি বলছেন আপনি!” —আবার বিস্মিত প্রশ্নের ঝড় উঠল।

সূচিরা বলল—“কেন, সেখানেই আমার সমস্তর উঠে এসেছে পুরুষদের সংগ-শিকার, উপার্জনে।”

“স্ব-ইচ্ছায় দিচ্ছে হতে পুরুষ, অর্থাৎ পুরুষ অভিভাবকের দল?” —প্রশ্ন করল ভূপেশ। একটু ঢোক গিলে নিয়ে বলল—“যার জন্যে রেজেন্সী ম্যারেজও নরকার হয়ে পড়ছে।”

সূচিরা আবার চোখ বারিয়ে ভেবে নিয়ে বলল—“যেমন দিচ্ছে না, তেমন আবার পাবে

মেনেও নিচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রেই তো দেখা যাচ্ছে এটা।”

“তাহলে রেজেন্সী বিবাহটা আপনি...”

বাধা পড়ল: “আপনারা পড়ছেন রেজেন্সী ম্যারেজ নিয়ে? বেশ মূখরোচক, কিন্তু পাঁচটা ভেইশের সময় হয়ে এসেছে, এক মাইল পথ—এর পরেই একেবারে হাটা ছেঁচলিগ!”

একটু দূরে কাঠালগাছের তলা থেকে রাজনীতির দলটা উঠে পড়ে এগিয়ে এসেছে; একজন সরস মস্তকা করল। উঠে পড়ল এ্যাও হেঁহে করে, তারপর দলে দলে ভিড়ে স্টেশনের দিকে অগ্রসর হলো নানা বিষয়ে মিশ্র আলোচনা করতে করতে।

সূচিরা পাঁচটা ভেইশের গাড়িটা ধরতে পারল না। ওয়া যাবে হাওড়ার দিকে। এর খানিকটা আগে বর্ষমানের গাড়িতে ওর বিশেষ দরকার ছিল, একটি বন্ধু ঐ গাড়িতে বৈঠক যাচ্ছে, সেখানকারই মেয়ে, তাকে একটা দরকারী চিঠি দিতে হবে। গাড়িটা এক বেশ খানিকটা দেরি করে, এদের হাওড়ার গাড়িটা যখন ডিস্টেন্ট সিগন্যালের কাছে এসে পড়েছে। পুল হরে এ প্ল্যাটফর্ম পৌঁছাতে না পৌঁছাতে ওটা ছেড়ে দিল।

একঘণ্টারও বেশি সময়, ছোট স্টেশন, নিজনি প্ল্যাটফর্ম, সবাই দুটো গাড়ি দু'দিকে বোরিয়ে গিয়ে আরও নিজনি হয়ে গেছে, সূচিরা পুলের ওপরই অনেকক্ষণ রইল দাঁড়িয়ে। একটু গা-হুমহুম করে বৈকি, তবে এমন আর কি?

প্ল্যাটফর্ম খালি হলেও, স্টেশনে লোক রয়েছে, আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

পারিশেষটি বড় সুন্দর, শহরের জীব, তার মেয়েগুলোই, দু'দলই ওর পাশে। পুলের ওপর থেকে বলে যেন আরও অপরাধ। সূচিরার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। সম্ভাব্য একটু গাড়ি হরে আসতে নেমে এল পুল থেকে। হাত-খড়্কাটা উঠে দেখল আর মিনিটকুড়ি আছে গাড়ি আসতে। টিকিটটা করে নিল।

দু' একজন করে জুটছে যাত্রী, তবে একেবারে পাড়ামেরে, নিম্নশ্রেণীর। মেয়ে-পুরুষ, দুই-ই। বেরিয়ে বেড়াচ্ছিল স্টেশন-ঘরের কাছাকাছি, এক সময় হঠাৎ কানে গেল—“আপনারও আমারই অবস্থা দেখাচ্ছে।”

খানিকটা গিয়ে ফিরে আসছে, প্রতিষ্ঠিত কণ্ঠের স্বর শুনে ঘুরে দ্যাখে ভূপেশ সিংহি বেয়ে নেমে অস্বস্থ। হাতে কতকগুলো শালুক ফল। মুখট এত উজ্জ্বল, সূচিরার মনে হোল যেন বহুপ্রত্যাশিত কী একটা জিনিস বুকি গেছে পেয়ে। তাড়াতাড়ি নিয়ে এসে বলল—“দাঁড়ান টিকিটটা করে আসি।”

বের হয়ে এসে চারিদিক দেখে নিয়ে বলল—“একটু বসলে কেমন হয় ঐ স্থানটার?”

—অল্প দূরেই একটা গাছের নীচে প্লাজা সিমেন্টের বেঞ্চ, সেটটা দেখিয়ে।

সূচিরা দেখে নিয়ে বলল—“ভার সময় কোথায়? এটুকু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তো কাটিয়ে দেওয়া যায়।”

নিখাভরেই বেন একটু চুপ করল ভূপেশ, পরে বলল—“একটু স্বার্থপরের মতো শোনায়। আমি সেইখান থেকেই আসছি, একরকম ছুটে।”

“আটকে গিয়েছিলেন? কেন?”

ভারপর শালুকগলোর দিকে চেয়ে বলল—“এইগুলো সংগ্রহ করতে বাধ্য? খুব শখ তো আপনার।... বেশ চলুন বাস।”

গোল বেঞ্চে আসবাবিধা, তারই মধ্যে একটু বালখান রেখে মুখোমুখি হয়ে বসল দু'জনে। সুচিরা একটু আড়চুই।

ভূপেশ সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ করে দিল, সময় নেই বলে একটু যেন নাড়াসই হয়ে পড়েছে, বলল—“এত আনন্দ হচ্ছে আপনাকে দেখে! তা আপনি কি করে আবার গাড়ি ফেল করলেন?”

“আমার তো গেল এগুনোর জন্যে।”

শুনে বলল—“নেহাও স্বার্থপরের মতন শোনায়, তবু বলব ভালো হয়েছে। নৈলে আপনার বন্ধু অমলা দত্তের সাহায্য নিতে হোত আমার।”

“বিশেষ কোন দরকার ছিল?” —একটু বিমূঢ়ভাবেই প্রশ্ন করল সুচিরা।

“দরকার না, ‘স’ ধরনের আর কি... আমাদের তক্কি হঠাৎ খেমে গেল তো? তাও একেবারে দোকম্ব জায়গাটিতে এসে।... মানে, তাহলে রেজেষ্ট্রারি বিবাহ সম্বন্ধে আপনার মতটা আসলে কি?”

“এই।” —একটু বিস্মিতভাবে চেয়ে একটু হেসেও ফেলল সুচিরা।

“না—মানে—দরকারটা।...”

যেন অল্প সময়ের অনেক কথা সেরে নেওয়ার তাগিদে একটু দুতলয়েই অসুস্থ করতে বাচ্ছিল ভূপেশ, এই সময় একটা স্মিলোক সামনে দিয়ে একটি ছোট মেয়ের হাত ধরে একটু বাজার হয়েই বলতে বলতে চলে গেল—“এ গাড়িও আধঘণ্টা জেট—সকাল হলে লেট-হওয়া বের করত বাবুবা।”

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে সেই ভাড়িভাড়ির ভাবটাই বেন নামিয়ে দিয়ে ভূপেশ হঠাৎ একটু অনাচনক হয়ে চেয়ে বইল সামনের দিকে। একটু অস্বস্তি বৈক, তবে মেয়েরা এ-ধরনের ভাবান্তর খানিকটা বোঝে বলেই সুচিরা চুপ করেই রইল; যার এত কলোর শখ, সে হয়তো নতুন জোৎস্না এই মুক্ত বাতাস, তার সঙ্গে আরও কত উপলব্ধি করার অবসর পেয়ে গেছে একটু।

ওরও কিছু রক্ত লাগবে না; একজন পরিচিত সঙ্গীই তা। একটু কৌতুকরস থাকায় ভালোই লাগছে বরং।

এক সময় ভূপেশই বলল—একটু সচাঁকিত হয়ে—“হ্যাঁ, কী-যেন বলছিলেন—হ্যাঁ, এই তো—বলছিলেন তাহলে রেজেষ্ট্রারি বিবাহ—তর্থাৎ যখন গার্জেনদের নড়া করা গেল না, নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করে নেওয়া, সমর্থন আছে এতে আপনার?”

সুচিরা সময়ও পেয়েছে প্রথমবারের প্রশ্নের পর, হেসেই বলল—“কী জানেন? ভরাপেটের তর্ক, বস না থেকে সময় কমানো ওর মতো কি আছে? বিশেষ করে আমার মতন একটা মেয়ের মুখ দিয়ে যখন বেরোয়।”

“এই দেখুন, মেয়েদের আঁধার সম্পর্কে এত সচেতন হয়েও আপনি আবার এড়িয়ে যাচ্ছেন! আপনার মতন শিক্ষিতা একজন মেয়ে...”

“কি জানেন—হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে”—প্রশংসা বেড়ে যাওয়ার ভয়েই বাধা দিয়ে শুরু করল সুচিরা। বলল, —“পরিস্থিতি তো অনেকরকমই হতে পারে। তেমনি, যেমন বললাম এখন, মেনেও নিচ্ছেন তো অনেক গার্জেন। বিশেষ করে বাপ-মা যেখানে কনসার্নড (concerned) অর্থাৎ হৃদয়-মনের সম্বন্ধ যেখানে সবচেয়ে বেশি।”

দাঁতি দিয়ে বড়ো আঙুলের নখ খুঁটে খুঁটে শুনছিল ভূপেশ, চোখ তুলে বলল—“ধরুন যদি মেনে না নেন?”

হেসে ফেলল আবার সুচিরা, বলল—“প্রশ্নটা ক্রমেই আরও যেন শক্ত করে আনিছেন আমার কাছে।”

একটু বিরতি দিয়ে বলল—“কি জানেন? আমাদের তর্ক, ডিবেটিং সোসাইটির তর্কই, একাডেমিক (Academic); এতো কোন তর্ক-বাচস্পাতের শাস্ত্রীয় বিধান দেওয়া নয়।”

“সেটা শুনলাম অমলা দত্তের কাছে; বলল আপনি কলেজের ডিবেটিং সোসাইটির সেক্রেটারি।”

ঘুরে চোখ বড় বড় করে এমনভাবে চাইল সুচিরা যাতে অকপট বিস্ময়ের সঙ্গে খানিকটা কপট রাগও যেন মিশে রয়েছে। একটু লজ্জাও, একটু আত্মপ্রসাদও হয় বৈক কেউ যেতে পারিচয় নিতে গেছে জানতে পারলে।

বলল—“অমলা সব বলতে গেছে আপনার কাছে। তার সঙ্গে একচোটে বোকা-পড়া করতে হবে।”

এরপর যেন অনেকখানি জেনে ফেলার জন্যই বেশ সহজ হয়ে বসল সুচিরা, বলল—“বেশ, তাহলে আসুন, সেক্রেটারি হেসেবেই একটা প্রশ্ন করি আপনাকে উত্তর দিন—হঠাৎ সব ছেড়ে রেজেষ্ট্রারি বিবাহ নিয়ে এতটা উতলা হলেন কেন আপনি? নিজে জড়িত নন তো?”

বেশ একটু হেসে উঠল।

“হাদি বলি, তাই?”

একটু যেন থাকা খেল সুচিরা, যেন লঘু চাপলোর মধ্যে প্রশ্নটা করে বসলেও ঠিক এই উত্তরটা আশা করেনি। সামলে গিয়ে আবার বেশ সহজভাবেই প্রশ্ন করল—

“কোন বাধা পাচ্ছেন তাতে?”

“পেতে পারি।” —একটু সময় নিয়ে উত্তর করল ভূপেশ। একটু স্বতন্ত্রত খেয়ে গেছে, তবে বিষয়টার মাঝখানে এসে পড়ে আর পশ্চাদ্দপদ হবে না ঠিক করে নিয়েছে।

“পেতে পারেন? ঠিক বুঝলাম না তো।”

—মস্তবা করল সুচিরা।

হয়তো শক্তি সঞ্চয়ের জন্যই জ্যোৎস্না-প্লুত আকাশ আর চারিদিকের শ্যামালিগার ওপর দিয়ে দৃষ্টিটা একবার খীয়ে খীয়ে বুলিয়ে নিয়ে এল ভূপেশ, তারপরও একটু আড়াল রেখেই বলল—“ধরুন, কারও যদি ঠিক হয়ে গিয়ে থাকে বিয়ের কথা—বাপ-মায়ের দিক থেকেই।”

“বেশ তো।” —মেয়ে যেতে টুকল

সুচিরা। তাতেও উত্তর না পেয়ে সোজা প্রশ্ন করল—“অমৃত আছে তার নিজের—অপছন্দ?”

“অমৃত বা অপছন্দের কথা সে রকমের না থাকতে পারে।”

আবিষ্কৃতভাবে খীয়ে খীয়ে শুরু করল ভূপেশ, বলে বসল—“তবে জীবনে কখন কখনও এমন এক একটা দিন এসে যায় যখন মনে হয়, জন্মজন্মান্তর ধরে যার জন্যে প্রতীক্ষা করে আছি তাকে গেলাম পেয়ে—এমন একটা শব্দ লগ্ন—এমন একটা পরিবেশ—পরিস্থিতি যদি আসে তার জীবনে সুচিরা দেবী...”

“এসেছে?”—হাসি গুড়গুড়িয়ে উঠে পেটে, তবু কণ্ঠস্বর একটু করুণার, একটু, সহানুভূতির আমেজ মিশিয়েই প্রশ্ন করল সুচিরা, এখন তো অনেকখানিই স্পষ্ট।

“এসেছে বৈক সুচিরা দেবী...”

সুচিরার মনে হোল অল্প একটু যেন বুকে আরও একটু আতুরভাবেই শুরু করতে গিয়ে সামলে নিল ভূপেশ, পরক্ষণেই সচাঁকিত হয়ে বলে উঠল—“এই দেখুন, হয়তো ভুলেই বসতাম।... এইফুল কটা।”

বাড়িয়ে ধরল শালুকের মতবকটা। সুচিরা একটু, বুকেই দু'হাতে নিয়ে ধন্যবাদ জানাল।

এ যেন শেষ কথাটি বলা, সে শেষ কথা অনেক নতুন কথাই ভূমিকা।

একটু চুপচাপই গিয়ে থাকে এর পর। গেলও। এক সময় ভূপেশই বলল—“কি আমার কথাটার তো উত্তর পেলাম না... গাড়িটা এসে পড়বে এবার। আপনার তো চন্দননগর... বেশ, ধরুন, আপনিই এ অবস্থায় পড়লে কি করতেন?”

একটা “তাহা” উর্কি মারেই মনে, তবু একটা মুচতা, আর এমনই একটা উত্তরও জোগানো রয়েছে তার, মোহ-মুগ্ধার সোজাই সে, হাসিটা চেপে বাধা দৃষ্টির হয়ে পড়েছে সুচিরার পক্ষে। তবু সাধ্যমতো কণ্ঠস্বরটা সহজ—সংযত রেখেই বলল—“হয়তো এরকম চরম অবস্থায় পড়লে আমাকেও নেমে পড়তে হোত। কিন্তু লগ্নের তো শেষ নেই, একটুর পর আর একটাকে তো আরও গুরুতর মনে হতে পারে, তখন...”

“কিন্তু...” —বলে আবার শুরু করতে বাচ্ছিল ভূপেশ, সুচিরা ততক্ষণে ছানিটি ব্যাগটা খুলে একটা সুদৃশ্য বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র বের করেছে। বাড়িয়ে ধরে এবার একটু হেসেই বলল—“তার চেয়ে এই বা মন্দ কি বলুন?... হ্যাঁ, বাবা-মায়েরই ঠিক করা বৈক। বেশ হোল, অমলার জন্যে এনেছিলাম, গাড়িতে দিয়ে দোব বলে। আপনিই নিন।”

গাড়িটা এসে গেছে। “আমি এই মেয়েদের গাড়িতেই উঠে পড়লাম” বলে এগিয়ে গিয়ে রড ধরে উঠে পড়ে ঘুরে বলল—“আমাদের কিন্তু নিশ্চয়।”

চিঠিতে দুটি ফটো-রক দেওয়া রয়েছে। একটি সুচিরারই। দুটি আটকে গিয়ে দাঁড়িয়েই ছিল ভূপেশ, হঠাৎ সম্ভবত হোল এর পরের গাড়ি একেবারে নটা পাঁচে।

তাজাডাড়ি গিয়ে যখন উঠল, গাড়িটা চলতে আরম্ভ করে দিয়েছে।



সত্যসন্ধ বুদ্ধদেব বসু

(একাক্ষ নাটক)



পাত্রসাতী

জয়ানন্দ

উর্মিলা (জয়ানন্দের স্ত্রী)

পুলিশের দারোগা

পুলিশের ইন্সপেক্টর

উকিল

জয়ানন্দের একটি বন্ধু ও বন্ধুপত্নী

দুই প্রৌঢ়

এক বালক

দুটি কলেজের ছাত্র

একটি ছাত্রী

কাগজের হকার

নেপথ্যে বিভিন্ন কন্ঠস্বর

[কলকাতার যে-কোনো একটা থানা। লম্বা টেবিলের সর্ব দিকে একটি ছোকরামতো দারোগা বসে আছে, তার সামনে একটা বালি-কাগজের খাতা খোলা, হাতে কলম। শ্রাবণ মাসের মেঘলা বিকেল, কড়া ইলেকট্রিক বাল্বে বুলেছে সীলিং থেকে]

দারোগা (খাতা থেকে গুনগুন করে পড়ে)। I hereby depose
.... on the second of August ... my wife
... at 600 X Block, New Alipore ...

(ইন্সপেক্টর ঢুকলো, দারোগা পড়া থামিয়ে উঠে দাঁড়ালো।)

আসুন, সার। আপনার জন্যই বসে আছি।

ইন্সপেক্টর। কোনো জরুরি ব্যাপার? (টেবিলের লম্বা দিকটার
বসলো।)

দারোগা। সেই যে আপনাকে ফোন করলাম দুপুরে—(সেও বসলো।)

ইন্সপেক্টর। ও সেই মাড়ীর-কেস। আসামি কোথায়?

দারোগা। তাকে পাশের ঘরে বসিয়ে রেখেছি।

ইন্সপেক্টর। হাজতে দাওনি?

দারোগা। একজন রেসপেক্টেবল ভদ্রলোক, সার—

ইন্সপেক্টর। তের, তের ভদ্রলোক দেখছি যে, জগমাথা। কাজকে
বিশ্বাস নেই।

দারোগা। ঠিক কথা, সার, যা বলেছেন। তবে—এই জয়ানন্দবাবু—
মানে, আসামি—লোকটি কেমন অশুভ-মতো। নিজেই চলে
এলো থানায়, আমরা কেউ কিছুর জিগেস করার আগেই বলে
কিনা—আমি আমার স্ত্রীকে খুন করেছি, আপনারা
আমাকে গ্রেপ্তার করুন।

ইন্সপেক্টর। এতে আর অশুভ কী আছে। খুন করলেই কনফেস করার
ভীষণ ইচ্ছে হয় কারো-কারো।

দারোগা। তাই বলে পুলিশের কাছে! আর ভদ্রলোকটির কথাবাতাও
কেমন বাঁকাচোরা। সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে,
মানে হলো।

ইন্সপেক্টর। কী-রকম?

দারোগা। হয়তো আসল খুনকে বাঁচাতে চাচ্ছে। বা লুকোতে চাচ্ছে
কোনো পারিবারিক কলঙ্ক। বা হয়তো...মোথায় ঢোকা
দিয়ে মাথার গোলামাল।

ইন্সপেক্টর। বিচার জন্য পাগল সাজা আর মৃত্যু কী।

দরোগা। না, সার, এখানে ঠিক উল্টো ব্যাপার। জোর করে বলছে সে খুনে। আমি এখন বললুম, 'হুট করে একটা কথা বললেই তো হ'লো না, আদালতে প্রমাণ হওয়া চাই—' তখন মুখটা এইটুকু হ'য়ে গেলো। 'আপনারা ভাবলে আমার কথায় বিশ্বাস করছেন না?' 'ভাবিনি আমাকে কেউ অবিশ্বাস করবে।' খুনে হবার জন্য এমন হামলাতে আর দেখিনি কাউকে।

ইন্সপেক্টর। তুমি আর কতটুকু দেখেছো, জয়নান্দ। এই সোঁদন সার্ভিসে ঢুকলে। আমার বয়সে কিছুতেই আর অবাক হবে না।

দরোগা। ঠিক কথা, সার। কিন্তু ভুললোকেটি—

ইন্সপেক্টর। ভুললোকেটি হয়তো উচ্চাঙ্গের স্কিমিনেল—ভাবছে নিজের সেরা নিকে জাহির করলে অন্যেরা নিজে'র বলে ধরে নেবে। পোস্ট-মর্টেমের রিপোর্ট আসেনি?

দরোগা। আসেনি এখনো। তবে সেখানেও এক ফ্যাকড়া, সার। জয়নান্দবাব'র যিনি ফ্যামিলি-ফিজিশিয়ান, তিনি এসেছিলেন খানিক আগে। লিখে দিয়ে গেছেন ওটা ন্যাচারল ডেথ—হেমেরেজ অব দি হার্ট। খুব বড়ো ডাক্তার, সার। এম. আর. সি. পি. এক, আর. সি. এস—

ইন্সপেক্টর। ও-সব বাদ নাও। ব্যাড'র বাধা ডাক্তার—ওটুকু বন্দুকত্যা করবে না।

[টেলিফোন বাজলো।]

ইন্সপেক্টর (টেলিফোনে)। হ্যালো—মেডিকেল কলেজ?—হ্যাঁ, বলুন। ডাউটফুল?... পরজনিং-এর কোনো এন্ডিডেন্স নেই?... ডায়ালেন্স?... তা হ'তে পারে, কিন্তু.....? আচ্ছা, রিপোর্টটা পাঠিয়ে দিন। (টেলিফোন নামিয়ে রাখলো।)

দরোগা (উদ্‌গীষভাবে)। তাহলে, সার, পোস্ট-মর্টেমেও ডোঁকনিউ কিছু ধরা পড়লো না?

ইন্সপেক্টর (অপ্রসন্ন মুখভঙ্গি করে)। বলছে এক ধরনের স্ট্রোকের নাকি ঐ রকম রক্তপাত হয় ভেতরে-ভেতরে। তা থাকলে মরুক গে, এতে আর ডোমার আমার কী।

দরোগা। এক আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেলো দেখছি। ভুলচীহলো মারা গেলেন স্ট্রোক, আর তা-ই নিয়ে কী হাঙ্গামাটাই খাচ্ছেছে। নিজেরও হৈনস্তা, আমাদেরও খাটুনির একশেষ। সেই সকাল ন-টার এসেছি, সার, ভেবেছিলাম আজ ক্রস্ট-বেঙ্গলের খেলাটা দেখতে যাবো—

ইন্সপেক্টর। তা আমাদের আর জুরিসডিকশন কতটুকু? আমরা চালান করে দেবো—কোর্টে গিয়ে যা হয় হবে। ডায়েরি করছে?

দরোগা। এই যে, সার—(খাতা এগিয়ে দিলো।)

ইন্সপেক্টর (খাতার চোখ বুলিয়ে)। Jayananda Sarkar, Public Relations Officer, All-India Chemicals... my wife Srimati Urmila Sarkar ইনকোয়ারিতে কে গিয়েছিলো?

দরোগা। নগেনবাব, সার—পাকা লোক। এই তাঁর রিপোর্ট। (একটা ফাইল এগিয়ে দিলো।)

ইন্সপেক্টর (ফাইলে চোখ ফেলে, সরিয়ে রেখে)। ইনকয়েরেশন কোথেকে এলো—

দরোগা। সেই তো মজা, সার। পাড়া-পড়শি কেউ কিছু সন্দেহ করেনি। কেউ কম্পনাও করেনি গোলমেলে কিছু আছে। ভুললোক নিকে এসে বললেন আমাদের—বেলা এগারোটা নাগাদ, আত্মীরেরা সাক্ষিয়ে-টাক্ষিয়ে শয়শানে নিয়ে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে—ওরই মধ্যে হঠাৎ জট লাল পাগড়ি দেখে যা অবস্থা সকলের। আমরা এখন বললুম এই ব্যাপার, জয়নান্দবাব'র একটি লালী ফিট হ'য়ে পড়লো। ভেবে দেখুন, সার, উনি যদি থানার না-আসতেন, কিছু না-বলতেন, তাহলে এতক্ষণ নিশ্চিন্তে শোক করতে পারতেন স্মারি জন্য, দু-বছর পর আবার বিয়ে করে স্বর বাঁধতেন—কোনো জন্মে কিছুটা হ'তো না।

ইন্সপেক্টর। আসামিকে ডাকো। চেহারাটা দেখি।

দরোগা (হাঁক দিয়ে)। তেওয়ারি! জয়নান্দ সরকারকো বোলাও।

[নেপথ্যে তেওয়ারি'র তারি বুটের শব্দ। একটু পরে জয়নান্দ'র প্রবেশ। আধ-বরসী, মাথার চুল পাংলা ও ঊশকোখ'দকো, চেহারা সম্ভ্রান্ত কিন্তু এ-মুহুর্তে মলিন, পরনে প্যান্ট-শার্ট।]

ইন্সপেক্টর (তাকিয়ে, বাঁ নিকে চেয়ার দেখিয়ে)। বসুন। (জয়নান্দ বসলো।) আপনার নাম...(দরোগার ডায়েরি দেখে) জয়নান্দ সরকার?

জয়নান্দ। আছে হ্যাঁ।

ইন্সপেক্টর। বয়স.....উনচাল্লিশ?

জয়নান্দ। আছে হ্যাঁ।

ইন্সপেক্টর। আপনি বলছেন আপনি আপনার স্মৃতিকে খুনে করেছেন?

জয়নান্দ। বা সত্য তা-ই বলছি।

দরোগা। সত্য-মিথ্যা হাইকোর্টে ঠিক হবে। তা আপনিও জানেন না, আমরাও জানি না।

জয়নান্দ। আপনার কথা'র প্রতিবাদ করতে বাধ্য হচ্ছি। আমার স্মৃতির মৃত্যুর কারণ শুধু আমিই জানি।

ইন্সপেক্টর (খাতার চোখ ফেলে)। আপনি বলছেন...বাই স্ট্রোংলিং..... গলা টিপে মেরেছিলেন?

জয়নান্দ। ঠিক তা-ই।

ইন্সপেক্টর। কী করে? ফাঁস জড়িয়ে? না, এমনি—শুধু হাতে? (হাত তুলে আঙুল বাকালো।)

জয়নান্দ। বালিশ চাপা দিয়ে। একটা, দুটো, তিনটে বালিশ। (দরোগা ও ইন্সপেক্টরের চোখেচোখি।)

ইন্সপেক্টর। কী বাজে বকছেন! বালিশ চাপা দিয়ে কোনো সাবালক মানুষকে মারা যায় না।

জয়নান্দ। আমি বালিশের ওপর হাঁটু চেপে বসেছিলাম। আমার ওজন দেড় মন। আর উর্মিলা ছিলো ছোটোখাটো, দুর্বল-মতো।

ইন্সপেক্টর। উনি ছটফট করেননি? চাঁৎকার করেননি? চাঁৎকাব শব্দে ছুটে আসেনি কেউ?

জয়নান্দ। ও বুঝতে পারিনি ব্যাপারটা। চাঁৎকার সাধ্যও ছিল না। আর চাঁচালেই বা শব্দতো কে? শেষরাত অব্যবাহিত বৃষ্টি হচ্ছে, আমরা স্বামী-স্ত্রী-দরজা বন্ধ করে ঘুমোচ্ছি।

ইন্সপেক্টর। তারপর?

জয়নান্দ। তারপর আমি উঠে গিয়ে ডাক্তারকে ফোন করলাম। ডাক্তার তক্ষুনি এলেন; দেখে বললেন, স্ট্রোক।

ইন্সপেক্টর। আপনি ডাক্তারকে বলেননি যে আপনি বালিশ চাপা দিয়ে—

- জয়ানন্দ। না, বলিনি। ডাক্তার আমার অনেকদিনের বন্ধু, বিশ্বাস করতো না। তাছাড়া—কেমন লজ্জাও করলো। কিন্তু আপনারা পুলিশ—ভগবানের প্রতিনিধি—আপনাদের কাছে লজ্জা নেই।
- দারোগা। মাপ করবেন, আমরা আইনের প্রতিনিধি, ভগবানের সঙ্গে কোনো কারবার নেই আমাদের।
- জয়ানন্দ। কিন্তু সব আইন তো ভগবানেরই সৃষ্টি।
- দারোগা। ভুল বলছেন। আমাদের ইন্ডিয়ান পীনাল কোড ইংরেজের তৈরি—অন্য অনেক দেশের সঙ্গে তা মিলে না। আইন যদি ভগবানের হবে তাহলে তা এক-এক দেশে এক-এক রকম কেন?
- ইন্সপেক্টর। অত বকবক কোরো না, জগন্নাথ, আমি চিন্তা করছি। কী যেন ভাবছিলাম—হ্যাঁ—(জয়ানন্দের দিকে ঝুঁকি) আপনার মোটিভ কী ছিলো?
- জয়ানন্দ। (যেন কথাটা বুঝতে না পেরে)। মোটিভ...?
- ইন্সপেক্টর। মানে—কারণটা কী? ব্যাপারটা—কী বলে গিয়ে—একটু অব্যবহৃতিক তো। ইঠাৎ ও-রকম একটা কাজ কেন করলেন?
- জয়ানন্দ। অব্যবহৃতিক কেন হবে? অনেকেরই অনেককে মারতে ইচ্ছে করে মাঝে-মাঝে। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, যারা একসঙ্গে এক বাড়িতে থাকে, তাদের মধ্যে তো খুবই বেশি। একটা বয়সে বোনের। চুলোচুলি করে, ভাইয়েরা কিল-ঘুঁষি চালায়। সবই তো এ এক ব্যাপার। আমরা আজকাল নরম করে হিংসে বলি, কিন্তু হিংসার আসল অর্থ তো মেরে ফেলার ইচ্ছে। বড়ো হয়, বৃদ্ধি পাকে—তখনও কেউ কথা দিয়ে মারে, কেউ কোনো ব্যবহার দিয়ে। পুরোপূর্ণি খুন পর্যন্ত গড়ার না—সময় নেই বলে, সুযোগ নেই বলে। তাছাড়া, রংও পড়ে যায়।
- দারোগা। (সে খুব আগ্রহ নিয়ে শুনছিলো)। আপনার তাহলে রং ছিলো আপনার স্ত্রীর ওপর?
- জয়ানন্দ। তা ছিলো বইকি।
- ইন্সপেক্টর। সেই রাগের কারণটাই জানতে চাচ্ছি।—জগন্নাথ, উনি যা বলছেন সিন্ধে নাও।
- দারোগা। (খাতা টেনে নিয়ে, লিখতে-লিখতে)। ‘আমার স্ত্রীর ওপর আমার রাগ ছিলো—তারপর?’
- জয়ানন্দ। (ক্লান্তভাবে কপালে হাত বুলিয়ে)। আমি—আমি ঠিক—(থেকে গেলো)।
- ইন্সপেক্টর। (জয়ানন্দকে সাহায্য করার ধরনে)। আচ্ছা শুনুন—আপনার স্ত্রী—কিছু মনে করবেন না, আমাদের সবই জানতে হয়—তার কোনো গুরুতর অপরাধ কি ধরা পড়েছিলো? বিয়ের পরে? যেমন ধরুন, যদি অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে—আই মীন, ইজ ইট এ কেইস অব কনজুগেল জেলাসি?
- জয়ানন্দ। জেলাসি? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ওটা বড় ছিলো আমার। ভীষণ।
- ইন্সপেক্টর। মাপ করবেন, কারো ব্যক্তিগত জীবন দিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি বড়ো নোংরা ব্যাপার, কিন্তু আমাদের তো এ কাজ। আর আপনিও প্যাঁচে পড়ে গেছেন। আমি যা জানতে চাচ্ছি তা এই : আপনি কি আপনার স্ত্রীর ইনফাইডেলিটি কোন প্রমাণ পেয়েছিলেন?
- জয়ানন্দ। প্রমাণ?...ইনফাইডেলিটি? না তো।
- ইন্সপেক্টর। এমন কোনো লক্ষণ, যাতে তাঁর চরিত্র বিষয়ে—
- জয়ানন্দ। (ঝাঁকিয়ে উঠে)। ইন্সপেক্টরবাবু, আপনি মূখ সামলে কথা বলবেন!
- ইন্সপেক্টর। কী মুশকিল! তাহলে আপনার জেলাসি কেন?
- জয়ানন্দ। এ আমার স্বভাব। বিয়ের ছ-মাস পর থেকেই মনে হ’তে লাগলো আমার স্ত্রী আমার অসহ্য! সব সময় নয়। মাঝে-মাঝে। তখন মনে-মনে প্ল্যান করতুম, কী করে তাকে দূর করা যায়।
- ইন্সপেক্টর। সে কী! ছ-মাস পর থেকেই? অশ্রুত!
- দারোগা। (যেন ইঠাৎ নতুন সূত্র খুঁজে পেয়ে, ডায়েরির পাতা উল্টে)। আপনারদের বিয়ে হয়েছিলো...দু-বছর আগে। তা-ই না?
- জয়ানন্দ। ঠিক।
- দারোগা। তখন আপনার বয়স ছিলো...সিঁইটশ, আপনার স্ত্রীর...উনিশ। ঠিক? (জয়ানন্দ মাথা নাড়লো)। দ্বিতীয় পক্ষ?
- জয়ানন্দ। আরে না! বিয়ে আমার এই প্রথম, যদিও আগে—
- দারোগা। (উৎসাহিত হয়ে)। বলুন, বলুন, খামলেন কেন?
- জয়ানন্দ। ব্যাচলার—যুবক—রোজগার কার প্রচুর—মেয়েদের নিয়ে খেলাধুলো করতুম আরকি।
- দারোগা। (হেসে উঠে)। খেলাধুলো! বেশ বলছেন কথাটা।
- ইন্সপেক্টর। (দারোগার দিকে প্রকৃটি করে)। তুমি বড় বাক্যে কথা টেনে আনতে পারো, জগন্নাথ। ও-সবের কোনো যেনারিং নেই।
- দারোগা। ঠিক কথা, স্যার, যা বলছেন। তবে কী জানেন—আমি ভাবছিলাম বয়সের এতটা তফাৎ যখন, আর উনি নিজে ফুলে-ফুলে মধু খেয়ে বেড়াতে—ব্যাপারটা হয়তো—বাক্য বলে সন্দেহবাতিক, তা-ই।
- জয়ানন্দ। (ঝাঁকিয়ে উঠে)। হি! আপনারা কি আমাকে ইতর ভাবলেন!
- ইন্সপেক্টর। কী মুশকিল! জেলাসির একটা কারণ চাই তো?
- জয়ানন্দ। সেটা অন্য ধরনের জেলাসি।
- ইন্সপেক্টর। ধরনটা একটু বৃদ্ধিয়ে বলুন।
- জয়ানন্দ। মানে, আমি যে সত্যি বিয়ে করবো তা ভাবিনি। দিদি ছিলো—বেপরোয়া, কুড়ি-বাজ, লাফিয়ে-লাফিয়ে উদ্ভাসিত করেছি চাকরিতে। ঢুকোছিলাম তেইশ বছর বয়সে অ্যাপ্রেন্টিস হ’য়ে পাঁচশো টাকা, দু-বছর পর কনফার্মেশন—আটশো—তারপর হাজার—বারো শো—চোদ্দ শো—হ’তে হ’তে এমন একটা অংক দাঁড়িয়ে গেলো যা বলতেও লজ্জা করে। ন-টা থেকে পাঁচটা আপিশ, একবারও অন্য কিছু ভাবি না সেই আট ঘণ্টার মধ্যে, ভাববার সময়ও থাকে না। কিন্তু যেই আপিশ থেকে বেরোলম—সন্ধ্যাবেলা—রাত্রে—আমার অন্য চেহারা। চমৎকার জীবন। একা ধর্মিক, কিছুই জন্য কোনো জবাবদিহি নেই করো কাছে, মনে-মনে ভাবি—সারা কলকাতায় যদি এমন একজনও থাকে যে সত্যি স্বাধীন, মন যখন যা চায় তা-ই করতে পারে সে হচ্ছি আমি। এমনি করে চোদ্দ বছর কাটাবার পর একদিন উমিলায় সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। তিন মাসের মধ্যে বিয়ে।
- দারোগা। (সাগ্রহে)। লাভ-ম্যারেজ তো?
- জয়ানন্দ। তা বলতে পারেন। কিন্তু আমি ভাবাক।
- ইন্সপেক্টর। অবাক কেন?
- জয়ানন্দ। প্রথমে ভেবেছিলাম, খুকিটি তো দেখতে-শুনতে বেশ একটু খেলানো থাক। কিন্তু আস্তে-আস্তে অন্য কিছু ঘটতে লাগলো আমার মধ্যে—ঘটে গেলো। এমন কিছু—যা নতুন, যাতে সুখের যেন সীমা নেই আবার কষ্টও বড়।

দারোগা (সত্যিকার উৎসাহিত হয়ে, তার আসল কাজ প্রায় ভুলে গিয়ে)।
একেই বলে লাফ্ অ্যাট ফাস্ট সাইট। কিন্তু কণ্ট আমার
কোথেকে এলো?

জয়ানন্দ। মানুষের যদি স্বাধীনতা চলে যায়, তার চেয়ে কণ্ট আর
কী? যদি সব চিন্তা সব সময় শুধু একদিকে ছোটে, তার
চেয়ে কণ্ট আর কী? (ইন্সপেক্টরের ইঙ্গিতে দারোগা
আবার লিখতে আরম্ভ করলো।) আমার নানা দিকে কোঁক
ছিলো—কিছু ভালো, কিছু বদখোয়াল : বই, নাটক, মদ,
জুয়ো, মেয়েরা। কিন্তু হঠাৎ অন্য সব মেয়ে অত্যন্ত
সাধারণ হয়ে গেলো—সাধারণ—বাজে—কথা বলার অযোগ্য,
ডাকিয়ে দেখার অযোগ্য। কী অন্যায় বস্তুনে তো, কী
অবিচার, কী স্বার্থপরতা! (দারোগা কলম নামিয়ে অবাক
হয়ে মুখ তুললো।) বিয়ে হলো—আমার যেন বিশ্বাস হয়
না সে এখন থেকে আমারই কাছে থাকবে—একই বাড়িতে—
একই ঘরে—একই বিছানায়। (ইন্সপেক্টর কাশলো।) অথচ
আমার কাছে ব্যাপারটা কিছু নতুন নয়; আমি সত্যি
কেটেছি অনেক জায়গারে, অনেক শরীরে—নির্বিষে।

ইন্সপেক্টর (কেশে)। আপনার এ-সব কথা অব্যক্ত হচ্চে, জয়ানন্দবাবু।
এবারে আসল ব্যাপারে চলে আসুন।

জয়ানন্দ (উদ্মনভাবে)। হঠাৎ কী-রকম বদলে গেলো সব। অপিশের
কাজে কখনো আমার অনুনোযোগ ছিলো না, সারা ডালহুসি
পাড়ার বিখ্যাত ছিলো আমার ভালো পোশাক, ভালো
ব্যবহার, দক্ষতা, উপস্থিতবুদ্ধি, সব ধরনের লোকের সঙ্গ
স্বচ্ছন্দে মেলামেশার ক্ষমতা। আমার সারা জীবনটাই ছিলো
বলতে গেলে পার্বলিক রিলেশনের চর্চা : কোথাও কোনো
নিমন্ত্রণ বাদ দিই না, কলকাতার প্রায় সব বড়ো ব্যাপারেই
আমি উপস্থিত, কলকাতার ছোটো-বড়ো নামজাদারা প্রায়
সকলেই আমার পরিচিত, এমনকি আমার মৈত্রিকার্মেও
কোনো ঢাক-ঢাক গড়-গড় নেই। কিন্তু বিয়ের পরে আমি
যেন বস্তু একটা প্রাইভেট মানুস হয়ে গেলুম, যেন আমাকে
ঘিরে অদৃশ্য একটা দেয়াল উঠে গেছে। আপিশে বসে মাঝে-
মাঝে অনামনস্ক হয়ে বাই, কেউ দেখা করতে এলে বিরক্ত
হই মনে-মনে, পাটিগুলোকে মনে হয় সময় নষ্ট। যেন-সারা
জগৎ থেকে আমাকে ছিনিয়ে এনেছে একটা উনিশ বছরের
মেয়ে। কী অপমান!

ইন্সপেক্টর। তা মশাই নতুন বিয়ের একটা মোজ আছে তো। ওটা কিছ
না—সকলেরই হয়, সকলেরই কেটে যায়, আপনারও যেতো।
আরো কিছুটা সময় দিলেন না কেন?

জয়ানন্দ। মোজ? নেশা? কিন্তু আমার কেন নেশা হবে বলুন—
আমি তো হরেক নেশার ওস্তাদ, বাঙালি ঘরের দুধ-ভাত
খাওয়া ভালো ছেলে তো নই, বরং কিছুটা—যাকে বলে
ভোগরাস্ত। ডেবেছিলাম বরং হচ্ছে, এখন দেখাশোনার জন্য
কাউকে দরকার, করেই কোঁক না বিয়েটা। ঘরে একটি নগ্ন-
তরম সরল বাঁলিকা, আর বাইরে কাজ—অন্য সব-কিছু—
মাঝে-মাঝে, আগের চাইতে কিছুটা বেশি সাবধানে—আমার
রপগণীরা। কে জানতো আমার জীবনটা এমন চুরমার হয়ে
যাবে। কে জানতো আমি সত্যি ভুলে যাবে, হাটুজলে
ডোবার মতো দুর্দশা হবে আমার। (দারোগা ও ইন্সপেক্টরের
চোখেচোখি, দারোগা কপালে টোকা দিলো।) সংস্কারে
বাড়ি বসে থাকি—দেখি তাকে, শুনি তাকে, তার গন্ধ যেন
বাতাসে ভেসে বেড়ায় : আর আমি যেন তাতেই ভরপুর,
তারই জন্য আমি বিকিয়ে দিচ্ছি আমার সুস্থ, স্বাভাবিক
জীবন—যা-কিছু আমাকে সুস্থ করেছে—একদিন, যা-কিছু
দিয়ে অন্যদের আমি সুস্থ করছি। অভ্যেসের দোষে নতুন

বই কিনে আনি, কিন্তু পাতা ওগুটই না, মনে হয় আমার
বই পড়ে কিছু জানার নেই আর, কিন্তু উম্মিলার কাছে
অনেক-কিছু শেখার আছে। ভাবি—এ কি কোনো রোগ,
ব্যাদি, আমি কি বোকা হয়ে যাচ্ছি? কী করে এই তফাট
হতে পারলো? অগ্ন-পরমাণুর যে-বিশেষ সংযোগ ও
সামঞ্জস্যের নাম উম্মিলা, তার রহস্যটা কী?

ইন্সপেক্টর (গলা-খাঁকার দিয়ে)। অত জ্ঞানের কথা আমাদের মাথায়
চুকবে না, মশাই। খুনটা কেন করলেন তা-ই বলুন।

জয়ানন্দ। তা-ই ভেে বলছি। চাই, আমি তাকে চাই—প্রতি মুহূর্তে
প্রতি নিশ্বাসে। কখনো ভাবিনি কোনো চাওয়া অতন তীব্র
হতে পারে। অমন নিষ্ঠুর। কখনো ভাবিনি ভালোবাসা মনে
দাসব। কখনো ভাবিনি একজনকে চাইলে অন্য সব চাওয়া
মরে যায়। কখনো ভাবিনি ভালোবাসা এত ছোটো জিনিস
যে একজনকে দিলে অন্য কারো জন্য কিছু বাকি থাকে না।
আর তাই আমার রাগ, আমার অক্রোশ, আমার ঈর্ষা। অন্য
সব মানুষ—যারা স্বাধীন, যাদের মন নানা দিকে ছড়ানো,
তাদের ওপর। দু-বছর আমি সহ্য করেছি এই যন্ত্রণা—
কিন্তু মানুষ আর কত পারে! এখন দেখুন আমাকে—আবার
আমি স্বাধীন—আমি আমার পৃথিবীকে ফিরে পেয়েছি।

ইন্সপেক্টর (হাই চেপে)। নাঃ, এর কথার মাথামুণ্ডু কিছু বোকা যায়
না। ডায়েরিতে সই করিয়েছো, জগন্নাথ?

দারোগা (খাতা দেখিয়ে)। এই যে, সার।

ইন্সপেক্টর (খাতাটা একটু নেড়ে-চেড়ে)। ঠিক আছে। তাহলে
(জয়ানন্দর দিকে তাকিয়ে, অতিথিকে বিদায় দেবার ধরনে)
—আপনার উকিল কে?

জয়ানন্দ। উকিল? উকিল দিয়ে কী হবে?

ইন্সপেক্টর। হিরবোল! আপনি একজন খুনের আসামি, আর কোনো
উকিল ঠিক করেননি?

[গাউন-পরা উকিলের প্রবেশ। লম্বা, লিকলিকে রোগা, ঠীক্ষা
না, চোখ দুটো ছোটো ও চকচকে। কথা ও নড়াচড়া খুব ক্ষিপ্ৰ।]

উকিল। এই যে, আমি এ'র উকিল। (কর্ড বের করে) গোবিন্দ-
মাধব ভট্টাচার্য রি-এস-সি. এম-এ-বি-এল. অ্যাডভোকেট।
আমি মিস্টার সরকারের জামিন হচ্ছি, এ'র কেসও আমিই
লড়বো। (একটা টাইপ-করা দাঁড়িল বের করে) এখনটার
আপনার একটা সই দরকার, জয়ানন্দবাবু।

জয়ানন্দ। কী এটা?

উকিল (সহাস্যে)। কিছু নয়, জাস্ট এ কপিলাটি। জামিনের জন্য
দশ হাজার, দশ হাজার আমার। এটা আপনার এন্টেট
থেকে আমার প্রাপ্য হবে—এন্টেট মানে প্রভিডেন্ট ফন্ড,
ব্যাংকের টাকা, ইনশুরেন্স, ইনভেস্টমেন্ট, স্থাবর সম্পত্তি,
যা-ই হোক না। আমি ডিফেন্ড করবো আপনাকে, মার্ভার
কেস নষ্ট ড্রাগ করে—ইট'স ন্যাথিং, এ পোট সাম্পল
রিজেলি। আরে মশাই আপনি ফেরার হবেন না, জামিন, এও
জানি আপনি বেকসুর খালাশ পাবেন, তবে লীগেল ব্যাপারে
সবদিকেই চোখ রাখতে হয় জানেন তো। এই যে, এখনো।
(উকিল বিদ্রোহে কলম বের করলো, না-পড়ে সই করে
দিলো জয়ানন্দ।) এখন বাড়ি চলুন মশাই, কোনো ভাবনা
নেই, এল'বা থেকে নেপোলিয়নের মতো সগৌরবে স্বস্থানে
ফিরে আসবেন আপনি। আমি দু'দে উকিল গোবিন্দ
ভট্টাচার্য, তেমন-তেমন শয়তানকেও বাঁচিয়ে দিচ্ছি, আর
আপনি তো রিজেলি ইনোসেন্ট...

[রঙ্গমঞ্চে আলো বদল হলো, খানা রূপান্তরিত হলো জয়ানন্দের
বাড়ির বসার ঘরে। রাত নেমেছে, এক কোণে জ্বলছে দীপানো
আলো, জয়ানন্দ একটি সোফায় আশে শয়ে। উকিল পাইচারি
করতে-করতে কথা বলছে মাঝে-মাঝে তার ছায়া পড়ছে দেয়ালে।
তাকে চোখ দিয়ে অনুসরণ করছে জয়ানন্দ।]

উকিল

(আগের কথার জের টেনে)।...জ্যাক্স-মার্টিন্স ইনোসেন্ট। এক নম্বর (আঙুলে কর গুণে) : জজের সেনের লেখা ডেথ-সার্টিফিকেট। হেমোরজ অব দি হার্ট, কার্ডিয়াক অ্যাপোপ্লেক্সি। অত বড়ো ডাক্তার, মৃত্যুর কয়েক মিনিট পরেই পরীক্ষা করেছিলেন, কোনো বাপের ব্যাটার সাধ্য নেই উড়িয়ে দেয়। দুই : এ সে আপনি বালিশ চাপা দেবার কথা বলেছেন—মাপ করবেন, বলতে বাধ্য হচ্ছি ও-ভাবে প্রোলি-সাইড হতে পারে, ইনফ্যান্টসাইড হতে পারে, কিন্তু হাম-সাইড—অ্যামার্টসিং অর নট অ্যামার্টসিং টু মার্ডার—এক্সট্রিমাল ডিফিকাল্ট। আপনি কি মশাই আর-কিছু ভেবে পেলেন না—ক্রাইম-ফিকশন পড়েন না বাসি? তারপর তিন নম্বর : পোস্ট-মর্টেমও কংক্লুসিভ কিছু পাওয়া যায়নি। 'May have been a case of strangling —' তার মানেই 'may not'. স্বাভাবিক মৃত্যুর সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা হয়নি। এ 'may' কথাটার ওপর বাঘের মতো লাফিয়ে পড়বো আমি, জজের মন্ডু ঘুরিয়ে দেবো, জুরিদের চোখে রোদনধারা নামিয়ে আনবো আপনার জন্য সমবেদনায়। আর কেনই বা সমবেদনা হবে না? আপনি, একজন উচ্চশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক, অত বড়ো একটা চাকরিতে আছেন— স্ত্রীর থেকে কান্ডজ্ঞান হারিয়েছিলেন সেদিন, আপনার মাথার ঠিক ছিলো না; কেন থানার গিরে-ছিলেন, কী বলেছিলেন, কিছুই আপনার মনে নেই। আপনি কোর্টে দাঁড়িয়ে ওখ নিয়ে বলছেন, 'আমি কিছুই জানি না, আমার কিছু মনে নেই।' আপনার মুখ দেখেই বোঝা যায়, আপনি কত কষ্ট পেয়েছেন স্ত্রীর জন্য, এখনো পাচ্ছেন। (নিজের বাসিমত আর ভিত্তি হারে) আপনার জর্জরলামান পরীক্শম দেখে জুরিদের হৃদয় টব হয়ে; বাড়ি ফিরে স্ত্রীদের সংগে একটু ভালো ব্যবহার করবেন তারা, হয়তো ফেরার পথে কিনে নিয়ে যাবেন একখানা শাড়ি, বা বেলফুলের মালা, বা মিঠেপানের থলি। অনেক সখা মনে-মনে বলবে, 'আহা, আমরা যদি এমন স্বামীর হতো।' অনেক কুমারী আপনার দ্বিতীয় পক্ষ হতে চাইবে।

জয়ানন্দ

(শেষ পর্যন্ত শব্দে, চোখে আঙুল ঘষে)। আপনি কে বলুন তো? আমি ঠিক চিনতে পারছি না।

উকিল

যাকে এখন আমাদের সবচেয়ে বেশি দরকার, আমি তাই। উকিল।

জয়ানন্দ

আমার মনে হচ্ছিলো আপনি শকুন। প্রকান্ড শকুন—গলাটা নড়বড়ে—পাখা নেড়ে-নেড়ে ঝপঝপ করে হাটছেন।

উকিল

শকুন? (জোরে হেসে উঠে) বেশ বলেছেন, মশাই বেশ বলেছেন। তা এক বিশেষে আমরা শকুনেরই মতো। আমাদের হলো লান্ড প্রোফেশন, জ্ঞানের উষ্মালোকে আমরা বিচরণ করি, কিন্তু আমাদের দৃষ্টি পড়ে থাকে সেই রসাতলে, যেখানে চেউ ভুলছে চুরি, জোচ্চোর, ছোরা, আগুন, লোভ, হিংসা, পরস্পরীকাতরতা—যত রকম মৃত্যু মানুষের, যত রকম অন্যায়। দুঃখীর দীর্ঘশ্বাস, বৈধবার সর্বনাশ, বণিকের হাহাকার, অত্যাচারীর আত্মলান—এই সবের চিকিৎসা ও ভার আমাদের ওপর। যা অসুন্দর, যা অশোভন, এমনকি যা জঘন্য, আমরা তারই মধ্যে মশাল নিয়ে নেমে যাই—নিভয়ে। উদ্ঘাটন করি গোপন কুৎসা, ছিঁড়ি ফোঁসি কপট আচ্ছাদন, উদ্ঘাটন করি বিপন্নকে। আমরা অম্ম মানুষের ভাগ্য নিজের হাতে তুলে নিই : আমরা দেবতার মতো দুঃসাহসী। আমাদেরই ওপর নির্ভর করছে ন্যায়, ধর্ম, সার্বিকার, মানুষ-মানুষে সৌভাৱ্য, সম্মতি। বৃদ্ধের সময় সন্তান দিয়ে পাড়িছুড়ি ফাঁসিয়ে দেয়া চলবে কিনা, না কি শব্দ গোলা-

গুলি চালিয়ে মারতে হবে, তাও ঠিক করে দিই আমরা। অপরাধীর মন্ড না-কেটে তাকে ফাঁসিতে ঝোলানো কেন বেশি সভ্য, বেশি মানবিক, তা নিয়ে আমরা দিনের পর দিন তর্ক করতে পারি। আমাদের কাছে কিছুই সরল নয়; আপনি শতকরা সাত টাকা মূল্যে এক হাজার টাকা ধার নিচ্ছেন, এই দলিল আমি লিখে দিলে তা বোঝার জন্য অন্য একটি উকিল ডাকতে হবে আপনাকে। রোম্ভুর শব্দে সাত রঙে তৈরি, আমরা অন্ধকারের অসংখ্য রং বের করছি। বাঁশুর মাত্র দশটি অনুরূপ ছিলো, আমাদের চোখে সম্ভবপর অপরাধের অন্ত নেই। সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর ভেদ, তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর বুদ্ধি—ছেঁড়া, কাটা, দোমড়ানো, মোচড়ানো, বাকানো, প্যাঁচানো, ওলটানো, চ্যাপ্টানো : আমাদের পেশা হলো বৃষ্টির ভোজবাজি, বিজ্ঞানের ভেদিক। কিন্তু আমরা (একটু কেশে)—আমরা ঐ বৃষ্টি, বাঁশু ইত্যাদির চাইতে মানবচরিত্র একটু বেশি বুদ্ধি আমরা কখনো বলি না, 'মা গৃধঃ', 'মা জীহ', আমাদের ভাষায় একটিমাত্র নিষেধ আছে 'মাতৈঃ'। অপরাধ তোমরা করবে জানি, কিন্তু মাতৈঃ তোমাদের গ্রাণের জন্য আমরা আছি। (একটু থেমে; জয়ানন্দের সামনে দাঁড়িয়ে) আপনি কখনো হাইকোর্টের রক্তভরে গিয়েছেন?

জয়ানন্দ

গিয়েছিলাম একবার।

উকিল

(সাগ্রহে)। কোনো লিটিগেশন ছিলো?

জয়ানন্দ

না। আমাকে জুরি করেছিলো। শমন পেয়ে গিয়েছিলাম।

উকিল

তাহলে তো লীগেল প্রসিডিওর আপনার জানা আছে?

জয়ানন্দ

ঠিক জানা নেই। একদিন গিয়েই আমার এত খারাপ লেগেছিলো যে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়ে নিষ্কৃতি নিলুম। আর বাইনি।

উকিল

(দীর্ঘ নিরাশ হয়ে, বসে)। খারাপ লেগেছিলো? কেন?

জয়ানন্দ

পুরো ব্যাপারটা কেন—অবাস্তব লেগেছিলো আমার। আমি হকচাকিরে গিয়েছিলাম। কী জাকজমক, কী এলানিহ কান্ড—কিংবা যেন এক আশ্চর্য নাটক, অথবা এক ঐতিহাসিক মিছিল। (পিঠ ঝাড়া করে) এরাসমুসের মতো পোশাক, ডব্লর জনসনের মতো পরচুলা—এই সব পরে জেলের এসে বসলেন। উকিলদের পরনে ফাউন্টের মতো গাউন, মুখের ভাব জ্ঞানগম্ভীর। হঠাৎ একটা তথ্যখবরের মতো শব্দ হলো : আমি অবাক হয়ে দেখলাম, উল্টোদিকের উচু পাটাতনে দাঁড়িয়ে একটি কুচকুচে কালো আঁটো পোশাক-পরা লোক উচ্চৈঃস্বরে কোনো ল্যাটিন শ্লোক আবৃত্তি করছে। আমি চমকে গেলাম রীতিমতো : ল্যাটিন শ্লোক—এই কলকাতায়, গঙ্গার তীরে, ফ্রেমিশ রেনেসাঁস স্টাইলে তৈরি এই হাইকোর্টে। তারপর—আর সেইটেতে প্রায় গায়ে কাঁটা দিলো আমার, এডগার পো-র গল্প মনে পড়ে গেলো—মাটির তলা থেকে এক গোপন লিফটে চড়ে উঠে এলো আসামি, যেন পাতাল থেকে এক পিশাচকে তুলে আনা হলো, বা হেরড-এর সভায় জন দি ব্যাপ্টিস্টকে। ছোট কালো রোগা একটা মানুষ, গরিব, হাবাগোবা, হয়তো আগে কখনো কলকাতাতেই আসেনি—সে টালমাটু চোখে ডাকছে চারদিকে; কী হচ্ছে, বা হতে চলেছে, কিছুই যেন তার মাথায় ঢুকছে না। ঐ দৃষ্টোকে কিছুতেই মেলাতে পারছিলাম না আমি : একদিকে ঐ লোকটি, আর একদিকে গাউন, পরচুলা, গাম্ভীর্য, তারস্বরে ল্যাটিন ঘন্ট, গমগমে গলায় ইংরেজি। আমি বুঝতে পারছিলাম ও-সবের প্রয়োজন আছে; আইনের শৃঙ্খতা, নিরপেক্ষতা, নিষিদ্ধ ওজনে সুবিচার—সেই মহামান্বিত বিদ্রোহ ধারণার দৃশ্যরূপ

হ'লো এই আড়ম্বর। বুঝেছিলাম এই অশ্রুত পোশাকের অর্থ কী—অমনি করে সাধারণ জীবন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে বিচারকদের, উকিলদেরও—মহাপুরুষদের মতো কোনো অলৌকিক লক্ষণে চিহ্নিত করা হয়েছে, নয়তো আমাদের বিশ্বাস ও ভক্তি জাগবে কী করে? কিন্তু সেইজন্যেই—সেইজন্যেই আমার মনে হচ্ছিলো যে এখানে আমার একমাত্র আপন জন—আর-কেউ নয়, এই ছোট্ট কালো হাবাগোবা লোকটি, এই খুনের আসামি।

(সাপ্রহে)। খুনের আসামি? কোন বছরের কথা বলুন তো?

জয়ানন্দ (একটু ভেবে)। ঠিক মনে নেই। দশ-বারো বছর আগেকার কথা হবে।

উকিল। মে মাস ছিলো কি?

জয়ানন্দ। তা হতে পারে। খুব গরম চলছিলো তখন।

উকিল। (উজ্জ্বল মুখে)। সেই মামলার আসামি পক্ষের কোর্সিাল ছিলুম আমি। ব্যাটা তার বোয়ের মাথায় দা বসিয়েছিলো। আমি তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলাম।

জয়ানন্দ। আশ্চর্য! কী করে বাঁচলেন?

উকিল। (সহাস্যে)। আফ্রিল, শূন্য স্বামী মারলেই মাথা ফাটবে তা তো নয়, অনেক অন্য কারণেও মাথা ফাটে মানুষের। কোনো আই-উইটনেস ছিলো না, সবচেয়ে কেউ দ্যাখেনি। অকুস্থলে একটা বর্টি-দা শোওয়ানো ছিলো, রক্তে মাখামাখি হয়ে গিয়েছিলো সেটা। পুলিশ খানাতলাস করে অন্য কোনো দা খুঁজে পারিনি, আসল অস্ত্রটি নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলো। আমি কেসটা এইভাবে সাজালুম : বোর্টি বর্টিদায়ে কুটনো কুটছিলো—একমাস আগে বাচ্চা হয়েছে তার, শরীর দুর্বল—তার পাঁচ বছরের ছেলে ছুটে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লো তার পিঠে, সে টাল সামলাতে পারলে না, ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে এমন পড়া পড়লো যে মাথার চাঁদিতে সেড় ইপি বসে গেলো বর্টি-দা। কন্ড খাটতে হয়েছিলো ঐ বদমাশটাকে বাঁচাতে গিয়ে, কিন্তু তারপর থেকেই প্র্যাকটিস জমে উঠলো আমার। এখন জিমিনেল কেস-এ আমার প্রায় জুড়ি নেই—এক অঘোর দাশ ছাড়া—তা অঘোরবাবুর বরস প্রায় সম্বর হ'লো বকেছেন না—(দাঁত বের করে হাসলো)।

জয়ানন্দ। আপনি তাহলে জানতেন যে ঐ লোকটাই খুনে?

উকিল। (সহাস্যে)। কী করে জানবো গম্ভাই আমি কি উপস্থিত ছিলাম সেখানে? যেটা প্রমাণ হলো সেটাকেই ঠিক বলে ধরে নেবেন।

জয়ানন্দ। আপনি তাহলে মিথ্যেটাকেই সত্য বলে প্রমাণ করলেন?

উকিল। (গম্ভীরমুখে)। শুনুন, জয়ানন্দবাবু। সত্য, মিথ্যা—এগুলো এক-একটা ধারণামাত্র, নিজস্ব কোনো সত্তা নেই এদের, এরা এক-এক পাঠে এক-একরকম চেহারা নেয়, এক-এক বৃগে এক-এক বর্ণ ধারণ করে। আমরা ছেলেবেলায় ইউক্লিডের জ্যামিতিকে নিভুল বলে জানতাম, এখন শুনছি তাতে ডের গলদ বেরিয়েছে। নিউটনের ফিজিক্সকে মহা-সত্য বলে ভাবতাম, সেই ভাবনাকে বদলে দিলেন আইন-স্টাইন। ফ্রয়েডকে ফুটো করে দিলেন ইয়ং। আবার দেখুন, বিজ্ঞানের শেষতম আবিষ্কার আমাদের কাছে এখন যতটা সত্য, ততটাই সত্য ছিলো মধ্যযুগের খৃষ্টানের কাছে স্বর্গ-নরক, প্রাচীন হিন্দুর কাছে পরলোক, পিতৃলোক, ব্রহ্মলোক। কেমন করে আমরা ধরে নিতে পারি যে এ-মহাত্মার সত্য পরের মহাত্মার মিথ্যা হয়ে যাবে না? তাহলে বলুন—সত্য কী? সত্য কোথায়? যদি বা কিছু থাকে কোথাও—কেন তাকে বলা হচ্ছে কখনো অপ্রণ, কখনো হিরণ্য, কখনো কাকতালি,

আর কখনো বা—হঠাৎ প্রায় রসিকতা করে—অশ্রুত-পরিমাণ? এতেই বোঝা যায় সত্যের অনেক নাম, অনেক চেহারা, সব সত্যই আংশিক, আপেক্ষিক—একেবারে সুগোল নিটোল পুরোপুরি সত্যটিকে—সেই অগোচরীয়ান মহাত্মা-মহীয়ানকে—কোনো মানুষ কখনো ধরতে পারে না, জানতে পারে না। তাছাড়া, এই যে তথাকথিত সত্য—মানে, এ-মহাত্মা আমাদের সত্য বলেই বলাই—সেটা এমন জিনিশও নয়, যার অভাবে সভ্যতা অচল হয়ে পড়ে। যখন পিরামিড তৈরি হচ্ছে, স্লেটো তাঁর খাপসুরং ছোকরাদের নিয়ে মজলিশ জমিয়েছেন, ভগবংশীতা লেখা হচ্ছে, তখন কেউ কম্পনাও করেনি যে পৃথিবীটা গোল, বা কোনো-কোনো অদৃশ্য জীবাণুর আক্রমণে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি। আব, সব-চেয়ে বড়ো কথা, সত্য বলে যদি কিছু থাকবেই, আর যদি তা শতকরা একশো পরিমাণে সত্যই হবে—ধুব, সুদৃষ্ট, প্রাজ্ঞ, তাহলে তা কেন স্বপ্রকাশ হতে পারে না, বিনা চেষ্টায় জাগতে পারে না বিশ্বাস, যেন আলো, যেন সূর্য, কেন পারে না বেরিয়ে আসতে স্ফটিকস্তম্ভ থেকে নর-সিংহের মতো, উঠে আসতে হাঁশুর মতো অমর দেহে রক্তাক্ত থেকে? কেন, তবে, সত্যও প্রমাণসাপেক্ষ? কেন সেই দিব্য বিভাকে নির্ভর করতে হয় মানুষের ক্ষুদ্র বুদ্ধির ওপর, তৈরি-করা যুক্তির ওপর, বানিয়ে-তোলা সংকীর্ণ লজিকের ওপর? আপনার অবাধ লাগে না ভাবতে যে সত্য—সেই মহাজ্যোতি—সারা বিশ্বে তার একমাত্র আশ্রয় হলো পৃথকে মানুষ—যার পাঁচটা মাত্র ইন্দ্রিয়, এক মটর দূরের জিনিশও যে দেখতে পায় না, শুনতে পায় না দশ গজ দূরে কেউ কথা বললে, যে জন্ম নেন নাংটো হয়ে, অজ্ঞান হয়ে, গুঁড়িয়ে-গুঁড়িয়ে মগজে না-চোকালে যে অ-আ-ক-খ যোগ-বিয়োগ পর্যন্ত শিখতে পারে না! তাহলে তো দেখছেন, যে-বুদ্ধির জোরে আমরা ক-খ যোগ-বিয়োগ শিখি, সেই বুদ্ধিই আলো, তার বাইরে সত্য-মিথ্যা কিছুই নেই। এই ধরুন না, সত্য হ'লো এই যে আপনি সম্পূর্ণ নিরপরাধ, কিন্তু আপনার কপালে তা লেখা নেই, আপনার চোখের কোনো সংকেতে তা দৃষ্টব্য নয়, আপনাকে দেখে কেউ তা তর্কনি বুদ্ধি নেবে না—সেটাও আমাদের প্রমাণ করতে হবে, সেই গম্ভীর ধারের ফ্রেমিশ স্টাইলের বড়ো বাড়িটার, বহু লোকের সামান্য অনেক মাথা খাটিয়ে, অনেক বুদ্ধি সাজিয়ে। দেখছেন তো, সত্য কী দুর্বল, আর আমাদের বুদ্ধি কী দুর্দান্ত!

জয়ানন্দ। হা ভগবান, আমি কি কাউকে বিশ্বাস করতে পারবো না যে আমি খুন করেছি!

উকিল। না, আপনি পারবেন না। যদিও ইচ্ছে করলে সেটোও আমি প্রমাণ করতে পারি না তা নয়। আপনি খুন করেছেন কি করেনি, সেটা এখন আমারই ওপর নির্ভর করছে। আর আমি বলছি (জয়ানন্দের চোখে চোখ রেখে)—খুন আপনি করেনি। আপনার কথায় কেউ বিশ্বাস করবে না।

জয়ানন্দ (বিহবলভাবে)। তাহলে...আমি কি...আমি কি ভুল ভাবছি?

[জয়ানন্দের একটি বন্ধু ও তার স্ত্রীর প্রবেশ। দু-জনেই সুবেশ, কাশনদোরস্ত।]

বন্ধু। ভুল, জয়ানন্দ ভুল।

বন্ধুস্রী। আমরা বিশ্বাস করিনি। কখনো বিশ্বাস করবো না।

বন্ধু। আমরা জানি, ও-রকম কাজ তুমার পক্ষে অসম্ভব।

বন্ধুস্রী। তুমি কখনো একটা রুঢ় কথা বলিনি কাউকে।

বন্ধু। তোমার মন অকাশের মতো উদার।

বন্ধুস্রী। কেউ তোমার কাছে টাকা চেয়ে, সহাস্য চেয়ে, ফিরে যাননি।

- বন্দু। পরের দৃশ্যে তোমার প্রাণ কান্দে। কোমল তোমার উর্মিলা (হালকা হেসে)। কী বা-তা বলছে? আমার যা সব সময় অন্তঃকরণ।
- বন্দুপত্নী। আমরা মেরেরা তোমাকে আদর্শ স্বামী বলে ডেকেছি।
- বন্দু। আমরা পদব্রজে তোমাকে আদর্শ বন্দু বলে ডালোবেসেছি।
- বন্দুপত্নী। আমরা জানি তোমার স্ত্রীকে তুমি কত ভালোবাসতে।
- বন্দু। আমরা বিশ্বাস করিনি।
- বন্দুপত্নী। কখনো করবো না।
- অনেক স্ত্রী-পুরুষের কণ্ঠ (নেপথ্যে)। আমরা বিশ্বাস করিনি। কখনো করবো না!
- বন্দু ও বন্দুপত্নী (একসঙ্গে)। আমরা সাক্ষী দেবো।
- অনেক স্ত্রী ও পুরুষের কণ্ঠ (নেপথ্যে)। আমরা সবাই সাক্ষী দেবো।
- জয়ানন্দ (বিহ্বল চোখে চারদিকে তাকিয়ে)। উর্মিলা কোথায়? তোমরা কেউ জানো সে কোথায়?
- উর্মিলা। তার নম্বর দেহ ভুলানো হয়েছে, আপনি তার জন্য চিন্তা করবেন না। সত্যীভাব্য ছিলেন, তার আত্মার সঙ্গীত হবে।
- জয়ানন্দ। উর্মিলা, তুমি কোথায়? তুমি কি অনেক দূরে চলে গিয়েছে? এরই মধ্যে? এখনো কি স্মৃতি আছে তোমার? তুমি এসো—পারো তো মনুষ্যের জন্য কিবে এসো—আমাকে আমার সত্য বলে বাত।
- [ইঙ্গিতের আদায় নীল আলো, জয়ানন্দ বসার বস শোবার হয়ে বসপাশ্চরিত। একটা লম্বা সোফার ঘুমিয়ে আছে জয়ানন্দ। পিছনে একটা জানালা খোলা, বাইরে অন্ধকার, বৃষ্টির শব্দ। উর্মিলাকে দেখা গেলো মন্তে, অঙ্গপট, যেন কুশাশয় জড়ানো। তার কণ্ঠের যেন দূর থেকে ভেসে আসছে।]
- উর্মিলা। আমাকে ডাকছিলে?
- জয়ানন্দ (চোখ মেলে)। কী হয়েছিলো বলো তো?
- উর্মিলা। হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেলো। আধো ঘুমে বৃষ্টির শব্দ শুনলাম। (কান পেতে) আঃ, কী ভালো এই বৃষ্টির শব্দ। চোখ মেলে দেখি ঘরে আলো জ্বলছে, তুমি বিছানার উঠে বসে আছো। আমার দিকে তাকিয়ে। আমি তোমাকে জিগেস করতে বাঁজিলাম, 'তুমি বসে আছো যে?'
- জয়ানন্দ। আমারও ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো বৃষ্টির শব্দে। এত অন্ধকার যে কিছুই দেখা যাচ্ছে না; আমার ঘুমে ইচ্ছা করলো তোমাকে দেখতে, উঠে আলো জ্বাললাম। অনেকক্ষণ তোমার দিকে তাকিয়ে রইলাম।
- উর্মিলা। তাই অমন অন্ধুত ছিলো তোমার ডাকানো। বেশিক্ষণ একদিকে তাকিয়ে থাকতে নেই; চোখ টাটার, মাথা ধরে। আমি বলতে বাঁজিলাম, 'কী দেখছো? অমন করে তাকিয়ে আছো কেন?'
- জয়ানন্দ। তুমি ঘুমুজিলে। আমার মনে হলো, আগে তোমাকে ঘুমন্ত কখনো দেখিনি। আমরা তো একসঙ্গে ঘুমিয়ে পড়তাম, জেগেও উঠতাম একসঙ্গে। কী ভালো সেই ঘুমের পড়া, জেগে ওঠা। একটু কাৎ হয়ে শূন্যে ছিলো, বালিশে চুল ছড়ানো, একটি হাত বকের কাছে এলিয়ে আছে। আমি দেখিছিলাম তোমার বকের মূর্, ওঠা-পড়া—মূর্, কোমল, অতি কোমল নিশ্বাস; তোমার গলার দৃশ্য—একটি নীলচে শিরা, নিজেরা না-জেনে, মাঝে-মাঝে একটু, যেন কেঁপে উঠেছে। যেন পাখির পাখা, যে-পাখি এখন আকাশে উড়ে গেছে। যেন লালকের ডাঁটি, রাতের পুরুষে, রাতের হাওয়ার, গিরগির।
- উর্মিলা (ইংগিত)। আমি কিন্তু ফাঁকি দিচ্ছিলাম তোমাকে! আসলে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো। ইচ্ছা করে চোখ বুজে ছিলাম। আমার ভালো লাগছিলো। গা ভরা আরাম। সুখ। চোখের পাতার ফাঁক দিয়ে মাঝে-মাঝে দেখছিলাম তোমাকে। দেখছিলাম, তুমি আমাকে দেখছো। আমার মজা লাগছিলো।
- জয়ানন্দ। আমি অনেক কথা ডাবছিলাম। এই তো আমি তোমাকে হুঁইনি, রাখিনি তোমার গালের ওপর গাল—শব্দ চোখে দেখছি, কিন্তু তা-ই যেন বহুদূর, তা-ই যেন সব। মনে হলো—আমি যেন চুরি করে নিয়ে এসেছি তোমাকে, জগৎকে বঞ্চিত করে; অনেক, অনেক চোখের তুলন অতৃপ্ত রেখে তোমাকে অন্যভাবে খাচার পুরেছি।
- উর্মিলা। হি! কী অসভ্যের মতো কথা! আমি তোমার স্ত্রী, আমরা বিবাহিত।
- জয়ানন্দ। তারপর ডাবলাম—না, খাচার বাবে পোরা হয়েছি সে তুমি নও, সে আমি। তুমি আমার খাচ। আমি জগৎকে বঞ্চিত করিনি, আমি বঞ্চিত হয়েছি জগৎ থেকে। কেন এমন হলো যে অন্য কোনো মেরেকে আমার আর ভালো লাগে না, সেই মেরেরা, যাদের নিয়ে—
- উর্মিলা। আমার কাছে বড়াই কোরো না তো। আমি যেন চিনি না তোমাকে! বিয়ের আগে কত বদনাম শুনিয়েছি তোমার! মন থেকে নদীর পড়ে থাকে—আরো কত লোমহর্ষক লম্প। বাবার তো বেশ আপত্তি ছিলো বিরুদ্ধে। কিন্তু তোমার সঙ্গে আলাপ করে বললেন—ছেলেটি ডারি ভালো তো। যেমন নম্র, তেমনি বুদ্ধিমান।
- জয়ানন্দ। আমি দরকার-মতো ডোল বদলাতে পারি, উর্মিলা। সেই-জেনোই তো চাকরিতে এত উন্নতি হলো।
- উর্মিলা। বাজে বোকো না। নিজের বদনাম নিয়ে রটিয়ে বেড়ানো, এই এক খেরাল ছিলো তোমার।
- জয়ানন্দ। না, উর্মিলা, না! যা শুনিয়েছি তার অনেকটাই সত্য।
- উর্মিলা (হেসে)। তা তো বটেই। সেইজেনোই রান্ধার কোনো ভিখিরি দেখলেই তোমার পকেটে হাত চলে যায়। সিনেমার কন্ঠ দৃশ্যে কাঁদো।
- জয়ানন্দ। ওগুলো রিফ্লেক্স অ্যাকশন—বা বলতে পারো বিবেকের ঘৃণ। ওগুলোর কোনো মূল্য নেই।
- উর্মিলা। তুমি যা-ই হও, আমি তোমাকে ভালোবাসি। হুঁলো?
- জয়ানন্দ (কপালে হাত বুলিয়ে)। তুমি কি বুঝবে না ভালোবাসা কত কঠিন? কত নিষ্ঠুর? বুঝবে না যে ভালোবাসার প্রতিশোধী অন্য সব মানব, এই বিশাল পৃথিবী? বুঝবে না যে একজনকে ভালোবাসলে অন্য কাউকে ভালোবাসা যায় না? আমি হঠাৎ শিখর জয়লাম বাক্স হিঁড় দেবো, পুরোনো করে। খাচ ভেঙে

বেরিয়ে আসবো বাইরে, আকাশের তলার, সকলের সঙ্গে সমান হয়ে বাঁচবো। আমার ভালোবাসা—তার মনেই অন্য কারো প্রতি অন্যায়। বিদ্যুতের মতো এটা কিলিক দিলো আমার মনে—তোমার দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে। কিলিক দিয়ে মিলিয়ে গেলো না, একটা আলো যেন ঝঞ্জল হতে-হতে আমাকে অন্ধ করে দিলো—সেই এক মুহূর্তে। আমি তুরীয়ানন্দের স্বাদ পেলাম, মনে হলো আমি জগতে প্রেমিক, মানুষের হাতা—আমি সব পারি। আমার পক্ষে নিষিদ্ধ কিছু নেই। আমি একটা বালিশ তুলে নিয়ে তোমার মুখ চাপা দিলাম।

উর্মিলা। ও মা, সে তো তুমি দুঃখী করছিলে। আমি কি তা বুঝিনি ভাবছো? ঠিক তখনই আমি চোখ মেলে তাকিয়েছিলাম। বলতে বাচ্ছিলাম, 'আলো নিবিয়ে দাও, এসো ঘুমোই।' তোমার গলা জড়িয়ে ধরবো বলে হাতও তুলেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ—হঠাৎ যেন এক হাজার ছোরা আমার বুকে বিধলো। অসহ্য কষ্ট—কিন্তু ওরই মধ্যে আমার মনে পড়লো আমার ছেলেবেলা থেকেই হার্ট দুর্বল, মনে হলো আমার বিয়ের আগেই বলা উচিত ছিলো তোমার—কিন্তু আমারও মনে ছিলো না, অনেকদিন একটানা সুস্থ ছিলাম তো, আর বিয়ের পরে আমার শরীরের সব ছোটোখাটো কষ্ট ম্যাজিকের মতো সেরে গিয়েছিলো। আমি বুঝতে পারলাম আমার মরণের ডাক এসেছে।

জয়ানন্দ। একটা, দুটো, তিনটে বালিশ। আমি হার্ট দিয়ে চাপা দিতে লাগলাম তার ওপর।

উর্মিলা। কী বাজে বকছো! তুমি কাকে পড়েছিলে আমার মুখের ওপর, বুঝতে পারিনি কী হলো—আমি কিছু বলতে চাইলাম তোমাকে, 'ভালো থেকে', বা ঐ রকম কোনো শেষ কথা—কিন্তু আমার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোলো না এত কষ্টে যে চীৎকার করাও অসম্ভব, আমি আর নিশ্বাস নতে পারছি না। ভেবো না, আমি বেশকিছু কষ্ট পাইনি—একটু পরেই শান্তি।.....আমি বাই তবো? তুমি ঘুমোও। (উর্মিলা সঙ্গে যেতে লাগলো।)

জয়ানন্দ। (চীৎকার করে) আমি! আমি! আমি! আমি তোমাকে গলা টিপে মেরেছিলাম।

উর্মিলা। বাঃ, তা কি কখনো হতে পারে! (অন্তহীত হলে।)

জয়ানন্দ। ভগবান, তুমি আমার শেষ আশ্রয়। বলো—আমাকে বলে দাও—কী করে আমি-বোকাই আমি কী, আমি কী করছি।

[জয়ানন্দ পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লো। মগ্ন আলো বদল, দশা বদল। শীতের সন্ধ্যা, লেকের ধারের রাস্তা। দুই প্রোফ ভদ্রলোক হাঁটছেন, কাঁধে শাল ফেলা। একজনের সঙ্গে একটি আট বছরের বালক।]

প্রথম প্রোফ। এবারে শীতটা তেমন জমছে না এখনো।

দ্বিতীয় প্রোফ। এদিকে এইটুকু-টুকু ফুলকপি এক-এক টাকা।

প্রথম প্রোফ। সোদিন শেরালদার বাজারে দেখলাম—

কাগজের হকার (প্রবেশ করে)। সরকার ট্রায়াল! নিউ আলিপুর্ খনের মামলা! খনের মামলা! (দুই প্রোফ দুটো কাগজ কিনলেন। হকার কাগজ হাঁকতে-হাঁকতে বেরিয়ে গেলো।)

প্রথম প্রোফ (কাগজে চোখ ফেলে)। ও প্রসিকিউশন টুটি চেপে ধরেছে একেবারে। লোকটাকে খুলিয়ে না দেয়।

দ্বিতীয় প্রোফ। তার আগে চৌরাস্তায় ধরে চাবকানো উচিত। ইন-হিউম্যান! রসস্রাস।

প্রথম প্রোফ। সত্যি—একটা একুশ বছরের মেয়ে—আবার নাকি লাভ-ম্যারেজ হয়েছিলো!

দ্বিতীয় প্রোফ। লাভ-ম্যারেজের নিকুচি! লোকটাকে নপুংসক করে দেয় না কেন?

বালক। বাবা, নপুংসক কাকে বলে?

দ্বিতীয় প্রোফ (বালকের গালে চড় বসিয়ে)। চুপ, অসভ্য ছেলে!

[আলো বদল, একই দশা। চৈত্র মাসের সন্ধ্যা। দুটি কলেজের ছাত্র ও একটি ছাত্রী প্রবেশ।]

প্রথম ছাত্রী (উপরের দিকে তাকিয়ে)। বাবাঃ, কত ফুল ফুটেছে গাছটার। কী-ফুল এগুলো?

ছাত্রী। চেনো না? এই তো শিরীষ। তার সুন্দর কুল।

দ্বিতীয় ছাত্র। তোমার চাই? পেড়ে দেবো?

কাগজের হকার (প্রবেশ করে)। খনের মামলা—নিউ আলিপুর্ খনের মামলা—নতুন খবর—জোর খবর—গরম খবর! (তিনজন তিনটে কাগজ কিনলো। হকার কাগজ হাঁকতে-হাঁকতে বেরিয়ে গেলো।)

প্রথম ছাত্র (কাগজে চোখ ফেলে)। জয়ানন্দের ছবি দিয়েছে। আর এই তার স্ত্রী। কী সুন্দর মেরে'ট! একে কখনো মরণে পাবে কেউ?

ছাত্রী। আর এই বুঝি জয়ানন্দ? কী চমৎকার দেখতে! অত সুন্দর মুখ নিয়ে কেউ খুন করতে পারে?

দ্বিতীয় ছাত্র। তা কেন পারবে না? এই দুর্ভিক্ষের দেশে যে তিন হাজার টাকা মাইনে পায় সে খুনে ছাড়া আর কী? একশো লোকের ভাত মারলে তবে তো এ মাইনে হয়! যাও এবার—লপসি খাও, ঘানি টানো।

ছাত্রী। না, ককখনো না, ককখনো জেল হবে না।

দ্বিতীয় ছাত্র। আলবৎ হবে! বাবজীবন! কুড়ি বছর! পচে মরবে। তিন হাজার টাকা—স্কাউন্ডলাস!

প্রথম ছাত্র। বলা যায় না কিন্তু। সোদিন আমাদের ল ক্লাশে কথা হিচ্ছিলো—প্রোফেসর বললেন বথেণ্ট এডিডেন্স নেই, মোটিভও পাওয়া যাচ্ছে না। তা ব্যাপারটা বেশ রোমাণ্টিক বা-ই হোক।

দ্বিতীয় ছাত্র। রোমাণ্টিক খুঁয়ে জল খাও।

[মগ্ন আলো বদল, একই দশা। বর্ষার সন্ধ্যা। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রোফের প্রবেশ।]

প্রথম প্রোফ। কী-রকম মেঘ করলো হঠাৎ। বৃষ্টি না আসে।

দ্বিতীয় প্রোফ। বর্ষাকালে এই এক মুশকিল! সম্ভেবেলা একটু বে লেকের ধারটার বেড়াবো—

প্রথম প্রোফ। এদিকে হজম নেই। ঢেংকুর।

কাগজের হকার (প্রবেশ করে)। স্পেশাল! স্পেশাল! স্পেশাল! জয়ানন্দ সরকারের খালাস! জয়ানন্দ সরকারের খালাস! জোর খবর! জবর খবর! গরম খবর! গ্রাম! গ্রাম! গ্রাম! (প্রোফ দু-জন দুটো কাগজ কিনলো। কাগজ হাঁকতে-হাঁকতে হকার বেরিয়ে গেলো।)

দ্বিতীয় প্রোফ। ইশা! আস্ত একটা খুনের ছেড়ে দিলে!
প্রথম প্রোফ। কেস যে ফেশে গেলো মশাই! প্রমাণ হ'লে না।
দ্বিতীয় প্রোফ। ফেশে তো বাবেই—টাকার কাছে গোপাল নাচে জানেন তো।
দ্বিতীয় প্রোফ। ও-সব বলবেন না। ওতে কনটেম্পট অব কোর্ট হ'লে যাবে।
প্রথম প্রোফ। (ইহৎ বিচলিত)। আমি তো জজদের কিছু বলছি না—
 উকিলগুলো বাড়-কে-বাড় স্কাউন্ডেল। দিনকে
 রাত করে দেয়।
দ্বিতীয় প্রোফ। ভুল যাচ্ছেন মহাশয় গান্ধী উকিল ছিলেন। সি. আর.
 নাথ উকিল ছিলেন।
প্রথম প্রোফ। (জগে)। আরে মশাই আপনি দেখছি বেজার তাকিক
 হ'য়ে উঠলেন। একটা জলজ্যান্ত খুনে—কোণ্ড ব্রুডে
 নিজের স্ত্রীকে মার্ডার করে—সে পার পেয়ে গেলো।
 ছী—ছী—হী!

[প্রোফ দৃ-জন বেরিয়ে গেলো। প্রথম হাত ও ছায়াটির প্রবেশ।
 দৃ-জনের হাতেই খবর-কাগজ।]

হাতী (সোজাসে)। ছেড়ে দিয়েছে! জয়ানন্দকে ছেড়ে দিয়েছে!
হাতী। ভালো। আমি বিমলের সঙ্গে বাজি রেখেছিলাম। মশ টাকা
 জিতলাম।
হাতী। আমার কী মনে হয় জানো—উনি ভীষণ ভালোবাসতেন ওর
 স্ত্রীকে।
হাতী। আমি কেসটা স্টাডি করবো পরীক্ষার পরে—খুব ইন্টারেস্টিং।
 সব কাটিং রেখে দিয়েছি।
হাতী। তোমার কি মনে হয় উনি আবার নির্যে করবেন?
কাগজের হকার (প্রবেশ করে)। স্পেশল। স্পেশল। একস্ট্রা-স্পেশল।
 জয়ানন্দের আত্মহত্যা! খুনের আসামির আত্মহত্যা! জোর
 খবর। নতুন খবর। গরম খবর। গ্রাম—গ্রাম—গ্রাম—(দৃ-জনে
 দুটো কাগজ কিনলো। হাঁকতে-হাঁকতে হকার বেরিয়ে গেলো।)
হাতী (কাগজে চোখ ফেলে—কাঁপা গলায়)। ভুললোক আত্মহত্যা
 করলেন! বাড়িতে পা দেয়া মাত্র! কেন? কেন? কেন? কী
 হয়েছিলো? জয়ানন্দ, কী হয়েছিলো? (হাত ও হাতীর
 প্রস্থান।)
গাউন-পরা উকিল (প্রবেশ করে)। হি! গলায় দড়ি দিয়ে মরলো! একটা
 ভালো লোক, সত্যিকার ভুললোক, উঁচু দরের। আর আমি
 আপ্রাণ করে বাঁচিয়ে দিলাম—সত্যি বাঁচাবার যোগ্য মানুষ।
 কিন্তু বাঁচার যোগ্য ছিলো না... মর্নিং! নটরটিক। সাইকো-
 টিক। তা হাকগে মরুকগে, আমার কী এসে বাজে, আমার
 মামলা আমি জিতছি, আমার পক্ষের আরো ফেপে উঠবে।
 (হুত বেরিয়ে গেলো।)

[মশ মৃহুর্ভের জন্য অশ্রুকার। তারপর বাপস নীল আলো,
 অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে জয়ানন্দ ও উকিলকে। দৃ-জনেই
 দাঁড়িয়ে আছে, জয়গাটা অনিশ্চয়। উমিলা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে
 জয়ানন্দের দিকে, তার কাছে আসার চেষ্টা করছে, কিন্তু কোনো
 অদৃশ্য বাধার জন্য এগোতে পারছে না। জয়ানন্দ স্থির।]

উমিলা (আবেগের সঞ্চে)। কেন? কেন? কেন? কেন তুমি এ-কাজ
 করলে?
জয়ানন্দ (ঠান্ডা গলায়)। তোমার জন্য করিনি। আমি জানতে চাই,
 সত্য জানতে চাই। তাই, আর-কোনো উপায় না-পেয়ে,
 অজানার কাঁপ দিলাম। (উমিলার মুখ বিষন্ন হ'লে, মাথা
 নিচু করে আস্তে-আস্তে মিলিয়ে গেলো সে।) একদিন
 আমি জানতাম আমি খুনে করেছি। তা-ই বলেছিলাম।
 তারপর জানলাম, করিনি। তা-ই বললাম। কোর্টে দাঁড়িয়ে
 হলফ করে বললাম আমি কিছুই জানি না, আগে কী
 বলেছিলাম কিছুই মনে নেই। মিথো বলেছিলাম? কখন?
 আগে, না পরে? দুটোই তো সত্য হ'তে পারে না? না কি
 এও সম্ভব যে দুটোই সত্য—আমি খুনে করেছিলাম, অথচ
 করিনি? (সামনের দিকে তাকিয়ে) আপনারা জানেন—
 আপনারা কেউ কিছু জানেন? আপনি? ... আপনি?
 আপনি? আমি আপনাদের মুখে করুণা দেখতে পাচ্ছি—
 কিন্তু আমি করুণা চাই না, আমি জানতে চাই। বলুন,
 আপনারা কি কখনো স্ত্রীকে গলা টিপে মারেননি? মারতে
 চাননি? আবার পরের মৃহুর্ভে পাগলের মতো ভালো-
 বাসেননি তাকে? আপনি...? আপনি...? আপনি...? সব
 চূপ-কেন? বলুন, কিছু বলুন। না—বলার কিছু নেই।
 আমরা সকলেই মানুষ : যে খুনে করেছে—বা করেনি খুনে
 হয়েছে—বা হয়নি, জুরি, জজ, উকিল, সাক্ষী—সকলেই
 মানুষ। আইন মানুষের তৈরি, শৃঙ্খল মানুষের তৈরি,
 আমাদের ধর্মবোধ—তাও মানুষেরই মাংস। সেই মানুষ—
 যার পাঁচটা মস্ত ইন্দ্রিয়, যে এক মাইল দূরের জিনিসও
 দেখতে পার না, যাকে শ্রুতিয়ে-গুতিয়ে অ-আক-খ
 দেখতে হয়। যে কখনো পারে না অন্য একজন হতে, অন্য
 কারো মনের মধ্যে ঢুকতে—এমনকি নিজের মন, তাও তার
 অজানা। সেই মানুষ। সেই আমি। এই এক বছর ধরে
 আমি ভাবছি—ভাবছি—অনবরত ভাবছি : কী হয়েছিলো?
 সত্যটা কী? সেই সংশয় আর সহ্য হ'লো না আমার। কাঁপ
 দিলাম—পেরিয়ে এলাম। কিন্তু এখানে—এখানেও কোনো
 উত্তর নেই। এখানেও কেউ নেই, কিছু নেই। কেউ এগিয়ে
 এলো না ফলের মাল্য নিয়ে, কেউ আমাকে নরকে হুঁতে
 ফেললো না। কেউ বললো না, 'এসো জয়ানন্দ। কোনো ভয়
 নেই।' কেউ বললো না, 'এসো, তোমার শাস্তি নিয়ে যাও।'
 মৃত্যু—তাও কোনো প্রমাণ দিলো না আমাকে। আমাদের
 মৃত্যু—তাও অর্থহীন।

বর্নিকা



বইসংগ্রহ বৃত্তিক

ভবানী মন্থোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের পুস্তকচর্চা খাতার একটি
বিখ্যাত সংলাপ উদ্ধৃত করছি :

কেন্দার ।। দেখুন ওর গাট কি—
আপনার লাইব্রেরীতে সকল রকম সম্প্রদায়ের
বই আছে, কিন্তু কি বলে—চীনেদের
সংস্কৃত-পুস্তক বোধকরি নেই।

বিক্রম ।। (বাস্তব হইয়া) অজ্ঞে না!
আপনি কোথাও সম্ভান পেয়েছেন?

কেন্দার ।। একখানি যোগাড় করে
এনেছি—আপনাকে উপহার দিতে চাই।
বইখানি ওর নাম কি বহুদল্য। এই দেখুন
(স্বপ্নাত) বেটা চীনেমানের কাছ থেকে তার
পুত্রোত্তর জুতোর হিসেব চেয়ে এনেছি।

তারপর কেন্দার দামটা বোধহয়
ঠিকঠিক বলে পরিশিষ্ট টাকা হেঁকেছে;
নেহাৎ দেশে তার শালীদার এই হলী
চীনেমানের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে, টাকা
প্রয়োজন ইত্যাদি।

উপরের এই উদ্ভাবিত মন্থোপাধ্যায়-
সংগ্রাহকের মধ্যে কি রকম বাস্তবিক
ভাব সঞ্চিত হয় তার পরিচয় আছে, আর
সেই সঙ্গে কিভাবে তারা ঠিকজগতের
স্বাভা প্রভাবিত হন তারও ইঙ্গিত আছে।

বই সংগ্রহ করা শেষ পর্যন্ত বাস্তবিক
দাঁড়ায় তখন অনেকেই বলে করেন। অল্প
স্টীল এই নীতি গ্রহণ করেন। অনেক
বিখ্যাত ব্যক্তিকে বই চেয়ে নিয়ে না ফেরত
দিতে এবং অবলীলাক্রমে অপার বই
নিজের শেটফোল্ড বা ব্যাগে তুলে রাখতে
দেখাশি। কয়েকজন বিখ্যাত মহিলাকে
সাংবাদিক ও সাহিত্যপ্রেমী জানুসকে
নিরীক্ষিতভাবে কলকাতা স্ট্রীটের স্টেলিং ও
বহুতলা স্ট্রীটের ওয়েলিংটন মোড়ে নিরীক্ষিত
মোড়া-করা করতে দেখাশি। তাঁদের সংগ্রহ-
শালা নিশ্চয়ই প্রচুর মূল্যবান গ্রন্থে ভরে
উঠেছে। তার ভিতর চীনা সংস্কৃতশাস্ত্রের
বইও হরত পাওয়া যেতে পারে।

মার্ক টোয়েন বলতেন পাতলা একখানি
বই হলে টেবিলটাকে খাড়া রাখার সুবিধা;
চামড়ার বাঁধাই গ্রন্থাদিও উত্তম, কারণ তাতে
দড়ি কমানোর ক্ষুদ্রা শানিয়ে নেওয়া যায়;
আর একখানি থানইটসদৃশ মোটা বই
থাকলে বিড়ালের গায়ে ছুঁড়ে মারার
প্রয়োজনে তা একেবারে অভুজমারী সম্পদ।

কিন্তু আইনসম্মতভাবে গ্রন্থাদি
ব্যবহারের আরও অনেক প্রকার পদ্ধতি
আছে। যেমন এখনও পর্যন্ত জটিল করা
হয় নি কি কি বই পড়তে হবে এবং কি
পড়তে হবে না। সুতরাং বই কিনতে হবে—
বইপ্রকাশকরা তাই মনোহর বিজ্ঞাপনে

পাঠকদের আকর্ষণ করেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে
বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের অবদান
অবিস্মরণীয়। “জলের দামে বদাম সবাদ”
কিন্তু “বসুমতীর শ্বেতহস্তী বাহির হইল”
ইত্যাদি বা লেখকদের বিশেষণে “গল্প
সাহিত্যের শাহানসা বাদশা” ইত্যাদি ইচ্ছানী
কোনো প্রকাশকই ব্যবহার করেন না। তবে
বিজ্ঞাপনের মোহে পড়ে মনোহর স্বা-
প্রকাশিত গ্রন্থাদি কিনতে হয়। একবার কেন
হলে সেগুলি সবচেয়ে রাখতে হয়—সবাই
ধরে নিতে হয় সেগুলি সংরক্ষণযোগ্য।

এইভাবে অতি সহজে ‘বুক কলেকটিং’
বা গ্রন্থসংগ্রহের বাস্তবিক মানব মনে গড়ে
ওঠে। তারপর একবার বেশা ধরে গেলে গ্রন্থ-
সংগ্রাহক বিন্দু প্রণোদিত উন্নীত হওয়ার
জন্য “প্রথম সংস্করণ” সংগ্রাহক চেষ্টা
করেন, যেমন ডাকটিকিট-সংগ্রাহক প্রথম
প্রকাশের দিনের পোস্টঅফিসের ছাপ ডাক-
টিকিটে লাগানোর জন্য জীবন পরিত্যাগ
করে থাকেন। আগে একটা ধারণা ছিল যে,
গ্রন্থসংগ্রহের বাস্তবিক শব্দ লাখপতিদেরই
থাকে, এ ধারণা প্রান্ত। যে কোনো ব্যক্তি
মাঝে মাঝে যদি এক-আধখানি গ্রন্থ সংগ্রহ
করতে পারেন তাহলেই তিনি কালক্রমে
অভিধানিক অর্থে একজন গ্রন্থ-সংগ্রাহক
হয়ে উঠতে পারেন।

একজন গ্রন্থসংগ্রাহকের অজস্র বই,
কিন্তু তার জন্য আলমারির অভাব। নিশ্চিত
প্রশ্নকর্তা বললেন, এত টাকার সব বই
আর আলমারি নেই। গ্রন্থপ্রেমীরা উত্তরে
বললেন, গ্রন্থ ধার করে চেয়ে আনা যায়,
আলমারি ত আর কেউ ধার দেয় না।

সুতরাং সব বই যে বাজার থেকে কিনতে
হবে এমন কোনো বাধ্যধরা নীতি নেই। বই-
সংগ্রাহকরা তাই ‘যেন তেন প্রকারে’
নীতিতেই বিন্বাসী।

বহু ভক্ত পাঠক অচিরেই ‘গ্রন্থ-
সংগ্রাহক’ হয়ে উঠবেন যদি তারা জানতে
পারেন যে গ্রন্থ-সংগ্রাহক হলে তাঁর হাতে
পৃথিবীর যেসব দুপ্রাপ্য সাহিত্যসম্পদ
জমবে তা বৃষ্টি মাজিরমের মত প্রাতিষ্ঠান
নীলামের বাজারে চড়া দামের প্রতিবোধিতার
কিনতে পারে।

তাছাড়া জাতীয় সাহিত্য গ্রন্থাদিও
প্রচুর অর্থ বিনিময়ে বিক্রি হওয়ার সম্ভাবনা
হয়েছে।

পৃথিবীটা সরল, সম্ভবত অতিশয়
আনন্দপ্রদ। যখনই হাতে পরসা থাকবে তে
বই আপনার মনে লাগে তা কিনে ফেলুন
এবং সেই বইখানি আপনার মানসিক তৃপ্তি-
সাধনে সমর্থ হলে তাকে সবচেয়ে রেখে দিন,
প্রিয়জনদের পড়ান। আমাদের এই অস্থিরতার
কালটিতেও মাঝে মাঝে কিছু প্রশংসনীয়
এবং আনন্দদায়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।
যাঁরা বেশ বেনেশী গ্রন্থ-সংগ্রাহক তাঁদেরও
জানা উচিত যে, পৃথিবীর ইতিহাসে আগে
যেমন সাদৃশ্য প্রকাশিত হয়েছে তেমনই
আমাদের প্রত্যাশার অজস্র পূর্ণ করে
একালের মধ্যেও অনেক ভালো বই প্রকাশ
সম্ভব হয়েছে। এই সব গ্রন্থের মধ্যে অনেক
গুলি আগামীকাল চড়া দামে বিক্রি হবে,

আগামীকালের সংগ্রাহকের চক্ৰ, নিশ্চয়ই
হবে তখন তার দামের বহর দেখে। সুতরাং
একথা বলা যায় যে, আমাদের এই কাল গ্রন্থ
সংগ্রাহকদের কাছে একটি সুবর্ণ যুগ।

এমন হতে পারে, একালের কোনো কোনো
গ্রন্থ-সংগ্রাহক তাঁর পূর্ববর্তী যুগটাকেই
গ্রন্থসংগ্রহের ‘সুবর্ণ যুগ’ ভেবেছেন। তিনি
বর্ধমান রাজবাটি সংস্করণ ‘মহাভারত’ কিনতে
পারেন নি। হিতবাদী সংস্করণ রবীন্দ্র-
গ্রন্থাবলী বা বসুমতী সংস্করণ ‘শরৎচন্দ্র’
বা প্রথম চৌধুরীও তিনি পান নি। তিনি
পান নি ‘মিষ্ট ডিক’ ‘লিটল উইমেন’ ‘টম
সইয়ার’, ‘লস্ট অব দি মহিকানস’ প্রভৃতির
প্রথম সংস্করণ। আগের যুগে এসব গ্রন্থ
হরত গ্রামেও পাওয়া যেত।

আপনি গ্রন্থ-সংগ্রাহক তালিকার নাম
লেখানোর আগেকার যুগটা তাই সর্বকালেই
‘সুবর্ণ যুগ’ বলে চিহ্নিত। একথা সত্য,
যে-সব মার্কিন গ্রন্থের নাম উল্লিখিত হয়েছে
বা বর্ধমান রাজবাটির মহাভারত, বা হিত-
বাদীর রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি বই একালের
যে কোনো গ্রন্থের চেয়েও অতিশয় মূল্যবান
মূল্যে পাওয়া যেত। সেই কালে এ সব গ্রন্থ
উঁচু দামে বিক্রানোর তালিকার প্রকাশ করা
অধিকার লাভ করে নি। শব্দ আমাদের
এই কালেই এ সব গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি
হয়েছে। দুপ্রাপ্য গ্রন্থমালা বলে চিহ্নিত
হলেই সেই গ্রন্থের মূল্য বাড়ে।

আগামী কালের দুপ্রাপ্য এবং বহুদল্য
গ্রন্থ তাই আজকের দিনের উত্তম গ্রন্থাদি।
এই কালের গোড়ার দিকে প্রকাশিত তিন-
খানি কাব্যগ্রন্থের এখন ভারী চড়া দাম।
এই কবিদের নাম এডনা মিলে, এলেনর
ওরাইলি এবং এডুইন আর্লিংটন ব্রিন্সন।
মার্কিন ও ব্রিটিশ বইয়ের বাজারে এঁদের
প্রথম দিকের গ্রন্থের অনেক দাম। এ যুগের
যেসব গল্পলেখকের রচনার সংস্করণ
আগামীকাল চড়া দামে বিক্রি হবে তাঁদের নর
উইলিয়াম ফকনার, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে,
টমাস উলফ, উইলো ক্যাথার (আমেরিকান),
বার্নার্ড শ, ওয়েলস, গলসওয়ার্থি, সমরসেট
মম, আলডস হাক্সলি, বার্ট্রান্ড রাসেল
(ইংলণ্ড) এবং আলবের্ট কামু, মাদাম সীম
দা বুলোয়া ও জাঁ পল সার্ত্রে (ফ্রান্স)।

আমাদের বাংলা দেশে শরৎচন্দ্র-পরবর্তী
সাহিত্যিকদের মধ্যে কিছুটা বন্দো, বনফল,
মানিক বন্দো, তারাপ্রসন্ন বন্দো, বৃন্দাবন,
প্রেমেন্দ্র, প্রবোধ, অচিন্ত্যকুমার, অমলাশংকর,
মনোজ বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিমল
মিত্র, সমরেশ বসু, বিমল কল, নরেন্দ্র মিত্র,
শঙ্কর, জরাসন্ধ প্রভৃতির গল্প বা উপন্যাস
গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ততকাল চড়া দাম
উঠবে।

এঁদের যেসব গ্রন্থ তেমন জনপ্রিয় নয়
সেই সব গ্রন্থেরও এমনই চড়া দাম উঠবে যে
সংগ্রাহক হরত প্রথম দিকে একটু হতাশ
হয়ে উঠেন। কিন্তু এর জন্য হতাশার ভেমন
কারণ নেই।

এই যেসব লেখকদের নাম উল্লিখিত হল,
এঁরা ছাড়া আরো নিশ্চয় অনেক লেখক
আছেন যারা এখনও প্রায় বিগিনার বা

এখনও হাতেখড়ির পর্যায়ে আছেন। কিন্তু তাঁদেরও ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

যেমন জন স্টেইনবকের ঘাঁরা ভক্ত পাঠক তাঁরা অথবা কালবিদগণ না করে স্টেইনবকের রচনাবলীর প্রথম সংস্করণ সংগ্রহে লেগে-ছিলেন অনেক আগে, এবং সেই প্রচেষ্টার বিনিময়ে উপলব্ধি ডিভিডেন্ডও তাঁরা পেয়েছেন।

ঘাঁরা গভালিকা শ্রেণীর, চোখ-কান বুজে ঘাঁরা অগ্রবর্তীদের অনুসরণ করেন, তাঁদের অবশ্য একটু বেশী মূল্য দিতে হচ্ছে। কারণ, ঘাঁরা প্রথম ফুলের প্রসাদ নেওয়ার জন্য ভোরে না উঠে আসেন তাঁদের একটু হতাশ হতে হয়, খরচটাও বেশী পড়ে।

এই সব লেখকদের সম্পর্কে কোনো রকম গোপন সংবাদ চালাচালি হয় না, এমন কি তাঁদের রচনার গুণাগুণেরও যথেষ্ট বিচার বিশ্লেষণ হয় না। এমন কি এ রকমের প্রচারপত্রও প্রচারিত হয় না—“এই সব লেখকদের গ্রন্থ বহুমূল্য, পূর্বাঙ্কে সংগ্রহ করুন, বিলম্বে হতাশ হইবেন।”

গ্রন্থাদি সংগ্রহীত প্রথমত পাঠকদের রুচির ওপর নির্ভর করে। পাঠকদের রুচি এবং বিচার-বিবেচনাই সর্বোচ্চ মাপকাঠি। এই সব গ্রন্থের মলাটের মধ্যে একটা কাল-জয়ী-স্বার্থীর সৌরভ ছড়ানো আছে। সংগ্রহ করার এই একমাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য পদ্ধতি। কারণ, সর্বকিছু অতিক্রম করে পাঠক লেখকের রচনারই গুণমূল্য হয়ে পড়ে। তাই পড়া এবং সংগ্রহ করা পাশা-পাশি চলবে। শুধু সংগ্রহ করার কোনো মূল্য নেই। যিনি সংগ্রাহক তিনি স্বয়ং রুচিবান পাঠক হওয়ারও প্রয়োজন আছে।

সাধারণতঃ কেউ বোঝে কেউ বোঝে না। তখন এই বোঝা না-বোঝার মধ্যেই স্বভাবগত সংগ্রাহক এবং যে ব্যক্তি কোনো দিনই প্রকৃত সংগ্রহকার হয়ে উঠতে পারবেন না তার পার্থক্যটুকু উপলব্ধি করা যায়। আমাদের মনে হয়, পুস্তকসংগ্রহে একটা ভাবাবেগ-পূর্ণ দিক আছে, কিন্তু সেই সেন্সিটিভিটি অর্থে আঠালো নয়, একেবারে নিছক সেন্সিটিভিটি মনোভঙ্গী—তবে অন্য অনেক দিকও বর্তমান।

প্রথমত আশা করা অনায়াস হবে না যে গ্রন্থ-সংগ্রাহকের মনটা অস্তিত্ব বিশ্লেষণধর্মী হবে, তাঁর রুচির মধ্যে একটা আভিজাত্য থাকবে আর থাকবে নিরাসক্ত অহংকার। সংগ্রাহকবৃত্তির জন্যই মানসিকতার মধ্যে একটু অহংভাব জাগ্রত থাকবে, আর তার ফলে একটা বিদগ্ধ মানসের সৃষ্টি হবে যা নিঃসন্দেহে বেশ প্রীতিদায়ক। কারণ, এই বৈশিষ্ট্যটুকুর ফলেই তিনি অ-বিশ্লেষক সংখ্যাগুরুদের থেকে আপনাকে স্বতন্ত্র করে রাখবেন।

সর্বপ্রকারের গ্রন্থের প্রথম সংস্করণই মূল্যবান এবং সেই কারণে প্রথম সংগ্রহ করে রাখা লাভজনক হতে পারে। তাই সকলেই এই বিষয়ে আগ্রহশীল এবং এই দিকে আগ্রসর হওয়াও তেমন কঠিন নয়।

একথা সত্য, এবং সর্বজনবিদিত যে খাঁটি প্রথম সংস্করণ নগদ দামে বেশ চড়া হারে বিক্রী হতে পারে। যদি গ্রন্থের খরিশদার মেলে তাহলে যে মূল্য পাওয়া যাবে তা কম্পনাতীত।

স্বর্গত হেমেন্দ্রপ্রসাদ-ঘোষ মহাশয়ের সংগ্রহশালায় রবীন্দ্রনাথের কবিকাহিনী, (১৮৭৮), প্রভাত সঙ্গীত (১২৯১), নাট্য-কাব্য (প্রকৃতির প্রতিশোধ) (১২৯১), পদ-রঙ্গাবলী (১৮৮৫), রাজর্ষি (১২৯০), চিঠি-পত্র (১৮৮৭), ইউরোপ যাত্রীর ডায়ারী (১৮৯০), সাম্বাসঙ্গীত (১২৮৮), রাজা ও রাণী (১৮৮৯), ছোটগল্প (১৩০০) প্রভৃতি ছিল। নিঃসন্দেহে এই প্রথম সংস্করণের গ্রন্থগুলির বাজারদর অনেক হওয়া সম্ভব।

এই অবস্থা বিবেচনা করে, স্বল্পবিত্ত সংগ্রাহক বা যে সংগ্রাহকের সর্বোচ্চ হাতে-খড়ি হচ্ছে, তিনি যদি বুদ্ধিমান হন তাহলে তিনি যে পথে বিচরণ করার প্রাস্তি কম, সেই পথেই আচরণ নেমে পড়বেন। পুরানো দিনের ‘বাজার সরগরমকারী’ ‘হাই স্পট’ মার্কা বই এবং সেই সঙ্গে সমকালীন মার্কামারা গ্রন্থ নিয়ে তিনি সৌখীন এবং সমরদার সংগ্রাহকের মনে নতুন আকর্ষণ সৃষ্টি করবেন। এই বিষয়ে অপরের পদাঙ্কানুসরণ না করে তাঁকে নিজের বিচার-বুদ্ধির ওপর নির্ভর করতে হবে। এবং তার ফলে পরিণামে তিনি সুখী হবেন। তিনি লাভের পথ বুজে পাবেন, অবশ্য যদি তাঁর

বিচারবুদ্ধি সূক্ষ্ম হয়। এই মজার খেলার আইন মেনে চললে তিনি একই সঙ্গে মূল্য-বান গ্রন্থ এবং সেই সঙ্গে কিছু অর্থও লাভ করবেন।

‘হাই স্পট’ কথাটি এই ব্যবসারেই একটা চালু শব্দ। ফটকা বাজারের ‘তেজী মন্দির’ মত ‘হাই স্পট’ অর্থে বইয়ের বাজারের ‘তেজী’ গ্রন্থ বোঝায়। এক হিসাবে এই শব্দটিকে কিঞ্চিৎ স্থূল বলা যায়। কিন্তু ভালোই হোক আর মন্দই হোক ‘হাই স্পট’ কথাটির চল হয়েছে, ভাষার ভাণ্ডারে প্রবেশ করে গেছে। গ্রন্থসংগ্রাহকদের কাছে এই কথা ‘তেজী মন্দির’ সমগোষ্ঠ। কথাটি প্রকৃত-পক্ষে কিন্তু গভীর তথ্য-ব্যঞ্জক। প্রতিটি গ্রন্থ-সংগ্রাহক একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে ‘হাই স্পট’ কথাটি সর্বোচ্চ সাহিত্যিক মূল্য বিশিষ্ট গ্রন্থের প্রতিই সূচনীয় হওয়ার সম্ভাব। যে গ্রন্থটির কালজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা তার পক্ষে ‘হাই স্পট’ কথাটি খাটে। কিন্তু অনেক বাজে এবং বেশ খারাপ বইকেও ‘হাই স্পট’ বলা হয়ে থাকে।

পরলোকগত মার্লে জনসন ন্যাক সর্ব-প্রথম ‘হাই স্পট’ কথাটি ব্যবহার করেন। ‘হাই স্পট’ কথাটির অর্থ সর্বোচ্চ খ্যাতি-সম্পন্ন লেখকের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, নতুন এমন একটি গ্রন্থ যা লাঞ্চে লাঞ্চে বিক্রী হয়েছে, তাজা ফুলের মতো, এবং সেই কারণে সাধারণ পাঠকের কাছে তার একটা উদ্ভাপনর আগ্রহ থাকা সম্ভব। তাই একডাকে বলা যায়, সমরসেট মনের অর্থ হিউ-



গুরুদেব
দিয়ে তৈরি

Lord's

লর্ডের
লভেন্স ও টফি

লর্ড এণ্ড সন লিঃ কলিকাতা-১

AL-18 BEN

ম্যান বনডেজ' একটি 'হাই স্পট' গ্রন্থ এবং সেই সঙ্গে 'মিসেস উইগস অব দি ক্যাবেজ প্যাচ' বা 'পলিয়ানা'ও হাই স্পট। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম পাঁচা' হাই স্পট, আবার 'হরিদাসের গদ্যস্তকথাও' হাই স্পট।

সবই বেশ দৃষ্টপাণ্য গ্রন্থ। সমরসেতু গ্রন্থটি চিরকালই চড়া দাম পাবে, আবার অন্য যেসব বই-এর কথা উল্লিখিত হয়েছে তাও দৃষ্টপাণ্য। তা ছাড়া সংগ্রাহকের কাছে ওদের মূল্যও কম নয়। বহুমূল্য বই তারা সংগ্রহ করতে চান, তাই হুতোম ও হরিদাসের গদ্যস্তকথা সেখানে সমান সম্মানের আসনে বসেছে। কালক্রমে অবশ্য এই অবস্থার হেরফের হবে। সংগ্রাহকরা শেষ পর্যন্ত হরিদাসের গদ্যস্তকথা বা মিসেস উইগস নিয়ে হাফিয়ে পড়বে, আর সাহিত্য পাঠকের কাছে অফ হিউম্যান বনডেজের মূল্য বৃদ্ধি পাবে। হুতোম পাঁচা 'হরিদাসকে হারিয়ে দেবে। আর দামও ঠিক ঠিক নির্ধারিত হবে।

বলা বাহুল্য, 'হাই স্পট' গ্রন্থের তালিকা থেকে বোঝা যাবে যে সেই সব বই যে-কোনো কারণেই হোক কোনো না কোনো সময়ে পল্লীপাথের পথচিহ্নের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল। যেসব বই ছোট ছেলেমেয়েদের বা বাড়ির লোকজনকে পরিচুপ্ত করেছে যেমন লিটল লড ফনটেলরয়, সেন্ট এলমো, বা চারু হার, কিংবা স্বপ্নের ধন বা মা কালীর খাঁড়া; সেই সব গ্রন্থ প্রকাশ কালে এবং তার অনেক দিন পরেও বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল। যেমন 'গ্যামোনা' বা 'সুসান জেনক্স' বা 'আজকল ট্রাস কেবিন' কিংবা 'স্বর্ণজিভা' বা 'কুলীন কুল মরম্ব' বা 'কক্সাবতী' প্রভৃতি। যেসব গ্রন্থ জাতির চিত্তে সঞ্চিত করেছিল তাঁর আলোড়ন, তার মূল্য চিরকালিক।

অবশ্য যে সব গ্রন্থ সাহিত্য-পাঠকে তার প্রথম প্রকাশের দিন থেকে উদ্বেল করে তুলেছিল আজকের দিনে তাঁদের প্রথম সংস্করণ সম্বান করা কঠিন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডল' বা 'কক্সান্তের উইগ' কিংবা 'দুর্গেশমীন্দ্রের মাইকেলের মেঘনাথ বধ কাব্য' রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' 'বাল্মীকি প্রতিভা' 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' প্রভৃতির প্রথম সংস্করণ সংগ্রহের চেষ্টা করুন, বুঝবেন কি কঠিন ব্যাপার।

'মিসেস বেকেরর দি ভার্জিনিয়ান, বেন হুর প্রভৃতি গ্রন্থগুলি খুব বেশী দিন প্রকাশিত হয়নি, তবু তার প্রথম সংস্করণের সম্বান করা কঠিন।

এই সবই 'হাই স্পট'—যেমন 'স্কার্লেট লেটার', এডগার এলান পোর কাহিনী, শেকস-পিয়ারের ফেলিও এডিসন, শেলী, রাউলিং কাউন্স প্রভৃতির কাব্যগ্রন্থ। এমন কি ইমাসমের 'এসেস'ও প্রথম সংস্করণ পাওয়া যাবে না।

'নীলদর্পণ' 'বড়ো শালিকের ব্যাড রৌ' কিংবা গিরীশের নাট্যকালীর প্রথম সংস্করণ

পাওয়া যাবে কি? হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ ভট্টাচার্য, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরিন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেন-গদ্যস্তকথা তা সৌন্দর্যের কথা। তাঁদের উপন্যাসগুলির জনপ্রিয়তা ছিল অসীম, কিন্তু প্রথম সংস্করণ সম্বান করে পাওয়া যাবে কি? মণীন্দ্রলাল বসুর 'রমলা'র প্রথম সংস্করণ জেপিছিলেন গদ্যদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স, পাওয়া যাবে কি সেই সবজন-প্রিয় উপন্যাসের প্রথম সংস্করণ? কাম্বিত ঘোষের অনুবাদ 'ওমর খৈয়াম' প্রথম সংস্করণ পাওয়া কঠিন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের একখানি কাব্যগ্রন্থেরও প্রথম সংস্করণ পাওয়া যাবে না, তেমনই পাওয়া যাবে না কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের 'নতুন খাতা'।

তালিকা বন্ধ করে লাভ নেই। সাহিত্যের দুটি বিভিন্ন বিভাগ সম্বলিত এই তালিকা সম্বলিত। তাই একথা বলা অনুচিত হবে না যে 'হাই স্পট' অর্থে সেই কালের প্রেত গ্রন্থ কিংবা সেই কালের জনপ্রিয় গ্রন্থ।

তাই একালের কোনো উৎসাহী সংগ্রাহক যখন উপরে উল্লিখিত গ্রন্থাবলী সব সংগ্রহ করতে পারবেন আর সেই সঙ্গে আরো কয়েক শত দৃষ্টপাণ্য এবং সংগ্রন্থ, তখন তাঁর পাঠাগার হবে 'হাই স্পটের' এক মূল্য-রাস আশ্রয়। আর সৌন্দর্য সেই সংগ্রাহকই এই বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করতে পারবেন।

তবে, একথা বলা ভালো যে কোনো একটি গ্রন্থের আত্মমাত্র্য চাহিদা বলেই তা কিনে আলমারিজাত করার প্রয়োজন নেই। বই যদি আপনার চিত্তে অপরিণামী আনন্দ সম্ভার করে তবেই তা কেনা উচিত। লাভ যদি হয় সেই ভাবেই হবে, সেই লাভের পরিমাণ কথা যাবে না।

যিনি সদ্য সংগ্রাহক তিনি বেশী গ্রন্থ কিনতে পারবেন না। তাঁকে তাই খাতনামাদের তালিকার সঙ্গে জনপ্রিয় গ্রন্থের তালিকাও বিচার করতে হবে। তাঁর ধারণা হওয়া সম্ভব তা না হলে লোকের তাঁকে উত্তম সংগ্রাহক বলবে না। এসব চিন্তা অবশ্য একেবারেই নিরর্থক।

ধরুন, যদি শুধুমাত্র পাঁচকড়ি দে, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রভৃতির ডিটেকটিভ গ্রন্থ সংগ্রহ করাই তম্মার বাস্তবিক হয়, তাহলে কি আমি লাভবান হব না? অজ্ঞার বিশ্বাস করেক বছরের মধ্যেই তার মূল্য বৃদ্ধি পাবে। প্রথম সংস্করণগুলির মূল্য এমন বাড়বে যে, সবাই তা কিনতেই পারবেন না। এই সংগ্রহ কেনার জন্য তাই অপেক্ষা করে বসে থাকতে নেই। আমি তা ধাক্কা না। আমি বলব, নিজের পছন্দানুসারে বই কিনুন, কিনুন এবং সংগ্রহ করুন। বই-গুলির মালিক হওয়ারও একটা আনন্দ আছে। তার মধ্যে আছে এক গরম পরি-ভূমিত।

সারা পৃথিবীতে লাতিনবিশ্ব গ্রন্থার চাপ শুধু হওয়ার পূর্বে প্রথম সংস্করণের

বই কেনার জন্য রুগোপ, আমেরিকার একটা প্রচণ্ড মন্ততা জেগেছিল। যারা প্রথম সংস্করণ সংগ্রহের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন তাঁরা কেউ মূল্যের ভয়ে পিছিয়ে পড়েন নি। তারপর এই তেজী বাজারে মন্দা পড়ল।

যেসব 'হাই স্পটের' প্রকৃত মূল্য আছে তার বাজারদর এখনও বেশী। তবে একদিন যে দর উঠেছিল, ইলানীং তার চেয়ে কিছু কম দর হতেও পারে। যারা এই সব গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ বিক্রী করে তারা বেশী লেখাপড়া জানে না, কিন্তু কোন গ্রন্থের কি মূল্য, কবে তা প্রকাশিত হয়েছিল এবং কি দুর্য্যাহাসিক প্রক্রিয়ায় তা সংগৃহীত হয়েছে তা সে বলে দিতে পারবে।

সংবাদপত্র পাঠকদের স্বপ্ন ধাক্কাতে পারে যে, ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র পুরনো বইয়ের দোকানে ন্যাশনাল লাইব্রেরীর ছাপমারা কয়েকখানি বহুমূল্য গ্রন্থ আবিষ্কার করে-ছিলেন।

এখন অনেক উত্তম গ্রন্থের নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে, আগ্রহশীল পাঠক তা কিনে সহজেই পড়তে পারেন। কিন্তু বিদ্বানদের খেয়াল-খাশি মেটানোর প্রয়োজন প্রথম সংস্করণের চাহিদা চিরদিনই থাকবে।

বইগুলির কোনো কতিবন্ধি নেই, বই আগেও যেমন ছিল এখনও তাই আছে, তাই থাকবে। তার মধ্যে অনেক গ্রন্থই আছে সাহিত্যের কালজয়ী স্বাক্ষর। তাদের সংগ্রহ করা তাই প্রয়োজন। কিন্তু শূন্য ফ্যানশন বা নিজের সাংস্কৃতিক রুচির বিজ্ঞাপন হিসেবে বই কেনা উচিত নয়। প্রায়ঃরুপের অন্যতম আসবাব হিসেবেও নয়। অবসরবিদ্যাদানের প্রয়োজনেই বই কেনা উচিত। কিন্তু পুরনো বই ফিরিয়ে নিয়ে আসে পুরনো কালকে, পুরনো দিনের আমেজ তার প্রতিটি পৃষ্ঠায়, একথাও ভুলে গেলে চলবে না।

তবে, যে কথা বলার চেষ্টা করছি সেই কথাটি আবার পুনরাবৃত্তি করা ভাল। আজকের যে লেখক শক্তিশালী ও জনপ্রিয়, অবিলম্বে তাঁর গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করুন। অটোগ্রাফ করিয়ে নিন। শূন্য, বন্ধুরহলে তাই নিয়ে গর্ব করার জন্যে একাধিক এর দাম হবে, সম্মানও হবে—এই আশায়।

প্রশ্ন হতে পারে কারি সেই লেখকবন্দ বাঁদের বইয়ের দিকে বেশী নজর দেওয়া দরকার?

এই প্রশ্নের জবাবে বলব, যারা সবোত্তম গ্রন্থটি সংগ্রহ করতে চান তাঁরা নজর রাখুন, তরুণ লেখক-লেখিকাদের দিকে। যে গ্রন্থ এখনও অপ্ৰকাশিত সেই গ্রন্থই হয়তো সর্বাপেক্ষা মহৎ গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করবে, আর তার মূল্যও হবে অকল্পনীয়।

চাকরিটি হারাতেই হল। আমি দৈনিক সুপ্রভাত কাগজের চীফ রিপোর্টার, কর্তব্য চেষ্টার এবং কর্তব্য পালনে আমার উৎসাহ কিছু মাত্র কম ছিল না, বরং তা একটু উৎসাহকেই প্রবল ছিল। আমার একমাত্র লক্ষ্য ছিল এমন সংবাদ সংগ্রহ করব, যা অন্য কেউ আমার আগে পাবে না, এবং অন্যের আগে পাওয়া সংবাদেরও এমন ব্যাখ্যা দেব, যাতে পাঠককুল বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবে। 'স্কুপ' সংগ্রহে আমার চেয়ে পাকা রিপোর্টার অন্য কোনো কাগজে ছিল না। আমাদের কাগজেও না।

এবং দৈবাৎ এমন একটি 'স্কুপ' সংগ্রহ করেছিলাম যাতে সাধারণ মানুষ দূরের কথা, বিজ্ঞান জগৎ চমকে যেত। কিন্তু সম্পাদক তা অবিশ্বাস্য বলে অগ্রাহ্য করলেন। হয়তো তাঁর দোষ নেই, কিন্তু আমি চাকরির বিনিময়ে যা পেয়েছি তা আমার কাছে অনেক বড়।

কিন্তু কি ঘটেছিল বলি। আমার উপর ভার ছিল বর্তমান দণ্ডকারখোর পূর্ববঙ্গ-বাসী বাসিন্দাদের খবর সংগ্রহ করা। খবর, এমন ভাবে সাজাতে হবে, এমন ভাবে ফোটোগ্রাফ দিলে ভিসিয়েল করতে হবে যাতে

তা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। অর্থাৎ আমি যেভাবে হারছিলাম, সেইভাবে। অন্যভাবে হতে পারে, জানা আছে। এ যুগে বাস করেও যে-মানুষ সেকেন্ডে, সে অবশ্যই যুগভ্রষ্ট। কিন্তু আমার কাণ্ডটা শুনুন।

কোরাপুটে এসে দণ্ডকারখোর হেড কোয়ার্টার্স অফিসটি কোথায় একটি লোককে জিজ্ঞাসা করলাম আমার সমস্ত পরিবেশ, সমস্ত স্থানকাল, হঠাৎ চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল। আমি গভীর অরণ্যের মাঝখানে বিভ্রান্তবৎ দাঁড়িয়ে। আমার প্রশ্নের উত্তর এলো প্রায় শূন্য থেকে। কতঃ? কতঃসময়ান্তঃ?

প্রশ্নকারী যেই হোন, আমি ভয়ে ভয়ে আমার পরিচয় দিলাম। সংস্কৃত ভাষার উত্তরে বাংলা। অথচ দু-জনেই দু-জনে বুদ্ধিতে পারলাম খুব সহজে। জেনে



সমস্ত ভারতবর্ষ বিচলিত হয়ে উঠতে পারে। যাতে এদের সম্পর্কে সবার মনে যে উদাসীনতা আছে সে বিষয়ে তাদের মনে এর জন্য অপরাধবোধটি জাগে।

বিজয়নগরম স্টেশনে নেমে কোরাপুটের দিকে গিয়েছিলাম সন্দেহ নেই, কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছবার আগেই সেই অদ্ভুত কাণ্ডটা ঘটে গেল। যুগভ্রষ্ট কথটা জানি, হাতী যুগভ্রষ্ট হতে পারে, হরিণ হতে পারে, বনো মোষ হতে পারে, কিন্তু একটা মানুষ যে 'যুগভ্রষ্ট' হতে পারে,

অসম্ভবত হলাম, আমি হেতুযুগের দণ্ডকারখোর উপস্থিত হয়েছি। হেড কোয়ার্টার্সের অফিস কোথায় প্রশ্নকারী জানেন না, পূর্ববঙ্গের উপনিবেশ কোথায় তাও তাঁর জানা নেই। আমি তখন আমার মূল কর্তব্য ভুলে এই নতুন পরি-স্থিতিতে নতুন 'স্কুপ'-সংবাদ সংগ্রহের আশায় প্রায় দিশাহারা। প্রকৃতই দিশাহারা। কিন্তু কে কোথায় আছেন? কেউ কি কোথাও আছেন? কিছুই না জেনে ঘুরতে ঘুরতে এক মন্দির হুজির এসে



ফটো : বিশ্ববন্ধু বসাক

হাজির। তাঁকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলাম, আমার এই সময়বৈষম্যটা কি করে ঘটল? কেন আমি উদ্ভাসিত উপনিবেশ দেখতে পেলাম না? কেন আমি যেভাবে এসে পড়েছি? মূর্খ কিঞ্চিৎ কৃপামিশ্রিত হাসি হেসে বললেন, সে তো কয়েক হাজার বছর পরে ঘটবে, সে বিষয়ে অগ্রিম সংবাদ তো দিতে পারব না, বৎস। আর ভিন্ন যুগের কথা বে বলছ, এ তো এদেশে খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। এক এক স্থানে এক একটা যুগ স্তম্ভ হয়ে আছে। সাধারণ বর্তমানের মধ্যে বহু অতীতের একটি করে পকেট আছে। বলে মূর্খ খানস্বস্তি হলেন।

আমি হতাশ ভাবে একটু দূরে একটি বিশাল শাল্মলী তরু ছায়ায় বসে গলার ব্যাগ ও ক্যামেরা নামিয়ে রিপোর্ট লিখব, এমন সময় একটু উপরে দাঁষ্ট পড়তেই দেখি এক বৃদ্ধ শকুন ডালে বসে কিমোচ্ছে। ভয়ে শিউরে উঠলাম। আমার কি পরিণাম হবে কে জানে। তবু একটি ছবি তুললাম তার। দণ্ডকারণের ঘোরা এবং ফনের পরিচয় কিছ, থাকলে রিপোর্টটি খুব বাস্তব হয়ে উঠবে।

কিন্তু চিন্তায় বাধা পড়ল। দূরগত একটি আতনাদ-রমণী কণ্ঠের আতনাদ, আমাকে সচকিত করে তুলল। কোনো মানব-পশুর হাতে কি কোনো আশ্রম-বাসিনী উৎপীড়িত হচ্ছেন? হয় তো কোনো রাক্ষসের কাজ এটি। বাংলা দেশের খবরের কাগজের রিপোর্টার আমি, একা

আমি, অস্বহীন আমি, তবু আমি ল্যাফিয়ে উঠলাম। বাংলা দেশে নারীহরণের অনেক রিপোর্ট লিখেছি, অভ্যাস আছে, কিন্তু কোনো রমণীকে রক্ষা করা কি আমার সাধ্য?

আতনাদ ক্রমে নিকটতর হচ্ছে। রথের ঘর্ষ শব্দ স্পষ্ট শোনা যেতে লাগল। কি সর্বনাশ! এ যে রাক্ষসের রথ! এ যে সীতা-হরণ! সীতার মূখে শুধু রাম নাম। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাবে পথ থেকে সরে দাঁড়ালুম, নইলে রান-ওভার হবার ভয় ছিল।

গাছের ডালের বৃদ্ধ শকুনটা পাখা ঝটপট করে জেগে উঠেছে।

এর পর যে দৃশ্য আরম্ভ হল, তা বর্ণনা করি এমন ভাষা আমার নেই। তবে অভ্যাসবশতঃ প্রথমেই ক্যামেরাটি খুলে একটি ফোটোগ্রাফ তুলে নিলাম।

হাত আমার কাঁপছিল। সঙ্গে বন্দুক থাকলে দৃশ্যমণ্ডলকে গুলি করে মেরে ফেলতাম, এমনি তখন মনের অবস্থা। মন উত্তেজনার চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। সে উত্তেজনা প্রকাশ করা গেল না। স্বয়ং বাস্তবিকও তার বর্ণনায় বধ্যবোগ্য আবেগ ও উত্তেজনার রূপ দিতে পারেন নি, কারণ তিনি কিছ চোখে দেখে লেখেন নি। রামের জন্মের আগেই তিনি রামায়ণ রচনা করে বসে আছেন।

ঐ পাখীটাই জটায়ু। আমি এতক্ষণ বৃথাতে পারিনি। রাজা দশরথের সখা জটায়ু। জটায়ু চিৎকার করে রাবণকে বললেন, এবং সংস্কৃত ভাষায় বললেন—

ব্রাতঃ, তোমার এ কি প্রবৃত্তি! তুমি রামের ভার্য্য সীতাকে হরণ করে কোথায় নিয়ে চলেছ? সীতা আতশ্বরে বললেন, আপনি আমার শ্বশুরের বৃদ্ধ, দেখুন আমাকে রাবণ অন্যায্য ভাবে হরণ করে নিয়ে চলেছে। আপনি বৃদ্ধ, একে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা আপনার নেই, রামচন্দ্র এদিকে এলে শুধু, তাঁকে খরবটা দেবেন।

জটায়ু সে কথায় কান না দিয়ে তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যানকারী রাবণের উপর কাঁপিয়ে পড়লেন, এবং উভয়ের মধ্যে যে যুদ্ধ আরম্ভ হল তা বর্ণনা করতে পারব না জেনেই ক্ষান্ত হলাম। শুধু অভ্যাসবশতঃ ক্যামেরায় একটি ছবি তুলে নিতে ছুঁল হল না।

দেখতে-দেখতে জটায়ুর আক্রমণে রাবণের রথ ভেঙে গেল। কিন্তু রাবণের সঙ্গে জটায়ু পারবেন কেন, রাবণের খেলা জটায়ুর একখানা পাখা কেটে যাওয়াতে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

রাবণ উল্লসিত। তিনি তখন সীতাকে নিয়ে শূন্য ওড়ার উদ্যোগ করতেই আনি তার কাছে ছুটে গিয়ে বললাম, মার্জনা করবেন, আমি বাংলা দেশের এক খবরের কাগজের রিপোর্টার, আপনি আমাকে কিছ, বাণী দিন। —রাবণের মতো এক দুর্ধর্ষ গুণ্ডার মন ভেজাবার জন্যই বাণী চাইলাম। দেখলাম রাবণ আমার কথায় খুব গর্ব বোধ করছেন। খুব কৌশলটা করেছিলাম। কারণ রাবণের ভয়ে, দেখলাম, ওখানকার সবাই কাঁপছে, পশুপাখীরা পালিয়ে যাচ্ছে,

বনদেবীরা পালিয়ে যাচ্ছেন। এখন অবস্থার আমি খুব সংসারসং দেখিয়েছি, বলতে হবে।

রাবণ গমিত ভাবে বললেন, কি তোমার প্রশ্ন? সীতা হরণের প্রশ্ন তুলো না, কারণ এটি আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এ বিষয়ে কোনো উপদেশ দিচ্ছে কি তোমার অশ্বিনী চরণ করব।

বললাম না, আপনার অবস্থিত কিছ, করব না। আমার শব্দে জিজ্ঞাসা, আপনি তো লক্ষ্য রাখুন, আপনাদের সিংহলী ভাষা, কিন্তু সংস্কৃত জানলেন কি করে?

রাবণ বললেন, ওটা আমাদের বিন্যাসের অবশ্যপাঠ্য বিষয়। দেবতাদের সংগে বোঝাযোগের জন্য সংস্কৃত ভাষা আমাদের সবাইকে শিখতে হয়। বখন-তখন আমাদের নানা দৈবতাকে ভোষণ করে বর নিতে হয় কি না? এবং তাঁরা যদিও আমাদের সিংহলী ভাষা বোঝেন তবু সংস্কৃতে ভোষণ করলে বেশি খুশি হন। ভোষণ-ক্রিয়া ব্যক্তিকে কিছুই মেলে না। দেবতাদের চরিত্র আমাদের সমালোচনার বাইরে।

আমি মনে মনে ভাবলাম যথেষ্ট বল থাকলে তোমার চরিত্রটি সমালোচনার আওতার আনতাম। কিন্তু সে কথা তো প্রকাশ করবার উপায় নেই।

রাবণ বলতে লাগলেন, অনেক সময় হাজার বছর শতক করতে হয় কোনো কোনো বরের জন্য। এরই জন্য সংস্কৃত পড়া। এখনও সেই বাগলকালের দুঃখ ভুলিনি—সেই শব্দরূপ ধাতুরূপ—সেই হাহাঃ হাহৌ হা হাঃ, হাহাম, হাহৌ হাহান—বলে রাবণ হাঃ হাঃ করে হেসে উঠে হঠাৎ খেয়ে গেলেন। বললেন, আমার আর সময় নেই, রাম এসে পড়লে আরও দৌঁড়ি হয়ে যাবে।

সীতা ক্রন্দনরত অবস্থায় আমাকে বললেন, আপনি সাক্ষী রইলেন, রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হলে সব তাকে বলবেন।

আমি বলব, প্রতিশ্রুতি দিলাম।

রাবণ সীতার হুল ধরে শুনো উড়ে চললেন—টিক যেমন বাণ্যাকির রামারণে পড়েছি। কিন্তু কি ভাবে যে ওড়া সম্ভব হল, তা বোঝা যায় না। জেট নয়, পরমাণু শক্তি নয়, ডিজেল নয়, তবে এ কিসের শক্তি? নিশ্চয় কোনো ভৌতপ্রিয় দৈবতের করে এ ক্রমছল্লাঙ্ক।

হুটে এলাম হরশাপর জটায়ুর কাছে। বললাম, বিহঙ্গরাজ, আপনার এই অবস্থা দেখে আমার বড় দুঃখ হচ্ছে, বলুন যদি কোনো উপায় থাকে, কোনো ওষুধ আপনার জন্য থাকে, তবে তা সংগ্রহ করে এনে আপনার চিকিৎসার ব্যবস্থা করি। আমার কাছে অবশ্য ফার্স্ট এডের কিছু কিছু ওষুধ আছে। রক্তবন্ধের জন্য তাইটামিন-কে আছে, ব্যাণ্ডেজ আছে, কিন্তু তাতে আপনার চিকিৎসা চলবে না।

জটায়ু বললেন, কোনো উপায় নেই ভাই, আমার মৃত্যু আসন্ন। আমি দুঃখ করো না। তুমি আমার দেখা পেলে সব

বলবে তাকে। তবে মনে হয় তার দেখা না পেয়ে আমি মরব না। রামারণে তো সেই রকমই পড়েছি।

তাকে আশ্বস্ত করে বললাম, আপনার ইচ্ছা অবশ্যই পূরণ হবে। কিন্তু বিহঙ্গরাজ, আপনার এমন মৃৎশব্দ অবস্থাতেও জিজ্ঞাসা না করে পারছি না, আপনি সংস্কৃত শিখলেন কি করে? আপনি না বললে জানবার আর কোনো উপায়ই থাকবে না এর পর।

জটায়ু বেদনা চেপে রেখে বললেন, বলছি, লিখে নাও। একটা গোড়ার দিক থেকে আরম্ভ করি। লেখ, নানা জাতীয় শব্দ আছে—কন্ডর, সেক্টোরি বাক্স, টাকি-বাক্স এবং ল্যামেরগাইয়ের। আমি ল্যামেরগাইয়ের শব্দ। অন্যরা এদেশে থাকে না। ইউরোপে এবং দক্ষিণ এশিয়ায়—অতএব ভারতবর্ষেও আমরা থাকি। আমাদের ভাষা আরিগান, বা ইন্ডো-ইউরোপীয়। আমাদের ভাষার আদি হচ্ছে টিউটোনিক। টিউটোনিক আর আরিগান একই কথা। এই টিউটোনিক গোষ্ঠীর যে অংশকে ইন্ডো-ইউরোপীয় বলা হয়, তা দু'ভাগে বিভক্ত। একটি ভারতীয়, অন্যটি ইরানী। ভারতীয় ভাষা সংস্কৃত, তা থেকে এসেছে তোমাদের বাংলা, বিহারী, গুজরাটি, মরাঠী, গুজরা, শজাবী, রাজস্থানী, উর্দু, হিন্দি, সিংহলী ইত্যাদি। তাই আমি সংস্কৃত জানি, ইংরেজী জানি, এবং বাংলাও বঝতে পারি। আমার মৃত্যুর সংস্কৃত তো শুনবে, ওটা আসল ভাষা ক্র্যাসিক্যাল সংস্কৃত, পণ্ডিতেরা তৈরি করেছেন। বাইশ লক্ষ বছর আগে এর জন্ম।

তার মানে বাইশশত বছর। আমাদের এক, আপনাদের হাজার। বাই হোক আপনি কষ্ট করে এতটা বললেন এতে আমি আপনার প্রতি অভ্যন্তর কৃতজ্ঞ হয়েছি। কিন্তু আর একটি প্রশ্ন—আপনাদের কি দটো ভাষা শিখতে হয়, না একটিতেই কাজ চলে?

বিহঙ্গরাজ বললেন, দটো শিখতে হয়, ইংরেজী কম্পাল-সারি। না শিখলে আমাদের ইউরোপীয় ভাইদের সঙ্গে যোগাযোগের ভাষা হারিয়ে ফেলব। তোমরাও ইংরেজীটা ছেড়ে না। ওটা টিউটোনিক পিডার লো জারমান সম্প্রদায়।

অবশ্যই ছাড়ব না। কিন্তু রাবণ যে বললেন, সংস্কৃত শিখতে হয় তাঁদের, তিনি বোধহয় জানেন না যে সিংহলী ভাষাও সংস্কৃত থেকে হয়েছে?

এ গুড়োটা সারিবাকাদী, প্রতিহিংসা-পরায়ণ, ও শ্বেবচারী, ভাষাতত্ত্বের ও জানে কি?

বলতে বলতে বিহঙ্গরাজ আরও দুর্বল হয়ে পড়লেন। আমি কিছুক্ষণ ধরে মৃত্যু শীথের আওরাজ শব্দে পাচ্ছিলাম। কিন্তু সীতা হরণের পর থেকে এ আনন্দ কোলাহল কেন? জটায়ুর পতনেও কি অত্যাচারীদের দুঃখ বোধ হচ্ছে না? এমন তো হওয়া উচিত নয়।

জটায়ুও শুনছিলেন শীথের আওরাজ। বললেন, ওরা আনন্দ করছে এইবার রাবণের মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে বলে। তুমি বাণ্যাকির রামারণ পড়নি বাকি? পড়লে এ মৃত্যু তোমার মনে পড়ত।

আমি বললাম, মূল রামারণটা পড়িনি, রাজশেখর বসুর সংকলিত অর্থসংগ্রহ পড়েছি, এখন সব মনে পড়ছে বটে।

এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল রাম ও লক্ষ্মণ এদিকে আসছেন। আমার মৃত্যু শব্দে, হায় সীতা কোরায় সীতা। তিনি ক্রমাগত গাছকে জিজ্ঞাসা করছেন সীতা কোথায়? বনদেবীদের জিজ্ঞাসা করছেন সীতা কোথায়? পাখীদের জিজ্ঞাসা করছেন সীতা কোথায়? কিন্তু রাবণের ভরে কেউ উত্তর দিচ্ছে না।

আমি তো দেখেপেয়ে স্তম্ভিত। সাম্রাজ্যবাদী রাবণ সমস্ত দক্ষিণ ভারতে তার প্রভাব বিস্তার করেছেন, বাকি বলে লক্ষ্মণের অভ্যন্তর, তা দেখে মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেল। কলিযুগে আমাদের দৈনির্যতে যা দেখি, প্রত্যক্ষণেও তা, এ মৃত্যুই বিস্ময়কর বোধ হল।

কিন্তু রামের এই রকম কোরায় নারী-সুলভ ব্যবহার কিছ, অসঙ্গত বোধ হল। কেন তিনি পৌরবহীনিভাবে কেঁদে বেড়াচ্ছেন? লক্ষ্মণ তাকে বোকাচ্ছেন, দাদা বীরের মতো উঠ দাঁড়াও, বীরের মতো সীতা আশ্বেষণ কর। কিন্তু কোনো কলি হচ্ছে না।

জটায়ু কণি কণে বললেন, রাম এতটা বাকি?

আমি বললাম, রাম-লক্ষ্মণ দু'জনে

৩পূজার রকমারী ফ্যান্সি শাড়ী
এখানে দেখুন

সাড়ির মেলা
নিউবেনারসী শাড়িস

৩পূজার রকমারী ফ্যান্সি শাড়ী
এখানে দেখুন

৩পূজার রকমারী ফ্যান্সি শাড়ী
এখানে দেখুন

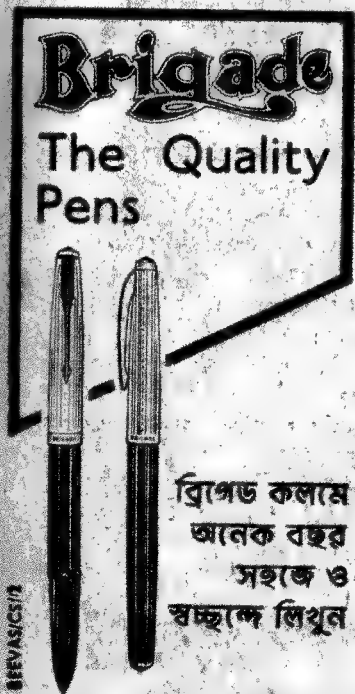
এসেছেন, কিন্তু এ কি? রাম যে আপনাকে লক্ষ্য করে শার সন্ধান করছেন?

জটায়ু বললেন, চিনতে পারেনি আমাকে, আমার দেহে রক্ত দেখে ভেবেছে আমি কোনো রাক্ষস, সীতাকে খেয়ে ফেলোছি।

আমি তা শ্রুনে ছুটে গিয়ে রামকে বললাম, এ কাজ থেকে নিবৃত্ত হোন, ইনি জটায়ু, রাবণ সীতা হরণ করে নিয়ে রাবার পাথে ইনি বাধা দিতে গিয়ে গরুড়রূপে আহত হয়েছেন। আপনি অবিলম্বে তাঁর কাছে যান, তাঁর সংবরণ করুন।

রাম-লক্ষণ ছুটে গেলেন সেদিকে, আমি এই সুযোগে একখানা ফোটা তুলে নিলাম।

হঠাৎ আমার খেয়াল হল, আমি যা আশা করে এসেছিলাম, তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি দামী জিনিস পেয়ে গেলাম। এত-বড় 'সুখ' সংবাদ ছাপা হলে একটা দারুণ উত্তেজনা সৃষ্টি হবে, যা পেরোছি এর চেয়ে বেশি পাওয়ার আমার কোনো দরকার নেই। অতএব আমার অবিলম্বে ওটা দরকার। এর পরের সবটা ঘটনা 'কভার' করতে হলে রাবণের মৃত্যু পর্যন্ত দেখতে হয়, এবং সেটা যে আমারও মৃত্যু তাতেই বা সংকট কোথায়? তা ভিন্ন আরও একটা ভর আমাকে চিন্তিত করে তুলল। আমি কিভাবে সময়ের দিক দিয়ে পিছিয়ে দ্রোণারূপে এসে পৌঁছোছি?



সোল সেলিং এজেন্ট
কমেন্ট সেলস কর্পোরেশন
৫৬১, ক্যানিং স্ট্রিট, কলিকাতা-১
ফোন : ৩৪-৬৩৮৮

আলোর গতিতে ছাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, তবু সময়ের গতিতে কিভাবে ছাড়ানো গেল? মনে পড়ল সময় আপেক্ষিক। পৃথিবীর বর্তমান সময় থেকে হঠাৎ যদি দ্রোণারূপের সময়ে গিয়ে পৌঁছাই তবে দ্রোণারূপে মাত্র এক দিন কাটিয়ে সেখান থেকে বর্তমান সময়ের ফিরে এলে হয়তো দেখব ইতিমধ্যে দশ পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেছে। তাই নানা দ্রোণারূপের ফিরেই আসতে চেষ্টা করলাম। রামের দুর্বল চরিত্র নিয়ে কিংবা জটায়ুর যন্ত্রণা নিয়ে অথবা সীতার দংশন নিয়ে প্রথমে দ্রোণাবনা হয়েছিল, তা থেকে এখন আমি সম্পূর্ণ মুক্ত। কারণ রামের সমস্ত কাহিনীটাই বাস্তবিক কতৃক কঠোরভাবে নিরাসিত। তিনি রামারূপে যা লিখে গেছেন, সেই রামারূপের রামের কোনো স্বাধীন ইচ্ছা নেই, ঠান্ডা উইল নেই, এখানে বাস্তবিকের সম্পর্কে রাম নিরাসিতবাদের অধীন সম্পূর্ণভাবে জটায়ুর নিয়ন্ত্রণের অধীন। অতএব ওনিরে ভেবে লাভ নেই।

অনামলস্কভাবে চলছিলাম হঠাৎ দেখি আমার পথ রূপ, আমি ঘেরাও হয়েছি। প্রায় পঁচিশজন বনদেবী আমাকে ঘিরে ধরেছেন। তাঁদের ভিতর থেকে একজন এগিয়ে এসে বললেন, আমরা আপনার কাজ সবই দেখেছি—আপনি এখানকার ঘটনা অন্যতর প্রচার করবেন বলে মনে হয়। একটা কলের সাহায্যে নানা স্থানের ছাপও তুলে নিলেন মনে হল। কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ কি বলতে পারেন? রাবণের ভয়ে আমরা আতঙ্কিত। সমস্ত দণ্ডকারণ্য সে অসংখ্য রাক্ষস ছেড়ে দিয়েছে, সেজন্য অধিকাংশ সময় আমাদের অলুপ্য হয়ে থাকতে হয়। এক মূন্সির কাছে জেনেছি বছরদিন পরে দণ্ডকারণ্য পূর্ব বাংলার বাস্তুহারা এসে দখল করবে। তখন আমাদের কি হবে? অরণ্য থাকবে না, আমরা অরণ্যদেবীরা কোথায় যাব? তাই আপনাকে অনুরোধ করি—আপনি আমাদের পক্ষ সমর্থন করে কোথাও একটা প্রচার করুন।

বনদেবীদের হাত এড়ানোর জন্য বললাম, নিশ্চয় করব, ঘেরাওটা তুলে নিয়ে আপনারা আমার এই ক্যামেরার সামনে দাঁড়ান।

আমিই দাঁড় করিয়ে গ্রুপ সাজিয়ে দিলাম। ফোটা তুলতে তুলতে মগজে এক বসিধ খেল গেল। বললাম, আপনাদের ভবিষ্যতের জন্য একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমি একই সঙ্গে দুটি যুগে বাস করছি, আর আপনারা একটায়, তাই আপনারা ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছেন না। তাই ভবিষ্যৎ যুগে যে আপনারা শিশিরকুমার ভাদাড়ির সীতা নাটকে নটগানের কাজ পারেন, সেটা শব্দে আমিই দেখতে পাচ্ছি। প্রায় পনেরো বছর বছরের কনকট হবে, অ্যামেরিকায় যাবেন তারপর।

বনদেবীরা একসঙ্গে খুশি হয়ে বলে উঠলেন, সত্যি বলছেন? যবে আনন্দ হল

শ্রুনে। একজন বললেন, আমাদের পদমর্যাদা কি হবে?

বনদেবীই থাকবেন। হেমেন্দ্রকুমার রায় আপনাদের শেখাবার ভার নিবেন।

বলতে বলতে দৃশ্য মিলিয়ে গেল। আমি ছুটে ফিরে চলেছি যে পথে এসেছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে আমার নিজের যুগে ফিরে চলেছি। পরিচিত প্রিয় ভেজালের যুগে, চোরাকারবারের যুগে। দন্ড চারপাের হেডকোয়ার্টাসের অফিসও দেখতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু তাতে কোনো আকর্ষণ ছিল না। যা সংগ্রহ করেছি, তা পরমাণু বোমার গতো ক্ষেটে পড়বে বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ছাকালে। হঠাৎ দৌঁধ এক ঋষি, দেখে জলে বিচলিত হয়ে উঠলাম। আবার কি যুগদ্রষ্ট হব? ঋষি জিজ্ঞাসা করলেন, মশর, আপনি হেড আপিস খুঁজতে আছিলেন না? বললাম, খুঁজছিলাম, কিন্তু এখন আর দরকার নেই। কিন্তু আপনি কি দণ্ডকারণ্য-বাসী কোনো ঋষি?

না, আমার নাম মুরলী দাস, এখানে মান মন্ড করি। আমার পাকা চুলদাড়ি আর খালি গা দেইখ্যা আপনার ভ্রম হইছে।—কবে মুরলী দাস তাঁর মরল হানিতে ফেটে পড়লেন। তারপর হাসিতে হাসিতেই বললেন, ঐ দেহেন আমার খ্যাত সোনার ধানে ভুইরা গ্যাছে গিয়া।

কিন্তু আমার তখন অন্য কিছুতে মন দেবার প্রবৃত্তি ছিল না, আমি তাঁকে নমস্কার জানিয়ে দ্রুত পা চালালাম।

রেলগাড়িতে বসে সমস্ত ঘটনাটিকে ট্রেজেনাপূর্ণ ভাষায় সাজিয়ে লিখে ফেললাম। কিন্তু কলকাতা ফিরে ক্যামেরা খুলে ফিল্ম বার করতে গিয়ে হতাশভাবে দেখি ক্যামেরা শূন্য। দ্রোণারূপের বিস্ময় ও বিভ্রান্তিতে ফিল্ম পরতে তুলে গিয়েছিলাম। এই ঘটনাটি আমাকে কি পরিমাণ নিরাশ করল তা সহজেই অনুমানযোগ্য। আমার রিপোর্টিং-এর এখন আর কি দায় রইল? প্রমাণহীন রচনা। মনটা ক্যামেরার মতোই শূন্য বোধ হতে লাগল।

সম্পাদকের কাছে তবু সব নিবেদন করলাম। বশনার ভাষায় আরও বেশি চমক মিশিয়ে বললাম। তিনি ধীরভাবে সব শ্রুনে একখানি কাগজ আমার সামনে এগিয়ে দিয়ে বললেন, কতৃপক্ষের কাছে একখানা লেটার অভ রেজিগনেশন লিখুন।

লিখলাম। উপার ছিল না। প্রমাণের কোনো পথ ছিল না।

ঘরে ফিরে কেবলই মনে হচ্ছে দণ্ড-কারণ্যে ফিরে গেলে কেমন হয়? কিছু জমি যদি সংগ্রহ করতে পারি, তবে চাষ করা বাকি জীবনটা সুখে কাটাতে পারব। ওখানে মুরলী দাস ও তাঁর বান্ধবত সমেত যে যুগটা চোখে পড়ল, সেটি দ্রোণারূপ থেকে খুব বেশি তফাৎ মনে হয় নি।

প্রারম্ভ

সত্যেন্দ্রকুমার
মিশ্র

সেবার কবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় বাচ্ছলাম
ওখানের সাহিত্য সম্মেলনে বোগ দিতে।
বাচ্ছলাম এখনকার মধ্যবিস্ত টেনে—অর্থাত্
ডিলদু একসপ্রেসে, কম ভাড়ায় ঠান্ডা
গাড়িতে যাবার সুযোগ নিতে। এই টেনে

চুড়ঙ্গার নেমে আগ্রা হয়ে বাসে বন্দ্যোপাধ্যায়
যাব—এই ব্যবস্থা ছিল।

চেরারে পরিমিত স্থানে বসে যাওয়া,
অনেক লোককে আগেপাশে পাওয়া যায়,
অথচ ঠান্ডায় মেজাজ থাকে ভাল—স্থান
নিরে কলহবিবাদ বাধে না, আড্ডা জমে
ওঠে সহজেই। আর আন্ডার বা ধর্ম—ওঠে না
এমন কোন প্রসঙ্গই নেই। আমাদের সৈনিকের
আন্ডাও তার ব্যতিক্রম নয়, প্রসঙ্গের অবিরাম
পরিবর্তন ঘটিছিল। রাজনীতি, ধর্মনীতি,
সমাজনীতি—তা থেকে জন্মান্তরবাদ, কর্ম-
ফল, প্রারম্ভ—শেষ পর্যন্ত সংবাদপত্রে এসে
পৌঁছল। খবরের কাগজে বেসব উত্তম
সংবাদ প্রকাশিত হয়—তা সত্যি না ওখানে
ভৈরী হয়?

এই প্রসঙ্গ চলতে চলতেই আমাদের
জিতেনবাবু বললেন, 'আচ্ছা দিন করেক
আগের একটা নিউজ দেখেছেন আপনারা?
যুবই ছোট হরফে ছিল বটে—তবু ছিল
প্রায় সব কাগজেই। মুর্শিদাবাদের কোন এক
গ্রামের এক ছোকরা ডাক্তার একটা নরককাল
বুকে জড়িয়ে ধরে গলগল কাঁপ দিয়ে মরেছে?
মনে আছে আপনারা?'



আছে বৈকি। আমাদের সকলেরই মনে আছে। খবরটা সত্যিই একটু বিচিত্র ধরনের, তাতে সন্দেহ নেই। আশ্চর্য্যত্যা বহু লোক করে—প্রত্যাহই একটা-দুটো আশ্চর্য্যতার খবর থাকে কাগজে, তার পক্ষাতিও বহু বিচিত্র—কিন্তু ঠিক এরকমটা এর আগে আর শুনিনি। বিশেষত লোকটা ডাক্তার, আজকাল সাধারণ লোক ঘূমের বাড়ি খেয়ে মরছে—ডাক্তারের সে কথাটা মনে পড়ল না একবারও? নদীতে বাঁপ দেওয়াও তবু একরকম—কংকাল জড়িয়ে বাঁপ দেওয়া একেবারে অভিনব। তাও, বিশেষ সংবাদ-দাতারা লিখেছেন, সে নাকি কঠিন আলিঙ্গন, কংকালের তো আলিঙ্গন করা সম্ভব নয়—ডাক্তারই জড়িয়ে ছিল—এমনভাবে জড়িয়ে ছিল যে, জল থেকে তোলবার পরও অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে বাহুবন্ধন শিথিল করতে পারা যায়নি।

সেইসব কথাই উঠল এবার, নবতর প্রশংসা হিসেবে। ভবনাথবাবু বলে উঠলেন, 'বাঁপ হোয়াই দ্যাট কংকাল? কংকালই বা একটা গোটা মানুষের এল কোথা থেকে? একটা পুরো স্কেলিটন সংগ্রহ করল লোকটা মরবে বলে? বলিহারী শব্দ বটে! নাকি তাত্ত্বিক সাধনামাধনা করতে গেছেন?'

ওপাশে একটি ভদ্রলোক এতক্ষণ একমনে কী একটা ইংরেজী সাপ্তাহিক পড়ছিলেন; আমাদের এ আলোচনায় তাঁর কান আছে তা একবারও মনে হয়নি—তাঁর নির্বিবর্তিতা দেখে। ইতঃ এখন তিনি কাগজটা সরিয়ে শান্তভাবে বলে উঠলেন 'কংকালটা ও কিনে-ছিল ডিস্‌পেন্সারী সাজিয়ে বলে। অনেক টাকা খরচ করেছিল ওটার জন্যে।'

কিনোছিল? কিন্তু ডিস্‌পেন্সারী সাজাতে স্কেলিটনের কী ধরকার তা তো বুকলুম না! শশিবাবু নড়েচড়ে বসে বেশ উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'আর কৈ, সে কথা তো কোন কাগজে লিখেছে বলে মনে পড়ছে না!'

'কাগজে আর লিখেই কি করে। বলুন। তবে আমি জানি, ভদ্রলোক আগের মতোই অনুভূতিজিত কণ্ঠে বললেন, বরং যেন ইচ্ছা করুণই শোনাল তাঁর কণ্ঠ—তবে সেটা আমাদেরও ভুল হতে পারে, 'কাগজ আমার শ্রুতি এর জন্যে অনেকটা দারী। হার কথা বলছেন, এ ডাক্তার—ডাক্তার ওর নাম, আমি ওর ভাষাশক্তি হই।'

করেক ম'হুতের জন্যে যেন নিখর হয়ে গেলাম আমরা। যে সংবাদটা খবরের কাগজে ছাপা হয়—সে যেন কোন 'সুন্দর লোকের ঘটনা, তার 'শায়শায়ীরাও যেন কম্পনালোকের মানুষ। তারা বা তাদের আত্মীয়স্বজন আমাদের সঙ্গে যাবে—এটা যেন ভাবাই যায় না।

তবে তার পরই—বিশ্বায়ের প্রথম ধাক্কাটা সামলে ওঠার মধ্যে সংগেই পিছুর দিক থেকে আরও ক'জন হুড়মুড়িয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে এল। জিতেনবাবু, উদ্ভট ক্রত-ভাবের পর পর 'হিন-৫'র টিপস'সি নিয়ে বলে উঠলেন, 'কী রকম, কী রকম—ব্যাপারটা

কি রকম জো? ... হুয়াইয়ের নাম? কী রকম শাস্ত হ'ত আপনাদের—এ ডাক্তার?'

হাসলেন ভদ্রলোক—প্রশংসা-করুণ হাসি এক ধরনের, সবিনয়ে বললেন, 'আমার নাম যতীন্দ্র, যতীন্দ্র বলেই বন্ধুরা ডাকেন সাধারণত। হ্যাঁ, ডাক্তার আমার শালা, নিজেরই শালা। ও যখন ডাক্তারী পাস করে এসে দেশে ডিস্‌পেন্সারী সাজিয়ে বসল, তখন আমার শ্রুতি তুসিছিলেন স্কেলিটনের কথাটা। আমাদের দেশে—হাওয়া জেলাতেই আমাদের দেশ—বুকেলেন, বহুদিন আগে সে ধরুন বছর চারশ কি তারও আগে, এক ডাক্তার এসে বসল প্রাকটিস করবে বলে। তখন ওখানে বাবুলাল বলে এক বাবা ডাক্তার ছিল, খুব নাম-ডাক তার। ডাক্তারের কম্পিটিশ্যান দেওয়ার আর কোন সম্ভাব্য মনে না পড়ার ভদ্রলোক কোথা থেকে একটা স্কেলিটন যোগাড় করে যিরাট কাঠের শোকেসে সাজিয়ে রাখলেন। পাড়ারি জারগা—কলকাতা থেকে যদিও খুব দূরে নয়, রাইল আর্থেরিক্স ব্রাথোই, তবু তখন একেবারেই জংগলে জারগা ছিল—ওর সেই স্কেলিটন দেখতেই পাঁচখানা গায়ের লোক জেপে পড়ল একেবারে, বিনম্রাত যেন স্বপ্ন দেখার ভাঁড় লেনে গেল ব্যক্তির সামনে। কথাটা চাউরও হয়ে গেল খুব। যে ডাক্তার এই সব হাড়শোড় নিয়ে নাড়াচাড়া করে, সে ডাক্তার যে খুব পলিভলোক তাতে আর কারও সন্দেহ রইল না। ফলে অতবড় বাবুলাল ডাক্তারের চোখের সামনেই নতুন ডাক্তারের পশার জমে উঠল। ... সেই কথাই আমার শ্রুতি বলেছিলেন ভাইকে, ভাইয়েরও কথাটা খুব প্রাণে লেগেছিল। তখন কে জানত যে, এই প্রস্তাবই কাল হবে যেচরারী জীবনে।'

কথাটা বলতে বলতে শেষের দিকে গলা কেঁপে উঠল যতীন্দ্রবাবু। তিনি বোধকার মনের আবেগ সামলাতেই হঠাৎ থেমে গিয়ে ওপাশ দিগে বসলেন।

কিন্তু মানুষের যখন কৌতুহল প্রবল হয়ে ওঠে, তখন সে অপরের আবেগের কথা বিবেচনা করবে—এতটা আশা করা উচিত নয়। আমরাও কেউ কলুম না সে বিবেচনা। চারদিক থেকে ভদ্রলোকের ওপর অজর প্রশ্ন বর্ষিত হতে শুরু করল।

'আজ্ঞা, তা আশ্চর্য্যত্যা আসল ব্যাপারটা কী হুয়াই?'

'ওর কি পশার জমে নি বলই?'

'তা বুকেলেন বুকেলেন—ও স্কেলিটনটাকে জড়িয়ে ডুবতে গেলে কেন? ওর মিস্ট্রীটা কি?'

'আজ্ঞা, আপনাদের শালা কি কোন তাত্ত্বিক সাধনামাধনা—?'

'ভদ্রলোক বিয়ে-বা করাইছেন নাকি? কে জাহে আর ওর?'

'এ বোধকর কোন 'হুয়াই প্রশ্নের ব্যাপার—না? কী বললেন? নাকি কোন পারিবারিক কলহ?'

এমনি অন্তহীন ও অর্থহীন নানা প্রশ্ন।

শিখর হয়ে বসে শুনলেন যতীন্দ্রবাবু—অসল কৌতুহলের এই নম্র ও স্মার্ত্তপর প্রকাশ। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার এদিকে ফিরলেন। ইতঃ বোঁকের মাথার কথাটা বলে ফেলে যে ভাল করেননি, তা বুকেলেন পেয়েছেন, সেই সঙ্গে এও বুকেলেন যে আর কেবলবার পথ সেই কোথাও। মানুষের কৌতুহলকে জাগ্রত করা জার যখনই বাঘের ঘুম ভাঙানো প্রায় একই রকম।

তিনি বললেন, 'বলছি। সব কথাই বলছি। গোপন করে আর লাভও নেই। হার লোকসান হবার কথা সে সমস্ত লাভ-লোকসানের বাইরে চলে গেছে। ... এ ঘটনার আসল কারণটা একমাত্র ভাষাই জানি, ওর জ্ঞানীও নয়। টুকরো টুকরো করে সংগ্রহ করেছি সবটা; ডাক্তারও—কে জানে কেন—সমস্ত আত্মীয়স্বজনের মধ্যে আমাকেই সবচেয়ে বিশ্বাস করত, বোধকার আমিও তাকে ও ব্যক্তির মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভাল-বাসতুম। সে মরবার আগে অশান্তির কারণটা আমাকে খুলে বলেছিল—আশ্চর্য্যত্যা কারণও—শুরু সেই আশ্চর্য্যতয়ের ইচ্ছাটা বাদ দিয়ে। সেটা ভাগেশি—ভাগেশি আমি বাবা সেব যান্ত হবো—এই জন্যেই বর্ধেন সেটা। আমিও অত বুকেলেন পারিনি। আমি তাকে নালাকনে বুকিয়েছিলুম। প্রতি-কারের পথ বাহেলিছিলুম—ভেবেছিলুম সে কতকটা বুকেলেন, লাভ হয়েছে। ... এখন বুকেলেন সেটা আমার ভুল বা অহুঁয়িকা। ঘটনাটা ঘটে হাবার পর সবটুকুই শিরশ্চাক হয়ে গেছে, দুই আর দুইয়ে যোগ দিতে অস্বীকার নি। তার হুতোর পরও জেনেছি কিছু। এসব কথা আপনাদের না বললেই ভাল হ'ত হয়ত—ওর আত্মীয়রা শুনলে কলম হবে, রাগ করবে। তবে আমার আবার অন্য ধারণা। লোকে বলে—নৃপবন্দ দেখে উঠে নৃপবন্দের কথাটা কাউকে খুলে বলে যদি কোন দেওয়ালে বা ভিতের গয়ে শু অঙ্কিতা জল ঢেলে দেয়, তাহলে সে স্বপ্ন আঁজ ফলে না, তার দোষ কেটে যায়, আমার মনে হয় তেমনি পাপকাজের বিষয়গটা লোকের সামনে খুলে বললে সে পাপ কিছুটা স্থানল হয়ে যায়। সেই জন্যেই আরও বলছি। ... এমনিই তো অপহৃত মৃত্যু—আমাদের শাস্ত্রমতে অনন্ত-নরক ওর প্রাপ্য—তার ওপর এ কৃতকর্মের বোকা—যদি আপনাদের খুলে বলার ফলে কিছুটা হালকা হয়ে যার তো বাক।'

যতীন্দ্রবাবু আস্তে আস্তে থেমে থেমে অনুভূতিজিত কণ্ঠে বিবৃত করে গেলেন সমস্ত ঘটনাটা। শূনে আমার অন্তত মনে হল—না বলাই উচিত ছিল তাঁর, মৃতব্যক্তির গোপন অপরাধ আর মৃত্যুগোর কথাটা এভাবে সহানুভূতিসূর্য্য কৌতুহল-কৌতুহলী পরস্যাশপদের কাছে বলার কোন অধিকারই তাঁর নেই।

আমার বরাবরই ভাল ছাত্র ছিল। ডাক্তারী পড়ার সময় কখনও ফেল করেনি, শেষ পরীক্ষাও কয়েকটি সম্মানের সঙ্গে পাস করেছে। একে শেষে হাউস ফিজিসিয়ান করেছিলেন অধ্যাপকরা, সরকারী বড় চাকরিরও ব্যবস্থা করে দিতে চেয়েছিলেন।

কিছুদিন অপেক্ষা করলে রিসার্চ ও বিল্ডিং পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন এমন আশ্বাসও দিয়েছিলেন। কিন্তু ওর বাবার নাকি খুব ইচ্ছা ছিল, ছেলে পাস করে দেশে এসে বসে—দেশে একজনও ভাল ডাক্তার না থাকায় কী অসুবিধা তা তিনি জীবনভোর অনুভব করেছেন, বিশেষ করে ডাক্তারের এক ভ্রমণী ও ঠাকুরার মৃত্যুর সময়। ডাক্তার যখন পাস করে বেরিয়ে, তখন ওর বাবা আর বেঁচে নেই, কিন্তু তাঁর সেই একান্তিক ইচ্ছার স্মৃতিটা ছিল। সেই উদ্দেশ্যেই যে তিনি বহু কষ্ট করে ওকে ডাক্তার পড়িয়েছিলেন, তাও সে ভোলেনি। সেই কারণেই সে সমস্ত প্রসোজন ভাগ করে দেশে এসে ডিসপেনসারী সাজিয়ে বসেছিল।

নিজস্ব ডিসপেনসারী না থাকলে পাড়াগায়ে ডাক্তারী করার কোন মানে হয় না, কারণ ভাল বা আধুনিক ওষুধ ও সব জারজায় দুর্লভ, তাছাড়া ওষুধের দোকান মাগ্রেই কোন না কোন ডাক্তারের অধীন। তারা অপর ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন সহজে সাজু করতে চায় না, এটা নেই, ওটা নেই বলে অসুবিধার সৃষ্টি করে। ডাক্তারের হাতে টাকা ছিল না, ওদের জমিজমা বা ছিল তাতে কোনমতে গ্রাসাচ্ছাদন চলে মাত্র, নগদ টাকা বা ছিল তা ওকে গড়াতে আর বোনের বিয়ে দিতেই শেষ করে ফেলেছিলেন ওর বাবা, বরং কিছু ঋণ রেখে গিয়েছিলেন ছেলের জন্যে। সুতরাং ডাক্তারকে বিয়ে করে স্বশ্রমের টাকাতাই ডাক্তারখানা সাজাতে হয়েছিল। অত ভাল ছাত্র যে, তার ধনী শ্বশুরের অভাব হয় না। ডাক্তারেরও হয়নি—তিনি ওদের বৈঠকখানার চালাঘর ভেঙ্গে নতুন করে ঘর তুলে দামী আসবাব, আধুনিক সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও মোটামুটি সবরকম দিয়ে ডিসপেনসারী সাজিয়ে দিয়েছিলেন। এত খরচ খরচ করতে হচ্ছে তখন কোন শব্দেই বসা ভাল—এই কথাটা বার বার বোঝাতে চেয়েছিলেন শ্বশুর ভদ্রলোক, কিন্তু ডাক্তার তা বুঝতে চায়নি। সে ঐ বন-গায়েই বসবে এই জেনে তাঁরা মেয়ে দিতে চান তো দিন—নইলে অন্য পার দেখুন, সাফ কথা বলে দিয়েছিল।

ওর তেজস্বিতা আর পিতৃভক্তিও মূখ্য হয়ে ভদ্রলোক সে শর্ত পালন করেছিলেন, কোথাও কোন কার্পণ্যও করেননি। ওর বো কৃষ্ণাও, ধনীকন্যা হওয়া সত্ত্বেও মানুষ ভাল ছিল, সহজেই এদের বাড়ি মিশে গিয়েছিল। ছড়াখটি দেওয়া থেকে পুজার জোগাড়, রান্না করা সব কাজেই এগিয়ে আসত, শিখেও নিয়েছিল খুব দ্রুত। শুবু গোয়াল নিকানো তর ফার কাটা এটা তার শাস্ত্রী করতে দেননি বলেই করেনি। এক কথায় সুখে শান্তিতে সমাধিতে জীবন কাটার কথা ডাক্তারের। কাঁতও তাই—যদি না ঐ কৃষ্ণালতা এসে জুটত। হয়ত এই জনোই মেয়েরা লক্ষণ অলক্ষণ শব্দ দুটির ওপর অত জোর দেয়।

কৃষ্ণালের কথাটা যতীশবাবুর স্ত্রী সোমলতাই তুলেছিলেন, তবে সেটা শুবুই

শব্দ বা খেয়াল নয়। কারণও একটু ছিল। ডাক্তারদের গ্রামে বড় ডাক্তার না থাক—পাশের গ্রামে বাবা ডাক্তার একজন ছিলেন—সত্য-ডাক্তার। তিনি রাত-বিরেতে আসতে চাইতেন না, এমনিও খাই ছিল প্রচণ্ড; আশপাশের গ্রাম থেকে ডাকতে এলে বিষম চাপ দিতেন, সেই কারণেই ওর বোন চাগুলাতা প্রায় বেঘোরে মারা গিয়েছিল—এরা যথাসময়ে অগ্রিম নগদ ফী এবং পাল্কী যোগাড় করে নিয়ে যেতে পারেননি বলে। অত দুর্ভাবহার করা সত্ত্বেও ভাল ডাক্তার বলে পশার খুব ছিল। সমস্ত লাভুনা সহ্য করেও রোগীর তাঁর দেয়ত ঘমা দিত।

সেই সত্য-ডাক্তারের সঙ্গে প্রতিযোগিতার কথা উঠতেই সোমলতা তার শ্বশুর-বাড়ির দেশের এককড়ি ডাক্তারের কথা তুলেছিল; কেমন করে এক কৃষ্ণালের জোরে অত বড় বাবুলাল ডাক্তারের নাকের সামনে পশার জমিয়েছিল—সেই গল্প করেছিল। কথাটা শুনে কৃষ্ণা তার বাবার কাছে কথাটা বলে। তিনি বহু অর্থ ব্যয় করে একটা কৃষ্ণাল সংগ্রহ করে কাঁচের শোকেস এনে সাজিয়ে দেন।

অবশ্য এর সুফলও যে ফলেনি তা নয়। যতীশবাবুদের দেশের মতোই সাতখানা গাঁ ভেঙ্গে পড়েছিল ঐ ভয়াবহ বস্তুটি দেখতে—সেই সঙ্গে ডাক্তারেরও একটা প্রচার হয়ে গিয়েছিল। দুটো একটা ডাক এবং জনকতক করে রোগীও পেতে শুবু করেছিল। তারপর অবশ্য সে যে ভাল ডাক্তার এটা জানাজানি হতে আর রোগীর অভাব হয়নি—তার গ্রাম তো বটেই, পাশের গ্রাম এমন কি সত্য-ডাক্তারের গ্রাম থেকেও রোগী আসতে শুবু করেছিল ইদানীং; রোজ 'ডিসপেনসারী'তে বিশ-পঁচিশটা করে রোগী আর অন্তত পাঁচ-সাতটা কল আসত। সে গ্রামে দু'টাকা আর পাশের গ্রামে গেলে চার টাকা নিত, আর অন্তত সেই সঙ্গে সাইকেল, রিকসা-ভাড়া—তাতেই রাজী হয়ে ডেকে নিয়ে যেত। এছাড়া কলাটা লাউটা, ডিমটা, মাছটা—এসব ফাউ তো ছিলই। সকলেই আশা করছিল কৃষ্ণা সে সাতখানা গ্রামের মধ্যে একাধিপত্য করতে পারবে।

কিন্তু সব আশায় বাধ সাধল ঐ নরকৃষ্ণালটা।

নর বললে ভুল হবে, নারীকৃষ্ণাল। যৌন ওর শ্বশুরমশাই লরী বোঝাই করে এসে জিনিসটা তুলে দিয়ে যান—সেদিন ডাক্তারই সেটা লক্ষ্য করে আর আড়ালে স্ত্রীকে বলে, 'তোমার বাবাই শেষে তোমার সতীন এনে বসিয়ে দিলেন!'

তাই নিয়ে খুব হাসাহাসি করে ওর। কৃষ্ণা বলেছিল, 'পেতালী সতীনে আমার ভর নেই। রক্তমাংসের দেহ আর তার যৌবনকাল—এর সঙ্গে কম্পিটিশনে পেয়ে উঠবে না ও। ভর আমার মানুষ সতীনকে, ডাক্তাররা নাকি মেয়েহলে শেলেট দেখতে গিয়ে অনেক সময় আটকে যায়, তুমিও না তাই একটা জুটিয়ে বসো—এই আমার ভর!'

হেসে উঠেছিল কৃষ্ণা বলতে বলতেই, বুজেনেই একচোট হেসেছিল—সেই সঙ্গে হেসেছিলেন ব্যক্তি বিধাতাও, রক্ত-মাংস আর যৌবনের স্পর্শ দেখে।...

বিধাতার সে হাসি বাধ হয়নি। ঐ কৃষ্ণালটাই শেষ পর্যন্ত সতীন হয়ে উঠল কৃষ্ণার।...

প্রথমটা অত বুঝতে পারিনি ডাক্তার। একটা অস্বস্তি অনুভব করছিল ঠিকই—তবে সে সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠতে দেরি হয়েছিল। অস্বস্তিটা যে কি তাও যেমন বোঝে নি, সেটা যে ঐ কৃষ্ণালটা আমার পর থেকেই শুবু হয়েছে তাও অত লক্ষ্য করেনি। এমন কি, যখন অস্বস্তিটা আর পোপল মইল না, তখনও কয়েক দশ পর্যন্ত ঐ যোগাযোগটা ধরা পড়েনি।

ভাল লাগছে না ওর, কেমন কেন ছটফট করছে মনটা। কী যেন একটা প্লানি, কিসের যেন একটা অপরাধবোধ তার তার আনন্দের গলক বিবাদ তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে—অবশ্য তার কারণটা বুঝতে পারছে না কিছুতেই, প্রথমটা এই রকমই বোধ হয়েছিল। কয়েক দিন যেতে কারণটাও স্পষ্ট হয়ে উঠল।

অপরাধ একটা সত্যিই ঘটেছিল। শুবু অপরাধ তাতে সন্দেহ নেই—তবু এমন একটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। এ অবস্থায় অনেকেই এমন করে, করে থাকে, আবার তুলও যায়।

লক্ষ্মী স্টোর্স

নিউ গোবিন্দ জুয়েলারী

মাননীয়কর্তারঃ জুয়েলার্স, অর্ডার সাংলানার্স এন্ড
গার্মেন্ট ডিভার্স

১৩২, বিধান সরণী (কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট), কালী-৪
(শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর দক্ষিণে)

গিনি সোনার গহনা • সাক্ষা গ্রহরত্ন • রূপার বাসনপত্র
ফোন : ৫৫-৬৬৬২

হাসপাতাল প্রথম দিকের কথা। ইস্তাফা একটা দু'ঘণ্টার কেস এসে পড়েছিল হাসপাতালে, বাসএ থাকার লাগার ব্যাপার। তখনও কোন ওয়ার্ডে ডাক পড়ার সময় আসেনি ডাক্তারের, এমার্জেন্সীর দিকে তো যাওয়ার কোন কারণই ছিল না। দৈবেই যোগাযোগ বলতে হবে। ডাক্তার কলেজ থেকে বেরিয়েছিল, মহিলাটিকে অচৈতন্য অবস্থায় নিয়ে আসিছিলেন রাস্তার কয়েক ভদ্রলোক। সম্ভ্রান্ত চেহারার মহিলা দেখে ডাক্তার স্বতঃপ্রসব হয়ে সঙ্গে সঙ্গে এমার্জেন্সীতে এসেছিল, প্রাথমিক চিকিৎসার পর সেই ধরপাকড় করে একটা বেড-এরও ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। মহিলাটির সঙ্গে যে মেয়েটি এসেছিল তারক সে লক্ষ্যও করেনি প্রথমে। মহিলাকে যখন স্ট্রেচারে করে তৈতরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন কালাকাটি করায় ও সঙ্গে যেতে চাওয়ার সামান্য যে একটা গোলমাল হয়েছিল, সেই সময়ই প্রথম দেখে সে তাকে। আঠারো-উনিশ বছরের মেয়ে, সুন্দরী দেখতে, এই পর্যন্ত—এমন কোন অসাধারণ ছিল না কোথাও। মেয়েটি অসহায়ভাবে কাঁদছিল—একটা অবাকও হয়ে পড়েছিল সেই সময়টার; ডাক্তার তার অবস্থা দেখে দয়ালু হয়ে হাসিমুখে-সুস্থিয়ে হাসপাতালে যে সবসময় আত্মীয়স্বজনদের ভেতরে যেতে দেওয়া সম্ভব নয়, সেটা বুঝিয়ে বলে অফিস ঘরে বাসরে রেখে ওর কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে নিজেই ওদের বাড়িতে খবর দিয়ে এসেছিল, যাতে তারা কেউ এসে মেয়েটিকে নিয়ে যান।

ব্যাপারটা সেইখানেই চুক যাবার কথা—কিন্তু চোকেমি। পরের দিন কোতাহলী হয়েই খবর নিতে গিয়েছিল মহিলাটির, কিছু কিছু সুবিধা-স্বাচ্ছন্দ্যেরও ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। মহিলাটি সেজন্মা কৃতজ্ঞ বোধ করেছিলেন সেই সূত্রেই ভিজিটিং আওয়ারে ওকে ডেকে পাঠিয়ে মেয়ে রেবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। ডাক্তার যে তাঁর ছেলের কাজ করেছে, সে-কথা বলতে গিয়ে মেয়ের কাছে জেনেছিলেন গতদিনের কথা, রেবার ও তাঁর কৃতজ্ঞতার আরও কারণ আছে। ডাক্তারের কাছ থেকে যে সাহায্য ও সহানুভূতি পেয়েছিল রেবা—তা হাসপাতালে আশা করেনি সে, হাসপাতাল সম্বন্ধে জন-প্রাতিতে যতটুকু ধারণা হয়েছিল, তার সঙ্গে এ আচরণ মেলে না। দু'জনের মিলিত

কৃতজ্ঞতার সৌন্দর্য বিরতই বোধ করেছিল ডাক্তার।

সুতরাং এ-পরিচয় যে হাসপাতালে সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা বলাই বাহুল্য। ওপ-মহিলা বিধবা, সম্ভ্রান্তবংশের বধূ ঠিকই, কিন্তু বিজ্ঞানালিনী নয়। এক স্কুলে শিক্ষকতার কাজ করেন, পটলডাঙ্গায় দিকে ছোট্ট একটা বাড়ি আছে, তারই নিচের তলা ভাড়া দিয়ে—ওপরতলার দুটি ঘরে কোনমতে মাথাগুজে থাকেন। এই একটি মেয়ে রেবা—ফাস্ট ইয়ারে পড়ে। আত্মীয়স্বজন এ-শহরে ওদের কিছু কম নেই—কিন্তু দু'দিনে তারা কেউ দেখেননি এই অভিমানে ওপ-মহিলা তাঁদের এঁড়িয়ে চলে।

রেবার মা বাড়ি ফিরেই একদিন নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালেন ডাক্তারকে। বারবার মিনতি জানিয়ে বলে দিলেন, অবসর পেলেই যেন সে এসে এখানে খেয়ে যায়, ছুটির পর সম্বন্ধের দিকে আধঘণ্টার জন্যও যদি সে থাকে, তিনি খাইয়ে দিতে পারবেন। ছোট্টলার খাওয়ার শরীর ঢেকে না—এ-তিনি খিলফণ জানেন।

খাওয়ার জন্য নয়—এমনিই মাঝে মাঝে আসতে শুরু করল ডাক্তার। ক্রমশ সেটা প্রায় নিয়মিত হয়ে উঠল। আকর্ষণটা মনেহেই—এই কথাই বোঝাল সে নিজেকে কিন্তু আসল আকর্ষণ যে রেবা—কিছদিন পর সেটা আর নিজের মনের কাছেও চাপা রইল না। রেবার গোড়ার দিকে ভেবেছিল—সে যে কলেজ থেকে ফিরে নিত্য উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষার কাল গোনে, সেটা কৃতজ্ঞতা ছাড়া কিছু নয়—সে-ভুল যখন ভাঙল, তখন বড় বেশী দেরী হয়ে গেছে, তখন মোহ নেশাতে পরিণত হয়েছে—ফেরার বা সতর্ক হবার আর পথ নেই।

ফলে বাড়ির বাইরেও দেখা হতে শুরু হল। ক্রমশ দেখা গেল সেইটেই সুবিধে-কর কবে কখন ছুটি—দু'জনেরই মনোমুগ্ধ হয়ে গেল। ছুটির পর সিনেমা, গম্ভীর ধার, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এবং ছুটির দিনে বোটানিক্যাল গার্ডেনস, চিড়িয়াখানা প্রভৃতি অপরিহার্য হয়ে উঠল প্রায়। রেবার মার বহুকালের রূপ অপভ্রান্ত—শ্রমজীবনের বিকল্প হিসেবে পড়েছিল ডাক্তারের ওপর। তিনি যেন ভুল হয়ে রইলেন, এই ঘনিষ্ঠতার দোষের কিছুই দেখতে পেলেন না।

চমক যখন ভাঙল, তখন সর্বনাশ বা হবার তা হয়ে গেছে। রেবা বলল, 'বিয়ে করো আমাকে। আমার ধর্ম ও ইজ্জত বাঁচাও।'

ডাক্তারের মূহুর্ত শূন্য হয়ে উঠল। বলল, 'সে আমি পারব না। অনেক কষ্ট করে সব-রকমে নিজেকে ও পরিবারকে যুক্ত করে আমাকে ডাক্তারী পড়াচ্ছেন বাবা। তাঁর ওশা আমি পাশ করে দেনি গিয়ে বস। তা সন্তে সেসে বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করা ছাড়া আমার উপায় নেই।'

'তাহলে আমার উপায়?' শান্ত কণ্ঠে কণ্ঠ রেবার।

উপায় বা ডাক্তারের হাতে ছিল, সেই প্রস্তাবই সে দিল। ওষুধ এনে দেবে সে, ওটা নষ্ট করে ফেলুক রেবা।

কোথায় করব?...বাড়িতে হবে না, মা জানতে পারলে আত্মহত্যা করবেন। তারপর তাঁর ছায়াঁদের মাথের দিকে চেয়ে তাদের শাসন করা সম্ভব হবে না, জীবিকাই সম্ভব হয়ে যাবে। ভাড়াটে আছে বাড়িতে—জানা-জানি কলেজকারীর শেষ থাকবে না।'

এর উত্তর দিতে পারেনি ডাক্তার। তখনও হাসপাতালে তার এত প্রতিপত্তি হয়নি যে, সেখানে কাজ সারবে। নীরবে মাথা হেঁট করে রইল সে—বিহবল হয়ে যুগ্মদুয়ারে মাথা কুটতে লাগল মনে মনে—একটা উপায়ের জন্যে। কিন্তু কোন সম্ভাব্য উপায়ের কথাই মনে পড়ল না সে-মুহুর্তে।

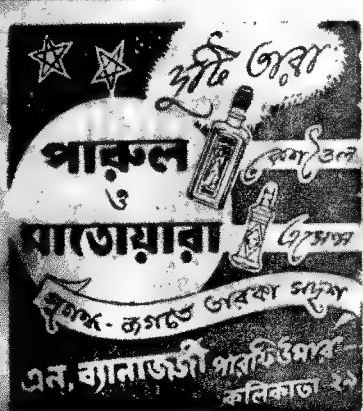
রেবা আর একটিও কথা বলেনি। অনুরোধ করেনি, কলহ করেনি, গল্পনা দেয়নি। যেন নীরব উপেক্ষার ওকে পরিহার করে বাড়ি চলে গিয়েছিল। আর দেখা করেনি কোনদিন। ডাক্তারেরও সাঁহস হয়নি তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে।

তবু মনে হয়, রেবা অপেক্ষাই করেছিল ওর জন্যে। হয়ত শেষমুহুর্ত পর্যন্ত ভাষা করেছিল ওর পৌরষ এবং সংসাহস জাগ্রত হবে, নিজের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্তের জন্যে এগিয়ে আসবে, ওকে এই আসল সর্বনাশ ও অসম্মান থেকে রক্ষা করবে। অস্তিত্ব এইরকম বিপদ এড়াবার একটা উপায়ও ব্যর্থ করবে খুঁজে। কিন্তু ডাক্তার কিছুই করতে পারেনি। তার না ছিল অর্থের জোর—না ছিল তেমন প্রভাব-প্রতিপত্তি। পাড়াগায়ের নির্বাসন ছেলে—শহরের ছেলেদের মতো অসংখ্য মতলব তার জানা ছিল না। তার কৃতিত্বও এমন প্রমাণিত হয়নি যে, অধ্যাপকদের প্রস্তাব বা আনুকূল্য লাভ করবে।

মাসখানেক পরে একখানা চিঠি পেল সে। রেবার চিঠি।

তাতে কোন সম্বোধন কি সম্ভাষণ ছিল না, শুধু লেখা ছিল, 'অন্তরপর যে একমাত্র পথ আমার কাছে খোলা ছিল—এ-জীবনটা নষ্ট করা, সেই পথ ধরতেই চললাম। তবে এখন মরব না, মায়ের জীবন এমনিই যথেষ্ট বিড়ম্বিত করেছে, সকলের সামনে তাঁর মাঝামাঝি চিরদিনের মতো হেঁট করতে চাই না আর। এমন জায়গাতেই মরব, যেখানে কেউ কোনমতে আমার পরিচয় পাবে না, সে-পরিচয় এখানে এসে মাঝে আঘাত করবে না। তোমাকে আমার বলার কিছুই নেই। শব্দ একটি কথাই বলে বাড়ি, তোমাকে আমি অনেক চেষ্টা করেও ক্ষমা করতে পারলাম না। কেবলই মনে হচ্ছে তুমি আমাকে বিয়ে করবে বাবার আশা পূর্ণ করতে পারবে, শব্দ যজ্ঞাট্টা এঁড়িয়ে যাবার জন্যেই করলে না। তোমাকে আমি অভিশাপ দিচ্ছি—শেষমুহুর্ত পর্যন্ত দিয়ে যাব—জীবনে তোমার বড় আশাটাই যেন বাথ' হয়, যেমন বাথ' তুমি আমার জীবনটা করলে।'

রেবার মাও তাঁর খানিক পরে কান্ডে কান্ডে ছুটে এসেছিলেন ওর কাছে। রেবা কোথায় চলে গেছে—শব্দ এক লাইন লিখে



রেখে গেছে, আমাকে খুঁজো না, পাবে না। ভেবে নিও যে, তোমার মেয়ে জলে ডুবে মরেছে।’

প্রথম একটু মন খারাপ হয়েছিল ঠিকি! কিন্তু বৌবন এক আশ্চর্য, সর্বদুঃখের মহোষধ—সব দুঃখ সব দুঃস্মৃতি সে অনায়াসে ভুলিয়ে দেয়। তাছাড়া আশা আর সুখিপুল সম্ভাবনার সিংহাসার যার সামনে অব্যাহত, সে পিছনে-ফেলে আসা পথের এক তুচ্ছ ঘটনাকে আঁকড়ে পৌছিয়ে পড়ে থাকবে—এটা সম্ভবও নয়। ডাক্তার ক্রমে ক্রমে শব্দ যে সেই দুঃখ ও লজ্জাবোঝা ভুলল তাই নয়—ঘটনাটাও ভুলে গেল ক্রমশ। কে জানে রেবার এই মৃত্যুতে সে ভয়চেন্তন মনে একটু স্বস্তিই অনুভব করেছিল কিনা। লেখাপড়ার চাপও বেড়ে গেল একটু একটু করে, সাফল্য বৃহত্তর সাফল্যের তদনা ও উদ্ভাসনার সামনের দিকে ছুটিয়ে নিয়ে চলল—সেই জয়যাত্রার রথচক্র-খলার অধঃস্থায় একটি করুণ কোমল মুখ কোথায় আচ্ছন্ন অবলুপ্ত হয়ে গেল—তা ও টেরও পেল না।

আশ্চর্য, এতদিন পরে সেই ঈগত বিস্মৃত অপরাধের স্মৃতিই যেন নতুন করে তার সমস্ত লজ্জা ও অনুশোচনার অনুভূতি নিয়ে জেগে উঠল। এ-অবস্থিতি তারই। কেবলই মনে হতে লাগল—ও যখন নিজের অবস্থা জানতই, তখন ওরই সাবধান হওয়া উচিত ছিল। রেবার এত জানার কথা নয়, সে শহরের মেয়ে, বিধবার কোলে মানুষ হয়েছে—জীবনের ঘোরপ্যাচ সে কিছই জানত না। সে সরল মনেই তাকে অবলম্বন করেছিল, ভালবেসেছিল—বিশ্বাস করেছিল। এমন একটা প্রশ্ন নষ্ট করে দিয়ে আজ আর সুখী ও নিশ্চিন্ত হবার ব্যক্তি কোন অধিকারী নেই ওর।...

কিন্তু সেই কবেরার ভুলে-যাওয়া অংশ-রাখই বা আজ এতদিন পরে এমনভাবে তার জীবনে দেখা দিল কেন—তার রাত্রেয় মিদঃ ও দিনের কর্ম নষ্ট করতে? কিছতেই সে যেন মন দিতে পারছে না, কোন কাজেই না। রোগী দেখাও হয়ে উঠছে না আর তেমন করে। তারা বিরক্ত হচ্ছে, অনুযোগ করছে!...

কেন? কেন? সেই বিস্মৃতপ্রায় কৃত-কর্মের বোঝা অকস্মাৎ এমন দৃঃসহ হয়ে উঠল কেন? ডাক্তারও বার বার এই প্রশ্ন করে নিজেকে!...

আর সেই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়েই কুঁচিল একটা সংশয় দেখা দেয় মনে। তবে কি এই স্মৃতির সঙ্গে ঐ কংকালটার কোন যোগাযোগ আছে? ওটা আসার পর জেগেই ওর এই অস্বস্তি বোধ হতে শুরু করল কেন? তবে কি ও কংকালটা রেবারই? শুধু, অভিশপ্ত ও দিগন্তে নিক্ষেপিত থাকতে পারেনি—তার পরপার পক্ষের ওর পরিপূর্ণ সুখের সময় এসে দেখা দিয়েছে—প্রতিশোধ নেওয়া জন্য, প্রস্তুত অভিশপ্তকে সত্য করার জন্য!...

প্রথম প্রথম সম্ভাবনাটা নিজের কাছেই অসম্ভব ও অসম্ভব বোধ হয়েছে—তবে

চিন্তাটা বেড়ে ফেলতেও পারেনি মথ থেকে। ক্রমে সে-চিন্তা তার বৃষ্টি-যাত্রাকে অভিভূত করেছে। বারবার ছুটে গিয়ে নির্ণিমেষে চেয়ে থেকেছে কংকালটার দিকে। দেখতে দেখতে মনে হয়েছে রেবার উচ্চতা ঠিক এতটাই ছিল, হাড়ের প্রস্থও অবিকল তেমনি। তার হাতের হাড় চওড়া ছিল দেহের অনুপাতে—তা নিয়ে কতদিন ঠাট্টা করেছে ডাক্তার।

ভাবে ভাবতে ভাবনাটা কল্পনার এসে স্থিরবশ হয়েছিল। সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে এক সময়—এ-কংকাল রেবারই। অবশ্য খবরাখবর নেবার চেষ্টা যে একেবারে করেনি তা নয়—কিন্তু সে অনুসন্ধান বেশী-দূর এগোতে পারেনি।...

দিশাহারা বিহ্বল ডাক্তার ছুটে এসেছে যতীশবাবুর কাছে। সব শুনলে যে পরামর্শ দেওয়া উচিত, অন্তত হিন্দুর পক্ষ—যতীশবাবু সেই পরামর্শই দিয়েছেন, স্কেলিটনটা কাউকে দিয়ে গণ্যায় ভাসিয়ে দাও, আর গয়াতে গিয়ে চুপি চুপি একটা পিণ্ডি দিয়ে এসো। অপঘাত মৃত্যু হলে প্রেতযানি প্রাপ্ত হয় শুনোঁছ—কিন্তু তার মা কি কিছ করেনি? অবশ্য সে-সময়ও হয়নি—নিরুদ্দেশ হবার পর বারো বছর না গেলে গ্রামশান্তি করে না। সে বাই হোক, তুমি গিয়ে গয়ায় কাজটা সেয়ে এসো, যদি সে এখনও সত্যি সত্যিই প্রেতযানিতে থেকে থাকে, উদ্ধার হয়ে চলে যাবে। তোমাকেও ক্ষমা করবে।’

ডাক্তারও কথাটা বুঝেছে। স্বেচ্ছা বলে স্বীকার করেছে। অন্তত যতীশবাবু তাই ভেবেছিলেন। সেই জন্যেই নিশ্চিন্ত ছিলেন। নইলে হয়ত নিজে ওর সঙ্গে গিয়ে কাজটা করাতেন। তাহলে আজ আর এ-আপশোষটা থাকত না। কিন্তু অতটা বোঝেননি। শেষ-মুহুর্তে কী যে হল, ডাক্তারের মতি পরিবর্তনের তৎকালিক প্রত্যক্ষ কারণটা কি, তা আজও তিনি জানেন না, একেবারে যখন খবর পেলেন, তখন যা হবার তা হয়েই গেছে। বস্তুত তিনি ও-ডরক থেকে চিঠি পাওয়ার আগে সংবাদপত্রেই প্রথম জানতে পারেন ঘটনাটার কথা।...

দীর্ঘ কাহিনী শেষ করে যতীশবাবু, যখন রুমালটা বাজ করে চোখ মুছে আবারও বাইরের দিকে মুখ ফেরালেন, তখন আমাদেরও কারও কোন প্রশ্ন করার অবস্থা নেই। গাড়ির শব্দ ও দূরে দূরে অবাগ্মদণ্ড যাত্রীদের অগপসে কথা বলার একটা স্তিমিত গঞ্জল ছাড়া আমাদের এদিকটা নীরব-নিথর হয়ে গেছে।

তবে এ-স্তিমিত অবস্থা বেশীক্ষণ রইল না বলা বাহুল্য। ‘মথুচক্রে লোণ্ড্রব’ আলো-চনা শুরু হয়ে গেল দেখতে দেখতে। বিশ্বাস ও অবিশ্বাসে বোহস্তর তর্ক বেধে

উঠল। উত্তেজনায় কণ্ঠস্বর যখন প্রায় সকলেরই পশ্চমে পৌঁছেছে, তখন ১৯৭ যতীশবাবু আবার এদিকে ফিরে বসেছেন। বললেন, সবচেয়ে মজা কি জানেন? এরপর আমি নিজে কিছ, কিছ খোঁজ নিয়োঁছ—আমার প্রথম থেকেই মনে সন্দেহটা ছিল—পরে নিঃসন্দেহে জেনেছি, রেবা অতী মরেনি। এখনও পর্যন্ত সে বেঁচে আছে। আমি তার সঙ্গে দেখা করিনি—মিছিমিছি এ-কথা তাকে আর জানিয়ে লাভই বা কি, এমনিই সে বশেষট দুঃখ পেয়েছে—তবে তাকে দেখে এসেছি। তার খবরও সব সংগ্রহ করেছি। সে গণ্যায় ডুবে মরবে বলে প্রথমে কাশী, পরে বিন্ধ্যাচলে যায়। কাশীতে বহু বাঙালী, হয়ত কেউ চিনে ফেলতে পারে এই ভেবেই বিন্ধ্যাচলে গিয়েছিল। সেখানে এক সম্মাসিনী, এক পাজাবী মাতাজী ওর চেহারা আর ভাবভঙ্গী দেখে আসল ব্যাপারটা অনুমান করে ওকে আটক করেন এবং আশ্রয় দেন। তিনিই ওকে নিয়ে যান জামিন-কেশে—নিজের আগ্রহে। সেখানেই সে অভঃ আছে, সেও সম্মাসিনীর জীবনযাপন করছে। ছেলটিও বেঁচে আছে, আশ্রয়েই মঃ হাচ্ছে। যদি বেঁচে থাকে, সে-ই ডাক্তারের বংশরক্ষা করবে একদিন।’



ডক্স এও কোং প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-১৪

অপরাধ

সুকুমার বসু

সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রম-পরিবর্তনের কোন এক উল্লেখযোগ্য পর্যায়ের সমাজে নীতিশাস্ত্রের প্রবর্তন হয়েছিল। সমাজের সঙ্গে নীতিশাস্ত্রের পরিচয় যতদিনের, বোধহয় 'অপরাধ' কথাটির প্রচলনও প্রায় ততদিনের। অপরাধের সংজ্ঞা সমাজ-সৃষ্টি। প্রধানত, সামাজিক রুচি, রীতি-নীতি, এবং আইন-কানূনের ভিত্তিতে অব্যাহত কোন ঘটনাকে বা ঘটনার পরিমাণকে অপরাধ আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। এমন কি প্রচলিত কোন, সামাজিক স্বার্থ আকাশিক বিপর্যস্ত হলে সংশ্লিষ্ট ঘটনা অপরাধ-মূলক হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। অপরাধের নিরপেক্ষ কোন সংজ্ঞা আজো নির্ধারিত হয় নি। এইজন্য সমাজের প্রয়োজনীয়তা এবং দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন অনুযায়ী অপরাধের সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়েছে। স্পর্শ, দর্শন, স্মাগ, স্রবণ, ভাস্পাদন, ইত্যাদির মত অপরাধবোধ-মূলক কোন ইন্দ্রিয় আমাদের নেই অথবা অপরাধ-নির্ণয়ক কোন নির্ভুল যন্ত্রের আবিষ্কার আজও হয় নি। তাই অনেক সময় কোনকোন অপরাধী স্বীয় চাতুৰ্যবলে অপরাধমূলক ঘটনাকে নিছক দুর্ঘটনার পরিণতি হিসাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়। আইনের জাগ্রানায় অপরাধ যুক্তি, বিবেচনা ও প্রমাণ-সাপেক্ষ। মনোবিজ্ঞানীদের মতে অপরাধ—প্রকৃতপক্ষে, মনের বিকৃত গতির অন্যতম শোচনীয় পরিণতি। প্রয়োজনের তাগদে মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা আদিম প্রবৃত্তি-গুলির নশন প্রকাশের মধ্যেই অপরাধের জন্ম। এমন কোন অপরাধ নেই যা মনের গহন কোণের অবশ্যমিত প্রবৃত্তিগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট নয়। চাওয়া এবং পাওয়ার মধ্যে সংস্কৃতির প্রভাব মানুষের মনে অনেক জটিলতা এনে দিয়েছে। এই জটিলতা যে বিষয়ে বা যে পর্যায়ে যত বেশী অপরাধ, এবং অপরাধীর সংখ্যাও সেই সব ক্ষেত্রে তত বেশী। সৃষ্টির যে পর্যায়ে মনের জটিলতা নেই বা যে সমস্ত প্রাণীর মধ্যে বোধ-শক্তি থাকলেও মনের অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় না—সেই পর্যায়ে নীতি-জ্ঞান এবং অপরাধ; এই দুটি বিষয়ের কোন খোঁজ পাওয়া যায় না।

অপরাধী-ছাপ নিয়ে মানুষ জন্মায় না অথবা অপরাধ-প্রবণতা পৃথকভাবে বংশগত-স্বভাব সংক্রামিত হয় না। পরিবেশের প্রভাবই মানুষের মনে অপরাধের অঙ্ক রাস্তা হয়ে থাকে। মানুষের মনে অপরাধের অঙ্কুরের সম্ভাবন পাওয়া গেলে বিশেষজ্ঞরা এই

সু-প্রভাবী মনকে অপরাধ-প্রবণ বলে চিহ্নিত করে থাকেন। যারা অপরাধ-প্রবণ তাদের পারিবারিক আবহাওয়া এবং পরিচিতির জীবনযাত্রার শৃঙ্খলার অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। পিতামাতার অথবা অন্যান্য জ্ঞাতীয়-স্বজনদের জীবিকা-অর্জন পদ্ধতি, আচার-ব্যবহার এবং সর্বোপরি বয়ঃসন্ধির ঠিক আগে সংসর্গদোষ অপরাধ-প্রবণতার বিশেষ সহায়ক। পরিবারের কলহ-প্রিয়তা, অসৌজন্য আচরণ, অবহেলা, উত্তেজনা, রুদ্ধ ব্যবহার, বিশৃঙ্খল বিন্যাস ইত্যাদির প্রত্যেকটি মনের গঠনকে অপরাধ-প্রবণতার অনুকূল করে তোলে। উক্ত প্রভাবগুলি মনকে সমাজ-বিরোধী করে তোলে অথবা মনে সমাজের প্রতি একটা নেতিভাবের উদয় হয়। এই পরিবর্তন উত্তরকালে সমাজ-শৃঙ্খলা এবং সামাজিক নীতির প্রতি বিরোধী মনোভাবের জন্য মূলতঃ দায়ী। পিতা, মাতা, অথবা পিতামাতা উভয়েরই প্রান্ত পরক্ষেপ মনে যে শূন্যতা বা অভাববোধ এনে দেয় সেটিও অপরাধ-প্রবণতার পক্ষে বিশেষ সহায়ক। নারী অপরাধীদের জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে সংসারের চরম দারিদ্র্য, অভিভাবকের দীর্ঘ বৈকল্য, পরিবারের তাগিদে অকালে অখোঁপাজনের চেষ্টা, ইত্যাদির ঘনিষ্ঠ বোগাযোগ দেখতে পাওয়া যায়।

সে সব পরিবারে অল্পসংখ্যক লোকের আয়ের ওপর চতুঃপুঞ্জ লোক নির্ভরশীল অথবা একজনের আয়ের ওপর একটি বৃহৎ পরিবার নির্ভরশীল সেইসব পরিবারের ছেলেমেয়েদের সংসার ও সমাজ সম্বন্ধে নানারকম অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা লাভ করা খুব স্বাভাবিক। এই ধরনের পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে শিক্ষার অভাব এবং ঔদাসীণ্যের ফলে বৈদগ্ধ্য, লোভ, স্বার্থ-পরতা, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির প্রাবল্য দেখা যায়। এই প্রাবল্য ছেলেমেয়েদের মনকে অসুস্থ কিংবা অপরাধ-প্রবণ করে তোলে। শৈশবের শিক্ষা, প্রতিবেশীর আচরণ, বন্ধু-বান্ধবদের কার্যকলাপ, রুচি-নীতির অভাব, পেশাদার অপরাধীর সংসর্গ, প্রভৃতি শিশু-মনকে অপরাধ-প্রবণ হতে সাহায্য করে। শৈশব অবস্থা থেকে সমাজের সঙ্গে, বাস্তব জীবনের সঙ্গে শিশুর পরিচয় যদি শৃঙ্খলার ভিত্তিতে গড়ে না ওঠে তাহলে তার ভবিষ্যৎ জীবন নীতি-বর্জিত হয়ে ওঠেই স্বাভাবিক। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কিছু কিছু অপরাধী পরিবারের অস্তিত্ব আছে। এই সমস্ত পরিবারের পরিবেশ অপরাধ-প্রবণতার ভরা—এই সমস্ত পরিবারের দৈনন্দন জীবনে অপরাধ প্রশংসা পায়। এই পরিবেশ ও জীবন পরিবারস্থ শিশুদের মনের গঠনকে বিকৃত করে তোলে। পুরুষাচরণে ভাবী অপরাধীর সৃষ্টি হয়ে থাকে। ফলে অপরাধ-প্রবণ পরিবারের বা অপরাধী পরিবারের অস্তিত্ব বজায় থেকে যায়।

অপরাধ বাদের পেশা তাদের অতীত জীবন অনুসন্ধান করে জ্ঞান গেছে যে কতকগুলো পরিবেশ-সৃষ্টি ঘটনা তাদের জীবনকে এইভাবে দূষিত করেছে। পারিবারিক বিপর্যয়, কোন আকাশিক ঘটনাচক্রে দূষিত

প্রভাব, সংসর্গদোষ, সমাজ-জীবনে অসামান্য, সামাজিক বিদ্বেষ, ভাগ্যের পরিহাস, প্রভৃতির প্রভাবে সৃষ্টি অপরাধ-প্রবণ মন মানুষকে অপরাধী-সমাজের সংস্পর্শে আনে। এই অপরাধী-সমাজের প্রত্যয়ে এবং আশ্রয়ে জন্মঃ তার জীবনের গতি বিকৃত হয় এবং স্বীয় অভিরুচি অনুযায়ী সে বিভিন্ন প্রকারের অপরাধের মাধ্যমে জীবিকা-অর্জন করতে সুরু করে। পেশাদার অপরাধীদের একটা সীমিত গন্ডী আছে। এই গন্ডীর মধ্যে এঁদের নিরাপত্তা ও মাননীয় স্বাচ্ছন্দ্য অক্ষুর থাকে। সমর্থনী মনের সম্ভাবন পেলে অপরাধী-সমাজ অনেক সময় বিরাট ঋণিক নিয়েও নবীন অপরাধীকে আশ্রয় দেয়। পেশাদার অপরাধীদের বৃত্তি, বিচারশক্তি, অভিনয়-কুম্ভতা, অনুকরণ-দক্ষতা, দলীয় আনুগত্য, ইত্যাদি মানসিক সম্পদগুলিকে বিশ্লেষণ করলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে মানসিক সম্পদে ওরা বঞ্চিত নয়। শূন্যমাত্র বহুস্তর সমাজের সঙ্গে কোন একটা ভুল বোঝাবুঝির ফলে ওদের মনে সামাজিক নীতি ও শৃঙ্খলার প্রতি একটা বিবশতা দেখা দিয়েছে। এই বিবশতার মূল কারণ লুকিয়ে রয়েছে ওদের মনে—যেগুলির নাগাল পাওয়া অসম্ভব না হলেও এখনো পর্যন্ত সঠিক সম্ভাবন পাওয়া যায়নি।

মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিদের চিন্তা-ধারা সাধারণত অপরাধ-পর্যাপ্ত। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ সব চিন্তাধারা কার্যে পরিণত না হয় সেই অবধি এদের অপরাধী বলা চলে না। মানসিক স্বদেশের বা অস্ত-স্বদেশের পরিণাম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানসিক অসুস্থতার গন্ডীতে সীমাবদ্ধ থাকে বলেই সমাজে অপরাধীর সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে সামান্য। অন্যথায় সমাজে অপরাধীর সংখ্যা যে কিভাবে বৃদ্ধি পেতো তা কল্পনাতীত। বিভিন্ন অপরাধ-মূলক ঘটনা বিশ্লেষণ করলে অপরাধগুলির জন্য দায়ী অপরাধীর মনের প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্যকে বুঝতে পারা যায়। পৃথিবীতে এমন কতকগুলি অপরাধের নজীর আছে যেখানে অপরাধীর মূল উদ্দেশ্য তার নিজস্ব মনের আদিম ও পাশব কামনাগুলির চরিতার্থত মন্থ। এই সমস্ত ক্ষেত্রে অপরাধীরা মনোবিকারগ্রস্ত। এদের মনোবিকারের জন্য দায়ী অস্ত-স্বদেশ। পরিবেশের বিশৃঙ্খলতার মানুষের মনের সংযমশক্তি যখন দুর্বল হয়ে পড়ে তখন পরিবেশের পশুভাব মনের গহন কোণে লুকিয়ে থাকা পশুভাবকে জাগিয়ে তোলে। মনের সেই জগত পাশব-প্রবৃত্তি সংযমকে পরাস্ত করে পরিবেশ প্রকাশ পেতে চান চরিতার্থতার লোভে। এই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করবার জন্য সংযম-শক্তি সাধামত বিরুদ্ধাচরণ করে—ফলে দেখা যায় অস্ত-স্বদেশ। এই স্বদেশের আধিক্যে মানুষের মনে যে সব ইচ্ছাগুলি প্রবল হয়ে ওঠে সেগুলি যারা বোঁকের বশবর্তী হয়ে কার্যে পরিণত করে ফেলে তারা সমাজের বিচারে অপরাধী। মানসিক বিকারগ্রস্ত এই শ্রেণীর অপরাধীদের অপরাধ পেশা নয়—অপরাধ এঁদের নেশা। এদের সংযমের কঠামো রাহ-গ্রস্ত—এরা সমাজ-জীবনের অসামান্য মূর্তি-মান সমস্যা। শাস্তি এঁদের অপরাধ থেকে

নিরস্ত করতে পারে না—এদের প্রয়োজন চিকিৎসার।

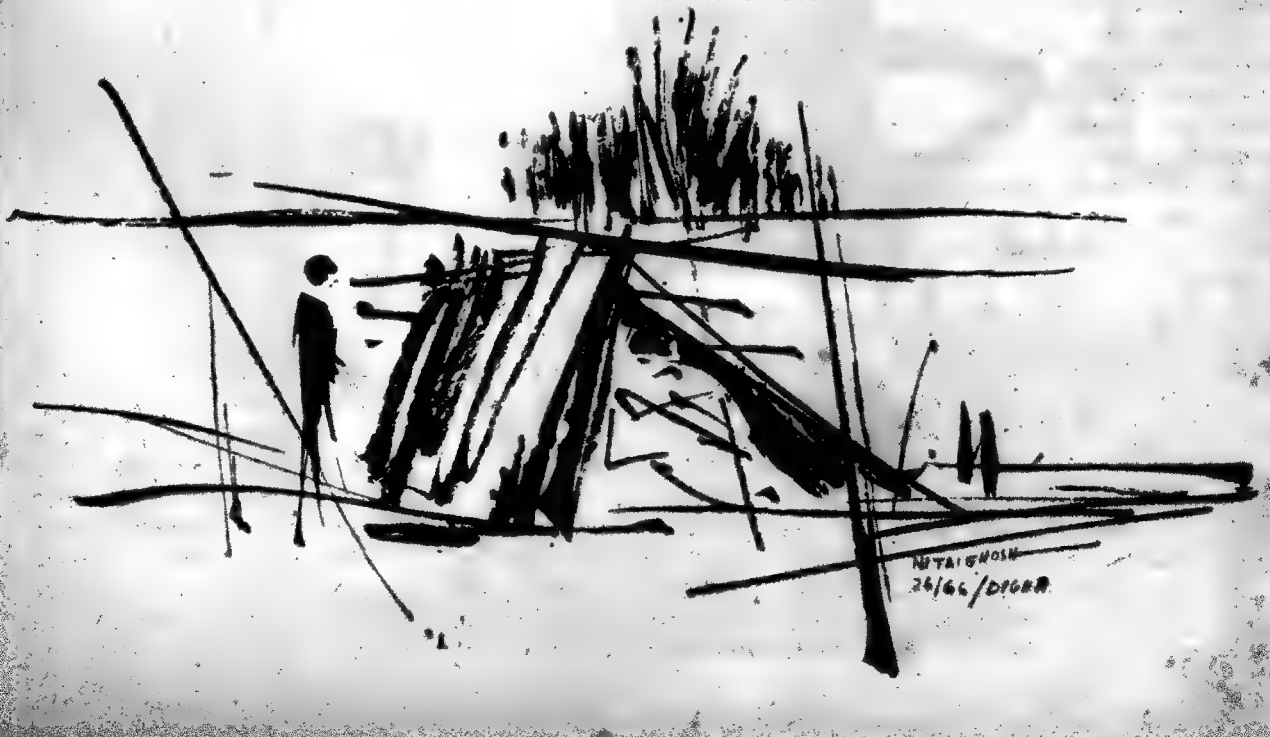
অগণিত মন ঘটনাচক্রে অপরাধ করে ফেলার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। অনেক ক্ষেত্রে অগণিত মনকে আপাতদৃষ্টিতে বুদ্ধিতে পরা বস্তু না। বিশেষ বিশেষ ঘটনা-জালের সম্মুখীন হলে এই ধরনের স্বরূপ প্রকাশ পায়। সমাজের স্বাভাবিক এবং শৃঙ্খলা বজায় রেখে সব সময়ে এরা চলতে পারে না। তাই জোর করে, ভয় বা লেজ দেখিয়ে এদের দিয়ে অন্যায় কাজ করিয়ে নেওয়া হয়ে থাকে। কুসংসর্গ প্রভাবে অথবা পেশাদার অপরাধীদের প্ররোচনায় এরা সহজেই অপরাধে লিপ্ত হয়ে ওঠে। এরা ঘটনার জড়িয়ে পড়ে যন্ত্রচালিতের মত। পেশাদার অপরাধীদের কবলে পড়া এদের জীবনের একটি খুব স্বাভাবিক দৃষ্টান্ত।

জীবনের একটানা প্রতিকূলতা এবং চরম বিপর্যয় কোনো কোনো পশ্চাত্য মনে এমন একটি সাময়িক প্রতিরোধ সৃষ্টি করে যার বশবর্তী হয়ে সে অপরাধে লিপ্ত হয়। সাধারণত সন্তোষ যখন সংকট আসে, সমাজ ও সংস্কৃতি যখন বিপর্যয় হয়ে ওঠে তখন কিছু লোক ঘটনাচক্রে অপরাধী হয়ে ওঠে। এদের বিশেষত্ব হলো অপরাধের পর এরা অনুশোচনায় লিপ্ত হয়। জীবন যখন স্বচ্ছন্দ গতিতে চলে, অভাব-অনটন যখন জীবনকে দুর্ভিক্ষ করে তোলেনা, ভয়াবহ-বাসস্থানের যখন অকুলান হয় না, তখন যাদের কহে সমাজ-গার্হস্থ্য কাজ কল্যাণাতীত—তারাও অবস্থা বিপর্যয়ে পড়ে অনেক ক্ষেত্রে অপরাধে লিপ্ত হয়ে থাকে। সাধারণত এই সব অপরাধীদের মূল উদ্দেশ্য স্থায়ী বিপর্যয় সত্ত্বাকে বাঁচিয়ে রাখবার প্রচেষ্টার মধ্যে জড়িত থাকে। কিন্তু এদের এই প্রচেষ্টা নীতি-বিরোধী হওয়ায় অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত হয়। ঘটনা-চক্রে জড়িয়ে পড়ে এই প্রকার অপরাধীদের চিন্তা-বিন্যাসে বিকৃতি আসে। ফলে এদের

দৃষ্টিভঙ্গী সাময়িকভাবে বিকৃত হয়। এই প্রকার অপরাধীদের অপরাধ সাধারণত পদ-স্থলন দ্বারা। এদের স্বাভাবিক করে তোলার জন্য প্রয়োজন শৃঙ্খলায় সমাজের সুবিবেচনা ও সহনশীলতা।

অপরাধ যে পর্যায়েরই হোক না কেন, সাধারণত কোন রকম বিবেচনা না করেই পরবেশ বা সমাজ তাকে ভুল বেছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে হেয় উচিত শাস্তির ব্যবস্থার সংশোধনের নামগন্ধ থাকে না, ঠিক তেমনি কয়েকটি ক্ষেত্রে চরম অপরাধী আইনকে ফাঁকি দিয়ে সমাজে প্রভাব পায় এবং পরিবেশকে বিকৃত করে তোলে। অনেক সময় অপরাধীর অনুশোচনা আসা সত্ত্বেও সমাজের অবহেলা ও হের-দুর্ভাগ্য সংশোধনের পক্ষে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। আইনের বিচারে অপরাধী-মাত্রই শাস্তি একমাত্র প্রতিবিধান। দণ্ড-বিধির মূল উদ্দেশ্য সমাজের শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখবার জন্য উপযুক্ত শাস্তির বিধান এবং যথাযথ প্রয়োগ। বর্তমান অপরাধ-বিজ্ঞানীদের চিন্তাধারায় সমাজ-কল্যাণের উক্ত উদ্দেশ্য একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য লক্ষ্যপথ বেছে নিয়েছে—সেটি হলো অপরাধীর পুনর্বাসন। এই লক্ষ্যপথ অনুযায়ী চলতে গেলে শাস্তির মধ্যে প্রচুর প্রতিহিংসার মনেভাবকে দূর করতে হবে। বর্তমান যুগের শাস্তি-পদ্ধতির একটি মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। আমাদের দেশে মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে নির্ধারিত শাস্তির প্রচলন সবে শুরু হয়েছে। অপরাধ প্রশমন এবং অপরাধীর পুনর্বাসন সম্পর্কীয় বিভিন্ন সমাজ-কল্যাণমূলক পরিকল্পনা এবং কার্যসূচী মনোবিজ্ঞান-ভিত্তিক। এইসব

পরিকল্পনা ও কার্যসূচীতে অপরাধীর মনের গতি ও প্রকৃতি অনুযায়ী সব প্রথম একটি প্রকারী বিভাগ করা হয়ে থাকে। এরপর সুশিক্ষিত, সুনিয়ন্ত্রিত এবং স্বতন্ত্র পরিবেশে অপরাধীর মনের নাগাল পাবার চেষ্টা করা হয়। অপরাধীর মনের গতি ও প্রকৃতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট কার্যসূচীর মাধ্যমে তার মানসিক ভারসাম্য ফিরিয়ে এনে তার বুদ্ধিমত্তা এবং অন্যান্য দক্ষতা অনুযায়ী তাকে উপযুক্ত উপজীবিকার শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। কিশোর অপরাধীদের সম্পর্কে এই পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রায় সার্বিক ব্যাপারের মধ্যে। বয়স্ক অপরাধীদের সম্পর্কেও আমাদের দেশে পুনর্বাসন পরিকল্পনার প্রবর্তন হয়েছে। জাগ্রত জনচেতনতার অভাবে, আদর্শ বিশেষজ্ঞ এবং মনোবিজ্ঞানের সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুসংহত কার্যসূচীর অভাবে এক কিছু বাস্তব বাধার জন্যে অপরাধীর পুনর্বাসন সম্পর্কীয় সমাজ-কল্যাণমূলক পরিকল্পনা-গুলির গতি শ্লথ হলো নৈরাশ্যজনক নয়। রোগের প্রভাব থেকে যেমন প্রাণীগণকে সম্পূর্ণ মুক্ত করা যায় না, দুর্ভাগ্যে যেমন পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিত করা যায় না, ঠিক তেমনি অপরাধ সত্ত্বাত্মক পরিধি থেকে সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব হবে না। শুধুও অপরাধীর পুনর্বাসনের পরিকল্পনা সার্বিকভাবে রূপায়িত হলে অনেক মন রহস্যময় হবে, সমাজে অপরাধের সংখ্যা অনেক কমে যাবে, সমাজে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার ভিত সুদৃঢ় হবে। অপরাধী সম্পর্কে এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে ভাবীকালের উন্নততর ও সংস্কৃত দণ্ডবিধির একটি আভ্যন্তরীণ সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে। সমাজের কল্যাণকামী এই আভ্যন্তরীণ সম্ভাবনাতত্ত্ব সকলের জ্ঞান-মন্দনযোগ্য।



পনেরোটা বছর ভারতবর্ষের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল না। উনিশ শো বারান সালে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেত চলে গিয়েছিলাম। এবং শিক্ষালভের পর সেখানেই আমি চাকরি নিয়েছি। একটি ইংরেজ মেরেকে বিনে করে লন্ডন শহরেই ঘর-সংসার পেতেছি। একটু ছেলেও আছে আমার। কোনো অভাব-অভিযোগ নেই। লেখাপড়া শিখে যখন টাকা রোজগারই করতে হবে তখন যেখানে ভাল মাইনের চাকরি পাব সেখানেই গিয়ে বসবাস করব বলে গোড়া থেকেই ভেবে রেখেছিলাম আমি। আমার বিশ্বাস, লন্ডনের চাকরিটার মতো এতো ভাল চাকরি ভারতবর্ষের কোথাও আমি পেতাম না। সদা স্বাধীন ভারতবর্ষকে উপকার করা কিংবা সাহায্য করার আশা আমাকে কেনেদিনও অনুপ্রাণিত করে নি। অন্ততঃ পনেরো বছর আগে আমার দ্বারা যে ভারতবর্ষের কোনো উপকার হতে পারে তেমন একটা রাজনৈতিক ভাওতা আমাকে মূহুর্তের জন্যও চঞ্চল করে তোলে নি। শুধু নিজের কি করে উপকার হয় সেই কথাই ভেবেছি। বড় আর ভাল চাকরির জন্য আমি আফ্রিকার উগান্ডা,

হে

দীপ্তি
চৌধুরী

কি বুগান্ডা রাজ্যে গিয়েও ঘর বাঁধতে পারতাম। ভারতীয় শিক্ষা আর সংস্কৃতির শেকল পরে কলকাতার কোনো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে যে আমি বন্দী হয়ে থাকব না তেমন প্রতিজ্ঞা আমার ছেলেবেলাকার।

তবু ভারতবর্ষের কথা আমি ভুলতে পারি না। আমার ইংরেজ স্ত্রী আর সাত বছর বয়সের ছেলেটি প্রধানমন্ত্রীর নামটি সহজেই বলে দিতে পারে। কবি রবীন্দ্রনাথ বাঙালী ছিলেন বলে স্ত্রী আর সন্তানের কাছে বিশেষভাবে সম্মানিত আমি। ওদের



আগ্রহ মূব বেশি বলেই পনেরো বছর পরে ভারতবর্ষ দেখতে এসেছি আমরা।

প্রথমেই এসেছি কলকাতায়। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার হাস্যকর পরিণতি দেখবার উদ্দেশ্যে আমাদের ছিল না। আমরা এসেছি আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে এবং তাদের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষকে দেখতে। আমার মা-বাবা নেই। ডাই-বোনরা আছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আগে থেকেই চৌরঙ্গীর একটা বড় হোটেল ঘর ভাড়া করে রেখেছিলেন আমি। এ দেশে যে এখন অভাবের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে খবর আমরা সংবাদপত্র না পড়েও জানতাম। ডাই নিকটআত্মীয় হলেও তাদের কন্ট্রোল-কন্ট্রাক্ট সংসারটাকে আরো বেশি কন্ট্রাক্ট করে তুলতে চাই নি।

দিন পনেরো হল কলকাতায় এসেছি। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে। বাশালাই মেরেদের আদর আপ্যায়নের জাকজমক দেখে আমার স্ত্রী আইলীন বিহার কিংবা মধ্যপ্রদেশের দুর্ভিক্ষের ব্যাপারটাকে একটা রাজনৈতিক চক্রান্ত বলে মনেই করতে আরম্ভ করেছে। এবং মাত্র দু' সপ্তাহের মধ্যেই তার ধারণা জন্মেছে যে, এ-দেশটা বোধহয় একটা চক্রান্তের দেশ। এখানে কাজের চেরে চক্রান্ত হয় বেশি।

কিন্তু এই সব ব্যাপারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কোনো সম্পর্ক নেই। আপনাতা আজ নিশ্চয়ই খবরের কাগজে পড়েছেন যে, আউটারাম ঘাটে কমলেশ মজুমদার নামে একজন মাতাল ব্যক্তি পা ফসকে জলে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণে পতিত হয়েছে। রাত করেটার সময় প্রায় এক মাইল দূরে গিয়ে তার মৃতদেহটা ভেসে ওঠে। এবং বেলা এগারোটার সময় মরনাতন্দন্ত হওয়ার কথাও পড়েছেন আপনারা। পুলিশ সন্দেহ করছে, কমলেশের মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী। হয়তো এর পেছনে বিরাট একটা চক্রান্ত রয়েছে। তাদের ধারণা, চক্রান্তের সূত্রপাত হয় পনেরো বছর আগে। আমি তখন কলকাতার কলেজে বি-এ-সি পড়ছি আর সেই কলেজেই বি-এ পড়ছে কমলেশ।

আমার বিশ্বাস, পুলিশের হাতে কাজ নেই। অতএব তারা খেঁ ভাজার কাজ করছে। আমার অপরাধ—পারচারি করতে করতে কমলেশ যখন পা ফসকে পড়ে যায় তখন আমি ওর সঙ্গে ছিলাম। কলকাতায় আসবার পরে গতকালই ওর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়। সারাটা দুপুর আমার হোটেলের কসেই রুদ খেয়েছে। আমার পরসাদা দিতে দেয় নি এবং নিজেও দেয় নি। দেখলাম, অন্য একজনের আঁকাউটে শুধু স্লিপ পই করে যাচ্ছে। মনে হল, মদ্যপানের ঘরটিতে প্রতিটি বোয়রা আর বাঁদ-ম্যানিটিও কমলেশকে খুব ভাল করে চেনে।

কলেজে পড়বার সময় কমলেশের সঙ্গে আমার ভাব ছিল বটে কিন্তু বন্ধু ছিল না। বন্ধুত্ব করবার সুযোগ পাওয়া যেত না। খেলাধুলোর নাম ছিল ওর। দেখতেও খুব সুন্দর ছিল। ওর জন্য আমাদের কলেজ পর পর দু' বছরই ফুটবল

খেলায় জয়ী হতে পেরেছিল। টেনিসও খেলত ভাল। বাঁক লড়ত। এই জন্য আমরা পক্ষে ওর নাগাল পাওয়া সম্ভব হতো না। ছেলেরা, এমন কি মেয়েরাও ওকে ঘিরে থাকত সব সময়। সকলেই ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু কোনো মেয়ে ওর প্রেমে পড়েছে বলে আমি জানতাম না। এই সম্বন্ধে ছেলেরদের মুখ থেকে কোনো আমি গল্পগুজব শুনিনি। কমলেশের জীবনে এইটাই ছিল একটা মস্তবড় অম্বাভাবিক ব্যাপার। নিকট বন্ধুদের সঙ্গে এই নিয়ে মহক মহক আমি আলোচনা-আলোচনা করতাম। আমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল সত্যপ্রিয় বিবাস। সে বলত, 'এই ধরনের কমলেশের মতো একটি নিম্পাশ চরিত্র খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।'

আমি তার প্রতিবাদ করে বলতাম, 'পাপ বলতে কি বোঝা জানি না। কিন্তু ব্যাপারটা আমার কাছে সাংঘাতিক অম্বাভাবিক ঠেকে। হয়তো ভবিষ্যৎ জীবনে সত্যিকারের একটি ক্রিমিনাল হয়ে উঠবে সে।'

আমার কথা শুনে সত্যপ্রিয় শুধু হাসত।

পরীক্ষার পর আমি বিলম্ব চলে গেলাম। তারপর কমলেশের সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নি। পনেরো বছর পর দু' সপ্তাহ আগে কলকাতায় ফিরে এসেছি আমি। কমলেশের খোঁজ করি নি। হঠাৎ চৌরঙ্গীর হোটেল মদ্যপানের ঘরটিতে দুপুরবেলা ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। সম্ভাব্যেলা টানতে টানতে সে আমার নিয়ে গিয়েছিল গঙ্গার ধারে। বলেছিল, 'চল, ওখানে গিয়ে শানিককণ মৃত্যু বার, সেবন করে আসি। আউটারাম ঘাটে বেড়াবার জায়গা আছে।'

হাওয়ার পথে হঠাৎ মনে পড়েছিল, সব রকমের খেলাধুলায় কমলেশের কৃতিত্ব থাকলেও সে সত্যি জমজম না। সেই জন্য জল দেখলেই ভয় পেত সে। ভুল করেও কখনো সে জলের ধারে যেত না। এখন ভাবলাম, হয়তো পরবর্তী জীবনে কমলেশ সত্যি শিখেছে। অতএব জল দেখলে আর ভয় পায় না। কিন্তু গতকাল যখন পা ফসকে ঘাটের ওপর থেকে জলের মধ্যে পড়ে গিয়ে আর উঠল না তখন বন্ধুর পারলাম, কমলেশ সত্যি জানে না। গঙ্গায় তখন বান ডেকেছিল। চাকতির মধ্যে চলে গিয়েছিল দূরে। ওখানে আরো কয়েকজন লোক হাওয়া খেতে এসেছিলেন। মাটির মধ্যে একটা লম্বা বাঁধা ছিল। লম্বের মুসলমান শরণার্থী আমার জিজ্ঞাসা করল, 'গাইটি কি সত্যি জানেন না?'

পুলিশ বলছে, জবাব দিতে নাকি অনেককণ দেরি করেছিলেন আমি। যখন জবাব দিলাম, 'রোখহর সত্যি জানেন না' তখন প্রোভের টানে কমলেশ কোথা যে ভেসে গিয়েছিল কেউ তার হাঁস পেল না। সারেশ আর কয়েকজন ছোকরা খালসী লাফিয়ে পড়ে ভুলসাতার দিয়ে অনেককণ পরন্ত খোঁজখুঁজি করল বটে, কিন্তু কাছ

হল না তাতে। মাঝরাতির পরে প্রায় এক মাইল দূরে কমলেশের মৃতদেহটা ভেসে উঠল।

কলকাতায় পৌঁছবার ঠিক তেরো দিন পরে সত্যপ্রিয়কে টেলিফোন করলাম। বিলম্ব থেকে থাকতে গোড়ার দিকে চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ ছিল। তারপর বছর দুই পরে সত্যপ্রিয় নিজেই চিঠি লেখা বন্ধ করে দিল। শেষ চিঠিতে লিখেছিল যে, চাকরি-বাকরির চেষ্টা না করে সে ব্যবসা করতে নেমেছে। স্বাধীন ভারতবর্ষে নতুন নতুন ব্যবসার সুযোগ অনেক। হঠাৎ কিছু মূল-ধন হাতে এসে গিয়েছে বলে সত্যপ্রিয় ব্যবসাতেই ঝোলানো মনোযোগ দিয়েছে। এই চিঠি পাওয়ার পর আমি আর ওকে চিঠি দিই নি। মাঝখানে তেরোটা বছর পার হয়ে গেল। শুধু এক বছর আগে লন্ডনে থাকতে এক বন্ধুর কাছে শুনিয়েছিলাম যে, সত্যপ্রিয় হাটের চিকিৎসার জন্য পুইজার-ল্যান্ড এসে মাস তিন কাটিয়ে গেল। এই এই বয়সে হাটের অসুখ হল কেন বুঝতে পারলাম না। পরদিন কি ছাত্রণ বছর বয়স হবে ওর। হয়তো ব্যবসায় সাফল্যলাভ করবার জন্য ভীষণভাবে খাটতে হয়েছে। সাফল্যলাভ যে করেছে তাতে আর সন্দেহ নেই। লন্ডনে বসেই শুনতে পেরেছিলাম যে, রীতিমতো ধনীলোক সে। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। কলেজে থাকতেই শুনিয়েছিলাম, সত্যপ্রিয়ের এক বিধবা কাকীমা ওর লেখাপড়ার খরচ চালান। কাকীমার রহস্য ছিল মাত্র পঁচিশ আর সতুর কুড়ি। কাকা হঠাৎ মারা যাওয়ার জন্য জীবনবীমার এক লক্ষ টাকা পেয়েছিলেন কাকীমা। তা ছাড়া বালিগঞ্জে কাকা একটা নতুন বাড়িও রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু সতুর বাবা সাধারণ একটা কেরানীর চাকরি করতেন। সংসারটাও ছিল বড়। মাইনে যা পেতেন তা দিয়ে কাকীমার উঠতে পারতেন না। কাকা মারা যাওয়ার পর ওর খরচা সব চালাতে লাগলেন কাকীমা। শেষ পর্যন্ত কাকীমার বাড়িতেই উঠে এসেছিল সে। আমরা ওকে ঠাট্টা করে বলতাম, 'বর্তমানে না কাকীমার আবার বিয়ে হচ্ছে ততদিন লেখাপড়া শেষ করে কাকীমার চুকে পড়।'

অবিশ্যি কাকীমার আর বিয়ে হয় নি। শেষ চিঠিতে সতু লিখেছিল, হঠাৎ গত মঙ্গলবার কাকীমা মারা গিয়েছেন।

ওর অফিসেই আজ টেলিফোন করে বললাম, 'হ্যালো, সতু—'

'কে?'

'চিনতে পারছিস?'

'শশাঙ্ক না?'

'হ্যাঁ, প্রায় তেরো দিন হল কলকাতায় এসেছি। সঙ্গে বউ আর ছেলেকেও নিয়ে এসেছি। উঠেছে চৌরঙ্গীর হোটেল। অফিসের পর আমার এখানে চলে আর।'

একটু ভেবে নিয়ে সত্যপ্রিয় বলল, 'না, ছুই বরং আমার বাড়ি আর। বিয়ে-টিরে করি নি। একাই আছি। আজ আমরা দুজনে বসে গল্প করব।'

পরে একদিন বউ আর ছেলেকে আমি নিয়ে গিয়ে নিয়ে আসব। আসবি?

‘ঠিকানা দে।’

বুঝলাম বালিগজের বাড়িটাতে সত্যাপ্রিয় আর থাকে না। বললে যে আলিপুরে নতুন একটা বাড়ি তৈরি করেছে। বড় বাড়ি। সামনে সুন্দর একটা বাগান আছে। ফেটের পাশে বন্দুক নিয়ে গাহারা দেয় একজন শিখ দারোয়ান। সত্য যে সুরক্ষিত হচ্ছে বাস করছে তাতে আর সন্দেহ নেই।

সন্ধ্যাবেলা ওর বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলার আমি। দারোয়ানকে বলাই ছিল। একজন বেরা এসে আমার সোতলার নিয়ে গেল। মৃণ্ম হওয়ার মতো বাড়ি বটে। কিন্তু সত্যকে বললাম, ‘এ কি চেহারা হয়েছে তোরা? কী সাংঘাতিক বাড়ি গিয়েছিল?’

হাটের ব্যারামে ভুগছি। দু’বছর আক্রমণ হয়ে গিয়েছে। অতএব তৃতীয় আক্রমণের ভয়ে সময় কাটে আমার। হাক পে, কুই কেমন আছিস? দেখে তো মনে হচ্ছে খুবই সুখে আছিস।’

সত্যর ভাবভঙ্গী দেখে ও কথাবাত্তা শুনেন মনে হল, চম্বিশ ঘণ্টাই ভয়ে ভয়ে সময় কাটাচ্ছে সে। গল্প করতে করতে মাঝে মাঝে অনমনস্ক হয়ে পড়ছিল। প্রায় ঘণ্টা দুই নানারকমের গল্প হল।

অলসকারে তিল ছোড়বার মতো হঠাৎ আমি জিজ্ঞাসা করে বললাম, ‘তোরা কি শব্দ, হাটের ভয়, না কি অন্য কোনো ভয় আছে?’

আমার প্রশ্ন শুনেন ওর মুখটা ফেঁসায়ে হয়ে গেল।

খানিকক্ষণ পার্শ্বচরিত্র করে ঘুরে বেড়াল ঘরের মধ্যে; তারপর জবাবটা এড়িয়ে দিয়ে সত্যাপ্রিয় জিজ্ঞাসা করল, ‘আমায়, পুরনো বন্ধুদের মধ্যে কার কার সঙ্গে দেখা হল? ব্যাংক, আমদের সঙ্গে বন্দনা বলে একটি মেয়ে পড়ত মনে আছে? বন্দনা মজিরক?’

‘খুব মনে আছে।’ তার সঙ্গে আমার বন্ধু হিসেবে বেশ ভাব ছিল। বছর দশ আগে লন্ডনে ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার। তখন ওর বিয়ে হয় নি।’

‘এখন সে বিবাহিতা। খুব ভাল বিয়ে হয়েছে। ওর স্যামী মিস্টার রাধাপ্রসাদ সেন একটা বিলেতী কোম্পানির ডিরেক্টর হয়েছেন। ভীষণ কমতা। আমার সঙ্গে কিছু কিছু কাজ হয়—তিনি অবিশ্য জানেন না যে, বন্দনার সহপাঠী আমি।’

‘জানলে কিছু সুবিধা হবে কি তোরা?’

‘আরো ভাল রেটে আঁকো বেশি আড়ার পাব।’

হাতের কাছেই টেলিফোনটা ছিল। দেখলাম বন্দনার টেলিফোন নম্বরটা সত্যর জানাই আছে। টেলিফোন করে রিসিভারটা আমার হাতে তুলে দিল সে।

ওপাশ থেকে বন্দনা জিজ্ঞাসা করল, ‘হ্যালো, কে? শশাঙ্ক? কোথা থেকে কল? হাট ফানি? কবে এসে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাল এসে। নিশ্চয়ই আসবে।’ সেখা মাড়ে ছুটায়। চিয়ার ইউ—

খুশী হল সত্যাপ্রিয়। আরো বেশি টাকা প্রেরণার করবে সে। হাটের ওপর

কৃত্রিম আক্রমণ মনেই খরস হয়ে যাওয়া। তা সত্ত্বেও আরো টাকা চাই ওর। বিয়ে করে নি কেন সে সম্পর্কে আমি কোনো প্রশ্নই করলাম না। মনে হল হাট ছাড়াও অন্য কোনো একটা গোলমাল আছে ওর। ভয়ে ভয়ে জীবন কাটাচ্ছে। বুকের ওপর বোকার মতো ভরটা চেপে বসে আছে।

টেলিফোন বেজে উঠল। সত্যাপ্রিয় রিসিভার তুলে জিজ্ঞাসা করল, হ্যালো—কে? ও, কে? কত চাই? পঞ্চাশ? পাবে। কাল অফিসে গিয়ে ক্যাশিয়ারবাবুর কাছ থেকে নিয়ে নিও। তাকে বলে রাখব। রিসিভারটা ফেলে রাখার আগেই মৃণ্মটা ওর যেন মৃহতের মধ্যে রক্তশূন্য হয়ে গেল। দম নেওয়ার জন্য মিনিট দুই চুপ করে বসে রইল সে।

জিজ্ঞাসা করলাম, ‘কি হল? কে ফোন করছিল?’

‘সেই লোকটা। আজ দশ বছর থেকে বুকের ওপর চেপে বসে রয়েছে—’ মৃণ্মতোষির মতো বলে খেতে লাগল সত্যাপ্রিয়, ‘শব্দ, টাকা, টাকা, আর টাকা। বখনি চায় তখনি দিই।’

‘ব্র্যাকমেল?’

‘মোটামুটি তাই। কিন্তু লোকটা কি অস্বভূত। লাখ টাকা চাইলে একসঙ্গে দিয়ে দিতাম। সারাজীবনের জন্য নিশ্চিত বোধ করতাম। কিন্তু তা সে নেবে না। মাসে শ-দুই টাকার বেশি নেয় না। গত দশ বছর থেকে লেগে রয়েছে।’

‘তোরা কোনো সিক্রেট আছে না কি? অপরাধ করেছিল কখনো?’

‘ব্যবসায়ীরা বোলআনা সাধু হতে পারে না, শশাঙ্ক। আমার নাম করে লোকটা বড় বড় দোকানে যায়, জিনিস কেনে। আমি আক্যাউন্ট খুলে দিয়েছি। একবারে লাখ টাকা নিয়ে সরে পড়লে আমার হাটের ওপর বোধ হয় একবারও আক্রমণ হতো না।’

‘অপরাধটা কি গুরুতর?’

‘হ্যাঁ, গুরুতর বৈকি। অবিশ্য প্রমাণ কিছু নেই, তবু পুলিশরা আঁকো সন্দেহ করে যে, কাকীমাকে আমিই খুন করে ফেলেছিলাম।’

‘কাকীমা মারা গিয়েছিলেন কি করে?’

‘সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মারা গিয়েছিলেন।’

‘এই লোকটা বুঝি তোরা গোপন ব্যাপারগুলো জানে?’

‘প্রকাশ্যে কোনো আলোচনা হয় নি বটে, কিন্তু দশ বছর আগে প্রথম বখনি টাকা চাইতে এসেছিল তখন বলেছিল, ‘কিছু টাকা দে আমার। নইলে সব কথা ফাঁস করে দেব।’ তারপর থেকে আমার সঙ্গে আর দেখা হয় নি। টেলিফোনে কথা হয়। নগদ শ-দুই টাকার বেশি নেয় না। জামা-কাপড় আর মদের দোকানের বিল শোধ করি—কিন্তু তাতেও আমার একশ-দেড়শ টাকার বেশি লাগে না। লোকটার চরিত্রে একটা অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতার লক্ষণ দেখতে পাই। সেই জন্যই প্রতি-মাসে টাকা নিয়ে ওর অস্তিত্বের কথা ভুলতে দেয় না আমার। কাউকে খুন করি নি, তবু মনে হয় আমি খুনী।’

‘আশ্চর্য! এ তো দেখছি অত্যন্ত বিদ্রী় অবস্থা তোরা? লাখ লাখ টাকা উপার্জন করেই বা লাভ কি?’

‘সেই জন্যই ভাবি কেউ যদি আমার হয়ে লোকটাকে খুন করতে পারে তা হলে আমি তাকে নগদ দেব দ’ লাখ—আর বালিগজের বাড়িটাও লিখে দেব।’

সত্যর কথা শুনেন হেসে উঠলাম আমি। কথাটা এমনভাবে বলল যেন মনে—হল, লোকটাকে খুঁশি করবার জন্য আমাকেই অনুরোধ করেছে সে। সাত নটা প্রায় মাজে। উঠে পড়লাম। আমার সঙ্গে সঙ্গে একতলার নেমে এল সত্যাপ্রিয়। ওর এই অবস্থা দেখে খুবই দুঃখবোধ করতে লাগলাম। ব্যবসায়ীরা বোলআনা সং না হতে পারে, কিন্তু খুনের মারে অভিযুক্ত হবে কেন? সত্য অবিশ্য অভিযুক্ত হয় নি। পুলিশ শব্দ সন্দেহ করে ওকে। আমার মনে হল, আসল অপরাধী ওর বিবেক—লোকটা তার রক্ত-মাংসের বাহ্যিক রূপ।

বিদায় নেওয়ার আগে বললাম, ‘হাওয়ার আগে আরেকদিন এসে দেখা করে যাব। মাস দুই থাকব ভারতবর্ষে।’

পরের দিন গেলাম বন্দনার সঙ্গে দেখা করতে। একটি বাচ্চা হয়েছে। প্রথমে মনে হয়েছিল খুবই সুখী। তারপর অজোড়ানা-প্রসঙ্গে হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করে বলল, ‘কমলেশ মজুমদারের সঙ্গে দেখা হয়েছে?’

‘না। কি করছে কমলেশ?’

‘কিছুই না। ছাত্রজীবনে ওর সঙ্গে আমার ভাব ছিল বটে, কিন্তু প্রেম-টোম কিছু ছিল না। এখন একটি লোফার-শুটো বললেই ঠিক বলা হবে। আমার সঙ্গে দেখা হয় না, টেলিফোনে কথা হয়। মাঝে মাঝে টাকা চেয়ে নেয়। বেশি নেয় না, শ-দুই টাকা—বেয়ারার হতে দিয়ে পাঠিয়ে দিই।’

‘কেন দাও?’

‘ভয়ে। প্রথম যেদিন টাকা চাইতে এসেছিল সেদিন বলে ছল, ‘কিছু টাকা দাও নইলে সব ফাঁস করে দেব।’ রাধাপ্রসাদকে আমি চিনি। ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি টাকা দিয়ে দিলাম। আমার এই সুন্দর সাক্ষাত-গৃহনো সংসারটা তখনই হয়ে যায় তা আমি চাই নি।’

‘তোমার কোনো সিক্রেট আছে বলে ছাত্রজীবনে আমি জানতাম না।’

‘ছিল, শশাঙ্ক। অন্য একটি ছেলেকে আমি ভালবাসতাম। তাকে তোমরা চিনতে না। প্রতি সপ্তাহে অস্বভূত তিনখানা করে চিঠি তাকে লিখেছি—’

‘এ বয়সে অনেকই লেখে।’

‘আমি অনেকটা দূর এগিয়ে গিয়েছিলাম। কমলেশের কথা শুনেন ভাবলাম, ভেতরের খবর সে জানে। পুরুষের মনে একবার সন্দেহ ঢুকলে, সারাজীবনেও তা দূর হয় না। শশাঙ্ক, গত পাঁচ বছর থেকে চম্বিশ ঘণ্টাই ভয়ে ভয়ে আছি। একসঙ্গে হাজার দশ চাইলে কমলেশকে নিয়ে দিতাম। কিন্তু তা সে নেবে না। প্রতি মাসে

একশ-দুশ করে নেয়—ছুরে ছুরে থাকে।
একটা দৃষ্ট দৃষ্টের মতো মনের মধ্যে ওর
অস্তিত্ব অনুভব করি। আরো কতো লোকের
জীবনে যে এমনিভাবে লেগে রয়েছে কে
জানে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল বন্দনা।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কমলেশের এই অবস্থা
হল কেন?'

'ওর মতো একটা অস্বাভাবিকতা ছিল।
অপরের কষ্টে সুখ পায় সে।'

'কিন্তু কেন?'

'বোধহয় এই জন্য ললিতাই দারী।'

'ললিতা কে?'

'একজন লক্ষপতির মেয়ে। তাকেই
ভালবাসত কমলেশ। ভীষণ ভালবাসত।
কিন্তু ললিতা ওকে ঘৃণা করত। অন্য
লোকের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গিয়েছে তার।
বারা অতিমাত্রায় সরল তারা আঘাত খেলে
বোধহয় অতিমাত্রায় হিংস্র হয়ে ওঠে।
সামাজিক আর সাংসারিক শৃঙ্খলা ভেঙে
ফেলবার জন্য সর্বদাই চেষ্টা করে। মাঝে মাঝে
ভাবি, কেউ যদি কমলেশকে গুম করে ফেলত
তা হলে গৃহনা বেচত তাকে আমি হাজার
কুড়ি টাকা দিতাম।'

বন্দনার কথা শুনে আজো আমার হাস
এল। কথাটা এমনভাবে বলল সে, যেন কম-
লেশকে গুম করবার জন্য আমাকেই অনু-
রোধ করছে বন্দনা।

উঠ পড়লাম আমি। মনটা সত্যিই
বিষয়ে উঠল। পনেরো বছর পর ভারতবর্ষ
দেখতে এসেছিলাম আমি। এখন মনে হচ্ছে,
না এলেই বোধহয় ভাল হতো।

বন্দনা বলল, 'আবার কবে আসবে?
কমলেশের সঙ্গে কি তোমার দেখা হবে না?'

'সম্ভাবনা কম। কলকাতায় আর হয়তো
আমরা এক সপ্তাহ থাকব। তারপর যাব
দক্ষিণ-ভারত দেখতে। ডেবেছিলাম দু'গা-
পূর ভিলাই আর রাউরকেলা ঘুরে আসব
একবার। কিন্তু তোমাদের মতো সেসব
জায়গাগুলোতেও দেখছি অশান্তি চলছে।'

'এই জন্য দারী কমলেশ।'

'কমলেশ কে? বুঝলে বন্দনা, কমলেশ
হচ্ছে দেশ ও জাতির অপরাধী বিবেক।'

'পাপ।' কথাটার জোর দিল বন্দনা।

তর্ক করবার প্রয়োজন বোধ করলাম না।
বিনায় নিয়ে চলে এলাম আমি।

গতকাল হোটেলের মধ্যপানের ঘরটাতে
হঠাৎ কমলেশ মজুমদারের সঙ্গে দেখা
হয়ে গিয়েছিল আমার। আগের মতো
চেহারাটা আর সুন্দর নেই। মাথার চুল
দেখলাম পেকে গিয়েছে। চোখের নিচে আগ
ইটি চওড়া কালি পড়েছে। মুখের চামড়ায়
গোটা কয়েক ভাঁজ। অত্যধিক মধ্যপানের
ফলে স্বাস্থ্যের হানি হয়েছে খুব। আমাকে
দেখে প্রথমেই সে জড়িয়ে ধরল। তারপর
বেরারকে ডেকে আমার জন্য মদ আনবার
হুকুম দিল। ঘরের এক কোনায় এসে বসলাম
আমরা।

প্রথম প্রশ্ন শুনেই অবাক হয়ে গেলম।
কমলেশ জিজ্ঞাসা করল, 'সত্যি কি বলল?
পরশুদিন সেখানে গিয়েছিল তুই।'



ফটো : পাখি সারথি

'তুই কি করে জানলি?'

'আমার দুটো অস্তিত্ব। তার মধ্যে একটা
হচ্ছে ভৌতিক।' হাসতে লাগল কমলেশ।

ভাবলাম, ব্যাপরটাকে আর গোপন রেখে
লাভ নেই। দেখা যখন হয়েই গেল তখন
খেলোয়াড়ি আলোচনা করাই ভাল।

'জিজ্ঞাসা করলাম, 'চাকরি-বাকরি করিস
না কেন?'

'কার জন্য করব? যাকে ভালবাসতাম
তাকে যখন পেলাম না তখন চাকরি করে
করব কি?'

'তা হলে ভয় দেখিয়ে টাকা রোজগার
করিস কি করে? পরের সিক্রেট ভাঙিয়ে
উপার্জন করতে লজ্জা করে না তোরা?'

'কারো সিক্রেটই আমি জানি না।'

'তার মনে? তা হলে ওরা ভয় পায়
কেন?'

'ওরা নিজেরাই অপরাধী বলে। বুঝলি
শশাঙ্ক। প্রত্যেক মানুষেরই একটা না
একটা সিক্রেট থাকে। এই কথাটাকে সত্য বলে
মনে নিয়ে প্রথমে সতুর ওপর পরীক্ষা
করতে গেলাম। দেখলাম, পরীক্ষাটা সার্থক
হয়েছে। বন্দনার ওপরও সেই একই পরীক্ষা
চালিয়েছিলাম। এরা নিজেদের বিবেক-
দংশনের খোঁচা খাচ্ছে দিনরাত। মাঝখান
থেকে আমার টাকার অভাব মিটে যাচ্ছে।
প্রকৃতপক্ষে কারো সিক্রেটই আমি জানি না।'

'একসঙ্গে মোটা টাকা তুলে নিলেই
তো পারিস।'

'আরো গোটা দশেক শিকার আছে
আমার। প্রত্যেকের কাছ থেকে কিছু কিছু
পেলে মোট পরিমাণ টাকা বেশ মোটাই হয়।'
হেসে উঠল কমলেশ। হাসি থামবার পর

বলল, 'চলে যাচ্ছে আমার। মোটা টাকা
নিলেও অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পাবে না
ওরা। সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রকমের
শিকার ধরেছি আমি। খেলিয়ে-খেলিয়ে
টাকা আদায় করতে বেশ লাগে।'

একটু ভেবে নিয়ে বললাম, 'আসলে
সুখী লোক দেখলে তোরা হিংসে হয়।'

'হবেও বা।' চুপ করে গেল কমলেশ।

মনস্তত্ত্বের দিক থেকে পুরো
মানুষটিকে বুঝতে আমার কষ্ট হল না।
খানিকটা সহানুভূতিও হল ওর প্রতি।
কিন্তু দশ-বারোটি মানুষকে ভয়ের মধ্যে
কালতিপাত করতে বাধ্য করছে বলে
কমলেশকে একটা রক্ত-মাংসের শয়তান বলে
মনে হল আমার। আজ রাতেই সতু আর
বন্দনাকে গিয়ে বলে আসব যে, ওদের
জীবনের কোনো গোপন কথাই জানে না
সে। অন্য দশটি লোকের খবর আমি জানি
না। আপাতত দু'জনকে যদি ভয় থেকে
মুক্তি দিয়ে যেতে পারি, তা হলে ভাবব,
বিলেতী টাকা খরচ করে ভারতবর্ষে আসা
আমার সার্থকই হয়েছে।

হাত-ঘড়িতে সময় দেখে কমলেশ বলল,
'চল, গঙ্গার ধার থেকে ঘুরে আসি।'

আপত্তি করলাম না। শীততাপনিয়ন্ত্রিত
ঘরটিতে বসে থাকতে আমারও আর ভাল
লাগছিল না। মৃত্ত হাওয়ার খানিকক্ষণ ঘুরে
বেড়াতে ভালই লাগবে।

আউটরাম ঘাটে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ
পা ফসকে পড়ে গেল কমলেশ।

পুলিশ বলছে, কোনো একটা গোপন
উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই নাকি কমলেশ
মজুমদারকে আমি থাকে দিয়ে ফেলিয়েছিলাম
জলে। উদ্দেশ্যটা যে কি হতে পারে
বসে বসে শুধু সেই কথাটাই স্বাভাবিক।

দাজিলিং!

পূর্বতনগরীদের রূপী এই শহর দাজিলিং। হিমালয়ের কোলে ছবির মত সাজানো শহর দাজিলিং। চিরবসন্তের শহর দাজিলিং।

দাজিলিং রেলওয়ে স্টেশনটি একতলা। স্টেশনের সামনে থেকেই বেরিয়েছে কার্ট-রোড। চওড়া রাস্তাটা সিঁধে এগিয়ে গেছে বাজারের পাশ দিয়ে, ট্যাক্সি-স্ট্যান্ডকে বাঁদিকে-রেখে, ক্যাফোলিক চার্চ আর কাছারীর ওপর দিয়ে। কিছুদূর গিয়ে কার্ট রোড নতুন নাম নিয়েছে-লেবং কার্ট রোড। বাকি হিলকে প্রদক্ষিণ করে সুদীর্ঘ পথটা চলে গেছে লেবং রেসকোর্সের দিকে।

অতদূর যেতে হবে না।

কার্ট রোড বখন লেবং কার্ট রোড হব-হব করছে, ঠিক তখন ডানদিকে সাহাডের গা বেয়ে পকসিডের মত একটা পথ উঠে

সুন্দর
মৌসুমের
অভিলাষ
মুগ্ধতা ও
চৈনিক
দারুণত্ব

কেউ ক্লাউডেড ইয়োলো, কেউ মার্বেল হোয়াইট, কেউ বেডফোর্ড বন্দ।

কিন্তু এ বাগানটি যেন সব বাগানকেই টেকা মারে। টেকা মারে আমতনে নয়, ডিজাইনে। বাগান সাজাবার অভিনব প্যাটার্নে।

বাগানের এক প্রান্তে বকবকে একটি বাংলো। বাংলোর রঙ হালকা হলুদ। সামনে দীর্ঘ ইউক্যালিপটাস আর ঝাউ গাছের বাঁধি। তাকশছোঁয়া বৃক্ষসারি যেন নিভৃত এই বাংলোটিকে লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপন করে রাখতে চাইছে।

করণ, এ বাংলো, এই বাগানের মূল্য যত, তার চাইতেও মূল্যবান হল বাংলোর মধ্যে রক্ষিত দৃশ্যপ্রাপ্য বস্তুগুলি। ছোটখাট একটা মিউজিয়াম গড়ে উঠেছে বাংলোর অভ্যন্তরে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত হরেকরকম বিচিত্র বস্তুসম্ভার



গেছে ওপরে। রাস্তাটার নাম রিভার্স হিল রোড।

পথের পাশে একটা ভারী সুন্দর বাগান। পথ চলতে চলতে সবাইকেই বাগানের পাশে একবার মনোহর হয়ে। অবশ্য চির-

সবুজ দাজিলিংয়ে বাগানের শোভা পথে-ঘাটে। বৈদিকে দুটোখা হয়, সেই দিকেই তে খে পড় কেবল ফুল আর ফুল। ফুলের ওপর গুনগুন করে কত মৃৎ প্রহর জা-কত বিহবল প্রজাপতি। বিচিত্র নাম তাদের।

সংগঠিত হয়েছে বহুদিনের অধ্যবসায় ও অর্থ-
ব্যয়ে এই বাংলার প্রতিটি কক্ষে।

দার্জিলিংয়ে হেন বাড়ি নেই যে জানে না
এই বাংলা আর এই বাগানের ঠিকানা,
জানে না বাংলার মূলক আর তার আশ্চর্য
মিউজিয়ামের বস্তান্ত। সংগ্রহশালার চৈনিক
পোস্টলেন মার্তি আর মিশরীয় জলছড়ির
চাইতেও তাদের কাছে অধিকতর চিত্তাকর্ষক
হল সংগ্রহশালার স্বাধিকারী।

নাম তার চিংইয়াং।

প্তার নাম মাধবীলতা।

চিংইয়াং জাতিতে চীনা। ধর্ম বৌদ্ধ।

মাধবীলতা জাতিতে বাঙালী। ধর্ম
হিন্দু।

চিং ইয়াং প্রৌঢ়। বয়স বাহ্যিক।

মাধবীলতা যুবতী। বয়স বইশ।

আমাদের গল্প সুদূর এই মাধবীলতা
আর চিংইয়াংকে নিয়ে, অকুশল এই
বাগান আর এই বাংলা।

রহস্য কিন্তু নির্ভর করে উঠেছে আরও
দুটি বস্তুকে নিয়ে।

সুদূর সগরের অভিশন্ত মৃত্যু আর
দারুণ মৃত্যুকে ঘিরে।

কিউরিও সংগ্রহ শুধু যে চিংইয়াংয়ের
মাতিক, তা নয়। এটা তার ব্যবসায়ও বটে।
বিভিন্ন মণিমুক্তা হীরা-জহরৎ তিনি অল্প-
মূল্যে কিনে নেন তিব্বতী ভূটিয়াদের কাছ
থেকে। এ ছাড়াও তাঁর কাছে আসে সুদূর-
সাগরের মুক্তা, ব্রহ্মদেশের পদ্মরাগমণি,
অস্ট্রেলিয়ার ওপ্যাল কাং-হি কুলদানি এবং
আরও কত কি। সব জিনিস অবশ্য
বাংলাতে থাকে না। কারবারের সুবিধার
জন্যে রবার্টসন রোডে—কোম্পানীর শোরুমের
দেওয়ান হয়।

বাংলাতে চিংইয়াং একক জমিদারি
হলেও ব্যবসায়ের তিনি একক নন। তাঁর এক-
জন পট্টনার আছে। ভুল্ললোক দার্জিলিংয়ের
আদ্য রাসিমলা। নাম, কমরূপ থালা।
জাতিতে নেপালী। বয়স চল্লিশ।

আতিথেয়তার জন্যে চিংইয়াংয়ের নাম-
ডক আছে। তাঁর বন্ধু-বান্ধবও অগণিত।
কিন্তু একজনের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা আর
সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। চিংইয়াংয়ের এই
প্রিয় বন্ধুটি অবশ্য ভিন্নধর্মী ও ভিন্নজাতি।
কিন্তু জাতিধর্মের প্রাচীর তাঁদের মনের মাঝে
বাঁড়তে পারেনি। তাই ইউরোপ তাঁর
মাহাত্ম্য হলো দার্জিলিংকে শ্রেষ্ঠজীবন
আবাস করে নিয়েছেন, বাইবেল তাঁর ধর্মগ্রন্থ
হলেও ত্রিপিটক সূত্র আর বেদবেদান্তউপ-
নিষদের মধ্যে বিশ্বব্রহ্মের আন্বেষণ করেছেন
রিচার্ড অ্যাডমিরাল কলিংউড।

বয়েসে তিনিও প্রৌঢ় এবং বোধকরি
এতগুলি কারণেই তিনি চিংইয়াংয়ের পবন
হলু।

হাটকা-হকুদ বাংলার সামনে চণ্ডা ঢাকা
কারাদায় প্রায় সম্মুখেই বসে থাকতে দেখা
যেত এই দুই প্রৌঢ়কে। একজনের চক্ষু
হাস্য, ককেশীয় মধুকরবা। অপহৃদনের
চক্ষু তির্যক, পাঁচু আনন। মুখোমুখি

দুটি মুখ নিম্নচাপ হয়ে বসে থাকতেন
দুজনে। মুখের মন পাতা ছোট টেবিলে
রাখা দাঁড়িয়ে মিশরীয় দাঁতের ঘুঁটে নিয়ে
চাল দিতেন। মুখের মাঝে পাশের
অপেক্ষাকৃত বড় টোকা মুখে তুলে নিতেন
ঠুনঠুনে পাতলা বাহা। মুখের গেলাস;
রক্তাভ মদিরা টলমল করত মুখের; আসব
পান করতে করতে সম্ভ্রান্ত করতেন
দুই প্রৌঢ়, কখনো রাজনীতি নিয়ে ল্যানো
করতেন, কখনো ব্যবসা।

ব্যবসার সামনে সারি সারি মুখের
এক পায়ে খাড়া থাকত ইউক্যাম্বিয়ার আর
পাইন। নিব্বুদ, নিম্নত্ব হয়ে আসত
চতুর্ভুজ। গোষ্ঠার লোহিতাভা মিলিয়ে
হেঁত অকাশ থেকে—সন্ধ্যার অপহৃদ অব-
গুণে অধিকমিক করে উঠত রাতির নক্ষত্র।

কখনো-কখনো প্রৌঢ়দের আসরে এসে
বসত মাধবীলতা। চিংইয়াংয়ের বন্ধু মাধবী-
লতা। নামের মতই মিষ্টি তার দেহতনু।
নামের মতই সৌরভময়। নামের মতই স্নিগ্ধ
তার কালো চোখ, নামের মতই দীর্ঘ পল্লব-
ছায়া শান্ত।

দুধে-আলতায় গোলা গাঢ়বর্ণ মাধবী
লতার। আর মুখ তে, নয় যেন একটা
শিশিরময়ত স্পন্দন। টানাটানা দুটি
চোখে কাজলের প্রলেপ দিয়ে মাসারিনীর মত
মুখশ্রী নিয়ে যখন পাশে এসে বসত মাধবী-
লতা, তখন মনে হত যেন বাংলাদেশের
সুদূর পল্লীগামের কোন এক লক্ষ্মীমতী-
বধূ। এলোথোপায় থাকত অমরথানা থোমট
চার ললাটে এলাচের দানির মত। এতটুকু
একটা কালো টিপ। রাভা অমরথাস্তের ফাঁকে
কুন্দদন্তে সলজ হাসত মাধবীলতা। তারপর
এক সময়ে উঠ যেত ঘরসংসারের কাজে।

সুখ আর শান্তি যেন মৃত হয়ে উঠেছিল
সুন্দর এই বাংলার সুন্দরতর ঘরগুলিতে।
অন্তত সবাই তাই জনত। জনত, চিংইয়াং
পট্টনার প্রপ, মাধবীলতাও তার চীনা
পতিকে দেবতার মতই পূজা করে। সম্মান-
হীনতার সব বেদনা সে বিস্মৃত হয় স্বামীর
মুখপানে চেয়ে।

কিন্তু ভুল ভুল সব ভুল।

সেই কারণেই বাকি ঘটনা সেই চরম
অমর্তন।

সেদিন সন্ধ্যায় হেগ হাইস্ক্রিও নতুন
বোতল খুলেছেন চিংইয়াং। ডিকাস্টার থেকে
সোভা ছিটিয়ে নিয়ে রঙীন কাচের সুবাপাত
তুলে ধরেছেন টেবিলের কাছে। পর-পর দু-দান
খেলো কিন্তু খেয়েছেন লড কলিংউডের
কাছে। সেজন্যে শ্রাম নেই মনে।

কলিংউড বললেন—“চিং, কাগজে পড়-
লাম হুমি নাকি জেড পাথরের তৈরী লেহান
মার্টিটা খেতে দিয়েছে—সুন্দর নগরীর
হাজাকে?”

“হ্যাঁ।”

“ভাল রাম পেয়েছ বলো।”

“তা পেয়েছি।”

“খাই বলো, জিনিসটা ছিল অপূর্ব।”

কিউরিও হিসেবে অনুমান।

“তা সত্যি। কিন্তু এবার এমন একটি
জিনিস হাতে এসেছে যা লোহান মার্টির
চেয়েও অপূর্ব।”

“বটে? কি জিনিস?”

“আরেকটা মার্টি।”

“মার্টি, মার্টি আর মার্টি। মার্টির
ওপর তোমরা যে কেন এত বোকা বুলি না।
সেবার তে মিৎ আমলের একটা ঘোড়সওয়ার
মার্টি কিনে বেশ কয়েক হাজার টাকা আটকে
ফেললে। তারও আগে মার্টি আমলের
একটা পাতল কিনেছিলে একজন ম্যাগাসের
কাছ থেকে। তার জন্যে তে মাকে কমা খোশ-
রত দিতে হয়নি। তাতেও তে মার আকুল
হল না। বাকি, এবার কি কিনলে মার্টি?”

“এবার যা কিনেছি তা মার্টি আর মিৎ
পরিণেডের আগের ব্যাপার। জানো তো
যিশুখ্রীষ্ট জন্মগ্রহণ করার দুশ বছর আগে
থেকে হান বংশ শাসন করছিল চীনদেশ?”

“জানি মানে এই জানলাম।”

“এই হান সম্রাটদেরই একটা অতুলনীয়
শিল্পকীর্তি। আর্থিক মূল্যে তো ছেড়েই
দিলাম, ঐতিহাসিক মূল্যও তার বড় কম
নয়।”

“কসের মার্টি?”

“চলোই না দেখাবো।”

চৈয়র ছেড়ে দাঁড়ালেন দুই প্রৌঢ়।
বরন্দার রক্তাক্ত জাপানী ফান্সি বজ্জীর
রাশ্মিরেখা চিকর পড়ল চিংইয়াংয়ের ড্রাগন-
আঁকা জড়িদার ক্রিমোনার ওপর থেকে।

সামনের বড় হলঘরে প্রবেশ করলেন চিং-
ইয়াং। দেওয়ালে দেওয়ালে আলোয় নিশ-
বিলিতি তৈল চরা। কোলোটিরই বয়স নিশ-
বর্ণ করা অনর্ভজের পক্ষে সম্ভব নয়। ঘরের
চার কোণে চর্মবর্মপরা চারজন সামুরাইয়ের
প্রমাণ আকারের চারটি কাম্বুমার্টি।

এ ঘরে দাঁড়ালেন না চিংইয়াং। এমন
সেবর পেরিয়ে এলেন নিজের শয়নকক্ষ।

নিরাভরণ কক্ষ। ধবধবে সাদা চাদের
বিহানো সঙ্গল ঘটি।

একক মানুষের পালঙ্ক। মাধবীলতার
শয়নকক্ষ পাশেই। চিংইয়াংয়ের শোবার ঘরে
ইতিপূর্বে কখনো আসেননি লড কলিংউড।
তাই সিংগল খাত থেকে ঝুং ঝুং
করলেন। মুখে কিছু বললেন না। খানের
মাথার কাছে দেওয়ালে গাথা একটা লোহার
শিল্পক। বেশ মজবুত সিন্দুক।
ক্রিমোনার পকেট থেকে এক গেছা ঢাবি বার
করলেন চিংইয়াং। ভারী কপাটটা খুলে
লোহপ্রাকান্ত থেকে টেনে তুললেন শেহ-
শুত্র চীনায়াটিনিমিত্ত একটা টে।

নির্ভাজ শয্যার ওপর টেটা রাখলেন চিং-
ইয়াং।

আর স্তম্ভিত্ত বিস্ময়ে পলকহীন চোখে
ঢাকিয়ে রইলেন রিচার্ড অ্যাডমিরাল লড
কলিংউড।

পৃথিবীর বহু দেশ পবর্টন করেছেন
লড কলিংউড, দেখেছেন বিস্তর বিস্তর
পামগ্রী। কিন্তু এরকমটি কোনদিন
দেখেননি।

সন্ধ্যার সাদা ফেনার

চীনাগাটির চৌকোনা আধারে তিনপায়ে ঝাঁড়িয়ে রয়েছে একটা দানোমূর্তি।

কাঠের দানো। সে কাঠ যে কত প্রাচীন, তা খসখসে অমসৃণ গা দেখেও অনুমান করা দুঃসাধ্য।

চীন জাপান বর্মার কিস্তৃতিকারকার হাত্যাদানো এর আগেও দেখেছেন লর্ড কলিংউড। কিন্তু এ যে একেবারে স্মৃতিছাড়া কল্পনা।

দানোর তিনটি পা। পায়ের গড়ন সিংহের মত। আতীক্ষনখরমুত্ ডয়ংকর ধাঝা।

দেহ আর হাত দুটি মানুষের মতই। পেশীবহুল নিরাবরণ গাট।

কিন্তু মাথা। সবচাইতে ভয়াবহ দানোর মাথাটা। বিকটদশন করালবদন।

বিশ্বের পুঞ্জীভূত বিভীষিকা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে কেশরযুক্ত সেই মুখাবলয়ে। গম্ভীরভালের বা কিছু অশরীরী কল্পনা, অশুভ ধারণা—সমস্তই রক্ত-জল-করা নৈপুণ্যে ছুটিয়ে তোলা হয়েছে সেই মুখে। চিত্তবনের যত কিছু অমঙ্গল, অকল্যাণ, পাগ আর অন্যায় জমা হয়েছে হৃৎপিণ্ড-স্তম্ভ-করা সেই কুণ্ডলিত কদাকার মুখে।

শিউরে উঠলেন লর্ড কলিংউড। কিন্তু পরমুহুর্তেই বিস্মিত হলেন মূর্তোগুলো দেখে।

সারি সারি মূর্তোগুলো সাজানো 'ডল বিকট বদনের কণ্ঠ ঘিরে। খাঁটি মূর্তি। অকৃত্রিম মূর্তি। চোখ ঠিকরে যায় তার চাপা নির্মল দুর্গতি দেখে। গোলাপ-বর্ণ আশ্চর্যসুন্দর সেই মূর্তোর মালার দিকে তাকিয়ে বিহ্বল কণ্ঠে বললেন লর্ড কলিংউড—“এক! এ কোন দেশের মূর্তি?”

“সুন্দুনাগরের। এরকম সাদা মূর্তি সুন্দুনাগর ছেঁচে ফেললেও অবশ্য এখন আর পাওয়া যাবে না।” বললেন চিংইয়াং। দুর্গতিময় কঠোরের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্যাহিতের মত যেন আপন মনেই বলতে লাগলেন—“শুজির বুকেও এমন রক্ত জন্মায়। কাগুয়ান সুন্দু আর মিনডোয়া সাগরে মেলে এই জিনিস—আর কোথাও নয়। দেখলেই মনে হয় যেন অনেকগুলো স.হ. একসঙ্গে উঠছে, তাই না?”

“অপূর্ব! অপূর্ব!” মুখকণ্ঠে বললেন লর্ড কলিংউড। দাম কত?”

“অধিক রাজস্ব দিলেও পাওয়া যায় না এ জিনিস। সুতরাং দামের কথা তুলো না। ধারসিদ্ধে আইল্যান্ডের মূর্তি এ মূর্তোর ক'ছ আনলে কাচ বলে মনে হবে। হস্তাধারিক হল মূর্তি আর মূর্তি আমার হাতে এসেছে। মতই দিন থাকে, ততই মূর্তি-মূর্তোর প্রেমে পড়ে যাচ্ছি আমি। হাতছাড়া করার কোন ইচ্ছেই নেই।”

“শুনছি অনেক রত্নের এমনি আকর্ষণী শক্তি থাকে। সঙ্গে গেলে মঙ্গলই হবে।”

“অমঙ্গলও হতে পারে।”

“তা হলেও হতে পারে। কিন্তু একথা তুমি বললে কেন?”

“তবে শোনো। এই দানোমূর্তির পেছনে একটা কিংবদন্তী আছে। শোনা যায়, এই

দানোমূর্তির অভিশাপে হানপ্রাসাদ ধুলোর ঢুটিয়েছে। তারপর কত শত বছর গেছে। কারও ভোগে লাগেনি এই মূর্তোর মালা। অলৌকিকভাবে প্রাণ হারিয়েছে সকলেই। মূর্তোর পরেও তাদের প্রেতাত্মারা মালা কাটাতে পারেনি—এমনই প্রচণ্ড অশুভ শক্তি এই মূর্তির। তাই মূর্তোর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে অশরীরীরা দেখা দিয়েছে তাদেরই যরা মূর্তি আর মূর্তির মালিক হয়েছে।”

প্রাচ্যের কুসংস্কার বলে ভৌতিক কাহিনীটাকে হেসে উড়িয়ে দিতে পারলেন না লর্ড কলিংউড। বিশেষ করে ঠিক সেই মুহুর্তে, সেই আধো-আলো আধো-আধারে কদাকার দানোর উপস্থিতিতে ঘরের পরিবেশটাই কেমন জানি ছমছমে হয়ে উঠেছিল।

তাই গলার স্বর খাদে নামিয়ে জিজ্ঞাস করছিলেন ফিসফিস করে—“তুমিই তো এখন এদের মালিক?”

অনুচ্চারিত প্রশ্নটা বুঝে নিলেন চিংইয়াং। গম্ভীর হয়ে উঠল ভীষক চক্ষু।

ধেমে ধেমে বললেন—“দেখছি তাদের।”

যেন একটা ধাক্কা খেলেন লর্ড কলিংউড।

বললেন—“কী দেখেছো?”

“গত সাত দিন ধরে প্রতি রাতে ছায়ার মত কি যেন একটা শূন্যপথে ভেসে যায় আমার জানলার সামনে দিয়ে।”

“ছায়ার মত বলছ কেন?”

“স্পষ্ট কিছু দেখিনি। তবে ছায়াটা একেবারে ছায়া নয়। তাতে আগুনের আভা আছে। কিন্তু জানলার কাছে ছুটে গিয়ে আর কিছু দেখতে পাইনি।”

কাণ্ড হাসি হেসে লর্ড কলিংউড বললেন—“তোমার চোখের ভুল হতে পারে?”

“তা হতে পারে। সেইজন্যই তো তোমাকে ছাড়া আর কাউকে একথা বলিনি এমনকি মাথবীকেও নয়।”

“ভূতপ্রভূতের কথা বাদ দিলাম। এমন দামী জিনিসটাকে এখানে রাখাও তো বিপজ্জনক।”

“রাতে সিন্দুক বন্ধ করে রাখি। চাবি থাকে বা লশের নীচে। গুলীভরা রিভলবার থাকে চাবির পাশে। জানোই তো আমার ঘুম শুবই পাতলা। সকালে অফিস যাবার সময়ে কাসকেটসমত মূর্তি নিয়ে যাই অফিসে যদি না বিক্রি করছি, তাহলে কাছ-ছাড়া করতে মন চায় না।”

“তা ভালো”, বলে পেছন ফিরলেন লর্ড কলিংউড।

ফিরেই চমকে উঠলেন। মনে হল ছায়ার মতই সাঁৎ করে কি যেন একটা সরে গেল দরজার সামনে দিয়ে। সেই সঙ্গে শুনলেন ছুঁড়ির রিন্‌টিন্‌টিন্‌ শব্দ।

* * *
পরের দিন সকালে দার্জিলিং পুলিশ-স্টেশনে প্রবেশ করল একজন দীর্ঘদেহী যুবক।

যুবকের পরনে কটসুউলের ঘি-রঙ পাঞ্জাবি, চুনেটকরা শান্তপুরী ধতির কোঁচাটি সমত্রে। রিক্ত পাঞ্জাবির পাশ-পাকটে এবং কাঁধের ওপর আলতোগোছে ঝুলছে দামী কাশ্মীরি মালা।

যুবক কন্দপের মতই কান্দিমান। রোমান নোভারোর শ্টাইলে ছাড়া সরু গোর্ফ, তীক্ষ্ণাঙ্গ নাসিকা এবং টানা ভুরু। ভুরুর নীচে স্পিন্থ দুই চোখে কবিসুলভ ভঙ্গুরতা।

চেহারায় কবি-কবি হলেও পেশায় মানুষটি গোয়েন্দা। আসমুদ্রাহিমাচলে যার নাম এখন সরকারী দপ্তরে আর অপরাধ-মহলে মুখে মুখে ফেরে, এ সেই ধুরন্ধর প্রাইভেট ডিটেকটিভ ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

ইন্দ্রনাথ দার্জিলিং এসেছিল সরকারী কাজে। টাইগার হিল মাইক্রোয়েন্ড স্টেশন তত্ত্বাবধীতদের লক্ষ্যস্থল হয়ে উঠেছে খবর পেয়েই ছুটে এসেছে ইন্দ্রনাথ। চরক্রেত এখানো নাগাল পায়নি, তবে পেতেও দেয়ী নেই।

ঠিক এমনি সময়ে সকালবেলা খবর গেল পুলিশস্টেশন থেকে।

না, মাইক্রোয়েন্ড-স্টেশন সংক্রান্ত ব্যাপার নয়। দার্জিলিংএর লক্ষপতি চীনা জুয়েলার এবং কিউরিও ব্যবসায়ী চিংইয়াং নিহত হয়েছেন গতকাল রাতে তার শরনকক্ষে।

খানার দারোগা তাই ডাবলেন, ইন্দ্রনাথ রুদ্র যখন শহরেই উপস্থিত, তখন তার পরামর্শ নিলে কতি কি।

তাই, ডিম-কাফি গিলেই ছুটে এসেছে ইন্দ্রনাথ।

এসেই শূন্য সমস্ত ঘটনা। চিংইয়াংয়ের বিশেষ বন্ধু লর্ড কলিংউড গতকাল রাত সাড়ে আটটায় এসেছিলেন তার গৃহে। দুজনে দাবা খেলেছেন, হুইস্কি পান করেছেন। তারপর দশটা নাগাদ বিদায় নিয়েছেন কলিংউড।

এ খবর জানা গেল চিংইয়াংয়ের খাস ভৃত্য জংবাহাদুরের কাছ থেকে।

আজ সকালে মনিবের লাশ সবার আগে জংবাহাদুরেরই চোখে পড়ে। আটটার সময়ে প্রতিদিনই ঘণ্টা বাজিয়ে প্রাতরাশ আনতে হুকুম দেন চিংইয়াং।

কোনো দিন তার ব্যতিক্রম হয়নি।

তাই আজ সকালে নিয়ম ভগ্ন হতেই সচকিত হয়েছে জংবাহাদুর ছেটী। সাড়ে আটটার সময়ে নিজেই দরজায় ধাক্কা দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেছে পাড়া দুটো।

অবশেষে পাওয়া গেছে চিংইয়াংয়ের প্রাণ-হীন দেহ।

শয্যাতেই পড়েছিল তার লাশ। দুই চোখ যেন কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে—যেন নিঃসীম আতংকে চিরতরে স্তম্ভ হয়ে গেছে প্রৌঢ়ের হৃদযন্ত্রের ধুকধুকানি।

কিন্তু তাতে নয়। শব্দ ভয় পেয়ে মারা যাননি চিংইয়াং। তার কণ্ঠ ঘিরে পাওয়া গেছে দশ আঙুলের চিহ্ন। নিম্নম নিম্নপর্বে নিষ্কান্ত হয়েছে চিংইয়াংয়ের প্রাণবায়ু।

বাংলার সদর দরজা বন্ধ ছিল ভেতর থেকেই। লর্ড কলিংউড কাল রাতে বিদায় নিলে নিজের হাতে দরজা বন্ধ করেছে জংবাহাদুর। আজ সকালেও তা বন্ধ ছিল।

অথচ, খুন হয়ে গেছেন চিংইয়াং।

হত্যাকারী এসেছিল জানলা পথে। চিং-ইয়াংয়ের শরনকে মাথার কাছে একটি মাথ জ্ঞানলায় গরাদ ছিল না; কিন্তু মাথের উপর উত্থাপিত হয়ে তারের জাল দিয়ে জানলা থেকে দিয়েছিলেন চিংইয়াং।

তারের সেই জাল কাড়ুর দিয়ে সবচেয়ে কোটে ফেলেছে নিশাচর হত্যাকারী।

এই পর্বন্ত মনে ইন্দ্রনাথ প্রশ্ন করল—
“আপনি বললেন, জংবাহাদুর হেট্রী শোবার ঘরের দরজার ঠেলা দিতেই দরজা খুলে গিয়েছিল।”

“হ্যাঁ।”

“তার মানে এই দাঁড়ায় যে, শোবার ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করেই শূন্যে চিংইয়াং। তাই না?”

“তা তো বটেই।”

“কিন্তু আজ সকালে দেখা গেছে দরজা খোলা ছিল। খোলা থাকার দুটো কারণ থাকতে পারে। প্রথমত, চিংইয়াং নিজেরই বন্ধ করতে ভুলে গেছিলেন। দ্বিতীয়ত, হত্যাকারী জানলা দিয়ে ঢুকেছে, কিন্তু দরজা খুলে বেরিয়েছে।”

বিজ্ঞের মত হেসে দারোগামশাই বললেন—
“আরে মশাই, সম্ভাবনাটা আমিও ভেবেছি। শোবার ঘরের দরজা খুলে হত্যাকারী যদি বেরিয়ে থাকে, তাহলে সে নিশ্চয় সদর দরজা দিয়েই চম্পট দিয়েছে। তা না হলে দরজা খুলে সে বাড়ীর মধ্যে আসতে বাবে কেন? কিন্তু, হেঁ হেঁ, বুঝলেন কিনা ইন্দ্রনাথবাবু, সদর দরজা তো ভেতর থেকে বন্ধ ছিল বলছে জংবাহাদুর। অর্থাৎ বুঝলেন কিনা, জংবাহাদুরের নিশ্চয় এর মধ্যে হাত আছে।”

“ঠিক করেছেন, আপনি অতিজ্ঞ ব্যক্তি।”

“হেঁ হেঁ, এই করেই মাথার চুল পাকালো কিনা। জংবাহাদুরকে ফটকে পড়তে বলে দিয়েছি। কিংগার্লিগট-এক্সপার্টও অকুশলীর ফটো-টটো তুলছে। কিন্তু, বুঝলেন কিনা, আরেকটা জ্যাচার ঘেঁষে বসে আছে।”

“কি বক্স?”

“চিংইয়াংয়ের মূখের ভেতর থেকে দলা পাকানো একটা রুমাল পাওয়া গেছে। চোঁচানি বন্ধ করার জন্যেই নিশ্চয় হত্যাকারীই তৈরি দিয়েছিল। এই সেই রুমাল।”

দলপাকানো সাদা রুমালটি টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিল ইন্দ্রনাথ। কেম্ব্রিকের সাদা রুমাল। এক কোণে লতা-পাতার এমব্রয়ডারী। ফাঁকে ফাঁকে লেখা একটি মাত্র অক্ষর—“সি”।

সিঁথে হয়ে বসেছিল ইন্দ্রনাথ। চোখ তুলতেই আকর্ণ হেসে দারোগা মশাই বললেন—বুঝলেন কিনা, কলিংউডেরও নামের আদ্যাক্ষরও “সি”।

“বটে?”

“কলিংউড গত রাতে দশটা পর্বন্ত চিংইয়াংয়ের কাছে ছিলেন।”

“বেশ।”

“চিংইয়াংয়ের বিধবা বউ মাধবীলতার কাছে শুনলাম, কাল রাতেই কলিংউডকে শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে শোবার সিঁদুক

খুলে খুব দামী একটা মৃত্তোর মালা আর কাঠের মূর্তি দেখাছিলেন তিনি।”

“কোথায় সেই মৃত্তোর মালা আর কাঠের মূর্তি?”

“সিঁদুক থেকে উদ্ধৃত হয়েছি।”

“বটে? বটে? বটে?”

“অতএব লর্ড কলিংউডকে নিশ্চয় সন্দেহ করা যায়?”

“জবাবাই।”

“কিন্তু, বুঝলেন কিনা, সন্দেহভাজন আরও দুজন, সিনেপসকে একজন, এসে আছে আমাদের এজিয়ারে।”

“যথা?”

“মাধবীলতা।”

“মাধবীলতা। চিংইয়াংয়ের বিধবা?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ।”

“তার মোটিভ?”

“চিংইয়াং মরলেই মাধবীলতার প্রেম-স্পন্দের পোয়াবায়ো।”

“মাধবীলতার প্রেমাস্পদ। মানে উপ-পতি। সে রকমি আবার কে?”

“কামরূপ থাপা। চিংইয়াংয়ের পার্টনার।”

“বলেন কি মশায়?”

“হেঁ, হেঁ, এই করেই মাথার চুল পাকালো কিনা। সব খবরই বার করে নিয়েছি জংবাহাদুরের পেট থেকে। তামাম দুনিয়া জানে অনাথ মাধবীলতাকে কিভাবে উদ্ধার করেছেন প্রোট চিংইয়াং। বিদেশী বাজারে ক্রীতদাসীরূপে বিক্রিয়ে যেত মাধবীলতা যদি না চিংইয়াং তার অটেল টাকা হাফির তাকে তুলে আনতেন শরতান-দের সম্পদ থেকে। মাধবীলতা সেজনে আমত্ব কৃতজ্ঞ থাকবে চিংইয়াংয়ের কাছে। কেননা, চিংইয়াং শূন্য একজন নারীর চরম অবমাননাই রোধ করেন নি, তাকে স্ত্রীর সম্মান দিয়েছেন। দীর্ঘকাল এদেশে বস-বাসের দরুণ চিংইয়াং বাংলা দেশকে ভাল-বেসেছিলেন, বাংলা ভাষা শিখেছিলেন। তাই প্রোটবরেন্সে তরুণী ভারী নিয়েও সম্পত্তা জীবন মধ্য হয়ে উঠেছিল তাদের। অন্তত সবাই তাই জানত।”

“উল্টোটি কে জেনেছিল?”

“জংবাহাদুর। তার চোখে খুলো দেওয়া বড় শব্দ। সে জানে মাধবীলতা চিংইয়াংকে প্রাণা করে, কিন্তু ভালবাসে না। নারীপ্রকৃতি বড়ই গোলমালে ব্যাপার, বুঝলেন কিনা, এইজন্যেই ভয়ের চোটে মশাই খিরেই করলাম না।”

“বেশ করেছেন। আমিও করি নি। কিন্তু তারপর?”

“প্রেমের স্রপাত কখন, তা অবশ্য জানে না জংবাহাদুর। কিন্তু কামরূপ থাপার সঙ্গে মাধবীলতার চোখে চোখে কথাবার্তা অনেক দিনই লক্ষ্য করেছে জংবাহাদুর। লক্ষ্যের অধিকারে ইউক্যালিপটাসের আড়ালে দুজনের অভিসারও দেখেছে এবং জেনেছে বড়রকমের একটা কেলেকারীর আর দেয়ী নেই। কিন্তু চিংইয়াংকে যে একনো প্রাণ দিতে হবে, তা সে স্বপ্নেও ভাবে নি।”

“অর্থাৎ জংবাহাদুরের মতে হত্যাকারী কামরূপ থাপা, তাকে সাহায্য করেছে মাধবীলতা।”

“আজ্ঞে হ্যাঁ। মোটিভটা কিন্তু বেজায় জবর। কামরূপ থাপা এখন যদি মাধবীলতাকে বিয়ে করেন, তাহলেই চিংইয়াংয়ের বিপুল সম্পত্তি আর কামরূপের একছত্র মালিক হয়ে বসেন তিনি।”

“তা তো বটেই।”

“কিন্তু মাস্টিকল হচ্ছে লর্ড কলিংউডকে নিয়ে। তাই তাকে তেঁকে পাঠিয়েছি। এ বোধহয় উনি এলেন।”

দোরগোড়ায় ভারী জুতোর শব্দ হল। পরমহুঁত্রে কনস্টেবলের পিছ, পিছ, হাঁড় ঘোরাতে ঘোরাতে প্রবেশ করলেন লর্ড কলিংউড। দুই চোখে তার নিবিড় বিষম।

“গুড মর্নিং। এত সকালে তলব কেন?”

“গুড মর্নিং। বসুন আপনি। একটা অভ্যস্ত খারাপ সংবাদ শোনাতে চাই আপনাকে। মিস চিংইয়াং আপনার বন্ধু?”

প্রশ্ন করলেন দারোগাবাবু।

“শুধু বন্ধু নয়, বিশেষ বন্ধু। কাল রাতেই তো দশটা পর্বন্ত আচ্ছা মশাই তার সঙ্গে,” বসতে বসতে বললেন লর্ড কলিংউড।

“কাল রাতেই খুন হয়ে গেছেন মিস চিংইয়াং,” বন্দকের গুলির মত কথাটা ত্যাগ করে ছুঁড়ে দিয়ে পলকহীন চোখে কলিংউডের মূখের ডাব লক্ষ্য করতে লাগলেন দারোগাবাবু।

নারদ চমকে উঠলেন কলিংউড। হাঁড়ের মোবের শিংয়ের হাতলটা এতজোরে চেপে ধরলেন যে আঙুলের গাটগুলো পর্বন্ত সাদা হয়ে গেল।

কিন্তু শব্দঘাতের মানুষ তিনি। সেকেন্ড কয়েকের মধ্যে সামলে নিলেন নিজেকে। বললেন—“খামোকা খুন হতে গেল কেন?”

“খামোকা নয়। খুনী সিঁদুক খুলে একটা মৃত্তোর মালা আর একটা কাঠের মূর্তি নিয়ে গেছে।”

“সুন্দর সাগরের মৃত্তো, আর হান্সিংগের দারুমূর্তি।” উষ্ম কণ্ঠে রুম্মস্বরাস বললেন কলিংউড। “চুরি গেছে? তাহলে কিংবদন্তী মিথ্যা নয়। অভিশাপ চিংইয়াংকেও স্পর্শ করেছে।”

এই প্রথম প্রশ্ন করল ইন্দ্রনাথ।

বলল—“তাপনি দেখেছেন জি-নস-গুলো?”

“শুধু দেখিনি, অভিশাপ্ত মূর্তি আর মৃত্তোর বৃত্তান্তও শুনিয়েছি।”

“কি শুনিয়েছেন?”

সমস্ত বললেন কলিংউড। জানলার সামনে গিয়ে শুনো বিলীয়মান আগুনের আভ্যময় ভৌতিক ছায়ার কথাও বললেন।

শুনো গম্ভীর হয়ে উঠল ইন্দ্রনাথ।

সেকেন্ড কয়েক গুম্ব হয়ে বসে থেকে রুম্মগটা এগিয়ে দিলে লর্ড কলিংউডের সামনে।

বলল—“চিন্তিতে পারেন?”

“আরে, এ যে আমার রুম্মাল। কোথায় পেলে?”

“মিস চিংইয়াংয়ের মৃত্তোর মৃত্তো।”

এবার সত্যি সত্যি তাকে উঠলেন লর্ড কলিংউড।

ইন্দুনাথ শান্তকণ্ঠে বললেন—“পরি-
শ্রিতির জটিলতা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করছেন।
সুতরাং লুকোচুরি না করে স্পষ্টই বলা
মাক। আপনি যে ভৌতিক ছায়ার কথা
বললেন, তা একমাত্র আপনি শুনছেন—
যদি কাছ শুনছেন তিনি এখন
মৃত। সুতরাং আপনার রিপোর্ট
সত্যি কি মিথ্যা তা বলা এখন
সম্ভব নয়। কিন্তু নিহত ব্যক্তির মুখে
আপনার রুমাল পাওয়া গেছে। সেটা মিথ্যা
নয়, সত্যি। কাজেই দারোগাবাবুর ইচ্ছে,
আপনি যদি ঘন্টাখানেক থানায় অপেক্ষা
করেন, সেই তবসেরে তিনি গিয়ে আপনার
বাড়ীতে একটু সন্ধ্যা করে আসতে পারেন।

মুখ লাল হয়ে উঠল লর্ড কলিংউডের।
কিন্তু প্রতিবাদ করার সাহস হল না। শুধু
মুখে বললেন—বেশ, আমি যে নিশ্চয়ই
সেটা প্রমাণিত হয়ে থাক। এই নিন আমার
চাবি।”

বলে, একগোছা চাবি টেবিলের উপর
রাখলেন লর্ড কলিংউড।

কীশে উঠে দারোগাবাবু বললেন—“ইন্দু
নাথবাবু, বেশী কিছু নেওয়া হচ্ছে না?
বুটিশ এম্বাসী এই নিয়ে আমার চাকরী
নাড়ুরে নিতে পারে।”

“সমস্ত দায়িত্ব আমার। সেরকম পরি-
শ্রিতি এলে জানবেন ইন্দুনাথ রুদ্র সেরে
পড়িবে না। শিল্পীর মহলে তুমি তো একে-
বারেই অজানা নই।”

“হে হে” কবে বললেন। তা আর জানি
না। কিন্তু বাই বলুন রহস্য খুব জমেছে।
খুনী বলে সন্দেহ করা বাজছে এখন কামরূপ
খাপকে, জং বাহাদুরকে আর লর্ড কলিং-
উডকে। আমার মাথায় কিন্তু একটা খিওরী
এসেছে।”

“কি রকম।”

“এমনও তো হতে পারে, লর্ড কলিং-
উডকে দরজা খুলে বের করে দিয়েছে জং
বাহাদুর?”

“দুটো কারণে সেটা সম্ভব নয়। প্রথমত,
লর্ড ফ্যামিলিতে কলেংকারী হয় ঠিকই,
কিন্তু খানদানী লড়বংশের মানুষ কখনো
একজন জাশিক্ত ইন্ডিয়ান নথরের সঙ্গে
হাত মেলায় না। এ দিক দিয়ে ভীষণ
ভ্যানিটি প্রচণ্ড। তা ছাড়াও লর্ড কলিংউড
বুদ্ধিমান মানুষ। যে পথে এসেছেন, সেই
পথেই বেরিয়ে যেতে পারতেন। দরজা খুলে
বাইরে এসে জং বাহাদুরকে জড়াতে যাবেন
কেন? তাকে তো আহাম্মক মনে হয় না।”

“তা হলে?”

“চোখকানমন সজাগ রেখে লর্ড কলিং-
উডের বাড়ীতে হানা তো দেওয়া যাক,
সুরাহা একটা হবেই।”

সুরাহা সত্যিই হল। কিন্তু নেছাই
অপ্রত্যাশিতভাবে।

লর্ড কলিংউড বিপত্নীক মানুষ।
নিঃসন্তান। জলাপাহাড়ের একটি সুদৃশ্য

বাংলোবাড়ীতে তিনি একলাই অবসর জীবন
যাপন করেন। সংসারের সমস্ত কাজ-কর্ম
করে একজন নেপালী চাকর। নাম, মহেন্দ্র
বাহাদুর।

গাঢ়িগোটা চেহারা লোকটার। পাহাড়ী-
দের মতই হাত পাশ গমোগমো মাংসপেশী।
ইংরেজী আর হিন্দিতে সমান দখল—দুটোই
মাড়ভাষার মত বলতে পারে অমূল্য।
ভূমিষ্ঠ হয়েছিল হিন্দু সন্তানরূপে, কিন্তু
মিশনারীদের পাল্লার পড়ে এখন সে খ্রিস্টান।

মহেন্দ্রই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখাল।
মনিবের চাবির গোছা দেখে কোন ভয়পাতি
করল না।

কিন্তু মৃত্যুর মালা বা দারুমুর্তির
কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। লোহার
আলমারী, দেওয়াল-সিন্দুক, কাঠের বাস-
সমস্তই খুলে দেখা হল। কিন্তু বুঝি।

মহেন্দ্রের কাজে কোন ফাঁকি নেই। ঘর-
দোর এত সকালেও কককক তকতক করছে।
প্রতিটি জিনিস স্বাধাধানে সাজানো।

মহেন্দ্র বাহাদুরের ঘরেও এক পাক ঘরে
এল ইন্দুনাথ দেখল, লোকটার পড়াশুনার
ব্যতিক্রম আছে। অবশ্য অধিকাংশই হালকা
উপন্যাস। ‘বই হিন্দি বই। একটা বই পড়তে
পড়তে শেজমাক’ দিয়ে বাখা হয়েছিল বালি-
শের কাছে। ইন্দুনাথ বইটা তুলে নিয়ে
কিছুক্ষণ উল্টোপাল্টো দেখে নামিয়ে রাখল।

সবশেষে জুতোর আলমারি খুলল
মহেন্দ্র।

সরিষারি হক ডিজাইনের জুতো
সাজানো প্রতিটি তাকে। প্রতি জোড়া জুতো
পালিশ করা খুলোর চিহ্নটি নেই কোথাও।

তবু উল্টোপাল্টো প্রতিটি জুতো দেখতে
লাগল ইন্দুনাথ।

কাদার নাগটা দেখা গেল তখন।

খানিকটা লাগজ মাটি লেগে একজোড়া
খুটের সামনের দিকে।

দেখেই চমকে উঠলেন দারোগাবাবু।

বললেন—“আপনাকে বলতেই ভুলে
গেছি। মিঃ চিংইয়াংয়ের বাগানে ফুল-
ঝোপের নরম মাটিতে এলোমেলো করেচুটা
জুতোর ছাপ দেখা গেছে। এ জুতো সে
ছাপের সঙ্গে মিলিয়ে ত সময় লাগবে। কিন্তু
এখনি কলতে পারি, লাল মাটির এই ডেলা
আমি চিনি।”

“চেনেন?”

“আলবৎ। বাগানের ফুলের ঝোপেই
আজ সকালে দেখেছি।”

“তাহলে তো হয়েই গেল।”

“কি হয়ে গেল?”

“এখানকার তদন্ত। মহেন্দ্র, এবার তো
বোড়ির পড়তে হবে আমাদের। ভাগ্যিস
তুমি ছিলে, তাইতো এত সহজে খুনীর
হাঁদল জানা গেল। বাওয়ার আগে এক
পেরালা চা খাওয়াবে না? তোমাদের দাজি-
লিংয়ের হ্যাপীভ্যালি তবের পিছো? ভদ্রানক
চা-ডেক্টা পেয়েছে।”

“নিশ্চয়, নিশ্চয়” বলে কুড়াখমুখে
অন্যভাবেই হল মহেন্দ্র বাহাদুর। এবং ভদ্রানক
ফস করে পকেট থেকে একটা ম্যাগনিকাইং

‘ক্লাস বার করে কালাগা জুতোর ও’
নামিয়ে আনল ইন্দুনাথ।

চোখ তুলল সেকেন্ড কয়েক পরেই।

সে চোখের বিচিত্র দৃষ্টি দেখে বিস্মিত
হলেন দারোগাবাবু।

কারুকারকরা কাম্বীরী তখন
কাঠের টে সাজিয়ে টিকোরি ঢাকা চারে
পেরালা আর পট নিয়ে এল মহেন্দ্র।
সোফাসেটে জাকিরে বসেছিল ইন্দুনাথ
আর দারোগাবাবু।

‘কাঁচি’ ধরিয়ে খুলবলয় রচনা করছি
ইন্দুনাথ। সোফার পেছনে মাথা ছেড়ে দিয়ে
নিব্বিট চোখে নিরীক্ষণ করছিল কড়িকাঠ।
দই চোখে শিল্পীর ভঙ্গিমত্তা।

মিকোটিনের নিখাস দিয়ে বাস্তব
গোড়া ভিজিয়ে নিয়ে যেন কবিতার ছন্দ
মিল খুঁজছে ইন্দুনাথ রুদ্র।

মহেন্দ্র হাতে ধরিয়ে দিল একটা
পেরালা।

আমেরী চুমুক দিল ইন্দুনাথ। তারপর
যেন সুখার পায়ে মুখ দিয়ে ফেলছে এমনি
মুখভাণ করে বললে—“আঃ, তোফা,
তোফা। মহেন্দ্র তোমার হাতটি বড়ই মিষ্টি।
পাকা কারিগরের হাত।”

বিনীতভাবে হাত কচলাতে লাগল
মহেন্দ্র।

ইন্দুনাথ প্রশ্ন করল—“এমন চা করতে
কোথায় শিখল মহেন্দ্র?”

“যে যে মেমসাহেবের কাছে ছিলাম,
তার কাছে।”

“কলিংউড সাহেবের কাছে কাম্বল
দ্বাং?”

“বছর পাঁচেক। যেদিন থেকে সাহেব
এখানে বাড়ী কিনলেন, সেদিন থেকে।”

“তাহলে তো তুমি খুবই পুরোনো
লোক। সব কাজই নিজের হাতে করতে
হয় বলা?”

“সমস্ত। সাহেব নোংরামি একদম পছন্দ
করেন না। সকালবেলা থেকেই তাই সব
পরিষ্কার করতে হয়। আটটার মধ্যে জুতো
পালিশ থেকে শুরু করে ঘরমোছা পর্যন্ত
শেষ করে ব্রেকফাস্ট দিতে হয়।”

“বুঝেছি। যাকে বলে হাড়ভাঙা খাটনি।
কিন্তু তোমার এমন মনিবও কিনা খনের
দায় পড়লেন।”

“সে কি কথা।”

“ওহো তোমাকে বলতেই ভুলে গেছি।
মিঃ চিংইয়াংকে কাল রাতে কে খুন করে
গেছে। তার মৃত্যুর মধ্যে পাওয়া গেছে
তোমার সাহেবের রুমাল।”

“বলছেন কি?”

“একেই বলে কপাল। তা নাহলে তোমার
সাহেবের মত এমন ভাল মানুসটি এ কাল
কেন করবেন বলা। পুলিশ অবশ্য রাতে
দুজনকে সন্দেহ করছে। দুজনেই নেপালী
একজন কামরূপ খাপা। আরেকজন জং
বাহাদুর ছেই।”

“কেন জংবাহাদুর কেন?”

“এয়ে বললাম, কাটা কপাল না হলে
এমন ভুল আর কেউ করে। খুন করাটাই



মাছধরার পরে ॥

কলকাতা



সত্য-প্রদীপে
বাণী বিনিময় ॥
অবনী চন্দ্র

হল একটা ভুল। তারপর যদি খুন নিষ্পত্ত না হয়, তাহলে সে ভুল বড়ই মারাত্মক। এক্ষেত্রে খুনী দুটো ভুল করেছে।”

“কি রকম?”

“খুনী গভীর রাতে কাড়ুর দিয়ে জানলার তারের জাল কেটে মিঃ চিংইয়াংয়ের শোবার ঘরে ঢুকেছে, গলা টিপে তাকে হত্যা করেছে, বালিশের তলা থেকে চাবি নিয়ে সিদ্দিক খুলে মৃত্যোর মালা তার কণ্ঠের মূর্তি দিয়েছে। তারপর দুটি ভুল করেছে—যে ভুল না করলে খুনীকে কোনদিনই ধরা যেত না।”

ভ্রম্যয় হয়ে খুনীছিল মহেন্দ্র বাহাদুর। ইন্দুনাথ বললে—“খুন করার পর সে যদি জামলা দিয়েই চোরাইমালা নিয়ে বেরিয়ে যেত, তাহলে পুলিশের কন্ডা ছিল না তার নাগাল পায়। কিন্তু সে দরজা খুলে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করেছে। খুন আর চুরি—পর-পর দুটো অপকর্ম করার পর যে লোক চম্পট না দিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢোকার সাহস দেখায়, বরং হতে হবে সে নিরঙ্কুশ নিরাপদ মনে করেই ঢুকেছে। অর্থাৎ তার একজন স্যাণ্ডা বাড়ীর মধ্যেই ছিল—যে তাকে সদর দরজা খুলে বার করে দিয়েছে। জংবাহাদুরই হল সেই স্যাণ্ডা। মহামূল্যবান দু-দুটি বস্তু হাতে পেয়ে আনন্দে আটখানা হয়ে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারেনি হত্যাকারী। রাখলে সে মিঃ চিংইয়াংয়ের শোবার ঘরের দরজা ভেতর থেকেই বন্ধ করে যেখে দিত—ফলে, জংবাহাদুর জড়িয়ে পড়ত না।

‘হত্যাকারী আর একটা মারাত্মক ভুল করল। লর্ড কলিংউডের একটা রুমাল সে সংগ্রহ করছিল তাকে খুনের দায়ে ফাঁসিয়ে দেওয়ার জন্যে। রুমালটা মিঃ চিংইয়াংয়ের মৃত্যু ঠেসে দিয়ে সে মোক্ষম চাল দিলে

ঠিকই। কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে আরও এক কাঠি এগোলো। অর্থাৎ লর্ড কলিংউডের একজোড়া জুতো পায়ে দিয়ে মিঃ চিংইয়াংয়ের বাগানের নরম মাটিতে ইচ্ছে করেই কতকগুলো ছাপ রেখে দিল। তারপর কাদামাথা জুতোজোড়া এনে রাখলে জুতোর আলমারিতে। কিন্তু অতি-উৎসাহের চোটে পরের দিন সকালে ঘাটটার মধ্যে সব কটা জুতোই সাফ করেও এই জুতোজোড়া ইচ্ছে করে কাদামাথা অবস্থাতেই রেখে দিলে পুলিশের দুটি আকর্ষণের জন্যে। আর তাই বেলা দশটার সময়ে এসেও দেখলাম—”

আচম্বিতে বন্য স্বাপদের মতই হুংকার দিয়ে উঠল মহেন্দ্র। দপ করে জুড়ে উঠল দুটি ভ্রু তির্যক চকু। তাঁর জিহ্বাসায় বেকৈ গেল অপরোক্ষ। ফলে উঠল হাতের মাংসপেশী। ফস করে জামার তলা থেকে টেনে বার করল একটা নেপালী কুর্কির এবং পরমহুতই লকলকে ফলাটা মাথায় ওপর তুলে ধরে এল সামনে।

কিন্তু দারোগাবাবু এই মূহূর্তটির জমোই প্রস্তুত হয়ে বসেছিলেন। পলক ফেলার আগেই তাঁর হাতে দেখা গেল নিকব কাছা রিভলবার। উপযুক্ত পারি তিনবার অগ্নিরোহিত বহে গেল নলচের মুখে দিয়ে এবং হাতে-পায়ে গুলিবর্ষ হয়ে আহুড়ে পড়ল দণ্ডান্ত খুনে মহেন্দ্র বাহাদুর।

ধানার ফিরে এসে ইন্দুনাথ বললে—“অতি-হিনেবীরাই। ঠিক ভুল করে। তা নাহলে সব জুতো পরিস্কার করে কাদায় ডেলাটা অমনি করে রেখে দিতে যাবে কেন মহেন্দ্র। ওর ওপর মগ্দের হরোইল আরেকটি কারণ।”

“কি?” পূর্নকিত চিত্তে প্রশ্ন করলেন দারোগাবাবু।

‘মহেন্দ্রের হালকা গম্প উপন্যাস পড়ার খুব নেশা। ওর বালিশের ওপর আজ সকালে যে বইটা আধপড়া অবস্থায় দেখলাম সেটা কি বই জানেন?’

“কি?”

“‘এ্যাজভেন্স’ অফ শার্লক হোমস-এর হিন্দী অনুবাদ।”

সপ্রশংস চোখে দারোগাবাবু বললেন—“বুঝলেন কিনা, আপনি হলেন শোলচকু মানুষ।”

“মোটেই না। জানেন তো, মন যা ভাবে না, চোখ তা দেখে না। বাক, জংবাহাদুর কি বলে?”

“সব স্মীকার করেছে। মহেন্দ্রের সঙ্গে গত সাতদিন ধরেই শলাপরামর্শ চলছিল মৃত্যোর মালা আর কণ্ঠের মূর্তি কিতাবে লোপাট করা যায়। খবরটা জংবাহাদুরই দিয়েছিল। গতকাল রাত্রে লর্ড কলিংউডের শোবার ঘরে ঢেকে নিয়ে গিয়ে মিঃ চিংইয়াং জিনিস দুটো বার করার ব্যবধে বার জংবাহাদুর। ও ভাবে বুদ্ধি বিস্তার করা পাকাপাকি করছেন মিঃ চিংইয়াং। তাই তৎক্ষণাৎ একজন ছোকরার হাতে চিরকুট লিখে পাঠিয়ে দেয় মহেন্দ্রকে। লেখে আর দেয়ী নয়। আজ রাত্রেই কাজ হাসিল করতে হবে। কিন্তু রুমাল আর কাদামাথা জুতো দিয়ে পুলিশকে বিপথ চালনা করার পুরো প্ল্যানটাই নাকি মহেন্দ্র। তবে ফস ফরাস মাথানো গ্যাসভরা বেলুন জানলার সামনে উড়িয়ে প্রতি রাতে মনিবকে জংবাহাদুরই ভরা দেখিয়েছে।”

“মৃত্যু আর মূর্তি পাওয়া গেছে?”

“মহেন্দ্রের কোমরেই গ্যামছা দিয়ে শর করে বাঁধা ছিল দুটোই। দেখলেন?”

“আরে না, না। অভিশপ্ত জিনিস মশাই। অভিশপ্ত ও জিনিস আমি দেখতেও চাই না।”

টেলিফোনটা এল ঠিক তখন।

বিসিভার করে দিলেন দারোগাবাবু। পরক্ষণেই এগিয়ে দিলেন ইন্দুনাথের দিকে—“আপনার।”

তারের মধ্যে দিয়ে ভেসে এল সুমিত্র বামাকন্ঠ—“ইন্দুনাথবাবু, আপনি আমাকে কোনদিন দেখেননি, আমিও আপনাকে দেখিনি। কিন্তু আপনার নাম শুনেছি। খবরটাও এই মাত্র শুনলাম। আপনি আমায় অন্তরের ধন্যবাদ আর সপ্রশংস নমস্কার গ্রহণ করুন।”

“কে আপনি?”

“মাথবীলতা।” কট করে কেটে গোল লাইন।



বারই মে, উনিশ শো সাতষটি। মস্কো থেকে আমরা তালিন-যাত্রী। এক রাত্রি ও প্রায় অর্ধদিনের জার্নি।

পথ দীর্ঘ হলেও স্বাচ্ছন্দ্যের সুব্যবস্থা যেখানে যেখানে ক্রান্তি বা অবসাদের ভাষণকা সেখানে স্বাভাবিকভাবেই হয়। এ ট্রেন-ভ্রমণেও তেমনি সুব্যবস্থায় আমরা আনন্দিত।

এক এক কম্পার্টমেন্টে চারটি করে বেড। আমাদের দেশের ট্রেনের মতোই আপার বার্থ ও লোয়ার বার্থে সাজানো। আমরা চারজন এক কম্পার্টমেন্টে—দুই আপার বার্থে দুই নিম্ন কবি যোগীন্দ্র শাস্ত্রী, মারাঠী ভাষায় 'নবশক্তি'র সম্পাদক শ্রীগ্যাডগিল এবং নীচে আমি ও প্রাচ্য প্রাসাদের অসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীসুধেন্দ্র-মাহন দাস।

আমাদের এক পাশের ঘরে তেলুগু কবি শ্রীশ্রীকে নিয়ে উদ্‌ সাহিত্যিক শ্রীকৃষ্ণেশ্বর সন্দ্বীক। সেখানে এক অপরিচিত সঙ্গীর সঙ্গে তাঁদের নতুন পরিচয়। আমাদের আরেক পাশের কম্পার্টমেন্টেও প্রায় একই-কম অবস্থা। সেখানেও এক অপরিচিত সঙ্গীর সঙ্গে আমাদের দুই গাইড সোভিয়েট রাষ্ট্র প্রত্নিকার দুই সম্পাদকীয় কর্মী—মোভিক ও শাসা এবং নভোভিস্ট প্রেসের খান চিরাশিম্পী অনাতানি জার-ক্লাভভেঙ্কোর দু'ভাগভাগি।

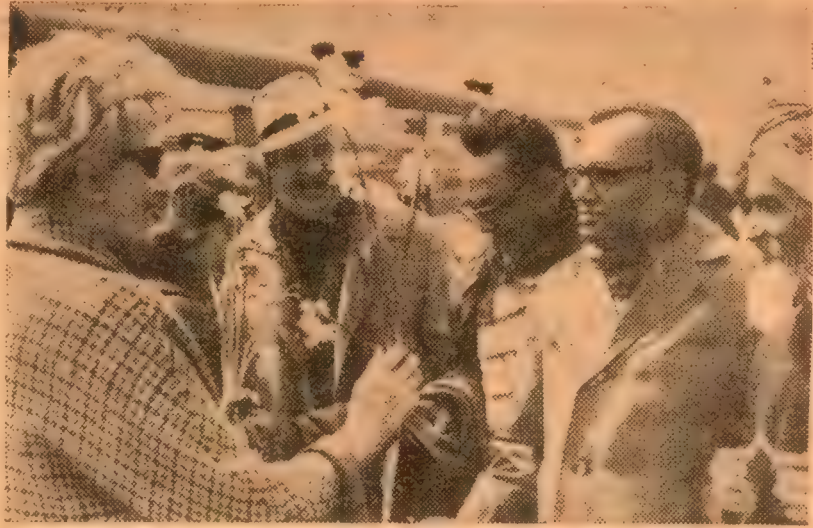
মস্কোর হোটেল ইউক্রেনে সাপার সেরে সেই আমরা ট্রেনে। নৈশহার সম্বন্ধে সবাই এই নিশ্চিন্ত। তাহলেও এক পেয়ালা কবির আকাঙ্ক্ষা যেন সকলেরই। বিশেষ করে আমাদের চাহিদাটা সীতমতো মুখের। সন্দের মানুষ। চা-এর সঙ্গে তাঁর যে কেবলে প্রাপের যোগাযোগ। তাঁর দাবী সঙ্গার সঙ্গে সঙেই আমাদের দরজায় এক হকারিণী। নেহাৎ কাকতালীয় ব্যাপার হলেও এই সুখকর। প্রয়োজন জিজ্ঞাসা ও জনার এক মুহূর্তের মধ্যেই হুকুম তামিল। আমাদের হাতে হাতে এক এক প্লাস ট্যাক-টি আর সামনের ছোট টেবিলে এক লি শিস্কুট।

চা খেতে খেতে বৈঠকী গল্প। বৈঠকী শীর্ষ। এই গতিই তো জীবন। আর সেই বৈঠকীই গল্প আমাদের বৈঠকে। সমাজ-নৃত্য রাশিয়ার কোন বিষয়ে কতটা অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা।

কম কথার মানুষ গ্যাডগিলজী। নিজের মনে তাঁর কথাবার্তা। প্রকৃত বিশেষজ্ঞের মনটি হওয়া উচিত ঠিক তেমনটিই তাঁর নাভাব। সব তো ভ্রমণ আরম্ভ। ভাষা না দেখে-শুনে-বুঝে কোনো বিষয়েই মন্তব্য করতে তিনি নারাজ। তাঁর মন তখনো চূপচাপ।

কমিউনিস্ট লোক-চলাচল ভ্রমণই বিরল। হুকুণের মধ্যেই সম্পূর্ণ স্তব্ধ। সহ-রিণী এসে কখন বাইরে থেকে দরজা টেনে রে উঠাও। ওটাই বোধহয় শব্দে বাবার কত। আমরাও তখনই যে বার সুখ-প্রায়।

আরো খানিকক্ষণ ধরে আমাদের মধ্যে দু-বিনিময়। ওপরে ইংরেজী ও নীচে



তালিন স্টেশনে ভারতীয় লেখকদের সম্বর্ধনা

বাংলা কথার সঙ্কর। অসমীয়া সাহিত্যিক হলেও অধ্যাপক দাস কণ্ঠভাষী। কিন্তু তামিল কবির কাছে মারাঠী যেমন অবোধ্য, মারাঠী সম্পাদকের কাছে তামিলও ঠিক তেমনি। ইংরেজীই তাই তাঁদের আলাপের মাধ্যম। সেই ইংরেজীকে হটবার জন্যে এ-প্রশ্নের ভারতীয়ের কী হিম্মত! আর সেই হটকারিতার কথা চিন্তা করতে করতেই কখন নিদ্রাশয়ন।

ঘুম ভাঙতেই সামনে বেড-টি। সঙ্গীদের চা-পান তগেই শুরু। চা-পান সেরে এক এক করে তাঁর হাতেই ব্রেক-ফাস্টের ডাক। আধঘন্টার মধ্যেই সবাই ফিটফাট। বেশ যোগদূরত্ব হয়ে একসঙ্গে আমরা ব্রেকফাস্ট করে। সে কার অনেক দূরে। অনেকগুলি গাড়ি পেরিয়ে তবে সে কার। সেখানে গিয়ে দেখি সমস্ত কিশোর-চন্দ্র বাকী বন্ধুদের নিয়ে আগে থেকেই ভোজনরত।

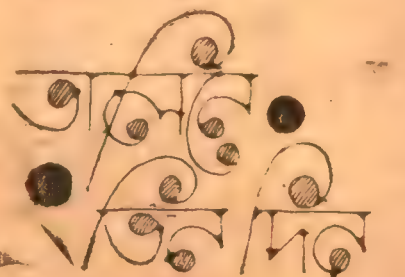
ব্রেকফাস্ট করে এক আনন্দ-পরিবেশ। দু'জন এস্টোনিয়ান সৈনিককে কেন্দ্র করে সে আনন্দ। এতজন ভারতীয়কে পেয়ে হারা মাতোয়ারা। আমাদের অনুপস্থিতিতেই কিশোরচন্দ্র, তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী সেলমা সিঙ্গিকী এবং তেলুগু কবি শ্রীশ্রীকে (ডাকবার সুবিধার প্রয়োজনে তাঁর নাম সংক্ষেপ) নিয়ে তাঁদের তরফ থেকে প্রচুর আদর-আপ্যায়ন। তারই উত্তরে সৈনিকবন্ধুর সম্মানে এবং ভারতীয় প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে কিশোর-চন্দ্রের প্রস্তাবে কনিয়াকের প্লাসে প্লাসে ঠোকাঠকি। ঠিক সে মুহূর্তেই আমরা

সেখানে। আমাদের চারজনকে নিয়ে আরেক দফা হেঁটে। কনিয়াক পানে আমাদের বিরূপতার সৈনিক বন্ধুদ্বয় হয়তো ব্যথিত। কিন্তু অন্য কিছু? হ্যাঁ, কনিয়াক অর্ডার। কনিয়াক চুমুক দিতে দিতেই অনেক গল্প। দোভাষী শাসার মাধ্যমে আমাদের পারস্পরিক পরিচয়লাভ। আমাদের সামনে বসিয়ে নিয়ে আমার সঙ্গে জোর আলাপ আরম্ভ। কথা না বন্ধে পারলেও তবুকারে-ইগিতে অনেকটা কাজ হাসিল। রবীন্দ্রনাথের কলকাতার লোক বলে আমার প্রতি যেন ওদের একটু বেশি খাতির। সেটা আমার পরম সৌভাগ্য।

সৈন্য দু'জনের মধ্যে একজন ইংরেজী বলতে না পারলেও কোনোরকমে লিখতে ও লিখে বোঝাতে সক্ষম। পারস্পরিক বুঝাপড়ায় তা খানিকটা সহায়ক। সেভাবেই ওদের সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞানলাভ। ওরা এস্টোনিয়ান পল্লীর মানুষ, জেলে পরিবারের সন্তান। দেশরক্ষার আহবানে সামরিকবাহিনী গ্রহণ। তাতে পরম উৎসাহিত। দিনযাপন। এক মাসের ছুটিতে এখন গ্রামের পথে। এক ঘন্টার মধ্যেই সে গ্রাম। তাই আনন্দের এত হুড়াহুড়ি। এক প্রশ্নের উত্তরে আমার তিন ছেলের কথা জেনে ওদের ভারি আনন্দ। ওদেরও একজনের দুই ছেলে। আমাদের ছেলেদের মধ্যে ভবিষ্যতে ঘনিষ্ঠতর বন্ধুত্বের আশা প্রকাশ। সারা পৃথিবী জুড়ে মৈত্রীর আবহাওয়ার শুভকামনা।

এরই মধ্যে একজন সৈন্য আসন ছেড়ে কোথায় উঠাও। কয়েক মিনিটের মধ্যেই কিছু হাতে নিয়ে তিনি এসে আমার সন্দেশে হাজির। আমার তিন ছেলের জন্যে তিনটি উপহার। তিন পিস চকোলেট। আন্তরিক ভারত-প্রীতির যথার্থ নিদর্শন।

চলমান ট্রেনের দু'ধারের সব জ সমারোহে চোখ জুড়ায়। তা' দেখতে দেখতে কখন কিছুক্ষণের জন্যে অন্যমন্য। হঠাৎ ট্রেন যেন শ্লথগতি। সামনেই স্টেশন। দু'জন সৈনিকবন্ধুর এবার বিদায়ের পালা। স্পাসিবা—থ্যাংক ইউ! সেই বিদায়সম্ভাষণে বেননার সুর। ওরা ট্রেন থেকে নেমে স্টেশনে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দাঁড়ির অগোচর। ট্রেনেরও আবার দৌড় শুরু।



দক্ষিণারজন বস

প্রান্তরাল সেরে আমরা আবার নিজ নিজ কামরার দিকে। পথের মাঝখানে হঠাৎ বাধা। রিসপসন-বুম থেকে সর্বিনয় উদ্ভ্রোধ। ট্রেনের ব্যবস্থাবি সম্পর্কে আমাদের অন্তর্গত গন্তব্য প্রত্যক্ষ। আমরা একতথ্য স্বীকার। অপরক্ষণের মধ্যেই প্রকান্ড এক বাধানো খাড়া নিয়ে আমাদের কামরায় সেই সহকারিণীর আবির্ভাব। সে খাড়ার একে একে সযাব স-স্বস্ত্য স্বাক্ষর। সব মন্তব্যে প্রায় একই কথা। ট্রেন-কর্তৃপক্ষের আতিথেয়তার এবং তাঁদের সকল প্রকারের সুব্যবস্থায় সবাই তখনো অত্যন্ত খুশি। সে মন্তব্যে খুশির হাসিতে ট্রেন-সহকারিণীরও মুখোজ্জ্বল। মুহূর্তের মধ্যেই খাড়া নিয়ে 'আইটে' (ধন্যবাদ) বলে সে অন্তর্ধান।

একটু বাদেই আমাদের কম্পার্টমেন্টে কবি শ্রীশ্রীজীর আবির্ভাব। তেলুগু কবির এটি ছদ্মনাম। তাঁর আসল নাম শ্রীশ্রীরাণা শ্রীনিবাস রাও। ছদ্মনাম না বলে এটিকে বরং তাঁর সর্বাঙ্গিক নাম বলাই ভালো। আধুনিক তেলুগু কবিরের মধ্যে তিনি শীর্ষস্থানীয়। সে খবর আমার আগেরই জানা। গত কয়েকদিনের আলোপ-পরিচয়ে সে বিষয়ে আংশিক উপলব্ধি। আজ সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও পূর্ণ অভিজ্ঞতা।

আমাদের ঘরে ঢুকেই আমার পাশে আসন গ্রহণ। কী মনে করে সঙ্গে সঙ্গেই প্রচীন তেলুগু সাহিত্য থেকে একটি অপূর্ব সুন্দর কবিতা আবৃত্তি। কবিতাটি কবি রামকৃষ্ণদেব রায়ের একটি প্রেমের কবিতা। এই কবিরই কথা 'দেশ ভাষানন্দ তেলুগু লেস সা' অর্থাৎ সব দেশের ভাষার মধ্যে তেলুগুই মধুরতম। 'আর তা' প্রমাণ করার জন্যে শ্রীশ্রীজীর চেঁচাও অকুণ্ঠিত। পর পর নিজেরও কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি। বাস্তবিক তেলুগু কবিতার ধার্মিক অত্যন্ত মধুর। সেটা সংস্কৃতবহুল শব্দব্যবহারের ফল। সমাজ-সচেতন আধুনিক কবি শ্রীশ্রীজী। বাণ-কবিতা রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। তেমন কয়টি কবিতা শুনে আমাদের পরম হৃত। কবিকে আমাদের সমবেত সাধুবাদ।

তারপরেই তামিল কবি শম্ভানন্দ ভারতীর পালা। তিনি শব্দ কবি নন, যোগীও। শ্রীঅরবিন্দের আশীর্বাদমণ্ডল ভক্ত-শিষ্য। কবিতা ও গীত রচনায় সমান হত। কয়েকটি কবিতা আবৃত্তির পর গান আরম্ভ। ছোট রেল-কামরায় তাঁর জমাট একটি কবি সম্মেলন। এক স্তর বছরের বৃষ্ণ ভারতীজী। কিন্তু অন্তহীন তাঁর উন্মাদনা। তামিল সংগীতের পর ইংরেজী, ফরাসী ও রুশ গান। রবীন্দ্রসংগীতেরও দু-একটি কলি উচ্চারণ। শেষটার অকস্মাৎ আমার ওপর চড়াও। অবশ্য তা নেই বই সহৃদয় অনুরোধ। পরক্ষণে বাংলা ভাষায় সে অনুরোধ বাংলা কবিতা আবৃত্তির জন্যে। একটি রবীন্দ্রন খের ও কয়েকটি নিজের কবিতা শুনিয়ে আমার দারুণ হৃত।

কিন্তু এর মধ্যেই একটি ব্যাপারে আমি অবাক। বসন্ত বকই বিস্ময়কর পাঠ্যকর্ম গ্যাভর্নলজীর। প্রবীণ মারঠী সাংবাদিক

শ্রীগ্যাভর্নলজী। কাবালোকের মস্তভার পরি-বেশেও এক। তিনি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কঠিন পাঠে একান্তে ধ্যানস্থ।

হঠাৎ হুইসল। ইঞ্জিনও তমল সুন্দর। আমরা তালিন স্টেশনে। সামনেই বিরাট ঘাড়টায় তখন সময় নাড়ে এগায়।

ট্রেন থেকে নেমে প্ল্যাটফর্মেই মধুর স্বাগত সন্তানগণ। সম্বর্ধনার নেটীয়ে বিখ্যাত এস্টোনিয়ান লেখিকা শ্রীমতী ভামারা তোমরাগ। সঙ্গে তাঁর কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক ও শিল্পী। হাতে-হাতে পুষ্প-গুচ্ছ দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন। আনন্দ-উচ্চ আবহাওয়ার মধ্যে আমাদের নিয়ে তাঁরা সুন্দর তালিন হোটেল।

টুরিস্টদের বিরাট ভীড় তখন তালিনে। পৃথক পৃথক ঘর পাওয়া এক কঠিন সমস্যা। মুচপেরোয়া নেই। একঘরে তিনজন থাকতেও আমরা রাজী। সেই ব্যবস্থাই সঙ্গে সঙ্গে। আমি অধ্যাপক দাস ও গ্যাভর্নলজী এক ঘরে। হাত-পা ছাড়িয়ে থাকার বৈধন্য জায়গা সেখানে। কাজেই সামান্য এক-আধটুকু অসু-বিধা সহিতে সবাই সন্তুষ্ট। আমাদের কাউকে অখুশি হতে না দেখে আমাদের গাইডরা এবং এস্টোনিয়ান আমন্ত্রণকারী খুশি।

প্রথম দিন তাড়াতাড়ি ডিনার (লাঞ্চ) সেরে কিন্তু বিপ্রাশের পর রাজধানী শহর ঘুরে দেখার ব্যবস্থা। পথ চলতে চলতে এক অভাবনীয় উপলব্ধি। কোনো রাজধানী শহর এত শান্ত নীরব হতে পারে, তা ভগিন্দারনীর। পরিচ্ছন্নতারও অতুলনীয়।

আমাদের হোটেলের অদূরেই প্রচীন এক দুর্গ। সে দুর্গের গায়ে দাঁড় করিয়ে আমাদের একদফা আলোকচিত্র গ্রহণ। তার-পরে আরেক দফা আমাদের দলকে পুরনো এক প্রার্থনাসৌধের সামনে নিয়ে গিয়ে। এই গীর্জাগুলির স্থাপত্য অনেকটা আমাদের দেশের পুরনো কলের মসজিদের মতো। গম্বুজগুলি একেবারে একইরকম দেখতে। মতের ফলে গীর্জাগুলিকে মনে হয় যেন একদম নতুন। এর সামনেই বিরাট বাধানো চত্বর। তার তিনদিক জুড়ে সরকারী সব দপ্তরখানা। আমরা যখন সেখানে তখন আফিস বন্ধ।

সেখান থেকেই পারে হোটেল হোটেল আমরা সাগর-তীরে। ঠিক সাগর নয়, উপ-সাগর। ফিনল্যান্ড উপসাগর তাঁরই ডালিম শহর। অলি-গলি পথ পেরিয়ে এসে আমরা একটা উঁচু জায়গায়। সেই সব গলি-পথ কলকাতার বড়োবাজারেরই গলির মতো, তবে অন্য সব পথের মতো নেগার্লিও মালিন্য-মুক্ত। সেই আবহাওয়ানবীন পথে হটিতে কতই না সুখ!

কিন্তু সেই উঁচু জায়গায় উঠে এসে মুহূর্তেই আমরা সব বিমূঢ়। এ অপূর্ব দৃশ্যের পঞ্চাংগটে আমাদের ছবি তোলা হবে কত আশা! কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে আশা ধুলিসাং। হঠাৎ সারা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। দেখতে দেখতে দিনের আলোটুকু প্রায় লোপাট। সেই আলো-আধারীর মধ্যে নীচের দিকে দৃষ্টিপাত। সেখানে শহরের আরেক অংশ। তালিন যেন দোতলা শহর।

কিরিঝিরে বাঁচি শব্দ হতেই আমরা দে-দোড়। সী-স ইউ পার্ক পেরিয়ে একেই তিন ভাগে আমরা তিন গাড়িতে। সেখানে থেকে হোটেল ফিরে নিশ্চিন্ত। সৌভাগ্যের মতো সফর সমাপিত।

টেলিভিশনের সামনে বসে খানিকটা সময়টিপত। দেশের সংবাদের জন্যে সকলেরই প্রবল পিপাসা। কিন্তু সে ঘুচতে ভ্রান্তির আশা অবাস্তব। এদেশের সংবাদপত্র রা টেলিভিশনে ভারতের তথ্য এশিয়া-আফ্রিকার খবর বঙ্গমামনাই প্রদর্শিত। যখন ফিরে গিয়ে বিকেলে কেনা মনিং প্যাকে (বেলজের ডেলি ওয়ার্ল্ডের পত্রিকার নতুন নাম) এক মল্লক দৃষ্টিপাত। লন্ডনে ভারতীয় ক্রিকেট দলের খেলার খবর ছাড়া ইন্ডিয়া লন্ডনের উল্লেখও নেই আর কোথাও। এ ব্যাপারে সবাই যেন আমেরিকারই দোস্ত।

যাক সে কথা। কিছুকাল গালগল্পের পর খাবারের ডাক। শ্রীমতী ভামারা তোমরাগ আগে থেকেই সাপার টেবিলে উপস্থিত। খেতে খেতেই পরদিনের কর্মসূচী শিরে সকাল দশটার বৈরিখে সমুদ্রতীরে ছবি তোলা, অর্থাৎ ফিনল্যান্ড উপসাগর নৌ-বিলাস এবং বিকেলে ন্যাশনাল গ্যালা-রী অব আর্ট দেখা ও অন্যান্য দর্শনীয় স্থান ঘুরে

গ্রান: এন্ড জুয়েলার
ফোন: ৩৪-৯২০৩, ৩৪-৯৪৮০

মানের মত জুয়েলারী ও প্রস্তুতের জন্য



বিস্ময়কারী স্মারক
সব বসন্ত-সমিতি দায়িত্ব

২৪, ২৪/১, বিপ্লব বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট (বহুবাজার) কলিকাতা-১২

ঘুরে বেড়ানো। বেশ, সে বাক্যই পাকা।
বাওরা-বাওরা সেয়ে আমরা যে বাস সুখ-
লভ্য।

পরদিন সূর্যোদয়ে যেন খুবই লজ্জা-
কর। অনেক বেলা অবধি তিনি মেঘের
আড়ালে। দশটার মধ্যেই আমাদের ব্রেকফাস্ট
লেন। কিন্তু ফটোগ্রাফার তখনো হোটেলের
অন্দরস্থিত। কতক্ষণ বাদে এসে গেলেও
চেপে-মুখে তার নৈরাশের ছায়া। এ আদ-
হ ওয়ার ফটো ভাঙো না হবারই কথা।
রোসের আশায় আশায় আরেকটু অপেক্ষা।

দরজা খুলেই বাইরে ভীষণ শীত।
সন্ধ্যারতের বর্ণে তালিন শীতল। কিন্তু
এত বর্ণের পরেও আকাশ অন্ধকার, সেটাই
অস্বাভাবিক। তখনো আকাশে মেঘ, তখনো বৃষ্টি!
কোট-ওভারকোটও শীত মানানো কঠিন।
তারই মধ্যে স্বামীজীর উৎসাহ কিন্তু
অপরিসীম। বেরিয়ে পড়ার জন্যে তাঁর
হাস্যভঙ্গি। আকাশের অবস্থা ক্রমশঃ একটু
জলোত্তর নিকে। সেই সুযোগে আমাদের বাই-
রাটা।

কিন্তু ঘুরে গাড়িতে এসে আগের দিনের
গলিমুখ থেকে আমরা পায়ে-হাটা পথে।
পাশের বাড়িগুলির জানালা থেকে অনেক
উৎসুক দৃষ্টির উৎসর্গ। দরজা খুলে
অনেক ছেলে-মেয়ে বড়ো-বুড়ি বরন্দর
হাসিয়ে। কিন্তু লোক আমাদের পিছে পিছে।
সেলমা সিন্ধুজীর নমোরস কোমল এবং
শাহারী শাহুই বিশেষ আকর্ষণ। তারওপরে
আবার দীর্ঘকেশ সন্ন্যাসিনী স্বামীজীর
বিভিন্ন পোষাক। সেই উঁচু কারাগার উঠেদেখি
চারিদিক থেকে আমরা ঘেরাও।

অনুরে সমুদ্র দৃশ্য। আকাশ অনেকটা
মিষ্ণ। লোহার রেলিংয়ের সেই অপূর্ব
পরিবেশে দাঁড়িয়ে দশকন্দের সঙ্গে আমাদের
মৈত্রী-বিনিময়। সবাইকে নিয়ে গ্রুপ ফটো
তোলায় এস্টোনিয়ান মেয়েদের ভারি লজ্জা।
শেষ অবধি শ্রীমতী সেলমা সিন্ধুজীর সঙ্গে
ডানের কয়েকজনের ছবি তুলতে গেবেই
আমাদের ফটোগ্রাফারের বিজ্ঞপ্তি। আরো
কতগুলি ফটো তোলায় পর সেখান থেকে
আমাদের অন্তর হটা।

ফিরতি পথে সে-এক হৃৎকম্পনীয়
অভিজ্ঞতা। বৃষ্টি না থাকলেও তখনো প্রচণ্ড
শীত। সব বাড়ির দরজা-জানলা থেকেই
হাত সেড়ে নেড়ে অজস্র লোকের অভিবাদন।
এক ব্যাঘ্র ডাক আমাদের অভিজ্ঞত। শীতে
আমাদের কাপড়ে দেখে তার বাড়িতে গিয়ে
হাত-পা গরম করে আসবার জন্যে আহ্বান।
সে আহ্বানে মাথুদের আকৃষ্ট। খেলেট
গরম শোলাক নিয়ে বের না হওয়ার শাসনের
সূত্রে আমাদের উদ্দেশ্যে কিংবদন্তি তিরস্কার
করেন। তাতে ব্যস্ত এ বাড়িভাড়াটি স্পষ্টতর।
অন্যান্য জানিয়ে তাঁর কাছ থেকে রুমার
গ্রহণ।

গাড়িতে কিন্নরদের মধ্যেই জাহাজ-
ঘাটে। তখন বাড়িতে এসেচল অভিজ্ঞত।
আমাদের সম্মুখীন নীচের ডেকে দাঁড়িয়ে
ক্যাপ্টেন ও তাঁর নাবিক দল। আকাশ তখন
বেহুত। ল্যান্সকে-কোমল সৌন্দর্যই বৃষ্টি

মনেই আমরা সবই ক্যাপ্টেনের অনুসরণ
ওপরতলায় খেল ডেকে। সেখানে 'হতেই
ক্যাপ্টেনের গল থেকে আমাদের হাতে হাতে
এম্বারকেশন কুপন এবং এস্টোনিয়ান শিপিং
বোর্ডের সম্মানসূচক কাড'। দুটোতেই
'ভেইনমুইন' জাহাজের ছবি। এম্বারকেশন
কুপনে রুশ ভাষার সঙ্গে ইংরেজীতেও সাদর
আহ্বান। সেখানে লেখা :

We are happy to greet you
aboard our ship! We hope that
this journey will be a fascinating
one and will leave unforgettable
impressions.

বাক্যটিকেই বই। সমুদ্রবক্ষে বস্তুতন্ত্রের
অনন্দ-ভ্রমণ সত্যি সত্যি অবিদ্যমান।

কিন্তু দোতলার ডেকে যে বসন্ত শীত!
হাড়কাঁপানো বাতাসে সবাই ধবধর। জাহাজ-
কর্কশদের সহযোগিতায় হাতে হাতে
দরজানা, বাদেও ওভারকোট নেই হাঁচেরও
পায়ে পায়ে ওভারকোট। কিন্তু তবু যেন
শীতে জমে দাবর অবস্থা! যে মাসে
কলকাতার মানব স্বপ্ন গরমে গলিমুখ তখন
তালিনে শীতে আমাদের কী হাল!

একটু বাদেই অবশ্য আমাদের কোয়ার্টার
ডাক। সেখানে প্রথমে পান, পরে আহাঙ্গের
চালাও ব্যবস্থা। আমাদের জাহাজের গতি
ফিনল্যান্ডের বিংশ ফিনল্যান্ডের নামেই
এই ফিনল্যান্ড উপসাগর। ফিনিস রাজধানী
হেলসিন্কার চার্লস মাইলের মধ্যে আমরা
সমুদ্রের বুকে। শান্তি সন্মেলনখাত
হেলসিন্কার। সেই শহরের সৌন্দর্যবর্ণনায়
কবি শ্রীশ্রী একমুখ মুখর। কয়েক বছর
আগের অভিজ্ঞতা বর্ণনায় তিনি অনন্দ-
বিহীন। আবার টেবিলে জাহাজেরই এক
নাবিক তখন স্বামী শঙ্করানন্দ ভারতীর
কাছে বোগ-ব্যাকের শিক্ষা নিতে ব্যস্ত।
বাওরা শেষে সেখানে বসেই জাহাজের
লোকদের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে নানা বিষয়ে
গালগল্প। দুপুরে বিদায় তাঁদের অনেকেই
আমাদের কথা বুঝতে অসারগ। আমরাই কি
তাঁদের দোভাষীর মাধ্যমে পুরোপুরি
বুঝতে সক্ষম? আমাদের পরিবেশন-
কারিগরদের চেয়ে চোখে সেই সক্ষমতাব
বেনা। এক পৃথিবীর স্বপ্নের সঙ্গে সঙ্গে
এক ভাষার স্নেহে অপরিসীম। মৃত্যুর
জন্যে আমরা মনে একটি চিন্তার
বিলম্বকালক।

এরই মধ্যে কখন যেন হঠাৎ তাঁর তরী!
আবার আমরা সেই জাহাজঘাটে। আমাদের
হাতে হাতে একটি করে পুস্তক উপহার।
কবিতা ও বিদ্যাসম্ভারগলিত আমরা
আবার অপেক্ষাকৃত তিনটি গাড়িতে কতকগুলি
অঙ্গে থেকেই লাড়ার তখন ইলাশে গাড়ি
বর্তি। তার মধ্যেই রাজধানীর রজপথে
আমাদের পুনরুত। শহরের এক প্রান্তে
মুক্তাঙ্গন জাতীয় উৎসবের বরাতে স্টেডিয়াম
গ্যালারি দেখে বিস্ময়। আর এক স্থানে স্থায়ী
পুস্তক প্রদর্শনী দেখে চোখের চাঁক।
সেখান থেকে সরাসরি আমরা ন্যাশনাল মার্শ
গ্যালারিতে। বেশ কয়েকশ বছর আগে
এস্টোনিয়ান এক রাজকুমারের জন্যে নির্মিত

ভাঁড় যা তাঁর কবরস্থানে। এই বিরাট
প্রাসাদ-ভবন। সেখানে এখন জাতীয় শিল্প-
কলার নানা নিদর্শনের সঙ্গে শিল্পের বেশ
থেকে সংগৃহীত প্রাচীন-আধুনিক বহু
শিল্পকর্মের সমাবেশ। শ্রিতীর জাহাজে
অংশগ্রহণকারী এক সৈনিকের শিল্পচর্চায়
পরিচয় পেয়ে আমরা সবাই মুগ্ধ। একটি
ঘরে তাঁর আঁকা অনেকগুলি স্কলর চিত্র।
এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মানবিক মূল্য-
বোধের বিচার সেখানে। ভাঙে বিদ্যার ঘন
নিয়মে আমরা সেখান থেকে পরে হুটেই
শহরের মধ্যবর্তী প্রকাণ্ড সেন্টাল পার্ক।

বিকেলের আড়াআড়ি তখন হেনরিক।
পার্কের ছায়ায় পথে চলতে চলতে আমরা
সরব। ক্রান্ত সূর্যের নরম রৌদ্রাভির দ্বিগুণ
স্পর্শে সকলেরই শানন্দ। হঠাৎ এক নতুন
দলের উল্লাসের মুখোমুখি আমরা। দলের
ভরণী কটির চোখে মুখে যেন হাসির
ফোয়ারা। দুটি ছেলের কাছে কানেক।
আমাদের দেখেই দুজনেরই ছবি নেবার
মতলব। শব্দ আমাদের ছবি নয়, শুধু
দলের সঙ্গে আমাদের মিলিত ছবি। একজন
এসে স্বামীজীর কাছে প্রস্তাব করতেই তিনি
সানন্দে রাজী। ফটো তোলা হতে হতে কবি
শঙ্করানন্দ ভারতীর যোগী খাতির বহুল
প্রচার। এমন ক্ষেত্রে ভরণদের মধ্যে ভাগ্য-
জিজ্ঞাসার আকাঙ্ক্ষা জগা স্বাভাবিক। একটি
মেয়ের প্রশ্নোত্তরে ওদের দলে হাস্যরোচ।
সে হাসির মহোৎসবে আমরাও অংশগ্রহণ।
আসছে বছরের মধ্যে মেয়েটির কোণে ভারতীয়
বরের সম্মান লাভের ভবিষ্যদ্বাণী।
স্বামীজীর এই নিশ্চিত আশ্বাসে ওরা
হেসেই থেলে। হসতে হাসতেই ওরা বিদায়।
সামনের কয়েকখান বৌগড়ে বসে কিছু-
ক্ষণের জন্যে আমাদের বিশ্রাম।

সংসা হিম্মী গানের সুরে আমরা
সচকিত। লজা মৃৎপঙ্কজের অতিপরিচিত
কন্ঠস্বর। ট্রান্সজিস্টার হিম্মী সিন্ধুজীর
এক জনপ্রিয় গান আমাদের চাকল্য লভন
করে দুটি বৃক ট্রান্সজিস্টার নিয়ে
আমাদের সামনে উপস্থিত। লজার গান শেষ
না হওয়া পর্যন্ত আমাদের কাছেই অবস্থান।
আমরা তাঁর বৃষ্টি। বিনোদে এও এক
বিচিত্র অভিজ্ঞত।

বিশ্রাম শেষে পার্ক থেকে ঢল আসার
পথে দীর্ঘর ধানের এক দল্য দেখে বেদনা-
বোধ। এ নিঃসরই অতিরিক্ত মনোবলের
পরিণতি। অচেতন অলক্ষ্যায় গুলফার এক
বরষক উদ্ভলোক। সবাই অনায়াসে সজ্জিক
হৃৎকম্পন।

সন্ধ্যার আগেই আমরা হোটলে, কিন্তু
লাউজে এত ভীত কিসের? আর প্রত্যেকেই
পোষাককেই কেনই বা রঙের এমন সবারোহে?
এরা ফিনল্যান্ড থেকে আগত এক লোক-
দলগীতিলিপীরা। তাই তাদের জাতি
প্রীতিসম্বন্ধে অংশগ্রহণ এবং জাহাজে।
এদের আগমনে তালিন হোটেল কলঙ্কিত।
আমাদের তো এখানে আর অন্য একটি
রাতেরই সময়। সন্ধ্যার শেষে কবিতার
চিন্তা নিয়েই আমরা বিভোর।

তালিনে জামাদের মূল কার্যসূচী শেষ-
দিনেই সংরক্ষিত; কিন্তু তার পরে কৃষ্ণের
চাকা মেঘলা সন্ধ্যা দেখে সকলেই মন
খারাপ। কিন্তু প্রান্তরায় শেষ হতেই
অকস্মাৎ সুবোধেরে সবাই খুঁক। সকাল
সাতো দশটার এন্টোনিয়ান সাহিত্যিকদের
সঙ্গে আমাদের বৈঠক। এন্টোনিয়ান সাইটাস
ইউনিয়নের বাড়িতে ভারতীয় সাহিত্যিকদের
সমর্থনার কার্যক্রম। বহুসময়েরই আত্ম-
সেখানে। ইউনিয়নের বাড়ি এবং তার আকস
ও আসবাবপত্র দেখে আমাদের অল্প
বিস্ময়। সোভিয়েট রাশিয়ার একটি ছোট
অপরাধী, মাত্র বৈশ লক্ষেই কিছু বেশ
লোকের দেশ এন্টোনিয়া। তার সাহিত্যিক
সংস্কার এমন প্রকাশ, আমরা কোথায়?
আমার মনে বেশ আনন্দজনক ধরে শুধু এই
প্রশ্নেরই আন্দোলন।

ইতিমধ্যে বেলা এগারটা নাগাদ আমাদের
বৈঠক আরম্ভ। ইউনিয়ন সভাপতির ন্যায়
ভাষণের পর পারস্পরিক শুভকামনা।
তারপর নানা বিষয়ে প্রশ্নোত্তরে উত্তর
জানাজানি। এন্টোনিয়ান সংস্কারের তথ্য
থেকে প্রথম প্রশ্ন তাঁদের দেশ সংস্কার
আমরা তেমন কিছু জানি কিনা। এসপতি
কিছু প্রশ্নের নিষ্পত্তি সে প্রশ্নের উত্তরে
আমার মধ্যে দু'চার কথা। আগে বিশেষ
কিছু না জানা থাকলেও স্বাভাবিক সহযোগিতার
সময় থেকে আমাদের দেশের মানুষ বাস্তবিক
তীরবর্তী দেশগুলি সম্পর্কে যেটুকু
ওয়ারেনফোল। ভারতীয় সংবাদপত্রে সেই
থেকে এসব খবরের কথা প্রায়ই প্রচার।
১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে এন্টোনিয়ায় রক্তপাতের
বিশ্রাবের কথা উল্লেখের মধ্যে মধ্যে
ইউনিয়ন সদস্যদের মধ্যে প্রচলিত-সিঁহের
সেই কিশোরেরই ফলশ্রুতি সোভিয়েট
রাশিয়ার সঙ্গে সংঘর্ষ। তারপরে হিটলারের
কৃষ্ণাঙ্গ হলেও জার্মানীর পরাজয়ে
এন্টোনিয়া জাতির সোভিয়েট রাশিয়ার
অপরাধী পরিণত। তাঁদের কথা আমাদের
এতটা জানা আছে শুনে এন্টোনিয়
সাহিত্যিক বন্দুরা বুঝেই বেশ।

এবার আমার একটি ছোট প্রশ্ন।
এন্টোনিয়ার ছোট ছোট কবিতাগুলি
জাপানের টুক বা হুকো নামে প্রকাশিত
কিনা। সংস্কৃত উত্তর : উত্তর দেশের এই
ধরনের কবিতার গুরুত্ব মিল থাকলেও তা
কেনো দিকেরই প্রভাবের ফল নয়—সে মিল
সেখানেই আত্মসমক।

ও তরফ থেকে পাঠা প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথ
সম্পর্কে। ভারতীয় সাহিত্যে রবীন্দ্রপ্রভাব
কেন গিয়েছে কিনা সে প্রশ্নের এই উত্তর
দিতও আমিই প্রসিদ্ধ। এক বছরেই এর
জবাব। রবীন্দ্রনাথ ভারতের নবজন্ম কবি,
তার প্রভাব প্রায়শঃ প্রশ্ন অস্বাভাবিক।

এর পরে জনকঙ্কণ ধরে ভারত-
পাকিস্তান ও ভারত-চীন সম্পর্ক এবং
ভারতের দুর্ভিক্ষের বিষয় নিয়ে অঙ্গুলি।
বন্দুর 'নবজন্ম' পত্রিকার প্রবীণ সম্পাদক
ত্রিগাভাঙ্গলজীর চরকার বিশেষভাবে সবাই
তৃপ্ত। আরেকটি প্রশ্নের উত্তরে আমাদের
দেশের সরকারী সাহিত্য সংস্থা সাহিত্য
আকাদেমি ও বৈদ্যকারী সংস্থা প্রসিদ্ধ

লেখক সখ্য প্রভৃতি সম্পর্কে ত্রিগাভাঙ্গল চরকার
ও তেলগু কবি ত্রিগাভাঙ্গল বন্দুরা পেশ।
তারপরে দুই দেশের কাঁচকার নতুন নতুন
পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রশ্ন নিয়ে কিছু সময়
কথাবার্তা। আমাদের শেষ প্রশ্ন এন্টোনিয়ার
বই-এর বাজার সম্বন্ধে। তার জবাব শুনে
আমরা রীতিমত বিস্ময়-স্তম্ভ।

লেখক একটি নামকরা হলেন তাঁর
বই-এর প্রথম সংস্করণ পাঠান থেকে পঁচাত্তর
হাজার কপি। অনেক সময় কয়েক হাজার
মতোই সংস্করণ শেষ। কখনো কখনো কয়েক
দিন বা দু'চার সপ্তাহেই সব কপি বিক্রি।
এমন কি নতুন লেখকদের রচনার চাহিদাও
এখানে কখনো। অনেকেরই প্রথম বই-এর
পঁচাত্তর হাজার কপির প্রথম সংস্করণ। এসব
বই-এর নিষ্পত্তি বিক্রিও কয়েক দিনের
ব্যাপার। আরেক মজার খবর কবিতা-পাঠক-
রাই সংখ্যায় বেশ এবং কবিতা-সংগ্রহের
অধিকাংশই গাইলা কবিতার পরে দখলে।

কথার কথায় বেলা দুটো অতিক্রান্ত।
আমাদের তিন ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকের পরি-
সমাপ্ত। মধ্যে মধ্যেই আক্ষেপ নিঃসৃত।
এন্টোনিয়ার জাতীয় কবি লেনিন পুরস্কার-
বিজয়ী মিঃ স্কুল। পত্নী ডোবেরাও এক
প্রখ্যাত কবি। প্রাক-সম্মান এই কবি-
সম্পত্তির গৃহ পরিদর্শনের আমন্ত্রণে
আমরা আনন্দিত।

বাইরে তখন অপূর্ণ সূর্যের আলোয়
সারা তালিন কলমল। নীচে মেয়ে আসতেই
ইউনিয়ন ইউনিয়নের মুখোমুখি ছোট ঘরের
বলারের দিকে দাঁড়ি নিবন্ধ। সেখানেই
এন্টোনিয়ার প্রেম উপন্যাসিক আলফ্রেড
উইল্ডার আভিনব স্মৃতিস্তম্ভ। পাথরে তাঁর
তার মুখাবলম্বক আলগা করে বসানো
বৈরাট এক পশ্চিমপটে। সেখানেই খোঁজ
তাঁর সাক্ষ্য পরিচয়। আর তার পাশেই
প্রায় একই মাপের আরেকখানি শিলা-চিত্রে

এন্টোনিয়ার ইতিহাস লিখার। একশ' তিন
বছর আগে মাটির পৃথিবী থেকে যে সাহিত্য-
গুণীর বিদায় গ্রহণ ডাকে এন্টোনিয়
সম্প্রদায়ের সুন্দর বাক্য। ভারতীয় লেখকদের
তরফ থেকে আমাদেরও নমস্কার নিবেদন
সেখানে।

হোটলে ফিরে এসে তিনটে থেকে
চারটের মধ্যে তিনার শেষ। তিনার-হল থেকেই
সরাসরি আমরা স্কুল-সম্পত্তির বাড়ি দিচ্ছি।
আমাদের হোটেল থেকে অনেকটা পথ। গাভ-
কানীর উপকণ্ঠে একটি সুন্দর এলাকার
দে-বাড়ি। সে বাড়ি দেখে এক নতুন উপ-
লব্ধি। মনুষ্যের আশ্রয়কৃৎ কত কাব্যমণ্ডিত
হওয়া সম্ভব এখানে তার প্রত্যক্ষ পরিচয়।
প্রতিটি ঘরের প্রতিটি জানালার কাঁচের মতো
করে সাজানো। সোভিয়েত অসামান্য একটি
লাইব্রেরী। সেখানে যেতে সিঁড়ি-দরজা এবং
আলপাশে ছেবোবার অঁকা নান ভকিতে
চোখ নিখর। আমরা আনন্দে অধীর।

কিন্তু পানাহারের এমন ঢালাও বাক্য
এই অসময়ে? সুবিচারের আশা মিথস্ক।
তবু গল্প গল্পে হার বা ইচ্ছে তাই গ্রহণ।
তার চরকার কবি-সম্পত্তির জীবনকথা।
জেলের ছেলে মিঃ স্কুল। কৈশর ও বৈরাট
একান্তভাবেই কবিতা-রস। একটি ছোট
স্বাধীনভাবে তাঁর লিখা। তাঁর একটি
কবিতার নামে তাঁর সেই স্মরণীয় আজ
পরিচিত। সে-গ্রামের নামের যথ' স্বতিকা
অন্য। বিয়ের পর কবিতা লেখার তার পত্নী
ডোবেরার। তিনি কান্ত গল্প ন্যায় উপন্যাস
লেখার। এসব কাহিনী শুনে, পল-ভোজনে
তৃপ্ত হয়ে আবার উপহার লাভ। হাতে-হাতে
একটি করে স্মরণ পুস্তক। সেখান থেকে
হোটলে ফিরেই রিগার উল্লেখ্য শ্রোতাদের
দিকে ছিটকি বস্তা। সাতো সাতটার রিগার
টোন। রিগা ন্যায়ক তীরবর্তী জলকণ্ঠ
সোভিয়েট রিপাবলিক ল্যাটভিয়ার রাজধানী।

‘মহাগুজার স্রেষ্ঠ অর্ঘ্য’...

সিই কোন্

আণিকা

হেয়ার অয়েল

একমাত্র পরিবেশক :

আর. ডি. এম. এণ্ড কোং

২১৭, বিধান সড়ী

কলিকাতা-৬

ফোন : ৩৪-৩৮০৬

প্রস্তুতকারক :

কিং এণ্ড কোং

কলিকাতা

(রেজিঃ চেমিষ্টার)

স্থাপিত—১৯৩৪ সাল)



Grace W.C. ৪৭

এই কাহিনীর প্রত্যেকটি বিবরণই সত্য এবং কি আশ্চর্যকরভাবে সত্য তা একটু দেখে করে পড়লেই অনুভব করতে পারবেন।

কোথার উত্তর আমেরিকার মেক্সিকোর এক প্রাচীন নারী মিসেস টোলটেক, আর কোথার সুদূর ভারতবর্ষের এক মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ রাঘবন অকস্মাৎ প্রজাপতির নির্বন্ধে একদিন বাঁধা পড়েছিলেন এবং শেষপর্যন্ত রাঘবনকে বাধ্য হতে হয়েছিল মিসেস টোলটেককে বিবাহ করতে। মিসেস টোলটেকের পূর্বস্বামীর একটি ছেলে ও একটি মেয়ে থাকার সত্ত্বেও, কেন যে তাঁর চেয়ে বয়সে দুগুণ বড়দের বড় এই মহিলাকে রাঘবন বিবাহ করেছিলেন এবং শূন্য বিবাহ করাই নয়, সব ছেড়েছড়ে সারা জীবন থেকে গিয়েছিলেন মেক্সিকোর এক শান্ত শহর-তুলসিতে, সেও এক আশ্চর্য রোমাঞ্চকর ঘটনা।

কারতর্ক থেকে অধ্যাপনার কাজ নিয়ে ফ্লোরিডার ট্যাম্পা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত হয়েছিলেন রাঘবন। আমেরিকান সভ্যতার বহু পূর্বে, গুয়াটেমালা ও বর্তমান বৃটিশ হন্ডুরাসকে বেতন করে মেক্সিকোতে এজেন্টে ও মাদ্রাজী সভ্যতার ক্ষেত্রে পড়ন হয়েছিল, সেই সময়েই প্রধানতঃ বিবেচনা করছিলেন অধ্যাপক রাঘবন।

বুড় শান্ত ও ভদ্র প্রকৃতির সুন্দর ছদ্ম ছিলেন রাঘবন। সাধারণতঃ মাদ্রাজের যে অংশ তাঁর বাস, সে অংশের লোকেরা তেমন ফরসা হয় না বটে, কিন্তু রাঘবনের ঝলগটা ছিল একটু স্নেহলব্ধ এবং তাঁদের সকলেরই গায়ের রং ছিল ফরসার দিকে। আমেরিকায় এসে যদিও পড়াশোনা নিয়েই সংসদর থাকতেন তিনি, তবু তাঁরই ফাঁকি মাঝে মাঝে বোরের পড়তেন ফিশিং, বোটিং ও সী-সিটে নয়-নারীর মত মেহের মেলার মধ্যে মিজেকে মিশিয়ে দিতে। এসব ছাড়া ফেরার, অপেরা বা সিনেমাও বাধা যেত না তাঁর। অনেক মেয়ে-পুরুষের সঙ্গেই পরিচিত হয়েছিল রাঘবনের, কিন্তু অতিগিরি ব্যারে-পড়া, উগ্র-অধুনিক সাজ-পোশাকে মাদ্রাজী স্টাইলের মেয়েদের কেমন খেঁচ লাগতে পারতেন না রাঘবন। তাঁর মতে ছিল প্রাচীন আশ্চর্য ধারা; সে কারণেই আমেরিকার কেতাদমস্ত সোসাইটি গাল'রা তাই তাঁকে ফাঁকি ফেলতে পারেনি।

কিন্তু তিনি ফাঁদে পড়েছিলেন মেক্সিকোর তাঁর গবেষণার কাজে গিয়ে। সে এক অশুভ ফাঁদে আটক গিয়েছিলেন লোকেরা। তখন তিনি মেক্সিকোর একা-লোকান্তে থাকেন, আর সেখান থেকে গ্যাম্বিফো, ভেরা ক্রুজ প্রভৃতি জারগা-মূলিতে ছুঁয়ে যেতেন তাঁর সম্বন্ধী মন নিয়ে। বড়ো বেড়ান, স্থানীয় বিচিত্র স্তম্ভ, তি এবং আদিম ইন্ডিয়ান ও স্প্যানিয়ার্ড-দের দিক-সংকীর্ণতর নিদর্শনগুলি। আর প্রাচীন এজেন্ট ও মায়ান বংশীয়দের মতো যারা আজ পৃষ্ঠীয় রোমান

কবর স্থানায় হৃদয়কল



বিশ্ব মনোপাধ্যায়

ক্যাথলিক ধর্ম রূপান্তরিত হয়েছে, সেইসব বংশের ইতিহাস।

এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে এখানেই, এখানকার পার্বত্য-শহরতলী গুরানা-জুয়াটেতে গিরে পড়ে আলাপ হয়ে গিয়েছিল, মিসেস টোলটেকের সঙ্গে অধ্যাপক রাঘবনের। কিংবদন্তী আছে, আমাদের দেশে কামরূপ কামাখ্যার মেয়েরা যেমন ভ্রমণকারী বিদেশী পুরুষকে পছন্দ হলে ভেড়া বানিয়ে ফেলে, তারা আর রক্ষা পায় না ঐ মেয়েদের কবল থেকে, রাঘবনকেও তেমন প্রথম আলাপেই প্রেমের ফাঁদে বেঁধে ফেলেছিলেন মিসেস টোলটেক।

মানুষের দেহান্তের পর হয় তাকে পুড়িয়ে ফেলা হয়, নয় কবর দেওয়া হয়, না হয়ত একটি বিশেষ স্থানে রক্ষা করে পক্ষীবিশেষ দিবে খাইয়ে দেওয়া হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের জন্য মৃতদেহগুলির সঙ্গতির জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি আছে।

কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র মেক্সিকোতেই এই মৃতদেহগুলি সমভেদে রেখে জনসাধারণকে দেখবার যে ব্যবস্থা আছে, তা যেমন রোমাঞ্চকর, তেমনই বীভৎস। এই মৃত মানুষের ভয়াবহ বাদুঘর বা কবরস্থানকে ঘিরে, নানা ধরনের যে সব অলৌকিক সত্য কাহিনী আছে, আশ্চর্য্যবাস্য হলেও, এখানে তারই একটি চিত্রসহ প্রকাশ করা হল।

পরের দিনই একাপুলকোর হোটেল ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল রাঘবনকে, টোলটেকের গুরানাজুয়াটোর বাড়িতে পৌঁছতে গেল। আশ্চর্য্য একটা মোহিনী-শক্তি ছিল এই প্রাচীন রমণীর। ফ্লোরিডার থাকাকালীন ইতিপূর্বে বেসব মেয়েদের সঙ্গে সস্ত্রাবে এসে-ছিলেন রাঘবন, বয়সে তারা টোলটেকের চেয়ে অনেক ছোট হলেও, তাদের কারুর সঙ্গে বেন তুলনা হয় না তাঁর। বয়স টোলটেকের পরগণের কাজকাছি হলেও, তাঁকে পৃথিবীর বেশী দেখাত না। মেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে রোমাঞ্চ কেন তাঁর উত্থলে পড়ছে, চলেই বললে খরে পড়ছে নতুন লাগ। আর ছিল মূখের ভঙ্গীতে, টানা টানা মিশ-কালো দুটি চোখের চাউনিতে মোহন-হৃদির স্বপ্নালু আমেজ। ভারতীয় রূপসীর সঙ্গে কোথায় বেন একটা মিল ছিল তাঁর। ভারী নিতম্বের উপরে কীণ কটিতটে মাথাভরা কুণ্ডিত কৃষ্ণ-চিকুর প্রস্রাবিত ছিল তাঁর, আর সুসজ্জিত শূন্য দাঁতের ফাঁক দিয়ে কথায় বেন মূকো করে পড়ত।

স্থানীয় লোকদের কাছে গ্রীষ্মতী টোলটেক ঠিক-ঠিক এতটা সুন্দরী না-হলেও গ্রীষ্ম রাঘবনের চোখে এইভাবেই বরা দিরেছিলেন। প্রথম দর্শনেই বিমোহিত হয়ে-ছিলেন অধ্যাপক রাঘবন।

তাঁদের আলাপের সূত্রটা ভারী মজার। মিসেস টোলটেক ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে বেড়াতে বোরেরে একটি স্ট্যাকুর সামনে দাঁড়িয়েছেন। রাঘবনও তাঁর তগণেই সেখানে এসে স্ট্যাকুর ঐতিহাসিক গুরুত্ব দেখছেন এমন সময় ছেলেমেয়ে দুটি ছুটেছুটি খেলতে খেলতে তাঁর কাছে এসে পড়ল। তিনি ছেলটিকে ধরে পকেট থেকে একটি লজ্জস বার করে তাকে দিতে গেলেন, কিন্তু সে তা অপরিচিতের কাছ থেকে না নিয়ে ছুটে চলে গেল তার মার কাছে। মিসেস টোলটেক হাসতে-হাসতে এগিয়ে এলেন মিঃ রাঘবনের কাছে, আর চার চোখের

এই মিলনই হয়ে গেল তাঁদের জীবনের জাম্বত গ্রন্থিবন্ধন। ছেলেমেয়ে ও মাকে তিনি লজ্জা দিলেন রাখবন। নিজের একটি গালে ফেললেন। কোথাও বেরুলে সবসময়েই পকেটে লজ্জা রাখা রাখবনের বহুদিনের অভ্যাস।

এর পর ঘটনা দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে পেরিয়ে গেল হয়ে এসে রাখবন ওঠেন মিসেস টোলটেকের বাড়িতে। পাহাড়-ঘেরা শহরের একপ্রান্তে ছোট একটি ছবির মত বাড়ি। থাকতেন টোলটেক দুটি ছোট ছোট ছেলে-মেয়েকে নিয়ে। ছেলেটির বয়স পাঁচ আর মেয়েটি তখন মাত্র বছর তিনেকের। এই মেয়েটি যখন টোলটেকের গর্ভে, তখনই আত্মহত্যা করেন তাঁর স্বামী।

শহর থেকে বেশ কিছুটা দূরে পাহাড় অঞ্চলে ওপল পাথরের খনিতে কাজ করতেন মিঃ টোলটেক। বেশীরভাগ সময়ই তাঁকে থাকতে হ'ত খনি অঞ্চলে। সপ্তাহে মাত্র একদিন এসে থাকতে পারতেন বাড়িতে। কিন্তু ঐ খনির কর্তাব্যক্তি মালিক রোজই প্রায় তসতসে গুয়ানাজুয়াটোর মিঃ টোলটেকের বাড়িতে। মিসেস টোলটেককে নিয়ে খুশতেন তিনি এখানে-ওখানে। সংসারের ও মিসেসের সখের স্বাভাবিক জিনিস কিনে দিয়ে যেতেন। এর জন্য অস্বস্তিই বোধ করতেন মিঃ টোলটেক, কিন্তু মনিবকে চটতে সাহস করতেন না। শেষপর্যন্ত একদিন এই ঘটনাকে অবলম্বন করে মনিবের সঙ্গে তাঁর বচসা এমনই একটা পর্যায়ে এসে উপস্থিত হ'ল যে, তিনি তাকে রিভলবার বন্দ করে খুন করে বসলেন এবং সেই রাতেই নিজের বাড়ি এসে আত্মহত্যা করেন।

মোটামুটি ঘটনাটি এইভাবে। স্বামীরা লোকের কাছ প্রকাশ পেলেও, প্রতিবেশীদের অধিকাংশই মিসেস টোলটেকের সুন্দর চেহারা ও মিষ্টি বাবদারের জন্য তাঁর প্রতিই ছিলেন সহানুভূতিসম্পন্ন। তাছাড়া এই ছেলেমেয়ে দুটিকে তিনি যে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে মানুষ করে তুলছেন নিজের চেষ্টায়, সেটাও বড় কম কথা ছিল না। স্বামীর অবিবাহিত বা স্ত্রী কর্তৃক পরিহৃত বস্ত্রের অনেকই তাঁর পাণিপ্ৰার্থী হয়েছিলেন বলে, কিন্তু বাড়িকেই মিসেস টোলটেক পাতা দেননি। কি করে তিনি তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পরও এই তিনটি বছর ছেলেমেয়ে দুটিকে মানুষ করে নিজের সংসার চালিয়ে যেতেন, সেটা প্রতিবেশীদের তখনকের কাছে ছিল একটা কৌতূহল ও কিস্কন্ধের বিষয়। তাদের কেউ কেউ এ নিয়ে প্রশ্ন করলে, মিসেস টোলটেক হ'ল সেকথা এড়িয়ে যেতেন, না হ'ল বলতেন ঈশ্বর চালিয়ে দিচ্ছেন।

রাখবনকে বাড়িতে রেখে, তাঁর কাছে সব কথাই বলে বসেছিলেন মিসেস টোলটেক। এবং কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে যেন প্রেমের বাধনে একেবারে আশেপাশে বোঁধে ফেল-ছিলেন। ফোরিডায় ফেরার কথা, তাঁর গবেষণার কথা, এমনকি দেশে তাঁর আত্মীয়-স্বজনের কথাও প্রায় ভুলে গিয়েছিলেন রাখবন। মিসেস টোলটেক ও তাঁর ছেলেমেয়েদুটিকে নিয়ে নিজের ছেলেমেয়ের

মত হাসি, গল্প, খেলায় নিয়ে যে তাঁর বিনমূলি ক্রমে কেত তা নিজেই তিনি ভেবে পেতেন না।

প্রৌঢ়া টোলটেক স্বভাবী লাবলা-লালিয়া নিয়ে সারিকালে ধরা দিতেন মিঃ রাখবনের কাছে। সে রাতে মাদকতার সারাদিন মোহাজ্জ্ব হয়ে থাকতেন অধ্যাপক রাখবন। কখনও কখনও যেন চমক ভেঙে উঠে তিনি ভাবতেন, এ কি করছেন তিনি! দিনরাত মিসেস টোলটেকের মুখ ভেদে বেড়াত তাঁর চোখের সামনে। কাছে পেলেই আদর করতে উঠে হ'ত তাঁকে। মেকসিকান এই নারীর দুর্নিবার আকর্ষণ সব ভুলিয়ে দিল অতীত ও অনাগত ভবিষ্যতের কথা।

মিসেস টোলটেককে বিবাহ করে মনুজের রাখবন পিলাই রং গোলে টামপা হিম্বাবিদ্যায়ের অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজ ছেড়ে, সামান্য ছোট একটা চাকরি নিয়ে, মেকসিকোর গুয়ানাজুয়াটোর পার্বত্য অঞ্চলের শহরতলীতে।

কিন্তু তাঁদের এই বিবাহের পর থেকেই কেমন যেন মাঝে মাঝে ঘূমের মধ্যে অশুভ স্থান দেখতে আরম্ভ করলেন প্রীমতী রাখবন। ক্রমশঃ এই স্থানের ব্যাপারটা প্রাতিহিক ঘটনায় এসে দাঁড়াল। তিনি দেখতেন : তাঁর পূর্ব-স্বামী মিঃ টোলটেক এসে তাঁকে ডাকছেন, জোর করে ধরে বোন-কামনা পরিহৃত করার চেষ্টা করছেন, চুমু খাচ্ছেন, কামড়াচ্ছেন তাঁর সর্বগো। বিকৃত চেহারা নিয়ে ভয় দেখিয়ে বলতেন : ছেলেমেয়ে দুটোকেই আঁধা নিয়ে যাব তোমার কাছ থেকে।—এই সব দেখে, প্রাচই চীৎকার করে লাফিয়ে উঠতেন বিহীনায় মিসেস রাখবন; জড়িয়ে ধরতেন মিঃ রাখবনকে। ছেলেমেয়ে দুটি অন্য থাটে জেগে উঠত ভয় পেয়ে, মায়ের ঐ চীৎকার চোঁচোঁচির সঙ্গে তারাও কান্ডে আরম্ভ করে দিত।

এ ব্যাপারে মিঃ রাখবন বুঝে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন এবং চিন্তাশ্রিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু এর কি উপায় করবেন তিনি? মিসেস রাখবন বুঝেই যেন দুর্বল হয়ে পড়ছেন। রাতে চোখ বুজেই যদি ঐ স্বপ্ন দেখেন সেই ভয়ে, বুঝেই যেন অন্তর্হিত

হয়েছে মিসেস রাখবনের চোখ থেকে। এখন সারা রাত প্রায় জেগেই শুয়ে থাকেন তিনি— রাখবন ঘুমিয়ে পড়েন, আর তাঁর ঘুমের নিকে চেয়ে থাকেন মিসেস রাখবন।

কিন্তু শব্দ স্থান বা ঘূমের মধ্যেই নয়, জগত অবস্থাতেও রেই পান না মিসেস রাখবন। হঠাৎ একদিন তিনি তাঁর পূর্ব-স্বামী মিঃ টোলটেকের আবহা মৃত্যু ঘরের ঘরো লেখে চীৎকার করে ওঠেন। তাঁর চীৎকারে রাখবনও হতমুগ্ধ হয়ে উঠে দেখেন মিসেস রাখবন ঠকঠক করে কাঁপছেন। প্রীমতী রাখবনের কাছ থেকে সব শুনে, তিনি যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন।

পরের দিন সকালে উঠেই রাখবন চল যান 'প্যাটিয়ন' সিস্টেম ক্যাশালিক ধর্ম্মাজকের কাছে। তাঁনি ওখানকার নকশা ওয়া বিশেষ এবং বহু অনৈতিক চুক্তি ঘটনার আশ্চর্য সমাধান করেছেন।

এখানে মেক্সিকর এই 'প্যাটিয়ন' সিস্টেম সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যিক মনে করি। এই কবরখানা বর্তমান সভ্যজগতের এক বিচিত্র বিষয়—মৃত পূর্ব-পূর্ব ও আত্মীয়স্বজনকে দেখবার এক বিশেষ মাদুখর।

গুয়ানাজুয়াটোর উচ্চ পাহাড়তলীর বিরাট এক চত্বর জুড়ে, ভূগর্ভের সমতল-ভূমিতে, রহস্য ও ভীতির এই রাজ্যে লোকের আছে শূকনো, শূকরো বিকৃত কামালসার নর-নারীর অসংখ্য দেহ। দেহগুলি কবর

SCD মানে ডাল





কম্পা ১৪ সেকা জিনিস টাইলি বার বার এ ব সিস্টেম ১১
বাস্তবের খরচজা, ১৪ সেকা মালিকের চিত্র চিত্রিত
কলন SCD Heater, Iron & Table Lamp বিক্রি
খরি ১১ পায় চিত্র চিত্রিত বার বার।

প্রস্তুতকারক : গাভুলী এন্ড কোম্পানী
১১, গোয়াব চিত্রিত বার, কলিকাতা-১
ফোন ১০৪-১৪১০

বেনারসী
সিল্ক
ও তাঁত বস্ত্রের
বৈচিত্র্য

২২৪
মহাত্মা গান্ধী রোড
আমাদের
ঔষধ বিভাগ
খোলা ২২ইয়াছে

ব্যানার্জি ব্রাদার্স

• বড়বাজার • কলিকাতা-৭ • ফোন: ৩৩-২০৭৪ •



অধ্যাপক রাখবন ও মিসেস রাখবন (প্রাক্তন মিসেস টোলটেক)

থেকে তুলে অথবা দেয়ালের গায়ের খোপ থেকে বার করে রাখা হয়েছে পাহাড়ের গায়ে সার দিয়ে। স্থানীয় কতৃপক্ষ মাটির তলর কবরের মত, পাহাড়ের গায়ে অনেক খুপারি তির করে দিয়েছেন মৃতদেহগুলির জন্য। তবে এই সব খোপের মধ্যে শবদেহগুলিকে রাখার জন্য মৃতের আত্মীয়স্বজনকে একটা নির্দিষ্ট হারে প্রতি বছর টাকা দিতে হয়। আর টাকা ঠিকমত দিতে না পারলে খোপগুলি খালি করে দিয়ে, শবদেহগুলিকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। তারপর ক্রমশঃ সেগুলি জীর্ণ হতে হতে ভেঙে পড়ে নিছক অস্থিখণ্ডে পরিণত হয়।

কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে, এখানকার প্রত্যন্ত শূন্য পর্বতীয় আবহাওয়ার জন্য, কবর থেকে তোলা বা দেয়ালের খুপারি থেকে বার করা শবদেহগুলি পড়ে গেলে গিয়ে, এমনই একটা অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে অনেক সময় তাদের গায়ের চামড়াগুলো পাচ-মণ্ডের মত মনে হয় এবং মাথার চুল, নখ, দাঁত মনে কি জামা-কাপড় পর্যন্ত কিছুটা দ্রবীকৃত অবস্থায় থেকে যায়। কিন্তু হলেও, এ দৃশ্য দেখা আমাদের পক্ষে কখনো মনে হলেও, ওদেশের লোকেরা সে দলে পরস্পর খরচ করে টিকিট কেটে রাট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে, সারিবদ্ধ কৃত লাসেদের বীভৎস এই দৃশ্য দেখে আসে ত রবিবার। ত ছাড়া মৃতদের পর্ব নামে (Feast of the Dead) সারা মেক্সিকোর রাট এক উৎসব প্রতিপালিত হয়; আর সেখানে আড়ম্বরের সঙ্গে সেদিন ম্যানাজুরটোর শত শত লোক শোভাযাত্রা হকারে, হাত জড়লত বাঁতি নিয়ে মৃতদের কবরস্থানে গিয়ে উপস্থিত হয়—তাদের মান ও শ্রদ্ধা জানাতে।

এখন আবার আমাদের সেই কাহিনীর মধ্যে আসা যাক।

অধ্যাপক রাখবন কবরখানার ধর্মযাজকের কাছে গিয়ে সব কথা বলে বললেন। প্রথমটা শুনে তিনি একটু বিচলিত হলেও, পরক্ষণেই বললেন, মিসেস টোলটেক তার পূর্ব-স্বামীর সদগতির জন্য কিছু না করে, তার অমর্যাদা করেছেন। আত্মহত্যাকারী হিসাবে তার আত্মার সদগতি হয়নি; তাছাড়া যে খুপারিতে তাকে রাখা হয়েছিল, সম্ভবতঃ বাৎসরিক ভাড়া না দেওয়ার জন্য তার লাস খুপারি থেকে বাইরে গাদার মধ্যে বার করে দেওয়া হয়েছে। আপনরা এসে তাকে শ্রদ্ধা জানান,—চারটে গিয়ে তার আত্মার সদগতি কামনা করে দেহটাকে মাটিতে কবর দিয়ে অথবা আবার চেম্বারে তুলে রাখার ব্যবস্থা করুন। আমার মনে হয়, এটা করলেই আপনারা শান্তি পাবেন এবং তারও আত্মা আত্মহত্যা করার পাপ থেকে মুক্ত হবে।

শেষ পর্যন্ত মিঃ ও মিসেস রাখবন মিঃ টোলটেকের মৃতদেহের তত্ত্বাবধানের জন্য ছেলেমেয়ে দুটিকে সঙ্গে নিয়ে ভয়ে ভয়ে গিয়ে হাজির হলেন 'প্যাণ্টিয়ন সিমিটিতে'।

গুয়ানাজুরাটোর এই ভয়াবহ রোমাঞ্চকর কবরস্থানের কথা রাখবন লোকমুখেই শুনেছিলেন কেবল, কখনও যাওয়া বা দেখার ইচ্ছা হয়নি তার। এখনও তার খুব ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু স্ত্রীর জন্য যেতে হ'ল তাকে।

ভিতরের কদম নারকীয় দৃশ্যের মধ্যে ঢুকে কেমন যেন তার মন বধ হয়ে আসতে লাগল। ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে আরও যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন তিনি। তারপর মিসেস রাখবনকে বললেন, 'বাইরের এই মৃতদেহগুলির মধ্যে খুঁজ দেখ সন্ধ্যা

করতে পার কিনা। যদি ও'কে পাওয়া যায়, তাহলে আমরা কতৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে আবার ও'র কবরের ব্যবস্থা করব।'

মিঃ রাখবনের সঙ্গে বিবাহ হওয়ার পর থেকেই মিসেস রাখবনের শরীর ভেঙে আরম্ভ করেছিল অত্যন্ত দ্রুত। তারপর এই স্বপ্ন দেখা, রাত জাগা প্রভৃতির ভীতি ও উত্তেজনার কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কবরের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখা বিকৃত শবদেহগুলি তন্নতন করে দেখতে লাগলেন মিসেস রাখবন, আর মিঃ রাখবন ছেলেমেয়ে দুটিকে সঙ্গে করে একদিকের কিছুটা ফাঁকা জায়গার দিকে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

পা টেনে-টেনে, ঘুরে ঘুরে সমস্ত জায়গাটা দেখার পর, মিসেস রাখবন মিঃ রাখবনকে বললেন, 'তুমি এখানে ওদের নিয়ে একটা দাঁড়াও, আমি একবার 'বোন চেম্বারের' ভেতরটা ঘুরে আসি।'

কিন্তু 'বোন চেম্বার'-এ ঢোকান সঙ্গে সঙ্গেই সেখান থেকে একটা করুণ আতর্নাদ কানে পৌঁছল মিঃ রাখবনের। আশপাশের আরও যেসব লোক সেদিন এসেছিলেন তাঁদের আত্মীয়স্বজনকে দেখতে, তারাও সে আতর্নাদ শুনে চমকে উঠলেন। ছেলে-মেয়েদের মধ্যে মিঃ রাখবন ও তার সঙ্গে আরও কয়েকজন ছুটে গেলেন সেদিকে। গিয়ে মিঃ রাখবন দেখলেন, মাটিতে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে আছেন তার স্ত্রী বিরাট কঙ্কালের গৃহার সামনে, আর বা দেখলেন তা স্বচক্ষে না দেখলে হয়ত বিশ্বাসই করতে পারতেন না,—দেখলেন, এক অলৌকিক রোমহর্ষণ ব্যাপার!—যে গৃহার মধ্যে জীর্ণ শবদেহের করোটি ও কঙ্কালগুলি জমায়েত হয়েছিল, তরই উপর দিয়ে একটি প্লগস্ট ছারামুর্তি ধীরপদক্ষেপে চলে যাচ্ছে গহবরের ভিতরের দিকে।

রাখবন ও আরও বারী ওখানে ছিলেন, তাঁরা দ্রুত ধর্মযাজক করে বাইরে অনলেন মিসেস রাখবনকে। সামান্য একবার কয়েক সেকেন্ডের জন্যে জ্ঞান ফিরলে, তিনি রাখবনের হাতটা শূন্য একবার মুখে ঠেকাবার চেষ্টা করেছিলেন মাত্র। তারপর সেখানেই সব শেষ হয়ে গিয়েছিল।

সেই ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে এরপর অধ্যাপক রাখবন সেখানেই রয়ে গিয়েছিলেন চিরকালের জন্য—স্বদেশে আর ফিরে আসেননি তিনি। ছেলেমেয়ে দুটি এখন অনেক বড় হয়েছে এবং দু'জনেরই বিবাহ হয়ে গেছে। আর এই কাহিনীর সত্যতা প্রমাণের জন্য গুয়ানাজুরাটোর সেই বাড়িতে বৃদ্ধ রাখবন সশরীরে, আজও বর্তমান আছেন এবং নিজেকে ভারতীয় বলে জারি করতে এতটুকু কুণ্ঠিত হন না।

নারীর যুগ-বদলবাহিত স্বীকৃতির বস
পূরার আজ উন্মুক্ত। বিংশ শতাব্দী নারী-
মুক্তির যুগ। নারীকে আপন ভাগ্য জন্ম করার
যে আহ্বান জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ আজ
তা সার্থক। মর্ষাদার যোগ্য আসনে তার
পুনর্গাভিষেক ঘটেছে। সুদূর অতীতে,
সভ্যতার প্রত্যয়ে সামগান মর্ষারিত ভারতের
তপোবনেও ছিল তার এই আসন। সেখানে
নারী ছিল পুরুষের সহচর, সর্বকর্মে উভয়ে
সমান অংশীদার। বেদের শ্লোক রচনার,
ঘাগবজ্ঞে এবং সামাজিক কর্মের বিস্তৃত
ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের প্রতিভা সমানে
নিয়োজিত হতো। গাঙ্গী, মৈত্রেয়ী, গৌতমী
প্রভৃতির নাম সেই মর্ষাদা ও কৃতিত্বের ইতি-
হাস বহন করে চলেছে।

এবার পুরাণকাহিনীর দিকে চোখ
ফেরাই। অসুরের অত্যাচারে দেবকুল
জর্জরিত এবং তাঁরা স্বর্গরাজ্য-বিহীন।
প্রয়োজন হয়ে পড়লো শক্তির। সবাই তিল
তিল করে রূপ দিলেন বাঞ্ছিত শক্তির—
উদ্ভব হলো আদ্যাশক্তি জননী দেবী
দুর্গার। অসুর পর্ষদস্ত হলো। কলুষমুক্ত
স্বর্গরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেন দেবতারা।
পুরাণগ্রন্থী এই কাহিনীতেও শক্তির
প্রতীকরূপে বন্দিত হয়েছিলেন নারী।
শব্দ পুরাণকাহিনী নয় 'আব' স্বহিরাও
হলেছেন, 'যশ নারী' পুজ্যেত, রমণ্যে তত
সর্ব দেবতা। নারীর প্রতি এই প্রম্ভার
স্বীকৃতিতে আমাদের অতীত ঐতিহ্য
উজ্জ্বল। কিন্তু তারপর কোথা দিয়ে কি হয়ে
গেল। কেউ টের পেল না। সামাজিকতার
শৃঙ্খলে নারী বাঁধা পড়লো। জাতির অগ্র-
গমনও বাহত হলো প্রচণ্ডভাবে।

ইতিমধ্যে ইতিহাসের অনেক পাতা
উল্টে গেছে। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আমরা
বখন ক্রান্তপ্রায়। তখন দিল্লীর সিংহাসনে
বসলেন সুলতানা রিজিয়া। নারীর ভাগা-
জরের নতুন ইংগিত স্পষ্ট হলো। দাস রাজ-



সিজার এবং ক্রিওপেট্রা

সিংহাসন নারী

প্রমীলা

বংশের সুলতান ইলতুতমিসের কন্যা রিজিয়া
পিতার মনোনীত উত্তরাধিকারী। কিন্তু
ইলতুতমিসের মৃত্যুর পর আর্মীর ওমরাহদের
বশ করে সিংহাসনে বসলেন রিজিয়ার
অকর্মণ্য ভ্রাতা রুকনুদ্দীন। রাজ্যে দেখা
দিল বিশৃঙ্খলা। কৌশলে ভ্রাতাকে সত্যি
শক্ত হাতে রাজ্যের রাশ ধরলেন রিজিয়া।
রাজ্যচালনার এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সমান তাঁর

প্রতিভা। দেশে শান্তি ফিরে এল। কিন্তু
কারেমী চক্র মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো—ধর্মের
ধুরা তুলে নারীর শাসনের বিরুদ্ধে তাবা
বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। বিদ্রোহের মোকা-
বিলায় এগিয়ে গেলেন রিজিয়া। ইতিমধ্যে
ভাগ্য তাঁর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়েছে।
অনিবার্য বিপর্ষয়ের মুখে দাঁড়িয়ে শেষ চেষ্টা
করলেন তিনি—বিয়ে করলেন এক বিদ্রোহী

নেতাকে। কিন্তু দুজনকেই বিদ্রোহীদের
হাতে প্রাণ হারাতে হয়।

নারীর আত্মপ্রকাশের প্রথম প্রয়াস
ভারতবর্ষে বাধা হয়ে গেল। ইতিপূর্বে
অবশ্য আফ্রিকা-ইউরোপে নারী নিজের
আসন নির্দিষ্ট করে নিয়েছে।

মিশরের আকাশে-বাতাসে সৌদীন গৃহ-
যুদ্ধের সংকেত। আলেকজান্দ্রিয়ায় ফাৰাও-
দের রাজপ্রাসাদে গভীর মন্তগায় রত
পরাক্রান্ত রোমক বীর জুলিয়াস সিজার।
এমন সময় সেখানে হাজির হলো এক গ্রীক
বাবসায়ী। সিজারকে উপহার দেওয়ার জন্য
নিয়ে এসেছে একটি কম্বল। ধীরে ধীরে
মলে ধরা হলো কম্বল। বোরিয়ে এলেন
অসামান্য সুন্দরী ক্রিওপেট্রা—গৃহযুদ্ধের
অন্যতম প্রতিস্বন্দ্বী। সবাই বিস্মিত—কারো
মুখে রা' নেই। রূপমন্ডল সিজার ক্রিওপেট্রার
পক্ষ নিলেন। গৃহযুদ্ধের অবসানে মিশরের
রাজ্যসনে বসলেন ক্রিওপেট্রা।

রূপেই তিনি জগত মাতিয়েছেন।
সিজার তাঁর বশীভূত ছিল এবং পরে মার্ক
অ্যান্টনি। এট দই ভুবনবন্দিত বীৰকে
নিজের আরণ্ডে এনে রোম-মিশর বিরাট

সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন এবং উভয়ের নিরাপত্তাকে করেছিলেন অজের। রূপের আড়ালে ক্রিওপেট্রার আর সব গুণ চাপা পড়ে গেছে। ল্যাটিন, হিব্রু, সিরীহসহ দশটি ভাষায় তিনি কথা বলতে পারতেন। এই বিদূষী রাণীর আমোদ-প্রমোদের কথা আজ আমাদের কাছে কাহিনীর মত শোনায়। শোনা যায়, একবার সুরার মধ্যে তিনি দেড় লক্ষ পাউন্ড মূল্যের একটা মৃত্তো ফেলে দেন। মৃত্তোটা আস্তে আস্তে গলে এলে তিনি সুরটুকু ফেলে দেন। রূপেগুণে অসাধারণ ক্রিওপেট্রার শেষজীবন অত্যন্ত বিষাদম্বল। মার্ক' আন্টনির সঙ্গে সামান্য ভুল বোঝাবুঝি বিরাট আকার ধারণ করে। পরিণতিতে দুজনকেই আত্মহতায় সাক্ষ্য দেয়। এভাবে, ঐতিহাসিক-কাহিনী 'ডটার অব দি সান' এবং 'সিস্টার অব দি মুন' রাণী ক্রিওপেট্রা শুধুমাত্র রূপের সৌরভ ছাড়িয়ে ইতিহাসকে রচনা করেন।

ইতিহাস অপ্রতিহত গতি। ইংলন্ডের সিংহাসনে বসলেন রাণী এলিজাবেথ। ক্রিওপেট্রার মতই এলিজাবেথের রাজ্যাসনের পথটি মোটেই প্রশস্ত ছিল না। রক্তাক্ত পথ ঘেয়েই তাকেও সিংহাসনের পথ উন্মুক্ত করে নিতে হয়েছে। একসঙ্গে অনেকের বিরুদ্ধে তাকে লড়াইয়ে নামতে হয়েছে। চক্রান্ত, প্রতি-চক্রান্ত এবং বিপ্লব, প্রতি-বিপ্লবে তাঁর রাজত্বের প্রথম ভাগ ছিল পরিপূর্ণ। সব প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজের রাজত্বকে তিনি সুদৃঢ় করেন। এলিজাবেথের রাজত্বকাল ইংলন্ডের সর্বাধিক

গৌরবের যুগ। ইংলন্ডের ইতিহাসে এই সময়ই নবজাগৃতি মাথা তুলে। শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্যে ইংলন্ড সারা বিশ্ব জুড়ির উদ্বেক করছে, স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক ও টমাস র্যালো সাত সমুদ্র অতিক্রম করে নতুন দেশ আবিষ্কারের নেশায় মত্ত। সাহিত্যে শেক্সপীয়র, মালো ও স্পেন্সার সজ্জা জাগিয়েছেন। ধর্ম ও গৌরবে ইংলন্ডের সৌভাগ্যসূর্য তখন মধ্যাহ্নগগনে। এলিজাবেথ ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন অসাধারণ-সাধারণ। আজীবন কুমারী এই রমণীর একমাত্র প্রিয় ছিল তাঁর স্বদেশ, যার স্বার্থে তিনি সবকিছুই করতে পারতেন। ইংলন্ড ওয়াক হার অনলি ল্যান্ডার' কথাটাকে তাই মানতে হয়।

স্পেনের প্রভাবশালী রাজা ক্যাস্টিল্লোর রাণী ইসাবেলা ইতিহাসে সমধিক প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন কলম্বাসের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে। এটা অবশ্য তাঁর জীবনের একটি গৌরবমণ্ডিত কীর্তি। কিন্তু স্পেনের ইতিহাসে তিনি অন্য কারণেও স্মরণীয়। দীপ্ত বুদ্ধি, চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং নিঃস্বার্থ স্বদেশপ্রেমিতেই তিনি ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে রয়েছেন। ধর্ম সম্পর্কে তাঁর গোড়ামি কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল এবং তাঁর ইহুদী নীতিও ঠিক সমর্থনযোগ্য ছিল না। ধর্মের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় নিষ্ঠার জন্য তাকে বলা হতো 'ক্যাথলিক' ধর্মের জীবন্ত প্রতিমূর্তি। ইসাবেলার শাসনে দেশে শিল্পকলার চর্চাও বৃদ্ধি পায়।

মৃত্যুশয্যা শুয়ে জাঁ আঁতানোয়েত বললেন, মাই লাইফ হাজ বিন এ ব্যাটল।

সত্যি সারা জীবন আঁতানোয়েতকে বৃদ্ধ করে কাটাতে হয়েছে। জেসুইটদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং সন্তবর্ষের বৃদ্ধ তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এছাড়াও ছোটখাট নানারকম সংঘাত এবং সংঘর্ষ—যার পরিণামে কিনা স্বামীর সঙ্গে মনো-মালিন্যের মেঘ ঘনিয়ে উঠেছিল। এই ঘটনার পর আঁতানোয়েতকে অবশ্য আর বেশিদিন বাঁচতে হয়নি। ইতিহাস বলে, আঁতানোয়েত মারা গেলে লুই একবার জানালায় দাঁড়িয়ে তাঁর কফিনটি দেখে-ছিলেন আর কিছু নয়।

আঁতানোয়েত সাধারণ রমণী। শিক্ষা-দীক্ষায় মার্জিত রচিত। ছিলেন রয়াল মিস্ট্রেস। ধীরে ধীরে পঞ্চদশ লুইকে কৃষ্ণগত করে তিনি হয়ে উঠলেন ফ্রান্সের সর্বোচ্চ। নামে মাত্র রাজা রইলেন পঞ্চদশ লুই—আসলে আঁতানোয়েত সব। মন্ত্রীর উত্থান-পতন ঘটে তাঁর নির্দেশে। চিরচরিত নিয়মকে দূরে ঠেলে তিনি নতুন নিয়ম প্রবর্তন করেন—নতুন নতুন দেশের সঙ্গে মিত্রতার বন্ধন্যার খুঁলে দিলেন। শিল্প-সাহিত্যে উৎসাহ দিলেন। ধর্মকেতুর মত আঁতানোয়েতের উদয় এবং তেমন পতন। তবে পতনের বেদনা তত গভীর নয়—এজন্য আঁতানোয়েতকে অপেক্ষা করতে হয়নি। মৃত্যু এসে তাকে রেহাই দিল।

বৃদ্ধ ইতিহাসে শাসক, সংস্কারক ও সংস্কৃতির ধারক হিসাবে ক্যাথারিন দি গ্রেট নিজেই একটি সম্পূর্ণ অধ্যায়। স্বামী তৃতীয় পিটারের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অকর্মণ্যতায় হতাশ হয়ে নিজেই রাজ্যের

ম্যারাইড
গুঁড়ো মিলো

উৎসবের
দিনগুলোকে
আরো সুস্বাদু
আরো মৌলিকীয় করে



দূর্ব্যবহারের সমস্ত জায়গায়
পাওয়া যায়

প্রকাশ গ্রামার্ম ৭৪/এ, নলিনী দেবী রোড, কলিকতা-৭



দাঁড়ি গ্রহণ করেন। তারপর রাশিয়ার ইতিহাসে শব্দ হয় এক নতুন ধর্ম। সাম্রাজ্যসীমা প্রসারিত হয় সমুদ্র ককসাগর পর্যন্ত এবং পোলান্ড ব্যবচ্ছেদে তিনি বিশেষ ভূমিকা নেন। দু'দবার তিনি তুরস্কের সঙ্গে যুদ্ধের দায়িত্ব বহন করেন এবং প্রতিবারই তাঁর ভূমিকা সফল।

রাজ্যভার গ্রহণ করেই শাসনসংস্কারে মনোনিবেশ করেছিলেন ক্যাথারিন। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করেন 'ইনস্ট্রাকশন'—নতুন সংস্কারের লিখিত নির্দেশ। তাঁর চিন্তা-ধারাকে ফ্রান্স 'বিশ্বব্যবস্থা' আখ্যা দিয়ে লিপিবদ্ধ করে। ভলভেরার, দিদেরোর সঙ্গে চুক্তিতে তাঁর নিয়মিত পত্রালাপ। পৃথিবীর নতুন চিন্তাধারার সঙ্গে দেশের লোকের সংযোগসাধনের জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন।

ক্যাথারিন ছিলেন জার্মান-দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু রুশ-প্রীতিতে তিনি যে কোন রাশিয়ানকে ছাড়িয়ে গেছেন। রুশ জাতি তাকে সম্মানিত করেছে 'দ্য গ্রেট' উপাধিতে ভূষিত করে। সাম্রাজ্যের স্বার্থে ব্যক্তি-জীবনকে তিনি তুচ্ছ করেছেন। পিটারের

যত্নের পরও তাই প্রেমাস্পদ ফ্রেগরী তালভকে বিয়ে করা হলো না। প্রেমের বেদনা বুকে নিয়েই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ভারতের ইতিহাসেও ইতিমধ্যে বীরোদ্ভাবের আবির্ভাব ঘটেছে। স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে ভারতসম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন গাঙ্গোয়ানার রাণী দুর্গাবতী এবং আহমদনগরের চাঁদ বিবি। ধর্মকে নিষিদ্ধ জেনেও পরাধীনতার শঙ্কল পরেন নি তারা। স্বাধীনতার সেই রঙাপিচ্ছিল পথ বেয়ে ইতিহাসের পাতায় এসে দাঁড়িয়েছেন কামিনীর রাণী লক্ষ্মীবাই—আজকের ইতিহাসে যার পরিচয় নিঃপ্রয়োজন। স্বাধীনতা রক্ষায় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তিনি প্রথম সশস্ত্র বিপ্লবের পথ বেছে নেন এবং ভারতের প্রথম স্বাধীনতাসংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন।

পৃথিবীর পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে আজ আবার শাসন-পরিচালনার রাজ্য ধরেছেন শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়কে, শ্রীমতী ফতিমা জিন্না এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। শ্রীমতী গান্ধী আমাদের প্রধানমন্ত্রী।

বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এই গুরুত্বপূর্ণ পদে তাঁর নিবাচন নিঃসন্দেহে বিশ্বের নারীজাতিক নতুন প্রেরণার উদ্ভূত করেছে। সিংহলের প্রাক্তন প্রধান-মন্ত্রী শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়কের অন্যতম কীর্তি হলো চীন-ভারত সীমান্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ। যদিও চীনের অনমনীয় মনোভাবের জন্য তা সফল হয়নি তবুও শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে তাঁর এই উদ্যোগ অবশ্য প্রশংসনীয়। পাকিস্তান প্রমুখ কারণে আজকের বোন শ্রীমতী ফতিমা জিন্না আয়ুবী শৈরচাকের বিরুদ্ধে পাকিস্তান প্রেসিডেন্ট নিবাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

এ সবই নতুন দিনের দিকচিহ্ন—নব-জাগৃতির নতুন পাঠ। ভাগ্যজয়ের নতুন দ্বার খুলে গেছে—স্বর্ণপ্রসূ সম্ভাবনা আজ নারীদের সম্মুখে। সে পথে চলার দায়িত্ব বহন করে এগিয়েও গেছেন অনেকে। এবার প্রয়োজন শব্দে চলার এই গতিতে বেগসঞ্চার। এ দায়িত্ব পালন করতে হ'ল বিশ্বের সমগ্র নারীসমাজের সঙ্গে আমাদেরও।

বাংলায় বুদ্ধজীবন

বেলা দে

বাংলা দেশ বারো মাসের তেরো পার্বণের দেশ। প্রাচীন যুগে সমাজ-জীবনের প্রধান অঙ্গ ছিল ধর্ম। দেবদেবীর পূজার মধ্যে দিয়ে মানুষ তার আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতো এবং বিশ্বাস করতো যে দেব-দেবীর সাহায্যেই তার সকল বাসনা পূর্ণ হবে। সেজন্য আজো আমাদের দেশে ধর্মের ব্যাপারগুলি প্রধান উৎসব হয়ে আছে।

ধর্ম সংক্রান্ত উৎসবের মধ্যে শারদোৎসব, সরস্বতী পূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালী পূজা, রথযাত্রা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মনে হয় প্রত্যেক পূজার বিভিন্ন যুগের ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে। যদিও এগুলি বাংলা দেশে আজো বর্তমান। কিন্তু প্রাচীন বাংলার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় তখনকার দৈনন্দিন জীবনে নানা রকমের উৎসবেরও আয়োজন ছিল। কয়েকটি উৎসবের উল্লেখ করা যেতে পারে। বৈশাখ মাসের শুক্লা চতুর্থীতে যব চতুর্থী উৎসব সম্পাদিত হতো। এ অনুষ্ঠানে একে অনের দেহে দুর্গাশক্তি ছাড় নিষ্ক্ষেপ করতো। এটি অবশ্য পশ্চিম ভারতেই বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। বহার প্রাচীন

বুদ্ধদিতে নবকিশলয় উদ্‌গত হলে নবপরিচয় উৎসব সম্পন্ন হতো। গ্রামের অধিবাসীরা বনভূমিতে সমবেত হয়ে নানি-প্রকার আহাদ-প্রমোদ করত। বুদ্ধরাজিগ সঙ্গে লতাগন্ধের বিকাক্ষ দেওয়া হতো। প্রাকণের শুক্লা চতুর্থীতে আলোল চতুর্থী উৎসব করার নিয়ম ছিল। এই সময় গৃহ-দেবতাকে দোলায় বাসিয়ে কলানো হতো। বর্তমানে এর পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণের কলানোয় অনুষ্ঠিত হয়। ভাদ্র মাসে ইকু পাকতে নুর্দ করলে ইকু ভাজিকা উৎসব করার রীতি ছিল।

বার্ষিক বাংলা দেশে যেমন উৎসবের ছড়াছড়ি তেমন আর কোথাও দেখা যায় না। বছরের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে একটির পর একটি ক্রম-বহু কত উৎসব—বিচিত্র আনন্দের কি অপূর্ব আয়োজন। বিভিন্ন ক্ষুদ্র প্রকৃতির মধ্যে যখন বিচিত্র পরিবর্তন দেখা যায়, বাঙালীও তখন ততোধিক বিচিত্র উৎসবের ডালি সাজিয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য অন্বেষণে জাপন করে। সকল ক্ষুদ্রতাই বাঙালী তার হৃদয়ের আনন্দরাস প্রয়োজনে রেখে জীবনময় গম্বুজ সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে উপভোগ করে।

বাঙালী বহুদিন ধরে বুদ্ধদেবের অনুষ্ঠান করে আসছেন। সমাজের নগ্নতার রাস্তাচারিতে দুর্গাপূজার সময় ধর্মীয় অধিবাসীরা নানা রকম উৎসব করত বলে উল্লেখ আছে। এই উৎসবগুলির নাম ও বিশদ বিবরণ এখনো জানা যায় নি। এ মধ্যে শব্দোৎসব সম্বন্ধে কালবিক্রম প্রমুখ কিছু উল্লেখ আছে। এ উৎসবটি বিশাখ-দশমীর দিন অনুষ্ঠিত হতো। যাত্রা এই উৎসবে শব্বের অভিনয় করতো তারা সমস্ত দেহে মাটি লেপন করে বৃক্ষপথে সজ্জিত হতো। শব্ব একটি অসত্য জাতিবিশেষ। এরা বাংলার বনেজগলে বাস করত। পাহাড়-পূর্বের ধর্মসম্প্রদে প্রাপ্ত প্রস্তুতকৃত বৃক্ষপথে সজ্জিত শব্বদের প্রতিকৃতি খোদিত পাওয়া যায়। এরা অভিনয়কারীসহ প্রতিকৃতিও হতে পারে। অশ্লীল গান ও অগভীরসহকারে নৃত্য না হলে উৎসব অঙ্গহীন হয়েছিল বলে পরিগণিত হতো। সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে, এই প্রকারের গান ও নৃত্য দেখলে বা শুনলে ভগবতী সুপ্রসন্ন হন। চর্যোদয় শতাব্দীতে বাংলা দেশে লিখিত বহুখণ্ড পুরাণে আছে যে, 'পরগোচরে অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করবে না মাতা, কন্যা ও শিষ্য শক্তিহীন দীকৃতা নয় তার কাছেও উচ্চারণ করবে না। কেবল আশ্বিন মাসে মহাপূজার দিন উচ্চারণ করবে। শব্ব দেবী ভগবতী শৃঙ্গার চম-প্রিয়, অতএব তাঁর প্রীতিার্থে তদীয় পূজা দিবসে শৃঙ্গার বাচক শব্দ উচ্চারণ করতে পারবে'।

আশ্বিনের পূর্ণিমা তিথিতে কোলা-গরী পূর্ণিমা উৎসব হতো। এর অপর নাম দ্যুতপূর্ণিমা। বর্তমান সময়ে এই রীতিতে বাংলার বারে ঘরে লক্ষ্মীপূজা হয়। প্রাচীন বাংলার এই উৎসবে সমস্ত গ্রাম দ্যুতপূর্ণিমা

ও দোলভাড়া করে কাটাতে হোত—বুত-ভাড়া করলে শ্রীবৃন্দ হয় বলে সকলের বিশ্বাস। এই সময় আত্মবিশ্বাস ও বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মিলিত হয়ে চিপটক খওয়ার রীতি ছিল। যদিও বর্তমানে এ উৎসব বাংলাদেশে বিশেষ পরিচিত।

কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে বন্ধুরা উৎসব হোত। এর অপর নাম সুখ-রাতি। বর্তমানে একে দীপালী উৎসব বলা হয়। বাংলা দেশে এই তিথিতে কালীপূজা হয়। দীপালী উৎসব পূর্বের মত বর্তমান-কালেও সমগ্র ভারতবর্ষেও অনুষ্ঠিত হয়।

মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের পঞ্চমী তিথিতে সুবন্দক উৎসব হোত। এর অপর নাম বন্দুতাংসব। এই উৎসবে নাচগানের বিশেষ ব্যবস্থা করা হোত। এই তিথিতে বাংলা দেশে সরস্বতী পূজা হয়। এটি বিদ্যার্থীদের বিশেষ প্রিয়—এই সময়ে আর একটি উৎসব ছিল অভূতপূর্ব। এই উৎসবে মটরশুটি, ছোলা প্রভৃতি আগুনে পুড়িয়ে বনভোজনে খাওয়া হোত। মৃগী-দাবাদ ও নদীয়া জেলার কোন কোন জায়গায় এখনো এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বসন্ত মাসগামে শ্যামলী বৃষ্টিফল ফলে ফুলে ভরে

উঠলে, শ্যামলী উৎসবের অনুষ্ঠান হোত। বালক ও বালিকেরা শ্যামলী পুষ্প সজ্জিত হয়ে চারদিকে ঘুরে ঘুরে নাচগান করতো। কাগদুনী পুর্ণিমায় হোলক বা হোলী উৎসব করা হোত। এটি জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলেরই প্রিয় ছিল। ছোট ছোট কাগজের ঠালির মধ্যে আঁবির ভরে মৃৎ বস্তুর পরস্পর পরস্পরের গায়ে ছুঁড়ে মারত। আমরা এখন বাক্যে কুমকুম বালি। বসন্ত কালে আর একটি উৎসব হোত সহকার ভজিকা। এর আর একটি নাম আর ভজিকা। উৎসবকারীরা আত্মপক্ষ কণ্ঠধ্বন-রূপে পরিধান করে, সবুজ ও অগস্ত আত্মকল গাছ থেকে তুলে এনে সকলে মিলে খেতো।

চৈত্র মাসের শুক্লা চতুর্থীতে মনোহরসব অনুষ্ঠিত হোত। এই উৎসবে মদন বৈকুণ্ঠ মূর্তি তৈরী করে পূজা করা হোত। নাচ-গান এ উৎসবের ছিল প্রধান অঙ্গ। চৈত্র মাসে শুক্লা অষ্টমীতে অশোকোত্তমসিকা উৎসব হোত। এই উৎসবে বৃক-বৃকভায়া অশোক ফুলের মূর্তি তৈরী করে মাথায় পরতো। বর্তমানে এই উৎসবের পরিবর্তে অশোকাস্তমী রত পালন করা হয়। চৈত্র

মাসের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব ছিল শিবরাসব। বৃহৎপন পুরাণে বলা হয়েছে যে, চৈত্র মাসে কি কঠিন, কি বৈশা, কি শ্রবণ সকলেই জিতেন্দ্রিয় হয়ে তিস্রাখ্যা স্নান ও রাত্রিকালে হবিষ্য ভোজন করবে। প্রাচীন-কালে বাঙালী অক্ষ, সতরুণ, দাবা, দশ-পদ প্রভৃতি খেলা করে বসে খেলতেন। বৃক অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েরা খেলনা, পুতুল প্রভৃতি নিয়ে খেলা করত। এ ছাড়া ছেলে-মেয়েরা বাড়ীর উঠানে ও মাঠে নান্ন গুচ্ছ খেলার আসর বসাতো।

এ ছাড়া মেয়েলী রত এবং নানা ধরনের ছোট-খাটো পূজাপার্বণের প্রচলন তো ছিলই আশে পাশে। যুগে যুগে প্রাচীন উৎসবের সঙ্গে নতুন উৎসব এসেছে, প্রাচীন উপাদানের সঙ্গে নতুন উপাদান মিলিত হয়ে অনেক উৎসব নবীন রূপ ধারণ করেছে। কালের বিবর্তনে অন্যান্য দেশের মত বাংলা দেশেও উৎসবের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। এখন নার্ব-জনীন বা বায়োমারী পূজার বেশী প্রচলন হয়েছে। তবে বেজাবেই হোক বাংলা দেশের উৎসব, পূজা-পার্বণ আজো সমানভাবেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

সেই-গুণে পূজার বাড়ী খাবার আগে শেষবারের মত ভো একবার আয়নার সামনে দাঁড়াবেনই, ঠিক সেই সময় নিজেকে একবার পুরুষের চোখ দিয়ে বাচাই করুন, দেখবেন আসল খুঁতটি ঠিক থরা পড়েছে। ভাবছেন হয়তো সেটা কিভাবে সম্ভব। কেন! অসম্ভব কিসে! আমরা কি জানি না তাঁরা কি ধরনের মেয়েদের পছন্দ করেন। যেমন ধরুন পছন্দ করেন না বিদ্যায় অহঙ্কার। অথচ বিদুষী হতে হবে। ভাবার ভাল-মানুষটির মত বোবা হয়ে থাকলে দুঃখান কিনতে হবে—তোতা। কথা বলতে হবে। তাঁর প্রশংসা আর নিজের অপারগতায় লাগু করে। অথচ সেটা ন্যাকারি হবে না। সাক্ষতে হবে এমন করে যাতে সেই সাক্ষতাই জাবার বাড়তি হয়ে তাঁদের চক্ষুপীড়া না খটায়। কিন্তু আমরা মেয়েরা কি শুধু পুরুষদের জন্যই সাজি। না। তাতো নর। ফুলের যেমন ফুটে তৃপ্তি, আমাদেরও ভেদমনি সাজবার একটা নিজস্ব আনন্দ আছে বৈকি। তবে ওরা হলেন যিয়ে পরমহংস—নীল থেকে কীর তুলতে জানেন, কিম্বা হয়ত র-চা-রাস। যার সঙ্গে দুখ মেলালেই সেটা কেমন দুখ বোকা যায়। খাঁটি হলোই চারের রং ভাল হয়। সুতরাং সেখানে রং ধরলেই বুঝতে হবে আপনার সাজটি যথার্থ হয়েছে। তাই এই প্রকৃত মনোভাষ্য দৃষ্টি দিয়ে নিজেকে বাচাই করলেই আপনার মারাত্মক খুঁত-গুলো নিখাত থরা পড়বে। মাসে লেখকরা নিজের লেখকেই যেমন করে পাঠকের দৃষ্টি-

খুঁতের
চোখে
নারী

জাভা পাকড়াশী

ভগ্নী দিয়ে বিচার করেন সেই রকম ত্রাখ নিয়ে দেখতে চলি আর কি।

তখনা নিজের মতের খুঁত বার করার আর একটি সহজ উপায় হচ্ছে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আগে কপালের ওপর হাত আড় করে রেখে অন্য হাতটি দিয়ে মূখের বাকি অংশ চাপা দিয়ে শুধু চোখ দুটি দেখুন। এবার দুটি হাতে এই পশ্চাৎ বজায় রেখে যথাক্রমে নাক তারপর চিবুক দেখুন। এবার সব চাপা দিয়ে শুধু কপালটি খুলে রেখে দেখুন। যার যেমন কপাল! ভগবান সবাইকেই কিছু নিখুঁত সুন্দরী করে পাঠান নি। কিন্তু

সেই খুঁতটুকু নিয়ে খুঁত খুঁত না করে যদি সেটা চাপা দিয়ে আমরা নিখুঁতের পর্বারো চলে যেতে পারি! সেটাই তো হল খোদার ওপর খোদাশিরি কিম্বা নিখুঁত কারিগর!

এভাবে পরীক্ষণ করে যার কপালটি ভাল বেরলো তিনি কপালকেই প্রাধান্য দিন। ছোট কপাল হলে হেয়ার ডু বদলান। তুলে চুল আঁটছে কপালে সুন্দর করে একটি ছোট টিপ আঁকুন। আবার যার ভুদু, দুটি সুন্দর তিনি আইরাউ পোলিলের সাহায্যে ভাতে ইলুধনুর আকার দিন। তবে মনে রাখবেন সব মূখে চওড়া চু বড় বৈশী যেমান। এবার আসুন চোখে। আরও চোখ হল মূখের আয়না। যার চোখ দুটি সুন্দর তিনি তো প্রায় সুন্দরীর পর্বারো। ঐ নয়ন দুটিতে এবার আরও নয়ন-মনোহর করে তুলুন। আগেই বলেছি কিন্তু যে, চড়া রংএ সব রঙ চটে যায়। কি সরকার ঐ নীল সবুজ ম্যাসাকারা থেকে ম্যাসাকার করার। তার চেয়ে দিশী প্রথার কাজল আর নবাবী সুমাই প্রের। সাক্ষতে করার আগে একবার হালকা সুমার টান দিন, তারপর সব শেষে আর একবার। চোখের ওপর পাতার একটু ভেসলিনের প্রলেপ দিয়ে বাড়তি পাউডারটুকু তুলে লিন। ইচ্ছে হলে খুব সুক্কর মেখার ওপর পাতার আর একটান সুমাই দিন। এইতো বেশ সুন্দর খজন নয়ন হল। আবার যার চোখ দুটি ভাল নয় বা গর্তে বলা, তিনি চোখের ওপর মোটে নকরই দেবেন না।

নাক নিয়ে নাকাল হবারও কোন কারণ নেই। যাদের নাক ছোট তাঁরা দুঃখ

রংএর পাউডার বেছে নিন। হালকা রংএর প্রলেপ দিন আগে সারা মুখে নরক, তারপর বোর রংটি সমস্ত মুখে মাখুন শুধু নাকটি ব্যত হবে। আর বেশী লম্বা নাকের জন্য ঠিক এর টুইটো প্রকরণ।

এবার নেমে আসুন ওষ্ঠে। নিখুঁত দুটি ফুলের পাণ্ডি ঠোঁট হয়ত আপনার নেই। কিন্তু বার মশত দুটি পরে ঠোঁট তিনি যদি আবার সেই সরসত্ব ঠোঁটটি ছিদ্রে লিপস্টিকের প্রলেপ দেন, তাহলে বে তারকার বদলে শ্রেষ্ঠ তাকুকা মনে হবে তাঁকে। সুসুভাষ হালকা রংএর লিপস্টিক-এর একটু অলগা ছোঁয়া দিন দুই ঠোঁটের মাঝ-খানটুকুতে। বেশ সর্দ দেখাবে ঠোঁট। আবার ভীষণ পাতলা, মূখের সঙ্গে যেমনমান, ঠোঁট হলে লিপস্টিকের প্রলেপ দিয়ে ঠোঁটের বর্ডার লাইন একটু বাড়িয়ে নিন। আর মূখের মধ্যে ঠোঁট দুটাই যদি খুব সুন্দর হয়, তাহলে চড়া রংএ লেটী স্মিটসে মূখের অন্য অববয়বগুলিকে অনারাসে ব্যাকগ্রাউন্ড ফেলে দিন। দেখবেন অনেক হাঁসত দুটিই তখন প্রমত্তের পাখার ভঙ্গ করে এসে এই বাম্‌ফলী পক্ষপাত্য ওষ্ঠে বসবে।

হাসের মৃত্যু চওড়া দিকে বড়, তাঁরা
চলেন সাহায্যে মৃত্যু সরে, কখন! আবার বাঁচ

অর্থ স্বয়ং সর্বদা, তিনি চুল তুলে 'সিঁকিলে
দিন।

বয়স, মূখের কাঁচ, গায়ের রং উচ্চতা
সবটা মিলিয়ে শাড়ী বাছবেন। ছাত্রী
আড়াই পেচি-এ যেমন বকরী জবাই হয়,
শাড়ীর আড়াই পাঁচি তেমনি পুরুষদের জন
জবাই হয়, এতো সর্বজনবিদিত। শাধু,
পরিধানের কায়দায় পরিবেশনের রকম-ফের।
নানা রংএর শাড়ীর দেখলতা ঘিরে যে
আড়াই-পেচি সঞ্জালন, তাতে যে মধুর
ছন্দ, এমন আর কোন পোশাকে নেই। পুতুয়া
পর দেহ ঘোরি মেহনতী বেশ। শাধু, সব
রংএ রং না মিলিয়ে নিজের রং অনুসারী
শাড়ী পরবেন। তবে উৎসবের দিনে কমলা,
জাম, ঘন সবুজ, মেঘনানীল, আগুন লাল
এমনি রং-গাফিলি বেশী হন টানে।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে দূরকম ভাষা ব্যবহার
করলে যেমন 'গুরু-চন্দ্র' দোষ হয়,
সত্যের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। এদিকে মাথার
মস্ত খোঁপা, গলা খালি, কিছু নাকে নাক-
জাবি, কোমরে চন্দ্রকাকালী আবার পায়ে
পায়ের। মানায় কি! তার চেয়ে সম্রাট রেখে
সাজুন। আরনাথ নিজেকে এইভাবে বিশেষায়ন
করলেই বৃদ্ধকে সাজটি কেমন হল।
আপনার চুলের ধরনে, শাড়ীর বংএ, মূবের
মেক-আপএ, অলংকারের ডিজাইনে একটি
নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আনুন। বেশ একটি
পরিচ্ছন্ন রুটির পরিচর ফুটে উঠবে আপনার
চলার-বসার, বেশে-বাসে। তখন নিজের মন
আর অন্যের চোখেও দেখবেন 'সেই রঙীন'
সত্যের বং ধরেছে। এই শব্দে আপনি প্রত্যক্ষ
স্বপনে কারুর অলঙ্কার পিনাসার কেশে হয়
আপনার এই কমনীয় সুন্দর কালিই ফুটবে
শান্তি আনবে।



କେନ୍ଦ୍ର

आचार्यगुरुदेव गणेशजी महाराज

विश्व
ॐ
कलिकाताः



“किंनर” एत चिह्ननी

আপনার চিঠির অমূল্য
মোহাব

विषय (आचार्य आशेष) लि: • कलिकाता-१

ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਲਪਾਰੰ..
ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੂਮਾ.. ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਭੁ..

জাগত হোমোজ জামি সেইসব নাম...চিত্তের
 মেঘের জিহ্বাপূর : ব্য-কৃষ্ণ, গুণি-কমার,
 ধোরাওরি, কলি-ব্রহ্ম, উত্তি ব্যক্তি, গজজোকর :
 মাথার পাখি, হাতে বজ্র, পদে বীর
 হোয়ার হুজুর বটাই বক : বনপাহাড়
 বেত-জামা-...-জামনির স্তম্ভ মস্তকনির বসি
 সেবার কুক রাম কীর বক কোরে ভীষ
 মুকি-রাজপুত : নীলা গুণি, নীল জাতি
 সবুজ গোপালি হও কইনি স : রাজস
 কলসের ব্যক্তি-ব্রহ্মসম, বেত গাছ, লোম
 খাম্বা, মুক্তার হাত, মণিকের আঁটি, কলি
 লপেত্র : গান্ধীর সে কি কানে টোপ, সে কি
 সূর্যমি কুক : বোকা মল-বদা সুকর হাত
 ধালি হাতের লেনকাক মুক্তার কুক, কোক
 গুড়মল লোমল কুক, পাকার কুক, নীলা
 আঁটি, হীরের টিক : সোনার জাতকল
 কলসের প্রণীপ, লোমলকলের কলোরা :
 কেন হুজুর কুক জাহ্নবীর হুজুর, কল
 যোনি জাহ্নবী কলসের সূর্যমলকল গান-
 কলসের হুজুর, চিত্রবল কলসের হুজুর
 নীলকল নীলকল নীলাকলসের হুজুর
 কলসের : জাহ্নবী কলসের, কলস
 ধামা বনকল কলস জাহ্নবী 'সে গান,
 কলস কলস' :





পারলৌকিক ত্যাগদেবী

তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী যখন তিন দিনের জ্বর তাকে ছেড়ে গেলেন তখন অঙ্কের অধ্যাপক বঙ্কুবাবু একেবারে ভেঙে পড়লেন।

ইতিপূর্বে তিনি স্ত্রী-স্বাধীনতার অত্যন্ত স্বপ্নে ছিলেন এবং নানা সভা-সমিতিতে স্ত্রী-স্বাধীনতার সমর্থনে তাঁর জরালময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন।

দর্শনের অধ্যাপক কালীকঙ্কর কয়াল ভয়াল ভাষায় তাকে দর্শনের চুলচেরা বিচার করে দেখালেন: স্বাধীনতা দিতে দিতেই স্ত্রীদের আত্মগণ্যতা কমে চিরতরে স্বাধীনতা দিয়ে গেছে। কোথাও বাধা-বন্ধন

রাখেন। জীবনে স্বাধীনতা, কর্মে স্বাধীনতা এবং সবশেষে মর্মে স্বাধীনতা দিয়ে সে বিশ্বপথে বন্ধনবিহীন হয়ে ছুটে চলেছে। সুতরাং হে অঙ্কের দিকপাল অধ্যাপক, তুমি ছাতাপালের মত নিবন্ধিতা করে শোকের গভীর পক্ষে নিমগ্ন হয়েছ। ঘর ভরে স্ত্রীদের ফটো টাংগিয়ে রাখো—অণুক্ষণ তাঁদের ধ্যান করো—মনে মনে স্বাধীনতার বিপক্ষে—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে পরলোকতত্ত্বে বিশ্বাসী বাংলার অধ্যাপক সংকর্ষণ ঘোষ বললেন: যদি পৃথিবীর মায়া কাটতে

না পেয়ে প্রেতরূপে রাতের অন্ধকারে বঙ্কুবাবুর বিছানার পাশে—

সমস্ত শরীরে শিহরন খেলে গেল বঙ্কুবাবুর। স্ত্রীর জন্যে নিশ্চয়ই শোক হয়েছে—কিন্তু তাই বলে একি অন্যায় কথা যে ভূত হয়ে ভয় দেখাবে। একে তো হাটের অবস্থা খারাপ; ফেল করলেই গেল— আর ফিরবে না। তার ওপর বঙ্কুবাবু দর্জনে বলে নমাভাবে স্ত্রীকে কষ্ট দিয়েছেন; রুটি দই বেলা নিদারুণ পেটের অসুখে—জলে পোকা, তা সত্ত্বেও কয়লা পুড়বে বলে জল ফোটাতে দেননি। কাপড়ের দাম সস্তা হবার আশায় দেব দেব করে কাপড় কিনে দিতেন না। ইলিশ মাছ চার টাকা করে কিলো শূনেও পেট খারাপ হবার ভয় দেখিয়ে স্ত্রীকে খেতে দেননি।— এখন ভূত হয়ে প্রতিহিংসা নেবার জন্যে যদি তার মন উগ্রীভ হয়ে ওঠে, তাহলে তো—

: আরে না-না। আমি স্বামী, তার দেবতা।—ইহকাল পরকাল—

: তাই তো পরকালের রাস্তায় ভেঁমাকে টানবে হে। একেই তো বলে জনম-মরণ কী সাথী—সংকর্ষণ ঘোষ কাব্য করে বললেন।

: হে-হে—হাসবার চেষ্টা করলেন বঙ্কুবাবু: কি যে বলা তুমি! যত সব বাজে কথা।—আমার স্ত্রী ছিলেন সত্যী-সাধনী—এমন চিন্তা তার মাথায় অন্যান্য বদ মেজাজের মহিলা প্রেতাখ্যা ছাড়া কেউ দিতে পারবে না। তাছাড়া আমি জানি তার একটা স্ট্রং পারসোনালিটি ছিল—মৃত্যুর পরও সে সেটা আশা করি মেনেটেন করে যাবে।

: তা যেতে পারে।—কিন্তু প্রাণের জন্যে কি ব্যবস্থা করছো?

: আমি বেশী খাওয়া-দাওয়ার পক্ষ-পাতী নই—

: তাতে যে পরিসা খরচ আছে। সংস্কৃতির অধ্যাপক মানসকুসুম চক্রবর্তী বললেন।

: না-না। ঠিক তা নয়। ওর আত্মার তৃপ্তির জন্যে আমি প্রাণবাসরে একটু দান-ধ্যান করতে চাই আর কি। একটু কাব্য পাঠ, তার পড়ার বড় ঝোঁক ছিল। আমি তাকে কখনও কলেজে যেতে দেইনি কো-এডুকেশন ছিল বলে। সে বাপের কাছ থেকে টাকা নিয়ে বই কিনে আলমারী ভরে রেখেছে। আমি সবই কলেজকে দান করবো।

: তা মন্দ নয়। তবে খাওয়া—

: তাও হবে—তবে একাজে আপনাদের পূর্ণ সহযোগিতা চাই। কাল রবিবার, কালই আমি সভার আয়োজন করবো। কলেজের প্রিন্সিপ্যালকেই সভাপতি করতে চাই। জানেন তো উনি আজ তিন বছর হলো সিনিয়র গ্রেড দেবার ব্যাপারে বাগড়া দিচ্ছেন। এই উপলক্ষে তাকেও তুষ্ট করা যাবে। আপনারা সবাই দয়া করে—

: নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই—আসবো বইকি।

অতর্কিত আমদের কলীগ—না এলে হয়।

বাড়ীর সামনে একটি পবিত্র গোচারণ ক্ষেত্র ছিল। তাকেই সংস্কার করে প্যান্ডাল টাঙান বঙ্কুবাবু। প্রথমদিকে সামনের কলাগাছ ঘট আমের পল্লব ইত্যাদি খাবার

কনো উপস্থিত গোমাতার দল পাত্তেল ঘেরাও করে ছিল। কিন্তু বন্ধুবান্ধব ডাম্পেল-ভাজা ছেলে পণ্ডা তাদের ওপর মন্দ লাঠি চালনা করে ছত্রভঙ্গ করে নিয়েছে। এবার আশা করা যায় সভার কাজ সুষ্ঠুভাবেই চলবে। প্রিন্সিপাল এসেছেন—এসেছেন গভীর বস্তির সব চাই-চাই মেম্বররা, পাড়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা, অনাহৃত বালকবৃন্দ এবং কৌতুহলী নেড়ী কুকুরের দল।

খুবই একটি অধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। সবাই সমবেত হয়েছেন, কীতনের ব্যবস্থা হয়েছে—তার মাথার গাইছে।

কিন্তু বন্ধুবান্ধবে এখনও দেখা যাচ্ছে না। সভার সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। সংকল্পবান্ধব একবার বাইরে আসছেন একবার ভেতরে যাচ্ছেন।

ওদিকে বন্ধুবান্ধব পাগলের মতো ছুটেছুটি করছেন—ভালো গরদের খুঁটি খানা এখনি বারান্দার ওপর রেখেছিলাম গেলা কোথায়? ঘর দরজা খোঁজাখুঁজি করছেন—এদিকে প্রিন্সিপাল বসে, কলেজের হোমরা-চোমরা গভীর বস্তির মেম্বররা বসে—বন্ধুবান্ধব যেন সামনের জিনিষ চোখে দেখছেন না দারভাস হয়ে।

সংকল্পবান্ধব বললেন: আপনি এখনি না এলে ওরা চলে যাবেন বলছেন—অগত্যা বিয়ের চৌলখানায় চোখে পড়লো। সেইটেই পরে নিলেন বন্ধুবান্ধব। সিনক তো—এর চেয়ে শৃঙ্খল আর কী আছে।

ঃ যা পরেছে বেশ—চাকরী আগে না কাপড় আসে? চাকরী থাকলে কত কাপড় হবে—মর্শনের অধ্যাপক কালীকঙ্করবান্ধব বললেন।

অগত্যা বিয়ের চৌলী আর গলায় মুরাফের মালা পরে যখন তিনি সভায় এলেন তখন (প্রিন্সিপাল বন্ধুবান্ধব দিকে তাকিয়ে যেন খাবি খেলেন।) প্রেসিডেন্ট বললেন : পর পর তিনটি শ্রীর মৃত্যুতে বোধহয় ওঁর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

ঃ আমারও তাই মনে হয়।

বন্ধুবান্ধব সভায় এসে সবাইকে কর-জোড়ে নিবেন করলেন : স্যার, কিছু মনে করবেন না, কাপড়টা বদলে—শ্রী নেই তো কে আর হাতে তুলে দেবে গাছিরে?

সঙ্গে সঙ্গে কীতনিয়ার দল তারুণ্যের গান ধরলো : অব্যয় ফিরে এসো হে—

ঃ উ-হু—, তাঁর কণ্ঠে মাথা নাড়লেন বন্ধুবান্ধব : কীতনিয়ার দিকে তাকিয়ে।

ঃ ওব অবশ্যই প্রাণ যায় বৃষ্টি—একবার ফিরে এসে হে—আরো তাঁর কণ্ঠে তারা বুরু ধরলো। সংকল্পবান্ধব ছুটে এলেন বন্ধুবান্ধব, একি—এমনি করে, সমবেতভাবে কিন্তু ডাকা উচিত নয়—যো জীবী অনলা-কথা যদি সত্যিই মায়া কাটাতে—

ঃ থামাও—থামাও—বন্ধুবান্ধব চিৎকার করে উঠলেন।

এখন বক্তৃতা হবে : স্যারের বক্তৃতা ধরবেন : কীতনি বন্ধ করো।

ঃ আমাদের কী দোর বাবু—দূর তো ভুল হয়নি।

ঃ ও সব নয়—কালীকঙ্করবান্ধব বললেন : গান পরে হবে, আগে বক্তৃতা হোক।

সংকল্পবান্ধব ছোট মেয়ে নেড়ী উদ্বেগন সংগীত গাইল। আজ তার গলাটা ভেঙ্গে গিয়েছিল : তবু মনে করো শেখের সেদিন ভয়ঙ্কর গানটা গাইল। সংকল্পবান্ধব তার বার প্রিন্সিপালের কানের কাছে গিয়ে বলতে লাগলেন : নেড়ীর গলাটা আজ একটু হয়ে হয়ে গেছে কিনা, নইলে ও গোবর-ডাঙ্গার কিল্লবান্ধব মার প্রাশ্নে গানটা গেয়ে মেডেল পেয়েছে।

গান হলো, এবার প্রিন্সিপালকে কিছু বলবার অনুরোধ করা হলো। মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। কিন্তু গ্রামের কলেজ—খুব পরোনোও নয়। লাইব্রেরীও তেমন ভালো নয়। যদি কিছু বই পাওয়া যায় মন্দ কি?—তাহাজা যেখানে গ্রামের লোকের চারিটি ওপর কলেজকে নির্ভর করতে হচ্ছে তখন পারসোনাল দান তো নিতেই হবে। কাজেই তিনি বললেন : আমি আর কী বলবো—ব্যাপারটা খুবই দুঃখের তবে দানবীর বন্ধুবান্ধব আমাদের লাইব্রেরীতে অনেক বই দেবেন বলেছেন। তাঁর সারা জীবনের সমুদয়—আমি এই সভায় ওঁর শ্রীর আদ্য কল্যাণ কামনা করি।

কম দন হাততালি পড়তে লাগলো। কীতনিয়া জলজল করে তাকাতে লাগলো বড়ো প্রেসিডেন্টের দিকে। মনে হলো যেন সে বড়ই হতাশ হয়েছে, প্রেসিডেন্টের অথবা তাঁর শ্রীর মৃত্যুতে কীতনের ভবিষ্যৎ আশা সমুদ্রে বিনষ্ট হওয়ার একেবারে দমে গেছে। একটা আসরে ভালো গাইলে পাঁচটা আসরে বায়না হয়—কী করা যায় অদৃষ্ট—



ঃ খাবার আন—খাবার আন। সংকল্পবান্ধব এক ছোকরার হাতে একটা থালাব ওপর কতগুলো আটার সিঁগাড়া নিয়ে সবার মুখের সামনে ধরতে লাগলেন : স্যার, যেকিঞ্চিৎ জলযোগ—চা আসছে।

শ্রীর অসুখের সমস্র করেকটা কলাই করা মগা কিনেছিলেন বন্ধুবান্ধব, তাও করেই ভেজা গড়ের চা এলো—তখন বেলা যারোটা—। সাতটা থেকে যারোটা পর্যন্ত এমনি করে বসে থেকে আর জলযোগের এই আরোজনে, মরিয়া হয়ে উঠলেন প্রিন্সিপাল—কই বন্ধুবান্ধব, বই?

ঃ এইবার আসছে স্যার—বলতে শুনতে একটা শোরানো আলমারী, চাদর নিয়ে ঢাকচ ঢাক কুলিতে খবর সভায় এনে হাজির করলো। কিছুই দেখা গেল না। তবে মনে হলো বইরে ঠাসা আছে।—এবার বকুন, একটা প্রসঙ্গ। হবার চেষ্টা করলেন তিনি। সভার একাধিক থেকে তখন গাঙগোলি শুরু হয়েছে। একটা তরুণ একটি কাগজ হাতে নিয়ে প্রিন্সিপালকে বলছে : স্যার, আমি একটি কবিতা পাঠ করতে চাই এই উপলক্ষে—।

ঃ বেশ পড়ুন—তবে এবারই সভা ভাঙা হবে।

হেলোটি গলা কাঁপিয়ে পড়তে লাগলো :—

‘মরিয়া’ তুমি আপন ‘গরাজে’
ধরণী হয়েছে গমস্ত
হায় হায় করে টাকে হাত দিয়ে
কানে তব প্রাণকান্ড
প্রফেসর দল করে কোলাহল—
প্রতিদেবী দল ফেল আঁখিজল
পাড়ার কুকুর যেউ যেউ রবে

কাঁপিয়েছে দিকপ্রান্ত

পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সভার প্রচণ্ড গোলমাল। গোটা চারেক গুরুত্ব লাঠি হাতে বন্ধুবান্ধব ছেলে পণ্ডা ভাড়া করেছে : তড়া খেয়ে পালাবার নোজা পথ সে সভার মধ্য-স্থলই বেছে নিচ্ছে। বন্ধুবান্ধব ক্রমশ ভেঙে পড়লেন : আমাদের গরদ অর্ধেকটা খেয়ে থাকী অর্ধেকটা নিয়ে ছুটেছে গরু—চাষ—হয় এমনি করে ঘরও প্রতিহিংসা নিল।

সভা পণ্ড হারোছিল কিন্তু কলেজের উদ্দেশ্যে দান যথাসময়ে বন্ধুবান্ধব ওলোকে পৌঁছে দিয়েছিলেন : সমুদ্রে প্রিন্সিপাল খলে দেখলেন তাতে পূর্ববর্তী শ্রীর জয়ানো এবং ছোকরের মূলে পড়া প্রাথমিক ভূগোল থেকে আরম্ভ করে প্রেমপত্র পর্যন্ত কিছুই বাদ পড়ে নি।

য়েগে গিয়ে ‘প্রিন্সিপাল বললেন, ক’ক’ : ‘একটা চিঠি ভিকটোরি করাই, টাইপ করুন। প্রফেসর বন্ধুবান্ধবী মন্ডল, এম-এ।’

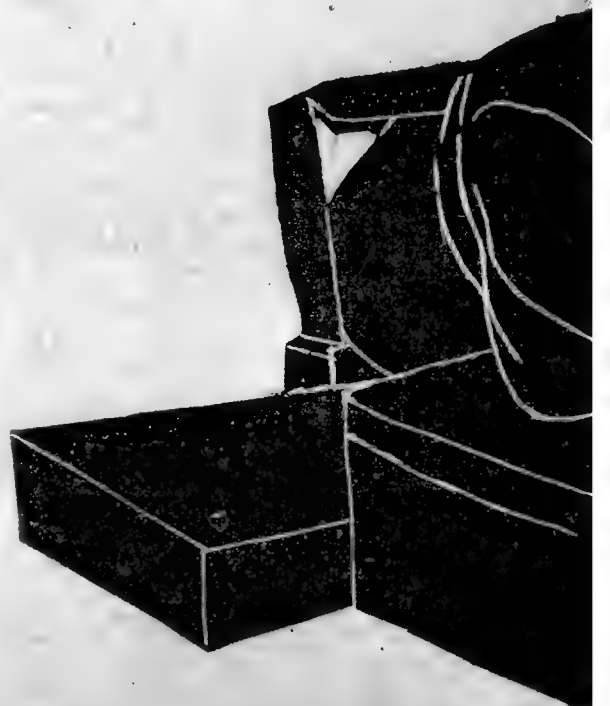
চিঠিটার সাবযায় : বন্ধুবান্ধব কীতনের কৃতজ্ঞ হয়ে কলেজ-কর্তৃপক্ষ তাঁকে এক আলমারী বই দান করলেন, বন্ধুবান্ধব যেন অদৃষ্ট করে কুলি ভাড়াটা মিটিয়ে দেন।

নাগ প্রফুল্ল বায়

(উ প ন্যা স)



বসে সেন্ট্রালে প্রীতির বখন সুরাটগামী ট্রেনটার
সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল তখন বিকেল। ফাল্গুন
অর্ধাৎ ষষ্ঠ ঋতুর বাতাসে সেই মৃদুতে নেশার ঘোর
লাগতে শুরু করেছে; রোদে লেগেছে গিনির রং। এই
ট্রেনটা না ধরে উপায় ছিল না। কেননা সুরাট মেল রাত
একটার ভূসাওয়ারল জংসনে পৌঁছবে; সেখান থেকে অমলের
এ গাড়িতে ওঠার কথা। টেলিগ্রাম করে সেইরকম ব্যবস্থা আগে
থেকেই করে রেখেছেন মোহিতকাকা। ভূসাওয়ারল জংসনে অমল যদি
সত্যি সত্যি আসে (মোহিতকাকা বখন টেলিগ্রাম করেছেন নিশ্চয়ই আসবে)
ভাবেন এই প্রথম তাকে দেখতে পাবে প্রীতি। সেজন্য হৃদপিণ্ডে সামান্য
দোলাটুকু লাগেনি, রক্ত বিন্দুমাত্র উচ্ছ্বাসিত হয়নি। প্রীতির প্রাণের ভেতরটা চাক
চাক বরফের মতন কঠিন শীতল উদাসীন কিছুর দিয়ে ঢাকা। জগতের কোন
ব্যাপারেই সেখানে তরঙ্গ ওঠে না। অথচ ললিতাকাকিমা আর মোহিতকাকার
কাছে দু-বছর ধরে অমলের কত গল্পই না সে শুনছে। কিন্তু অমলের
কথা এখন না, পরে। ফাস্ট আর সেকেন্ড ক্লাসের সব আসন
রিজার্ভ। অগত্যা তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কেটে সুরাট মেলের
দ্বারের এসে দাঁড়তে হয়েছিল প্রীতিদের। প্রীতিরা বলতে
মোহিতকাকার ললিতাকাকিমা, মোহিতকাকার বোন যুথিকা।
একটা ছোকরা চাকর আর প্রীতি নিজে। কিন্তু
ট্রেনের বাতীমাতেই মহাভারতের দুরোধন। বিনা
বস্বে এক কাচা জমি ছাড়তেও কেউ রাজী না।



কামরার কামরার খান্না দিয়ে প্রথমটা প্রীতিদের হতাশ হয়ে ফিরত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত প্রচুর ব্যাক এবং ততোধিক বাহুবলের বিনিময়ে একটা দরজা ইঞ্চিকয়েক ফাঁক করতে পেরেছিলেন মোহিতকাকা, এই ফাঁকটুকু পেয়েই তিনি ম্যাজিক দেখিয়ে দিয়েছেন। আগে নিজে চুকেছেন, তারপর একে একে প্রীতিদের ডুলেছেন। বাস, বাস্কেট, বিছানা, সোরাই কিছুই ফেলে আসেন নি। উঠেই সম্পূর্ণ থাকেন নি মোহিতকাকা, বসারও বন্দোবস্ত করে ফেলেছেন। জানালার ধার ঘেঁষে স্থগিকা আর প্রীতিকে বসিয়েছেন, মুনোমুখি একটা বোম্বিতে ললিতাকাকিমা আর নিজে বসেছেন। ছোকরা চাকরটাকে বাজের

মালপত্রের ভেতর গুজে দিয়েছেন। মোহিতকাকার বাক্স পঞ্চাশের সীমালেন্ড। ছ' ফুট দীর্ঘ মজবুত চেহারা, গায়ের রং টকটকে। তীক্ষ্ণ নাকের দু-পাশে সজাগ চোখ, লম্বাটে চিবুক। কয়েকটি চুলের রংবদল আর শরীরের রংবদলের কিছু ভার পড়া ছাড়া সময় তার ওপর আর কোন ছায়াই ফেলাতে পারে নি। বিস্তৃত কপাল যদি সাফল্যের প্রতীক হয় তা হলে বলতে হবে জীবনে তিনি সফল। সত্যিই সফল—কতী ব্যবসাদার মোহিতকাকা, মাসিক আর হাজার দশকের মতন।

ললিতাকাকিমা গত প্রাণে চুরাশিশের দেউড়িতে পা দিয়েছেন, সেই উপলক্ষে কলকাতার ঘোষপুর পাকের বাড়িতে ঘটা করে জন্মদিনের উৎসব পালন করা হয়েছে। মোটামোট ষসখসে সুখের শরীর। দিনরাত সোফার দশে উল বোন ছাড়া কাজ নেই। অর্থাৎ বিনা কাজের দিন-রাপনের ফল হয়েছে এই; দেহে ইতিমধ্যেই প্রচুর চর্বি জমিয়ে ফেলেছেন। একদা রূপসীই ছিলেন; সৌন্দর্যের রেখাগুলি চর্বির তলায় ঢাকা পড়ে গেছে।



১৯৩৮

মোহিতকাকার লালতাকাকিয়ার জেলেপুলে নেই। মোহিত-
কাকার একমাত্র যোন যুথিকা। গারের রূপ পাকা ধানের উপমা।
বব-করা লালচে-তুল, নীলাভ চোখ, তীক্ষ্ণ চিবুক, নিটোল রক্তাভ
হাত। নখ এবং ঠোঁট রক্তবর্ণে রঞ্জিত, আই-প্রো পেন্সিলে নিখুঁত
করে তুলে, অঁকা। প্রসাধনীর ব্যবহার তার মোটামুটি বুদ্ধিশোভন।
সব মিলিয়ে তাকে বিদেশিনী মনে হয়। তবে রাজকুমার মাপ দ্রুত
বেতাবে সংকীর্ণ হতে শুরু করেছে, শাঙ্কিটা হেভাবে স্বচ্ছ, তাতে
শঙ্কিত হবার কারণ আছে।

মোহিতকাকার বাড়িতে বিদেশী অনেক বকমের ম্যাগাজিন
আসে, তাতে টপলেস বিকিনি ড্রেসের ছবি দেখেছে প্রীতি। ঐ বকম
পোশাক কলকাতার চাল, হলে যুথিকাই খুব সম্ভব তা পরে প্রথম
রাস্তায় বেরবে। তার কাজ হল ঘন্টার ঘন্টার শাড়ি বদলানো আর
টুঙ্গীতরের চাকার ঝড় তুলে কলকাতার দূরন্ত যুথীর মতন ছুটে
বেড়ানো। টমবর। সুখী সম্ভল সংসারের আদুরে মেয়ে। খেয়ালের
ঠিকঠিকানা নেই, যখন যা খুশি করছে, যেখানে ইচ্ছে যাচ্ছে। ঘন্টা
একমুঠো রঙীন বাত্পের মতন আকারবিহীন, দু বছর খরে বি-এ
পরীক্ষা দিয়ে আসছে, পাশটা আর করে ওঠা হচ্ছে না। সেজন্য
বিশ্বদ্রোহ দৃষ্টিভঙ্গি বা আক্ষেপ আছে এমন মনে হবার কারণ নেই।

আর প্রীতি নিজ? সে কালো মেয়ে, কাবা করে বড়জোর
পাখাঙ্গী বলা যেতে পারে। হাত-পা-নাক-মুখ, কোন কিছুতেই
চমৎকারিষ নেই। তার যা কিছু মনোহারিত ঘনপালকে ঘেরা দুটি বড়
বড় চোখেই থাকতে পারত, কিন্তু সে দুটি ছায়াছন্ন। সর্বকণ গাড়
গভীর এক বিষাদ প্রনীতিকে ঘিরে আছে।

জগতে প্রীতির কেউ নেই, বাপ-মা-ভাই-বোন কেউ না।
মোহিতকাকা তার নিজের কাকা নন, গ্রাম-সম্পর্কে কাকা। তাঁর সঙ্গে
কোনরকম শোণিতবন্ধন নেই। ওঁদের সংসারে নিভান্তই আশ্রিত
সে। প্রীতির কথা এখন না, পরে বিস্তৃতভাবে তা বলতে হবে।

বাই হোক দাঁড়তে উঠেই চে'চারেট শব্দ করে গিরোহিলেন
লালতাকাকিমা, 'ওরে বাবো, এ কোন অশ্বকুপে এনে তুললো। দম
আটকে আমি মরে যাব।'

যুথিকাও নাকে কামা জুড়েছিল, 'গদী নেই, এয়ারকন্ডিশনিং
নেই। অল্পত একট ফ্যানও যদি থাকত। তার ওপর এত লোক—
বিজিবি, মোরো'—বলতে বলতে চোখ কুচকে গিরোহিল।

মোহিতকাকা বলোছিলেন, 'ফান' ক্রাসে গদী-এয়ারকন্ডিশনিং
থাকবে কোথেকে? তার ঐ দ্যাখ ফ্যান ছিল, কারা খুলে নিয়ে গেছে।
চিরকাল তো হয় ফস্ট না হয় এয়ারকন্ডিশনিং কোচে বুরোহিস।
একবারটা না হয় একটু কন্ট করলি। আর জানিস তো কন্ট না করলে
কন্ট—বলতে বলতে থমকে গিরোহিলেন মোহিতকাকা, খুব সম্ভব
ছোটবোনের সঙ্গে কাজলামির সীমারেখাটা ইঠাং তাঁর মনে
পড়ে থাকবে।

লালতাকাকিমা বলোছিলেন, 'তোমার বাপু ফস্ট ক্রাস
রিজার্ভ করা উচিত ছিল। এত কন্ট আর গরমে—'

বাধা দিয়ে 'মোহিতকাকা বলোছিলেন, 'ফস্ট ক্রাস রিজার্ভ'
কমতে গেলে বোম্বাউতে আরো দশটা দিন বসে থাকতে হত। সুব্রাট
মোলের সব সীট দশ দিনের জন্যে বুকড। ওদিকে হিজ হাইনেস
অমলচন্দ্র—যখন তেঁতার স্বাদার ছুটি নিয়ে তুসাওরালে প্রহর গুনছে।
দশদিন ছুটি নষ্ট হলে আমাদের সঙ্গে স্মারকা-টারকার যেতে
পারত সে?'

লালতাকাকিমা এবার চুপ করে গেছেন, কিন্তু যুথিকার
নাকিসূঁজের কামা সহজে থামতে চাননি।

সুব্রাট মেল জুড়েছিল সপ্তাহের ধানিক আগে। তারপর একটার
পর একটা স্টেশন পৌঁছনে ফেলে পশ্চিম ভারতের কঠিন মাটির
ওপর দিয়ে টেনটা উদ্‌ঘাটনে চলে গেল। 'সংসার' কেতে লম্বা
পারে নেমে এসেছে রাস্তা। আকাশে চন্দনের পাটার মতন ফোলা

একটি চাঁদ উঠেছে। রাস্তাটাও এক জারগার বমকে বাকেনি, বিভিন্ন
কাঁটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার বরেনও ভ্রমণ বেড়ে যাচ্ছিল।

এখন প্রায় এগারোটা বাজে। এরই মধ্যে বাগীনের চুলুনি
শব্দ হয়ে গেছে। লালতাকাকিমা ঘন ঘন হাই তুলছেন। যুথিকার
চোখ বুজে আসছে, মোহিতকাকারও চুলুনি ভাব।

লালতাকাকিমা বললেন, 'আমি বাপু আর চোখ মেলে
রাখতে পারছি না'—বলেই সামান্য সংকীর্ণ জায়গাটুকুতে মথ্য
কাত করলেন।

'আমারও হুড ঘুম পাচ্ছে' যুথিকাও শোবার ব্যবস্থা
করে নিল।

'আমিও যে জেগে থাকতে পারছি না রে—' আরও ঘুম-
জড়িত চোখে কোনরকমে তাকিয়ে মোহিতকাকা বললেন, 'কিন্তু
সবাই ঘুমুলে কি করে হবে? অমল তো কামরায় কামরায়
ডাকাডাকি করে বেড়াবে। সাড়া না পেলে ভাববে এ টেনে আমরা
আসি নি। একজন কারো জেগে থাকা দরকার। আমি জাগব সে
শর্ত নেই, চোখ একবারেই ভেঙে আসছে।'

জড়ানো ডুবন্ত সুরে লালতাকাকিমা আর যুথিকা বলল,
'আমারও—আমারও—'

মোহিতকাকা বললেন, 'ভারি বিপদে পড়া গেল তো।'
বলতে বলতে ইঠাং তাঁর দুটি এসে পড়ল প্রীতির ওপর। সঙ্গে
সঙ্গে সমস্যাটার সমাধান যেন হাতের মঠের পেয়ে গেলেন।
বললেন, 'এই মেয়ে, তুই তো খুব রাত জাগতে পারিস। সেবার
আমরা অসুখের সময় পর পর সাত রাত জেগেছিলাম—'

প্রীতি কিছ্ বলল না, মৃদু হাসল।

মোহিতকাকা আবার বললেন, 'তোকে একটা কাজ করতে
হবে। দেখাও তো আমরা সব কেমন একেবারে ঘুমকাতুরে। তুই
মা একটু জেগে থাকবি। তুনাওয়াল জংশনে ট্রেন থামলে অমল
আমাদের ডাকবে। ডাকলেই আমাকে তুলে দিবি। পারবি তো?'

খুব আন্তে প্রীতি বলল, 'পারব।'

'তুলে যাস না আবার, তা হলে এত ঘুরে ছুটে আসাই
সার হবে।'

'আপনি ভাববেন না।'

সন্মুখে প্রীতির মাথায় একটা টোকা দিয়ে চোখ বুজে
হোন্ডায়েল মাথা রাখলেন মোহিতকাকা, নিমেষে চেতনার শেষ
অন্তরীপটিও নিমজ্জিত হয়ে গেল তাঁর।

প্রীতি হাড়া, এ কামরায় এখন আর কেউ জেগে নেই।
ট্রেনের মোলানিতে তারও চোখ জুড়ে আসতে চাইছিল কিন্তু
উপায় নেই। মোহিতকাকা বিরাট দায়িত্ব দিয়েছেন, তা পালনের
জন্য বিনাধমে তাকে নিশিবাগন করতে হবে।

লক্ষ্যহীন অলস চোখে একবার চারদিকে তাকাল প্রীতি।
তৃতীয় শ্রেণীর এই কামরাটাকে এখন যুথিকার মনে হচ্ছে। বাস্তব,
বিছানা, ট্রাক, স্টেকেশ, বড়ি-হোন্ডায়েল—নানান জাতের লটবহর
বস্ত্রপত্র স্তূপীকৃত। তাদের ফাঁকে মানুষ, সে মানুষও বিচিত্র।
ভারত প্রজাতন্ত্রে যতগুলি প্রদেশ আছে তাদের কেউ সুব্রাট মেলের
এই কামরাটিতে প্রতিনিধি পাঠাতে ভুল করে নি। তাই দেখা যাচ্ছে
বিপুলো সিম্বি রাইজারটির পিঠে টেলান দিয়ে কেরলীয় ভদ্রলোকটি
পরিপাটি নিদ্রা নিচ্ছেন। পাঞ্জাবকেশরীর গা বেঁধে কীল যোগ-
সন্তানটি শোভা পাচ্ছেন। অদ্ভুত সহানুভূতি, সত্যিকার লোকসভা
দিগ্বীতে না; খুব সম্ভব ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর কামরাগুলোতে।

এখন সবাই ঘুমছে। মিহি-মোটো শানারকমের নাসিকা-
বাদনে বিচিত্র কমসার্ট বেজে চলেছে।

কিছুক্ষণ কামরার দৃশ্য দেখে আর দৃশ্যে আড়াইশো
নাকের ডাক শব্দে কাটিয়ে দিল প্রীতি। আন্তে আন্তে তার দুটি
দিয়ে পড়ল মোহিতকাকার পাশে পড়ে থাকা ওয়েস্টার্ন রেলের
টাইম-টেবলটার ওপর। একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বইটা তুলে নিল
প্রীতি। সময় কাটাবার পক্ষে এটা অব্যর্থ যুথিকাবাদ। উদাস

হাঙলে বাড়া ওঠাতে লাগল সে; এই তারতম্যে কত স্টেশনই না অর্ধে আর কি বিচিত্র তাদের সব নাম।

ওঠাতে ওঠতে এক জায়গায় প্রাণিতর চোখ আটকে গেল।

সূর্যট মেলের গতিবিধির খবর এখানে লেখা আছে।

বুসসার-বিলম্বিত-নভসারি-উধনা পর পর স্টেশনগুলোয় নাম পড়তে লাগল প্রাণিত। হঠাৎ তার মনে পড়ল, খানিক আগে ট্রেনটা উধনায় থেমেছিল। উধনার পর আর মাথ দূটো স্টেশন; তারপরেই ভূসাওয়াল জংসন।

একটা দশে সূর্যট মেল ভূসাওয়াল পৌঁছেবে; মাথ পাঁচ মিনিটের জন্য গতি-ভঙ্গ। তারপর আবার ছোট্টা শুরু। এখন রাতের আয়ু কত? এদিক সৈনিক ডাকতেই প্রাণিত দেখতে গেল, হাঙকার ঘাড়তে কাটার কাটা বারোটা বেজেছে।

আর মাথ এক ঘণ্টা দশ মিনিট। ভূসাওয়াল জংসনে অমলের ডাক কানে এলেই মোহিতকাকাকে ডেকে নেবে প্রাণিত; তারপর বাকি রাতটুকু সে ঘুমাবে।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে কৌতুক বোধ করল প্রাণিত; গদীবিহীন শীতাপনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থারাজিত খার্ড ক্রাসের ঠাসঠাসি ভিড়ে অসহ্য গরমে জনতার সঙ্গে একাকার হয়ে সুখী স্বচ্ছল পরিতৃপ্ত মোহিতকাকার কেন চলেছেন সে কথা ভেবে একটু মজা।

অমল হচ্ছে ললিতাকাকিমার ভাই। দু-বছর ধরে ললিতা-কাকিমার মুখে প্রাণিত শনে আসছে, এমন ছেলে হয় না। মোহিত-কাকাও উচ্ছ্বাসিত হয়ে তরত সায় দিয়েছেন। স্কুল-কলেজ কিংবা ইউনিভার্সিটি-কোন পরীক্ষাতেই নাকি সেকেন্ড হারনি অমল। ছাত্রজীবন তার অসাধারণ উজ্জ্বল। ললিতাকাকিমার কাছে অমলের ফোটো নেই; মুখে মুখে নিজের ভাইয়ের যে বর্ণনা তিনি নিয়েছেন, যে কাউকে মুগ্ধ বিস্মিত এবং চমকিত করার পক্ষে তা যথেষ্ট। কিন্তু মুগ্ধ বিস্মিত কিছাই হয়নি প্রাণিত; মুগ্ধ হবার মতন মনের গঠনই নয় তার। প্রাণিতর বৃকের ভেতর আবেগের নদীগুলি কবেই শুকিয়ে গেছে। দু-বছর ধরে শুলেও অমল সম্বন্ধে বিস্ময়প্রসূ কৌতূহল বোধ করেনি সে। কোন ব্যাপারেই কৌতূহল বোধ করে না প্রাণিত; তাকে ঘিরে মেরুপ্রদেশের জমাট কঠিন শীতল উদাসীনতা।

ললিতাকাকিমা বলেছেন, ইউনিভার্সিটি থেকে বেরবার পরই ব্যাংক বিরাট চাকরি নিয়ে ভূসাওয়াল এসেছে অমল; সাত বছর ওখানেই আছে। অমলের স্বভাব নাকি অনেকটা উদ্ভিদের মতন। যেখানেই যায় ভালপালা মেলে শেকড় ছাড়িয়ে বসে; সহজে নড়তে চায় না। সাত বছরে ছুটিছাটা তো কম পার নি কিন্তু দু-দিনের জন্য যে কলকাতায় ঘুরে আসবে সেটা আর হয়ে ওঠেনি। ললিতা-কাকিমা মোহিতকাকা চিঠি লিখে লিখে ক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। আর সাত বছর ধরে প্রতি চিঠির উত্তরে অমল লিখেছে, এবার যাব—এবার যাব।

ললিতাকাকিমা মোহিতকাকার এত ঘন ঘন চিঠি লেখার নেপথ্যে স্বার্থের একটু ছোঁয়া আছে। তাঁদের ইচ্ছে অমলের সঙ্গে হাঙকার বিয়ে দেবে। তাইদে দিয়ে দিয়েও যখন অমলকে কলকাতায় আনতে পারলেন না তখন সিদ্ধান্ত করলেন নিজেরাই অমলের কাছে থাকবেন। আঁসি আঁসি করেও মোহিতকাকার ব্যবসার খামেলায় কমান কেটে গেছে। তারপর দিন দশেক আগে ব্যবসার দুর্ভাবনা এক পাশে ফেলে রেখে সবাইকে নিয়ে বোম্বাই মেলে উঠেছিলেন। রথ দেখা কলা বেচার মতন অমলের কাছে হাওয়াটা তো আছেই; ঘাউ হিসেবে বোম্বাই শহরটাও দেখে নিয়েছেন।

কলকাতা থেকে অমলকে টেলিগ্রাম করে দিন পনের ছুটি নিতে লিখেছেন মোহিতকাকা। বোম্বাই এসে আরেকটা টেলিগ্রাম করেছিলেন; অমল যেন আজকের সূর্যট মেল ধরবার জন্য স্টেশনে আসে; একটু খোঁজ করে তাদের বাক করে নেয়।

ভূসাওয়াল থেকে অমলকে তুলে নিয়ে মোহিতকাকার সূর্যট, স্বাক্ষর, গির আর ভেরাবল রাখেন। উদ্দেশ্য : এই ঘোরাঘুরির কাকে

হাঙকা আর অমলকে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ দেওয়া। সাত বছর আগে অমল অবশ্য হাঙকাকে দেখেই; হাঙকা তখন কিশোরী। তাই বিয়ের প্রশ্ন ছিল না।

কতকণ নিজের ভাবনার ভেতর ডুবে ছিল, মনে নেই। খেয়াল হতেই প্রাণিত টের পেল, গাফির গতি স্তিমিত হয়ে আসছে। চমকে ঘাড়ের দিকে তাকাল সে; একটা পাঁচ। আর পাঁচ মিনিট পরেই ভূসাওয়াল জংসন।

অতীর্কিতে আরেকটা ব্যাপার মনে হতে সামান্য চমক লাগল প্রাণিতর। যার জন্য এত আয়োজন, বাঙলা দেশ থেকে কয়েক শ' মাইল পাড়ি দিয়ে এত দূরে ছুটে আসা, হাঙকার কিন্তু সে ব্যাপারে দুর্ভাবনা বা ব্যগ্রতা নেই। পরম নিশ্চিন্তে পরিতৃপ্ত মিটোল ঘুমের ভেতর সে অচেতন হয়ে আছে আর প্রাণিত কিনা সমস্ত অন্তরকে ছুঁতে মতন তীক্ষ্ণ উদ্বেগ করে অমলের জন্য জেগে বসে রয়েছে। কৃতজ্ঞতা, নিছক কৃতজ্ঞতা। মোহিতকাকার আশ্রয় দিয়েছেন; তার বদলে রাত জাগা তো সামান্য কথা, ও'রা বললে আগুনও বাঁপ দিতে পারে প্রাণিত।

দেখতে দেখতে ট্রেনটা স্টেশনে এসে থামল। বাগীনের চোঁচামোচি, বাস্তবতা শুরু হয়ে গেল। বাইবে কুলীনের চিব্বাকর শোনা যাচ্ছে, 'ভূসাওয়াল-ভূসাওয়াল-ভূসাওয়াল—'

সমস্ত ইন্দ্রিয় কানের ভেতর এনে জানালার বাইরে মুগ্ধ বাড়িয়ে দিল প্রাণিত। 'প্ল্যাটফর্মে ফ্লুরেসেন্ট আলোর টল নেমেছে। তার তলায় যাত্রীরা, ভেঁড়াররা, কুলীরা ছোটোছোটো করছে। তাদের কামরা থেকেও কেউ কেউ নামল, কেউ কেউ উঠল।

কোন দিকে লক্ষ্য নেই প্রাণিতর। দুর্ভাবিত প্ল্যাটফর্মের দিকে নিম্নলিখিত তাকিয়ে আছে সে; অসংখ্য যাত্রীর ভেতর কে অমল কে তাকে বলে দেবে।

মুহূর্তগুলো ঘোড়ার পিঠে উঠে লাফিয়ে লাফিয়ে কোঁররে যাচ্ছে। কিন্তু কই, কেউ তো এ কামরার জানালার মুগ্ধ বাড়ির মোহিতকাকা, হাঙকা অথবা ললিতাকাকিমাকে ডাকছে না। ভবে কি—তবে কি অমল আসে নি?

দু'বার ঘণ্টা পড়ে গেছে। তৃতীয় ঘণ্টার মধ্যে সঙ্গে গাড়ের হুইসল শোনা যাবে; ট্রেনও নতুন উদ্যমে ছুটতে শুরু করবে।

তৃতীয় ঘণ্টাটা পড়তে যাবে সেই সময় দেখা গেল একটি সুপুরুষ তরুণ উৎকণ্ঠিতের মতন কামরার কামরার ঊর্ধ্ব দিচ্ছে আর ডাকছে, 'মোহিতবাবু—মোহিতবাবু—'

নিশ্চয়ই অমল। মোহিতকাকা চোখ বোজার আগে বলে-ছিলেন, অমলের ডাক শোনামাত্র যেন তাকে জানিয়ে নেওয়া হয়। প্রাণিত আশেত করে হাককা দিয়ে ডাকতে লাগল, 'কাকু-কাকু' কিন্তু ঘুম ভাঙার কোন লক্ষণই দেখা গেল না বরং নাসিকা-বাদন আরো প্রবল হয়ে উঠল।

এদিকে তবণটি এসে এ কামরার ডাকডাকি শুরু করছে। মোহিতকাকাকে আগন্তু গেল যে সময়টুকু নম্র হবে ততক্ষণ তবণটি অপেক্ষা করবে না; জানালার ফ্রেম থেকে তার মুগ্ধ সরে পাশের কামরায় ঢাল যাবে।

একটু ইতস্তত করল প্রাণিত। তারপর সব বিশ্বাস দু-হাতে সরিয়ে যুবকটির দিকে তাকাল। ইহং কাঁপা গলায় বলল, 'আপনি অমলবাবু?'

যুবকটি অবাক। বাঙলাদেশ থেকে এত দূরে সূর্যটগামী ট্রেনের কামরায় শুচেনা এক যাত্রিনীর মুখে নিজের নাম শনে সে বিমূঢ় হয়ে গেছে। ব্যাপারটা অত্যাশ্চর্য, অকল্পনীয়ও। সেই 'ব' কারা যেন খাড়ি পেতে ভূ-ভারতের সব খবর বলে দিতে পারত মেয়েটি কি ভেতর কোন হাদুবিদ্যা জানে?

প্রাণিত খানিক অধৈর্যের সুরে এবার বলল, 'আপনি অমলবাবু তো?'

অশ্রুত মাথ, নাড়ল অমল, বিস্ময় তার প্রায় শীর্ষিকান্তে পৌঁছেছে।

এই সময় হুতীর ঘণ্টা শোন গেল। সেই সঙ্গে গাড়ির বর্শ। পরমুহুর্তেই ইঞ্জিনের হুইসল বেজে উঠল—সুইচট মেলের দীর্ঘ শব্দের একটা বিশাল সরসপের মতন জ্বলন্ত আবেগে চমকে শব্দ করল।

প্রীতি প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'উঠে পড়ুন—শিগুগির উঠে পড়ুন—'

বিশ্রান্তের মতন অমল বলল, 'কিন্তু—' অমলের মনোভাবটা বুঝতে পারল প্রীতি। মুখমুখে বলল, 'মোহিতবাবুকে জান' জো? তিনি এ কামরাতেই আছেন। বসছেন। আর বের করবেন না; গাড়ির শব্দ বেড়ে যাচ্ছে; এরপর উঠতে পারবেন না।'

ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে হাটছিল অমল। আর কিছু বলল না সে; প্রায় সম্মোহের ঘোরে হ্যাঁড়ল ধরে ওপরে উঠে এল। প্রীতির বুকির তেতর থেকে অব্যবহাসিত জ্বলন্ত অশ্রুত বেরিয়ে গেল; সহজভাবে এবার শ্বাস নিতে পারল সে।

কামরার তেতর অসুতই মোহিতবাবুদের দেখতে গেল অমল। অবশ্য বুঝে সে প্রীতিকে বলল, 'মোহিতবাবু, কামরার জায়গাবু হন। এই ট্রেনে—'

কথা দিয়ে প্রীতি বলল, 'আমি আপনার পরিচয় জানি।'

'কিন্তু, আপনার পরিচয়টা আমার ক'ম নেই।'

অমল উদাসীন সুরে প্রীতি বলল, 'তোমার মতন পরিচয় তোমার নেই।'

মেয়েটি কে, মোহিতবাবুদের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী, পরিচয়ই বা দিতে চাইছে না কেন—কে বলবে। বিষয়ের মতন একটুকুশ তাকিয়ে রইল অমল। তারপর হৃদয়ত মোহিতবাবুর ওপর বগীর মতন চানচান গিল; থাকাকা দিতে দিতে জোরে জোরে ডাকতে লাগল, 'জামাইবাবু—জামাইবাবু—'

প্রীতি জ্বলা করল, মোহিতবাবুকে ধাক্কা দিতে উঠে বসলেন। যম তেত্রেই অমলকে জামনে পাড়িয়ে থাকতে দেখে যুগ্মতে তার হৃদয়চোখ আলো হয়ে উঠল। বলতভাবে বললেন, 'এসে তা হলো।'

'না, আমার জন্যে টেলিগ্রাম করেছিলেন নাকি?' বুকুে মোহিতবাবুর পা ছুঁয়ে প্রণাম করল অমল।

এদিকে চেঁচামেঁচি করে হুলস্থূল; কান্ড বাধিরে হাথকা আর ললিতাকাকিমার গুরু ভাঙিয়ে ফেললেন, মোহিতবাবু। 'দ্যাখো দ্যাখো কে এসেছে।'

অমল এবার ললিতাকাকিমাকে প্রণাম করল। তার চিবুকে আঙুল ঠেকিয়ে চুমু খেলেন ললিতাকাকিমা। স্নেহে বললেন, 'কতদিন পর ডেকে দেখলাম ছোটো; কি মেগা হয়ে গেছিস।'

দুই বসে প্রীতি জানতে পারল অমলের আসরের নাম হোটেল। অমল বলল, 'আমি মেগা হাছি আর তুই কিন্তু হাতী হয়ে উঠেছিস সের্গাদ।'

ললিতাকাকিমা হেসে ফেললেন, 'যা বলেছিস ভাই, দিন দিন ফুলাহি।'

মোহিতবাবু চুপ করে বসে ছিলেন না। সুইচটের ওপর হোল্ডজল চাপিয়ে।

অমলের বসবার ব্যবস্থা করতে করতে মন্তব্য করলেন, 'তবেই বুকে দেখে রাসার তোমার বোনটিকে কেনন সুখে রেখেছি।'

স্বামীর উদ্দেশ্যে প্রচণ্ড করলেন ললিতাকাকিমা, 'সুখে একবারে মরে বাই। ললিতাকাকিমার কটাক এবং কথাগুলো যে সুখেরই অন্য নাম, বুঝতে অসুবিধা হয় না।'

বসার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ। মোহিতবাবু ডাকলেন, 'বোমো। হে অমলচন্দর, তোমার জন্যে কেনন চমৎকার সিংহাসন তৈরি করে দিয়েছি, দ্যাখো।'

তখন বলল, 'কিন্তু ললিতাকাকিমার হাতা থেকে মুক্তি পেল না। এতকাল পর ভাইকে পেয়ে তিনি উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠেছেন। কলকাতার যার না কেন, এখানে কিভাবে থাকে, জমা বাঙালী টাঙালী ভূসাত্ত্বালে আছে কিনা, খাওয়া-নাওয়ার অনিয়ম করে কিনা—ইত্যাদি ইত্যাদি হাজার প্রশ্ন করতে লাগলেন। সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না; একটার জবাব দিতে না দিতে খড়ের মতন নতুন প্রশ্ন এসে যাচ্ছে।'

মাকান থেকে মোহিতবাবুকে বলে উঠলেন, 'তোমরা দু'জাইবোনেই শব্দ বন্ধক করবেন নাকি? আর আমরা বোমো হয়ে থাকব? আমাদের দিকে একটু-আখটু কৃপাবর্ণন কর।'

অমল হেসে তাকাল।

মোহিতবাবুকে বললেন, 'তারপর অমল, হেসে আমায়ও খুঁজে বার করতে তোমার অসুবিধে হয়েছিল।'

'আ একটু হয়েছিল বৈকি। আমি তো প্রথমে কান্ট গ্রাস কম্পার্টমেন্টগুলোতে খোঁজ করছি; সেখানে আপনার পাভা নেই। ডেবেছিলাম, হসত এ ট্রেনে আসেন নি। বুঝে ঘুরে শেষ পর্যন্ত এই খাড গ্রাসে আপনার আবিষ্কার করলাম।'

কান্ট গ্রাসে কেন আসতে পারেন নি সংক্ষেপে তার কারণ জানালেন মোহিতবাবু।

অমল বলল, 'আপনার খোঁজার সময় একটা অরি মজার ব্যাপার হয়েছে জামাইবাবু—' বলে হাসতে লাগল সে।

'কী?'

'কামরার কামরার যথ বাড়িয়ে জামাইবাবু জামাইবাবু' বলে ডাকছিলেন। এ দিকে প্রত্যেক কামরার দ-চারজন করে বাঙালী ছিল। তারা সাড়া দিতে লাগল। ভাবলাম এতগুলো ডরমহাউসের হাতে তো আমার বোনটাকে তুলে দিই নি।'

'আর সর্বনাশ; এ কি শোনালে শালিকচন্দর!' বেম মাথায় বাজ ডেকে পড়েছে এমন সুরে মোহিতবাবুকে বললেন, 'সবটা না বিশটা না, শিবরাত্রির সন্ধ্যা এ তো একটা মোটে আমার বউ। এই বড়ো কলসে তার এতগুলো ভাগিদার জড়িয়ে কেনলে রাসার।'

কপট রাসে যথ বাকালেন ললিতাকাকিমা, 'যত বরেন হচ্ছে ইয়ারকি তত বাড়ছে; যথ কিছু আটকান না।'

সবই হেসে উঠল। এমন কি যে প্রীতি সবসময় বিবাহরতী ছাড়াই শীতল

নিরুদ্ভূত সেও সামান্য একটু না হেসে পারল না।

হাসির উচ্ছ্বাস কিছু স্তিমিত হলে অমল বলল, 'তারপর ব্যাপারটা কি ঘটবে তো জামাইবাবু; ব্যবসাপত্রের সব গুড়িতে ফেলছেন নাকি?'

'হঠাৎ এ প্রশ্ন?'

'কিন্তু কালে তো কলকাতার ফরাটি স্কোয়ার মাইলের বাইরে পা বাঙালি নি; ব্যবসা ছাড়া আর কিছু জানতেন না। এবার কি এমন ঘটল যাতে লম্বা পাড়ি জমিয়েছেন? তা-ও দু-দশ বছর জন্যে নয়, বেশ কিছুদিনের ব্যাপার বলেই মনে হচ্ছে।'

প্রশ্নটা আপাতত এড়িয়ে গিয়ে মোহিতবাবুকে ডাড়াডাড়া বলে উঠলেন, 'এ দ্যাখো আমিই শব্দ; কথা বলছি, শব্দের সঙ্গেই এখন পর্যন্ত তোমার আলাপটা করিয়ে দেওয়া হয় নি।'

অমল ঈর্ষ চকিত হল, 'শব্দি মানে শব্দি। কোথায়?'

মোহিতবাবুকে কি বলতে বাজিলেন তার আগে শব্দিবাই বলে উঠল, 'আপনি তো কালের জিনিস দেখতে পান না। পঞ্চাশ কিলোগ্রাম ওয়েট পাঁচ কুট তিন ইঞ্চি হাইটের জলজাত মানবদা সামনে বসে আছি আর আপনি বলছেন কোথায়।'

দু-চেখে অসীম বিস্ময় নিয়ে অমল বলল, 'কি আশ্চর্য! তোমাকে তো চিনতেই পারি নি; ডেবেছিলাম কে না কে। সাত বছর আগে দেখেছিলাম, তখন কত ছোট ছুঁমি। এখন একেবারে জেঁদ হয়ে উঠেছে। চিনতে পারা সহজ নাকি!'

'আপনাকে কিছু দেখেই চিনতে পেরেছি; সাত বছর আগের মতনই আছেন। একটুও বদলান নি।'

'হ্যাঁ! হাসতে হাসতে তখন বলল, 'আমি চিরকাল প্রমারের সেই অখর পদটি হয়েই আছি। যোগ-বিয়োগ কিছু নেই।'

শব্দি হাসল। ললিতাকাকিমা মোহিতবাবুকে হাসলেন।

অমল আবার বলল, 'পড়াশোনা নিশ্চয়ই করছ?'

নথ বুটেতে বুটেতে ঠোঁট ছুঁতলো করে খাড়া কাত করল শব্দি।

মোহিতবাবু ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিলেন, 'পড়াশোনা আর কি। কলকাতার বড়োটা ছুঁয়ে আছে, এই পর্যন্ত। দু বছর ধরে বি এ পরীক্ষা দিচ্ছে, পাশ টাশ করার বোধহয় উচ্ছে নেই।'

খাড়া বাকিয়ে চোখের একটি ভাঁজ করল শব্দি। তারপর নাকিসুরে কান্না দিয়ে বলল, 'দাদা! অর্ধাৎ লেখাপড়ার কথা আপাতত মূলত্ববী থাক।'

মোহিতবাবু, 'কিন্তু কলতে বাজিলেন, অতীকটে কি বেন মনে পড়ে গেল অমলের। বলতভাবে বলল, 'সবায় সঙ্গে সঙ্গে-টল করছি কিছু টান চুপ কেন? ও'র সঙ্গে তো পরিচয় করিয়ে দিলেন না জামাইবাবু—' প্রীতিকে দেখিয়ে দিল সে।

এতকম নিজের অস্তিত্ব প্রায় বিস্মৃত করে বসে পড়ল প্রীতি। সকলের সামনে

থাকলেও সবসময় তার ভূমিকা অপেক্ষা-চ্যবণীয়, এই তার স্বভাব। এমনভাবে সাময়িক মতন নিজেকে গুটিয়ে সে আত্ম-গোপন করে থাকে যে তার উপস্থিতি টের পাওয়া যায় না। নিজেকে 'মুছে দেবার ভেতরেই বসে' তার বত জ্ঞানলব্ধ। তার সামনে বত কথাই হোক—বত উদ্ভ্রম, বত পরিহাস, বত কোতুকের খেলা—কিছুই প্রীতির ওপর ছায়া ফেলে না, লগ কাটে না। এতটুকু প্রতিভা অন্বেষণ করে না সে।

আজ অবশ্য স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজ করেছে প্রীতি, মোহিতকাকা আর অমলের চড়া-ডারে বাঁধা রসিকতা শুনে একটু আগে হরত অজ্ঞাতে অর্থমনস্কতার মধ্যে নিঃশব্দে হেসেছে।

মাই হোক অমলের শেষ কথাগুলোতে চমক লাগল কি? চাক চাক বরফের মতন ভারী নিশ্চল বিষয়ে প্রীতির মনের ওপর-দিকটা সর্বক্ষণ ঢাকা, তার উল্লস কোথাও সামান্য ঢেউ উঠল কিনা প্রীতি বুঝতে পারল না।

এক সময় মোহিতকাকার গলা ভেসে এসে, 'ওর নাম প্রীতি।' অমল সম্মুখে প্রীতিকে বললেন, 'আর এ কে তা তো জানিসই।'

আগেই মাথা নাড়ল প্রীতি, অর্থৎ জানে বৈকি।

অমল বলল, 'নামটা জানা গেল কিন্তু ওটা তো গোটা পরিচয় না।'

খানিক ইতস্তত করে মোহিতকাকা বললেন, 'সম্পর্কে ও আমার ভাই-সে—'

মোহিতকাকার মস্তকের তুলনা নেই। সবাই যখন বিমূর্খ, সব দৃষ্টির যখন বন্ধ—সেই সময় একমাত্র তিনিই হাত বাড়িয়ে কাছে টেনেছেন। অমলের কাছে প্রীতি হাতে অস্বাভাব্য বোধ না করে, কুণ্ঠিত হয়ে না পড়ে সেইজন্য এইমাত্র জিজ্ঞাসা বললেন; আসলে তার সঙ্গে প্রীতির কোন সম্পর্কই নেই। এক গ্রামে বাড়ি, এই পর্যন্ত।

অমলের কোতুক সীমাহীন। সে বলল, 'সাত বছর আগে যখন কলকাতায় ছিলাম আপনার বাড়ি কতবার গেছি কিন্তু একে তো কোলকাতা বোঝিনি।'

'ও তখন আমার কাছে থাকত না।'

'কোথায় থাকতেন?'

'বেশে—মানে ইস্টবেগানে।'

'পাকিস্তানে?'

'হ্যাঁ—' আগেই করে মাথা নেড়ে ঈর্ষ বাঁধত মূর্খ মোহিতকাকা বললেন, 'মেরেটা ভারি মজা।'

অমলের গলায় প্রতিধ্বনি শোনা গেল, 'মজা!'

'হ্যাঁ।'

'কি রকম?'

কোতুক বন্ধে বলতে গিয়ে হঠাৎ থামলেন মোহিতকাকা, 'ও সব কথা এখন থাক, পরে শুনো।'

এদিকে শব্দ প্রায় আটকে আসামি প্রীতির বৃকের ভেতর মেঘাচ্ছা দিলেন



পূজা আসছে

কেনাকাটার এইতো সময় !

নতুন নক্সা • নতুন ষ্টাইল-নানা রঙের বাহারে সজ্জা

বাংলার অভুলনীর তাঁতবস্ত্র

তক্তুজ

কিনে খুশি হবেন।

বাংলার সকল সুখ্যাতি তাঁতকেন্দ্রে প্রস্তুত

ধুতি • লুঙ্গী • শাড়ি • বেডকভার
সার্টের কাপড় • ইত্যাদি

॥ সকলের রুচি ও সুরতি অনুযায়ী তক্তুজ পাবেন ॥

আপনার কাছাকাছি বিক্রেতকল্প থেকে সহজমত কেনাকাটা করুন
কলিকাতা: ২৩, গড়িয়াহাট রোড, পোল পার্ক (শ্রী-তাপ মিত্রব্রিত্ত)

৪০, বাগবাড়ার স্ট্রিট • ২০০/৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট (বিধান সরণী) •
১২২/১এ, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট (বিধান সরণী) • ১২২/১এ, আচার্য প্রফুল্ল
চন্দ্র রোড • ২১, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড • ৮০ ডা: সুব্রত
সরকার রোড • ১৬১, বেলবাটী মেন রোড • ২০৮, বতাবাড়ার
স্ট্রিট • ১২৮, হাজরা রোড • পি-৪৪২, ব্লক 'এন', নিউ আলিপুর।
২৪ পরগনা: কলোনি ক্রিশি, বাগাসত • জাহ্নবী হারবার।
হুগলী: জি. টি. রোড, শ্রীমতলা, শ্রীরামপুর • বাজবলহাট,
হুগলী • নেতাজী সুভাষ রোড, তারকেশ্বর। নবীকা: সুভাগড়,
শান্তিপুর। বর্ধমান: ৪২/১, জি. টি. রোড (টাউন হল) বর্ধমান •
৩৪২, জি. টি. রোড, আসানসোল। বাকুড়া: ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিয়ন
বিজিৎ, মাদারতলা, বাকুড়া। মেদিনীপুর: শিবাজী,
মেদিনীপুর • এন. টি. ই ১৬৬, গোলবাড়ার, বঙ্গাপুর। পশ্চিম
মিমাকপুর: টেশন রোড, ব্রায়গড়। কলগাইতি: নাচোট
স্ট্রিট, কলগাইতি।

॥ ছুটাও পাওয়া যায় ॥

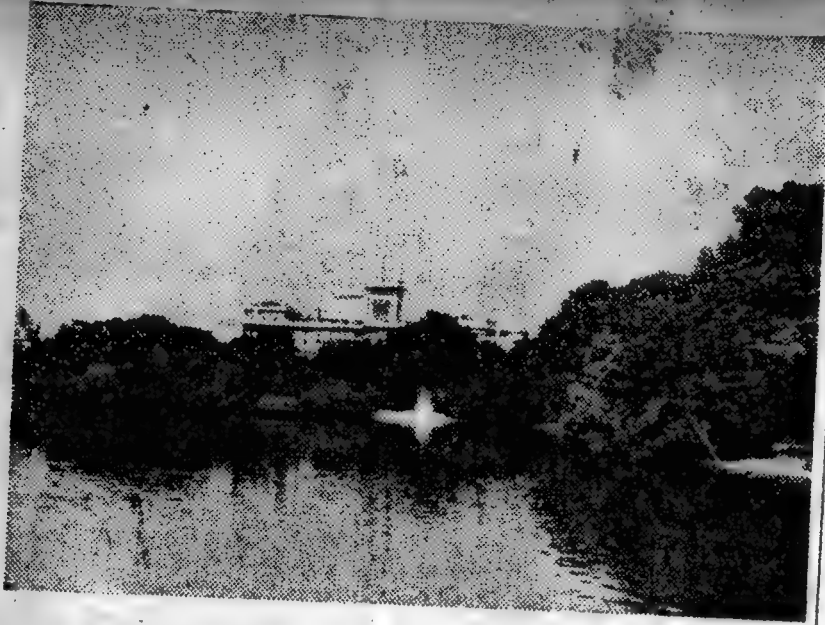
সেন্ট্রাল সেন্ট্রাল ডিপো:

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হ্যাণ্ডল্ড উইভার্স

কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড

৬৭, ব্রতীদাস টেম্পল স্ট্রিট, কলিকাতা-৭ • ফোন: ৩৫-৩৬৫৮





ফটো : গণেশ উকিল

মতন অত্যন্ত ভারী কণ্টকর কিছু একটা অনুভব করছিল সে।

আর কোন প্রশ্ন না করে অমল প্রীতির বিকে তাকাল। তার চোখ দুটি কোমল, ঘনীভূত শিশিরের মতন সহানুভূতিতে সিত। মোহিতকাকা মুখে 'দুঃখী' শব্দটা শুনেনি খুব সম্ভব তার মন সমবেদনার ভরে গেছে। অমল হরত সেই জাতের মানুষ, আবেগের প্রোভে ভেসে বেতে সব-কক্ষ যে উদ্মুখ। আনন্দ-বিবাদ-উচ্ছ্বাস—যে কোন একটা ঢেউ হাতের কাছে পৌঁছেই হল, চোখ-কান বুজে বোধ হয় তক্ষ্মান তাতে আপ দিয়ে পড়ে।

কিন্তু 'দুঃখী' শব্দটার শক্তি কতটুকু? প্রীতির যা দুঃখ, তাকে ঘিরে যে অসীম অব্যক্ত রহস্য—এ দুর্বল ঝঞ্ঝারহীন সাদা-মাঠা শব্দটা দিয়ে তার কতটুকু বোঝানো যায়? প্রীতির অন্তরীণ দুঃখের কতটুকু অংশ মাগা যায় ওটা দিয়ে? মোহিতকাকা যদি সব কথা বলে বলতেন—

প্রীতির ভাবনা সম্পূর্ণ হবার আগে অমলের গলা শোনা গেল, 'প্রীতিদেবীর জন্যে এই কম্পার্টমেন্টটা খুঁজে বার করতে পেরেছি। আমি তো হনো হয়ে এ কাম-রায় সে কামরায় আপনাদের ডাকাডাকি করে বেড়াচ্ছিলাম, উনিই আমাকে ডেকে তুলেছেন।'

মোহিতকাকা বললেন, 'হ্যাঁ, ওকে তোমার জন্যে জেগে থাকতে বলেছিলাম।'

'ওকে জেগে থাকতে বলে নিজেয়া ঘুম লাগাচ্ছিলেন! বাঃ, বেশ তো—'

অমলের গলায় হালকা সুরই বাজছে তবু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল প্রীতি। মোহিতকাকার আশ্রয়দাতা, তার প্রতি ওঁদের কর্মণা অসীম। সে আপ সামান্য রাত জাগায় শেষ হয় না।

ওদিকে মোহিতকাকা অপ্রস্তুত। বললেন, 'আমার বডু ঘুম পাচ্ছিল। তাই—'

অমল বলল, 'আপনার না হয় ঘুম পাচ্ছিল কিন্তু সেজাদি? যুথি?'

আরমণটা একেবারে সরাসরি। অতএব আত্মরক্ষা করা পরকার। বিরতমুখে ভাড়া-তাড় ললিতাকাকিমা বললেন, 'তুই তো জানিসই ভাই ছেলেবেলা থেকে আমি কেমন ঘুমকাতুরে। ট্রেনে উঠলে তো কথাই নেই, দু'লুনি লাগল তো আমারও দু'লুনি শব্দ হল।'

যুথিকার মৃৎচোখের চেহারা দেখে করুণাই হয়। যে মেয়ে কয়েক শ মাইল পাড়ি দিয়ে এতদূরে স্বরস্বরা হতে এসেছে সে কিনা ভাবী বরের জন্য কয়েকটা ঘণ্টা জেগে থাকতে পারল না! আদুরে জেদী উদ্দাম বেপারেরা যুথিকা কোনরকমে বলতে পারল, 'প্রীতিই তো বললে জেগে থাকবে। ও খুব রাত জাগতে পারে।'

'আর তুমি খুব ঘুমেতে, না?'

সবাই হেসে উঠল।

হাসাহাসির ভেতরেও প্রীতি লক্ষ করল, মোহিতকাকা ললিতাকাকিয়ার মুখে চাঁকিতের জন্য ছায়া পড়েই মিলিয়ে গেল। আর চোখ নামিয়ে নখ খুঁটে লাগল যুথিকা।

অমল আবার বলল, 'এ রকম রিস্ক নেওয়া উচিত হয়নি। প্রীতিদেবী আমাকে সেনেন না, আগে কোনদিন দ্যাখেনও নি। আমি যদি না ডেকে কামরায় কামরায় উঠি দিয়ে চলে যেতাম কেমন হত বলুন তো?' কেউ উত্তর দিলেন না।

খানিক চুপচাপ। তারপর অমলই নীরবতা ভেঙে এক সময় ডেকে উঠল, 'জামাইবাবু—'

আবহাওয়ারটা লম্বা করার জন্য হালকা গলায় মোহিতকাকা সাড়া দিলেন, 'বলে ফেল হে শালাবাবু—'

'তখন তো সে কথাটার জবাব দিলেন না।'

এ 'কেন'টার?'

'হঠাৎ এমন কেনে সেনেন কেন?'
'কেনে গেলার!'

নরতো কী। ব্যবসা-পত্তর ছে কলকাতা ছেড়ে পাক্স আরব বেদুইন কু বোরিয়ে পড়েছেন। ফল্ট ক্লাস কি এয়ার কন্ডিশান্ড কোডের পরোয়া করেন নি থাড ক্লাস থাড ক্লাসই সই। তার ওপ-আমাকে জোর এডেনা পাঠিয়েছেন স্টেশটে হাঞ্জিরা দিতে। আমার জন্যে রাত জেগে যিনি। কস 'ছিলেন, ডাকা মাত্রই তিনি গাড়িতে তুলে ফেলেছেন, কোন কথা বলায় সুযোগ দান নি। এদিকে—'

'কী?'

'টিকিট কাটি নি, বিনা টিকিটে—'

বাধা দিয়ে মোহিতকাকা বললেন, 'বিনা টিকিটে হবে কেন, দম্ভুরমত তোমার টিকিট কাটা হয়ে গেছে।' পকেট থেকে টিকিট বার করে দেখালেন মোহিতকাকা, 'ইন্ডিয়ান রেলওয়েজকে ফাঁকি দেবার বিন্দু-মাত্র ইচ্ছে আমার নেই।'

একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সবিস্ময়ে অমল বলল, 'বম্বে থেকে কেটেছেন নাকি?'
'ইয়েস—' মোহিতকাকা ঘাড় কাত করলেন।

'বম্বে থেকে কেটেছেন, উঠেছি ভূস-ওয়ালে। তা হলে রেলওয়ের লাভই করিয়ে দিয়েছেন দেখছি।'

'সিওর!'

কিন্তু আমাকে নিয়ে চলেছেন কোথায়?'

'আপাতত সুঘাট। সেখানে থেকে ডেরাবল, শ্বারকা, গির ফরবর্ট—'

'আরে বাবা, এ যে লম্বা পাড়ি।'

মোহিতকাকা কিছু না বলে হাসতে লাগলেন।

অমল বলল, 'আমাকে তো শব্দ স্টেশনে আসতে লিখেছিলেন। এমন চরাক-কলে ফেলবার ইচ্ছে ছিল তা তো লেখেন নি।'

'নারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিলাম। অত কথা খুলে লিখলে স্টেশন পর্যন্ত কি তুমি আসতে? তোমার নেচার তো জ্বনি দ্বাদার—'

অমল বৃত্তবৃত্ত করতে লাগল, জামা-কাপড় কিছু আনি নি; কটা দিন কিভাবে যে কাটবে।'

'ভাবনার কিছু নেই ভায়া। বিপদের সময় উপকারেই যদি না লাগলাম বোন বিয়ে দিয়েছিলে কেন? আমার সন্টকেসে যথেষ্ট ধনী-পাজারি আছে; তাই দিয়ে কাজ চালিয়ে নিও।'

'ধনী না হয় হল কিন্তু আপনার পাজারি কি আমার হবে?'

'আরে বাপু, যেখানে যাচ্ছি সেখানে কেউ আর তোমার জামার ছাতা-কল-পটে ইণ্ডি মিলিয়ে মেপে দেখবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।'

একটু চুপ করে থেকে অমল বলল, 'কিন্তু ব্যাপারখানা কী?'

'কিসের?'

'এমন করে বোরিয়ে পড়ার?'

দুই বসে প্রীতি বৃন্দ, বড়বনের
বাপারটা কিছুই জানে না অমল। চিঠিতে
এ সম্পর্কে হয়ত স্পষ্ট কোন ইঙ্গিত নান
নি মোহিতকাকা। বৃথিকার সঙ্গে মোলামেশার
ফলাফল কী দাঁড়ায়, বাতাসে অনেকটাই
লাগে কিনা—সব দেখে বিশ্লেষণ করে মনের
উজ্জ্বল তিন মেলে ধরবেন। ব্যবসায়ের
মামলো; সামনের দিকে এক পা ফেলতে
তিন-বার ভাবেন। প্রতিটি পথক্ষেপ তাঁর
মান-জোখ করা, হিসেবী, ভীতি, সতর্কতা
দিয়ে যোগ।

মোহিতকাকা বললেন, 'কলকাতা আর
ভাল লাগছিল না, তাই বোরয়ে পড়লাম।
তা ছাড়া তোমার সঙ্গে দেখাও হচ্ছিল না
অনেক দিন। চিঠি লিখে, লিখে তো
হয়রান হয়ে গেছি।'

তাঁর চোখে দৃষ্টি স্থির রেখে অমল
বলল বিশ্বাস হয় না। হঠক করে এমনি
বেরিয়ে পড়ার পাত আর যেই হোক আপনি
নন; নিশ্চয়ই অন্য কোন মতলব আছে।'

চোখমুখ দেখে বোকা গেল, মোহিত-
কাকা অস্বস্তি বোধ করলেন। বললেন,
'আমার সব কিছুর ভেতর তোমরা মতলব
দেখ। বলছি, এমনি এসেছি—'

এবার অমল ললিতাকাকিমার দিকে
তাকাল, 'কী ব্যাপার রে সেজদি?'

দু হাত নেড়ে ললিতাকাকিমা বললেন,
'আমি কিছু জানি না বাপ। কদিন আগে
দুপুরবেলা এসে বলল চিঠি কটে এনেছি;
রোঁড় হয়ে নাও। সম্মোবেলা বসে মেল
ধরব। হাজার হোক পান্ডিত্যবতা, বিনা বাক্য-
ব্যয়ে ছুঁতের পিছনে সুতোর মতন গুর পিছ
পিছ বসে মেলে গিয়ে উঠেছি।'

চোখ বড় বড় করে অমল বলল, 'খন্ড
সেজদি, একমুহুরে তোমার মতন পান্ডিত্য আর
একটিও নেই দেখছি। সনাতন ভারতীর
নন্দীরের কাণ্ড একমাত্র তুই-ই বোধহয় কাঁধে
ফেলে ঘুরে বেড়াচ্ছ। কিন্তু সিন্ধুর—'

'কী?'

'তোমাদের মা-চোখ দেখে কিছু আমার
কেমন কেমন লাগছে।'

'কেমন?' ললিতাকাকিমাকে ঈর্ষা শঙ্কিত
দেখাল।

'তোমরা কিছু লজ্জা?'

ললিতাকাকিমা হঠক করে কোন উত্তর
না পেয়ে মোহিতকাকার দিকে তাকালেন।
আর অমল বৃথিকাকে নিয়ে পড়ল, 'তুমি
কিছু জানো বৃথিক?'

বৃথিকার কথা না বলই ভাল। মধ্যে
রক্তাকস খেল যেতে লাগল তার। অমল
না জানুক, সে তো জানে কলকাতা থেকে
সুদূর পর্বত ছুটে আসার সৈন্যে মোহিত-
কাকা, ললিতাকাকিমা হয়ত তার নিজেরও
কোন গভীর গহন উদ্দেশ্যটা রাখছে। চোখ
নামিয়ে কাঁপা গলায় বৃথিকা কিস্কিন্দ
করল, 'আমি জানি না।'

এবার অমলের দৃষ্টি এসে পড়ল প্রীতির
মুখে, 'আপনি কিছু জানেন?'

মোহিতকাকা আর ললিতাকাকিমাকে
একবার হুত দেখে নিল প্রীতি; চোখের কোণ
দ্বিগুণে তারা ইসারা করলেন। ইঙ্গিতটা বাক্য
প্রীতি। আস্ত আস্ত মাথা নেড়ে জানাল,
সে-ও এ ব্যাপারে কিছু জানে না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অমল মোহিত-
কাকাকে বলল, 'সুপার জামাইবাবু—সুপার
পারফর্মেন্স—'

মোহিতকাকা চকিত হলেন, 'মানে?'

'পুতুলনাচের খেলোয়াড়ের মতন সুতো
টানছেন আর সেজদি, বৃথিক, প্রীতিদেবী—
সবাই মাথা নেড়ে না-না করছে। কিছুই
তারা জানে না বেন। অল রাইট, দু একদিনের
ভেতরেই মতলবটা আমি ব্যার করে ফেলব।
সে থাক, এখন কী প্রোগ্রাম বলুন—'

বৃথকে না পেয়ে মোহিতকাকা জিজ্ঞেস
করলেন, 'কিসের?'

হাত উঠে ঘাড় দেখে অমল বলল, 'প্রায়
দুটো বাজতে চলছে। টেন তো কাল সকালে
সুদূর পৌঁছবে। বাকি রাতটুকু কী করতে
চান? গল্প করে কাটাবেন না ঘুমোবেন?'

ললিতাকাকিমা সুযোগটুকুর অপেক্ষায়
ছিলেন বোধ হয়। উৎসাহের সুরে তড়াতাড়ি
বলে উঠলেন, 'আজ্ঞা সবাই ঘুমিয়ে পড়। রাত
জাগলে শরীর খারাপ হবে। কাল থেকে
আবার ঘোরাঘুরি আছে। ঘুম দিয়ে শরীর
খারাপের করে নাও; কাল রাত পার গল্প
কোরো, গল্পে কোরো। বা প্রায় চার করে
যেও। শরীর খারাপ থাকলে কিন্তু কিছু
ভাল লাগবে না।' বলতে বলতে ঘাড় কাঁচ
করে শোবার উদ্যোগ করলেন।

ললিতাকাকিমার প্রস্তাবটা তৎক্ষণাৎ
অমলমেন করলেন মোহিতকাকা, 'সেই
ভাল, সেই ভাল। সবাই ঘুমিয়ে পড় হে।'
বলে নিচ্ছে চোখ বুজলেন। ললিতাকাকিমা
স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে বা বলেছেন তাতে তাঁর
শ্রমিত নেই।

এদিকে অমলের দিকে আড়ে আড়ে
তাকিয়ে চোখের পাতার নাচন দিয়ে ঠোঁট
টিপে ললিতাকাকিমা হেসে মাথা হেলিয়ে দিল
বৃথিকা। অমলও কামরার দেয়ালে ঠেস
দিয়ে চোখ বুজল।

প্রীতি ঠিক করেছিল, ভূসাগুলাে অমলের
ডাক কানে এলেই মোহিতকাকাকে জাগিয়ে
লিয়ে টানা একখানা ঘুম দেবে। কিন্তু অমল
ওঠার পর কথায় কথায় ঘুমের কথাটা একে-
বারে মনে ছিল না; এবার সে চোখ বুজল।
অনেকক্ষণ চোখ বুজে রইল প্রীতি।

স্টেশনে স্টেশনে যাত্রী নেমে যাওয়াতে পা
ছাড়িয়ে কাত হবার মতন জায়গা হয়েছে, তার
ওপর ট্রেনের দোলনি আছে; বাইরে বসে
অতুর বাতাসে শিরশিরে শীতের আমেজ
মাথা। একটি পরিপাটি নিটোল ঘুমের পক্ষে
আয়োজনটা মোটামুটি ভালই। কিন্তু ঘুমোতে
পারল না প্রীতি। ঘুম যখন আসছে না এখন
কতক্ষণ আর চোখ বুজে থাকে যায়। একবার
চোখ মেলে তাকাল সে।

কেউ জেগে নেই। বাদঘরে প্রাণীদেহ
বেগন রাখা হয় তেমনি ঘুমের আরকে কামরা-
ভর্তি মানবগুলোকে কেউ বুঝে সারি সারি
সাজিয়ে রেখেছে।

ঘুমন্ত যাত্রীদের দেখতে দেখতে হঠাৎ
জমলের দিকে চোখ পড়তে চমকে উঠল
প্রীতি। অমল তাকিয়ে আছে। কি আশ্চর্য,
এখন সে বুঝে নি!

চোখাচোখি হতে অমল হাসল, 'ঘুমো
নি?'

অড়ট গলায় প্রীতি বলল, 'না।'

আমারও ঘুম আসছে না।' বলতে
বলতে সোজা হয়ে বসল অমল।

প্রীতি চুপ।

অমল আবার বলল, 'এভাবে বার্ড ট্রান্স
হাবার অভ্যাস আমার কোনকালেই নেই। এবার
একটা এক্সপারিমেন্ট হল।' যে হোষ্ট-
জলটার ওপর সে বসে আছে সেটা দেখিয়ে
বলল, 'এটার চড়ে কী মনে হচ্ছে জানেন?'

জগতের কোন ব্যাপারেই কোতুল নেই
প্রীতির। তবু নিজের অজান্তেই মেন সে
বলল, 'কী?'

'অশ্বারোহণের অমলদ পাচ্ছি।'

চমকায় কথা বলতে পারে অমল।
প্রীতির ঠোঁটের প্রান্ত দুটো খানিক বিস্তৃত
হয়ে হাসির আভা একটুখণের জন্য হুটে
উঠেই মিলিয়ে গেল।

অমল এবার বলল, 'দাঁদি জামাইবাবু কি
ঘুমিয়েছে? দাঁদির ঘুম সম্বন্ধে অবশ্য
সন্দেহ নেই। তবে জামাইবাবু—' হাত
বাড়িয়ে মোহিতকাকার কানের কাছে জোরে
জোরে তুড়ি মিল অমল। নাকের কান্ডটার
সুড়সুড়ি এবং দু-চারটা খোঁচা দিয়ে নিশ্চিন্ত
হয়ে বলল, 'না, জামাইবাবুর ঘুমটাও
ভেঙেইনি। এবার তা হলে একটা সিগারেট
ধরানো যেতে পারে।'

ফস করে দেশলাই জ্বালানো অমল।
সিগারেট ধরিয়ে দাঁদি টান দিয়ে একটি
একটি করে অনেকগুলো ধোঁয়ার বসন্ত
হাওয়ায় ছুড়ে দিল, তারপর বলল, 'এ
কমরায় আপনি আর আমি ছাড়া সবাই
ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু আপনি আর আমি
জেগে আছি।'

খুব সহজ সুরে কথাগুলো বলেছে
অমল। নিশ্চয়ই কিছু না ভেবেই বলেছে।
এর ভেতর কিছু থাকা উচিতও নয়, এর
সঙ্গে কোন ইঙ্গিত জড়িয়ে অর্থময় করে
ভোলাও অনায়াস। তবু প্রীতির বৃকের
ভেতরকার চিহ্নবাহুর দেখে কিসের যেন
একটা ছায়া পড়ল।

অমল বলল, 'জামাইবাবু, তখন
আপনার দুঃখের কথা কি বলছিলেন?
আপনার কথা জানতে ইচ্ছে করছে। ঘুম
তো আসছে না, বলুন না—'

প্রায় ফিসফিস গলায় প্রীতি বলল,
'সে সব আপনার ভাল লাগবে না।'

'না লাগুক, আপনি বলুন।'
'মোহিতকাকু তো তখনই বললেন,
পরে আপনাকে বলবেন। ওর কাছেই
শুনবেন।'

অমল আর পীড়াপীড়ি করল না।
কিছুক্ষণ দুঃখমন্ডলের মতন সিগারেট ধরে
গেল। তারপর বলল, 'আপনি খুব শাই-
লাজুক—'

প্রীতি চুপ।

অমল আবার বলল, 'লাজুক না
গম্ভীর, কোনটা বলুন তো?'

প্রীতি উত্তর দিল না।

অমল বলতে লাগল, 'আপনি বোধহয়
লোকের সঙ্গে মোলায়েম পছন্দ করেন না।'
চমকে অমলের দিকে তাকাল প্রীতি। ভূস-
গুলাে এ কামরায় ডেকে ভোলায় পড়ে অনেক-
বার তমসকে দেখেছে সে। মোহিতকাকার

সুখে কথা বললে কলতে অমল এখন হাসির কোয়ারা ছোটাছুটি নিজের অজান্তে প্রীতির চোখ দট্টে। বুকে বুকে তার বুকের ওপর গিরে পড়ছিল। কিন্তু সে দেখায় বিশেষত্ব ছিল না। যেমন করে যানব্র অনমনস্কের মতন আকাশ দ্যাখে, পাখি দ্যাখে অথবা আর কোন দৃশ্য, সেইভাবে অমলকে দেখেছিল প্রীতি। কিন্তু এতর এই যুগ্মত কামরার তারা দুজন হাতা যখন আর কেউ জেনে নেই তখন সমস্ত মনো-বোধ্য চোখের মিলিত এনে অমলকে দেখতে লাগল সে।

দু বছর হল মোহিতকাকা তাকে আশ্রয় নিয়েছেন। এই দু বছরে ললিতা-কাকিমার মধ্যে অন্তত হাজার বারও তারি ডাইরের কথা শুনতে হয়েছে। ললিতা-কাকিমার বর্ণনায় এক বিশদ বাড়াবাড়ি ছিল না। অমল সুপুরুষ। নাক-চিবুক-কপাল, ব্যাক গ্রান করা কুচকুচে কালো চুল, ধারাল মুখ—কোথাও এতটুকু খুঁত বার করা যবে না। চওড়া কঁচি, মটোর ধরা বার কোয়টি এমনই সরু—তার ওপর দিকে বিশাল বুক। সুব্রা আর বর্গশালিতা, লাবণ্য আর পৌরব নিষ্ঠিতে সমান সমান মেলে তার সর্বাঙ্গে এমন করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে অমলের দিকে তাকালে দৃষ্টি জারাম পায়। অমলের উপস্থিতিটাই খুব সুখদায়ক।

ললিতাকাকিমার এই ডাইটির সমস্ত আকর্ষণ তার চোখে। এমন প্রাণবন্ত উজ্জ্বল চোখ কয়টিই দেখা যায়। শুধু কি প্রাণবন্ত তার উজ্জ্বল, বিচরকমের দুর্গামণ্ড। বার দিকে অমল তাকায় সে দৃষ্টি বুকের গভীর পর্যন্ত চিকন ভীরের মতন বুঝবা বিষে যায়। নইলে কেমন করে এই সামান্য সময়টুকুর ভেতর অমল বুকেতে পারল বেশি কথা বলতে ভালবাসে না প্রীতি, লোকের সঙ্গে মিলতে পারে না।

প্রীতি যে মিশতে পারে না, তার পেছনে দৃষ্ট নেই, অহংকার নেই। অহংকার করতে হলে কিছু মূল্যবান বস্তু—হয় রূপ, না হয় গুন। প্রীতির তেমন কিছুই নেই। তাকে ঘিরে যা রয়েছে তা হল সীমাহীন শ্রম। দুর্বল অনিশ্লেষ বস্তু। প্রীতির বুকের ভেতর সবগুলো দুয়ারই বন্ধ। সেগুলো খুলে যে বেরিয়ে আসবে তেমন টাকটুকুই আর অবশিষ্ট নেই। চারপাশে পৃথিবী রস-মুগ্ধ-উজ্জ্বল-আবেগে টলো-মলো হয়ে আছে; পা বাড়ালেই হাসি-গান-আনন্দের অফুরন্ত স্রোত। কিন্তু কাপি নিতে পারে না প্রীতি। পেছন থেকে অদৃশ্য ভেটী শব্দ মুঠোর তাকে যেন ধরে রাখে। হৃদপিণ্ডের অতল থেকে কিসফিসিরে কে যেন নিরন্তর শাসায়, ডোর জনো আনন্দ নয়। তদিকে তুই 'পঠি ফি'রতে রাখ।

সবকিছু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে একটা ধূসর নিঃশব্দ জনহীন স্থানে চার-দিকে দেওয়াল তুলে নির্বাসিত হয়ে ওঠে প্রীতি।

অমলের গলা সোনা থেল, কী তাকছেন?

অমলটো নব্বো প্রীতি বলল, 'কিছু না।' সিগারেটের ছাই কাড়তে কাড়তে অমল বলল, 'ভাবছেন আর বলছেন, কিছু না।'

হাতের কাছে উত্তর খুঁজে না পেয়ে কোন-রকমে তাত্তাত্তি প্রীতি বলে উঠল, 'আমার খুব ঘুম পাচ্ছে।'

অমলের সঙ্গে অতি সামান্য অতি সাধারণ দু-চারটে কথা হয়েছে। তবে কেন যেন প্রীতির মনে হচ্ছে, কামরার সবাই এখন ঘুমে অচেতন তখন ললিতাকাকিমার এই প্রাণবন্ত সুপুরুষ ডাইটির সঙ্গে জেগে বসে থাকা অনুচিত, বিপজ্জনক।

ঠোঁট টিপে বিচি হাসল অমল। কেমন করে যেন বলল, 'ঘুম পাচ্ছে।'

অমল কি ঘুমের কথাটা বিশ্বাস করল না? তার চোখের দিকে তাকিয়ে কিবান অথবা অবিশ্বাস কোনটাই বাচাই করে নিলে সাহস হল না প্রীতির। নীচের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'তা হলে ঘুমান।'

প্রীতি বাড় হেলিয়ে ঘুমোতে চেষ্টা করল। কিন্তু চোখের পাতা বন্ধ হলেই কি ঘুম আসে? সে জেগে বইল। আর ট্রেনের চাকার একটানা শব্দের সঙ্গে হৃদপিণ্ডের উত্থান-পতন একাকার হয়ে একটি নাম 'অবি-রাম বেজে চলল—অমল, অমল, অমল—'

দু হাত দিয়ে সবলে তামলের চিন্তা করে সরিয়ে দিতে চাইল প্রীতি, কিন্তু অবাধ্য ভাবনাটা নিভাস্ত অকারণেই বুকে বুকে ফিরে ফিরে হানা দিতে লাগল।

৥ দুই ৥

গরের সিন সুরাট।

টেলিফোনে অমল বলল, 'সৌরাষ্ট্রে এসে লোকের প্রথমে যার স্মারক। কি প্রভাসে। কিংবা গির ফরেটে। কেউ কেউ পৌরস্বয়, বসোনা, ভূমুকছেও যায়। আর আপনি কিনা পল্লাইই সুরাট আত্মশয় করলেন জামাইবাবু?'

মোহিতকাকা বললেন, 'সুরাট সুপারক' আমার একটা মোহ আছে তাই।'

'কি রকম?'

'ছেলেবেলার হিন্দুতে এই জায়গাটার কথা পড়ছি। এখানে কে না হানা দিয়েছে? পতঙ্গীজ এসেছে, যোগলয়া এসেছে, ডাচরা এসেছে, ফরাসীরা এসেছে। শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা দিল্লীর নবাবের কাছ থেকে সুরাটে কুঠি তৈরির অধিকার পায়; সেটা খুব সম্ভব নাইনটিনথ সেক্সের মাঝামাঝি সময়। এত জাতি যুগে যুগে হানা দিয়েছে, এমন জায়গা সারা ভারতবর্ষে বোধ হয় খুব বেশি নেই। মোহিতকাকা বলতে লাগলেন 'ছেলেবেলা থেকেই আমার ইচ্ছে সুরাট দেখা; ইচ্ছে না বলে স্বপ্নও বলতে পার। তাই এবার যখন বেরিয়ে পড়া গেল তখন ডাকনাম এদিকে এসে প্রথমই সুরাট যাব।'

অমল কিন্তু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ললিতাকাকিয়া বললেন, 'খুব তো হিন্দু আওয়াজো হচ্ছে এদিকে হ'ল আছে?'

শরীর দিকে ফিরে দুই হাত জোড় করে মোহিতকাকা বললেন, 'হার ম্যাজেন্টি আঙা করুন—'

'ইরাকি' দিতে হবে না। কাল সারারাত একটুও ঘুমোতে পারিনি; এখন যদি চাও করতে না পারি নির্বাসিত হয়ে যাব।'

'ঘুমোতে পার নি; বল কি।'

'খাউ' ক্রাসের ঐ ভিড়ে-গরমে-নোংরা কখনো ঘুমেনো যাব। তার ওপর ট্রেন বললেন জেনো দৌড়খান তো আছেই।'

'সত্যি বলছ ঘুমোও নি।' মোহিত-কাকার চোখ গোলাকার হয়ে গেল।

'নিশ্চয়ই ঘুমোই নি।'

'আমরা যে কামরার হিলাম তার ঘাতীদের জিজ্ঞেস করলে অন্যরকম সাক্ষ্য দেবে কিন্তু।'

চোখ বুঁচকে ললিতাকাকিয়া বললেন, 'কী সাক্ষ্য দেবে শুন।'

'কাল সারা রাত ঘুমের ঘোরে তোমার নাকে পুই পুই করে সারোপ বেজেছে।'

'আহা-হা-হা—' গলায় কাঁপন তুলে কেমন করে যেন শব্দটা উচ্চারণ করলেন ললিতাকাকিয়া।

মোহিতকাকা কি বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই অমল বলে উঠল, 'তারা কিন্তু আরো একটা কথা বলবে জামাইবাবু—'

নিশ্চয় চোখে তাকিয়ে মোহিতকাকা বললেন, 'কী?'

'সেজদার সারোপের সঙ্গে আপনার নাকও সারা রাত বিগ ভ্রাম 'বাজিয়েছে। সপাতও ভালই হয়েছিল।'

সবাই হেসে উঠল। এর ভেতর যুথিকার মাতামাতিই সব চাইতে বেশি। শরীরে চেঁচি তুলে তীক্ষ্ণ খিলখিল শব্দে সে হাসতে লাগল। একবার হাসতে শুরু করলে মেরোটা সহজে থামতে চার না।

যুথিকার দিকে ফিরে অমল বলল, 'অত হেসো না যুথি, তোমার নাকও কমতি যার নি—সমানে এপ্রায়ে ছড় টেনে গেছে। তিনজনে মিলে তোমরা একেবারে জলসার আসর বাসিয়ে দিয়েছিলে।'

হাসতে হাসতে যুথিকা থমকে গেল। নাকের ভেতর থেকে সরু আওয়াজ বার করে বলল, 'উ-হু-হু-হু, আমার নাকে এপ্রায়ে বাজিয়েছে—আপনাকে বলছে।'

এদিকে মোহিতকাকা চোঁচিয়ে উঠলেন, 'ইমপসিবল, আমার নাক কখনও ডাকে না।'

অমল বলল, 'হাজার বার ডাকে, প্রচণ্ড-ভাবে ডাকে।'

'সাক্ষী আছে?'

'নিশ্চয়ই।' অমল নিজের কান দট্টে দেখিয়ে বলল, 'এরা সাক্ষী।'

জোরে জোরে মাথা নেড়ে মোহিতকাকা বললেন, 'উইটনেস হিসেবে তুমি অচল।'

'তারণ?'

'কারণ তোমার নিস্টারের সারোপ বাজায্য কথা বেই বলোছি অমনি তুমি আমার নাক ডাকার কথা বললে। এর ভেতর মোটিভ আছে। মোটিভটা হল আমাকে একই দোষে বোঝা করে বোনের সম্মান রক্ষা।'

অমল বলল, 'ট্রেন থেকে নেমে পড়ছি, এখন আর সাক্ষী কোথায় পাই।' বলতে বলতে হঠাৎ কি মনে পড়তে চোখ-মুখ

উদ্ভব হয়ে উঠল, 'সাকী সাকী করছি অথচ সাকী তো হাতের কাছেই রয়েছে।' 'কে?' মোহিতকাকা জিজ্ঞেস করলেন।

'উনি—' প্রীতির দিকে আঙুল দেখিয়ে অমল বলল, 'প্রীতিদেবী তো আপনার নিজের লোক। আমার সঙ্গে এখন পর্যন্ত ভাল করে আলাপই হয় নি। উনি নিশ্চয়ই আমার জন্যে মিত্যে বলবেন না।'

মোহিতকাকা জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রীতি কি জেগে ছিলি?'

প্রীতি উত্তর দেবার আগেই অমল বলল, 'উনি আর আমি—এই দুজনে শব্দ জেগে ছিলাম। আপনারা যমুদ্বিলেন।'

থেকে থেকে কেমন করে বেন মোহিত-কাকা বললেন, 'তোমরা দুজন শব্দ জেগে ছিলে?'

মোহিতকাকার স্নেহে এমন কিছু আছে কি, অক্ষুট সংশয়, সন্দেহ অথবা অন্য কিছু—প্রীতি ঠিক বুঝতে পারল না। নিজের অজান্তে তার চোখ ললিতাকাকিমার দিকে ফিরল, সেখান থেকে যথিকার মুখ ঘুরে মোহিতকাকার চোখে এসে স্থির হল।

ললিতাকাকিমার কপাল কেমন মেন কুঁচকে গেছে। যথিকার চোখের তারা দুটে নিশ্চল। মোহিতকাকার চোখ দেখে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, কোনদিনই যায় না। দু বছর ওকে দেখছে প্রীতি। ভেতর দিকের কোন দূরন্ত আবেগ অথবা ফেনারিত উত্তাপকে মোহিতকাকা কখনও বাইরে বেরিয়ে আসতে দ্ব্যন না, সব সময় গুহাগোপন করে রাখেন।

এক বকমের নদী আছে যা আপাত-স্থির কিন্তু তলার তলার তার গহনসংঘারী চোরাখুঁর্ণি। মোহিতকাকাকে কি ভেমন দেখাচ্ছে? প্রীতি বুঝতে পারল না। তবে এটুকু বোঝা গেল একটু আগে উচ্ছ্বাসিত হাসিতে আর ঠাট্টার ঠাট্টার লঘু সুরের যে রিমিক্স অকেস্ট্রা বেজে বাজছিল তার সুর কেটে গেছে। কোথায় বেন একটা ছায়া পড়তে শব্দ করেছে।

হঠাৎ কব'শ সুরে চোঁচিয়ে উঠলেন ললিতাকাকিমা, 'সংয়ের মতন 'প্ল্যাটফর্মে' দাঁড়িয়ে ঝইলে যে। চান না হয় পরে হবে। এখন কোথাও একটু বসবার ব্যবস্থা করবে তো।'

যক্ষারটা কার উদ্দেশে বুঝতে অসুবিধে হল না। মোহিতকাকা আর দাঁড়ালেন না। অমলকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ ছুটলেন।

একটু পর স্টেশনমাস্টারকে ডেকে এনে ওয়েটিংরুমের ডালা খোলানো হল। দেখেই বোঝা যায় দীর্ঘকাল দরটা দরজা বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। দু-চার বছরের ভেতর মনুষ্য-জাতির কোন প্রতিনিধি এর দখল নিতে আসে নি।

সবাইকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন মোহিত-কাকা। ওয়েটিংরুমের সলো স্নানঘর ভাঙে কিন্তু জল নেই। মোহিতকাকা স্টেশন-মাস্টারকে জানালেন, সাগা রাত ট্রেন জার্নি করে আসা হয়েছে, স্নান একান্ত প্রয়োজন। অনগ্রহ করে তিনি যদি জলের ব্যবস্থা করে দ্ব্যন খুব উপকার হয়।

স্টেশনমাস্টার বললেন, 'এখানে তো জল নেই, কুয়ো আছে বেশ খানিকটা দূরে। আমি একটা লোক ঠিক করে দিচ্ছি। পরশা দিলে কুয়ো থেকে সে জল এনে দেবে। তাছাড়া এই ঘরটাও পরিষ্কার করবে।'

মোহিতকাকা বললেন, 'খুব ভাল। শব্দ জল আনা ঘর সাফই করা কেন, আমরা বত্ক্ষণ আছি লোকটা থাকতে পারবে না?'

'কেন বলুন তো?'

আজ সুরাট স্টেশনে নামতেই দেখা গেছে ছোকরা চাকরটার বেশ-জরাজীৱনকে দিয়ে কাজকর্ম করানো যাবে না। মোহিতকাকা বললেন, 'এই ফুট-করমাস বাটবে, এটা-ওটা এনে দেবে—'

'তা পারবে। তবে পরশা বেশি দিতে হবে।'

'সে তো দেবই! তাছাড়া খোরাকিও দেব।'

স্টেশনমাস্টার একটা কুলী ঠিক করে দিলে চলে গেলেন। লোকটা প্রথমে ওয়েটিং-রুমটা পরিষ্কার করল। তারপর বালতি করে করে জল নিয়ে এল।

স্নানের পালা চুকলে অমল বলল, 'বাওয়া-বাওয়ার কী হবে? স্টেশনের নমুনা তো সবুজকে দেখলেন। এখানে রেলভয়ে কেটারিংয়ের বালাই নেই। তবে শহরের ভেতরে গেলে হোটেল মিলতে পারে।'



হঁগ, ইনি 'বলডেক্স'ই মাখেন
আর তাইতো হঁগ চুল এত সুন্দর

বলডেক্স পারফিউমড চুলের
বাঁহা ও সৌন্দর্য ফিরিয়ে এনে
চুলকে আরও ঘন, আরও কালো
আরও সুন্দর করে তোলে।

বলডেক্স স্পেশাল ব্যবহারে
চুল ওঠা বন্ধ হয় ও নতুন চুল
গকায়।
মরামাস, খুঁচি ইত্যাদিও দূর করে



আয়ুর্বেদীয় উপাদান প্রস্তুত
বলডেক্স
স্পেশাল ও পারফিউমড

বেস্ট কেমিক্যাল কর্পোরেশন
৯১, বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা-৩৭

‘উ-হু-উ-হু-’ জোরে জোরে প্রবল বেগে মাথা নেড়ে উঠলেন মোহিতকাকা, ‘হোটেল আমার পক্ষে নিষিদ্ধ এলাকা ব্রাদার। পেটটিকে গ্যাসট্রিক আলসারের কাছে প্রায় দানপত্র করে দিয়েছিলাম। কত কষ্টে যে ওটার স্বস্থ ফিরে পেয়েছি তুমিই জানি। কাজ মশলাহীন রান্না ছাড়া আমার চলে না।’

‘কিছু—’ অমলকে চিন্তিত দেখাল।

‘কী?’

‘আপনার ফরমাস মতন রান্না এখানে কোথায় পাবেন?’

‘ব্রাদার, তৈরী না হয়েই কি বেরিয়েছি মনে করো—’ মোহিতকাকা হাসলেন, ‘স্টোভ-কড়া-হাতা-খুঁটি — গম্বাদন মাথায় করে এনেছি। চলো, আগাতত বাজারটা খুঁজে বান্ন করা যাক, কিছু মেনে কিনা দেখি।’

স্টেশনমাস্তারের কাছে জিজ্ঞেস করতে বাজারের হার্ডস মিলল। টাওয়ার মাত্র মিনিট দশকের পথ। সরু চাল, কিছু সবজি, রুটি, কলা, দুই ইত্যাদি কিনতে কিনতে নজরে পড়ল এক ধান্নে কয়েকটা লোক মাছ নিয়ে কসেছে, হুপোর স্তূপের মতন চকচকে লোভনীর বড় বড় পাবদা আর টাংরা মাছ। বাংলা দেশ থেকে এত দূরে খাটি বগীর মীনকুলকে দেখে দোভ আর জয় করা গেল না। অতএব সের দুয়েকের মতন টাংরা আর পাবদা খালিতে এসে উঠল।

বাজার থেকে ফিরে মোহিতকাকা ধলি উপড় করে উজ্জ্বলিত হয়ে উঠলেন, ‘দ্যাখো দ্যাখো, কাদের এনেছি। এতদূরে এসে দেশো-রানীদের দেখে আর লোভ সামলাতে পারিনি। কলকাতার বিশ টাকা দিলেও এমন ফ্রেশ আর এতবড় সাইজের মাছ পায়ে না। ভারি আজ অনিরম করব।’

সবাই খুশী, কলকাতার এমন মাছ ইদানীং দুলভ। আনন্দে সবার চোখ চকচক করছে। ললিতাকাকিমা মাছের দিকে চোখ রেখে বললেন, ‘অনিরম বলতে?’

‘আজ একটু, কাল খাব। বেশ যত্ন করে আদা-টানা।’ দিয়ে টাংরার দো-পে-মাজী বান্নাও। আর পাবদাটা দিয়ে কোল। হিংয়ের বড়ি হলে পাবদা জমত ভাল, না কি বল?’

‘খাওয়ার তো খুব চোট দেখছি। পেটটা সেসে এসেছে; কালটাল খেয়ে—’

বাধা দিয়ে মোহিতকাকা বললেন, ‘কিছু হবে না গিন্নী, তুমি দেখে নিও। আর যদি একটু হয় তো হবে।’ অর্থাৎ এমন মাছ মুঠোর পেয়ে তরিবত করে থাকেন না, তা হতে পারে না।

অমল বলল, ‘রান্নাবান্না পরে হবেখন। লাড়িটাড়ি জ্বলে যাচ্ছে, এখন পর্যন্ত ত্রেক-ফাল্টি হল না। অস্তত এক কাপ চা না গেলে আর চলছে না।’

ললিতাকাকিমা প্রীতির দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘স্টোভটা ধরিয়ে চায়ের জল চাড়িয়ে দাও—’ বলে সেই কুলীটাকে ডেকে ওয়েটিংরুমের মাঝখানে সতরঞ্চি এবং তার ওপর সুদৃশ্য চাদের পাড়ালেন।

কুলীটি সৌর্যশেষের লোক; তমে হিম্মী কিছু কিছু বোঝে। চায়-সতরঞ্চির কলস

বাইরে গিয়ে বোস।’ তমলদের বললেন, ‘তোরা এখানে আর।’

কুলীটা বাইরে চলে গেল। যুথিকা, তমল, ললিতাকাকিমা আর মোহিতকাকা—চারজনে ফরাসে বসলেন। জোকরা চাকরটা জরগায় ওয়েটিংরুমের সম্পত্তি একটা ইঞ্জি-চেয়ারে কুন্ডলী পাকিয়ে আছে।

প্রীতির কিছু কোন দিকে লক্ষ নেই। লোহার ট্রান্স খুলে স্টোভ-প্লেট-ক-প-ডিস-খুঁটি মাঝতীর সরঞ্জাম বার করে ফেলল। তারপর স্টোভ ধরিয়ে চায়ের জল চাড়িয়ে কিপ্র হাতে রুটি কেটে মাখন লাগাতে বসল। মাখন মাখানো হলে কলা ছাড়িয়ে, প্লেটে প্লেটে সাজিয়ে প্রত্যেকের সামনে রেখে গেল।

ললিতাকাকিমা শব্দ চায়ের জল চড়াতেই বলছিলেন। ‘কিন্তু রুটি কাটা, মাখন লাগানো ইত্যাদি ইত্যাদি যেন অলি-খিত চুতির মতন। চায়ের জল চড়াতে বললেই এগুলো করতে হবে এবং প্রীতিকেই করতে হবে।’

স্টোভটা একটানা গরম করে চলেছে। তার উষ্ণমুখ নীলাভ আগুন দেখতে দেখতে চায়ের জল টগবগ করে উঠল। চা ছেকে সবাইকে দিয়ে অক্ষুণ্ণে প্রীতি বলল, ‘এবার কী করব?’

ললিতাকাকিমা বললেন, ‘মাছগুলো কুটে ফেল; তারপর রান্নার যোগাড়শস্ত কর—’

অমল বোধহয় লক্ষ করছিলেন। বলল, ‘সে কি, উনি তো চা-টা কিছুই খেলেন না—’

মোহিতকাকা তাড়াহাড়ি বলে উঠলেন, ‘তোরা খাবার-টাবার এখানে নিয়ে আর। আগে খাওয়া, তারপর কাজ।’

প্রীতির খাওয়ার ব্যাপারে অমলের মনো-যোগ ললিতাকাকিমা কে খুশী করে নি। অত্যন্ত বিরস আর রুদ্ধ সুরে তিনি বললেন, ‘না খেয়ে আমি ওকে কাজ করতে বলি নি। আমাকে তোমরা নিষ্ঠুর পশ্টুন্ড ভাবো নাকি?’

প্রীতি বিব্রত, কুণ্ঠিত। এমনিতেই তার ন্ডব শামকের মতন; আরো বানিকটা নিজেকে গুটিয়ে নিল সে।

ব্যাপারটা স্মৃতি সামান্য, তুচ্ছই বলা যায়। ললিতাকাকিমার এতখানি অসন্তুষ্ট হবার কারণ ছিল না। হঠাৎ অমলের ওপর খুবই বিরক্ত হল প্রীতি। সে থাক বা না থাক, তা লক্ষ্য করবার তার প্রয়োজন কী?

মোহিতকাকা ডাকা সঙ্গেই খাবার-টাবার নিয়ে সবার কাছে এসে বসল না প্রীতি। দূরে নিজেকে খানিক আড়াল করে রেখে দ্রুত খাওয়ার পাল চুকিয়ে ফেলল। তারপর মস্তিষ্ক কুটে ধূয়ে রান্নার আয়োজন করতে লাগল।

মোহিতকাকদের খাওয়া এখনও শেষ হয়নি। খাওয়ার চাইতে গল্পই হচ্ছে বেশি। তাঁদের টুকরে টুকরো কথা কয়ে আসতে লাগল।

মোহিতকাকা বললেন, ‘একটা গাইড নিলে ভাল হয়, না কি বল?’

অমল বলল, ‘গাইড! গাইড দিয়ে কী হবে?’

‘সুবাট নহরটা ধরিয়ে ফিরিয়ে দেখাবার জন্যে।’

‘কিছু দরকার নেই। আমিই আপনাদের দেখিয়ে দেবখন।’

যুথিকার গলা শোনা গেল, ‘আপনি কেমন করে দেখাবেন! আপনি কি কখনও এখানে এসেছেন?’

অমল বলল, ‘ভূসাগুরাল থেকে এ জায়গাটা আর কতদূর। অকিসের বন্দু-বন্দবদের পঞ্জায় পড়ে একবার এসেছিলাম।’ মোহিতকাকা বললেন, ‘তবে তো ভালই হল। আচ্ছা এখানে দেখবার কী কী আছে?’

‘বিশেষ কিছুই নেই।’

‘কতক্ষণ লাগবে সব দেখতে?’

‘ম্যাকসিমাম বটী পাঁচ-ছয়ক। ফিরে এসে আজ রাতেই তমরা স্মারকার বাবার গাড়ি ধরব।’

যুথিকা বলল, ‘আপনি সৌর্যশেষের সবটা ধরেছেন?’

অমল বলল, ‘ঘোর ঘুরি আমার তেমন ভাল লাগে না। সেবার বন্দুরো জোর করে ধরে এনেছি। কয়েকটা জায়গা মোটে দেখেছি। সৌর্যশেষের এরিরা বিরাট। দুদিন দশ দিনে তার কতটুকু আর দেখা যায় বল।’

ইতিমধ্যে কড়াইয়ে তেল দিয়ে মাছ ভাজতে শুরুর করেছে প্রীতি। ভাজা মাছের সুস্বাদু মিষ্টি গন্ধে চরমিক ভরে গেছে।

যষ্ঠ খতুর বাতাসে সর্বকল মত্ততা যেন ভর করে থাকে। নেশার বেহেশ হলে দিগ্বিদিকে ছুটে বেড়ানোতেই তার বত আনন্দ। ফলে ওয়েটিংরুমের হাওয়াটুকু আর তার ভেতরেই আবদ্ধ নেই; ভাজা মাছের খবর চার দিকে রাশি করে দেবার জন্য সে শব্দ বর বার বাইরে ছুটেছে।

এদিকে মোহিতকাকাদের আসার মোটা-হুটি জমে ওটার মুখে আবার এক কান্ড করে বসল অমল। হঠাৎ প্রীতির দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, ‘উ-হু-উ-হু, এটা কিছু ঠিক হচ্ছে না।’

মোহিতকাকারা উদ্ভূত হলেন, ‘কী?’

‘আমরা তদারক করে আড্ডা মারব। আর উনি মানে প্রীতিদেবী একা একা খেতে যাবেন। তা হতে পারে না। সেজদা, যুথিকা—তোমরা ওকে হেল্প কর। যদি বল তো আমিও হাত লাগাতে পারি।’

হুদাপণ্ডের উত্থান-পতন দ্রুততর হল প্রীতির। পৃথিবীর সবটুকু সংকট চারিদিক থেকে যেন তাকে বেঁটন করতে লাগল। অমল জানে না সহানুভূতি দেখতে গিয়ে নিজের অজান্তসারে প্রীতির কি নিদারুণ ক্রটি করে যচ্ছে।

মোহিতকাকারা তার আগ্রহঘাতা ভগ্নাতের সব দুয়ার যখন বন্ধ তখন এগারো কাছে টেনে নিয়েছিলেন। তাঁদের সূচী জন্য আরামের জন্য সবকিছু করতে হুট প্রীতিকে; এই হচ্ছে নিয়ম। লিখে-পড়ে এ শব্দে তাকে অবশ্যই আগ্রহ দ্যান নি মোহিত কাকারা। নিজে নিজেই এই শব্দ ঠিক করে অলিখিত চুপিপথে সহ করে দিয়েছে প্রীতি এদিকে যুথিকা চমকে উঠেছে। ললিতা কাকিমার হৃৎচোখে বিরতি ফুটেছে। কি কালের দিন-রাপনে তিনি অতাপ্ত, কাল

আজ্ঞানীতে হৃদপিণ্ড তার যেন স্তব্ধ হয়ে আসছিল।

বাই হোক বিমূঢ়তার আর মৃত্যু করকটা মূহুর্ত। তারপরেই নিজের ব্যক্তির ভেতর ফিরে এলেন মোহিতকাকা। পুরুষকুলে তিনি হরত সিংহ নন, তাই বলে একেবারে শ্রী-লালিত শ্রী-পালিত ভীরু খরগোসটিও নন। জেদ এবং ব্যক্তিগত বজ্রায় রাখতে বললেন, 'যা প্রীতি, তেরা তিনজনে ঐ টাঙ্গার গিরে বোস। তিনজনেই পাতলা পাতলা রোগা রোগা আঁচিস, ঠিক কুসিরে মাবে।'

প্রীতি নিজেকে কোথায় যে লুকোবে ভেবে পাচ্ছিল না। নতচোখে ফিসফিসিয়ে বলল, 'আমি বাব না। আপনারা ঘুরে আসুন। আমি ওয়েটিংরুমে শূদ্রীর (ছোঁকরা চাকরটা) কাছে গিয়ে বসি।'

'কি আশ্চর্য, বাবি না কেন?'

আগে থেকে কিছুই ভাবে নি প্রীতি। তবু আপনা থেকেই জবাবটা এসে গেল, 'আমার বন্ধ মাথা ধরেছে।'

যা শুনলেন তাই সরল মনে বিশ্বাস করে নিলেন মোহিতকাকা। তার ভুলদেশে যে আরো কিছু থাকতে পারে—ইলাভময়, অধঃপূর্ণ—তা আর খোঁজাল করলেন না। বললেন, 'তাইলে ভূই থেকেই যা।'

স্টেশনে থেকে যেতে পারলে সব দিক থেকেই ভাল হত। সূর্যট দেখে ফিরে আসার ভেতরেই ললিতাকাকিমার মোহিতকাকার সন্ধি হয়ে যেত। কিন্তু তা আর হল না। অতর্কিতে অমল আরেক কান্ড করে বসল। এতক্ষণ স্থির নিবন্ধ দৃষ্টিতে প্রীতিকে দেখেছিল সে: সেই দুর্ভেদী ভীকু চোখে। এবার কাছে এসে বলল, 'আপনার মাথা ধরে নি।'

ফাঁদে-পড়া পাখির মতন ভেতরে ভেতরে ছটকট করে উঠল প্রীতি। বিব্রত মুখ বলল, 'না-না, সত্যি ধরেছে।'

'বসি ধরেই থাকক টাঙ্গার উঠে হাওয়া খেলে সেরে মাবে। সূর্যটের দরজায় এসে শহরটা দেখে যাবেন না, এ হতে পারে না। আসুন।' কাণ্ডজ্ঞানহীন অবস্থায় অমল হঠাৎ প্রীতির একটা হাত ধরে টানতে টানতে অন্য টাঙ্গার নিয়ে তুলল। তারপর ব্যতিক্রমে ডাকল, 'এসো ব্যাচি—' বলে নিজে উঠে বসল।

টাঙ্গার এক ধারে বসেছে অমল, মাঝখানে ব্যাচি, আরেক ধারে প্রীতি।

আকাশের চড়াই বেয়ে বেয়ে সূর্যটা এখন মাথার ওপর উঠে এসেছে। সমস্তটা কলসনের শেষশেষি, স্নোড এর ভেতরেই আগুনের সহোদর হয়ে উঠতে শুরু করেছে। তবে হাওয়া আছে—তরল, অপরিমিত উচ্ছ্বাসিত হাওয়া। সেটুকুই বা রক।

কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না প্রীতি। রাসের উজ্জ্বল জ্বালায় লগ্নিহীন না, বাড়াসের সুখদায়ক স্পর্শটুকুও সে অনুভব করতে পারছিল না। তাকে কি তার সারা দেহ অনুভূতিহীন হয়ে গেছে? তা তো নয়। অনুভবের স্রুই যদি সে হারিয়ে ফেলবে, লক্ষ লক্ষ রক্তকণিকা যে

মুখের ওপর উঠে এসে সমানে সমস্তকে কলরোল বাধিয়ে দিয়েছে তা কেমন করে টের পাচ্ছে? তাকে এই মূহুর্তে গাঢ় গভীর সীমাহীন এক আচ্ছন্নতা প্রবল টানে ত্যাগাত অভলে টানতে লাগল। সমস্ত অস্তিত্বের ভেতর অসহ্য এক ধরধরানি যেন ভর করে বসল। বড়, জলোচ্ছ্বাস নাকি ভূকম্পনের মতন নিবারণ কোন প্রাকৃতিক বিপর্ষয়ে বৃকের ভেতরটা কাঁপছে। শব্দ অমল হাতের যে জায়গাটার ধরেছিল সেখানে কোন সাড় নেই। রক্তের সম্মিলন ব্যাচিবা সেখানে বন্ধ হয়ে গেছে।

পুরুষের স্পর্শ কি আগে আর কখনও পার নি প্রীতি? পেয়েছে বৈকি! বিদ্রু-চমকের মতন ঢাকা শহর থেকে কোলাখোলা ঘাবার পথে সেই নোকোটোর কথা মনে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠল প্রীতির। চোখের সামনে দিয়ে রক্ত-দাঙ্গা-খুন-হল্লা-বর্শা-বরষা আর এক দল আদিম বর্বর জন্তুর মুখ মিছিল করে ঘুরিয়ে গেল।

একটা মাত্র মূহুর্ত। পরকালেই পেশীর সেই কাঠিন্য শিথিল হয়ে গেল। আবার সেই ঘোরটার ভেতর হারিয়ে গেল প্রীতি।

আচ্ছন্নতার ভেতরেই সে অমলকে বলতে শুনল, 'চালাও—'

টাঙ্গা চলতে লাগল।

এক সময় টাঙ্গাওনারা প্রাচীরে-ঘেরা আদিমকালের এক শহরে নিয়ে এল। সূর্যট যেন একালের নয়, মাটির অতল থেকে আবিষ্কৃত সূর্য্যচীন কোন নব্বীর ধূসর-বর্ষা।

একের পর এক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হয়ে যাচ্ছে। ভাকরা-লাপালা-দুর্গাপুর-বুরকেনা-নাগাজুন সাগর-নতুন নতুন তুলির টানে ভারতবর্ষ জুড়ে নতুন জীবনের রেখাচিত্র ফুটে উঠতে শুরু করেছে।

সূর্যট খুব সম্ভব সে সন্দের খবর রাখে না। কোনরকম পরিবর্তনের কাঁড়ি সে ধরে না। চারপাশে উঁচু উঁচু প্রাচীর তুলে নিজেকে তার ভেতর নির্বাসিত করে রেখেছে সূর্যট। প্রাচীরটা প্রতীক নয়, নিত্যকৃত আক্ষরিকভাবেই সত্য।

সূর্যট একান্তভাবেই প্রতিবিম্বসী। আধুনিক কাল তার দেউড়িতে এসে থমকে আছে, ভেতরে ঢোকার পথ পায় নি। এখনকার সব কিছুই প্রাচীন, পুরনো। নিজের সর্বাপেক্ষ অতীতের যাদুঘর সাজিয়ে রেখেছে যেন সূর্যট।

ভেতরে ঢুকলেই মনে হয় একালে নয়, মধ্যযুগে কিংবা তারও কয়েক শতক আগের শান্ত আত্মসমাহিত - জীবনযাত্রার ভেতর আসা গেলে।

অমল যখন গাইড তখন সব কিছু দেখাবার এবং বোঝাবার দায়িত্ব তারই। ঘুরে ঘুরে বিশপ হোবারের তৈরি চার্চ দেখাল অমল, প্যালাস দেখাল, পুতুসীজ আর ফরাসীদের ভাঙা কেল্লা দেখাল, ইংরেজদের কারখানার ধূসরবর্ণের দেওয়াল। মারাঠা নারক শিবাজী ইংরেজদের জাড়াবার

জন্য কোথায় আক্রমণ করেছিলেন, দেখাল। এ শহরের যারোটা গেট, গেটগুলো দেখাল।

দেখাচ্ছে আর সূর্যটকে ঘিরে নানা বৃত্তে নানা জাতির লোক লালালা এবং আক্রমণের ইতিহাস বলে যাচ্ছে অমল। বন্ধার ফাঁকে ফাঁকে মোহিতকাকা এবং ললিতা-কাকিমার সঙ্গে ঠাট্টা-ঠাট্টা করছে। ব্যাচির সঙ্গে হান্সি কথার মেতে উঠছে। প্রীতির দিকে মূখ ফিরিয়েও মাকে মাকে মজা করছে। ঘোরের ভেতর অস্পষ্টভাবে হু-হু করে যাচ্ছে প্রীতি।

একটা ব্যাপার লক্ষ করেছে প্রীতি, ললিতাকাকিমা আর মোহিতকাকা পরস্পর কথা বন্ধ করেছেন। কেউ কারো দিকে তাকিয়ে না পর্যন্ত। কারোটা মনে পড়তে আড়ষ্ট বোধ করল প্রীতি। মনে হল, অমল হাত ধরে টেনেছিল ঠিকই। হাতটা ছাড়িয়ে নেওয়া উচিত ছিল। জনতে কত রমণীর দৃশ্য মনোরম দেশ সে দ্যাখে নি। সূর্যট না দেখলেই বা কি এমন কতি হত!

সেই দুপুর থেকে একটানা ঘন্টা করে প্রাচীনকালের স্মৃতিলোকে ঘুরে বেড়ান হল। সোমাল-পাঠান-ইংরেজ-ফরাসী, ডাচ-পুতুসীজ, নানা আমলের ধূসরবর্ণের মাড়ির সারাদিনের ক্রান্তি গভীর মধ্যে এক সময় ভাস্তী নবীর পাড়ে এসে দাঁড়াল অমলরা।

মোহিতকাকা বললেন, 'অশ্রুত জাতিগা। এখানে এসে মনে হয় না একালে আঁচি। এর সারা দেহ জুড়ে শব্দ অতীত, অতীত আর অতীত।'

অমল ভাবকের মতন মুখ করে বলল, 'দিস ইজ এ শোস হুইচ হাজ এ পাল্ট, এ কালারলেস প্রজেন্ট, বাট নো ফিউচার।'

'রাইট।'

ললিতাকাকিমা করল সূর্য ডাকলেন, 'হোটন—'

অমল ফিরে তাকাল, 'কী বললিস সেজদি?'

সেই দুপুর থেকে তো একটা চরকি-কলে ঘোরাফিরা, আর কিছু পারলি না। হাত-পা আমার ভেঙে আসছে।'

মোটামোটো শূদ্রী মালু, সারাদিন ঘোরা-ফুরির কলে মূখখানা ছোট হয়ে গেছে। দুপুরবেলা ঘুমোবার তড়াস, সেই ঘুম-টুকু আজ বিসর্জন দিতে হয়েছে। ফেটে চোখ দুটি আরক্ত, চুলচুল।

সমস্ত দিন টাঙ্গাতেই ঘোরা হয়েছে। কিন্তু টাঙ্গা তো সর্বগাম্য নয়। ইতিহাসের সাক্ষী কেন কেল্লা বা প্রাসাদের সদর দরজা পর্যন্ত তারা পৌঁছে দিয়েছে, তারপর পা দুটোর ওপর ভরসা করে ছেঁটে দেখতে হয়েছে। যে সময়টা ঘূমের জন্য বরাদ্দ তখন এত হাটাইটি ছোটোছোটো সূখের শরীরে সইবার কথা নয়।

অমল বলল, 'ভর নেই।' যা দেখবার দেখা হয়ে গেছে। শব্দ ঐ যে পুন্ডটা দেখলিস—' সারনের দিকে আঙুল ব্যাঙিয়ে দিল অমল।

পুন্ডটা দেখতে দেখতে ললিতাকাকিমা বললেন, 'হ্যাঁ, ওখানে কী?'

‘ওটার ওপর দাঁড়িয়ে সুরাট শহরকে জারেরদার দেখব। দেখাবি হাবির মতন, মনে হবে। জার!’ অমল চলতে শুরু করল।

প্রীতিরও তার পিছু পিছু চলতে লাগল। আর খোঁড়াতে খোঁড়াতে সবাইকে অনুসরণ করতে লাগলেন ললিতাকাকিমা। হঠাৎ আর চাপাগুলার গজ-গজ করছেন, ‘ভাঙাচোরা ইট-পাথরের ভেতর ভেতর মতন ঘুরে ঘুরে কি জানল যে তোরা পাস!’

চলতে চলতে হঠাৎ গমকে লীডাল তুলল। চোখ বড় করে সুর টেনে টেনে বলল, ‘হ্যাঁ রে সেক্সি—’

ডাকের ভাষাতে এমন কিছু আছে কমলের, ললিতাকাকিমা চমকে উঠলেন। তারপর সীলগুণ গলার বললেন, ‘কী বলছিস?’

‘বি এ পর্যন্ত তো পড়েছিলি। হিন্দি তো তোর একটা সবজেক্ট ছিল।’

‘তাতে কী হয়েছে?’

‘কী হয়েছে আবার জিজ্ঞেস করছিস।’

‘বা রে, বুঝতে না পারলে জিজ্ঞেস করব না!’

‘হিন্দির ছত্ৰী হয়ে অতীতের সাক্ষী এই সব জারগা সম্বন্ধে তোর ইন্টারেস্ট নেই!’ মোহিতকাকা হঠাৎ খুব নিরীহ সুরে বললেন, ‘সব ইন্টারেস্ট আপাতত নিয়ম ভেতর নির্বাণ লাভ করেছে।’

ললিতাকাকিমা উত্তর দিলেন না। চেয়ে চেয়ে থেকে থেকে স্থানীর দিকে জাগরণ হোলেন হন হন করে সামনে এগিয়ে গেলেন।

মোহিতকাকা অমলের চোখে চোখ রেখে এবার টিপসী কটলেন, ‘দ্যাখো! দ্যাখো লালাবাবু, আমার মহিষীটি কেমন জেট স্পেনের স্পীড তুলছে!’ মহিষী শব্দটি তিনি বিশেষ অর্থে এবং বিশেষভাবে উচ্চারণ করলেন।

অমল মুখ টিপে হাসল, ‘ওকে মহিষী বললে আপনার নিজের মাথা কিন্তু ঘাঁচি না।’

অর্থাৎ আমাকে মহিষীর ম্যাসিকিউলিন জেডার হতে হয়, এই তো?’

‘রাইট!’

‘ওটা শিরোধার্য করলম।’

সবাই হাসতে লাগল।

মোহিতকাকা হাসাহাসির ভেতর বললেন, ‘তোমার সিন্ধুরটিকে বুঝিয়ে বল, এ চেহারার এমন হর্স পাওয়ারে ছোট ঠিক নয়; মেদিনী কীলয়ে পজেন্সগমনে চললে দামায়ে ভাল!’

এ সবই সন্দিগ প্রস্তাব। দু বছর ধরে প্রীতি দেখে আসছে ললিতাকাকিমার ওপর রাগ করে বা কথা বন্ধ করে খুব বেশি কণ থাকতে পারেন না মোহিতকাকা। স্থানিক গায়ের তারি মুখ চুলকান করতে থাকে। তখন স্ত্রীর চারপাশে ঘুরে ঘুরে শব্দ করেন। নিজেই কেচে সেখে ভাব করে ফেলেন।

তার ঠিকই ছুঁড়ছিল ললিতাকাকিমা, কিন্তু লক্ষ্যভেদ করা গেল না। ললিতাকাকিমা কিরও তাকালেন না তার দিকে।

তাম্বী নদীর পূর্বে লীকিরে সুরাট শহর এবং সুরাট দেখে টাঙ্গার করে এবং

ফেরার পাল। আগের মতনই ললিতাকাকিমা আর মোহিতকাকা একটা টাঙ্গার উঠলেন। প্রীতির আরেক টাঙ্গার।

মোহিতকাকার টাঙ্গারটা আগে আগে চলছে। প্রীতিসেবটা তার পিছু পিছু।

প্রীতি দেখতে পেল, মোহিতকাকা ললিতাকাকিমা, কেউ কারো দিকে তাকানো না; একেবারে বিপরীত দিকে মুখ করে খুব মনোযোগ দিয়ে পুরনো কার্ভির ধংসাবলয় আর ঘুঁলোভাতি বাসতাব সৌন্দর্য দেখছেন। সন্দিগ প্রস্তাবটা বহু হওয়াতে মোহিতকাকার উদ্যমে ভাটার টন ধরেছে; বোধ হয় সেখ মটমট করে নেবার কোন লক্ষণই আপাতত দেখা যাচ্ছে না। শুধুর সেখে মনে হচ্ছে যেন স্মারী-স্মারী না, ডিম্বগ্রহের দুটি অণু মিলে একটা টাঙ্গার তুলে দেওয়া হয়েছে।

তখনকার সেই আচ্ছন্নতার ঘোর পুরো পুরো কান্ট নি প্রীতির; আবছা আবছা মিহি কুমাশার মতন সেটা তার অস্তিত্বকে ঢেকে আছে।

এক সময় অমলের গলা কানে এল। সে ব্যতিক্রমে বলছে, ‘সুরাট কেননা দেখলে ঘাঁচি?’

ব্যতিক্রম উচ্চসিত হয়ে উঠল, ‘সুপার!’

‘কি বকম?’

‘একটা জারগার ডাচ-ফরাসী-ইংরেজ-পল্টু-গীজ-পাঠান-মোগল-হিন্দু, এত জাতের স্পর্ধাচিহ্ন রয়েছে ভাবা যায় না।’ দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল আমি যেন লু শো তিন শো তার শো বছর আগের সেই দিনগুলোতে ঘুরে বেড়াছি। আর আপনি হিস্টোরিক্যাল ইন্ডেস্ট্রালো কা বোকাছলেন! এক কথার চমককার। ব্যতিক্রম চোখমুখ এবং কণ্ঠস্বর হুঁশ হয়ে উঠল।

সুরাট দেখতে আসার আগে সেখানে বসে এ শহর সম্বন্ধে যা যা বলছিল অমল, ব্যতিক্রম গলার তারই প্রতিধ্বনি শোনা গেল।

এমনিতে ব্যতিক্রম তো তরলা, চপলা। কিন্তু তার ভেতর অনাবিস্কৃত চমকপ্রদ একটা দিকও যে ছিল, সে খবর কে জানত! সেখানে ব্যতিক্রম হিসেবী, সূচুতরা। এরই মধ্যে কেমন কোশলে অমলের সজ্ঞা, শব্দ করে দিচ্ছে সে!

কমল শব্দ করে হাসল, ‘ভাল বেরিয়ে পারছিলাম।’

‘সিওর। এমনভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন যাতে ভাঙাচোরা এসব চোঁ-প্যাগেল লিভিং হয়ে উঠছিল। অতীতের দিনগুলো তার সমস্ত প্রায়শ্চর্য আর কালার নিয়ে তৈরী; সমস্ত কুটে উঠছিল।’

ব্যতিক্রমে চিরদিন অকুরে নাকিসবে কাদতেই দেখা গেছে। সে যে এত পুঙ্খিল, এমন সুচোয়, হাঁদে কথা বলতে পারে, প্রীতিও জানা ছিল না।

অমল বলল, ‘তাই নাকি?’

ব্যতিক্রম চুল ব্যিকুরে ঘাড় হেলিয়ে ব্যতিক্রম লিঙ্গিত হল, ‘হ্যাঁ!’

অকম্পে তেখনে ধনুর্ধরন সিংহের বিলীন শানিক আগে সুরাট তার ওপরে কল্যা হয়েছে। সারাবিনের অকম্প-সীতার-কালত পাখিরা এখন অবসর ডানায় দাঁড় টানতে টানতে ঘরে তিবছে। ক্রিনিকার সিকের গলার মতন আবছা অর্থকর নহছে।

ব্যতিক্রম সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ অমল ভেবে উঠল ‘প্রীতি—’

চমকে প্রীতি অমলের দিকে তাকাল। অম্বুটে কাশা গলার সাড় দিল, ‘কী বলছেন?’

‘চুপচাপ বসে আছেন কেন?’

প্রথমটা কী উত্তর দেবে ভেবে গেল না প্রীতি। বিরতভাবে হাসল সে; তারপর কোম-কোমে বলল, ‘কী করব তা হলো?’

কেশর স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের জন্য
ডাঃ নরেন আবিষ্কৃত

এ্যাণ্টি বন্ড

হেয়ার অয়েল
কম্বার করুন।

প্রাপ্তিস্থান :

কিং এণ্ড কোং
কলিকাতা (সকল শাখা)



শুও বিবাহের
শয্যাছব্য ও
অনোমত মশারি

ফোন • ২৪ - ৪৩২৮

অনন্ত চরণ মাল্লিক এওকো

১৬৭/৪, ধর্মতলা স্ট্রীট • কলিকাতা-১৩

অমল বলল, 'কথা বলবেন, গল্প করবেন।'

প্রীতি নিঃশব্দ।

অমল বলল, 'বলুন সুরাট কেমন লাগল?'

'ভালই। অনেকটা—' বসন্তে বলতে থেমে গেল প্রীতি।

'অনেকটা কী?'

'আমার মতন।'

অমল জবাব। আস্তে করে বলল, 'আপনার মতন।'

'হ্যাঁ। ঘরের অভাব থেকে প্রীতি বলে উঠল, আর ভরাবহ একটা জাতীয় আছে; যত মানেও হয়ত আছে। কিন্তু ভবিষ্যৎ নেই।'

অমল ঘরে বসল। পরিপূর্ণ নৃসিংহ প্রীতির দিকে তাকাল সে। অন্ধকার ইতি-মধ্যে ঘন হতে শুরু করেছে; প্রীতির মুখটা স্পষ্ট দেখা গেল না।

থুং কোল শব্দে অমল বলল, 'কি রকম?'

এবার ঘোরাটা যেন কেটে গেল। নিজের শারদ স্বভাবের ভেতর থেকে খানিকটা বেরিয়ে এসেছিল প্রীতি; 'মুহূর্তে' শব্দ আবগম্যে ভগ্নায় নিজেকে ঢেকে দিল সে।

অমল আবার বলল, 'চুপ করে রইলেন কেন? বলুন—'

প্রীতি উত্তর দিল না।

অমলকে এবার ক'খ দেখাল, 'নিজের কথা আপন বলতে চান না কেন?'

আবহা গলায় প্রীতি এবার বলল, 'আপনাকে তো কালই বলেছি, সে কথা শুনাবেন মতন নয়।'

অমল অনেকবার অনুরোধ করল 'অনুনয় করল, ক'খ হল; শেষ পর্যন্ত চুপও করে গেল কিন্তু প্রীতির কথা কিছুই জানা গেল না।

বসন্তে কতুর রোগে সুরাট শহর সারাদিন জ্বলেছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে এখন তার সমস্ত দাহ জ্বড়োবার পালা। বাতাসে হিমের আমেজ মিশতে শুরু করেছে; ঠান্ডা সুখপর্শে বেশ আরামই লাগছে।

কোথায় যেন সুরাট কেটে গিয়েছিল। প্রীতির সঙ্গে কথা জো বলছেই না অমল; এমন কি যথিকার সঙ্গও না। টাঙ্গার চাকার একটানা কাঁচ কাঁচ শব্দ ছাড়া এখন চারদিকে চাপ চাপ নীরবতা।

।। তিন ।।

সুরাট থেকে স্মারক।

স্মারক পা দিয়েই ললিতাকাকিমা যোকা ভগ্নলেন, তিন দিন—পূরো বাহাতর ঘণ্টা তার রেষ্ট চাই। সুরাটে যেতব তাকে ছাটানো হয়েছে এবং টেনে টেনে যেভাবে ঘোরানো হাতে তিনদিন বিগ্রহ ছাড়া একটি পা-ও ফেলতে পারবেন না।

অমল বলল, 'তথ্যসূত্র। বাহাতর ঘণ্টা যাতে বিদ্যায় পড়ে থাকতে পারেন তার ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে।'

স্মারক স্টেশনটি নিত্যই নগণ্য স্টেশনগুলো একেবারেই হরিজন। মোহিত-ভরসা বললেন, 'স্টেশনের যা নমুনা দেখছি

আর এখান থেকে শহরের যেটুকু আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছে তাতে ভাল হোটেল-টোটেল এখানে মিলবে বলে তো মনে হচ্ছে না।'

অমল বলল, 'ভাল হোটেল সত্যি নেই?'

'তাহলে উঠবে কোথায়?'

'মঠে।'

'থাকার ব্যবস্থা কেমন?'

'মন না।' অমল বলল, 'সাধু-সম্মানী-কর ব্যাপার, এখানে গ্র্যান্ড হোটেলের আরাম আর পাচ্ছেন কোথায়?'

'আমি লোহালকড়ের দোকানদার, দরকার হলে কুলীর কাজও করতে হয়। আরামের দরকার নেই আমার। আর দরকার—' বলে আড় আড় দৃষ্টি দিকে তাকালেন মোহিত-কাকা।

চোখাচোখি হতেই, ললিতাকাকিমা বিনম্রমুখে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

অমল বলল, 'তবে একটা কথা জামাই-বাবু—'

'বলে ফেল।'

'আপনি তো একটি মাহের পোকা।'

মঠে কিন্তু মাহ-মাস চলবে না।'

মোহিতকাকা আতঙ্কে উঠলেন, 'আমার গ্যাসট্রিকের অসুখ হয়েছিল। তার ওপর খানদানী একটি আমাশা জড়িয়ে ফেলেছি। মাহ-মাস ছাড়া—'

বাধা দিয়ে অমল বলল, 'কোন উপায় নেই জামাইবাবু। দুখ-ঘি-কীর হানা, এসব থেকেই আপনাকে সাফনা লাভ করতে হবে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে মোহিতকাকা বললেন,

'অগত্যা—'

'এ অঞ্চলের লোকেরা মাহ খাওয়াকে খুব ঘৃণা করে।'

'তাই তো দেখছি।' সারা সৌরাস্ট্র জুড়ে একেবারে ব্রহ্মচর্যের স্কুল খুলে রেখেছে, দিন-কয়েক থাকলে নিখুঁত আশ্রম-বাগল হয়ে যাব মনে হচ্ছে। আগে জানলে কে এদিকে আসত।'

কিছু না বলে অমল হাসল।

টাঙ্গা ডেকে এক সময় মঠে পৌঁছে গেল প্রীতিরা। পৌঁছেই দুখানা ঘর বোকাড় করে ফেলল অমল।

আর ঘরের দখল পেতেই ললিতাকাকিমা বললেন, 'তাড়াতাড়ি একটা বিদ্যায় পেতে নাও তো প্রীতি, আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।'

ক্ষিপ্ৰ হাতে বিদ্যায় পেতে দিল প্রীতি, ললিতাকাকিমা তৎক্ষণাৎ নিজের দেহ তাতে দগ্ধে দিলেন। ললিতাকাকিমা শূন্যে পড়লে পান-টান সেরে রম্যাবাস চাপিয়ে দিল প্রীতি। যথিকারও একটু-আধটু তাকে সাহায্য করতে লাগল। প্রীতির স্নানের সময়টুকুর ভেতর অমল আর মোহিতকাকা চাল-ডাল দুখ-টুখ বোগাড় করে এনেছেন।

রান্না এবং খাওয়া চুকতে কিকল হয়ে গেল।

ললিতাকাকিমা সেই যে শূন্যেছিলেন, মাঝখানে প্রীতির ডাকে একবার উঠে কোন-রকমে পান এবং খাওয়া শেষ করে আবার বিদ্যায় ফিরে গেছেন। মোহিতকাকারও

আরেকটা বিদ্যায় নিজেকে এলিয়ে দিয়েছেন। হোকরা চাকরটার জ্বর ছাড়িয়ে, সে-ও একবারে শূন্যে আছে।

টানা একটি ঘুম দিয়ে ললিতাকাকিমা মেজাজ এবং শরীর এখন অনেকখানি সুস্থ। অমল আর যথিকা তাঁর বিদ্যায়তেই বসে-ছিল। প্রীতি ঘরের আরেক কোণে স্টোভ-টোভগুলো ঠিকঠাক করে রাখছিল। ললিতাকাকিমা বললেন, 'কাল সারারাত টেনে টেনে ঝাঁকুনি খেয়ে কেটেছে। এখন একটু শূন্যে থাক না—'

দু' হাত জোড় করে অমল বলল, 'এই বিকেলবেলা আর শূন্যে বোলো না ভাগিনী—'

'কেন?'

'অবেলায় ঘুমিয়ে তোমার মতন আকার ধারণ করার ইচ্ছে আমার মোটেই নেই।'

'একদিন ঘুমোলেই ফুলে যাবে! থাক তোমার ঘুমোতে হবে না।'

যথিকা এই সময় বলল, 'আমিও ঘুমোব না বৌদি।'

ললিতাকাকিমা শূন্যেছিলেন; 'তাহলে কী করবে শূন্য—'

'চলো জায়গাটা ঘরে দেখে আসি।'

অমল উৎসাহিত হল, 'ভেরি গুড। স্মারক পৌঁছে ঘরে বসে থাকাতা কোন কাজের কথা নয়। উঠে পড় সেজিদি, জামাই-বাবু উঠুন—'

'না বাপু, আমি এখন উঠতে পারব না। আজকের দিনটা তোমরা আর আমাকে টানা-টানি করো না, রেহাই দাও।'

মোহিতকাকার চোখ ঘূমে জুড়ে আস-ছিল। কোনরকমে মেলে জড়িত সূরে বললেন, 'তোমরাই ঘরেটিকে এসো। আমার বয়েস কত হল জানো তো? হাক-সেগুরি হুঁতে চলল। এই বয়েসে দৌড়ঝাপ কি পোষায়।' বলতে বলতে স্মরণ এবং চোখা ঘুগণও দুটোই বুজে এল।

ইতিমধ্যে ললিতাকাকিমা কি ভেবে নিয়েছেন। তাঁর মূখের ওপর দিগে চকিতে পর পর অনেকগুলো টেউ নেচে গেল। উৎসুক সূরে ডাকলেন, 'এই ছোটন—'

'কী বললেন?'

অমল ফিরে তাকাল। 'যথিকে সব দেখিয়ে-টোঁখিয়ে নিয়ে আস। যা—'

'যা রে—'

'কী?'

'অমল বলল, 'জামাইবাবু আর তুই তো ঘাবি না, তোরা পড়ে পড়ে ঘুমো। কিন্তু প্রীতিদেবী তো আর তোদের মতন ঘুড়িতে যাননি। উনি আমাদের সঙ্গে যাবেন। প্রীতির দিকে ফিরে, 'পাঁচ মিনিটের ভেতর রোড হয়ে নিন, কুইক।'

বাসনাকোসন গুছাতে গুছাতে অমলকে দিকে একবার তাকাল প্রীতি। পরক-তার চোখ ললিতাকাকিমা দিকে ফিরল। প্রীতি দেখল স্মারক নিম্পলকে তার দিকে তাকিয়ে আছেন ললিতাকাকিমা। তাঁ চোয়াল লম্বা, দাঁত-দাঁত-চাপা এক কাঁচ-নেমে এসেছে। তাঁর চোখের তারা নিশ্চল ঐ নিশ্চলতার ভেতর একটা পরিষ্কার ইংগিত আছে, স্পষ্ট নিবেশ।

সুদূরে যে ভুলটা করে ফেলেছিল, আরকার তর তা ঘটতে দেবে না প্রীতি। আশ্বেত আশ্বেত অমলের দিকে ফিরে সে বলল, 'না—'

'কী?'

'আমার বন্ধ ঘুম পাচ্ছে, এখন একটু শোব।'

অমল চে'চামেচি করে উঠল, 'পরে ঘুমেবেন। এখন চলুন দেখি। ঘুমোবার জন্যে সারারাত পড়ে আছে।'

'না' প্রীতি মাথা নাড়ল।

প্রীতির এই অশ্রুতে 'না' উচ্চারণটির মধ্যে এমন কিছু ছিল যাতে আর পাঁড়াপাঁড়ি করতে পারল না অমল। শূন্য, বকল, 'খুঁকোঁছ', সেজদির কাছে থেকে থেকে গর হাওয়া আপনার গারে লেগেছে।'

প্রীতি উত্তর দিল না।

একটু পর যুথিকাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল অমল। প্রীতি লক্ষ্য করল, চোখে আবার পলক পড়তে শুরু করেছে ললিতাকাকিমার। চোয়ালের সেই কাঠিন্য আর নেই, মুখটা বেশ নমনীয় দেখাচ্ছে। ধীরে ধীরে তিনি দেয়ালের দিকে পাশ ফিরলেন। বোকা গেল, প্রীতির বিবেচনায় তিনি মোটামুটি ঝুঁকী হয়েছেন।

ললিতাকাকিমার মনোবাসনা বোধে বৈকি প্রীতি। মোহিতকাকার ঐ ভো একটা মাত্র বোন। যুথিকার সঙ্গে যিয়ে হলে তার ভাইটি প্রচুর পাবে। ভাল ছেলে ফেলে একটা বাড়ি পর্যন্ত দিতে রাজী মোহিতকাকা।

বাড়িটা আর পরের হাতে যায় কেন, ভাই-ই পাক। ভাড়াটা স্বামীর সংসারে ব্যাপর-বাড়ির হাওয়া যতভাবে বইবে দেওয়া যায়, মেয়েদের পক্ষে সেটাই কামা।

সত্যিই ঘুম পারানি প্রীতির। বাসনপত্র গুছিয়ে নিঃশব্দে বাইরের বারান্দায় ঢাল গেল। সবেমাত্র সে বারান্দায় পা দিয়েছে মোহিতকাকার ফিসফিসানি কানে ভেসে এল। ললিতাকাকিমাকে তিনি ডাকছেন 'এ্যাঁই—এ্যাঁই—গিন্নী—'

চকিত হয়ে একবার মুখ ফেরাল প্রীতি। দেখল মোহিতকাকা বিছানায় উঠে বসেছেন। এই জন্যেই কি কপট ঘুমটুকুর আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি! হরত। বোকা গেল আরেক বার সন্ধির প্রচেষ্টা চলবে।

হঠাৎ চোখাচোখি হয়ে গেল মোহিতকাকা বিরত বোধ করতে পারেন। কাঁড়েই একটু দূরে আড়ালে গিয়ে রেলিংয়ের ডর দিয়ে দাঁড়াল প্রীতি।

এই পড়ন্ত বেলার রোদের রঙ হলুদ হয়ে উঠেছে। সামনের দিক যতদূর চোখ যায়, কোন কিম্বরই নেই। রাস্তাগুলো ধুলেয় হসর। তার দু'ধারে সারিবদ্ধ বাড়ি-ঘরের চেউ, সেগুলোর গায়ে অকুণ্ঠ দীনতা ফুটে আছে।

কালানের নেশাপ্রমত্ত বাতাস কাঠি-ফুটো-পাতা-জুজাল নিয়ে হঠাৎ হঠাৎ ঘুরি ঘোরাতে ঘোরাতে ছুটে যাচ্ছে। আকাশের নীল ছুঁয়ে ছুঁয়ে নান-না-জানা কটা পাখি

ডানা মেলে স্থির হয়ে আছে। অনেকদূরে তিন-চারটে নারকেল গাছ একপায়ে দাঁড়িয়ে।

অলস চোখে 'তারিক' তারিকের দেখাছিল প্রীতি। সে দেখার ভেতর মনোযোগ ছিল না, বিশ্লেষণ ছিল না। দেখতে দেখতে হঠাৎ যেন চোখের সামনের দৃশ্যপট ঘুরে গেল। নিঃশব্দে চোরাপায়ে একটা ভাবনা কখন যে তার সম্পূর্ণ দখল নিয়ে বসেছে, নিজেরই খেয়াল নেই। সে ভাবতে লাগল, যুথিকার এখন কী করছে? কোথায় কোথায় বুরে বেড়াচ্ছে? অমল বোঝাতে পারে চমৎকার। যুথিকা মিথো বলেনি, সুত্রাটের দু'ল-প্রাসাদ-গীর্জা দেখাতে দেখাতে অমল যখন তাদের ঐতিহাসিক পঞ্চাংপট বর্ণনা করে যাচ্ছিল, তখন যুথিকা একা কেন, প্রীতিও কি মৃগ হযনি? অমলের কণ্ঠস্বর চমৎকার। যেমন হাসতে পারে, তেমনি হাসতে।

এলোমেলো, অসংলগ্ন, টুকরো টুকরো ভাবে ভাবনাটা বিচিত্র সুরে ঘুরে ঘুরে দেখা দিচ্ছে, যুথিকার মতন ফুটে উঠছে, অল্প অল্প দাঁলিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ প্রীতির নিজেকে বুঝে নিঃসঙ্গ মনে হল। মোহিতকাকা ললিতাকাকিমা ঘরের ভেতর রয়েছেন; যুথিকা-অমল বেড়াতে বেরিয়েছে। অপর স্মারকায় আকাশতলায় সে একা একা দাঁড়িয়ে আছে।

মানুষের সঙ্গে বুঝ একটা পছন্দ করে না প্রীতি। পছন্দ ঠিক নয়, কারো কাছে



পোড়া... কাটা... পোকার কামড়

এই সব আকস্মিক দুর্ঘটনায়

এ্যাক্সিমেন্ট

চর্বিবর্জিত এ্যাক্সিমেন্টিক মলম

সিরাপন ও নির্ভরযোগ্য

সক্রিয় প্রতিরোধক □ সবর আনামবাহক

শিশুদের কোমল ত্বকের

পক্ষেও নিরাপদ □ দাপ লাগে না



বেঙ্গল ইন্ডিনিটির তৈরী



হাতের কাছে রাখুন

যেতেই তার তলসীম সন্মোচ। বৃকের ভেতর-
কার সবগুলি দরজাই তার বন্ধ। সেগুলো
খুলে যে বেরিয়ে আসবে, হাসিতে উচ্ছ্বাসে
মুখর হয়ে উঠবে তেমন সাধ্য প্রীতির নেই।
গৃহ-গোপন একটা ভয় সব সময় তাকে
বেষ্টন করে আছে।

তবু প্রীতির মনে হল, একা একা এভাবে
দাঁড়িয়ে থাকার চাইতে অমলদের সংগে
গেলেই হত। অমল তো মাঝার জন্য ডেকে-
ছিলই। কিন্তু—কিন্তু ডাকলেই কি পা
বাড়ানো যায়! ললিতাকাকিমার চোখের সেই
নিশ্চল তারাদুটোর কথা মনে পড়ে গেল
প্রীতির।



আমার বস্তু ঘুম পাচ্ছে...

অমল আর যুথিকার জগৎ তার কাছে
নিষিদ্ধ। স্পর্শভাবে কিছু বলেননি ললিতা-
কাকিমা তবু বোধা যায় সেই জগৎটার চার-
দিক ঘিরে অদৃশ্য একটা সীমারেখা টেনে
দিয়েছেন।

প্রীতি এবার নিজের ওপরেই বিতর্ক
অনুভব করল। কেন সে অমলদের কথা
ভাবছে? নিজের অন্তহীন দুঃখ বিষাদ আর
মস্তিষ্কার ভেতর বন্দী হয়ে থাকা ছাড়া তার
আর কোন পথ নেই।

কতকগ নানা বিরুদ্ধ মতো দোল
খেয়েছে, মনে নেই। আচমকা গুরু গুরু
আওয়াজ কানে আসতেই চমকে উঠল প্রীতি।
কখন যে তার অনামনস্কতার সুযোগে অকাল
থেকে ফলগুনের রোদ চুপিসাড়ে অদৃশ্য
হয়েছে কে বলবে।

মতকগই অনামনস্ক হয়ে থাক প্রীতি,
এত তাড়াতাড়ি রোদের বিদায় নেবার কথা
নয়। প্রীতি জানে পশ্চিম দিকে হত যাওয়ার
যাবে, অন্ধাংশ নাকি দ্রাবিণ্য। কিসের চক্রান্তে
যেন সেখানে সুবোধায় এবং সুবাস্ত—
দুইই বিলম্বিত। অতএব অনায়াসেই দিনের
জালো তরেকটু দীর্ঘায় হতে পারত।

কিন্তু না, সন্ধ্যা নামনি। রোদটাকে
বিগলেকের দেউড়ি পার করিয়ে যারা

আকাশের দখল নিলেছে তারা হ'ল চাপ চাপ
মন মেঘ। এই ফাল্গুন মাসটা ঝড়-বৃষ্টির
মরশুম না। তবু অকালে মেঘ জমেছে। আর
এ-মেঘ শরতের জ্যোতিন তবঘুরে মেঘ না;
এ রীতিমত মন্থর এবং জলবাহী। স্মারকার
আকাশ জুড়ে তারা আবাদ-প্রাকণের স্মৃতি
ফিরিয়ে এনেছে।

দেখতে দেখতে বৃষ্টি নেমে গেল। প্রথমে
ফোঁটায় ফোঁটায়, তারপরে ঝিরঝিরিয়ে,
অবশেষে জোরে জোরে প্রবল বেগে। তার
সঙ্গে বিদ্যুতের চমকানি তাকে; মেঘের
গজ-ও সমানে সঙ্গত করে যাচ্ছে।

মন্থতার মধ্যেই কখন যে সন্টার গভীর
স্তরে কোথায় যেন একটা ঘন ছায়া পড়ল;
প্রীতি জানে না। নিজের অজান্তে একটা
হতাশা নাকি অনাকিছু টেউয়ের মতন
জান্তে আস্তে সমস্ত আশ্বিনের ওপর
ছাড়িয়ে পড়তে লাগল।

একসময় ছুটতে ছুটতে যুথিকার কাছে
এসে পড়ল। ভিজ্ঞ একেবারে নেয়ে উঠেছে
তারা; চুল থেকে জামা-কাপড় থেকে জল
ধরছে। বৃষ্টিতে ভেজাটা যেন পরম
কৌতুকের খেলা; দু-জনেই হেসে হেসে
উঠছে।

কাছাকাছি আসতেই অমলরা দাঁড়িয়ে
পড়ল।

অমল বলল, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির
শোভা দেখছেন নাকি?'

আবছা গলায় প্রীতি বলল, 'না—
মানো—'

'তখন যে বললেন ঘুমোবেন; ঘুমো-
বার নমুনাটা তো বেশ।'

প্রীতিকে মিথ্যা বলতে হল, 'ঘুমিয়ে
পড়েছিলাম, মেঘের ডাকে ঘুম ডেকে গেল।
বাইরে এসে দেখি বৃষ্টি পড়ছে।'

অমল বলল, 'আমাদের সংগে গেলেই
কিন্তু পারতেন।'

'কি আর হত, ভিজ্ঞ চুপচুপে হয়ে
তাসতে হত। নগদ একটি জ্বর, কম করে
সিঁদ-হাচি-কাসি ইত্যাদি লাভ হত।' নিজের
অজান্তে যেন খানিক প্রগলভা হয়ে উঠল
প্রীতি।

'আজ্ঞে না ম্যাডাম—'

প্রীতি জিজ্ঞাসা চোখে তাকাল।

অমল রগড় করে বলল, 'আরো কিন্ত
লাভ হত।'

'কী?'

'যুথিকা একটা জিনিস দেখে এসেছে
আপনিও দেখতে পেতেন।'

'কী জিনিস?'

ঠোট টিপ হাসতে হাসতে অমল বলল,
'যুথিকে জিজ্ঞাস করুন।'

প্রীতি যুথিকার দিকে তাকাল; তার
মুখ আরক্ত হয়ে উঠেছে। চোখ নামিয়ে
অক্ষুট জড়িত স্বরে যুথিকা বলল, 'তলসী'
বলেই ঘরে পালিয়ে গেল।

প্রীতির চোখ এবার বিমর্ষের মতন
অমলের দিকে ফিরল। অমল চোখের কোণে
দুঃখমি ফুটিয়ে বলল, 'আজকের দিনটা
ধৈর্য ধরুন, কাল আপনাকেও দেখিয়ে
জানব।'

প্রীতি কি বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই
অমল ঘরের ভেতর অদৃশ্য হল।

দিনের শেষে সেই যে অকাল-বর্ষা শুর
হয়েছিল তার আর থামবার নাম নেই। বেদু
ধূলুধী মেজাজে বিলম্বিত লয়ে সে তার
ধরেছে। সমের মাথায় তবলার ঠেকো দেবার
মতন থেকে থেকেই বাজের আওয়াজ জোনা
যাচ্ছে।

এক ঘরে এখন সবাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে
বসে আছে। মোহিতকাকী বললেন, 'কে
বলবে এটা ফাল্গুন মাস, একেবারে আবাদ-
প্রাকণের সঙ্গে পাল্লা দিতে শুরুর করেছে।'



উত্তমকুমার ॥



কটো : ভবুত



মাধবী মৃৎপাখ্যায় ॥



মৃৎ : অমৃত

অনিম চট্টোপাধ্যায় ॥

স্বামী'র দিকে তাকিয়ে ললিতা কহিলেন, 'আজকের রাতটা কিভাবে কাটবে?'

বোকা গেল মোহিতকাকার সঙ্গে তাঁর সান্নিধ্য হয়ে গেছে। সান্নিধ্যের সতর্কতা কী তা তখনো অজান্তেই থেকে গেল।

বাই হোক, মোহিতকাকা একেই সময় 'আমল' প্রণত হয়ে ওঠেন। তখন আর তাঁর স্থানকালপাতের জ্ঞান থাকে না। সান্নিধ্য দিকে ফিরে গদগদ স্বরে বললেন, 'কী জন্যে প্রিয়ে?'

'চাদের মূড়ি দিয়ে আরাম করে একখানা ঘুম দেবার জন্যে।'

'এই কথাই যে বলবে, আমি তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু চাঁদবদনি—'

সম্ভাষণের এই প্রণততায় রাগ করলেন না ললিতাকাকিমা। চোখ কুচকে হাসি-হাসি মুখে বললেন, 'কী?'

'ও তো তোমার বাসনা। কিন্তু ব্যবস্থার মানে, অমল যদি-বাঁধের বরসী ছেলে-মেয়েদের মনোবাসনা কী জানো?'

'কী?'

'কালিদাসের মেঘদূত পাঠ। নইলে বৈষ্ণব কবিদের বর্ণনায় কবিতা।' বলেই শব্দ করে আবৃত্তি করতে লাগলেন:

'রমণি কাজর বন ভীম ভূজপায়
কুসুম পরা নরবায়।

গরজ তরঙ্গ মন রোম বিরম্ব ঘন
সংসার পড় অভিসার।।

সজনি, বচন ছড়াইত মোহি লাজ
হোএত সে হোও বরু সব হম অঙ্গিকর
সাহস মন দেল আজ।।

আবৃত্তি শেষ হলে লাফিয়ে উঠল অমল, 'আরে জামাইবাবু—'

চুপুটে গিয়ে চোখের কোণে তাকালেন, মোহিতকাকা, 'বলে ফেস ব্রাদার।'

'আমি তো ভেবেছিলাম, হাত-পায়ের তলার মনটাকে অনেক আগেই সমাধি দিয়ে বসে তপছেন। কিন্তু, এ-সে দেখছি তলার তলার এতদূরে গোড় মাইন। আরেকটা কবিতা ধরুন—'

'উঃ! বললাম তো এসব আবৃত্তি-টাবৃত্তি তোমাদের জন্যে। আমাদের মতন হাড়-সেঁকুরিওলাদের জন্যে কী জানো?'

'কী?'

'এই বর্ষার রাতে মূগের ডালের খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজ!' বলেই কান মূলে জিত কাটলেন মোহিতকাকা, 'সর্বনাশ! কোথায় বসে ইলিশ মাছের ধান করছি!'

তাঁর মুখ-চোখের চেহারা দেখে সবাই হেসে উঠল। হাসির মাতামাতি কিছু কমলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, মোহিতকাকা প্রীতিকে বললেন, 'আ প্রীতি, মাছ ভো হব না। তুই এমন খিচুড়ি কর। অবশ্য খিচুড়ি নম্রুটার সঙ্গে ইলিশ মাছের একটা স্পিরি-চুয়াল লিঙ্ক আছে। তা আর কি করা হবে!'

অমল বলল, 'খিচুড়ি মিলতে পাবে একটি মাত্র সতে'।'

'কী?'

'আমো আবৃত্তি করতে হবে।'

'অমৃত্যু।' মোহিতকাকা আরো তিন-চারটে বৈষ্ণব কবিতা আবৃত্তি করে অমলকে বললেন, 'আমার স্টক খতম। এবার তোমরা শোনোও!'

অমল বলল, 'আমি কিন্তু সংস্কৃত কি মৈথিলী কিছু জানি না, আমার ভরসা রবীন্দ্রনাথ।'

'রবীন্দ্রনাথ সব অগতির গতি।'

'নাও হে, শব্দ করে দাও—'

রবীন্দ্রনাথের গোটা সাত আটক কবিতা আবৃত্তি করল অমল। তারপর যুথিকার পালা, সে-ও তিন-চারটে কবিতা শোনাল।

এই সময় ললিতাকাকিমা বলে উঠলেন, 'আমি কিন্তু অবস্টি-টাব্টি করতে পারব না, আমার কিছু মনে নেই।'

অমল বলল, 'তোমার কিছু করতে হবে না; তুই শব্দ যোগান্না প্রাকটিশ করে যা।' বলে হঠাৎ প্রীতির দিকে তাকাল, 'গড় হেভেন, আমরা শব্দ গলা ফাটিয়ে মরলাম। প্রীতিদেবী তো কিছু করলেন না। তা হবে না।'

অক্ষুট কাঁপা গলার প্রীতি বলল, 'আমি—আমি—'

মোহিতকাকা বললেন, 'সবাই যখন রিসাইট করেছে তোমারও কিছু করা উচিত প্রীতি—' বলতে বলতে কি মনে পড়তে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, 'আরে তুই তো ইচ্ছে করলে আমাদের সবার ওপর টেক্সা দিতে পারিস। মেঘদূত, কুমারসম্ভব উভয় কিছু একটা আবৃত্তি কর না—'

ইম্ব বিম্বের মতন অমল বলল, 'মেঘদূত কুমারসম্ভব উনি জানেন?'

'জানা কো উচিত। ওর বাবা ছিলেন কাব্যভীষ্ম; আমাদের ওদিককার সবচাইতে বড় সংস্কৃতের গণ্ডিত। তাই মেয়ে মেঘদূত-টুট জানবে না।'

এবার অমল প্রীতির পেছনে লাগল, 'আপনাকে ছাড়ছি না, মেঘদূত শোনতেই হবে।'

বিস্তৃত লম্বিত প্রীতি ললিতাকাকিমার দিকে তাকাল। যে কারণেই হোক তাঁর মেজাজটা এখন বেশ প্রসন্নই আছে। বললেন, 'কর না আবৃত্তি; সবাই যখন বলছে—'

প্রীতি শব্দ করল। পরো মেঘদূতখানা, মেঘদূত কেন—কালিদাসের সব কাব্যই তার প্রায় কলংক। প্রথমে অনুরক্ত সলম্বল কাঁপা গলার: তারপর ধীরে ধীরে বত এগুতে লাগল ততই সশ্কাচ কাটতে লাগল। সূরটা তার বাঁশির মত মিষ্টি, 'মিষ্টি এবং সজীব। কখনও সেটা চড়ায় উঠছে, কখনও নামছে। দেখতে দেখতে কালিদাসের কবিতা আর বাইরের অকাল বর্ষা কখন যে একাকার হয়ে গেল কেউ জানে না।

সবাই মুগ্ধ চমৎকৃত। এমন কি ললিতাকাকিমা পর্যন্ত। অবাকভাবে তাকিয়ে আছেন।

আবৃত্তি শেষ হলে সম্ভাষিত মত ফিলিসফিসিয়ে তখন বলল 'এমন রেসিটলেন আমি তার কখনও শুনিনি।'

৥ তিন ৥

পরের দিন সকালে আকাশ একবারে পরিষ্কার। একটা রাত জামা-জামা

অপ্রাপ্ত চলের তেতর কাটিয়ে বসে বসে জামার তার আপন স্বভাব ফিরে পেরেছে। অতএব চা-টা খেয়ে অমলরা বোরেরে পড়ল। আজ ললিতাকাকিমা, মোহিতকাকা আর প্রীতিও তাদের সঙ্গে আছে।

স্বামিকা ছোট জামগা—মন্দিরময় দেশ। মন্দির ছাড়া আর কোন বিশেষ্যই এখানে নেই। এর যা কিছু, বস্তাকরকের ভেতর দেখা হয়ে যায়।

ঘুরে ঘুরে তখন ভদ্রকালী মন্দির দেখাল, সিম্বনাথ শিবের মন্দির দেখাল। স্মারকাধীশ বণছোড়জীর মন্দির দেখা অংশেই আসা গেল মুকুণ্ডী মন্দিরে।

মুকুণ্ডী মন্দিরের পরিবেশটা চমৎকার। শান্ত, নির্জন, কোলাহলশূন্য। অংশেপাশে কোথাও মানুষের বসতি নেই। পশ্চিমে যতদূর চোখ যায়, জার্ম সাগর। সমুদ্র এখানে বিপুল বিশাল ধানশস্য হয়ে আছে।

অমল বলল, 'আমি তবু যদি কলি মন্দিরটা দেখে গিছি; আমরা আর আর যাব না। জামাইবাবু আপনি সেকলিতে নিয়ে ভেতরে যান।'

মোহিতকাকা প্রীতিকে ডাকলেন, 'তুইও আর প্রীতি—'

'না, প্রীতিদেবী এখন যখন না। তখনোনা আগে ঘুরে আসুন।'

মোহিতকাকা কি বলেন তিনিই জানেন। আর কিছু না বলে ললিতাকাকিকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। প্রীতি লক্ষ করল অন্যদিকে মুগ্ধ ফিরিয়ে যুথিকা শব্দ হাসছে, অমলের চোখে মুখেও সিম্বল সশ্কাচক হাসির ছটা। হাসিটা বেন সব বাধা চুপকার করে ফোয়ারার মতন ফুটে বেরুতে চাইছে; অমল প্রাণপণে সবলে সেটাকে উচ্ছ্বসিত হতে দিচ্ছে না।

প্রীতি অনুমান করল, তাকে নিয়ে অমল আর যুথিকা কোন গভীর বাক্য মেতেছে। মনে মনে খানিক উদ্ভিষ্ট উঠল সে।

একবার তখন আরেকবার যুথিকা— ফিরে ফিরে কিছুক্ষণ দূরত্বকে দেখল প্রীতি। তারপর বলল 'কাকাদের সঙ্গে আমাকে বেতে মিলেন না কেন?'

অমলের চোখে দৃষ্টিমির হাসিটা হল-কাছেই। সে বলল, 'এ মন্দিরে স্বামী-স্ত্রী ছাড়া চুকে নেই।'

'যাদের বিয়ে হয়নি?'

'তাদের একলা একলা বেতে হয়।'

কিন্তুই বৃষ্টি পারা মাছে না। আর কিছু না বলে উৎসব লম্বল আর জামাই হলের মধ্যে প্রীতি দেল খেতে লাগল।

একটু পর মোহিতকাকা ললিতাকাকিমা মন্দির থেকে বোরেরে এলেন। অমল তাদের চোখের তলে দিয়ে অমল 'আপনারা গোত্রা নদীর ঐ মুখটার দিকে এগিয়ে যান। আমরা ভাসছি।'

মোহিতকাকার চলে গেলেন।

অমল এবার প্রীতির দিকে ফিরল। মন্দিরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'যান, ভেতরে গিয়ে দেখে আসুন।'

প্রীতির মন আগেই সঙ্গিন্য হয়ে উঠছিল। সে বলল, 'না, আমি যাব না।'

‘যেতেই হবে। সবাই দেখেছে, আপনি না দেখে যেতে পারবেন না।’ একরকম ঠেলে-ঠেলেই প্রীতিকে ভেতরে পাঠিয়ে দিল অমল।

মন্দিরে ঢুকে দেয়ালের দিকে তাকাতো ফাখ-মুখ খা-খা করে উঠল প্রীতির; তার দিকে পাথরে খোদাই সারি সারি মিথুন-মূর্তি। এক পলকের বেশি সে মূখ্য দেখা যায় না; প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রীতি ছুটে বেরিয়ে এল। এতক্ষণে তমালের স্বপ্নমন্টা ধরা পড়েছে।

প্রীতি শুনছে, পুরীতে আর কোনারকো এ-জাতীয় মিথুনবংশ মূর্তি দেখা যায়। সোরাষ্ট্রের এই মন্দিরেও যে তারা থাকবে, কে জানত।

বাইরে আসতেই অমল বলল, ‘কোন দেখলেন?’

ফিস-ফিস আপসা গলায় প্রীতি বলল, ‘আমি কিছু দেখিনি।’

‘দ্যাখেননি?’ বলেই হো-হো করে ধীরে ধীরে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে হেসে উঠল অমল। এতক্ষণ যে হাসিটা সে ঠোঁটের প্রান্তে টিপে রেখেছিল এবার সেটা সব বাধা সারিয়ে দু’দু’ম বেগে বেরিয়ে এসেছে।

প্রীতি তাকাতো পারছিল না; যামে তার জামা-টামা ভিজে উঠেছে; মাথাটা যেন ঝলিল হয়ে যাবে কুলে পড়ছে। অমল যে এতবড় ফাজিল কে ভেবেছিল। তবু কি আশ্চর্য, কি নিলম্বজ বুদ্ধিকাটা; তমালের সঙ্গে ভাল দিয়ে দিয়ে সে-ও সমানে হেসে উঠেছে।

খানিক পর প্রীতির দিকে গোমতী নদীর মোহনায় এল অমল। গোমতী এখানে সমুদ্রে মিলেছে।

মোহিতকাকার আগেই এসে গিয়ে-ছিলেন; প্রীতির জন্য তারা অপেক্ষা করছেন।

জামাটা মনোরম। চাই চাই পাথর চারিদিকে ছড়ানো। ইতিমধ্যে পুনশ্চর মতন পাথরের পর নড়ি; তারপর বালুকাবেলা।

সমুদ্রের পাড়টা কিছুক্ষণ ঘুরে দু’দু’র-বেলা টাঙ্গায় করে সবাই মঠে ফিরে এল।

কালকের মতন আজও বিকেল বেলা বুদ্ধিকা আর তমলকে বেড়াতে পাঠালেন লালিতাকাকিমা; কিন্তু না বলেও শব্দ চোখের তারা নিষ্কল করে প্রীতিকে ধরে রাখলেন। দু’দু’র পর্যন্ত ঘুরে ফুর্তি হয়ে পড়েছিলেন মোহিতকাকা, তিনিও বেরলেন না।

আজও নতুন্যর আগে আগে স্মারকর আকাশ মেঘে মেঘে ছেয়ে গেল এবং দেখতে দেখতে বৃষ্টিও নামল। আজও ভিজতে ভিজতে ফিরে-এল অমলরা।

কাল রাতে আশ্বিনের আসর বসেছিল। আজ মোহিতকাকা তাদের প্যাকেট বার করলেন।

লালিতাকাকিমা বললেন, ‘আমাকে বাদ দিয়ে—’

‘মানে?’ মোহিতকাকার চোখ জিজ্ঞাস, হয়ে উঠল।

‘আমি খেলায় হার’

‘মেষ জেঁকেছে, বৃষ্টি পড়ছে; নিগ্রা সাকনা শব্দ হবে, এই তো?’

‘ঠিক ধরেছে। ওনব তাস-কাস আমার ভাল লাগে না।’

অগত্যা প্রীতিকেই বসতে হল।

‘অমল বলল, ‘কে কার পাটনার হবে?’ মোহিতকাকা বললেন, ‘তুমি তবু বুদ্ধি আমি আর প্রীতি—’

‘বেশ।’

বুদ্ধিকা বলে উঠল, ‘না।’

মোহিতকাকা জিজ্ঞাস, চোখে তাকালেন, ‘কী হল?’

‘তুমি আর আমি পাটনার হবে দাদা।’

অমল না জানতে পারে কিন্তু বুদ্ধিকা তো জানে কেন এত যোজন পাড়ি দিয়ে সোরাষ্ট্র আসা হয়েছে। মোহিতকাকার সামনে অমলকে পাটনার করে বসতে তাই বোধহয় লজ্জা হচ্ছে তার।

‘ওসজ্জা, তাই।’

খেলা শব্দ হল।

প্রীতি শব্দ ভালো খেলতে পারে না।

যদিও একটু-আধটু পারত, বুদ্ধিকাণী মন্দিরের সেই ব্যাপারটা তাকে একেবারে সম্বুদ্ধিত করে রেখেছে। অমলের জন্যই তার বিরত, কুস্তিত তবুস্বা। আর তারই পাটনার হয়ে কোন তাসের পিঠে কোন তাস সে ফেলছে, কী ডাকছে—নিজেই বুদ্ধিকা জানে না। কাজেই হারের পর হার চলল।

হতাশ সুরে অমল বলল, ‘আপনি আমাকে ডোবায়ে দেখাচ্ছি; একটু মন দিয়ে খেলুন।’

মনোযোগ দিতে গিয়ে আরো ভুল করতে লাগল প্রীতি।

একসময় হাতের তাস উল্টে রেখে অমল বলল, ‘আমি একটু, বাইরে থেকে আসছি।’ বলে বেরিয়ে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ হল অমল বাইরে গেছে, ফিরছে না। বুদ্ধিকা বলল, ‘কি ব্যাপার, এত দেরি করছে কেন?’

মোহিতকাকা বললেন, ‘বোধহয় সিগারেট টিগারেট থাকে; আমার সামনে তো স্মোক করে না।’

নতচেয়ে চুপচাপ তাস নাড়াচাড়া করছিল প্রীতি। বৃষ্টি করে কিসের আওয়াজ হতেই মুখ তুলল। সঙ্গে সঙ্গে চোখাচোখ হলে গেল। মরজার বাইরে নিজেই আড়ালে রেখে তমল হাতছানি দিচ্ছে। একহাতে হাতছানি দিচ্ছে, আরেক হাতের তল্লাশী ঠোঁটের ওপর স্থির। অর্থাৎ নিঃশব্দে চুপ-সড়ে বাইরে যেতে বলছে সে।

বুঝি বিপদ— বোধ করল প্রীতি। বুদ্ধিকাণী মন্দিরের সেই অভিজ্ঞতাটা এখনও এত টাটকা, এত অস্বস্তিকর যে অমলের কাছ যেতে সাহস হচ্ছে না; তাকে নিরে কোন বিপজ্জনক কেতুকের খেলার তমল মেতে উঠবে কে বলবে?

সমানে হাতছানি দিয়েই বড়জ্ব অমল; বোকা যায় সে বেশ তদ্রিক; হয়ে উঠেছে। হাড় কিরিয়ে একবার বুদ্ধিকা আর মোহিত-কাকাকে দেখে নিল প্রীতি। না, ওরা অমলকে লক্ষ্য করেননি।

কোনবে অমল হাতছানি দিয়ে বড়জ্ব তাতে আর বসে থাকা ঠিক নয়। বুদ্ধিকারা দেখে ফেললে কি ধারণা করবে কে জানে। শ্বাসরুদ্ধের মতন উঠে নিঃশব্দ পায়ে বাইরে এল প্রীতি।

অমল বলল, ‘কখন থেকে আসতে বলছি। আসেন তবু না।’

ভয়ে ভয়ে আড়ট গলায় প্রীতি বলল, ‘আসতে বলছেন কেন?’

‘আপনি তো খেলতে যেনই আমাকে ডোবাতে শুরু করেছেন। এখন মন দিয়ে আমার কটা কথা শুনুন।’

‘কী?’

‘আপনার হাতে কী তাস থাকবে আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়, আমার হাতে কী তাস থাকবে আপনার পক্ষেও জানা অসম্ভব। তাই কটা কোড শিখিয়ে দিচ্ছি। যদি খুব খুব করি কাসি বুদ্ধিবেন ইচ্ছাপনের বিবি আছে, যদি বলি ‘হেভেন’ বুদ্ধিবেন চিড়ি-তনের গোলাম।’ বিভিন্ন তাসের সংকেত বুঝিয়ে অমল বলল, ‘আপনার হাতে কী কী তাস আছে জানাকার জন্যে এরকম কাশবেন, হেভেন বলবেন, বুদ্ধিবেন? আপনি আগে ঘরে যান, আমি পরে বাছি।’

প্রীতি অবাক, মাথার কত ফাঁদ-বে-খেলে অমলের!

এবার খেলতে বসে প্রীতির জিজ্ঞাসে লাগল। প্রথমটা বাধা বাধা ঠেকেছিল; সংকেতগুলো সব মনে করতে পারছিল না প্রীতি। তারপর খেলতে খেলতে ব্যাপারটা বেশ মজাদার হয়ে উঠল। মনে করে করে সে কাশতে লাগল, হেভেন বলতে লাগল। তাস খেলার বাইরে আরেকটা বিচিত্র খেলার স্বপ্ন যে প্রীতি মজে গেছে, নিজেই জানে না।

খেলা ভালল অনেক রাতে। বৃষ্টি তখনও চলছে। আজ আর খিচুড়ি হয়নি; পর পর দু’দিন খিচুড়ি খেয়ে পাকস্থলীটাকে বিপদ করার সাহস হয়নি মোহিতকাকার। আজ ভাতেরই ব্যবস্থা হয়েছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর আড়ালে পেয়ে অমল প্রীতিকে বলল, ‘আমাদের ঐ কোডের ব্যাপারটা কেউ যেন জানে না। শব্দ আপনি আর আমি। আমি তবু আপনি।’

নির্দোষভাবেই কথাটা বলছে অমল, তবু কেন জানি প্রীতির হৃদপিণ্ডের ভেতর দিয়ে দুরন্ত বেগে স্বপ্নের বয়ে গেল।

II চার II

লালিতাকাকিমা জানিয়েছিলেন তিন-দিনের আগে স্মারক ছেড়ে নড়বেন না। কিন্তু দু’দিনের বেশি স্মারক তাঁদের ধরে রাখতে পারল না।

এখানকার বা-কিছু দর্শনীয়, প্রথম দিনেই দেখা হয়ে গিয়েছিল। তার পরেও একটা দিন তারা ছিলেন। তৃতীয় দিন লালিতাকাকিমা বললেন, ‘এখানে আর থেকে কি হবে, অন্য কোথাও চল।’

মোহিতকাকার টিপনী কাটলেন, ‘বাহার’র বণ্টার আগে, আমরা ছাড়বে না বরোহিঙ্গে। তবে আটচালিশ স্বপ্ন—

ললিতাকাকিমা চোখ পাকলেন, 'কাক-
লমি করতে হবে না।'

মোহিতকাকা বললেন, 'তবে আর কি,
গাটিরয়া বাধো হে মসুফের—'

স্বারকা থেকে ওথা। উদ্দেশ্য, বেট
স্বারকা দেখতে যাওয়া।

ওথায় এসে ডাকবাংলোর উঠল প্রীতির।
একটা স্নান সেখানে কাটিয়ে পরের দিন
ভোরে মালপত্র রেখে বেট স্বারকার রওনা
হওয়া গেল।

ওথা বন্দর থেকে নৌকায় করে বেট
স্বারকার যেতে হয়। বেট কথাটার অর্থ
স্বীকৃতি; বেট স্বারকা সমুদ্রের মাঝখানে।

অমল একটা নৌকা ঠিক করে ফেলল।
হুথিকা ছেলেমানুষের মতন হাততালি দিয়ে
উঠল, 'কি মজা! আমি আগে আর কখনো
নৌকোয় উঠিনি। হোয়াট এ ফাইন এক্স-
পিরিয়েন্স।' বলেই সে উঠে পড়ল।

হুথিকার পর উঠলেন মোহিতকাকা,
তারপর ললিতাকাকিমা।

প্রীতি তখনও পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে।
অমল বলল, 'উঠুন—'

নৌকায় পা দিতে গিয়ে হঠাৎ কি ঘটে
গেল প্রীতির; শ্বাসনলীটা কেউ যেন দ-
হাতে সবলে চেপে ধরল। চোখের তারা স্থির
হয়ে গেল; হৃৎস্পন্দন বৃথিবা প্তব্বই হয়ে
গেছে। গোষ্ঠানির মতন একটা আওয়াজ
বেরিয়ে এল তার গলা দিয়ে, 'না—না—'

অমল চমকে উঠল, 'কী হয়েছে প্রীতি-
দেবী, কী হয়েছে?'

উন্মাদের মতন প্রীতি চেঁচিয়ে উঠল,
'আমি নৌকায় যাব না, যাব না—'

সন্নেহ গলার অমল বলল, 'কেন, কেন?'

প্রীতি হুতুতে পারল, এভাবে অন্যদের
বিস্ত কড়া জন্মায়। সবার সঙ্গে নৌকায়
করে বেট স্বারকার যাওয়াই উচিত। বস্তু
জ্ঞান এই চমৎকার আলোকোজ্জ্বল সকালটির
সবাই সেখানে অন্যদের সঙ্গে টলোমলো,
সেখানে এমন একটি বিদ্রী কান্ড বাধানো
ঠিক না। কিন্তু নিজের কোন ইচ্ছাই এখন
নিজের ওপর জিরা করছে না। সমানে সে
গোষ্ঠিত লাগল, 'না—না—না—'

মোহিতকাকা স্থিরদৃষ্টিতে প্রীতিকে
দেখছিলেন। তাড়াতাড়ি নৌকা থেকে নেমে
এসে বসলেন, 'থাক, ওর নৌকায় উঠতে হবে
না।'

ললিতাকাকিমা সন্নেহে আদ্র-বুরে
বললেন, 'না, প্রীতির গিয়ে কাজ নেই।'

মোহিতকাকা বললেন, 'আমি প্রীতিকে
ডাকবাংলোর রেখে আসছি; গুপী তো
আছেই। দৃজনে খানিকক্ষণ থাকুক। বেট
স্বারকা দেখতে আমাদের হবে বেশিক্ষণ
লাগবে না।'

প্রীতিকে নিয়ে মোহিতকাকা একটা
টাক্সি উঠলেন।

অমল বিমূঢ়ের মতন দাঁড়িয়ে রইল।

মোহিতকাকার পাশে অজ্ঞানের মতন
সঙ্গে আছে প্রীতি। টাক্সি দু'লকি সালে
ছাড়বে। ওথা বন্দর, মাঝিঘাটা, গুটিমুখাটা,

সমুদ্র, শ্রিয়ের ভ্রমশ দূরে—আরো দূরে সরে
গিয়ে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

দুলোভরা পথের দু'ধারে দোকানপসার,
অলঙ্কারি চেহারা বাড়িঘর, গাছপালা। কিন্তু
কিছুই দেখতে পাচ্ছে না প্রীতি কিংবা দেখ-
লেও তার চেতনায় সে সব রেখাপাত করতে
পারছে না। আরব সাগরের পটে এই ওথা
বন্দর তার সমুদ্র, তার মলিন চেহারা—সব
ধীরে ধীরে চোখের সামনে থেকে মূছে
হচ্ছে।

একটু আগে নৌকায় উঠতে গিয়ে এমন
একটা প্রতিজ্ঞা কেন ঘটে গেল? প্রীতির
চাইতে কে আর তা ভাল জানে। মোহিতকাকা
অবশ্য জানেন; জানেন বলেই তাকে ডাক-
বাংলোর রেখে আসতে চলেছেন। ললিতা-
কাকিমাও জানেন, তাই তাঁর কণ্ঠস্বর সহানু-
ভূতিতে কেমন হয়ে উঠছিল। অমল জানে
না বলেই বিমূঢ় হয়ে গেছে।

কিন্তু মোহিতকাকা, ললিতাকাকিমা বা
অমল কারো কথাই এখন ডাবছে না প্রীতি।
তার সমস্ত আনন্দ এই মুহূর্তে 'কি এক
প্রবল উজ্জান টানে দূর্বীর গতিতে কয়েক
বছর আগের কতকগুলো শ্বাসকৃৎস্ন দিনের
মধ্যে ফিরে যেতে লাগল। সেই টান সেক্ষেত্রে
রাখবার মতন শক্তি প্রীতির নেই।

সেই পুরনো ইতিহাস।

প্রীতির আদি তিকানা ঢাকা জেলার।
ঢাকা শহরের উল্টোদিকে বড়ীসংসার
ওপারে ধানের খেত, পাটের বন আর আম-
জামের ছায়ার ঘেরা কোণাখোলা নামে একটি
গ্রামে। যেন এ কালের গ্রাম না। সভ্যতার
আদিম উদ্যায় যে কৃষিজীবন শূন্য হয়েছিল
কোণাখোলা তার থেকে খুব বেশি দূর এগিয়ে
আসতে পারেনি। পৃথিবী জুড়ে কত শিল্প-
বিশলয় রাষ্ট্রবিশলয় ঘটে গেছে, কোণাখোলা
তার কিছু থাকত না। রাখালিয়া গ্রাম ভাটি-
হালি আর 'প্যাস্টোরাল ল্যান্ড' মোহ তাকে
আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

বাবা ছিলেন কাব্যাতীর্থ; তিন পুরুষ
আগে বাড়িতে টোল ছিল; ইংরেজি ভাষার
হাতের মুখে তা উড়ে গেছে। তাই বলে
বাবা সংস্কৃত চর্চা ছাড়েন নি; ঢাকার এক
নামকরা স্কুলের তিনি ছিলেন হেড পিওন।

মা-ও ছিলেন নৈয়ায়িকের মেয়ে—শান্ত,
স্নিগ্ধ, ছায়াছন্ন দীর্ঘটির মতন শীতল।
বারি কাছে এলে দেহমন যেন জড়িয়ে যেত।
মা বাগ করতে জানতেন না, ছেলেমেয়েদের
ওপর হাত তুলতে পারতেন না। কথায় কথায়
ছিল তাঁর হাসি।

ভাইবোন মিলিয়ে প্রীতির তিনজন।
প্রীতিই সবার বড়।

পৈতৃক জন্মজমা ছিল, পুকুর ছিল, গরু
ছিল চারপাঁচটা, তার ওপর স্কুল থেকে আর
তো 'ছিলই। সুখ আর স্বচ্ছলতা যেন প্রীতি-
দের সংসারে উছল পড়ত।

ঢাকা বোর্ড থেকে স্কুল ফাইনাল পাশ কর-
বার পর বাবা কলেজে ভর্তি করে দিলে-
ছিলেন। সোজা সকালবেলা খেয়েদেয়ে তাকে
নিয়ে খেয়া পৌঁছিয়ে ঢাকার চলে যেতেন
বাবা; তাকে কলেজে পৌঁছে দিয়ে নিজের
স্কুলে যেতেন। ফিরতেনও দু-জনে এক-
সঙ্গে।

বেদিন প্রীতির কলেজ আগে ছুটি
হয়ে যেত, বাবার স্কুলে চলে আসত। নইলে
বাবাই তার কলেজে যেতেন। তারপর খেয়া
পৌঁছিয়ে বাড়ি ফেরা।

দিনগুলো ছিল মসৃণ, মনোরম,
দুর্ভাবনাশূন্য। অপার স্নিগ্ধতার ভেতর
একটা রমণীয় স্বপ্নের মতন জীবনটা কেটে
যাওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু কাল না।

কোথায় বিহার, কোথায় পাজাব, কোথায়
নোয়াখালি আর বিহার—জুগোলের নানা
প্রান্তের এই নামগুলো যখন জড়লছে,
মানুষের ধকথাকে গাঢ় রঙে ভিজে যাচ্ছে
তখনও কোণাখোলা আত্মসমাহিত। নোয়া-
খালি-বিহারের ছায়া সেখানে পড়েনি। কত
ক'দিন আর।

দেখতে দেখতে দেশ ভাগ হয়ে গেল।
তারও পর দু'দিনে বহর কাটল। প্রীতি
যখন খাড়া ইয়ারে পড়ছে নেই সমর এখানকার
হাটি দুলে উঠল। ঢাকা জেলার এই প্রান্তে
পৃথিবী যেখানে নিরন্তর অশ্রুস্রাব,
অতর্কিতে সেখানে প্রলয় নেমে এল।

অতর্কিতে কি? আবহাওয়া ধীরে ধীরে
কখন উত্তপ্ত হতে শুরু করেছিল; প্রীতি
খোয়াল করেনি। সচেতন হয়নি। যখন খোয়াল
হল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

মনে পড়ছে, সেদিন সকালবেলা 'খয়ে-
দেয়ে যখন ঢাকার বায়ু তখনও আকাশ নিম্নে,
তখন কোন উত্তেজনা ছিল না। কিন্তু
বিকলে বাবার সঙ্গে বাড়ি ফেরার রাত্তি
ঢাকার চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। ক'টা
আর বয়সের ফলায় তখন মৃত্যু বলকালে।
চিংকারে-আগুন-ধ্বংস-হত্যায় ঢাকায় তখন
নরকের আসর। সভ্যতার সমস্ত বিবর্তন
অগ্রাধা করে সেই দিনটা যেন প্রাগৈতিহাসিক
কালের আদিম অন্ধকারে ফিরে গিয়েছিল।
আর বর্ষার বৃষ্ণের একদল জন্তু বা খুঁশি
করার সনদ হাতে পেরে ঢাকার পথে পথে
টল দিয়ে ফিরছিল।

কলেজ ছুটির পর বাবাকে তাঁর স্কুল
থেকে নিয়ে তখন প্রীতি বেরিয়ে পড়েছে।
খেয়াঘাটের কাছাকাছিও এসে পড়েছিল।
হঠাৎ প্রচণ্ড হস্রা কানে এসেছে। ঢাকার
পেছন ফিরতেই প্রীতির হৃৎপিণ্ড জমাট
বেঁধে গেছে, শ্বাসপদার্থ সড়কি আর হেঁরা
বাগিয়ে তাদের দিকেই ছুটে আসছিল।
উল্লাসে তাদের চোখ জ্বলছিল; লকলকে
জিভ বেরে লালা ঝরাছিল।

বাবা প্রথমটা দিশেহারা হয়ে পড়ে-
ছিলেন। লক্ষ্যতলা-মুছকটিক অথবা কুয়ার-
সম্ভবের কোন পক্ষেতেই এই শ্বাসপদার্থের কথা
লেখা নেই। একটা মাত্র মুহূর্ত স্তব্ধতাই
স্তম্ভিত বিমূঢ়তা সবলে সারিয়ে নিয়ে
প্রীতির হাত ধরে উদ্দেশ্যবাসে খেয়াসেকার
দিকে ছুটেতে শুরুর করেছিলেন। ছুটিতে
ছুটিতে বাবা বলছিলেন, 'ওদের হাত থেকে
বোধ হয় নিস্তার নেই। তবু আমাদের
বাঁচার চেষ্টা করতে হবে। ছোট্ট, আরো
জোরে ছোট্ট—'

লক্ষীর সবটুকু শক্তি পায়ে সঞ্চারিত
করে ছুটছিল প্রীতিরা। ছুটছিল, ছুটছিল
আর ছুটছিল।

বাবার গলা আবার শোনা গিরোছিল, 'আমি থাকতে তোকে কেউ হুঁতে পারবে না। কিন্তু আমি যদি মরি তুমি হুঁতে চেষ্টা করিস। সবকিছুর কলমে বেঁচে লাভ নেই। যে বাঁচায় গৌরব সেই মর্যাদা নেই তা মৃত্যুর চাইতেও জঘন্য।'

বাবা যে ইংগিত দিয়েছেন প্রীতির বৃক্ষে অসুবিধে হয়নি।

খেয়া নৌকায় মাঝিরা অনেক কলন চেনা। তারা বলছিল, 'ডর নেই পাঁড়ত-মলাই, নিদিয়া। আমরা যখন আছি তখন তুমি বাঁচায়া আগুনগো কিছু করতে পারবে না। জান দিয়া বাচাম্—'

নৌকায় উঠে পড়েছিল প্রীতির মাঝিরা প্রাণও দিরোছিল কিন্তু তাদের বাঁচাতে পারেনি। মাঝিদের পর এসেছিল বাবার পাল্লা; একটা আঘাত হাত ছোয়ার ফলা তার হৃদপিণ্ডে আঘাত ঢাকে দিয়েছিল। মুহূর্তে হতে হতে প্রীতি বৃক্ষে পার্শ্ব ছিল নৌকোটা কতর বেগে কাঁচা যেন উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

তারপরের সাতটা দিন এই নৌকোতেই কেটে গেছে প্রীতির। তার এই সাতদিনের স্মৃতি জড়ে শব্দ চাপ চাপ বস্তাদায়ক অন্ধকার। এই সাতদিন পৃথিবীতে সর্বোদয় হয়েছে কিনা, বাতাস হয়েছে কিনা প্রীতি কলতে পারবে না। জগতের সব স্রোত সব সুরঙ্গ যেন থমকে গিরোছিল। সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং অনুভূতি শূন্য হয়ে গিরোছিল। জীবনও নয়, মৃত্যুও নয়—দুয়ের মাঝখানে মুহূর্তে কতকগুলি এক স্তম্ভতায় ভেতর প্রীতির অস্তিত্ব স্তম্ভিত হয়ে গিরোছিল।

বর্ষান্তর অসংখ্য কাহিনী সে শুনতে, পড়তে। কিন্তু এই সাতটা দিন তার ওপর দিয়া যা করে গেছে তার তুলনায় এই কাহিনীগুলো নিতান্তই ফিকে বিবর্ণ।

সাতদিন পর পুলিশ তাকে উদ্ধার করে গ্রামে পৌঁছে দিয়েছিল। কিন্তু এ কোন গ্রাম! এই কি তার আজন্মের চেনা কেপাখোলা!

সাতদিন অর্থাৎ একটা সপ্তাহ। এক সপ্তাহ সে কোপাখোলার ছিল না। তার ভেতর কাঁচা যেন শান্ত সিন্ধু ড্রায়-সর্দিবিধ প্রাণটাকে ডলে-পিখে পাঁড়িয়ে বিরাট একটা ধনসম্পদ তৈরি করে রেখে দিয়েছিল।

গ্রামে কবে আগুন লেগেছিল কে বলবে। তবে প্রীতি এসে দেখেছে তখনও বরগুলো ষিকিষিকি জলছে। রাসটাইল জাপ; থেকে থেকে বৃষ্টি পড়ছিল। তাদের বর্ষাও সব আগুন নেভাতে পারেনি। দমকা জ্বলন্ত বাতাসে ভেজা ছাই উড়ছিল। আর সমস্ত গ্রামখানা জুড়ে ইতস্তত বৃতদেব হাঁড়িয়ে ছিল। সব মিলিয়ে কোপাখোলা যেন এক বিশৃঙ্খল ভয়াবহ মহামাশান।

নিজদের বাড়টাকে অবশ্যই হুঁতে পেরেছিল প্রীতি। কিন্তু রাশি রাশি অগ্নি-ছাড়া তার আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। চারদিকে ছড়ানো মৃতদেহগুলোর রক্তের থেকে মা আর ছোট ভাইবোনদের আঁকড়কড় গিরোছিল সে।

সেদিন প্রীতির মনে হরোছিল সে উন্মাদ হয়ে যাবে কিন্তু হয়নি। বাবা তাকে ইংগিত দিয়েছিলেন আত্মহত্যা করতে। তা-ও পারেনি সে। শব্দ একটা সোলসায়িত আগুনের নদীতে ভেতর দিয়ে কিভাবে কানের সহায়তার বল কাতার এসে পৌঁছেছিল আজ আর মনে পড়ে না। কলকাতার এসে আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারারে দ্বারারে সে ঘুরেছে। সবাই প্রচুর সহানুভূতি জানিয়েছে, তার দুখে বিগলিত হয়ে প্রচুরতর সান্ত্বনা দিয়েছে কিন্তু আশ্রয় দায় নি। হস্ত আশ্রয় দেবার মতন শক্তি বা উদারতা তাদের ছিল না। সবাই যখন ফিরিয়ে দিয়েছে তখন আত্মীয় না, স্বজন না, সম্পর্কও নেই—এই মানুষি, মোহিতকালা, তাকে কাছে টেনে নিয়েছেন।

বাবা বলছিলেন যে-জীবনে গৌরব নেই মর্যাদা নেই তা মৃত্যুর চাইতেও জঘন্য। অগৌরব আর অমর্যাদার জীবন নিয়েই বেঁচে আছে প্রীতি। তবে একটা নিদারুণ প্রতিজ্ঞা তার ঘটেছে; প্রাণের সবগুলি দমকা একে একে বশ হয়ে গেছে। জগতের কোন উল্লাসে সে সাড়া দিতে পারবে না, কোন উৎসবে কাঁপিয়ে পড়তে পারে না। নিরুৎসব নিরুল্লাস এক হস্তস্তার ভেতর একটু একটু করে সে হারিয়ে যাচ্ছে।

ডাকবাংলোর তাকে পৌঁছে দিয়ে মোহিতকালা কখন ওখা বন্দরে ফিরে গেছেন, প্রীতির খেয়াল নেই।

এখন সম্ভ্য। দেখতে দেখতে চাঁদ উঠে গেল। অলক্ষ্য চোখের দৃষ্টির এই শহরটাকে এখন আর চেনাই যাচ্ছে না। কে এক বাদকর কি যেন মন্ত্র পড়ে তাকে আশ্চর্য মোহমগ্ন করে নিয়েছে।

ডাকবাংলোর সামনের দিকে একটা বারান্দা মতন সেখানে একটি চেয়ারে চুপ-চাপ বসে আছে প্রীতি। মোহিতকালা দুপুরবেলা তাকে খেয়ে নিতে বলেছিলেন, প্রীতি খায় নি। দুপুর ভরস্কর অতীতটা সারাদিন ধারাল তীব্রের ফলার তার সমস্ত অস্তিত্ব বিনষ্ট করে যাচ্ছে।

অনেক রাত্রে মোহিতকালা ফিরে এলেন। ফিরেই খেতে বসলেন। প্রীতির খাবার ইচ্ছা ছিল না, শরীর খারাপের অজু-হাতে সে এড়তে চাইছিল। মোহিতকালা এড়াতে দিলেন না, একরকম জোর করেই খেতে বসালেন মোহিতকালা।

খেতে খেতে ওখা বেটো স্মারকর গল্প করছিলেন। প্রীতি শুনতে পাচ্ছিল ঠিকই কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছিল না। দু-বছর আগের সেই দিনগুলো তাকে স্তম্ভিতও বিহবল করে রেখেছে। তবে খেতে খেতে একটা ব্যাপার অনমনস্কের মতন প্রীতি লক্ষ করেছে, কেমন যেন বিহর চেপে তার দিকে তাকিয়ে আছে অমল। চোখা-চোখি হলোই অবশ্য অনাস্থিক মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে প্রীতি। তারপর আবার, মতগার অমলের দিকে তাকিয়েছে। সেই বিবাদমগ্ন কদুশ চোখদুটি তার ওপর নিরুৎসব।

সমস্ত দিন ঘোরাঘুরি গেছে, শরীরের অসীম প্রান্তি মাথা। খেয়েদেয়েই মোহিতকালা শব্দে পড়েছেন। প্রীতিও শব্দেছে।

শব্দেছে কিন্তু ঘুম আসছে না। প্লানগুলো প্লাজ যেন ঘনত্বের ছিলার মতন কবে বাধা। ওগুলো শিথিল হয়ে ঘুমের ভেতর যে আস্তে আস্তে ঘুবে বাধে তার কোন লক্ষণ বোকা যাচ্ছে না।

খানিকক্ষণ এপাশ ওপাশ করে উঠে পড়ল প্রীতি, বাইরের বারান্দায় এসে মুহূর্তে বৃষ্টি নিরুৎসব শহরের দিকে তাকিয়ে রইল।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল খেয়াল নেই। হঠাৎ পিঠে হাতের স্পর্শ পেতেই চকিত ভরাত প্রীতি ফিরে তাকাল। অমল—অমল এসে পাশে দাঁড়িয়েছে।

জ্যোৎস্নামাথা তরল অশ্রুকারে জ্বলন্ত মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। অক্ষুণ্ণ কাঁপা গলার প্রীতি বলল, 'আপনি!'

অমল যেন তার কথা শুনতে পেল না। গাঢ় আবেগের সুরে বলল, 'আজ বেটো স্মারকর বাবার সমর জমাইবাচ্চা উপন্যাস সব কথা বলেছেন। মানুষের এত যে দুঃখ হতে পারে আমার ধারণা ছিল না।'

প্রীতি কিছু বলতে চেষ্টা করল, পারল না। বৃকের অতল থেকে ঢেউয়ের মতন কলে ফুলে কি যেন উঠে এসে তার শ্বরটাকে বুজিয়ে দিল।

II পাঁচ II

বেটো স্মারকর থেকে জন্মগড়।

জন্মগড়ে এসে উপরকোট লুণ্ণ দেখা হল। দামোদর কুন্ড, রেবতী কুন্ড, হুচকুন্ড মহাদেবের মন্দিরও বাদ গেল না। অকস্মেৎ আদ্যাশক্তি অম্বাজীর মন্দির। গির্দারি পাহাড়ে হাজার লশেক সিঁড়ি ভেঙে অম্বাজীর মন্দিরে পৌঁছতে হয়।

এত সিঁড়ি বাওয়া গলিতাকাকিমার পক্ষে সম্ভব না। তিনি নীচেই থেকে গেলেন, মোহিতকালাও হাক সেগুরীর দোহাই দিয়ে সিঁড়ির হাত এড়ালেন। বাকি তিনজন হুঁধিকা, অমল এবং প্রীতি ওপরে উঠতে লাগল।

প্রীতি উঠছে আর লক্ষ্য করছে অমলের দৃষ্টি তার দিকেই নিরুৎসব। বেটো স্মারকর থেকে ফিরে আসার পন কি যে হয়েছে অমলের, সবসময় তার দিকে তাকিয়ে আছে।

হঠাৎ অমল বলল, 'হুঁধিকা, প্রীতিদেবী—একটা বাজি ধরা যাক।'

প্রীতি জিজ্ঞাসা চোখে তাকাল।

অমল বলতে লাগল, 'একটা বাজি ধরা যাক।'

'কী বাজি?'

'যে আগে মন্দিরের চুড়ায় পৌঁছতে পারবে তাকে বাকি দুজন এক সের এক সের করে প্রাণ্ডি খাওয়াবে।'

হুঁধিকা বলল, 'ওরে বাবা, কু সের প্রাণ্ডি খেয়ে মরব না কি?'

অমল উজ্জল কৌতুকর সুরে বলল, 'তোমার কি ধারণা, কাস্ট হবে?'

'কোন সম্ভেদ নেই।'

'বল কি প্রাণ্ডি?'

'ঠিকই বলছি ব্যাংগ আপন ডো। জানেন না কলেজ আর ইউনিভার্সিটিতে

স্পোর্টসের সবগুলো ফান্ট প্রাইজ আমার বাবা।

বুকের কথা বিশ্বাস কি।

পত্রিকা হয়ে থাক।

অমল বলল, 'অল রাইট।' প্রীতির দিকে ফিরে, 'আমি কি পারব?'

প্রীতি বলল, 'আমি কি পারব?'

'নিশ্চয়ই পারবেন।'

একটু ভেবে আশেত আশেত প্রীতি বলল, 'জীবনে আমি কোনদিন এমন প্রতিযোগিতায় নাছি নি।'

অমল বলল, 'কোনদিন নাছেন নি, ভাতে কী হয়েছে। আজ নেমে পড়ুন।'

প্রীতি চোখ নামিয়ে কাঁপা গলায় প্রায় নিশ্বাসে বলল, 'শুধু শুধু, নামা। হৃদয়কার সঙ্গে আমি পারব না।'

অনেকখানি হৃদয়ে ক্রমেন করে বেন অমল বলল, 'পেরেও তো যেতে পারেন।'

প্রীতি চুপ।

অমল এবার তাড়া লাগল, 'আর দেরি করবেন না, রোগ চড়াড়িয়ে বাড়ছে। শুধু করে নি—'

সিঁড়ি ভাঙার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গেল।

হৃদয়কার সঠিকভাবে ডাল স্পোর্টস-ওম্যান। কাঠবিড়ালির মতন তরতর করে পুস উঠতে লাগল। অমল পুস, যৌবনের অপরিণত শক্তি তার মধ্যে জমা হয়ে আছে। সেও সমানে সিঁড়ি বাইছে। কখনও হৃদয়কার হু সিঁড়ি এগিয়ে যাচ্ছে, কখনও অমল।

প্রথমটা প্রীতির বাধা বাধা জাগছিল। জালদ-উল্লাসের ভগ্ন থেকে সে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে তার পক্ষে এমন অকল্পনীয় হৃদয়ে মেতে ওঠা সহজ না। কানিসটা ওঠার পর হঠাৎ নিজের মধ্যে ছোড়ের টান অনুভব করল প্রীতি, বুকের সেই মরু-পড়া বন্ধ দুয়ারগাছি যেন একটু একটু হলে যেতে লাগল।

একবার যখন ছোড়ের টান লেগেছে তখন আর নিজেকে আটকে রাখতে পারল না প্রীতি, সেও ভেসে গেল।

কিন্তু অমল আর হৃদয়কার অনেক ওপরে: প্রায় পাশাপাশি চলছে। প্রাণপণে সিঁড়ি কেটেও তাদের হারা যাচ্ছে না। বরং দ্রুত আরো ছেঁড়ি যাচ্ছে।

অমলের দিকে চোখ রেখে প্রীতি উঠছিল। উঠতে উঠতে অর্ধকণ্ঠে তার হৃদ-শিল্পিত কি এক প্রতিজ্ঞা ঘটে গেল। মনে হল, এই প্রতিযোগিতা যেন তিন জনের না, দু'জনের আর হৃদয়কার মধ্যে। এতে হেরে গেল তার জীবন নিরর্থক হয়ে যাবে। কিছুতেই—কোনমতেই হৃদয়কারকে বাঁচি জিততে দেওয়া হবে না। সমস্ত সংকল্প আর শক্তি একত্র করে পা চালাতে লাগল প্রীতি। কিন্তু রাখখানের ফাঁকাটা একই রকম থেকে যাচ্ছে, কিছুতেই সেটা অতিক্রম করা যাচ্ছে না।

একটানা সিঁড়ি বাইতে বাইতে হুটু-হুটু একসময় যেন ভেঙে এল, বুকের ভেতর স্বাস এল হৃদয় হয়ে। ধীরে ধীরে প্রীতির গতি শিথিল হয়ে আসতে লাগল। অকল্পনীয় সঙ্গে দ্রুত ক্রমশ যেতে যেতে লাগল। কেমন যেন শূন্যতা বোধ করল প্রীতি।

কতগুলো সিঁড়ি নীচে ফেলল অশ্রুজীর্ণ হৃদয়ের দিকে কতখানি প্রীতি উঠেছে, কে বলবে। হঠাৎ একসময় ওপর থেকে হাওয়ার তরঙ্গে অমলের গলা ভেসে এল, 'তাড়াডাড়ি প্রীতিদেবী, হারিআপ।'

না, অমল তবে তার কথা ভোলে নি। তাকে লেহনে ফেলে হৃদয়কারে নিয়ে চড়ায় পৌছবার ইচ্ছা অমলকে তাহলে পেয়ে বসনি। হরত-হরত। নতুন উল্লাসে আবার উঠতে চেষ্টা করল প্রীতি। কিন্তু উৎসাহটা যতখানি সজীব, শরীর তিক্ত তত-খানিই ক্লান্ত। তার মধ্যে এতটুকু উদ্যমও আর অবশিষ্ট নেই। দ্রুত আরো—আরো পিছিয়ে পড়তে লাগল সে। হাজার চেষ্টাতেও নিজের ভেতর এতটুকু গতিবেগ সঞ্চারিত করতে পারল না প্রীতি।

পিছিয়ে পিছিয়ে অসীম শূন্যতার ভেতর প্রীতির মনে হতে লাগল, অমল আর হৃদয়কার সঙ্গে উল্লাসের মতন পাখা দিতে যাওয়া বাবা-বুঝাই। মাঝখানের দ্রুত পৌঁছিয়ে কোনদিন সে তাদের জ্বাতে পৌঁছাতে পারবে না। জীবন তাকে আব-জনার মতন যে অতল অন্ধকারে হুঁড়ে দিচ্ছে সেখান থেকে উঠে উঠে চড়ায় পৌছানো অসম্ভব।

আশেত আশেত নিজীব অবসর পায়ে এবার উঠছিল প্রীতি। হঠাৎ দেখা গেল, ভরতর করে তম্বল নেমে আসছে। কাছাকাছি এসে সে বলল, 'কি হল, হঠাৎ স্পীড কমায়ে দিলেন যে?'

প্রীতি বলল, 'আমি আর পারছি না।' 'সে কি, এখনও তো অর্ধক ওঠা হলান। তাড়াডাড়ি পা চালান, হৃদয়কার কিন্তু বাঁচি জিততে হবে।'

'হৃদয়কারই তো জিতবে, আমি আপনাকে আগেই বলছি। ওর সঙ্গে পাখা দেবার কোনরকম যোগাটাই আমার নেই।'

স্থির নিবন্ধ চেয়ে একটুকু ভাবিয়ে রইল অমল। কি বুঝল সে-ই জানে। গড় গভীর শ্বরে বলল, 'জানেন, আপনার গলা নীচে নেমে এলাম।'

কাঁপা গলায় প্রীতি বলল, 'কেন নামলেন?'

'আপনাকে ওপরে তুলবার জন্যে।'

'আমার পক্ষে ওপরে ওঠা কি সম্ভব?'

'নিজের সম্মুখে আপনার এ দীনতা কেন?'

প্রীতি বলল, 'আমার সব কথাই তো মোহিতকারক কাছে নুনেজেন।'

অমল বলল, 'শুনো।'

'তবে?'

'আপনার হৃদয়ের শেষ নেই জানি। তবু আমার মনে হয়, আপনি ফুরিয়ে যাবেন। জীবনকে আবার নতুন করে শুরু করার এখনও সময় আছে।'

প্রীতি কিছু বলল না, পরিপূর্ণ চেয়ে অমলের দিকে তাকাল।

অমল বলল, 'তাড়াডাড়ি পা চালান, হৃদয়কার কিন্তু অনেক দূরে উঠে গেছে।'

৥৥৥

কুমাগড় থেকে গির কলকট। সেখানে সৌরাস্ট্রের মুক্ত সিংহ লেখে প্রভাসলজনে। প্রভাসে এসে ডাক-বাংলায়ই থাকার ব্যবস্থা হল।

অনেক ঘোরাঘুরি হয়েছে। মোহিতকারক বললেন, 'কলকাতা থেকে কানিন হল বৌরয়েছি বল তো?'

ললিতাকাকিমা বললেন, 'আজকে নিয়ে পঁচিশ দিন।'

মোহিতকারক বললেন, 'এখানে দু'দিন থাকব, তারপর সোজা কলকাতা। পঁচিশ দিন এ্যাবসেন্ট, ব্যবসাপত্রে ওলিকে বো-হর জাটে উঠে ফস আছে।' কলকাতার জন্য চক্কল হয়ে উঠেছেন মোহিতকারক।

প্রথম দিন প্রভাসে সুবাসিনীর দেখা হল, নেহাৎসর্গ দেখা হল। তারপর আসা হল সোমনাথের হৃদয়ের।

সুসন্তান মাঘদ সোমনাথের যে গ্রামের লুট করে ধনসম্পদ তৈরি করে দিয়েছিল, প্রকৃত সোমনাথ হাওয়া হল। তারপর নতুন হৃদয়ের।

নতুন হৃদয়ের বাঁককের দরজা খুললে সমুদ্র—আরব সাগর। প্রীতিরা যখন সেখানে পৌঁছল, তখন দিনটা দুপুরের পেরিয়ে বিকেলের ঢেউড়িতে ফসকে আছে।

অমল বলল, 'কম্বলবন্ধনের সঙ্গে আমি সেবার যখন এখানে এসেছিলাম তখন ছিল পূর্ণিমা। চাঁদের আলোয় সমুদ্রকে বা দেখার কি বলব! সুপার্ব!'

ললিতাকাকিমা হিসেব-টিসেব করে বলেছেন, 'আজও তো পূর্ণিমা রে—ভরা পূর্ণিমা।'

অমল বলল, 'এখন পূর্ণিমা, আজ সম্মোহন সবাই সমুদ্রের ধারে এসে কব।' প্রভাসটা বিনা বাধায় পাশ হয়ে গেল।

অমল আবার বলল, 'কালও তো আমরা থাকছি, কালও আসব।'

কেউ প্রতিবাদ করল না।

সম্মোহন প্রীতিরা যখন সমুদ্রের পারে এসে পৌঁছল, চাঁদ উঠে গেছে।

আরব সাগর বঙ্গোপসাগর নয়। এমনকি যে অফ বঙ্গোপের উদ্যমতা উজ্জলতা তার নেই। কুলের বালাটির মতন সে লাল, স্নিগ্ধ, মনোহারিনী। কিন্তু পূর্ণিমার হাতে ভরা কোটালে তার চোখের গেছে সম্পূর্ণ বদলে। এখন সে আরব সাগর, এখন কল্পালিত, কেনারিত উল্লাসে কলকল যোলায় এয়ে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে সে।

জ্যোৎস্নার চারিদিক ভাসে ভাসে। সমুদ্রের দিকে বকুর চোখ যায় আরব সাগরকে নির্মিত পেয়েছে। চাঁদের আলোর বিভ্রান্ত একদল সী-গাল পাখি পাখা খাপটিয়ে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। বাতাসকে রাশি রাশি হাওয়ার লম্বার মতন জ্বলছে।

জ্যোৎস্নার সন্ধ্যা বোধহয় বাতাস কর। কিছুক্ষণ বিহ্বলের মতন ফসে থাকার পর হঠাৎ অমল উঠে লাড়ল। বলল, 'সেজীব, আর একটা কিছু করা থাক।'

‘কী করবি?’ ললিতাকাকিমা ডাইরের দিকে তাকালেন।

‘লুকোচুরি খেলি আর।’

‘লুকোচুরি!’

‘হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওঠ। জামাইবাবু উঠে পড়ুন। যুধি প্রীতিদেবী-বী রোড—’

শান্তকৃত সুরে মোহিতকাকা বললেন, ‘কি ছেলেরা-বি হচ্ছে অমল?’

অমল বলল, ‘কলকাতায় তো পারবেন না, লোহালকড়ের তলায় সবসব চাপা দিয়ে রেখেছেন। কিছুক্ষণের জন্যে না হয় এখানে ছেলেদেরকে ফিরে গেলেনই। দেখবেন, খারাপ লাগবে না।’

একরকম জোর করেই সবাইকে লুকোচুরি খেলার নামাল অমল। প্রথমটা না-না করে মোহিতকাকারা শেষপর্যন্ত রাজী হলেন। তারপর কখন যে এই সমুদ্রতীরে তারা অশ্রুবিপ্লব হয়ে গেলেন, নিজেরাই জানেন না।

ছুটেতে ছুটেতে লুকোতে লুকোতে প্রীতির শব্দ মনে হতে লাগল—এই সমুদ্র না, এই জ্যোৎস্নার ঢল-নামা আকাশ না, নিশ্চুসারসেরা না—অমল, অমল ডাকে এক রমণীর উৎসাহের ভেতর নিয়ে এসেছে।

পরের দিন বেরবার সময় প্রীতির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ অমল বলল, ‘একটা ব্যাপার কদিন থেকে দেখছি।’

‘তী কখনে তো?’ প্রশ্ন করে প্রীতি তাকাল।

‘তার আগে বলুন তো সেজাদিরা কি আপনাকে ভাল শাড়ি-টাড়ি কিনে দায় না?’

‘মাকে প্রীতি বলল, নিশ্চয়ই দান।’

‘তবে রোজ এসব বাজে মার্কী কাপড় পড়ে বেগোন কেন?’—প্রীতির পরনের শাড়িটা দেখিয়ে দিল অমল।

ললিতাকাকিমা বললেন, ‘তুই তো বললি ছোটল, আমরা বলে বলে হয়রান হয়ে গেছি। কিছুতেই ভাল শাড়ি মেয়ে পরবে না।’

সত্যিই তাই। সাজসজ্জা প্রসাধন—কোন-কিছুর প্রতিই আকর্ষণ নেই প্রীতির। দু’ বছর আগের সেই সাতটা দিন তাকে এমন জারজার শোনে দিয়েছে যেখানে কিছুই ভাল লাগে না, সব বিবর্ণ বিস্মাদ হয়ে গেছে।

অমল তাড়া লাগাল, ‘যান—যান, শিগ-গির শাড়িটা বদলে আসুন।’

প্রীতির ইচ্ছা হচ্ছিল, একটা ভাল শাড়ি পরে আসে। অসীম সংকোচ তাকে পেয়ে কল। বলল, ‘আজ থাক।’

সমুদ্রের পাড়ে এসে ললিতাকাকিমা আজ প্রথমেই জানিয়ে দিলেন, কাল ছোটো-ছোট করে তাঁর গা ব্যথা হয়ে গেছে। আজ যেন অমল কালকের মতন পাগলামি না করে। আজ ছুটেতে হলে নির্ভাত তিনি মারা পড়বেন। মোহিতকাকাও স্ত্রীর সঙ্গে এ-ব্যাপারে একমত হলেন।

অমল বলল, ‘না-না, লুকোচুরি না। আজ গান হবে। সেজাদি, তুই তো এক সময় ভাল গাইতস।’

‘গান-টান সব ভুলে গেছি। আমরা বাপু জ্বালিও না। দেখাছিস না, কেমন মট্টেরিছি। চব্বির তলার গানের গলা ঢাকা পড়ে গেছে।’

প্রীতি ললিতাকাকিমার গা ঘেঁষে বসে-ছিল। অমল জিজ্ঞাসা করল, ‘আপনি জানেন প্রীতিদেবী?’

মাথা নেড়ে প্রীতি জানাল, সে জানে না। ললিতাকাকিমা এই সময় বলে উঠলেন, ‘যুধি বুঝি ভাল গাইতে পারে।’

যুধিকাকে অনুরোধ করতেই সে গান ধরল, ‘জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে—’

সত্যি চমৎকার গায় যুধিকা। গানের রেশটা অনেকক্ষণ সমুদ্রতীরকে কুহকিত করে রাখল। একসময় তখন বল উঠল, ‘অপুর্ব।’ যুধিকার গানের প্রশংসা প্রীতির প্রাণের কোন অনুশোচনাকৃত ছায়া ফেলল।

গান শেষ হবার পরও অনেক-ক্ষণ সন্মোহিতের মতন সবাই বসে রইল। তারপর একে একে মোহিতকাকা, যুধিকা, আর প্রীতি উঠে গিয়ে বালির ওপর ঘুরতে লাগল। ললিতাকাকিমা আর অমল অবশ্য গেল না; তারা বসেই রইল।

খানিকক্ষণ হাটার পর অনামনস্কের মতন অমলের কাছকাছি এসে পড়ে ছল প্রীতি। হঠাৎ ললিতাকাকিমার গলা কানে আসতে থমকে দাঁড়াল। ললিতাকাকিমা বললেন, ‘যুধিকে ভাল কেমন লাগল বল।’

অমল বলল, ‘ভাল। কিন্তু কিসের যেন গম্বু পাচ্ছি সেজাদি।’

ললিতাকাকিমা বললেন, ‘তুমি বড় হয়েছ; একা একা বাউন্ডলের মতন থাকা তোমার উচিত না। আমাদের ইচ্ছে যুধির সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব।’

‘এতদিনে ঝোলা থেকে বেড়ান বেরুন। এইজন্যেই যুধি কলকাতা এতদূর ছুটে এসেছি।’

‘হ্যাঁ, তুই বললে দিনটিই দেখে—’

শুনতে শুনতে প্রীতির মনে হল, স্বাস যেন বৃদ্ধ হয়ে গেছে। অমলের উত্তরের জন্য উৎকণ্ঠ হয়ে রইল।

অমল বলল, ‘না-না, দিন-টিন দেখতে হবে না। তমপাতত ওসব কিছু ভাবনা।’

ললিতাকাকিমা এরপর চোঁচামচি করে কি যেন বলে উঠলেন; প্রীতি শুনতে পেল না। শব্দ তার বুকের ভেতরে আবহ বাতাস অস্তে অস্তে বেরিয়ে এল। অমল বিয়ের কথা ভাবেনি বলেই কি প্রীতি খুশী হল? নিজের কাছেই তার কোন স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই।

সোমনাথ থেকে এবার ফেরার পালা। ভূসাগুরে এসে প্রীতির কালকটা মেইল ধরল। অমল ভূসাগুরেই থেকে গেল। কালকটা মেল ছাড়ার আগে ললিতাকাকিমা বললেন, ‘আমি তোমার কোন কথাই শুনব না। কলকাতায় গিয়েই সব ব্যবস্থা করব।’

অমল উত্তর দিল না। চোখ কুঁচকে তেঁটি টিপল শব্দ।

মোহিতকাকা বললেন, ‘ছুটি-টুটি নিয়ে একবার কলকাতায় এসো।’ যুধিকাও সেই

অনুরোধ করল। নিজের অজান্তেই প্রীতি বলে বসল, ‘কটা দিন বেশ কাটল; আসবেন কিন্তু কলকাতায়। নিশ্চয়ই আসবেন।’ বলেই সফতন হয়ে চোখ নত করল।

অমল কেমন করে হাসল।

II. মাঝ II

কলকাতায় ফিরে সোমবারেই সেই বিন-গুলোর কথা কিছুতেই ভুলতে পারছিল না প্রীতি। সন্ধ্যা, বেটে স্মারকা, জুনাগড়, গির্গার পাহাড়ে সিঁড়ি ভাঙার প্রতিযোগিতা, সোমনাথের বালুকাবোলায় পূর্ণিমার রাতে লুকোচুরি খেলা, যুধিকার গান—ঘুরে ঘুরে রমণীর গানের কলির মতন সব, সবকিছু তাকে দুনিয়া দিয়ে যাচ্ছিল। আর মনে পড়ছিল অমলকে। অমল—অমল—অমল—

নিজের অজান্তে কবে যে প্রীতির পরি-বর্তন শুরু হয়েছিল, কে বলবে। কবে যে সস্তা ঘামের বাজে কাপড়গুলো আবর্জনার মতন ছুঁড়ে দিয়ে চমৎকার চমৎকার শাড়ি পড়তে শুরু করেছিল, কবে থেকে চোখের কোণে কাজলের টান দিচ্ছে, পাউডার বুলোচ্ছে মুখে, গম্বুতেল মাখছে—নিজেই সে জানে না। শব্দ, এতটুকু প্রীতি অনুভব করছিল, বুকের ভেতরকার স্তম্ভ তুষার কিসের উত্তাপে যেন গলতে শুরু করেছে।

এদিকে কলকাতায় ফিরেই ললিতাকাকিমা যুধিকাকে আশ্বিন করে ভুলেছেন; তমলকে চিঠি লেখ, অমলকে চিঠি লেখ। তাঁর খারশা যুধিকা যদি উপযাচকা হয়ে হাত বাড়ায়, অমল নীরব থাকতে পারবে না।

তাড়া খাবার পর চিঠি লেখার প্যাড আর কলম নিয়ে একদিন যুধিকা প্রীতির কাছে এসে হাজির। বলল, ‘বৌদি বড় বিপদ ফেলেছে তাই। চিঠি-টিটি লিখতে ভাল লাগে না। পলীজ, আমার হয়ে অমলবাবুকে কিছু লিখে দাও।’

প্রথমটা থমকে গেল প্রীতি। তারপর কি ভেবে চিঠি লিখে দিল। কদিন পর অমলের চিঠি এল। তার উত্তরও প্রীতিকে লিখতে হল। তারপর ভূসাগুর আর কলকাতার মধ্যে কত চিঠি এল কত চিঠি গেল তার হিসেব নেই। যুধিকার সব চিঠি প্রীতিকেই লিখতে হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ আর কালিদাসের বাছা বাছা কবিতার লাইন দিয়ে রাত জেগে নিজের প্রাণের সবটুকু আকুলতা মিশিয়ে অমলকে চিঠি লেখে প্রীতি। লিখতে লিখতে বুকের মধ্যে ক’চ লতার মতন কি যেন একটা সবুজ পাতার ছেয়ে গেল। চিঠির ভেতর দিয়ে নিজের কোন সাধ মিটিয়ে নিচ্ছে প্রীতি?

মাস কয়েক পর একদিন সকালবেলায় মোহিতকাকা, যুধিকা আর ললিতাকাকিমা ওদের এক আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে গেলেন; ফিরবেন রাত্রে। মোহিতকাকারা বেরবার একটু পরেই তমল এল। প্রথমটা যেন দেখেও কিবাস করতে পারল না প্রীতি; তারপরেই হৃদপিণ্ডে একসঙ্গে করা যেন প’চিশটা এলোজ ছড় টানতে লাগল। বিস্মিত অনান্দিত প্রীতি কীভাবে স্নেহে বলল, ‘এ-কি, আপনি! কবে এলেন?’

অমল বলল, 'ভাল এসেছি; পাতি-পুকুরে দাদার বাড়িতে উঠেছি।'

'আপনি কলকাতায় আসবেন; কই অংগ তো জানাননি।'

'সারপ্রাইজ দেব তেবেহিলায়।'

'কেমন' ভয়েন', ভাল আছি', 'আপনি কেমন' ইত্যাদির পর অমল যখন জানতে পারল, মোহিতকারী বাড়িতে নেই, রাতে ফিরবেন, তখন চলে যেতে চাইল। প্রীতি যেতে দিল না; একরকম জোর করেই ধরে রাখল। নিজেই বেড়ি প্রচুর গল্প করল; সেসব গল্পের মধ্যে সৌরভের সেই মনোরম দিনগুলোর স্মৃতি বেশির ভাগ জায়গা জুড়ে রইল।

'দুপুরবেলা অমলকে খাওয়াতে বসল প্রীতি। অমল খার খুব কম। কখনও বালিকা-বছটির মত অভিমান করে কখনো প্রবীণা গািহণীর মতন ধমকে তখনকে প্রচুর খাওয়াত। তারপর আবার গল্প।

প্রীতি যখন পারছিল, এসব অন্যান্য, অশ্রদ্ধা, পাপ। মোহিতকারী তার আশ্রয়-দাতা। যথিকর সঙ্গে অমলের সম্পর্কও সে জানে। সব জেনে সব বুঝেও নিজের হৃদয়-বোঝে কিছুতেই ঠিকিয়ে রাখতে পারল না প্রীতি।

গল্প করতে করতে হঠাৎ অমল বলল, 'তপর্পনি কিন্তু অনেক বদলে গেছেন।'

চোখ নামিয়ে নখ খুঁটতে খুঁটতে প্রীতি বলল, 'সবাই তাই বলছে।'

বতকল না মোহিতকারী ফিরে এলেন ততক্ষণ অমলের নৃগণ গল্প করে গেল প্রীতি।

কুড়ি গিমের ছুটি নিয়ে অমল কল-কাতার এসেছে। পাতিপুকুরে দাদার বাড়ি থেকে রোজ একবার করে মোহিতকারীদের কাছে তার আসা চাই। অমলকে ঘিরে বোম্পুর পাকে' বেন উৎসব শুরুর হয়ে গেছে। কোনদিন কেরামের আসর বসেছে, কোনদিন আমের, কোনদিন গানের, কোনদিন বা টোঁবল টেনিসের। তার ওপর বেড়ানো তো আছেই।

ললিতাকাকিমার ইচ্ছা যথিকা তার অমল এই দুজনে শব্দ বেড়াতে থাক। অমল কিন্তু প্রীতিক ছাড়ে না। ললিতাকাকিমার অপছন্দ জেনেও চোখ-কান বুজে গাড়িতে গিয়ে ওঠে প্রীতি।

এইভাবেই চলছিল। একদিন সকলবেলা অমল এসে ঝড় বইয়ে দিল, 'সেজাঁদ, যথি, প্রীতিদেবী, জামাইবাবু—সবাই বেডি হয়ে নিন। আজ ডায়মন্ডহারবারে পিকনিক করতে যাব।'

মোহিতকারী আজ ছুটি। অতএব ছোটোছুটি ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেল। সেজে-টেজে প্রায় উড়তে উড়তে দোড়ল। নিজের ঘর থেকে নেমে আসছিল প্রীতি। নামতে নামতে ধমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল।

সিঁড়ির তলায় দুই-বুমে। সেখানে অমল, মোহিতকারী আর ললিতাকাকিমা বসে আছেন।

ললিতাকাকিমা বলছেন, 'মেরেটা একে-বারে বদলে গেছে।'

মোহিতকারী বলছেন, 'আমি তো বাড়িতে বিশেষ থাকি না; তবে আমার নজরে পড়েছে। সৌরভ থেকে ফেরার পরই মেরেটা কেমন যেন চেজ করছে। সাবগোজে মন দিয়েছে। টয়লেটে—'

প্রীতি বুঝতে পারছিল তার সম্বন্ধেই কথা হচ্ছে। কতক্ষণ ধরে হচ্ছে কে জানে?'

বিরক্ত স্বাকাল সবারে ললিতাকাকিমা বলছেন, 'করবে না! সব ঐ ছোটোনের জন্যে। সৌরভেই দেখনি, মেরেটাকে নিয়ে কেমন মস্তামাতি করেছে! এখানে এসেও রোজ ওকে নিয়ে বেড়ানো চাই। আর যত বলি যথি তার ভুই যা; তা নয়। ওকে না জোটেলে চলে না।'

বিরক্ত অমল বেন কৈফিয়তই দিতে শুরু করল, 'কি আশ্চর্য! মাতামাতিয় ভুই দেখলি কোথায়! একটা মেয়ে যার ঐ রকম ট্রাজিক

ব্যাক-গ্রাউন্ড তাকে নিয়ে কি প্রেম করতে বেবুই! যথি তো সপ্তগই থাকে; তাকে জিজ্ঞেস করে পাখ না। ওকে নিয়ে যদি কিছু উচ্ছ্বাস দেখিয়েই থাকি তা জাউট অফ সিমপ্যাথি।' একটা খেমে আবার বলল, 'জামা জামাইবাবু একটা ভাল ছেলেটোলে দেখে প্রীতির বিষে দিন না। লাইফ—'

তার কিছু শুনতে পারছিল না প্রীতি। অস্বস্ত এক শুনাতার তেতর ডুবতে ডুবতে তার মনে হচ্ছিল, করুণা—করুণা—করুণা। তবে কি অমলের সমস্ত কথা, গল্প, জমতা আর উচ্ছ্বাসিত আচরণের ভেতর করুণা ছাড়া আর কিছুই ছিল না? হয়ত, হয়ত।

করুণা ছাড়া আর কী-ই বা থাকা সম্ভব। অস্ব-বিশ্মতির ঘোরে এ কি করে বসেছে প্রীতি?

যথিকা তার চাইতে সব দিক থেকেই কামা। অথচ পুরুর সামান্য পুঁজটুকু ছাড়া তার কিছু নেই। তাই নিয়ে যথিকার সঙ্গে কি বিচিত্র প্রতিযোগিতাতেই না নেরোছিল সে। নিজের নিজেই প্রাপের গভীরে একটা লতাকে অক্ষুরিত করে পাতার পাতায় ফুলে ফুলে পুঁপুত করে তুলেছিল প্রীতি। কিন্তু সৌমিকে ফিরেও তাকাননি অমল; করুণা ছাড়া কিছুই করেনি।

নীচে আর নামল না প্রীতি। অবসর পায়ে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল। তারপর নামী শাড়ি গ্লাউজ খুলে সস্তা বাজে জামা-কাপড় পরল; ঘবে ঘবে প্রসাধনের সব চিহ্ন তুলে দিয়ে স্তম্ভ জড়স্তুপের মতন বসে রইল।

অমলরা তেঁকে তেঁকে লজ্জার ধাক্কা দিয়ে কখন চলে গেছে প্রীতি টেরও পেল না। সুখস্বক উত্তাপে কবে যথিকর তেতরকার বরফ গলতে শুরুর করেছিল, কে বলবে। কিন্তু ফোয়ারা হয় তা বেরিয়ে আসতে পারল না। প্রীতিকে ঘিরে নতুন করে মেছ-প্রবেশের তুহার জমাট বাঁধতে লাগল।

—শেষ—



প্রফেসররা পর্বস্তু ক্রাশের মধ্যে মমতা সেনকে ডাকেন বৌদি বলে। এম-এ ক্লাসে তার সহপাঠী ও পাঠিনীরা যদিও কউ কচি খোকা বা খুকী নয় তবু শিক্ষক ও ছাত্র মধ্য যে একটা প্রজ্জ্বলিত স্নেহের দ্বারা টিপ্তপ্রাহমান, মমতার কাজ পর্বস্তু গিয়ে তা পৌছয় না। আগেই কিসে বাহত হয়ে যেন থেমে যায়। বয়সের পার্থক্য কিংবা বিশ বছরের বিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতা মমতা সেন তা বুঝতে পারে না। বাস্তবিক প্রফেসররা সবাই একটু সমীহ করে তাকে। এর কারণ বোধহয় লেখাপড়ার তার একনিষ্ঠা। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মত চটুল, কতব্যবিমূৰ্খ ও উদাসীন সে নয়। বরং এত বেশী খনো-যোগী যে, প্রফেসরদের মুখের কথাগুলো কেন গিলে খায়। খাতা-পেন্সিল নিয়ে যখন নোট নেয় কিছু, তখন এমন একাগ্র মনে তা গ্রহণ করে যেন কোথাও ভুল-ভ্রান্তি না হয়। ছাত্রছাত্রীরা যেমন কটকটিতে পাখাল বীড়ে, ও একেবারে তার উল্টো। ক্রম-যেমন কোনটা কামাই করে না, তেমনি বাড়ী থেকে এমনভাবে তৈরি হয়ে আসে যে প্রফেসরদের বস্তুতার সময় যদি কিছু ভুল বা অসংলগ্ন মত্থ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে, তখন সে ত-হরিয়ে দেয় এবং কোন পুস্তকে কোথায়, সে সম্বন্ধে কি উল্লিখিত আছে, সঙ্গে সংগ মত্থ বলে যায়।

প্রফেসররা তাই মনে মনে ভয় করে তাকে। একটা কিছু বোঝাবার সময় বাবংবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন, ডু ইউ ফলো বৌদি?

অন্য ছাত্ররা যেমন না বুকেও তখনক সময় ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে যায়, বৌদি একেবারেই তা করে না। উঠে দাঁড়িয়ে সোজা বলে বসে, না স্যার, ওটা ঠিক বুঝতে পারলাম না, যদি আর একবার বলেন।

এর জন্য মান-অপমান কোন কিছুই বৌদি গায়ের মাখতো না। পরস্য দিয়ে লেখাপড়া শিখতে এসেছি যখন, সবটুকু উশুল করে নিয়ে তবে ছাড়বো বরং এমনি একটা মনোভাব তার। শব্দ-জ্ঞানপিপাসা, এ ছাড়া আর কিছু যেন নেই তার মনে।

এমন অনুরাগী ছাত্রছাত্রী আজকাল বড় একটা দেখা যায় না। অধ্যাপকরা তাই বৌদির ক্রাশ নেবার আগে বৃত্তিমত তৈরি করে আসেন। এটা, সেটা প্রশ্ন করে দু-একজন প্রফেসরকে ক্রাশের মাঝখানে দু-একবার বেরাকুব বানিয়ে নিরুদ্দেশ। তাঁরা বদলে না পারলে, নিজে বলে বাহাদুরী নিয়েছেন।

খ্যাতক ইউ বৌদি, বলে প্রফেসর তার বিদ্যাবতার প্রশংসা করতে গিয়ে হয়ত বলেন, 'একাকী গারুকের নয়ত গান, গাহিতে হবে দুইজনে'—ইত্যাদি। হার যেনেও সে পরাক্ষকে গৌরবমণ্ডিত করার জন্য বলেন, শব্দ-প্রফেসর ছাত্রদের শিক্ষা দেন না, ছাত্রদেরও কতব্য সেই শিক্ষার হোমানলে খাতাগুলি দিয়ে তাকে আরো বেশী প্রজ্জ্বলিত করে তোলা।

সকল ছাত্রছাত্রীদের চেয়ে বরং ৫০ বা সাংসারিক অভিজ্ঞতার অগ্রগণ্য ছিল না মমতা

বৌদি
সুখ

সুখ নাথ ঘোষ

সেন, লেখাপড়াতে ছিল সবাপেক্ষা মনো-যোগী ছাত্রী। অন্য ছাত্রছাত্রীরা বৌদির এই একনিষ্ঠতা নিয়ে নিজেরদের মধ্যে মাটো-জামসা করলেও আবার ওরই স্মারস্ব চুতো কেউ কেউ। তাই বৌদি প্রফেসর জোয়ারীর নোটটা আমি সব জায়গার ফলো করতে পারি নি, খাতাটা একবার দেখেন?

না তোমরা সব ইয়ারকি কাজলামী করবে ক্রাশে আর নোট দেবার বেলা আমি? রত্নকে বলেন, ছিঃ তোমরা ক্রাশের মধ্যে কি যা-তা করো, তোমাদের ভয় করে না একটু। যদি প্রফেসরদের চোখে পড়ে? ছি-ছি তোমাদের মা-বাবা কত টাকা পরমা খরচ করে

তোমাদের লেখাপড়া দেখাতে পাঠান তা কি একবারও ভেবে দেখে না?

বৌদি সহসা মা, খড়ীর ভূমিকার অবতীর্ণ হন। ওদের রীতিমত হেঁসকার করেন। ওদের ক্রাশে সতেরোটা ছেলে আর পচিটি মেয়ে। এই মেয়ে কটির পিছনে সব সময় ছেলেগুলি লেগে থাকে। এক একদিন তাদের ইয়ারকির মাত্রা এমনই সীমা লঙ্ঘন করে যে, বৌদি রীতিমত চটে ওঠেন।

সেদিন রত্না, শূভ্রা ও মীনাকাকে আড়ালে ডেকে বৌদি বললেন, ছি ছি তোমরা এ রকম বেশভূষা করে আসো কেন? পেট-কাটা ব্লাউজ, তারও আবার হাত-কটা—পাতলা নাইলনের শাড়ী? জামে হীরক, মানস আর উশ্চল ওরা তিনজনে কি করছিল।

রত্না বলে, জানি। কিন্তু কি করবো জানেন ত মানসটা কি রকম দৃষ্ট। বললে আরো বাড়ায়। তাছাড়া প্রফেসর পড়াচ্ছেন, তাঁর সামনে ত কিছু করা যায় না, তাই দৃষ্টটা, এই দেখুন না, শূভ্রার কোমরের নগ্ন অংশে কলম দিয়ে কি লিখে দিয়েছে। ধব-ধবে রঙ শূভ্রার, তলপেটের দিক থেকে পিছনটা যেন মাখন দিয়ে গড়া। শূভ্রা ফিক করে হেসে ফেলতেই বৌদির মুখ কঠিন হয়ে ওঠে। ছিঃ তুমি হাসছো! ওদের সঙ্গে একেবারে আলাপ পর্বস্তু করা উচিত নয়। মেয়েদের গায়ের হাত দিয়ে এ কি রকম বিদ্রী



ইরাকি? তোমরা কি করে প্রচুর দণ্ড করতে পারি না!

বলেই তারপর নিজেকে সামান্য নিয়ে বৌদি যেন কতকটা স্বপ্নভোগি করেন, তা ওরা ত পুরুষ, ওদেরই যা মোষ ভি! ওদের চোখের সামনে যদি এইভাবে দেখে অর্থাৎ উল্লস করে বলে থাকো তাহলে ওরাই বা তার সুযোগ নেবে না কেন? বরং আঁচম বলাবো, এখানের ছেলেরা অনেক সভ্য, অনেক ভদ্র। এই সব দেখেও তারা লোভ সম্পন্ন করে চুপ করে থাকে।

মানিফী একটুখানি নীরব থেকে শুধু আপনি আমাদের স্মরণ বলছেন ওদেরও ডেকে তৈরানি নিবেশ করে দিতে পারেন? আপনি সকলের চেয়ে বড়, আপনার কথা ওরা নিশ্চয়ই শুনবে। আমরা বলতে গেলে উল্টে আরো কিছু বলে যদি অপমান করে বসে!

বেশ। তোমাদের কাছ থেকে স্বতন্ত্র হতে পেরেছি, তখন নিশ্চয়ই বলবো। মা-বাপ কিভাবে না খেয়ে, না পরে, তোমাদের লেখাপড়া লেখাবার জন্যে কাঁড় কাঁড় টাকা খরচ করছেন, তা কি তোমরা বুঝতে পারো না ভাই। তোমরা কেউই কচি-বুকা নও। তোমরা ইউনিভার্সিটিতে পড়ছা। তোমাদের যা কিছু উন্নতি, সব এই পরীক্ষার ওপর নির্ভর করছে।

সত্যি একদিন মানস, হীরক প্রভৃতির ডেকে বৌদি বললেন দেখো মেয়েরা আজ তোমাদের সঙ্গে পড়তে এসেছে বলে তাদের মানসভ্রমের যাতে হানি হয় এমন কতক কি উচিত? তোমরা সব ইউনিভার্সিটি রয়। দু'দিন পরে তোমরাই দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে—

গেছেন থেকে শ্রদ্ধাশ্রু বলে উঠলো, বৌদি এখানে নয়। একটা টেবিল নিচে মাঠে চলে গেলেন অনেক হাততালি পাবেন।

ঠাট্টা করছো? বলেই বৌদি গম্ভীর হয়ে গেলেন।

শ্রদ্ধাশ্রু বড় মৃদুফোঁড়। খল গর হল উঠলো, পাগল, ক্রান্তব্রতদের সঙ্গে কি কেউ ঠাট্টা করে কখনো?

তোমাদের চেয়ে অনেক বয়েস আমার বেশী, কুলে যেরো না।

সেটা এখন ক্রান্তের বাইরে থাকবে, তখন মনে করবো। হতভাগ্য ক্রান্তে আছেন, হতভাগ্য উই আর অল ফ্রেন্ডস।

বৌদির কানে সঙ্গে সঙ্গে এই ফ্রেন্ডস কথাটা যেন থাকা যাবে। ঠোঁটের কোণে হাল্কা হাসি টিপে তিনি বলেন, আমাকেও কি তোমরা ফ্রেন্ডস মনে করো?

শ্রদ্ধাশ্রু! নিশ্চয়ই। নইলে কখনো এত সব কথা বলতে সাহস হতো?

এবার বৌদি গম্ভীর হতে গিয়েও হেসে ফেলেন। ভারী দুটো ছেলে তা!

পরের দিন এক কাণ্ড করে বললো ওরা ক্রান্তের ভেতরে।

রক্তা আর শ্রদ্ধা দুজনে বেশী কড়াকড়ে লোকচান শুনছিল। প্রফেসর নাশপুস্ত কড়ী কড়া প্রকৃতির লোক। ভাটরা তাকে ধর্মতত্ত্ব ভয় করে। তবু ওরাই মধ্যে রক্তার বেশী

সঙ্গে শ্রদ্ধার বেশীতে কখন যে মানস গিট বেঁধে দিয়েছিল, কেউ তা টের পায় নি। লোকচান শেষ হবার আগেই সেমন ওটা দুজনে মাথা নাড়িয়েছে, অবশি তা নাশপুস্তের নজরে পড়ে গেল। তিনি চোঁচিয়ে উঠলেন, গেট আউট অফ হাট ক্রান্ত। সঙ্গে সঙ্গে তার দৃঢ় চোখে আগুন জ্বলতে শুরু। এটা আত্ম মারবার কারণ? বলে, কে একাক্ষর করে? সবাই চুপ।

প্রফেসরের একেবারে চোখের সামনে দুটো বোম্বোনে মেয়েরা বসে, আর তার পিছনে ছেলেরা। ছেলেরদের দাঁক ওটমট করে তাকিয়ে তারপর বৌদিকে জিজ্ঞাস করলেন তিনি, বৌদি কে করেছে সত্যি ক'র বলো?

বৌদি দেখেছিলেন কে করেছে, তবু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, জানি না সর।

আবার সিংহগর্জন করে উঠলেন, প্রফেসর নাশপুস্ত, ক্রান্তের আউট, এটওয়ান্স।

রক্তা ও শ্রদ্ধা নিঃশব্দে দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

তখন ঠিক তাদের পিছনের বোম্বোনে যে তিনজন বসেছিল হীরক, মানস এবং শ্রদ্ধাশ্রু তাদেরও তিনি এই শ্রদ্ধা দিলেন। গেট আউট ইউ থ্রি!

তারা ভয়ে ভয়ে বললে, আমরা ত দাঁক করি নি!

মাট আপ। মিথো কথা বলতে লজ্জা করছে না। তোমরা তিনজনেই ছিলে ওদের পিছনে?

সুড় সুড় করে ওরা রক্তার অনুসরণ করলো।

বাইরে বেরিয়ে এসে ওরা সকলে হেসে কুটি-কুটি খায়। হীরক বলে, ভাগ্যিস বৌদি বলে দেয় নি? যে বকম নীতিবাগিন উনি! আমি ত ভেবেছিলাম—

জিব ভোমচে রক্তা বলে, বেশ হতে, তাহলে, তোমার জন্যে আমাদের সকলের এইভাবে অপমানিত হতে হতো না।

বলটা বেজে গেল বৌদি এসে তাদের তিক্কার করে, ছিঃ ছিঃ তোমরা ক্রান্তের মধ্যে এসব কি করছো তোমাদের কি এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই? তবুপন সব দুর্নীতি এই মেয়েদের ওপর পড়বে। তোমাদের ক'নেট এর জন্যে দোষী করবে না? আর এইভাবে যদি তোমরা ওদের পড়াশুনা বন্ধ করে তাহলে ওদের ভবিষ্যৎটা কি হবে ভবে দেখছো? তোমরা না হয় লেখাপড়া ভাঙা। কিন্তু—

বৌদির মূখের ওপর বলে ওঠে শ্রদ্ধাশ্রু, আমাদের যদি লেখাপড়ার ভাল বলেন, তাহলে রক্তা ও শ্রদ্ধাকে কি বলবেন? জনৈন এবার টিউটোরিয়ালে ওবা দুজনেই আমাদের সকলের চোখে বেশী নম্র পড়েছে

বৌদি ঠোঁটের কোণে হাসি টিপে বলেন জানি, তার জন্যে রাত জেগে তৈরার তোমাদের নোটগুলো ওদের হাতের টুক দিয়ারিছল।

কে বলেছে? সব বড় কথা

বৌদি বলেন আমার চোখে বা না দিতে চেষ্টা করো না ভাই। আমি সব জান।

যদি সব জানেন তাহলে এত বক বাকি করেন কেন? আচ্ছা বৌদি আপনারও ত একদিন বয়েস ছিল তখন কলকাতা লাইফটা আপনারা কি এন্জার করেন নি এখন ত সত্যি করে?

রক্তা করে। লেখাপড়া ছাড়া আর কিছু, তখন চিন্তা করার অবকাশ ছিল না। মেয়েদের কলেজে বন্ধ গাড়ী করে যাওয়া, অর্থ ভাঙ্গা। মেয়েদের সঙ্গেই স্কুল-কলেজে অবসর নতুরে খেলাধুলা একটু বা নাচ-গান। এই ছিল আমাদের জীবন। একটা পুরুষ হারি পছন্দ ঢোকায় হুকুম ছিল না কলেজে। বাড়ীতেও ছিল মা-বাপের তৈরানি কড়া শাসন। তোমরা সব দিনের কথা কল্পনাও করতে পারবে না।

রক্তা হেসে বলে, সেই জন্যে ব্যক্তি আবার এত কাল পরে পড়তে এসেছেন? শ্রদ্ধাশ্রু লাইফটা এন্জার করার জন্যে।

রক্তা করে ভাই। তোমাদের শ্রদ্ধাশ্রু লাইফের এন্জারমেন্ট বলতে ও দাঁক, পড়তে যাওয়ার নাম করে ছেলেরদের সঙ্গে আত্ম মারা। ক্রান্ত পাঠিয়ে সিনেমা ভেপ, রেস্টোরাঁতে, কফি হাউসে, বস্তার পর চট্টা গল্প-গুজব করা, আমার কি অন্য সে বয়েস আছে। বলে তিনি মিনিট করে ক'র থেকে আবার শ্রদ্ধা করেন। ছেলে-মেয়েরা সব বড় হয়ে গেছে। একটা ছেলে টাই-নীলারি পড়ে লিবপুত্রে, একটা ছেলে ডাক্তারী পড়ছে। মেয়েরাও সব কলেজে চলে যায়। ফাকা বাড়ীতে একা একা ঢাক লাগে না, তাই ভবলুম, বি-এটা পাশ করাই আছে, ভর্তি হয়ে বাই এম-এ ভাঙ্গে।

মানিফী বলে, ওমা শ্রদ্ধা এই জন্যে এত কষ্ট করে পড়তে এলেন?

কষ্ট কি ভাই। শিক্ষার কি শেষ হয়। ভালই লাগছে আমার। বরং আগের থেকে অনেক বেশী আনন্দ পাই এখন পড়তে।

এবার মেয়েরা নিঃশব্দে মেয়েদের ভেতরে দাঁষ্ট বিনিময় করে। রক্তা বেশ, আপনার ত আর অন্য কোন আকর্ষণ নেই। স্বামী বিরাট বড়লোক। কলকাতার দু'তিন-খানা ভাড়া বাড়ী। ছেলে-মেয়েরা এমনি করে গেছে, কাজেই পড়াশুনার মধ্যে চমটা চট করে ডুবিয়ে দিতে পারেন।

আহ-হা বাছারে। বল তোমাদের মাঝায় যেন কত চিন্তা। মা-বাপ কাঁড় কাঁড় টাকা দিচ্ছেন লেখাপড়া লেখার জন্যে, আর তোমরা সেজেগুজে পড়তে আসো না যেন হাসর লাগতে আসো।

খিল-খিল করে একটা হাসির ফনা যেন বয়ে যায়।

রক্তা বলে, আপনার ত সবকিছু খুঁটি গেছে ভাই, আমাদের যে সবই এখন থাকী। কাজেই চিন্তার কি শেষ আছে বৌদি।

সে চিন্তাও তোমাদের মা-বাপ করছেন। তোমরা শ্রদ্ধা দয়া করে এখন লেখাপড়া মন দিয়ে শিখে, তাঁদের উদ্বার করো। অর্থপূর্ণ হাসি হাসেন বৌদি।

রাইট! শ্রদ্ধাশ্রু মন্তব্য করে:

শ্রদ্ধা জিব ভোমচে শ্রদ্ধাশ্রুকে বলে, ওঃ জানি যেন মেয়েদের সব গাঁড়ির হল জল বসে আছেন? বিজ্ঞতা দেখলে গা জ্বলে যায়।

একদিন ছেলেরা বৌদিকে ঘিরে ধরলে।
লিঙ্গ বৌদি, আপনি ঠাকুরা-দিদির মনো-
ভাব পরিচয় করুন। আমরা আজ আপনাকে
মডার্ন বৌদি রূপে পেতে চাই?

মডার্ন বৌদি বলতে তোমরা কি বোঝ
জানি না।

অর্থাৎ আমাদের সঙ্গে আজকে
রোস্টারি গিরে আপনাকে খেতে হবে।

না-না ও অনুরোধ আমরা করো না ভাই।
তোমরা যাও।

বস করে শূভ্রাংশু বলে, আমরা ত
যাই এবং আপনাকেও আজ ছাড়বো না।
আজ একটা বিশেষ দিন।

কি রকম? বৌদির কণ্ঠে কৌতূহল
প্রকাশ পায়।

আজ মানসের জন্মদিন। রজা আমাদের
খাওয়াবে।

রজা খাওয়াবে কেন?

বলার সঙ্গে সঙ্গে সকলে একসঙ্গে চুপ
করে যায়। আর সকলের মুখেই একটা চাপা
জ্বাশির রেশ ফুটে ওঠে। তা দেখে বুঝতে
বিলম্ব হয় না বৌদির। তিনিও অনেক দিন
ধরে অনেক কিছুই লক্ষ্য করেছেন। রজার
চপালে অনেক দুঃখ আছে, তাও তিনি মনে
মনে জানেন। তাকে সতর্ক করার অনেক
চেষ্টা করেছেন। নানাভাবে উপদেশ দিয়ে
ঝুঁকিয়েছেন। আজকাল এই অবাধ মেলা-
মেশার সুযোগ নিয়ে কত মেয়ের জীবন নষ্ট
করেছে এই রকম ছেলেরা। কিন্তু রজা তাঁর
কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। ছেলের দল
এক মেয়ের সবাই যেন রজাকে ওই মানসের
দিকে ঠেলে দিয়ে আনন্দ উপভোগ করতে
চায়। জীবন নিয়ে ছেলেখেলা ভাল লাগে না
বৌদির। রজার এই সর্বনাশের সাক্ষী হতে
তিনি চান না। তিনি জানেন, এর পরিণতি
কোথায়। তাই রাজী হন না সে প্রস্তাবে।

শেষে রজা নিজেকে এসে বৌদির হাত
ধরে। বৌদি রজার মুখের ওপর অর্ধ-পূর্ণ
মুদ্রিত হান্ডে, সে বলে, "লট অস এনজয়!"

শূভ্রাংশু বলে, বৌদি একালের কলেজ
জীবনের আনন্দের স্বাদ একটু চেখে দেখুন।
আমাদের সম্মুখে আপনার ধারণা ভাল নয়
জানি। তবু ক্রান্তক্ষেত্রে হিসেবে আপনাকে
আজ আমাদের ভেতরে চাই।

অগত্যা তিনি আর না বলতে পারলেন
না।

রোস্টারি গিরে তিনি আরো এক
নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। মেয়েরা ও
ছেলেরা এ ওর পাত থেকে খাবার তুলে নিয়ে
কেড়ে-কুড়ে খেতে থাকে। এটো, অর্ধ-ভুক্ত
কার্টোনেট চপ রজার পাত থেকে তুলে বোম্বার্ড
মানস যেমন খেয়ে ফেলে, তেমন মানসের
পাতেরটা নিয়ে রজাও খায়।

বৌদি মুখে অবস্মিত প্রকাশ করে
বলেন, আঃ কি হচ্ছে, অসভ্যতা। তোমাদের
নিজের পাতেরটা যদি ভাল লাগে না।

ভাল লাগে কিছু মিষ্টি লাগে না
বৌদি। বলে হাসতে থাকে ছেলের দল।

আপনি নিশ্চয়ই খুব রেগে যাচ্ছেন?

না। রাগবো কেন? তবে এটোকাটি-
পুলোয় বাচ-বিচার করা উচিত। সেখানে
একটা প্রাস্থ্যের প্রশ্ন রয়েছে। তোমরা সবাই

শিক্ষিত এটা বোধকারী আর বেশী বলতে
হবে না। মুখে একথা বললেও মনে-মনে
তিনি ছি-ছি করতে লাগলেন মেয়েদের এই
প্রণয়ী উচ্ছৃঙ্খলতা দেখে। ছেলেরা চোরে
মেয়েদের তিনি বেশী অপরাধী বলে মনে
করেন। তাদের প্রণয় না পেলে ছেলেরা
কখনই এতখানি অগ্রসর হতে পারে না।

পরের দিন এক ফাঁকে রজাকে চুপি চুপি
বৌদি জিজ্ঞেস করেন, তোমার বাড়ীতে কে
কে আছেন ভাই?

মা, বাবা, দাদা, ছোট বোন সবাই। কেন
একথা জিজ্ঞেস করছেন বৌদি।

না, এমনি। বলে চুপ করে যান। তার-
পর একটু ঢোক গিলে বলেন, তুমি যে
ছেলেদের সঙ্গে এইভাবে মেলামেশা করো,
তোমার বাড়ীর লোকেরা তা জানেন?

পাগল! তাহলে আর রক্ষা আছে। আমার
মায়ের চেয়ে বাবা আরো শিষ্ট।

তাহলে এইভাবে লুকিয়ে তোমার
ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করা উচিত নয়।
যখন অভিভাবকরা পছন্দ করেন না।

রজা ফিক করে হেসে বলে, কোন অভি-
ভাবকরাই এ পছন্দ করেন না। তাই বলে
কলেক্ট লাইফটা কেউ কি এনজয় করে না?

একটু খেমে বৌদি বলেন, থাক ভাই,
এ সম্বন্ধে সকলের মত এক নয়। বলে চুপ
করে যান। অর্থাৎ যে আগুনে জেনে-শুনে
হাত দেবে, তার হাত পড়বেই। কেউ ও
আর কাঁচ খুকী নয়। মরুকগে। এ নিয়ে
আর উনি কাজকে কিছু বলবেন না। মনে-
মনে প্রতিজ্ঞা করেন। কিন্তু কেমন একটা
গোয়েন্দার দৃষ্টি যেন ওর চোখে জেগে
থাকে। রজা আর মানসের মধ্যে কেমন ধীরে
ধীরে আকর্ষণ বেড়ে চলেছে, সব কাজের
মধ্যে দিয়ে তিনি তা লক্ষ্য করেন। আর রজার
ভবিষ্যৎ চিন্তা করে, মানসিক অশান্তিতে
দিন কাটান।

ফাইনাল পরীকার আর দেরী নেই।
ইউনিভার্সিটির ক্রাশ বোধহয় বড়জোর মান-

খানেক হবে। প্রফেসরদের কাছ থেকে মোট
নিনে ছাত্রছাত্রীরা যখন সবাই বাসন্ত, ঠিক
সেই সময় রজা একেবারে ক্রাশে আসা বন্দ
করে দিলে।

একদিন, দুদিন করতে করতে দশ-বারো
দিন কেটে যায়।

কি হলো। অসুখ-বিসুখ করলো নাকি?
এতকি জিজ্ঞেস করে কিন্তু কেউই তার খবর
সঠিক বলতে পারে না। যদিও রজার দিক
থেকে রজা পড়তে আসতো। মেয়েরা
আপসে কিসকিস করে। কি হলো? সবাই
মানসকে জিজ্ঞেস করে।

কিন্তু মানসকে যেন সবচেয়ে বেশী
চিন্তিত মনে হয়। সে বলে, আমি কি জানি?

শেষে একদিন শূভ্রা ক্রাশে এসে বললে,
রজার পাকা দেখা হয়ে গেছে। এই দশ-ই
খাওয়াবে বিয়ে।

কি করে জানলে তুমি ভাই? বৌদি
প্রশ্ন করেন। তার যেন বিশ্বাস করতে
প্রবৃত্তি হয় না।

উজ্জ্বল কাল নাইট শোভে
আমি, দিদি, জামাইবাবু সব গিরেছিলুম
হঠাৎ দেখি রজা একেবারে আমাদের সামনের
সিট-এ বসে আছে। শূভ্রা বললে।

বৌদি বলেন, সেই জনোই
মানসকে সব সময় এত উদ্ভাসিত ও
মনমরা দেখার, এখন বুঝছি। বৌদি
ভাবেন, নিশ্চয়ই ওর মা-বাবা কোনদিন
দেখতে পেরেছেন কিছু ভাই ভাড়াভাড়ি
এইভাবে বিয়েটা দিয়ে দিচ্ছেন মেয়ের। এই
কটা মাস পরীকার জন্যে অপেক্ষাও করতে
সাহস পাচ্ছেন না। সত্যি যে রকম বাড়িবাড়ি
শুরু করেছিল ওরা। ঠিক হয়েছে। মনে-
মনে বেশ খুশি হন তিনি। আবার পর-
মুহুর্তে অন্য চিন্তাও জাগে, আজকাল
নভেল নাটকে কত রকমের কাহিনী পড়া
যায়। বাসরঘর থেকে পালিয়ে মেয়ে তার
প্রণয়ী সঙ্গে মিলিত হয়। সে রকম যদি
কিছু হয়। বিয়েটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত
কিছুই বিশ্বাস নেই। একালের মেয়েদের
অসাম্য কিছু নেই।

সেদিন পি মজুমদারের দোকানে ব্রাউজ
কিনতে গিয়েছিলেন বৌদি। এক গাদা
ব্রাউজের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে দেখছেন
এমন সময় পেছন থেকে রজা তাকে জড়িয়ে
ধরলে।

মুখ ফিঁদিয়ে তিনি বললেন, আরে
রজা তুমি?

হ্যাঁ, দেখেও কি চিনতে পারছেন না?

বলতে বলতে দোকান থেকে রাস্তায়
নেমে এসে বৌদি বললেন, হারি তোমার নাকি
বিয়ে?

হ্যাঁ, আমি ত ছোট বোনকে নিয়ে
বাজার করতে বেরিয়েছি। ওই তো টার্মিটে
সে বলে আছে। গড়িয়াছাটা থেকে বেনারসী
শাড়ী, জুতো, টায়ালট সব কিনে, এগিয়ে
এসেছি, ব্রাউজ কিনতে।

রজার চোখে-মুখে যেন আনন্দ উপহাস
পড়ছে।



বৌদি বলেন, তা তোর নিজের বিয়ের বাজার নিজেই করছিস?

ওমা, তা করবো না। আমার 'চরেন' মত জিনিস আমি কিনবো না। তারপর অন্যের কেনা জিনিস দেখে সবাই হাসাহাসি করুক আর কি, গহিয়া বলে?

হ্যাঁ, তা বিয়ে হচ্ছে কোথায়? কোথায় তোর শ্বশুরবাড়ী?

দুর্গাপুরে।

পাঠটি কেমন?

কেমন, কি করে জানবো, তবে শুনছি দেখতে ভালই। ছ' বছর বিলেতে থেকে ইঞ্জিনীয়ার হয়ে এসেছে। দুর্গাপুরে এখন হাজার টাকা মাইনে পায়। নিজস্ব কোয়ার্টার, অফিসের গাড়ী।

ভারী খুশি হলুম। কিন্তু পাত্র নিজে তোকে দেখতে আসে নি?

না। যাপ আর বন্ধুদের পাঠিয়েছিল। তাদের পছন্দই নাকি ফাইনাল! বিয়ের আগে নাকি সে মেরেকে চোখে দেখা পছন্দ করে না। একেবারে শক্তকৃষ্টি দিয়েই শব্দ হবে দেখা।

বৌদি বলেন, খুব কাব্য ত দেখছি ইঞ্জিনীয়ারের প্রাণে!

আমিও ভাই এ বিষয়ে একমত। বরকে একেবারে প্রথম জামিনাতলায় আবিষ্কার করবো, তবেই ত খিল। নইলে আগেই ঘরের সব কিছুই জানা আছে, শব্দে মালাটা বদল করে নশজনকে সাক্ষী রেখে বিয়ে করার মধ্যে কোন 'চ্যাম' থাকে না।

বৌদি বলেন, তা পরীক্ষার আর কটা ঘাস নাকী। একেবারে এম-এটা দিয়ে বিয়ে করলে পারাতিস! বাবা-মা কৃষ্ণ রাজী হলেন না?

দুর্গা হাসি ছেঁসে, রক্তা বলে, পাত্র-পক্ষের ইচ্ছা বিয়েটা আগে হয়ে থাক, তারপর পরীক্ষা এখন হোক বিলেই হবে। মা, আমার মত জানতে এসেছিলেন, আমি বললুম, তোমরা যা ভাল বোঝ করো। তবে পরীক্ষা ত রইলোই। মা বললেন, তাহাড়া আর পরীক্ষা দিয়েই বা কি হবে। তাকে ত চাকরী করতে যেতে হচ্ছে না।

আমি বললুম, না পরীক্ষা আমি দেবোই। তবে এখন না হলে, প্রাইভেটেও দিতে পারি।

বৌদি এবার হাসি চাপতে পারলেন না। অর্থাৎ 'শুভসা শীঘ্র' বৃকোঁছ—আর দেরী নইছে না। তাড়াটা তাহলে এ তরফেই বেশী।

ছেোট একটা চিমটি বৌদির হাতে কেটে রক্তা বলে, মনে আছে রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটা—বহুদিন হলো নব ফাল্গুনে ছিন্দু আমি তব ভরসায়—

বৌদি বললে, আচ্ছা দেখা হোক তোমার বরের সঙ্গে তখন সব ফাল্গুনে দেবো।

হ্যাঁ, ভাই বৌদি, আপনারা কিছু মনে করবেন না। আমি বিয়েতে কাটকে 'কনট্রোল' করতে পারবো না। আমার বাবা বড় গভর্ণমেন্ট অফিসার। তিনি 'গেট কন্ট্রোল অর্ডারের' বাইরে একজনকেও কলতে রাজী নন। আমাদের বড় ফ্যামিলি, আত্মীয়স্বজনদেরই বলা যাচ্ছে না। বাবা তবু আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তোর কলেজের বন্ধু-বান্ধব কজন?

আমি স্নেহ বলে দিয়েছি, একজনও না। সত্যিকারের যদি বলতে হয় ত স্কুলের

বন্ধুদের বলা উচিত, যাদের সঙ্গে আট-দশ বছর একসঙ্গে পড়েছি। নইলে এক কলেজে আই-এ, আর এক কলেজে বি-এ, আর ইউনিভারসিটিতে এম-এ। ক্রাশফোর্ড-এর কি শেষ আছে। তাহাড়া কে কোথায় আছে কে জানে—কে কার খবর রাখে।

বৌদি অবাক হয়ে রক্তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। মানসের শূন্যে মুখখানা কেন জানি না বার বার তার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। সবচেয়ে আশ্চর্য হয়ে যান তিনি, একবারও তার নাম মুখে উচ্চারণ করেন না রক্তা।

এবার বৌদিকে একটা ধাক্কা দিয়ে রক্তা বলে, কি ভাবছেন এত? না, কিছু নয়।

আপনি ভাই সকলকে বলে দেবেন কিছু যেন মনে না করে। আমি পরে এসে একদিন সকলকে একটা পার্টিতে ডাকবো।

বৌদি বলেন, খুব ভাল 'আইডিয়া'। বিয়ের দিন বরকে শব্দে চোখে দেখা হয়। আলোপ-পরিচয় করা যায় না! এ বেশ ভাল হবে।

হ্যাঁ আমারও ঠিক সেই ইচ্ছা।

বলাবাহুল্য রক্তার সে ইচ্ছা মনেই থেকে যায়। কোনদিন কারো পরিণত হয়নি। বিয়ের পর এক মাস, দু মাস করতে করতে গোটা বছর কেটে যায়, ইউনিভারসিটির সহ-পাঠিরা কলকাতা ছেড়ে কে কোথায় চলে যায় সে খবরও রাখে না রক্তা। গ্রাম্য প্রয়োজনও বোঝ করে না। স্বামী সহবাসে মনের আনন্দে দিনের পর দিন বাড়িয়ে যায়।

নানা উপায়ে পয়সা বাঁচানো যায়



এখন উষা পাখা কিনে পয়সা বাঁচাতে পারেন

এবারকার মত গরম চলে গেল... কিন্তু আমরা এখন থেকেই ভাবছি আসছে বহর পছন্দের কথা। আপনিও তাই ভাবছেন তো? আমাদের বে-মরসুমী ক্রিষ্টবন্দীর সুবোধ ঘিরে পাখা কিনুন—তাতে টাকা বাঁচবে। সহজ ক্রিষ্টিতে—এক পয়সাও বাড়তি বরচ না করে অনেক বরচ মডেলের পছন্দমত উষা পাখা কিনতে পারেন। এলা সেক্টরের থেকে এই সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। মত আগে কিনবেন—ক্রিষ্টির টাকাও তত কম পড়বে।



উষা ভারতে সর্বাধিক বিক্রীত-বিশ্বাসযোগ্য। নিঃসন্দেহে স্বীকৃত হয়েছে



সর্বনাশ | শ্রীলেখাবসু

জ্যাঠাইমা সেই থেকে আমাদের তাড়না করছেন যাতে আমরা একবার ভুবনমামার সাপে দেখা করে আসি। “কত ভালোবাসতো জ্যেদের—খা-না একবার”, এই ধরনের কথা তিনি ক্রমাগতই বলে চলেছেন। আর যদিও এই ব্যাপারে জ্যাঠাইমাই সব ভূমিকা নিয়েছেন, তবু আমি জানি তাঁর নির্দেশের পিছনে বাবা-কাকাদের নীরব সমর্থন আছে।

সত্যিই ভুবনমামা আমাদের খুব ভালোবাসতেন। সকলকেই ভালোবাসতেন তিনি। তাঁর বিরাট হৃদয়ের স্বতোষসারিত নিম্নলিখিত প্রাণিত সকলকেই কাছে টেনে নিত। আমার জ্ঞান মেজবৌদির ওপরে তো তাঁর বিশেষ পক্ষপাতই ছিলো। মেজবৌদিকে চেনেন কি? আমাদের বাড়ীতে এলে মেজবৌদিকে লক্ষ্য না করে উপায় থাকে না। তিনি আমাদের জ্যাঠাইমার মেজবৌমা, আবার তাঁর প্রবল প্রতিপক্ষও বটে। নায়-অনায় বোধটা তাঁর বড়ই প্রবল। আর যেহেতু এতদিন আমাদের একায়বতী পরিবারে জ্যাঠাইমাই অপ্রতিহত দাপটে করণীয় করে এসেছেন, সেইহেতু তিনিই অধস্তনদের মধ্যে নায়-অন্যায়ের ব্যাখ্যা শুনতে সবচেয়ে নারাজ। মেজবৌদিরও দাপট কম নয়, জ্যাঠাইমা—মাকে দেখলে মা-কাকীমার এখনো হৃদকম্প হয়—তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কিনা অকুতোভরে নিজের গত্যমত ব্যক্ত করেন! আজ্ঞা বলুন তো, জ্যাঠাইমার এতে রাগ হওয়াটা কি

অন্যায়? আমি তো বাপু তাঁকে বিশেষ দোষ দিতে পারি না। তাঁর মনস্তত্ত্বটাও এমন কিছু আর্থোস্তিক নয়?—তুই একটা সম্পূর্ণ মানবও ন'স, নেহাৎই একটা ‘বৌমানুষ’, এই সোদা আমাদের ঘরে এসেছিঁস, সঙ্গে না এনেছিঁস অতলে অর্থ, না এনেছিঁস বনেন্দী ঘরের ছাপ, আর শেষ অবধি কিনা তোরই মধ্যে আমার উচিত কথা শুনতে হবে!—জ্যাঠাইমার মনে-ভাবটা অনেকটা এই ধরনের।

তাহাড়া সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার কি জানেন? জ্যাঠাইমা মনে-মনে মেজবৌদিকে একটু ভয়ও করেন। তিনি এই বৌটাকে বিরুদ্ধে মতই বিশ্বেষ পোষণ করেন না কেন, বাড়ীশুদ্ধ সকলে যে বৌটাকে বিশেষ একটু সম্মেনই চোখে দেখে, তাতে কোনো সম্মেন নেই। মেজবৌদি কিন্তু প্রয়োজন বাক্যে কাজকেই ছেড়ে কথা বলে না, আর তাই দেখে জ্যাঠাইমা শূন্য মাঝে মাঝে অবাঁক হয়ে যান। তিনি যখন উচিত কথা বলেন, তখন সবাই যেন পাঁচম গলাধঃকরণ করে, আর মেজবৌমার কথা হলো অমৃতসমান? এই তো সৌন্দর্য বড়ী ঠিকে ঝিটা না বলে-করে তিনদিন কামাই করে এসে স্বামী মর-মর বলে যখন মায়াফান্না কেঁদে পড়লো, তখন জ্যাঠাইমা বলেছিলেন, বৌটির সব ছল, আর তিনিদিনের মাইনেটা কেটে নিয়ে বৌটাকে দূর করে দিতে বলেছিলেন। ন্যায্য কথাই তো, কিন্তু তাই শুনলে বাড়ীশুদ্ধ সকলের

মুখ যেন কেমন হয়ে গেল। তবু তো সবাই চুপ করেছিলে, আর জ্যাঠাইমার শাশুড়ীর মেজবৌ (আমার মা) নির্দ্বন্দ্ব জ্যাঠাইমার নির্দেশ মত মাইনে চুকিয়ে দিচ্ছিলেন, এমন সময় রণস্বাস জ্যাঠাইমার প্রতিপক্ষের উদয় হলো। (আজ্ঞা, জ্যাঠাইমার শাশুড়ীর মেজবৌ আর তাঁর নিজের মেজবৌয়ে এত তফাৎ কেন হলো? বোধহয় জ্যাঠাইমার পোড়া কপালেরই দোষ!) এসেই মেজবৌদি বললে, “মা, এটা কিছু ঠিক হচ্ছে না”, আর তাই শুনলে বাড়ীশুদ্ধ সকলের মধ্যে যেন আলো জ্বলল উঠলো। জ্যাঠাইমার শাশুড়ীর মেজবৌ টাকা গোলা বন্দ করে জ্যাঠাইমার মূখের দিকে আশান্বিত নয়ানে চেয়ে রইলেন, আর জ্যাঠাইমার মেজবৌ বলে চললো, “সত্যিই ওর স্বামীর বড় অসুখ, আমি নেতাকে দিয়ে খবর জানিয়েছিলুম কিনা। ওকে বরং চিকিৎসার জন্যে কিছু বখশিস দিন মা। বেচারী বড়ো মানুষ, এ-বাড়ীর কাজ ছাড়লে যাবেই বা কোথায়?” আজ্ঞা, কথা শুনলে হাড় জ্বলে যায় না? বড়ো হয়ে গিয়ে তেমন কাজকর্ম আর পারে না বলেই না জ্যাঠাইমা তাকে তাকে ছিলেন কবে বৌটাকে দূর করবেন—এই কথাটা আর তাঁর গণধরী বোয়ের মাথায় ঢুকলো না?

যাই হোক, মেজবৌদির কথা অনেক বলে ফেললুম, তাঁর কথা উঠলে আমি

আমরা তঁাকে সমালোচিত করি না। তবে আমলে যার কথা বলতে চাই তিনি হলেন আমাদের ভুবনমামা। ভুবনমামা জ্যাঠাইমার কোনো এক ছুঁ-সম্পর্কের ভাই বটে, কিন্তু তার বা আমাদের কারো আচরণ প্রাণে যোকবার জো ছিলো না যে তিনি আমাদের পরমাধীন নন। লম্বা চওড়া গোরবর্ণ মানবটি, হা-হা করে খসে ফাটিয়ে হাসেন আর বিপদে-আপদে উৎসবে-বাসনে সর্বদাই আমাদের সর্ব-কার্যের কাঁড়ারী হয়ে হাল ধরে থাকেন। ভুবনমামার আপন পর জ্ঞান ছিলো না—এই কথা বাড়ীশুদ্ধে সবাই বলতো। জ্যাঠাইমাও বলতেন তবে একটু ভিন্নভাবে। ভুবনমামা জ্যাঠাইমার ভাই হলেও যে মা-কাঁকীমার বোনের মত স্নেহ করতেন এবং তাঁসব ছেলেমেয়েদের জ্যাঠাইমার সন্তানদের চেয়ে কিছু কম দেখতেন না এটা বাড়ীর সকলেই আনন্দের ও জ্যাঠাইমার ক্রিষ্ণ গাভরাহর বিষয় ছিলো। গাভরাহর একটু করপও ছিলো। ভুবনমামা “পলসোলা” লোক ছিলেন, তেঁদের এক বছর সঙ্গের কাঁড়ের না স্লাম্টিকের ব্যবসার নেমে যথেষ্ট উপাভূত করতেন। তার ওপর ভুলজোকের সংস্কার রুনা স্ত্রী ছাড়া আর কেউ ছিলো না। আর তারও ওপরের কারণ হলো ভুলজোক বড়ো চিলুড়িয়া মানুষ ছিলেন। খাইয়ে-মাখিয়ে, উপহার নিয়ে, বেড়াতে নিয়ে গিরে আমাদের সংসারে যেন একটা ফাঁটার স্রোত বইয়ে রাখতেন।

আরো সবাই কি আর “পয়সা” বলে ভুবনমামাকে ভালোবাসতো? তা নয়। তিনি ছিলেন যেন আমল-নিভৃততার একটা প্রতীক। আমরা মনে হতো যেন “ক-একটা অলোর আভার মুখখানা তার জুলতলে করছে। সেই জুলতলে মুখটা যেন বড়ো সুন্দর, বড়ো আপন মনে হতো। জ্যাঠাইমাটি, মাক, কাকা সবাই অস্কেতে তার ওপরে নির্ভর করতেন। তিনি এসেছেন খবর পেলেই মা-কাঁকীমা খাঁশ-খাঁশ মুখে খাবার তৈরী করতে বসে যেতেন। আর আমরা উৎসুক হয়ে প্রতীক্ষা করতুম কতক্ষণে বড়োদের হাত জাড়িয়ে এসে তিনি আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন।

ভুবনমামা ছিলেন ছোটোখাটো রোগা মত শক্ত নির্বিরোধী মানুষটি। জ্যাঠাইমাকে বোধহয় মা-কাঁকীমার চেয়েও বেশী ভাল করতেন। স্ত্রীর প্রতি ভুবনমামার চিনটা একটু অসাধারণ রকম ছিলো, তাই নিয়ে মা-কাঁকীমা খুব ঠাট্টা করতেন। স্ত্রীটি বড়ো রুক্ষ ছিলেন বলেই হোক বা বড়ো ভীত, আর নরম ছিলেন বলেই হোক ভুবনমামার আচরণটা শুধুই প্রেমিক স্বামীর মত ছিলো না।—কি বলবো—যেন একটু পিতৃসুলভ সঙ্কল্প ভাবও মেশানো ছিলো। এই হোকাঁকীমার ছোটো ছেলের অন্নপ্রাশনের দিন একবারী লোকের মধ্যে কি কান্ডটাই না করলেন ভুবনমামা। শুনলাম ভীড়ে আর গরমে ভুবনমামার নাকি একটু স্ত্রীর খসাপ হারিয়ে, কিন্তু কান্ডকারখানা দেখে মনে

হলো ভুবনমামারই বিলম্ব মাথাটা খরস হয়েছিল। বেশ ট্র-ট্র করে চরিক ঘুরাচ্ছিলেন। অভ্যাগতদের আপ্যায়ন, ডাডারের চাঁক, ভিয়েনের তলারক সব এক-হাতে করছিলেন। হঠাৎ স্ত্রীর অসুস্থতার খবর পেয়ে মূগ্ধ যেন কালী মেয়ে গেল। তারপর জল-পাখা-রে শরবৎ-রে এই নানাবিধ রাবে হীতিমত একটা শোরগোল পাঁকিয়ে তুললেন। সেই কাজের বাড়ীর মধ্যেই সবাইকে ঠেলে-ঠেলে একটা ঘর খালি করে ভুবনমামাকে শইয়ে দিলেন, তারপর মেজবোদিকে সকাতির অনুময় করলেন যেন তিনি ভুবনমামার মাথার কাছে বসে থাকেন। ভুবনমামা তো স্কেতে এতোটুকু হয়ে গেলেন, আর মেজবোদ অভ্যাসমত ভুবনমামাকে বকেই উঠলেন, “কি যে বাড়াবাড়ি করছেন মামা-বন্দু আপনি! কিছু হয়নি মামীর, একটু শূয়ে থাকলেই সেরে যাবে। আমরা সবাই তো এখান থেকে আছি, আপনি এবার ও-সিঁকে যান তো।” মেজবোদার তাক্সা খেয়ে ভুবনমামা তো ভবনকার মত পালালেন, কিন্তু একটু পরে-পরেই এসে যে কতবার ঘুরে দেখে গেলেন তার ঠিক নেই। মা-কাঁকীমাকা সবাই সেদিন মুখটিপে হাসলেন, আর জ্যাঠাইমা বললেন, “আসিখোতা!”—আরো নীচু গলাতেই বললেন, কারণ ভুবনমামা একটা স্বক্যকে সোনার হার নিয়ে ভোটা-ঝোকাতে আশীর্বাদ করেছেন, আর ভুবনমামা নইলে তো কাজের বাড়ী অচল।

সেই ভুবনমামার কাছে মদার জন্যে আমাদের তাক্সা করতে হচ্ছে শুনে আশ্চর্য হইলেন তো? আমিও বতবার ভাবি ততবার আশ্চর্য হয়ে বই। ইচ্ছে করে মাথখানের গেলমেলে দিনগুলোর কৃত্রী স্মৃতির সংশ-গলো তেলা মেয়ে কোথাও সরিয়ে দিই, বিশেষত জ্যাঠাইমার বিষয়ে দিনটা—কিন্তু প্রাপ্তপণে চেষ্টা করলেও যখন তাদের সরানো বাধে না তখন গোড়া থেকেই সব কথা বালি।

বেশ চলছিলো সব। আমাদের একাধ-কৃত্রী পরিবারে সাংসারিক বিচিত্র লীল নির্মিত ভূপে অভিনীত হয়ে চলছিলো। ছেলগুলো পাশ করে, চাকরী পায়, তাদের বো খোজার ছুম গড়ে যায়, তারপর একদিন ঘটা করে বিয়ে হয়। কিছুদিন নতুন কুঠুমদের সমালোচনা হয়। তারপর বো-গুলো খিঁচিয়ে বসে এক-একে পরিবারের সংখ্যা বাড়ায়। মেয়েদেরও মোটামুটি একই ফর্মুলা। নেহাৎ এক-আধটা পাশ না করলে বিয়ে হওয়া মুস্কিল তাই শুলে দেওয়া। সেই এক-আধটা পাশ করতে না করতে জীবনের পরম লক্ষ্য বিয়ের ব্যাপারটা ঘটিয়ে কেবার জন্যে অভিব্যক্তরা তৎপর হয়ে ওঠেন। অগাধ পাঠপক্ষকে জামাই-আশ্রয় করার পর একজন সত্যিই জামাই হতে রাজী হয়ে যান, অতঃপর তবু-তাবাস, আত্মত্ব... একের পর এক নির্মিত ভূপে চলতে থাকে। মাথখান থেকে হঠাৎ পোলমাল বাখলো রাঙা-দি, জ্যাঠাইমার ছোটো মেয়ে। সে হঠাৎ স্বাধীনভাবে একটা পছন্দ করে ফেল বাড়ীশুদ্ধে সবাইকে তাক্সা লাগিয়ে দিল।

ছোটোটি আঁকালা স্বভাবত স্নেহর এক অবস্থাপন্নও হটে। কিন্তু পড়ুরা ছেলে, তার ব্যপের ওপরেই নির্ভর। জনপ্রতি আছে যে ব্যপের আবার অবস্থা যেমন ভালো, মেজাজ নাকি তেমনি খরাপ। কি-জানি পড়ুরা ছেলের প্রেমের খবর পেয়ে পড়ুরা পড়ুরা তাক্সা করতেন কিনা। জ্যাঠাইমা রাঙা-দিকেও হাথখট শালনের মধ্যেই মান্দ্র করাইলেন। ব্যাটা বছর বয়স থেকে ব্যাটামার বেয়েনো, জনলায় নীড়ানো সব বন্ধ করে দিরাইলেন। কিছু তবুও মুখপোড়া মেয়ে কিনা এই কান্ড বাধিয়ে ফেললো? কি বলবেন, নেহাৎ নাকি অমন অবস্থাপন্ন পাঠ জোতাতে হলে তাঁদের কালঘাম ছুটে যেত তাই, নইলে জ্যাঠাইমা মেয়েকে একেবারে সর্বাঙ্গ দিয়ে দিতেন না!

বাইহোক এখন সমস্যা দাঁড়ালো, প্রস্তাবটি নিয়ে বয়ের ব্যপের কলহ এসেছে তো। জ্যাঠাইমাইয়ের আবার একটুতেই মানহানি হয়, তিনি প্রথমেই বরকন না, কি-জানি ভাবী মেয়েই যদি অবমাননাকর

প'রে বড়
আরাম



সজ্জা ও পদ্য'র
গেঞ্জী

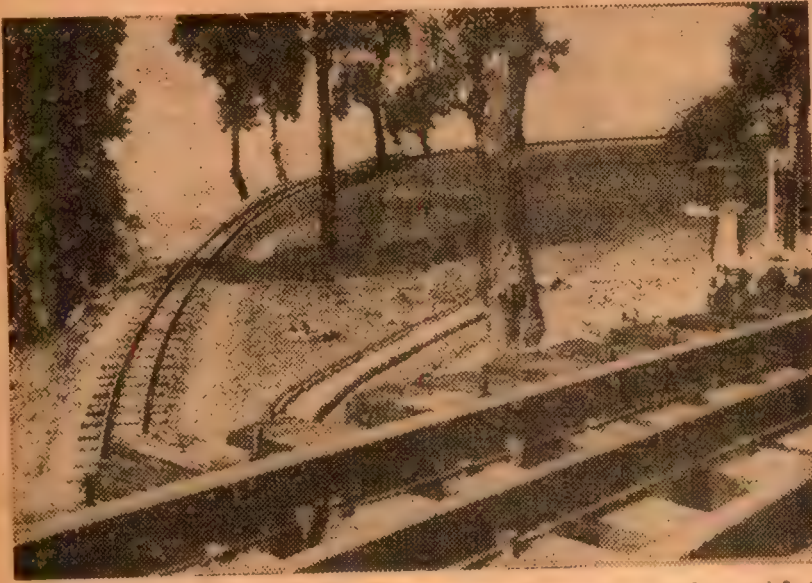
ডি.এন.বহুর হোমিয়ারী জামাই

হোমিয়ারী জামাই



হোমিয়ারী জামাই

হোমিয়ারী জামাই



ফটো : অনিল চ্যাটার্জি

কিছু বলে বসেন? বাবা-কাকা তো চির-কালের ভীতু মুখচোরা মানুষ। অতএব সবাই ভুবনমামার শরণাপন্ন হলেন। আর সব শোনামাত্র ভুবনমামা হা-হা করে হেসে, রাঙাচিহ্নে পিঠে চাপড়ে আদর করে, তবুনি বরের সপ্নে দেখা করে এসে তার প্রচুর

বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতির্বিদ

জ্যোতিষ সন্ধ্যাট পড়িত গ্রীষ্মে রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, জ্যোতির্বিদ, সাময়িককর, এম-আর-এ-এস (লন্ডন), ৮৮-২, রফি আমের কিদোয়াই রোড, “জ্যোতিষ-সন্ধ্যাট ভবন”, কলিকাতা-১০। সময় বৈকাল ৫-৭টা। ফোন : ২৪-৪০৬৫। প্রেসিডেন্ট অল ইন্ডিয়া এস্ট্রোলজিক্যাল এন্ড এস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি স্থাপিত : ১৯০৭ খ্রিঃ।



জ্যোতিষ-সন্ধ্যাট দিব্যদেহধারী এই মহামানবের বিস্ময়-কর ভবিষ্যৎবাণী, হস্তরেখা ও কোষ্ঠী বিচার, তাম্রিক জিয়াকলাপ ভারতের জ্যোতিষ ও তন্ত্র-শাস্ত্রের ইতিহাসে অম্বিতীয়। তার গৌরবদীপ্ত প্রতিভা শৃঙ্খলা ভারতে নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে (ইংল্যান্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান, মালয়েশিয়া, জাভা, সিঙ্গাপুর) পরিব্যাপ্ত। গৃহমুখ চিন্তাবিদেয়া প্রমাণপ্রত্য অস্তরে জানিয়েছেন স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন।

প্রশংসাপত্রসহ ক্যাটালগের জন্য লিখুন। বহু পরীক্ষিত কয়েকটি অভ্যাস কবচ। ধনদা কবচ-সর্বপ্রকার আর্থিক উন্নতির জন্য ১১-৪০, শক্তিলালী বহুঃ ৪৪-৫৪; বগলামুখী কবচ-প্রবল শত্রুনাশ ও মামলার জয়লাভ এবং কর্মোন্নতি হয়-১০-৬৪, বহুঃ ৫১-১৮। মোহিনী কবচ-ধারণে চিরশত্রুও মিথ্র হয়-১৭-২৫, বহুঃ ৫১-১৮। সর্বস্বতী কবচ-বিদ্যোমতি ও পরীক্ষায় সফল ১৪-০৪, বহুঃ ৫৭-৪৪।

প্রশংসা করে বাড়ীটাকে এমন মতিরে ফেললেন যে সকলের মনে বেন বিয়েবাড়ীর রঙ ধরে গেল। তারপর ভুবনমামা সব ব্যবস্থাই করলেন। বরের কে-একজন প্রোফেসর জাতীয় মুরব্বিকে ধরে বরের বাপের সপ্নে দেখা করলেন। আর কথায়-বার্তার অমারিকতার ভুললোককে রীতিমত গিলিয়ে নিয়ে রাজী করিয়ে ফেললেন। সবই ঠিক হয়ে গেল, শুধু বরের ফাইনাল পরীক্ষাটা হওয়া অবধি, অর্থাৎ বছর খানেক, আমাদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। এ ব্যাপারে আর ভুললোককে টলানো গেল না। যাই হোক—কটা মাস তো? দেখতে দেখতে কেটে যাবে। আমরা উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম আর জ্যাঠাইমা-মাকাকীমা শাড়ী, গয়না ফার্নিচারের কেনাকাটার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সবচেয়েই ভুবনমামা তাঁদের পরিচালক এবং আত্ম-বাহকও বটে। জ্যাঠাইমা অবধি একগাল হেসে বলে ফেলতে লাগলেন, “সত্যি, ভুবন না হলে বেন সবই অচল।”

মাস দু'য়েক গেছে, বিয়ের ব্যাপারে মা-জ্যাঠাইমাদের উৎসাহে সাময়িকভাবে একটু ভাঁটা পড়েছে। এমন সময় কানাখুঁবোর শুনলুম ভুবনমামার নাকি সর্বনাশ হয়ে গেছে, তাঁর সেই বন্ধু না পার্টনার নাকি তাঁর স্বাস্থ্যসর্ব্ব হারিয়ে নিয়ে সরে পড়েছে। ভুবনমামার নাকি বসন্তবাড়ীটি ছাড়া এখন আর কিছুই নেই। স্যানিটিকের কারখানার অবস্থাও নাকি টলমল। ভুবনমামাকে দেখলুম দু'একদিন, ব্যস্তসমস্তভাবে এসে জ্যাঠামশাইদের সপ্নে কথা বলে চলে যান। একটু বিষয় লাগলো তাঁকে আর একটু চিন্তিত, তাছাড়া সর্বনাশের কোনো ছাপ তাঁর মুখে ছিলো না। আমরা একটু এড়িয়েই দাঁড়িয়েছি। একদিন শুনি মেজবোদীর সপ্নে তাঁর কথা হচ্ছে। স্যানিটিক কোমল গলায় মেজবোদী বলেছে, “এমনভাবে তার

হাতে সর্বস্ব ছেড়ে দেওয়াটা উচিত হয়নি মামাবাবু।”

ভুবনমামা বললেন, “কি বললিস মা? মানুষ কি মানুষকে বিশ্বাস না করে পারে? কুড়ি বছরের বন্ধু আমার...!”

মেজবোদী একটু চুপ করে থেকে আবার বললো, “বিজনেসের লাইনটা আপনার উপর নর মামাবাবু। লোকে আবার ঠকাবে আপনাকে। আপনার সরলতার সুযোগ নেবে?”

“দূর পাগলি”, ভুবনমামা হা-হা করে হেসে উঠলেন, “একটা লোক বিশ্বাসঘাতক হয়েছে বলে কি পৃথিবীটাই মন্দ হয়ে যাবে রে?” বলতে বলতে ভুবনমামার মুখখানা আবার জলজ্বল করে উঠলো, “তুই দেখিস মা, কারখানাটা আবার আমি নিশ্চয়ই দাঁড়ি করাবো।”

মেজবোদী আর কিছু বললে না, দেখলুম তার চোখদুটো ছলছল করছে।

এরপর বাড়ীতে একটু উত্তেজনার হাওয়া বইলো। ভুবনমামা নাকি কিছু টাকা জ্যাঠামশাইয়ের কাছে ধার চেয়েছেন। জ্যাঠামশাই অবিশ্যি তবুনি দিয়ে দিতেন যদি না জ্যাঠাইমার মুখখানা অহোরাত্র তাঁর চোখের ওপর ভাসতো। তিনি তো “আচ্ছা দেখি” বলে ভুবনমামাকে বিদায় দিয়ে অন্তঃপুরে এলেন, তারপরে চিরকালীন দুই প্রতিপক্ষ আবার পরস্পরের সম্মুখীন হলো। জ্যাঠাইমা মুখ বেকিয়ে বললেন, “ধার যে নেবে তা শুধু কি করে শুনি? ভুবনের কি কিছু আছে? বৃষ্টির দোবে সব খোয়ালো।” আর তাই শুনে মেজবোদী রাঙামুখে বললে, “কি বলছেন মা? কোনদিন তিনি কিছু চান নি আমাদের কাছে, আর আজ তাঁকে শুধুহাতে ফিরিয়ে দেবেন?” জ্যাঠামশাই মাঝে পড়ে রফা করলেন যে ভুবনমামা যা চেয়েছেন তার অর্ধেক তাঁকে দেওয়া হোক। বাবা-কাকাও সায় দিলেন। আর জ্যাঠাইমাও, কি-জানি কেন, বিশেষ আর আপত্তি করলেন না। বোধহয় তাঁর কণি আশা ছিলো যে টাকটাক শেষ অবধি মারা যাবে না।

কিন্তু কিছুদিন পরে আবহাওয়া সত্যিই গরম হয়ে উঠলো। ততদিনে জ্যাঠামশাইরা বুঝেছেন যে ভুবনমামার কারখানার যেমন টলমলে অবস্থা তাতে তুচ্ছ দু'পাঁচ হাজার টাকা সেখানে স্নোতে ভেসে যাবে। ভালোমত বাঁধন দিতে হলে মোটা টাকার দরকার। অত টাকা কে দেবে? তার ওপর ভারী একটা বদ অভ্যাস হয়েছে ভুবনমামার। সকলের কাছেই নাকি মোটা ধার ছাড়াও ছোটোখাটো দু'একশো টাকা ধার নিয়ে বসে আছেন। জ্যাঠাইমা সেদিন বাড়ীতে হুঁলুখুল করলেন। মেজবোদীকে দেখিয়ে বললেন, “এই সর্বনাশীর বৃষ্টিতেই টাকা-গুলো আমার জলে গেল।” মেজবোদী ঠাণ্ডা গলায় বললে, “বেশ তো, উনি তো! আমাদের অনেক টাকা অনেক সময়ই বাঁচিয়েছেন। তার থেকে নিলেনই বা কিছু।” শুনে জ্যাঠাইমা রেগে অগ্নিমূর্তি হলেন, এমনকি বাবা-

জ্যাঠাইমশাইও তাঁদের আদরের বৌমার
কথায় তেমন করে সায় দিতে পারলেন না।

সবাই তার আর হয়ে থাকেন। ভুবন-
মামা কিন্তু বেকার জবোটা কেন? ধরতেই
পারেন না। আগের মতই এসে অস্কেচে
খাওয়া-দাওয়া করেন, সুখ-দুঃখের গল্প
করেন, তারপর চলে যান। এইভাবে ক্রমে
রাঙাদির বিয়ের দিন এগিয়ে এলো। আর
সকলের ইচ্ছে থাক বা না থাক ভুবনমামা
বেন আবার নিজের পুরোনো 'পেপারজিশন'টা
ফিরে পেলেন। ছোটোছোটো, কেনাকাটা,
ব্যবস্থাপনা সবই ভুবনমামার হাতে।
জ্যাঠাইমার ইচ্ছে ছিলো না যে টাকাকাড়ির
ব্যাপারটা ভুবনমামার হাতে পড়ে, কিন্তু
কাজের বাড়ীতে কখন কি প্রয়োজন হয় তার
ঠিক কি? জ্যাঠাইমা আড়ালে গজগজ
করতেন। আর শেষ পর্যন্ত সামনাসামনি
ফেটে পড়ার সুযোগও তিনি পেয়ে গেলেন।

বিয়ের দিন সকালে সবে গায়ে-হাটুদের
তত্ব এসে নেমেছে এমন সময় কাকা শুকুনো-
মুখে এসে জ্যাঠাইমাকে বললেন, "নেকলেশের
সামটা কি এখনো দাওনি? গয়নার দোকান
থেকে ফোন করছে।" কাকার মুখ দেখে মনে
হলো কি-কেন সন্দেহে তিনি একটু অস্থির
হয়ে পড়েছেন।

জ্যাঠাইমা যেন ইলেকট্রিকের শক
খেলেন, "দিইনি মানে? নিশ্চয়ই দিইছি,
আমার পরিষ্কার মনে আছে।" তারপরই
দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "এ হলো ভুবনের
কীর্তি। তোমার সামনেই তো তার হাতে
দামটা দেওয়া হয়েছিলো। 'ভুবনদা-ভুবনদা'
করে কত আদিখ্যাতা তোমাদের, কীর্তি-
কলাপ বেরুলো তো এখন?"

এর পরেও কি শুনতে চান? জ্যাঠাইমা
তবাতার স্বরূপ আবরণটুকুও রাখলেন না।
সেই একবাড়ী লোকের মধ্যেই জেরা করলেন
ভুবনমামাকে।

আর আশ্চর্য, ভুবনমামা খুব সহজেই
স্বীকার করলেন টাকা নেওয়ার কথা। "ওটা
এখনো দেওয়া হয়নি দিদি, তোমার ভাজের
শরীরটা বড়ো খরাপ যাচ্ছে কদিন ধরে ওই
থেকে কিছু টাকা ওষুধ-বিস্মৃধে খরচ হয়ে
গেল।" তার সহজ সরল ভাবে স্বীকার
করলেন ভুবনমামা। টাকাটা নেওয়ার মধ্যে
বে কোনো লজ্জা-সঙ্কোচের কারণ আছে তা
তার ভাবে মনে হলো না।

কিন্তু মনে না হলো তো কি হয়েছে?
জ্যাঠাইমা তবে আছেন কি করতে। "বলি
তুমি ভেবেছো কি হলো তো ভুবন," বলে
সেই যে তিনি আরম্ভ করলেন হতক্ষণ না
ভুবনমামার মুখ ক্যাকাশে হয়ে গেল।
অপমানে ঠোঁটদুটো খরখর করে কাঁপতে
লাগলো, আর দরজা-জানলার রাজ্যের লোক
উঁকি মারতে লাগলো, ততক্ষণ তিনি
থামলেন না। জ্যাঠাইমশাই, বাবা, কাকা
দু'একবার বধা দিতে গেলেন, কিন্তু
জ্যাঠাইমার প্রবল গলার তেড়ে সে কণি
চেন্টাটা কোথায় ভেসে গেল।

এইরকম পরিস্থিতিতে আমরা এখন
বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁপছি, তখন ইঠং

মেজবৌদি এসে ঘরে ঢুকলো। তার চোখে
বুকবুকে দৃষ্টি। বড়ো বড়ো নিঃশ্বাস
পড়ছে। এসেই তাকি কণ্ঠে ডাকলো,
"মা—!" কি যেন ছিলো তার কণ্ঠস্বরে যে
জ্যাঠাইমা অবধি চমকে উঠলেন। তারপর
সবাইকে স্তব্ধ করে দিয়ে একইরকম গরায়
মেজবৌদি বললে, "মামাবাবু, আপনি এখনো
বসে আছেন কেন?"

একটু পরে দেখলুম ভুবনমামা ঘর থেকে
বেরিয়ে এলেন। তাঁর মুখখানা দেখতে
পেলুম না, কিন্তু কথা শুনতে পেলুম।
সঙ্গে বাবা ছিলেন, দরজার সামনে এসে
ভুবনমামা তাঁকে বললেন, "অন্তত এই
টাকাটা আজই পাঠিয়ে দেব," তার গলাটা
কেমন যেন ফ্যাশ-ফেশে বিকৃত শোনালো।

টাকাটা বোধহয় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন
ভুবনমামা, কিন্তু নিজে আর আসেননি।
ভালোই করেছেন না এসে, আরো অপমানিত
হতেন হয়তো। মানুষের ওপর তাঁর সেই
সরল বিশ্বাস তখনো ছিলো কিনা জানি না,
আমার কিন্তু নিজেদের ওপর বিশেষ ভরসা
ছিলো না।

তারপরে অনেকদিন আর ভুবনমামাকে
দেখিনি, তবে এ-দিক ও-দিক থেকে তাঁর
খবর পাই। শুনতে পাই ভুবনমামা তাঁর
কারখানাটা মটগেজ না কি দিয়ে কিছু
টাকার সংস্থান করে সত্যিই ব্যবসাটাকে
আবার তেলেটলে দাঁড় করিয়েছেন। আবার
নাকি "দু' পরসার" মুখ দেখছেন। তবে
আমরা যে আবার তাঁর মুখ দেখতে পাবো
এমন আশা আর ছিলো না। শ্রুত্বের মাঝে
মাঝে ভাবেন সৈদিন তাঁর ওপর বড়ো অন্যাক
হয়ে গেছলো, তাঁর নামের উল্লেখ হলে মা-
কাকীমারা মুখ শ্লান করে থাকে। আমরা
নিঃশব্দই থাকি।

এমন সময় আবার ভুবনমামার নাম বেশ
প্রকাশ্যভাবে উচ্চারিত হলো আমাদের
বাড়ীতে। রাঙাদিই কথাটা পাড়লো, তার
স্বামীর নাকি একটা ভালো চাকরির সম্ভাবনা
আছে। যিনি তার ওপরওলা ইবেন তিনি
নাকি আবার ভুবনমামার বন্ধু, অতএব
ভুবনমামাকে একটু ধরতে পারলেই...

প্রস্তাবটা শুনে আমরা সবাই মধ্য নীচ
করে ছিলাম আর মেজবৌদি বলছিলেন,
"ঠাকুরজামাইয়ের কাজ এমনিতেই হবে, তার
জন্যে ভুবনমামাকে ধরবে কি? তোমাদের কি
লজ্জাশরম নেই?"

অবিশা মেজবৌদি কথাটা শেষ করার
আগেই জ্যাঠাইমা কাঁকিয়ে উঠছিলেন,
"তা তো বলবেই, ননদের ওপর টান কটা।"

তারপর থেকেই জ্যাঠাইমা আমাদের
হাড়না করছেন বাতে আমরা গিরে ভুবন-
মামাকে আবার এ-বাড়ীতে ধরে নিয়ে আসি।
কিন্তু মেজবৌদি আর আমি কিছুতেই রাজী
হতে পারছি না। তাতে অবিশা কিছু
আসবে যাবে না। কারণ শুনছি জ্যাঠাইমশাই
বাবা, কাকা তিনজনেই আজ ভুবনমামাকে
নেহাশ্রম খাবার জন্যে ধরে আনতে যাচ্ছেন।
সেই উপলক্ষ্যে গ্রা পায়স রাঁধছেন আর
কাকীমার রান্না মাংসের সুগন্ধ বাড়ী ভরে

দিয়েছে। মেজবৌদি নিমন্ত্রণ করতে চাননি,
বাধা দিয়েছিলো, কিন্তু গুরুজনেরা কেউ
তার কথায় কান দেননি। সে পাথরের মত
মুখে কাঁক করছে। জানি সে ভুবনমামাকে
মুখ দেখাতে চায় না, বাড়ীর সকলের লজ্জা
তো তারও লজ্জা।

আমি অত লজ্জার ধার ধারি না। আমি
ভুবনমামাকে মুখ দেখাতে লজ্জা পাবো না।
কিন্তু তাঁর মুখ দেখতে হবে বলে বড়ো ভয়
করছে। এই নিমন্ত্রণের পরেও কি সেই মুখ
মানুষের প্রতি বিশ্বাসের ছপটুকু অম্লান
থাকবে? সেই জলজলে ভাবটুকু অম্লান
থাকবে? আর যদি সেই বিশ্বাসের দাঁড়টুকু
হারিয়ে গিয়ে থাকে তবে ভুবনমামাকে
কি-রকম সর্বহারার মত দেখাবে তাই ভাবছি।
তাঁর এই অন্তিম সর্বশ্রমের চেহারাটা দেখতে
হবে ভেবে বড়ো ভয় করছে।

চিগ্রাফিন মিথিবাব বই
কে আর্টিস্ট
ড্রইং বুক
নির্দিষ্ট গায়ে প্রকাশিত
আপোকাবিষ্ট

মারীর দ্বাষ্ট
ও
নৌলবোর
পূর্ণ বিকাশে
আপোকাবিষ্ট

ভর দেহে
পূর্ণ স্বাস্থ্যের
সঙ্গীন দেহ
গাতিরদ
দ্যামা
ফ্রেও এও কোং
৪০১৭৫, আগার চিংপুর রোড, তলি-৭
ফোন: ৩১৫, বর্তমান স্ট্রিট, তলি-১০



বিকল্পপুরের জোড়বাংলা মন্দির

মন্দির পরিভ্রমণ

পূর্ব, দক্ষিণ, মধ্য ভারত

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য মন্দির স্মৃতিসৌধ, স্তূপ, বিহার, দেবদেবীর মূর্তি। এর মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ধর্মের পাশাপাশি অবস্থান লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। বিস্ময়কর সৌন্দর্যে যুগ যুগ ধরে মানুষকে অভিভূত করেছে এগুলি। দেবতার স্মরণে মানুষের সৃষ্টি এই পুণ্যস্থান। সূক্ষ্মতম শিল্পের অনবদ্য বাজনায প্রকাশ এবং স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের গৌরবময় নিদর্শন। এইসব অনিন্দ্যাসুন্দর সৃষ্টি রাজাদের অকুপণ অর্থব্যয় এবং বহু শিল্পীর শিল্পভাবনায় রূপময়তা লাভ করেছে। এই সমস্ত মন্দিরসৃষ্টির পেছনে আছে ইতিহাস, কিংবদন্তী, খ্যাত-অখ্যাত নানান কাহিনী।

মোক্ষলাভই ছিল ভারতবাসীর কাম্য। আধ্যাত্মিক চিন্তার শিল্পময় রূপ মন্দিরগুলি। ভারতীয় জনমানুষের সৌন্দর্যবোধ যে কত গভীর এবং সূক্ষ্ম ছিল তা এগুলির অভ্যন্তরে এবং বাইরে নানাভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উড়িষ্যা ও বাঙলা দেশ এবং ভারতের সঙ্গর পূর্বাঞ্চল, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, সৌরাষ্ট্র, দক্ষিণ ভারত, পশ্চিম ভারত, কাশ্মীর—ভারতের সর্বত্র মন্দিরের যে অসামান্য সমারোহ, তা দর্শন করা একমাত্র কঠোর-সংকল্প পুণ্যার্থী এবং শিল্পরসিকের পক্ষেই সম্ভব।

এই সমস্ত মন্দির নির্মাণে বিভিন্ন শিল্পরীতি অনুসৃত। দক্ষিণ ভারতের বহির্মুখী ভাস্কর্যরীতির সঙ্গে তুলনায় উত্তর ভারতের অন্তর্মুখী শিল্পরূপায়ণ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সূচিত করে। উত্তর ভারতের মন্দিরের জ্যামিতিক নক্সা সুস্পষ্ট। দক্ষিণ ভারতে সেগুলি ডিজাইন ও মূর্তি বসিয়ে কারুকাজ করা। উত্তর ভারতে যেমন মূল মন্দিরের ওপর শিল্পীর দৃষ্টি ছিল নিবন্ধ, দক্ষিণ ভারতে তেমন লক্ষ্য ছিল মন্দিরচত্বরে গোপূরমের ওপর।

যাই হোক, বর্তমান নিরন্ধে সর্বভারতীয় মন্দির গুলি নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়। এখানে কেবলমাত্র পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলির উল্লেখযোগ্য করেকটিকেই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।



খাজুরাহো আদিনাথ

বাংলা II

মন্দিরস্থাপত্যে বাংলাদেশের একটি লক্ষ্য বৈশিষ্ট্য আছে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে মন্দির অভ্যন্তর ও বহির্ভাগে অলংকরণের যে রীতি লক্ষ্য করা যায়, বাংলা তা থেকে অনেক পৃথক রীতির। কলকাতার মধ্যে বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলির লক্ষ্য শিল্পবৈশিষ্ট্য এবং প্রাচীনতা শিল্প-রসিক মানুষকে আকৃষ্ট করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। পূর্ব ও পশ্চিম কলকাতার মন্দিরসংখ্যাও কম নয়। অধিকাংশ ছোট ছোট আকারের। পুরোন মন্দিরগুলির গায়ে প্রতিমাকাল, রামায়ণ, মহাভারত, পুরান-কাহিনী, বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা, বাজপাখীর মূর্তি অলংকৃত করা হয়েছে।

বিষ্ণুপুরের শ্যামরায় মন্দির, রাসমণ্ড জোড়বাংলা, মদনমোহন মন্দির, বরাকরের বের্গানিয়া দেউল; হা'লশহরের শিবের মন্দির,

কমন চৌধুরী

বাঁশবেড়িয়ার বাসুদেবের মন্দির, হংসেশ্বরী মন্দির প্রভৃতি শিল্পকর্মের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য।

বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলা মন্দিরটির অলংকরণ ও নির্মাণপদ্ধতি সম্পূর্ণ বাংলা দেশের নিজস্বতার পরিচয়জ্ঞাপক। এর শিল্পরূপ অতুলনীয়। বাঁশ ও খড় দিয়ে নির্মিত বাংলাদেশের দোচালা ঘরের মত রূপ। ইট দিয়ে তৈরি দুটো মন্দির এসে মিশেছে, চড়া একটি। চারকোনা এই মন্দিরটির এক এক পাশের আরতন চারিশ ফুট। ছাদ বিশ ফুট উঁচু। মাথার শিখরটির উচ্চতা পঞ্চাশ ফুট। মন্দিরের মাঝখানে আট ফুট লম্বা চওড়া ঠাকুরঘর পোড়ামাটির



কোনকের সূর্যমন্দির

অলংকরণে ঐশ্বর্যময়। এর মধ্যে কত বিচিত্র কাহিনী ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পীরা।

অবশ্য এই রীতির আরো কয়েকটি মন্দির বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে দেখা যায়। কিন্তু তাদের শিল্পরূপ জোড়বাংলার মত এত উঁচুতরের নয়।

কামাখ্যা II

ভারতের পূর্বপ্রান্তের ঐতিহাসিক ও সুপ্রাচীন কামাখ্যাদেবীর মন্দির সম্পর্কে খুব বেশী কথা জানা যায় না। এখানে যাওয়াও খুব সহজসাধ্য নয়। সতীর দেহ নিয়ে মহাদেব যখন প্রলয় নাড়ো পৃথিবী-বিনাশে উদ্দাম হয়ে উঠেছিলেন, তখন বিষ্ণুর সুদর্শনচক্রে ঋণ্ডিত সতীদেহ ভারতের নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়ে। কামাখ্যায় পড়েছিল সতীদেবীর যোনি অংশ। দেবী তাই এখানে পরিচিত হন কামাখ্যা নামে।

কথিত আছে কামাখ্যা মন্দির নির্মাণ করেন বিদেহ নৃপতি মহারাজ নরকাসুর। তিনি নিজেই হন সেবাহিত। মন্দিরটি ভেঙে গেলে, রাজা নরনারায়ণ এটি পুনর্নির্মাণ করেন। মূর্তিপ্রতিষ্ঠার দিন এক লক্ষ পশু বলি দেওয়া হয়েছিল।

শান্তমন্দিরের প্রণকল্প কামাখ্যা। যখন ভারতে শান্তমন্দির প্রবল বন্যা আসে তখন



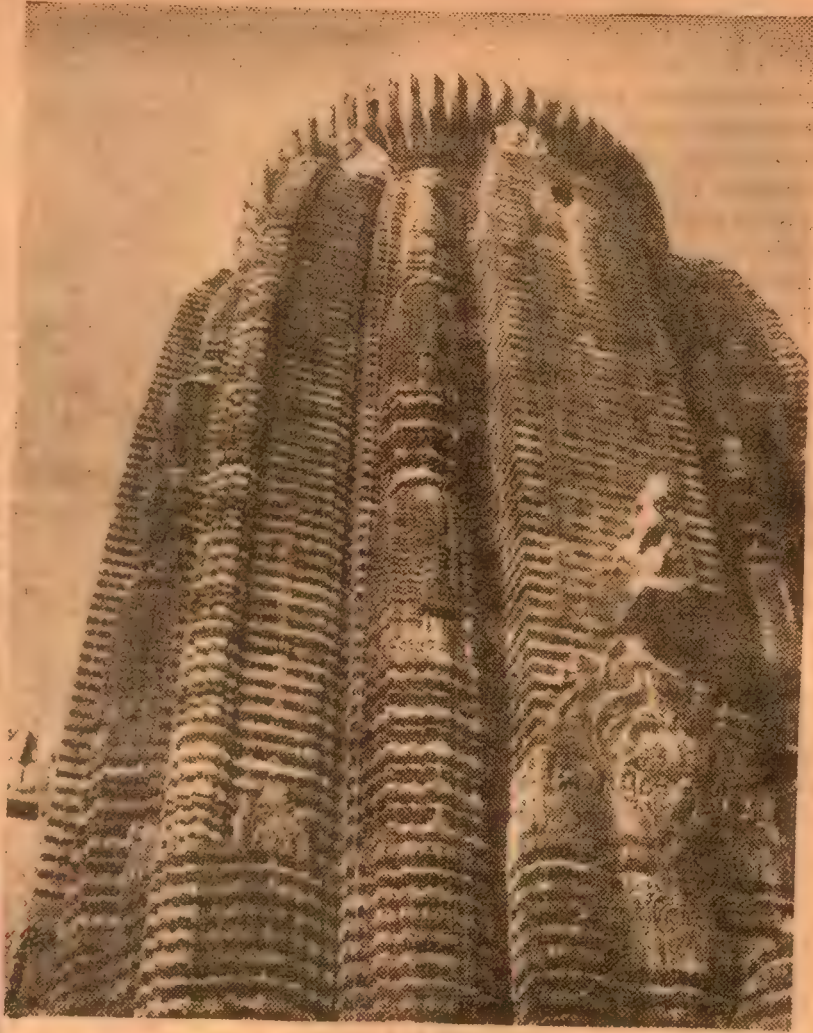
কামাখ্যাদেবীর মন্দির

এই মন্দিরের গুরুত্বও বোঝে যায় অসম্ভবভাবে। তাদের প্রতিপত্তি কমবার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরটির গুরুত্বও কমে যায়। দেবী বিভিন্ন ভাবে পূজিত হন। মন্দিরটি অলঙ্কৃত। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীর চিত্ররূপ খোদিত আছে মন্দিরের গায়ে। বহু দেব-দেবী যক্ষিণী মূর্তি আছে। আরো আছে নানারূপে নারীমূর্তি। কয়েকটি মৈথুন মূর্তিও রয়েছে।

উড়িষ্যা ॥

উড়িষ্যার মন্দিরসংখ্যা কম নয়। এদের মন্দিরনির্মাণ ও স্থাপত্যরীতিতেও রয়েছে একটি স্বতন্ত্র শিল্পধারা। কয়েকটি মন্দিরে দক্ষিণ ভারতীয় রীতির মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজের মন্দির, অনন্ত বাসুদেবের মন্দির, পরশুরামেশ্বরের মন্দির, মৃত্যেশ্বরের মন্দির, রাজারাণীর মন্দির, পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির, বিমলাদেবীর মন্দির, কৈনাকের সূর্যমন্দির উড়িষ্যা শিল্পকলার এক গৌরবময় যুগের নিদর্শন।

রাজারাণী মন্দিরটি সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে অপূর্ণ দৃশ্যায়। সম্ভবত দশম বা একাদশ শতাব্দীতে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। মন্দির অভ্যন্তরে কোন বিগ্রহ নেই। মন্দিরে শিবলিঙ্গ স্থাপন, সম্ভবত



রাজারাণী মন্দির



কান্ডারীর মহাদেব মন্দির

কোন দৈব আদেশে বশ করে দেওয়া হয়েছিল। কাল রঙের রাজারাণী পাথর ব্যবহৃত হয়েছিল মন্দিরনির্মাণে। তাই মন্দিরটির এই নাম। এই মন্দিরের অনেকগুলি মূর্তি অপসৃত হয়েছে। নাগনাগিনীর মূর্তি, অগ্নির মূর্তি, ভৈরবের মূর্তি উড়িষ্যা ভাস্কর্যের অপূর্ণ অভিজ্ঞান। এখানকার জগন্মোহন মন্দিরটিও সুঅলঙ্কৃত। রাজারাণী মন্দিরের ভাস্কর্য ও গঠনপ্রণালীতে অভিনব লক্ষণীয়। একটি মেঘেশ্বরের মন্দিরও আছে। তাছাড়া আছে আরো কয়েকটি মন্দির। নাগনাগিনী পশুপতী লতাপাতার অলঙ্করণ শিল্পীর কল্পনাকে আজও জীবন্ত করে রেখেছে।

উড়িষ্যা মন্দিরস্থাপত্যের দুটি প্রমুখ নিদর্শন হোল পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির এবং কৈনাকের সূর্যমন্দির। জগন্নাথদেবের মন্দিরটি গঙ্গাবংশের অবদান। এই মন্দিরটির চড়া বহুদূর থেকেই দৃশ্যমান। অনঙ্গ-ভীমদেব ১১৯৮ খৃঃ এটি নির্মাণ করেন। আবার অনেকের মতে অনন্ত বর্মণ চোড়গঙ্গ ১১৪৮ খৃঃ মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। উড়িষ্যা শিল্পকলার গৌরবময় যুগের স্বাক্ষর জগন্নাথদেবের মন্দির। মন্দিরের গায়ে আছে অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি।

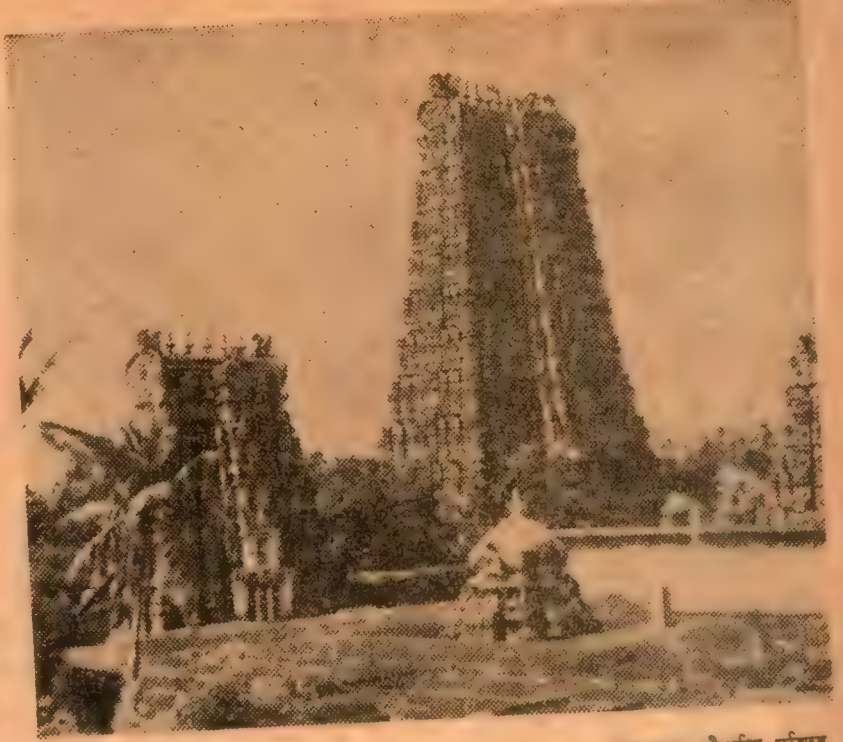
জগন্নাথদেবের মন্দিরটি সমুদ্র থেকে এক মাইল দূরে বিরাট প্রাঙ্গণের মধ্যে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। প্রাচীরটির নাম মেঘনাদ। উত্তর-দক্ষিণে ছ'শ ছেইটি ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে ছ'শ সাতাশ ফুট বিস্তৃত। প্রাচীর চত্বিশ ফুট উঁচু এবং বাইশ ফুট চওড়া। সিংহদ্বার, হস্তীদ্বার, আবদার, খাঙ্গা নামে চারটি দ্বার আছে প্রাচীরে।

মন্দিরভাঙ্গনে ছড়িয়ে আছে কয়েকটি ছোট ছোট মন্দির। কোনারকের সুউচ্চ কৃষ্ণপাথরের তৈরি স্তম্ভটি আঠার শতকে এই মন্দিরে নিয়ে আসে মারাঠারা। সেটি সিংহদ্বারের সামনে রক্ষিত—নাম অরুণ স্তম্ভ।

মন্দির অভ্যন্তরে কালো পাথরের বেদী ওপরে আছে জগন্নাথদেব, বলরাম, সুভদ্রার দারুনীমিত মূর্তি। মূল মন্দিরসহ জগন্মোহন মন্দির, ভোগমন্ডপ, নাটমন্দির, অক্ষয়ট, লক্ষ্মীর মন্দির, বিমলাদেবীর মন্দিরও এখানকার দর্শনীয়। মূর্তিসম্ভারও অনবদ্য শিল্পময়। শিল্পী যেন মনের সমস্ত ঐশ্বর্য ঢেলে দিয়েছে সৃষ্টিতে।

মন্দিরবাহির্ভাগে নানান দেবদেবী, শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেক, কৃষ্ণজীবনের বিচিত্র ঘটনা, নানান মৈথুন দৃশ্য এবং বিবিধ অলঙ্করণ আজও জীবন্ত হয়ে আছে।

কোনারকের সূর্যমন্দিরে কালের ছোঁয়া



মাদ্‌দ্বার মীনাক্ষি মন্দির



তাঙ্গোরে বহুদীশ্বরের মন্দির

লগেগেছে ও বহু অংশ ভেঙে পড়েছে। ইতস্ততঃ বিকসিত হয়েছিল সেই সমস্ত শিল্পকাজ মন্দিরের চারদিকে। একটি যাদুঘর নির্মাণ করে সেখানে বিকসিত শিল্পকাজ সংরক্ষণ করা হয়েছে।

মন্দির নির্মাণ করেন চোড়বংশের রাজা নরসিংহদেব। পুরুরী অসংখ্য মন্দির থেকেও শ্রেষ্ঠ মন্দির নির্মাণের স্বপ্ন ছিল তাঁর। বারশ' শ্রেষ্ঠ স্থাপতি নির্মাণের কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। বোল বছর ধরে নির্মিত হয়। এই মন্দিরের চূড়ার স্থাপিত আসল শিলাটি ভেঙে পড়ে বলে অনেকের ধারণা। সম্ভবত এই চূড়াটি ১৮৩৭ খৃঃ পর্বন্ত অটুট ছিল।

পুরী থেকে একটিশ মাইল দূরে চন্দ্রভাগা তীরে সূর্যমন্দির। কৈন্যারকের দক্ষিণ-পূর্বে দু' মাইল দূরে বগোপসাগর।

ব্রহ্মপুত্রাঙ্গের কৈন্যাদিত্যের নামানুসারে মন্দিরের বিগ্রহ সূর্যদেবতা কৈন্যক' নামে পরিচিত। বহু পুরান মন্দির। কর্ণাল-সংহিতাতে এই মন্দির নির্মাণের উল্লেখ আছে।

মন্দিরটির বহু অলঙ্কৃত অংশ, সুন্দরতম শিল্পসম্ভার ছড়িয়ে আছে চারদিকে। মন্দিরের চূড়ার অংশ এবং উপরিভাগে এগুলি। ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের এক গৌরবময় যুগের পরিচয়ক এগুলি। কিংবদন্তী, এই মন্দিরের চূড়ায় ছিল চুম্বকপাথর। সমুদ্রে চলমান জাহাজকে টেনে নিয়ে আসত তীরে এই প্রস্তরচুম্বক। মুসলমানদের একটি জাহাজকে এইভাবে টেনে আনা হয়। তারা মন্দিরটি ধ্বংস করে। পুরোহিতরা গালিয়ে যান পুরীতে।

মন্দিরটি নির্মাণের পরিকল্পনায় ছিল অভিনব। সপ্তাশ্বত্থ রথের আকারে নির্মিত। চাক্ষুশি সূর্যলঙ্কৃত চাকা আছে রথে। সূর্যদেবের বিভিন্ন ধরনের কয়েকটি মূর্তি আছে। মন্দিরের গায়ের কাজে শিল্পীর কল্পনা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। নগ্ননারীগনী, অর্ধনারীশ্বর, দেবতা, দৈত্য, পশুপাখীর অসংখ্য মূর্তি, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী মন্দিরের শিল্পরূপে পেরেছে। কয়েকটি মৈথুন মূর্তিও আছে। মূর্তিগুলির গঠনসৌন্দর্য এবং প্রকাশভঙ্গি

অনির্বচনীয়। নটমন্দিরের শিল্পরূপটি অনিনীয়।

মধ্য ভারত II

খাজুরাহো একটি পূণ্য ভীষণস্থান। দশম একাদশ শতকে যে মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল, তার সবগুলি এখন দেখতে পাওয়া যাবে না। বিশেষ করে যখন চালুদেব রাজাদের আমলে সংস্কৃতিচর্চার পীঠস্থান হয়ে ওঠে খাজুরাহো, তখন অনেকগুলি সুঅলঙ্কৃত মন্দির নির্মিত হয়। কাণ্ডারীয় মহাদেবের মন্দির, আদিনাথের মন্দির, দেবী জগদম্বার মন্দির, পার্শ্বনাথের মন্দির, লক্ষণের মন্দির, দুল্লাদেবের মন্দির খাজুরাহোকে শিল্প-সমৃদ্ধ করেছে।

কাণ্ডারীয় মহাদেবের মন্দিরটি ৯৫৪ খৃঃ নির্মিত। একশত এক ফুট নয় ইঞ্চি উঁচু মন্দিরটি দাঁড়িয়ে আছে মহামাহিমময় রূপ নিয়ে। মন্দিরটি একশত দুই ফুট তিন

নিবন্ধের আলোকচিত্রগুলি

শ্রীহারি গণগোপাধ্যায় কর্তৃক গৃহীত

ইঞ্চি লম্বা এবং ছেঁচটি ফুট দশ ইঞ্চি চওড়া। অনবদ্য অলঙ্করণ রয়েছে মন্দিরটির ভিতরে ও বাইরে। জৈনদের আদিনাথের মন্দিরটি খাজুরাহো শিল্পকৃতির স্মরণযোগ্য চিহ্ন। মূর্তিসম্ভার অতুলনীয়।

দক্ষিণ ভারত II

দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলি সংখ্যায় যেমন অগণিত, শিল্পকর্মেও তেমনি বৈচিত্র্যময়। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা মন্দিরগুলিতে স্থানীয় শিল্পীর চিন্তাভাবনার রূপটি স্পষ্ট। তাম্রোলের বৃহদীশ্বরের মন্দির, তিরুচুরাপল্লী শ্রীরামের রণনাথের মন্দির, রকফোর্ট মন্দির; কন্যাকুমারীর মন্দির, ত্রিবেন্দ্রামের পদ্মনাভের মন্দির; মাদুরার মীনাক্ষী মন্দির, রামেশ্বরমের রামলিঙ্গেশ্বরমের মন্দির; বিশাখাপত্তনের সীমাচলমের মন্দির; মাদ্রাজের পার্শ্বসারথির মন্দির; কাণ্ডীপুরমের একাম্বরনাথের মন্দির; বৈকুণ্ঠ পেরুমলের মন্দির; মহাবলীপুরমের ধর্মরাজের মন্দির;

চিদম্বরমের নটরাজের মন্দির; তিরুপুর্বার বালাজীভেঙ্কটেশের মন্দিরগুলিই হোল সব থেকে বৈশিষ্ট্যময়। এই সমস্ত মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ, বহির্ভাগ এবং গোপদূরম দীর্ঘকাল হাকত গুণ্যাধী ও শিল্পরসিককে বিম্বরাবিষ্ট করে রেখেছে। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলির ধারে ধারে যে গোপদূরম নির্মিত হয়েছিল, সেগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নৃপতি নির্মাণ করেন। প্রতি-যোগিতার ফলে কখনও কখনও মন্দির থেকেও গোপদূরম আকারে বৃহৎ রূপ নিয়েছে।

তাম্রোলের বৃহদীশ্বরের মন্দির দেখলেই মনে হবে যেন একটি দুর্গ। দ্রাবিড় স্থাপত্য-কলার নিদর্শনময় বিরাট উঁচু মন্দিরটির ভিত্তি হোল বিরাশি স্কেলার ফুট। একশ নব্বই ফুট উঁচু মন্দিরচূড়ায় আছে বারটি ভল। চূড়ার গম্বুজটি অগুর্বা। সর্বোপে নানান দেবদেবীর মূর্তি খোদিত। লতাপাতা ফুল সব মিলিয়ে শিল্পজ্ঞানের এক সুন্দরতম বিকাশ ঘটেছে।

রাজরাজেশ্বর মন্দির নামেও এটি পরিচিত। মন্দিরের প্রবেশদ্বারেই একটি সুঅলঙ্কৃত গোপদূরম। এর গায়ে খোদিত আছে বিকুমুতি। মন্দির এবং গোপদূরম দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য মন্দির থেকে স্বতন্ত্র গোত্রের। মন্দিরনির্মাণের বেশ কয়েক শত বৎসর পরে গোপদূরম নির্মিত হয়েছিল। অনবদ্য এর শিল্পসম্ভার। এবং জাম্ভব' সূক্ষ্ম শিল্পকাজে, রূপময়।

চোল রাজা রাজাদেব দশম শতাব্দীর শেষভাগে এই মন্দিরটি নির্মাণ শুরু করেন। ১০১২ খৃঃ মন্দির নির্মাণ শেষ হয়। তিনি বহু মূল্যবান সম্পদ মন্দিরে দান করেন।

এখানকার শিবলিঙ্গটি ভের কুটের থেকেও বেশী উঁচু-ইনিই বৃহদীশ্বর-রাজরাজেশ্বর। একটি উঁচু মন্দির ওপর আছে বোল ফুট লম্বা, সাত ফুট চওড়া আর দশ ফুট উঁচু নন্দীর মূর্তি। এই মন্দিরটি এক সময় ছিল ফরাসীদের বারুদের গুদাম। ইংরেজরা করেছিল সৈন্যশিবির।

প্রাচীনকালে মাদুরার হিন্দু রাজারা অনেকগুলি মন্দির নির্মাণ করেন। ১৩১৯ খৃঃ মালিক কাফুর মাদুরা অধিকার করার পর দ্রাবিড় স্থাপত্যশিল্প বিনষ্ট হয়। ১৩৩৬ খৃঃ মাদুরার আবদুল হিন্দুরাজা স্থাপিত হয়। দক্ষিণ ভারতের বিশ্বস্ত মন্দিরগুলি সংস্কার করেন ক্ষিতীর হরিহর।

মাদুরার মীনাক্ষী মন্দিরের সর্বোপে ঘটেছে দ্রাবিড় স্থাপত্যশিল্পের ঐশ্বর্যময় বিকাশ। মীনাক্ষী মন্দিরের বিগ্রহ শিবের। নাম সুন্দরেশ্বর আর দেবী পার্বতী হলেন মীনাক্ষী। বিরাট পাঁচিল দিয়ে বেঁধা মন্দিরের চারটি প্রবেশদ্বারে ১৫০ ফুট উঁচু গোপদূরম। এগুলি দ্রাবিড় শিল্পপরাতিতে অলঙ্কৃত। এই মন্দিরে আরো ছয়টি ছোট ছোট গোপদূরম আছে। অন্যান্য দেবদেবীরও সাতটি মন্দির আছে এবং গোপদূরমে খোদিত আছে মহাদেব-পার্বতীর কাহিনী।



সমালোচকের লড়াই

বাঙলা বা ভারতীয় ছবি গত কয়েক বছরের মধ্যে অনেকখানি প্রগতিশীল হয়েছে। একথা কটর নৈরাশ্যবাদী ছাড়া প্রায় সকলেই কমবেশী পরিমাণে মেনে নেন। তবে এখানে কিন্তু চলচ্চিত্রের সমগ্র শিল্পটির কোন সার্বিক শ্রীবৃদ্ধির কথা ভাঙাংগীর মত অনুমান করে নিলে ভুল হবে। সত্যি কথাটা হল এই যে, সাম্প্রতিক কালে আমাদের দেশীয় চিত্রশিল্পে এমন কয়েকটি নতুন শক্তিমূলক চিত্রশিল্পের আবির্ভাব ঘটেছে যারা তাঁদের নিজস্ব শিল্পভাবনা ও সৌকর্য দিয়ে আজকের দিনের চলচ্চিত্রশিল্পীদের শিল্পমানসের ওপর একটা স্পষ্ট ও ভাবগভীর প্রভাব বিস্তার করেছেন। এখানে আমি কিন্তু বিশেষ করে বাঙলা দেশের এমন ক'জন নতুন চিত্রশিল্পীদের কথাই উল্লেখ করছি যারা তাঁদের আধুনিক চিত্রচিন্তা ও শিল্পবোধ দিয়ে বাঙলা ছবিকে দিয়েছেন ও দিচ্ছেন একটা নতুন রকমের লাভগা, মর্যাদা ও দীপ্তি, একটা পরিচ্ছন্ন কল্পনাশুদ্ধতা, এবং নিশ্চয় কিছুটা পরিমাণে (কমবেশী) বাকি চলচ্চিত্র-দুনিয়ার আধুনিক ভাবধারার সঙ্গে সহ-ধর্মিতা ও সহমর্মিতা বজায় রেখে একটা উন্নত রুচি এবং শাস্ত্রমূলক শিল্পসৃজনী কলা-নৈপুণ্যের তত্ত্বাস।

এই কয়েকটি কমতায়র চিত্রশিল্পীদের একান্ত ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী ও শিল্প-সৃষ্টির রসগত তুলনামূলক বিশ্লেষণ আমার



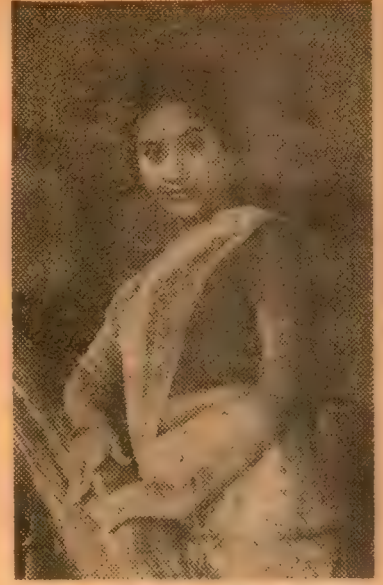
পদ্মাবতী জয়দেব চিত্রে সন্ধ্যা

এই নিবন্ধের বক্তব্যের বহির্ভূত। সেই কারণেই এইসব নবীন চিত্রপ্রতিভাধরদের নামোল্লেখ ও আলোচনা থেকে নিজেকে এখানে নিবৃত্ত রাখছি। আমার লক্ষ্য হচ্ছে সুদীর্ঘ চিত্রদর্শক সমাজের নিকট এইটুকু চিন্তা করতে অনুরোধ করা : এই নবীন যুগের নবীন চিত্রশিল্পীরা কি দর্শকদের ধ্যান-ধারণায় সমগ্র চিত্রশিল্পটিকে তার পুরাতন গম্ভীর থেকে, অর্ধশতাব্দী ধরে গড়ে ওঠা চিত্রশিল্প থেকে মুক্ত করতে পেরেছেন—তাঁদের এই সুস্পষ্ট প্রত্যাবর্তনের সাহায্যে? না কি তারা শুধু একটা স্বকীয় শিল্পমান রচনা করেছেন মাত্র, যেটার পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র শিল্পটিরই একটা উন্নত, বিশিষ্ট ও নবীন শিল্পাভিজাত্যের কীর্তিরচনা অনুমান করা অত্যাশ্চর্য হবে?

আমার নিজের ধারণা—এই কটি মূর্তিময় নবীন ছায়াচিত্রধর্মীর 'শিল্পকর্ম' দেখে সমগ্র শিল্পের একটা উন্নত মানমর্যাদা ও শিল্পসৃষ্টি পারগম্যতা অনুমান করে নেওয়া বাস্তবোচিত হবে না। একটা 'সোয়ালো' পাখী দেখেই গ্রীষ্ম এসে গেছে

নির্মলকুমার ঘোষ (এন-কে-জি)

ধরে নিলে যেমন ভুল করা হবে, তেমন ভুল হবে কয়েকটি ব্যতিক্রমস্বরূপ চিত্রকারদের অনুমান করে নেওয়া নতুন যুগধর্মী শিল্প-সৌন্দর্যের প্রতিনিধিস্বরূপ। যদিও একথাও স্বীকার করতে হবে যে তাঁরাও একেবারে খাঁটি ব্যতিক্রম নন। তাঁদের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা ঘটেছে এ যুগের উন্নততর শিল্পা-কাঙ্ক্ষার আগুন তাগিদে। নতুন যুগের তত্ত্ব-গামী শিল্পপরসের যে সৃজনব্যাকুলতা আমাদের চিত্রজগতের অর্ধশতাব্দীর গভান্দ-গতিকতার সঞ্চিত পলিমাটির ওপর ভাব-প্লাবনের তীর মনোবিস্ময় সৃষ্টি করেছে এ'রা তারই বাণীবহ তত্ত্বদাতা। এঁদের মধ্যে বিপুল প্রতিভাধররূপে কেউ আবির্ভূত কিনা জানি না। কিন্তু একথা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করি যে, এ'রা এসেছেন আগামীদিনের শিল্পদেবতার আকর্ষণীয় প্রাণস্পন্দন পেঁচে দেবার মহৎ বাতী নিয়ে। এঁদের সর্ব অঙ্গো, সর্ব মানসে ও চেতনায় আছে সেই অনাগত শিল্পদেবতার প্রথম শিহরন। এ'রা আগামী সূর্যের উদয়াচলের কনকরশ্মি নিশ্চয়। সে হিসাবে এ'রা অবশ্যই নমস্য এবং আমাদের চিঠমান নির্ধারণের ক্ষেত্রে এঁদের একটা সুনির্দিষ্ট সম্মান আসন থাকবেই। যদিও আমার সন্দেহ আছে যে, এ'রা বিগত যুগের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর চিত্রশিল্পীদের পরিণত আবর্তনের ফলপ্রসূতিরূপে নিজদের স্বীকার করেন কিনা।



আরোগ্য নিকেতন চিত্রে সন্ধ্যা রায়

সাধারণ চিত্রদর্শক একথা অনুভব করবার সময় বা সুযোগ আজো পান নি হয়তো, কিন্তু চিত্রসমালোচককুল নিঃসন্দেহে অনুভব করেছেন একটা সত্য। এই কটি নবীন যুগের মহত্তর চিত্রশিল্পের বাতীবিহ অগ্রদূতরা প্রায় বেন হাতে করে সবার মতোই নিয়ে এসেছেন আর এক শ্রেণীর চিত্রচিন্তা-ধারক ও বাহকদের। তাঁরা হচ্ছেন মোটামুটি এই দশকটিরই নবতর চিত্রবাণীরূপে ফিল্ম-সোসাইটিগুলি দ্বারা আজকে বন্য়ার জলের দীপ্ত উজ্জ্বল মতো আছড়ে পড়েছেন বাঙলাদেশের শহরে, গ্রামে, পল্লীতে-পল্লীতে, এমন কি অলিগলিতেও প্রায়। এইসব ফিল্ম-সোসাইটিদের আগমনের পর থেকে দু-একটা ব্যাপার স্পষ্ট লক্ষ্য করা যাচ্ছে—যা বাইরের দল-নিরপেক্ষ দর্শকসমাজকে দিচ্ছে বেশ একটা মজার খোরাক। এ'রা সম্ভ্রম ঘোষণা করছেন—এ'রাই আগামীযুগের মহত্তর চিত্রশিল্পের ও সংস্কৃতির উত্তরীর পরিধানকারী। এ'রা আগামীদিনের চিত্রপ্রতিভাধরদের আগমন-স্বাগতই শুধু নন, এ'রাই সেই উন্নতমানের শিল্পপরসের একমাত্র যোগ্য কলারসিক, উপলব্ধিশীল চিন্তানায়ক, যারা পরিবেশন করবেন সেই নতুন রসের বাতী, দেশবাসীকে দেবেন চিত্ররসধর্মতার নতুন প্রাণবন্ধ্যা, লেবেন নবীন দিকচক্রবালের বিচিত্র আলোকরশ্মি। কি করে তা দেবেন তাঁরা? দেবেন তাঁদের আয়োজিত ফিল্ম সোসাইটির উন্নত চিত্র-প্রদর্শনের সাহায্যে, এবং সেইসব প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্তি বৃত্তাচক্রে। সে চক্রে অমূল্য চিত্রবাণী দেবেন তাঁরা, অর্থাৎ এইসব সোসাইটির নামকসভারা, এবং তাদের গুরুদ-স্থানীয় ঐ কটি নবীন চিত্রশিল্পীরা। তাঁরা নাকি নবীন উৎসাহে প্রমাণ করতে লেগে গেছেন কয়েকটি মূল্যবান তত্ত্ব ও তথ্য। এক, এই professional সমালোচকরা দেশের চিত্রশিল্পের সর্বনাশ করছেন কতক-গুলো 'অপদার্থ' বাঙলা, ইংরেজি ও হিন্দী ছবির অসার প্রশস্তিমূলক সমা-লোচনা করে। দুই, এসব নবীন চিত্রশিল্পীদের ব্যক্তিগত জয়গান না করে, তাঁদের যুগের

১৯৬৭-র

শারদীয়
অমৃত
১৩৭৪সৌম্য-নাথ
সবলতা-সিদ্দান্ত
**অজানা
মপথ**
পরিচালনা-সালিল জৈন
সঙ্গীত-হেমন্তদিলীপ কুমার
অ্যাথিনা রতন
সাদমী
ইন্ডিয়ান ফিল্ম
পরিচালনা-এ.ভি.সি. সিং
সঙ্গীত-মি.শাহাদশ্রীকৃষ্ণ কামাধারিয়ার
দাদু
পরিচালনা
অজিত গাঙ্গুলীগোলাপজীর
**মঞ্জরী
অপেরা**
বাথলা ও বোম্বাই এর
শিল্পীদ্বন্দ্বঅমিতাভ জৈন
**আদ্যাশক্তি
মহামায়া**
পরিচালনা-পার্বতী রায় চৌধুরী
সঙ্গীত-সত্যেন্দ্র মুখার্জীশ্রী রঞ্জিত পিকচার্স
৮৭, ধর্মতলা ব্রিটিশ কলিকাতা-৩০

সুলভ মনোভাবের দর্শন। তিন, (ষেটা বোধ-কার তদুক্ত) এই সমালোচকরা দু'ঘণ্টার মত যে উচ্চাধিকারের আসনগুলি দখল করে আছেন সেই জায়গা থেকে নিজেদের সঙ্গিয়ে নিয়ে সে জায়গায় নবীন প্রতিভাধর amateur সমালোচকদের সম্মানে না প্রতিষ্ঠিত করে। কেননা, তাঁরা তো নিজেরা বাতিল হয়েই গেছেন, কেন তবে যোগ্যতর নবীন যুগের নবীন চিত্রদর্শকের হাতে তাঁদের পতাকা তুলে দিয়ে সময়ে অবসর নেবেন না। দেখা যাক, বিপরীত দিক থেকে সমালোচক-কুল এঁদের, অর্থাৎ এই নবীন যুগের চিত্র-বার্তাবহরূপ ফিল্ম সোসাইটির এই মনোভাব সম্বন্ধে করুণ প্রতিক্রিয়া পোষণ করেন।

আমরা মনে হয়, এই তথাকথিত প্রোফেশনাল ক্রিটিক্ এবং ফিল্ম সোসাইটির সভাপতিলাভুক্ত 'এমচার' ক্রিটিকদের মধ্যে অকারণ এমন একটা অনিভপ্রত সম্পর্ক গড়ে উঠছে যেটা যেমন তদাবশ্যক তেমনই আমাদের চিত্রশিল্পের পক্ষে ক্ষতিকর। বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সমালোচকরা বলেন—এই সব armchair critic দের ভূঁইফোড় উদ্ভব হয়েছে বাঙের ছাতার মতো গজানো, এই সব



পরিচালনা চিত্র সুলতা চৌধুরী

ফিল্ম সোসাইটির প্রাকোর্থে, এবং এ কটি নবীন ক্রিটিকদের প্রশান্তি গাইতে। এবং সোসাইটিতে প্রদর্শিত একটি ছবি তাঁরা দেখবার সুযোগ পান তারই মাধ্যমে এসব ছবির স্রষ্টাদের সম্বন্ধে বিদেশী কাগজে মুদ্রিত বা তাঁদের hand-out থেকে সংকলিত প্রশান্তিবাদগুলোকে নিজেদের মতন করে পুনরুদ্ভূত করেন। যার ভেতর দিয়ে এই সব ক্ষুদ্রে সমালোচকরা জাহির করতে চান নিজেদের উচ্চাঙ্গের রসবোধ।

আরো একটা জিনিস এঁদের সম্বন্ধে সমালোচকবুল বলেন। এই amateur ক্রিটিকদের উচ্চাঙ্গের মননশীলতার একমাত্র ছাড়পত্র হলো ফিল্ম সোসাইটির সভ্যের টিকেট। একমাত্র উদ্দেশ্য হলো uncensored, unexpurgated বিদেশী ছবির যৌন-উত্তেজনামূলক দৃশ্যগুলি নির্ভেজাল দেখে একটা তরু, সূক্ষ্ম যৌনরোধকরণজনিত নিকৃষ্ট সুখবোধ যে কারণে ফিল্ম সোসাইটির সভ্য হবার জন্য আজ নির্লজ্জ

মারামারি চলছে যুবকসমাজে) এবং এই ছাড়-পত্রের বিবিধ বিশেষ সুবিধাগুলি ভোগ করা। প্রত্যেক শিল্পপথের উপলব্ধিবিদ্যা আয়ত্ত করতে গেলে প্রয়োজন যেসব বিদ্যা-নুশীলন ও অধ্যয়ন তার কোন প্রস্তুতি বা চর্চাই নাকি এঁদের নেই। এঁরা নাকি ঝোড়ো হাওয়ার খড়কুটোর মত। এবং লক্ষ্য করলে নাকি আরো দেখা যাবে—যতোগুলি ফিল্ম সোসাইটি ভাঙ্গ গড়ে উঠেছে তার প্রত্যেকটাই কয়েকটি নির্দিষ্ট বিদেশী কনসাল্টে বা Trade Representation -এর অনুকূল্যে তাঁদের দেশের থেকে আমদানী একই সংখ্যক কতকগুলি নির্দিষ্ট ছবি নিয়ে একের পর এক দেখানো একটা হাস্যকর প্রতিযোগিতা-সূচক মনোভাব নিয়ে। এবং এঁদের উদ্দেশ্য নাকি এই সস্তা আচরণবৃত্তির সাহায্যে নিজেদের চিত্রচিন্তারাজ্যের এক একটা দিক-পালরূপে প্রতিপন্ন করা।

দু'পক্ষের মনোভাবে ও আচরণেই হয়তো কিছুটা যুগ ও কিছুটা আতিশয্যাদোষ আছে। Film Society movement ও আজকের দিনের উন্নততর বিশ্বকলচ্চিত্র-চিন্তাধারার একটা প্রকৃষ্ট বাহক ও ধারক।। আন্তর্জাতিক চিত্রজগতে তাদেরও একটা বিশিষ্ট স্থান ভাজ স্বীকৃত। এবং দু'পক্ষের কথা যে এই বিদেশী ফিল্ম সোসাইটির কর্ণধারারও চিত্রসমালোচকদের বিশিষ্ট ও সম্মানিত দান চিত্রশিল্পের নৌকরসাধনের ক্ষেত্রে নির্বাহ্য স্বীকার করে নেন। আমাদের দেশেই কেন যে উভয় দলে এই অস্বাস্থ্যকর পরস্পর-আগ্রাসী মনোভাব, কেনই বা আমরা বুঝছি না যে এতে ক'রে আমাদের শিল্পকে বর্ধিত করা হচ্ছে অনেকখানি সম্ভাব্য সুন্দরতর শিল্পরসসাধনা থেকে, এবং কেনই বা এ কটি পূর্বোক্ত নবীন চিত্রকররা এই সোসাইটিগুলিকে ঢাকের কাঠির মত নিজেদের কাজে লাগাবার খেলো মনোবৃত্তি দেখাচ্ছেন, এই চিন্তাবোধগুলি আজ আমাদের আসা উচিত। ম্যাথু আর্নল্ড বলে-ছিলেন—অবশ্য সাহিত্যিকলার ব্যাপারে—যে শিল্পক্ষেত্রে দেখা যায় একটা সৃষ্টি-সৌন্দর্যের বৃদ্ধি আসে নিছক কলারসম্প্রদায়ের আবির্ভাবের ও প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। এবং তার আগের যুগে নিঃসংশয়ে এসে থাকেন এঁদেরই আবির্ভাবের ক্ষেত্রচনা করতে, প্রসূতিরই মতো, পূর্বসূরী কলা-সমালোচক, যারা মহৎ সৃষ্টির প্রসববেদনাকে সম্ভব করে থাকেন!

আমাদের দেশের সর্বক্ষেত্রেই যেমন, চিত্রশিল্প-সমালোচনার ক্ষেত্রেও তেমনি দেখছি বহু দুঃখকর, জ্ঞানিকর বিবাদ-বিতর্ক, যার মূল উদ্দেশ্য মনে হয় না আমাদের চিত্রশিল্পের ক্রমোন্নতি। মনে হয় তার একমাত্র উদ্দেশ্য অপরকে ধিক্কার-বাদের মাধ্যমে আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জন। অথচ এই দু'টি পরম সম্ভাবনাময় শিল্পরসাধ-কারীর দল কতোখানি লাভ্য দান করতে পারেন আপন চিত্রশিল্পকে, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা দিয়ে, সেই কথা ভেবে প্রচুর বেদনা বোধ করি।

“সায়গল”—নামটা শুনলেই নিউ থিয়েটারে যাবার আগেই। ও’র গল্প আরো কত রেকর্ড করতেন মুখ হয়ে শুনিয়ে আর ও’র চেহারা সর্বশেষ বিরাট একটা হোমড়া-চোমড়া গোছের ছবি মনে মনে ঐক্য রেখেছি। তখন সবে নিউ থিয়েটারে বোগ দিয়েছি।

একদিন নিউ থিয়েটারের অফিসরুমে বসে সবাই মিলে কি যেন একটা কাজের কথাই আলোচনা করছিলাম। হঠাৎ এক ভদ্রলোকের প্রবেশ। একটু বেন এলোমেলো, মাথার চুল-গুলোও ভাল করে আঁচড়ানো নেই। আধ-ময়লা ধূতি-পাঞ্জাবী একমুখ পান। অসাধারণ শূন্য ছোট চোখদুটির উজ্জ্বলতা। ২৪ মিনিটের জন্য এসে ওঁদের সঙ্গে কি যেন বলে চলে গেলেন। প্রস্থানোদ্যতর দিকে চেয়ে একজন সন্মোহে মস্তব্য করলেন “পাগলা”।

“কে উনি?”—আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“সে কি! সায়গলকে চেনেন না? শোনো। শোনো সায়গল একবার এসো এদিকে”, সায়গলকে ডেকে স্টুডিও ম্যানেজার পি এন রায় আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। “হা, হা, আমি ও’কে খুব জানি, গান ভি শুনিয়ে কোতো”—হাসিমুখে দুহাত তুলে নমস্কার করে ভাঙাভাঙা বাংলায় বললেন সায়গল। অতবড় গুলী এত নামডাক। কিন্তু এমন সহজ সরল, এত সাধারণ। ভাব-



‘সাথী’ চিত্রে কানন দেবী ও সায়গল

কে এল সায়গল

কানন দেবী

তেই পারিনি। প্রতিভার ধর্মই বোধহয় সরলতা। সায়গলকে এবং আরো কয়েকজন প্রতিভাশালী শিল্পীকে দেখে এ সত্য বারবার অনুভব করছি। “আবার দেখা হবে” বলে ব্যস্তবাগীশভাবে চলে গেলেন।

...এর কিছুদিন বাদেই “সাথী” ছবিতে ও’র সঙ্গে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল। তখন শিল্পী সায়গল ছাড়াও দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ মানুষটির যে পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল তার দামও কম নয়। তখন ত ভার্যিনি আমার এ অভিজ্ঞতা কেনোদিন কলমে কলমে বন্দী করার প্রয়োজন হবে। তাই ঠিক স্টাডি করার মত করে ও’কে দেখিনি। লেখবার উপকরণ সংগ্রহ করার মত করে ও’র চালচলন, আচার ব্যবহারকে বিচারও করিনি। তাছাড়া তখনকার যুগ ঠিক আজকের মত মেলামেশা, দেখাশোনা, গল্প-গুজবের পথ বেরে পরস্পরকে জানবার, বোঝ-বার অনুকূল ছিল না। সে ছিল দৃঢ়নিবন্ধ নিয়মে বাধা কাঠিন্য কমজীবন। ডিরেক্টররা কড়া মাস্টারমশায়ের মত কাজ আদায় করে নিতেন। এতটুকু এদিক-ওদিক হবার উপায় ছিল না। কোনো সাথীশিল্পী বা সহকর্মীর ব্যক্তিগত আকর্ষণকে রাসাপভোগের মত আশ্বাদন করা, অথবা তাই নিয়ে কোনো গভীর ফিলসফির সরস পালাগান রচনা করা কোনোটারই অবকাশ ছিল না। তখনকার

চিন্তাধারাও ছিল স্বতন্ত্র। চিত্রশিল্পীদের আজকের মত চেখে কেউ দেখতেন না। তাঁদের ভাবনা, কল্পনা, জীবনধারা নিয়ে কোনো সাংবাদিক অতশত মাথাও ঘামাতেন না। তখন স্টুডিও গেছি, কাজ করছি ছুটি মিললে চলে এসেছি। সন্টিং না থাকলেও স্টুডিওতে নিয়মিত ১০টা, ৫টা হাজিরা দিয়ে লেভিভরমে বসে থাকতে হতো। একটু এদিকওদিক বেড়ালে বা কোনো পুরুষ শিল্পীর সঙ্গে কথা বললে কড়পকের রক্তচক্র হুমকী ত ছিলই। উপরন্তু একটা সামান্য ঘটনার বেদনাদায়ক স্মৃতি এখনও মল থেকে মোছিনি। একবার সেট বদ-লাবার সময় ৫ মিনিটের জন্য বাইরে গেছি। তখন মাত্রই ডিরেক্টরের কৈফিয়ৎ তলব, “কোথা গিয়েছিলে?” একটু বাইরে গেছি স্যার, সেটেও ত কাজ হচ্ছিল না তাই।” ভয়ে ভয়ে বলি। “দু’মিনিটের জন্য গেলেও বলে যাবো?”—মাথা নীচু করে সে কথ’ও মনে নিতে হয়েছে। “ডিসাপ্লিন” নিশ্চয় ছিল। কিন্তু সেই উপলক্ষ্যে কতাদের ধম-কের বাড়াবাড়িটাও কম ছিল না। তবু তারই মধ্যে একফালি মুখ আকাশের মত সায়গলের প্রাণখোলা, আনন্দময় আচরণ দরদর সহ-যোগিতা, গানপাগল আনমনা স্বভাব অজানতে মনকে আনিবচর্চার সরসতার ভরিয়ে তুলেছে বৈকি! নইলে এতবছরের

ব্যবধানেও ও’র কথা স্মৃতিস্নেহে এমন অন-পনয় হয়ে রইল কেমন করে?

“সাথী” ছবিতে প্রথম একসঙ্গে কাজ করি। তারপর “পরিচয়”—তে। তখনই খুব কাছে থেকে সায়গলকে দেখলাম। নিশ্চয় অনবকাশের মাঝে সায়গল ছিলেন বেন এক-বলক মুক্ত হাওয়া। এমন একটা নিশ্চিত-ভাব আর আনন্দ সঙ্গে নিয়ে ফিরতেন ও’কে দেখলেই সেটের সকলের মনটা যেন খুশিতে বলমল করে উঠত। কতদিন এমন হয়েছে ‘সেট’ তৈরী। ও’রই একটা ‘শট’ নেবার কথা। কিন্তু সময় চলে যায়। সায়গলের দেখাই নেই। প্রথমে ‘এই এলো এই এলো’ ভাব, তারপর উদ্বেগ—শেষে বিরক্ত হয়ে যখন pack-up করার উপক্রম হচ্ছে কঁড়ের মত ছুটতে ছুটে সায়গল এসে হাজির। সকলের ক্রোধ, বিরক্তি গালাগালি বেখালুয় হুজুম করে এর ওর গিট চাপড়ে দিয়ে “নেনা ভাই, নেনা ভাই। এই ত হয়ে গেল। রাগ কর-হিস্ কেন লক্ষ্মীটি। নো’সিগ্রেট খা।” বলেই হস্ত ক্যামেরাম্যানের মুখে সিগ্রেট গুঁজে দিয়ে দেশলাই জ্বালিয়ে ধরিয়ে দেবার উপ-ক্রম করলেন। অমনই সবাই জল হয়ে গেল। ডিরেক্টরের ক্রুদ্ধিত শ্রু শরল হয়ে এল। রাগ করতে গিয়েও হেসে। কেলে সেটের কম্বীরা। এমনি ব্যাপারের বহু পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। কিন্তু প্রতিবারই কত থেকে সরু করে ক্ষুদ্রতম কম্বী অবধি সবাই বেন নতুন করে উপলক্ষ্য করেছেন—সায়গলের ওপর রাগ করা যায় না। কারণ, বোড়ো হাওয়ার মত মনের সকল গ্লানিকে নিম্নে উড়িয়ে দেবার বাদুম্পা ও’র হাতের মৃদোর মাথা।

.....একসঙ্গে কাজ করতে গিয়ে ও’র কাছে যে কো-অপারেশন পেরেছি তা এখনও

মধুর স্মৃতির মত মনের অন্তরে সঞ্চিত রয়েছে।

আমি তখন কত ছোট, শূন্য বয়সে নয়। যোগ্যতাতেও। বিশেষ "সাথী"র মত সংগীতপ্রধান ছবিতে সায়গলের মত অতবড় গায়কের বিপরীতে 'গাইয়ে' মেয়ের ভূমিকায় অ'ভিনয় করা সহজ নয়। ভরে কাঁটা হয়ে থাকতাম। সে 'ভর' যে ভরসার আলোয় হেসে উঠত সে-ও ঐ সায়গলের সব-উড়িয়ে দেবার সহজতায়। রিহাসালের সময় "দেবী। ভয় কিসের? আপনি গান ত?" গান সুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই ঘনঘন "বাহালা"র মণ্ডিতে সায়গলের দীপ্ত দুইচোখে যে আলো

ঘরলে উঠত তাতে খেন নিজেকে নতুন করে দেখতে পেতাম। অনুভব করতাম সত্যিই ভয়ের কিছুই নেই। এই আশ্বস্তায় তখন শক্তিতে আস্থা রাখবার শক্তি—জাগিয়ে দিতেন স্বয়ং সায়গল। তাঁর কাছে এ ঋণ আমি হারিতমহুতোই স্বীকার করছি। শূন্য তখনই নয় এখনও। এ ঋণ স্বীকারের সুযোগ পেয়ে আমি ধন্য। জীবনে আমাদের কত পাওয়ারই না ব্যর্থ হয়ে যায় তারজন্য জীবনদেবতার কাছে ঋণ-স্বীকার করতে পারি না বলে।

তখন নায়িকা-প্রধান যুগ নয়—ওপর-ওলাদের ডিক্টেটরশিপের যুগ। চুটি ধর-বার জন্য কতৃপক্ষ আ'নদৃষ্টিতে তাকিয়ে



অজানা শব্দ চিত্রে সোমেন চক্রবর্তী ও মাধবী মৃথোপাধ্যায়

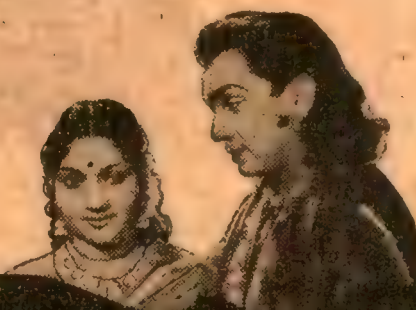
আছেন। সে যুগে স্নেহসিন্ধু সহযোগিতার এমন উদার দাক্ষিণ্য মনকে অভিভূত না করে পারত না। কত পুঞ্জীভূত বেদনার মেঘেই ত বিদ্যুতের আলো অমন উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে ওঠে। সেই অকুণ্ণ অনুদারতার কাঠিন্যের পটভূমিকায় সায়গলের উপারতা খেন ঐ বিদ্যুতের মতই আপন স্বরূপে বলকে উঠত।

একটা কথা মনে পড়ে সায়গলের অমারি-কতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ। তখনকার কালে মিউজিক টেকের সময় এখনকার মত প্রত্যেকটি শিল্পীর সামনে একটা করে মাইক থাকত না। একটা মাইকেই সবাইকে গাইতে হতো, সে বৈষতসংগীতই হোক আর সম-বৈতই হোক। সবারই চেষ্টা থাকত মাইকের প্রধান অংশটা খেন তার ভাগে পড়ে! কিন্তু সায়গল বিনামিষধার বারবার আমার মূখের সামনে মাইক এনে বসিয়ে দিয়েছেন। এমন কি দুজনে একসঙ্গে গাইবার সময়ও। আমি কত লজ্জা পেরোছি, সপেক্ষবোধ করছি—“না, না পে কি”—কোই ব্যত নেই, আপনি গেয়ে চলুন। নোব ঠিক হয়ে বাবে।” গান ভাল হলে অনেক সময় “বাঃ” বলে পিঠ চাপড়েও দিয়েছেন আত্মভোলা নির্মল মনের মানুষটি।

গাইয়ে হলেও এমন গান-পাগলা মানুষ খুব বেশী দেখেছি বলে মনে পড়ে না। একটা হার্মোনিয়ম সামনে পেলেই হোলো। সে হোক না ভালো। তাই সই। ঘন্টার পর ঘন্টা সেই হার্মোনিয়ম কোলের ওপর তুলে নিয়ে গানের পর গান গেয়ে চললেন। গানের সময়, চারপাশের পরিবেশ দোক-জন কোনো কিছু সম্বন্ধেই কোনো হুঁশ থাকত না। একেবারে আত্ম-



ডুমুরগি জয়দেবের অমৃত বাহিনী



জন-আইন বিষয় (গো.)

দমাবতী জয়দেব

পরিচালনা-চিত্রদ্রুত স্নেহাং-দেবনারায়ণ গুপ্ত
সঙ্গীত-বিজয় পাল গীত-পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
কণ্ঠ-সংগীতে :-
॥ মানা দে ॥ ধনজয় ॥ মানবোহ ॥ তবু ॥ আরতি ॥ শিখা ॥
লাইফ পিকচার্স প্রসিদ্ধি

আগবার প্রিয় চিত্রগৃহে : মুক্তি সম্বাসন !

বিস্মৃত শিল্পী বলতে সা বোঝায় তাই। কেউ না থামালে বোধহয় উনি দিনের মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই বিরামহীন গেয়ে যেতেন। কাজের সময়ও, এক কথা বলার সময় ছাড়া সবসময় আপন মনে গুন গুন করতেন। সে-সময় ওঁকে দেখলে মনে হতো উনি যেন অনেকদূরের মানুষ। আমাদের চেনামহলের কেউ নয়—এ-জগতের সঙ্গে ওঁর কোনো সম্পর্কই নেই। সকলের মধ্যে থেকেও উনি যেন সবার থেকে আলাদা। কতদিন ওঁর তন্ময়তাব দেখে অজানতেই চোখদুটো জলে ভরে উঠেছে। মনে হয়েছে “আমিও যদি অর্মানি করে গানের রাজ্যে হারিয়ে যেতে পারতাম”—কিন্তু সে ভাবনা শুধু ক্ষণিকের জন্য। পরক্ষণেই সাজ বদল করতে ছুটেতে হতো। পরের সটের জন্য। ভাবনাবিলাসের অবকাশ

একবারেই ছিল না। সে ত প্রথমেই বলেছি। তবু একটা কথা সেদিনও যেমন ভুলিনি, আজও ভুলতে পারিনি। সে-কথাটি হচ্ছে এই যে, এই খেলার ধরায় আকাশের স্বপ্ন যদি কেউ জাগাতে পারেন, সে ওঁদের মত জ্ঞাতিশিল্পীরাই—তাদের খ্যাতির পরিধি এতটুকুই হোক আর এতবড়ই হোক।

সেটে একটা ঝড়ের সিন ছিল। এলো-এলো বিগবর্ন কড়ে ‘ভুলুয়া’ বেশী সায়গলের পরচুলা কোথায় উড়ে গিয়েছে। কিন্তু ওঁর সেদিকে খেয়ালই নেই, উনি পাটাই করে যাচ্ছেন। সবাই যত ইগিত করেন ক্যামেরার বাইরে যাবার জন্য—ওঁর হৃদয়ই নেই। অবশেষে সকলের সম্মিলিত হাসিতে যখন সচেতন হলেন, তখন সবার হাসিকে ছাপিয়ে উঠেছিলো ওঁর প্রাণখোলা, দরাজ হাসি।

তারপর। একদিন শুনলাম সায়গল অসুস্থ। কথা হয়েছিল দল বেঁধে একদিন সবাই মিলে ওঁকে দেখতে যাব। সে আর হয়ে ওঠেনি। তখন যদি জানতাম আর কোনোদিন দেখা হবে না, তাহলে সব ব্যথা উপেক্ষা করে যেমন করে হোক দেখে আসতাম। হঠাৎ একদিন খবর পেলাম, সায়গল আর নেই। এতবড় নিদারুণ সংবাদের জন্য মনটা প্রস্তুত ছিল না। হরত সেই-জন্যই মনে হয়েছিল, যদি সেই দুঃসংসার আগের মত হঠাৎ হাজির হয়ে প্রাণখোলা হাসিতে এই জমাত-বাঁধা অসহনীয় বিষমতাকে এক মিনিটে উড়িয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু না, যতবড় শিল্পীই হোন, বড় মস্ত মনের মানুষই হোন—মৃত্যুর নিম্নম পরোয়ানা কাউকেই রেহাই দেয় না।

তপন সিংহের ছবি

বাঙলাদেশে বর্তমানে বে কয়জন স্বনামধন্য খ্যাতিমান চলচ্চিত্র-পরিচালক আছেন, তপন সিংহ তাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে অন্যতম। রুচিবান, কাব্যধর্মী অথচ জনপ্রিয় পরিচালকরূপে তিনি স্বীকৃত।

চলচ্চিত্র-পরিচালকরূপে রত্নী হওয়া তপন সিংহের জীবনে কোনো অচিন্তনীয় এবং আকস্মিক ঘটনা নয়। যখন তিনি স্কুলের ছাত্র, তখন থেকেই তাঁর মনে চিত্র-পরিচালক হবার বাসনা দানা বাঁধতে থাকে। তাঁর পিতার ইচ্ছা ছিল, তিনি একজন ইঞ্জিনিয়ার হন এবং সেই কারণে যখন তিনি আই.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তখন তাঁকে রাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ভর্তি করে দেওয়া হয়। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই এই পড়ার প্রতি তিনি মন বসাতে পারেননি। সেই কারণে এখানে একটি বছর নষ্ট করবার পরে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে বি.এস.সি পড়তে শুরুর করেন। এবং ১৯৪৪ সালে বি.এস.সি পাশ করবার পরের বছরেই নিউ থিয়েটার্সে সূখ্যাত শব্দযন্ত্রী বাণী দত্তের কাছে শিক্ষানবীশরূপে যোগদান করেন। এইখানে বছর-তিনেক থাকবার পরে ১৯৪৮ সালে নব-প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা মূভিটোনে যখন বাণী দত্ত অন্যতম অংশীদার ও প্রধান শব্দ-যন্ত্রীরূপে যোগদান করেন, তখন গ্রীসিংহও এই প্রতিষ্ঠানে চলে আসেন। শীঘ্রই তিনি স্বাধীন শব্দযন্ত্রীরূপে কাজ শুরুর করে দেন এবং ন্যাশনাল প্রোগ্রেন্সিভ পিকচার্সের ‘পরিবর্তন’ ও ‘বরষা’ ছবিদ্বিতিতে শব্দ-যন্ত্রীরূপে নিজের দক্ষতার পরিচয় দেন। কিন্তু শব্দযন্ত্রীরূপে রত্নী থাকলেও আসলে তাঁর মনোগত অভিপ্রায় ছিল চিত্র-পরিচালনার ক্ষেত্রে নিজেকে নিয়োজিত করার জন্যে। সেইজন্যে তিনি যখনই সুযোগ পেতেন, তখনই স্টুডিওর অভ্যন্তরে সেটে সে-শুরুর

নাম-করা পরিচালকদের কর্মপন্থাতি লক্ষ্য করতেন। শেষে তিনি মনে মনে স্থির করলেন, বিদেশে গিয়ে সেখানকার চিত্রগ্রহণ পন্থাতির সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করতে হবে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৪৯-এর শেষভাগে তিনি ইংল্যান্ড যাত্রা করেন। নিউ থিয়েটার্সের ততপূর্ব কর্মাধ্যক্ষ এবং ফিল্ম সার্ভিসেস-এর প্রতিষ্ঠাতা পরলোকগত পি.এন.রায় অধুনালুপ্ত ব্রিটিশ ডিস্ট্রিবিউটাস-এর কলিকাতা শাখার কর্মকর্তা মিঃ রিয়ার্ডেনের সহায়তায় গ্রীসিংহের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে ইংল্যান্ডের পাইনউড স্টুডিওর চিত্রগ্রহণ-পন্থাতি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করে দেন। ১৯৪৯-এর শেষভাগ থেকে ১৯৫১-র প্রথম কয়েক মাস পর্যন্ত পুরো দেড় বৎসরকাল গ্রীসিংহ এই পাইনউড স্টুডিওতে



চিত্রগ্রাহণ চিত্রে উত্তমকুমার

নিয়মিতভাবে শিক্ষানবীশীর মন নিয়ে বিভিন্ন ছবির শটটিংয়ে উপস্থিত থাকতেন। এই সময়ে ওখানে ডাক্তার বোগার্ড অভিনীত ও ‘চালিস টাইটন’ পরিচালিত ‘হি হাণ্ডেড’ এবং জেমস স্টুয়ার্ট অভিনীত ‘দ্য হাই-



নলদায়িত্বী চিত্রে দীপিকা দাস

ওয়ে' ছবি দখানি তোলা হচ্ছিল। অবসর সময়ে গ্রীসিংহ ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউটে গিয়ে পুরোনো নাম-করা ছবির স্থিরচিত্রগুলি (স্টিল) দেখতেন। শিক্ষার্থীর চোখ নিয়ে। ছবির কম্পোজিশন, অ্যাকশন, লাইটিং প্রভৃতি বিষয়ে বহু আলোকপাত করেছিল এই স্থিরচিত্রগুলি।

১৯৫১ সালের মাঝামাঝি গ্রীসিংহ কলকাতায় ফিরে আসেন এবং কোনোরকমে একটি চিত্র-পরিচালনার সুযোগ করবার জন্যে আশ্রয় চেষ্টা করতে থাকেন। শেষ-পর্যন্ত তিনি কয়েকজন শিল্পী ও কলা-কুশলীর সহায়তায় যথোপযথ্যে লিটল পিকচার্স নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এবং 'অক্লুশ' নামে একটি ছবির প্রযোজনা

ও পরিচালনা করেন। ছবিটি আদৌ ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ না করলেও ছবিটির সপক্ষে এই কথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে, ছবিটি ছিল গতানুগতিকতার উদ্ভেদ এবং এর শতকরা নব্বইভাগ ছিল বহির্দৃশ্য। ছবিটি ১৯৫৪ সালের ১৮ই মার্চ উত্তরা, পূর্ববঙ্গ এবং উজ্জ্বলা চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করে। এরপর প্রতি বছর একখানি করে এবং ১৯৫৮ ও ১৯৬৪ সালে দখানি করে সব-সময়ে পনেরোখানি ছবি তার দ্বারা পরিচালিত হয়ে মুক্তিলাভ করেছে। যে-ছবিতে প্রথম তিনি সবভারতীয় খ্যাতিলাভ করেন, সেটি হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওলা'র বাঙলা চিত্ররূপ। ছবিটি শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্ররূপে রাষ্ট্রপতির সর্বাঙ্গপদক লাভ করে এবং



তিন অধ্যায় চিত্র সূপ্রিয়া দেবী

১৯৫৭ সালে অনুষ্ঠিত বার্লিনের ৭ম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ আবহ-সঙ্গীতের জন্যে পুরস্কৃত হয়। এরপর থেকে তার পরিচালিত প্রতিটি ছবিই জনসমাদর লাভের সঙ্গে সঙ্গে গণজনের কাছ থেকেও প্রশংসালোভে সমর্থ হয়েছে। এরই মধ্যে বিশেষ করে যে-ছবিগুলি চিত্রশিল্পীদের দ্বারা সংবর্ধিত হয়েছে, 'সেগুনি হচ্ছে : লৌহকপাট, ক্ষণিকের অতিথি, ক্ষণিকত পাষণ, নিজর্ন সৈকতে, আরোহী এবং অতিথি। রবীন্দ্র-কাহিনী 'অতিথি'র চিত্র-রূপ দিতে গিয়ে গ্রীসিংহ তার কবিতা ও সূক্ষ্ম শিল্পপরসঙ্গানের যে-পরিচয় দিয়েছেন, বাঙলার চলচ্চিত্র-জগতে তা একান্তই দুর্লভ।

গ্রীসিংহের মতে প্রধানত দুটি দিকে লক্ষ্য রেখে ছবি তৈরি করা যেতে পারে— এক, দর্শকদের কথা ভেবে এবং দুই, আত্ম-তৃপ্তির জন্যে। এই আত্মতৃপ্তির জন্যে ছবি তৈরি করতে না পারার ব্যথা প্রায় প্রতিটি শিল্পীর মতোই গ্রীসিংহকেও অহিনিশি পীড়িত করছে; কারণ বলাই বাহুল্য দর্শকদের তৃপ্তির প্রতি লক্ষ্য রেখেই তাঁকে আজ পর্যন্ত প্রতিটি ছবিই করতে হয়েছে এবং হচ্ছে। অথচ তিনি বলেন, বেশ কয়েক বৎসর যাবৎ যে-সব প্রোডিউসার তাঁকে দিয়ে ছবি পরিচালনা করতে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই তাঁকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দিয়েছেন ছবি তৈরির ব্যাপারে। এমনকি, তিনি কি কাহিনী নির্বাচন করবেন, তার চিননাটা কেমন হল, কোন কোন শিল্পী তিনি নিয়োগ করবেন, ছবির কতখানি বাইরে তোলা হবে এবং কতখানিই বা স্টুডিওর অভ্যন্তরে তোলা হবে, এ-সব সম্বন্ধে তাঁদের আদৌ কোনো ঔৎসুক্য দেখা যায় না; ছবিটি তুলতে মোটামুটি কত খরচ হবে, এইটুকু জেনেই তারা খুশী। তিনি যতই বলেন, যে-কাহিনীটার চিত্ররূপ দিতে চাই, সেটা কেমন একবার চোখ বুজিয়ে দেখুন বা চিননাটা কেমন তৈরি হল, একবার কান

এক বন্দ্য-নারীর ব্যাধরা অন্তরের হাহাকার!

•BEEFEE



আপনার প্রিয় চিত্রগৃহে—মুদ্রি সমাসয়!

পরিবেশক : সরকার ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটর্স

২, জগদ্বল্লভ নেহেরু রোড, কলিকাতা-১৩

শুনুন, তাঁরাও ততই বলেন, ছবি এখন সেন্সার করবার জন্যে তৈরি হবে, তখন ছবি দেখব, তার আগে কিছু দেখব না, শুনবও না। অথচ প্রযোজকের প্রতি তাঁর দায়িত্বের কথা তিনি কিছুতেই ভুলতে পারেন না। বরং উজ্জ্বল প্রযোজকরা তাঁর কাছ থেকে কিছুই জানতে না চেয়ে তাঁর প্রতি অত্যধিক নির্ভরশীলতা প্রকাশ করেন বলে তাঁদের সম্বন্ধে তাঁর নিজের দায়িত্ববোধটা যেন মাহাত্ম্যবোধে বৈশী।

কাজেই প্রযোজক ঝাতে তাঁর গণনীকৃত অর্থ ফিরিয়ে পান, সে-চিন্তার খ্রীসিংহকে জর্জর হতেই হয় এবং কেমন করে শিল্প-বোধকে আহত না করে ছবিকে জনপ্রিয় করা যায়, তাই নিয়ে তাঁর মস্তিষ্ককে ঘূর্ণিত করতেই হয়। খ্রীসিংহ মনে করেন, কোনো-দিন যদি আমাদের দেশের সরকার—সে কেন্দ্রীয়ই হোক, আর রাজ্য সরকারই হোক—এগিয়ে এসে বলেন, আমরা কুড়ি লাখ টাকা ছবি তৈরির জন্যে খরচ করব, সাধকনামা আস্থাভাজন চারজন বা পাঁচজন পরিচালকের মধ্যে এই টাকা আমরা ভাগ করে দেব, তারা তাদের আপন আপন রুচি ও শিল্পবোধকে সম্বল করে নিজেদের ইচ্ছামত ছবি তৈরি করুক এবং তিনি যদি সেই নির্বাচিত পরিচালকদের অন্যতম হবার সৌভাগ্য লাভ করেন, সেইদিন এবং মাত্র সেইদিনই তিনি আত্মতৃপ্তির জন্যে ছবি তৈরি করে নিজের জীবনকে সাধক করতে পারবেন, তার আগে নয়।

কবি যেমন নিজেকে প্রকাশ করবার জন্যে কবিতা লেখেন, চিত্রকর ছবি তঁরকেন, গায়ক গান করেন, চিত্রপরিচালকও নিশ্চয়ই ছবি তৈরীর মাধ্যমে নিজের সাধকতাকে খুঁজে পান। খ্রীসিংহ বলেন, “অপরের কি হয় জানি না, আমি কিন্তু সারাক্ষণই ছবি তৈরীর চিন্তায় মগ্ন থাকি। খবরের কাগজ পড়তে পড়তে হয়ত কোনো ঘটনার কথা চোখে পড়ল কিংবা কোনো সুন্দর উক্তি দেখতে পেলুম, অমনি সে জিনিসের চিত্র-সম্ভাবনার কথা মনকে আলোড়িত করতে লাগল। পথে কোনো ঘটনা প্রত্যক্ষ করলুম বা কোনো বিশেষ চেহারাওলা লোক দেখলুম, অমনি সেইগুলিকে উপলক্ষ্য করে চিত্র-কাহিনীর সূত্র রচনা করতে শুরু করলুম। আজ আমাদের দৈনন্দিন জীবন নানাভাবে বিপর্যস্ত। জীবনের মূল্যবোধও দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। মানবের জীবনে স্বজ্ঞ নিরাপত্তাবোধ হারিয়ে গেছে। বাইরের কোনো দুরন্ত শক্তি আমাদের সমাজকে আজ সংজারে আঘাত করছে তাকে ভেগে চুরমার করে

ফেলবার জন্যে। এ সমস্তই আমার মনকে প্রতিনিয়তই নাড়া দিচ্ছে। চিত্রপরিচালকেরও তো একটি সামাজিক দায়িত্ববোধ থাকা উচিত এবং ছবির মাধ্যমেই সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে। আমেরিকার ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট-এর একটি কথা আমার মনে গাঁথা রয়েছে, তিনি বলেছিলেন : আমাদের ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলবার জন্যে তথ্যই আদৌ উৎসুক নই; আমি উৎসুক আমাদের ভবিষ্যতের জন্যে আমাদের ব্যবসায়কে গড়ে তুলতে।—এই সুন্দর উক্তিটিকে যদি ছবির মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে পারি, তাহলে হয়ত

আজ আমাদের সমাজের কিছুটা উপকার হয়।”

‘হাটেবাজারে’ শেষ করবার পরে খ্রীসিংহ ইন্দ্রমিত্র রচিত ছোট গল্প ‘আপনজন’ অবলম্বনে যে ছবিটি করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন, তাতে পল্লীগামের একজন সেকেলে বৃদ্ধার চোখ দিয়ে বর্তমান শহুরে সমাজের মূল্যায়নের প্রয়াস আছে। খ্রীসিংহ মনে করেন, নন্দনতন্ত্র বা রসের বিচারে ছবিটি কি পর্ষদের হবে, তা আগে থাকতে নিশ্চয় করে বলা না গেলেও ছবিটি যে আজকের দিনের একটি সাধক দলিলরূপে চিহ্নিত হবে, একথা নিশ্চয় বলা যায়।

—ভবেশ সান্যাল

বহস্য, রোমাঞ্চ ও রোমান্স শব্দ থেকে শেষ পর্যন্ত আপনাকে
মগ্নমগ্ন করে রাখবে ---

অগ্রদূত

পরিচালিত

উষ্ম কুমার

অঞ্জনা জ্যোতি

কালী বন্দ্যোপাধ্যায়

সুরতা

গোভা জেন

বক্সিস ঘোষ

প্রজ্ঞান মুখোপাধ্যায়

তরুণ মিত্র

কামু মুখার্জী

অভিনেতা



চলচ্চিত্র ভারতী
নির্মিত

হাটেবাজারে

পরিচালনা:
ডিল্লিপ ফিল্ম,
ডিস্ট্রিবিউটার্স

সংগীত: সুধীন দাশগুপ্ত

কাহিনী চিত্রনাট্য: প্রশান্ত দেব

॥ দ্রুত সমাপ্তির পথে ॥

বাংলা ছবির বিষয়ে

মৃণাল সেন

শিল্প-মনস্ক কোন সিনেমা পরিচালকের কল্পনা এলেই আমার কল্পনায় ডেলে ওঠে সঙ্গীতময় সুদর্শন এক পাখী, যে ব্যবসারীর জাল পরিহারের প্রতিজ্ঞার বৃক্ষ থেকে ত্যক্ত বৃক্ষে অবিরত পল্লবনম্র হয়। মৃণাল সেন বাংলায় সেই অতিস্বল্প পরিচালকদের অন্যতম যারা পৌনঃপুনিক প্রলোভন সত্ত্বেও সিনেমা ব্যবসারীদের জালে আজও অধরা, উপরন্তু সিনেমার মাধ্যমে স্বকীয় বক্তব্যের শৈল্পিক রূপায়ণে ক্রান্তিবিহীন এবং নিরবচ্ছিন্ন। এবং মৃণাল সেনের প্রতি সিনেমারাসিকদের কৃতজ্ঞতার কারণ নিহিত শিল্পের প্রতি তাঁর এই নিঃশর্ত আনুগত্য—সাক্ষ্য-ব্যর্থতার স্বল্প খতিয়ান নয়।

কেন আমি শ্রীযুক্ত সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারকে সিনেমার, বিশেষভাবে বাংলা সিনেমার সম্ভাবনা এবং গতি-প্রকৃতি বোঝার পক্ষে আবশ্যিক মনে করি তার ব্যাখ্যা পূর্বাচ্ছেই এই ভূমিকার মধ্যেই রয়েছে। এবং এটি সাক্ষাৎকারই, প্রবন্ধ নয়। কারণ, ব্যবহারিক শিল্পের স্রষ্টা যে কোন কারণেই হোক প্রবন্ধে ততখানি আত্মপ্রকাশ করেন না, যতখানি করেন সাক্ষাৎকারের স্বগতভাবে। অতএব সেই অতি উত্তম রূপে যখন শ্রীযুক্ত সেনের সঙ্গে দেখা হল বিনা ভূমিকার শূন্য করে দিলাম আমার প্রশ্নগুলি :

বস্তু ॥ আপনি কেমনভাবে ছবি তৈরী করেন? অর্থাৎ কি পদ্ধতিতে বিষয়বস্তু থেকে স্ক্রিপ্ট (script) এবং স্ক্রিপ্ট থেকে ছবি তৈরী করেন? এ বিষয়টি জানার একটি স্বাভাবিক আগ্রহ আমাদের আছে যেহেতু আপনার ছবিগুলি সর্বদিক থেকেই সাবেকী ছবি থেকে আলাদা।



মালুচরী চিত্রে দীপিকা দাস, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও অনুপমহার

সেন ॥ যে কোন ছবি তৈরীর মূলে থাকে একটি কেন্দ্রীয় ভাবনা যা থেকে সমস্ত ছবিটি উৎসারিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়। সিনেমার মূল উপাদান দুটি—ইমেজ এবং সাউন্ড। সুতরাং কেন্দ্রীয় ভাবনা অনুসারে ক্যামেরা এবং সাউন্ডের ভূমিকা সম্মুখে রেখে আমি চিত্রনাট্য রচনা করি। কিন্তু ছবি তোলার সময়ে কখনও চিত্রনাট্যের দ্বারা শাসিত হই না। চিত্রনাট্য অনেকটা স্টারটিং পয়েন্ট হিসেবে কাজ করে। চিত্রনাট্যের কোন আইডিয়া রূপায়িত করার প্রয়োজনে অনেক সময়ই চিত্রনাট্যকে পরিবর্তন করি। ছবি তৈরী সাধারণতঃ তিনেক দিন ধরে চল, সেকারণে আমার চরিত্রগুলি এবং আমি যেন grow করি—চরিত্রগুলির সঙ্গে সান্নিধ্য এবং একাত্মতার দরুন ভাবনাগুলি ক্রমশঃই সংশোধিত হতে থাকে, মূড় এবং পরিবেশও পরিবর্তিত হয়।

আউটডোর স্যুটিং-এর সময় স্ক্রিপ্ট-এর সবচেয়ে বেশী পরিবর্তন করি—এত বেশী যে একে পূর্বপরিকল্পনাহীনতা বা improvisation-ও বলা যায়। অনেক সময় একটি বিশেষ দৃশ্যের স্যুটিং-এর সময় আমি স্ক্রিপ্ট-এর সংলাপ অভিনেতাদের বলি না—সেই বিশেষ পরিস্থিতিতে তাদের যে সংলাপ স্বাভাবিকভাবে মনে আসে তাই বলার সুযোগ দিই। অধিকাংশক্ষেত্রে এই পদ্ধতি আকাঙ্ক্ষিত সাফল্য এনেছে।

তবে ছবি তোলার সময়ে আমি বিশৃঙ্খলার প্রহর কখনও দিই না। ফলে তোলা ফিল্ম আমাকে কখনও ফেলে দিতে হয় নি।



শীলা চিত্রে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

বস্তু ॥ আপনি যখন কোন ছবি করেন তখন তা কি স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে করেন অথবা আগেকার করা ছবিগুলির কথা মনে রেখে করেন? অর্থাৎ আপনার কোন একটি বিশেষ ছবির মর্ম উপলব্ধিতে কি আগেকার ছবিগুলির স্মৃতি দরকার হয়?

সেন ॥ যে কোন শিল্পের—ছবিরও—মুঠো দিক রয়েছে—বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিক। বিষয়বস্তুর দিক থেকে আমার প্রত্যেকটি ছবি স্বয়ংসম্পূর্ণ—একটিবে বোঝার জন্যে অন্যটির জ্ঞান দরকার হয় না। বিদেশে কেউ কেউ trilogy করেছেন, এদেশেও সত্যজিৎবাহু trilogy করেছেন। কিন্তু আমি বিশেষ সময়ে একটি বিশেষ চরিত্র, স্থান, ঘটনা অথবা সমস্যাকে একটি-মাত্র ছবিতেই রূপায়িত করেছি—পরিবর্তী কোন ছবিতে তার জের টানি নি। আঙ্গিকের দিক থেকে কিন্তু এক ধরনের ধারাবাহিকতা রয়ে গেছে। যদিও আঙ্গিক আবশ্যিকভাবেই বিষয়বস্তুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, আঙ্গিকের কোন একটি বিশেষ প্রয়োগ আমাকে অনেক সময়েই নতুন নতুন অভিজ্ঞতার মধ্যে টেনেছে। যেমন, জনেকেই জ্বল করেন যে, 'আকাশ কুসুম'—এই আম সর্বপ্রথম 'ফ্রিজ'-এর ব্যবহার করি। কিন্তু ১৯৬৩ সালের 'প্রতিনিধি'তেই আমি ফ্রিজ ব্যবহার করেছি একটি বাচ্চার ওপর। আবার অতি সম্প্রতি-কালের 'মাটির মানবে'ও ফ্রিজ-এর ব্যবহার আছে। গত কিছুকাল হল

অনেক সমালোচক jump cut সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছেন। ১৯৬১ সালের 'পুনশ্চ'তে আমি jump cut প্রয়োগ করেছি। প্রসঙ্গতঃ ১৯৬১ সাল থেকে আমি টাইম এবং স্পেস নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করি এবং আমার আঙ্গকের ভাষনা তারই। বুদ্ধিসঙ্গত পরিণতি।

বসু ॥ আপনার ভাবনা-চিন্তায় কি বিশেষ কোন দর্শনের প্রভাব আছে?

সেন ॥ সমাজ এবং জীবন সম্পর্কে আমার ভাবনা-চিন্তা একটিমাত্র বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত। বিষয়টি হল পরিবেশ—যে পরিবেশে মানুষ গড়ে ওঠে নিঃশেষ হয়ে যায়, ভালবাসে কিনা ঘণা করে। পরিবেশকে বাদ দিয়ে মানুষকে আমি কখনও বিচার করি না—পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতেই শুধু, মানুষকে বিচার করি।

আমি মানুষের মধ্যে সর্বদাই একটি sense of dignity খুঁজে পাই। 'মাটির মানুষের একটি দৃশ্য লাগল, কাঁধে একটি চরিত্র ক্ষেতের কাজের শেষে বাড়ী ফিরছে। বাস্তব জীবনে লাগল কাঁধে মানুষের মধ্যে আমি sense of dignity খুঁজে পেয়েছি বলেই এমন একটি দৃশ্য সম্ভব হয়েছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা মানুষের সহজাত সত্যায় আমার আস্থা অনড়।

বসু ॥ তাহলে একথা কি বলা যায় যে, আপনার কোন ছবিতে অমহৎ অথবা খারাপ কোন চরিত্রকে আপনি রূপান্তর করতে চান না?

সেন ॥ আমি আগেই বলেছি আমি মানুষকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করি না—তাকে তার পরিবেশের, পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করি। দৃশ্যতঃ বা বিচ্ছিন্নভাবে যে চরিত্রকে দৃষ্ট মনে হয় পরিবেশকে বিচার করলে তার সম্পর্কে আচরা আমাদের ধারণা পাল্টাতে বাধ্য হয়। 'বাইশে শ্রাবণের একটি দৃশ্যে আছে স্ত্রী ক্রোধের সঙ্গো তাত দিচ্ছে এবং স্বামী গোপ্রাসে গিলছে। স্বামীর এই অভিলোভী গোপ্রাসে গেলা বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে বিরক্তির সৃষ্টি করে কিন্তু যে অভাব এবং দুর্যোগ তার চারিদিকে রয়েছে তার পটভূমিকায় স্বামীর গোপ্রাসে খাওয়া বেদনাই সঞ্চার করে।

বসু ॥ আপনি আপনার ছবিতে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কতখানি গুরুত্ব দেন?

সেন ॥ ছবি তৈরীতে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে; সুতরাং তাদের আমি স্বেচ্ছা গুরুত্ব দিই।

বসু ॥ ছবির একটি কম্পোজিশনে অভিনেতা ছাড়া বা কিছু স্ক্রিন জুড়ে থাকে তবুও গুরুত্ব কি অভিনেতাদের পড়ই নর?

সেন ॥ ছবির একটি নিশ্চল মুহূর্তে বাই প্রতীকমান ছোক অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ভূমিকার সঙ্গো একটি টেবিল কিম্বা চেয়ারের ভূমিকার পার্থক্য রয়েছে।

অভিনেতা কথা বলে, অঙ্গভঙ্গী করে এবং সেই কারণে একজন পরিচালক কিম্বা টেকনিসিয়ানের মতই ছবিতে তারও একটি creative role আছে।

বসু ॥ আপনি অভিনেতাদের কিভাবে নির্দেশ দেন? আপনি কি তাদের কোন একটি মুড কিভাবে রূপায়িত করতে হবে তা নিজে অভিনয় করে দেখিয়ে দেন অথবা মুডটিই তাদের বুঝিয়ে দেন—অভিনয়ে অভিনেতাদের চরম স্বাধীনতা থাকে?

সেন ॥ স্বাধীনতা থাকে তবে চরম নয়। অভিনেতাদের আমি আমারই নির্ধারিত পথে বিচরণ করার স্বাধীনতা দিই

থাকি। তবে সাধারণতঃ আমি এমন পরিবেশ বা পরিস্থিতির সৃষ্টি করি—অন্ততঃ চেষ্টা করি—যাতে তারা বোঝেন এবং বিশ্বাস করেন কিভাবে কোন বিশেষ অঙ্গভঙ্গী করতে হবে বা সংলাপ বলতে হবে।

বসু ॥ 'আকাশ কুসুম' এবং 'বাইশে শ্রাবণের সুর' এবং মেজাজ বিপুল তফাৎ। এ কি আকস্মিক অথবা সমাজ এবং জীবন সম্পর্কে আপনার ধারণার পরিবর্তনই এর কারণ?

সেন ॥ এই তফাৎ আকস্মিক নয়, আবার সমাজ এবং জীবন সম্পর্কে আমার ধারণার কোন পরিবর্তন এই সময়ের

আজ নৃতিপ্রতীক্ষায় !

নিঃসঙ্গ অস্তরে জীবনের পরিচ্ছন্ন সুরশী বেয়ে যে চলতে চেয়েছিল, অকস্মাৎ তার জীবনে নেমে এল অতীত দিনের এক পক্ষিপাতার



কলকিত্তিত্ত্বমুখোপাধ্যায়-পরিচালনা অর্ধেন্দু সেন-সংগীত হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
আপনার প্রিয় চিত্রগৃহসমূহে • ইকনমিক পিকচার্স পরিবেশন

মধ্যে ঘটেছে এমন কথাও বলা ঠিক হবে না। আসলে ছবি দুটির পটভূমিকাই ভিন্ন—সুতরাং তারা সুর এবং মেজাজেও ভিন্ন। 'বাইশে শ্রাবণের' পটভূমিকা বিশ শতকের তৃতীয় দশকের শেষার্ধ্বে — যুদ্ধের একটু আগে। ছবিটিকে বলা যায় অব্যবহিত যুদ্ধ পূর্ব যুগের study and interpretation. 'আকাশ কুসুমের' পটভূমিকা বিশ শতকের ষষ্ঠ দশকের দ্বিতীয়ার্ধ। মাঝখানে যুদ্ধ জীবন সম্পর্কে মূল্যবোধগুলিই পাটে দিয়ে গেছে। ফলে 'আকাশ কুসুম' কখনই 'বাইশে শ্রাবণের' পটভূমিকায় তৈরী হতে পারত না।

বস্তু ॥ আপনার সাম্প্রতিক ছবি 'মাটির মানুষের' গ্রাম্য জীবন আবার ফিরে এসেছে। কিন্তু ছবির নায়ক শহুরে বিকার, অর্থলিপ্সা এবং স্বার্থপরতার আক্রান্ত। 'আকাশ কুসুমের' নায়কও মূলতঃ সং হলেও শহুরে অর্থলিপ্সা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার আক্রান্ত হয়ে বিপথে চালিত হয়েছিল। এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

সেন ॥ কোন পথ আসলে বিপথ অথবা ঠিক সে সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই না। কারণ আমি নীতিবাদী বক্তৃতা পছন্দ করি না। আমি দেশ এবং মানুষকে আবেগ এবং প্রাধা নিয়ে বিচার করি, তারা আমার কাছে

বাদ্যযন্ত্রে রাখা প্রদর্শনীর বস্তু নয়। দুটি ছবিরই নায়কের মধ্যে এক ধরনের স্বাভাবিক জন্মলাভ করেছে এবং তারা ambition । প্রধানতঃ এই স্বাভাবিক এবং ambitions -এর জন্যই পথের বাধা ভাঙার ব্যগ্রতায় সমাজের গতানুগতিক নিয়মগুলি তারা মানে নি।

বস্তু ॥ 'মাটির মানুষের' নায়কের অভিভাবক আছে — অভিভাবকের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ, কিন্তু 'আকাশ কুসুমের' নায়কের যদিও মা আছে, সে কিন্তু কখনও মার স্মারা শাসিত হয় নি।

সেন ॥ 'মাটির মানুষ' তিরিশের যুগের কাহিনী, সে যুগে অভিভাবক থাকাতাই স্বাভাবিক; কিন্তু 'আকাশ কুসুমের' যুগে নিরস্ত্র শক্তি হিসেবে অভিভাবকের কম্পনা করা কঠিন। কিন্তু 'মাটির মানুষ'ও শেষ পর্যন্ত দুই ভাইয়ের মিলন দেখান হয় নি—সকলের চাপে ছোট ভাই বড় ভাইয়ের খোঁজে বেরিয়েছে মাত্র। কারণ দুজনের মিলন হোক বা না হোক কাহিনীর চরিত্রের মূল রূপটি তাতে পরিবর্তিত হচ্ছে না।

বস্তু ॥ আপনার আগেকার ছবি 'আকাশ কুসুম' এবং সাম্প্রতিক ছবি 'মাটির মানুষ' ফ্রিজ ব্যবহার করেছেন। আপনার কাছে ফ্রিজ-এর বিশেষ significance কি?

সেন ॥ আমি কখনই ফ্রিজ ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে ফ্রিজ ব্যবহার করি নি। অর্থাৎ একটি ছবি তৈরীর আগে থেকেই আমি স্থির করে রাখি না যে ছবিটিতে আমি ফ্রিজ ব্যবহার করবই। যে স্বাভাবিক প্রয়োজনবোধ থেকে আমি ক্রোজ-আপ ব্যবহার করি বা ক্যামেরা চার্জ করি সেই স্বাভাবিক প্রয়োজনবোধের ভাগিদে আমি ফ্রিজ ব্যবহার করি। প্রসঙ্গতঃ, আমি ১৯৬৩ সালে তোলা 'প্রতিনিধি'তে সর্বপ্রথম ফ্রিজ ব্যবহার করি প্রয়োজনবোধে। এবং প্রয়োজনবোধেই 'আকাশ কুসুম' ও পরবর্তী ছবিতেও করছি। 'আকাশ কুসুম'ই আমি সর্বপ্রথম ফ্রিজ ব্যবহার করি বলে অনেকের যে ধারণা আছে তা ঠিক নয়।

বস্তু ॥ আমার মনে হয় ফ্রিজ আধুনিক কালের স্রষ্টাদের একটি শক্তিশালী অস্ত্র।

সেন ॥ সে কথা ঠিক, কিন্তু অস্ত্রটির জন্ম একেবারে আধুনিককালে নয়। ১৯২৮ সালের 'পিপল অন এ সানডে' নামের জার্মান ছবিটিতে ফ্রিজ ব্যবহৃত হয়েছে। যতদূর মনে পড়ে ১৯৪৮ সালে মাইকেল রেডগ্রেভ-এর 'এ ম্যাটার অব লাইফ অ্যান্ড ডেথ' ছবিটি লাইট হাউসে দেখান হয়। সেখানে ফ্রিজ-এর দৃঃসাহিক ব্যবহার ছিল।

বস্তু ॥ সিনেমায় আপনি সঙ্গীতকে কতখানি গুরুত্ব দেন?

পৌরাণিক আর ঐতিহাসিক দুটি বিরহ-মিলন ও মিলন-বিরহের কাহিনী

জয়দেব চন্দ্রবর্তী ও সমীরণ মজুমদার প্রযোজিত

সাবিত্রী অসীমবুঝার
বীরবানার্জী-জহর রায়
বলীপদ চন্দ্রবর্তী
মীপিকানন্দ
অভিনয়

জে.এস. প্রোডাকসন্সের

বলীপদ

চিন্নাট/মণি বর্মা • সংগীত/বলীপদ সেন

জয়শঙ্কর
প্রোডাকসন্সের নিবেদন
প্রযোজনা
জয়দেব চন্দ্রবর্তী • শঙ্কর রায়চৌধুরী
রমাপদ চৌধুরীর

পানিবাসী

পরিচালনা চিত্ত বসু

বাংলা ও বোম্বাই-এর
জনপ্রিয় শিল্পী সমন্বয়ে ও
বিপুল অর্থব্যয়ে
নির্মিত

পরিবেশনা • প্যারিসেন্ট ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটর্স প্রাঃ লিঃ

৫৬, ধনুলা স্ট্রাট, কালকাতা-১০

সেন ॥ সিনেমার সঙ্গীতকে দু' ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—কণ্ঠসঙ্গীত এবং আবহসঙ্গীত। প্রথম ক্ষেত্রে, চরিত্রগুলি যে প্রয়োজনবোধে হাঁটে, কিম্বা হাসে কিম্বা কাঁদে সেই প্রয়োজনবোধে গান গাইতে পারে। কিন্তু ভারতীয় ছবি-গুলিতে গান সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয় পার্কে জলসার মেলাজে। তার ঘোরতর বিরোধী আমি। তবে আবহ-সঙ্গীত সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে, আবহসঙ্গীতের প্রয়োজন আছে এবং সে প্রয়োজন অসামান্য।

বন্দ্য ॥ কিন্তু একথা তো ঠিক যে আবহ-সঙ্গীত সাধারণভাবে অবাস্তব। কারণ যেমন ধরুন বাস্তব জীবনে আমরা যখন কাঁদি তখন অদৃশ্য থেকে কেউ সেতার বাজিয়ে তার সমর্থন জানাব না—অথচ সিনেমায় তা অবধারিত।

সেন ॥ কিন্তু সিনেমার পর্দায় আমরা বাস্তবকে হাজির করি না, বাস্তবের মায়ী (ইল্যুশন) সৃষ্টি করি। অর্থাৎ শিল্প মাধ্যমের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করে একটি বাস্তব জগতের 'মায়ী' সৃষ্টি করাই শিল্পের অধিষ্ঠ। সিনেমার বৈশিষ্ট্য বলতে যেমন ক্যামেরার বিভিন্ন ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যকে বোঝায় তেমনি আবহসঙ্গীতের মত বাইরের পর্দাকেও বোঝায়—যেহেতু এর সাহায্যে সহজেই ইল্যুশন অফ মডেস সৃষ্টি করা যায়। ফলতঃ অত্যন্ত সংগত কারণেই আবহসঙ্গীত সিনেমার একটি আর্টিস্টিক কনভেনশন হিসেবে গণ্য থাকে।

বন্দ্য ॥ সিনেমা সংলাপের ওপর কতখানি নির্ভরশীল—অর্থাৎ সিনেমায় সংলাপের ভূমিকা মুখ্য তথবা গৌণ?

সেন ॥ সিনেমায় সংলাপের পরিমাণ প্রয়োজনের ওপর নির্ভর করে। অনেকের মতে সিনেমা প্রধানতঃ দৃশ্যধর্মী সুতরাং সংলাপের পরিমাণ সর্বদাই কম থাকা উচিত। আমি বিশ্বাস করি না যে, সিনেমা সর্বদাই কম কথা বলবে। চরিত্রেরা যখনই প্রয়োজনবোধ করবে তখনই কথা বলবে। তবে সংলাপ রচনায় সর্বদাই নিবর্তনশীল হতে হবে যাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু স্থান না পায়।

বন্দ্য ॥ প্রসঙ্গতঃ, আমার মনে হয় চিত্রনাট্য সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে বা করা উচিত যেভাবে নাটক সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এতে বিশেষভাবে সিনেমার জন্য সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র শাখা থাকার দরুন সিনেমাই লাভবান হবে।

সেন ॥ সিনেমার বিষয়বস্তুর জন্য সাহিত্যের স্মারক হওয়ার মধ্যে কোন সংশ্লিষ্টতার কারণ দেখি না। তবে নাটকের মত চিত্রনাট্যকেও সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে গণ্য করা

যেতে পারে। বিদেশে অনেক চিত্রনাট্য প্রকাশিত হয়েছে—তবে সবগুলিই সিনেমা হওয়ার পর। ছবি তোলা হয় নি এমন চিত্রনাট্য কখনও প্রকাশিত হয় নি। নাটকের ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সময় আগে নাটক প্রকাশিত হয়, তারপরে সেটি মঞ্চস্থ হয়।

বন্দ্য ॥ আপনি অতীতে যে সমস্ত ছবি করেছেন সেগুলি সম্পর্কে আপনার মনোভাব কি? আগেকার ছবিগুলিতে, যেমন, 'আকাশ কুসুম' এমন কিছু কি আছে যা আপনি এখন ছবিটি করলে মোটেই তুলতেন না বা অন্যভাবে তুলতেন?

সেন ॥ ব্যক্তিগতভাবে বলতে গেলে প্রত্যেক পরবর্তী ছবিতেই বিষয়বস্তু এবং অঙ্গকে আমি অপেক্ষাকৃত বেশী নিশ্চিত। যেন I am growing in every film. সেকারণেই পুরনো ছবি সম্পর্কে আমি বেশ ক্রিটিকাল। মাঝে মাঝে মনে হয় যদি পুরো ছবিটাকেই ড্রেস রিহাসাল মনে করে আবার তুলতে পারতাম।

বন্দ্য ॥ এমন অনেক নিদর্শন আছে যে, একজন কবি সারাজীবন ধরে বিশেষ কয়েকটি কবিতার সংশোধন করে গেলেন—সৃষ্টিকে নিখুঁত করার জন্য। কিন্তু সিনেমার সংশোধনের তো কোন সুযোগ নেই।

২৯শে সেপ্টেম্বর শুভারম্ভ
এক বিচিত্র নারী-হৃদয়ের, অমর্ত্যময়ী মায়ের চোখা-পাওয়া,
বঞ্চনা-বেদনার হৃদয়ময়ী কাহিনী

সৌমিনী আনন্দা



মুখোমুখি

রাভেন সারকার পরিবেশিত-চিত্রালা ক্রিয়া

অন্যান্য ভূমিকায় : মলিনা দেবী, ছায়া দেবী, রেণুকা রায়, শর্মিষ্ঠা বিশ্বাস, গীতা দে, কবির গাঙ্গুলী, কালু নাথ্যায়, কবির রায়, উৎপল দত্ত, অরুণ মুখার্জি, সত্যেন দাস, আনন্দ নাথ্যায়, সমরকুমার, রায় সৌমিত্র, রায় মলয় প্রভৃতি।

উত্তরা : পুরবা : উজ্জ্বলা ও শহরতলীর অন্যান্য চিত্রগৃহে



কখনো মেঘ চিত্রে উত্তমকুমার ও অঞ্জনা ভৌমিক

সেন ॥ একথা ঠিক যে অতীতে তোলা কোন ছবিকে সংশোধন করা যায় না। এটা সিনেমার একটা ব্র ব্যাক। কিন্তু তবু এই যে তোলা ছবিকে সংশোধন করার একটি বাসনা আমার মনের মধ্যে রয়েছে। এটা আমার মতে আমার পক্ষে ভাল। ধরুন, এই মুহূর্তে 'মাটির মানুষ' সম্পর্কে আমার ভালবাসা সবচেয়ে বেশী, কিন্তু কিছুকাল বাদেই হয়তো মনে হবে ছবিটির অংশবিশেষ অন্যভাবে করলে ভাল হতো। 'মথার' রুচিশীল সমালোচকের যে মন্তব্য আজ স্বীকার করে নিতে পারছি না তখন হয়তো তাই সত্য বলে মনে হতো।

বসু ॥ আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছু বলেন।

সেন ॥ ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। আমার তৈরি হাটখানা ছবির মধ্যে সাতখানার ক্ষেত্রে খরচ পুরোপুরি ওঠে নি। ফলে কোন ছবির প্রযোজকই আমার কাছে দ্বিতীয়বার আসেন না। কেবল 'দীর্ঘ আকাশের নীচে' ছবিটির টাকা উঠে এসেছিল। তা, এই ছবিটির প্রযোজকও আর আসেন নি। এমন ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করে লাভ কি বলেন, কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা যেখানে সামান্যই? সুতরাং আমার ভাবনা বর্তমান কালকে নিয়ে। I live in the present

বসু ॥ বাংলাদেশের সাধারণ দর্শক সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

সেন ॥ সাধারণ দর্শক সবদাই এনটারটেইন-মেন্ট চান। যুগটাও পড়েছে প্রচারের। কমানিক ছবিগুলি ক্রমাগত প্রচারে

সাধারণ দর্শককে সবদাই বিভ্রান্ত করে রেখেছে। একটা সত্য ঘটনা বলি শুনুন। ঘটনাটা এর আগেও কোথায় বেন উল্লেখ করেছি। রাস্তায় এক পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। বেশ উৎসাহের সঙ্গে বললেন, "অমুক



জালবাই চিত্রে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

ছবিটা দেখলাম কাল। সম্মত। রোজই হাউস ফুল। পাঁচদিন ঘুরে ঘটাখানেক লাইন দিয়ে দু'খানা টিকিট পেলাম।" বাজার মাতানো এক ছবির নাম করলেন ভদ্রলোক। জিজ্ঞাসা করলাম, "কেমন লাগলো?" জবাব পেলাম, "আর বলবেন না, ছটা টাকা জলে গেল। প্লাস টাক্সি ভাড়া।" একটু থেমে আবার বললেন, "হ্যাঁ, ভালো কথা, কংগ্রেসলেশন, আপনার ছবিটা দারুণ হয়েছে।" "এর মধ্যেই দেখে ফেলেছেন!" একটু উৎসাহের সঙ্গে বললাম। ভদ্রলোক বেশ সপ্রতিভভাবেই বললেন, "না, মানে, এখনো দেখে উঠতে পারি নি। শুনছি।" এ ঘটনাটিকে আমার মোটেই আকস্মিক মনে হয় না, সচরাচর এই রকমই ঘটে। সাধারণ দর্শককে ব্যবসায়িক ছবির হাত থেকে রক্ষা করার উপায় আমি দেখি না। ও'রা ছ' টাকা জলে দেবেন, স্বীকার করবেন, কিন্তু আবারও ছ' টাকা জলে দেবেন, দিতে বাধ্য। সিনেমা ব্যবসায় বর্তমান কাঠামোতে।

বসু ॥ এক্ষেত্রে সাধারণ দর্শককে কামড়াক্ত করাই কি এর সমাধান নয়? অর্থাৎ কোনো শিক্ষাপ্রসঙ্গ ছবিতে এমন কিছু ব্যবসায়িক উপাদান রেখে দেওয়া যাতে সাধারণ দর্শক ছবিটি দেখতে বাধ্য হন। যেমন যৌন আবেদনযুক্ত কোন দৃশ্য— কিংবা আড়ম্বরপূর্ণ দৃশ্যবলী।

সেন ॥ ব্যবসায়িক ছবি আমি চেষ্টা করলেও তৈরি করতে পারব না। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় না যে একটি বা দুটি যৌন আবেদনধর্মী বা আড়ম্বরভরা দৃশ্যের জন্যে একটি ছবি ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করতে পারে। তবে পরীক্ষামূলকভাবে চেষ্টা করা যেতে পারে। আমার পক্ষে যদিও কোন পূর্ব সত্য মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

বসু ॥ এমন প্রায়শই বলা হয় যে পুনর্জন্মে ছাত্ররা বা শেখা বাংলাদেশে বিখ্যাত পরিচালকদের তত্ত্বাবধানে সহকারীরা তার চেয়ে অনেক বেশী কার্যকরী শিক্ষা পায়। মন্তব্যটি কতখানি সত্য?

সেন ॥ এ সম্পর্কে আমি বলতে পারি যে ধারণাটা ঠিক নয়। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পরিচালকেরা বাংলাদেশে গত বেশ কয়েক বছর ধরে ছবি তুলছেন, কিন্তু তাঁদের মোট কয়েকজন সহকারীদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত ক'জন পরিচালক হিসেবে, কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন? ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য একজনেরও আছে কিনা সন্দেহ। এর কারণ আছে। সহকারীর কাজে বাংলাদেশে প্রকৃত শিক্ষার বাধা অনেক। প্রথমতঃ ছবি তৈরিতে নানা ধরনের কমািশিয়াল ফ্যাক্টর থাকে। তারপর আছে নির্যমিত পড়াশুনা এবং শৃঙ্খলার অভাব। কিন্তু পূনো ইনস্টি-



দৈবজয়ন্তীমালা ॥



মহিলা : অমৃত

রাজকামিনী ॥



সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ॥



স্বর্গো : অমৃত

অপর্ণা দাশগুপ্ত ॥

টিউটে ছবি তৈরির একটি আবহাওয়া আছে। They breathe film তারপর তাদের টেকস্ট বই পড়তে হয়—শুধু পড়াই নয়, পড়ে পরীক্ষা দিতে হয়। এখানে একটা অ্যাকাডেমিক আবহাওয়া আছে এবং সেটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। পৃথিবীর বিভিন্ন কেন্দ্রে চলচ্চিত্র আন্দোলনের খবর তাদের কাছে পৌঁছোচ্ছে; National Film Archive-এ বাংলা চলচ্চিত্র সম্পর্কিত ব্যবহার্য দলিলপত্র ব্যবহারের সুযোগ তারা পাচ্ছে। এমন কি তারা স্বল্প দৈর্ঘ্য ছবি তোলার সুযোগ পর্যন্ত পাচ্ছে। ফলে তাদের শিক্ষা এখানকার তুলনায় অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ এবং স্বাবলম্বী।

বঙ্গ।। বাংলা দেশে তাহলে পূনা ইনস্টিটিউটের মতো একটি প্রতিষ্ঠান দরকার। বাস্তবে কি এমন কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা সম্ভব?

সেন।। আমার মনে হয় না যে এ ধরনের দুটো প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ভারতে সম্ভব।

বঙ্গ।। বাংলা সিনেমার মান উন্নয়নে স্থানীয় ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের কি কোন ভূমিকা আছে?

সেন।। বাংলা সিনেমা সাময়িকভাবে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের ফলাফলে মোটেই প্রভাবিত হয়নি। আসলে ব্যবসায়িক সিনেমা মহল ফিল্ম সোসাইটি মহল সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করে। তার কারণ অবশ্য পারস্পরিক। একদিকে ব্যবসায়িক সিনেমা সম্পর্কে ফিল্ম সোসাইটি মহলের একটি সহজাত ঘণা আছে। ফলে ব্যবসায়িক সিনেমা মহল আত্মবশ্বার সহজাত তাগিদে দূরত্ব বজায় রেখে চলছে এবং একধরনের inferiority complex-এ ভুগছে। বাস্তবগতভাবে কিন্তু এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকার দরুন বিশেষ উপকৃত হয়েছি।

বঙ্গ।। ফরাসী 'নুভেল ভাগ' বাংলা-দেশের সিনেমা এবং সিনেমা পরিচালকদের ওপর আদৌ কোন প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়েছে এমন কোন প্রমাণ দৃশ্যতঃ পাওয়া যায় নি। আপনি কি এ বিষয়ে একমত?

সেন।। ফরাসী 'নুভেল ভাগ' এবং সাধারণভাবে কয়েকটি ইয়ুরোপীয় ছবি একেই দেখানোর ফলে কোন কোন বাংলা ছবির আঙ্গিকে বিশেষভাবে সম্প্রদায় বাহুল্যবর্জন এবং smartness দেখা গেছে। কিন্তু বাংলা ছবির মূলে অচল অনড় চরিত্রের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। এক্ষেত্রেও আবার বাস্তবগতভাবে আমি এই সমস্ত ছবির ম্যারা অনুপ্রাণিত হয়েছি। এমন কি emotionally moved হয়েছি। এই সমস্ত ইয়ুরোপীয় ছবিতই আমি লক্ষ্য

করেছি সিনেমার ডাইমেনশান কিভাবে বেড়ে যাচ্ছে।

বঙ্গ।। নিও-রিয়ালিজম সম্পর্কে আপনার মত কি? নিও-রিয়ালিজমের সম্ভাবনা কি ইতিমধ্যেই নিশ্চিত নয়?

সেন।। নিশ্চিত? Neo-realism has completely floored me. আমি নিও-রিয়ালিজমের সংজ্ঞা নির্ধারণের জটিলতার মধ্যে ঝেঁতে চাই না। কিন্তু নিও-রিয়ালিজমের প্রবক্তারা বিশেষভাবে জাভাভিনি যেভাবে শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন তাতে আমি কখনই ভাবতে পারি না যে এর সম্ভাবনা নিশ্চিত হয়ে গেছে। আধুনিক জীবনের জটিলতাকেও নিও-রিয়ালিজম সঠিকভাবে ভাষা দিতে পারে। অনেক আত্মিক বস্তুবতার প্রসঙ্গ তুলে থাকেন, কিন্তু আমার কাছে আত্মিক বাস্তবতা সমাজ বাস্তবতারই একটি অঙ্গ।

বঙ্গ।। সমালোচকদের ভূমিকা সম্পর্কে আপনার কি মত? আপনি কি সমালোচকদের মতামতে প্রভাবিত হন?

সেন।। এ বিষয়ে আমার মতামতটা খুব সোজা। যে সমালোচক আমার ছবির প্রশংসা করেন তাকে আমি খাতির করি এবং যে সমালোচক তা করেন না তাকে অনেকটা করুণভাবেই এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। শেষ পর্যন্ত হয়তো একটা রফা হয়ে যায়, যদিও ব্যক্তি অনুসারে ভগ্নাটী পাট্টার।

বঙ্গ।। বাংলা সিনেমার বিশেষ কোন রীতি বা ভগ্নী কি আছে আপনার মতে? অর্থাৎ: Bengali School of film making বলে কোন কিছু অস্তিত্ব কি আছে?

সেন।। না, এমন কোন কিছু অস্তিত্ব আজ নেই এবং কোনকালে ছিল না। পথের পাঁচালীর পরে একটা আবহাওয়া তৈরী হয়েছিল তবে সেটা আজ বেতে কমেছে। তবে সাধারণ দর্শকের মনে ছবির গুণাগুণ মান সম্পর্কে একটা প্রত্যাশা রয়েছে যেটা পথের পাঁচালীর সময় ছিল না। কিন্তু এক্ষেত্রেও একটা অগ্রে বলা ঘটনাটির মতো দেখেছি যারাপ, শূন্যে ছবি তোলার মনোভাব কাজ করেছে।

বঙ্গ।। বর্তমান বাংলা সিনেমার অভিনয় রীতি সম্পর্কে আপনার মতামত কি? অভিনয় রীতিতে বিশেষ কোন প্রবণতা কি লক্ষ্য করা যায়?

সেন।। কিছুদিন আগে পর্যন্ত বাংলা সিনেমার অভিনয়ে রঙ্গমঞ্চের প্রভাব খুব বেশী ছিল যা প্রায়শই শূন্যতর নয়। কিন্তু সম্প্রতি একটা পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। এই পরিবর্তন তাদের দিক থেকে এসেছে যারা সরাসরি সিনেমায় নেমেছেন। তাদের প্রভাব অন্য সকলের মধ্যেও ছড়িয়ে যাচ্ছে। এদের মধ্যে মাধবী এবং সৌমিত্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দুজনের অভিনয়

অনেক কম পরিমাণে শারীরিক, অনেক বেশী পরিমাণে অন্তর্মুখী এবং সার্বজনীন।

বঙ্গ।। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, সৌমিত্র বা মাধবী ইত্যাদি নতুন দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সিনেমায় এসেছেন সত্যিই রায়, স্বত্বিক ঘটক, তপন সিংহ কিংবা আপনার মাধ্যমে। অর্থাৎ এদের সাফল্যের অন্যতম কারণ হল এই যে, এরা চলচ্চিত্রের বৈশিষ্ট্যকে পুরোপুরি বোঝেন এমন পরিচালকের অধীনে শিক্ষালাভ করেছেন।

সেন।। কথাটা এই—এদের সাফল্যের অন্যতম মূল কারণ হল এই যে, এরা একটি বাস্তব পরিবেশে গড়ে উঠেছেন।

বঙ্গ।। বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ কি আপনার মতে সংকটপূর্ণ নয়?

সেন।। খুবই সংকটপূর্ণ। একে অনিশ্চিত। তবে দুর্ভাগ্যজনক আছেন তাদের প্যাশান এবং ধৈর্য অপারিসীম। এদের আপনি incorrigible dreamer বলতে পারেন। এবং এদের জন্য বাংলা সিনেমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা রাখুন।

বঙ্গ।। রঙীন ছবি সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

সেন।। রঙ সম্পর্কে আমার অ্যালার্জি আছে। রঙকে আমি মেনে নিতে পারি নি—যদিও সম্প্রতি একটি রঙীন ডকুমেন্টারি করছি।



কুমারী মঞ্জু বোস

সূর ও সঙ্গীত পরিচালনা—কালীপদ সেন
কথা : পুলক মজুমদার
এবার শারদীয় পত্রের রেকর্ড, ১৯৬৭

- (১) গ্যাংগার গ্যাংগার গ্যাংগা, ঘুম পাড়ানি গান।
- (২) মাগো আমায় বোকাছো কেন।
- কুমারী মঞ্জু বোস সম্প্রতি কয়েকটি বাংলা ছবিতে গান গাইয়াছেন এবং গত বছর পুজাতে রেকর্ড করিয়াছেন।
- (১) তাক দুমদুম বাদি বাজে
- (২) কুমকুম তুলতুল খালি গাল দেয় (ছড়া গান)

কল্পে রঙকে যেনে নেওরতে, অসুবিধে কোথায়?

সেনা। আমি জানি যে রঙে শিল্পীর আত্ম-প্রকাশে নতুন ধরনের সব উপাদান এসে দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক শিল্প-প্রদর্শনীতে 'আল' কখনও সাদা কখনও কালো। কিন্তু শিল্পসৃষ্টির প্রথম সতাই হল শিল্পব্যবস্থার সঙ্গে শিল্পীর একটি অন্তর্গততা বোধ। রঙের ক্ষেত্রে আমি অন্তর্গততা বা আন্তর্গতভাবে involved বোধ করি না। নিজেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করি। সেই কারণে রঙীন ছবি সম্পর্কে আমার উৎসাহ কম।

বন্দ্য। ভারতীয় সেন্সরশিপকে অনেকেরই নীতিবাগীশ বলে অভিহিত করে থাকেন। আপনি কি এবিষয়ে একমত?

সেনা। ভারতীয় সেন্সর বোর্ডকে নীতি-বাগীশ না বলে শুচিব্যবস্থার হিন্দু বিধবার মনোভাবসম্মত বলা উচিত। তবে বর্তমানে পরিবর্তনের কিছু লক্ষণ প্রধানতঃ বিদেশী ছবির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে। আশা করি ভবিষ্যতে সেন্সর বোর্ডের মনোভাব আরও বাস্তব এবং rational হবে।

বন্দ্য। ভারতীয় সিনেমার চুম্বন কি অনুমোদিত হওয়া উচিত নয়?

সেনা। হ্যাঁ, উচিত। বাস্তব জীবনে চুম্বন যেমন গোপনে ঘটে প্রেম নিবেদনও তেমনি গোপনে ঘটে। সুতরাং প্রেম নিবেদন যদি সিনেমার অনুমোদিত তবে চুম্বন নয় কেন? অবশ্য মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের কতটা আমরা সিনেমায় পর্দায় দেখাব সে বিষয়ে পরিমিতবোধের প্রশ্ন অবশ্যই আছে, কিন্তু চুম্বন দেখাতে কোন বাধা নেই। সেন্সর বোর্ড যে নৈতিক প্রশ্ন তুলে থাকেন তা ঠিক নয়। চুম্বন মানুষের অধিকৃত জীবন-ধারার একটি অঙ্গ, সুতরাং অনৈতিক নয় কোনোমতেই।

বন্দ্য। আপনি আপনার সাম্প্রতিক ছবিটি ওড়িয়া ভাষায় তুলেছেন। বাংলা ছবি না করে ওড়িয়া ছবি করার পিছনে যে বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে সে সম্পর্কে কিছু বলুন।

সেনা। ওড়িয়া ভাষার ছবি তুলেছি বলে অনেকেরি ভুল করেন যে আমি বাংলা ছবির সঙ্গে সম্পর্ক বুঝি ত্যাগ করেছি। কিন্তু এমন ধারণা ঠিক নয়। বাংলা ছবির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করব কেন? আমার ওড়িয়া ছবি করার পিছনে একটি নাটকীয় ঘটনা রয়েছে। গত বছর একজন প্রযোজক আমার কাছে এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন আমি ওড়িয়া ভাষার ছবি তুলতে পারি কি না। আমার সঙ্গেই হল তিনি হয়তো আমার অতীত সম্পর্কে কিছু জানেন না। আমি তাকে বললাম, "আমাকে দিয়ে ছবি করতে চান কেন? আপনি কি জানেন যে পরিবেশকদের মতে আমার সাতখানা ছবির ছথানাতে লক্ষী টাকা পুরোপুরি ফিরে আসেনি?" তিনি আমাকে বিস্মিত করলেন। বললেন যে তিনি জানেন যে ব্যবসা এবং শিল্প হাত ধরাধরি করে চলে না এবং তাঁর আকাঙ্ক্ষা একটি শিল্পসম্মত ছবি করার। তিনি আমাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেন। একমাত্র সত্য ছিল এই যে ছবিটি করতে হবে কালিন্দী-চরণ পাণিগ্রাহীর সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার বিজয়ী উপন্যাস "মাটির মানুষ" অবলম্বনে। উপন্যাসের ঘটনা-কাল তৃতীয় দশকের শেষভাগ। তিরিশের বৃগ, বিশেষভাবে তিরিশের বৃগের শেষভাগ চিরকালই আমাকে টানে। সুতরাং আমি রাজী হয়ে গেলাম। অভিজ্ঞতা বা ছিলো তা পাছাড়প্রমাণ। ছবির মধ্যমটিকে যেন আরো পরিষ্কার বুঝতে পারছি।

আমার প্রশ্ন করা শেষ হয়েছে। ভাষার জন্যে অনেককণ সময় ব্যয় করার জন্যে প্রীতেন্দ্রকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যখন বিদায় নিলাম বাইরে তখন মহা-সমরোহে সন্ধ্যা নামছে।

—অজয়কুমার বন্দ্য

ভালোবাসার একটি কবিতা



অন্যান্য চরিত্রে : অসীমকুমার : তরুনকুমার : কান, রায় : কেওট মৃধাজী
সাহিত্য সম্পাদক : পদ্মা দেবী : ভারতী দেবী : সুরেশা : চণ্ডিমা ভাস্করী :
গানে : কিশোরকুমার : রায়, মৃধাজী : হেমন্তকুমার : নীলিমা চ্যাটার্জী :
সম্পাদনা : অমিত মৃধাজী : চিত্রগ্রহণ : কানাই দে

শুভমুক্তি শুক্রবার ২৯শে সেপ্টেম্বর
মিনার : বিজলী : ছবিঘর ও অন্যত্র

বাংলা ছবির বিষয়ে ঋত্বিক ঘটক

“গত তিরিশ বছরের মধ্যে বাংলা ছবির দৃষ্টান্তগত বৈশিষ্ট্য রদ-বদল হয়েছে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে সব পরিবর্তনই যে সব সময়ে ভালর দিকে হয়েছে তা বলা চলে না। শৃঙ্গ-প্রবর্তনকারীদের ভেতর প্রথম পথিকৃৎ হলেন প্রমথেশ বড়ুয়া। ‘অধিকার’, ‘গৃহদাহ’, ইত্যাদি ছবির মাধ্যমে তিনি যে শৃঙ্গ-বিস্ময়-কর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন তা নয়—একটা বিরাট সম্ভাবনার পথনির্দেশও দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী যুগে, বিশেষ করে যুদ্ধের সময়ে, সে পথচিহ্নকে অনুসরণ করার মত পরিচালকের অভাবে সে সুযোগ প্রায় নষ্টই হয়ে গেলে বলা চলে। বিমল রায় অবিশিষ্ট ‘উদয়ের পথে’ ‘অজ্ঞানগড়’ ইত্যাদির মারফৎ সেই হারানো পথটা আবার খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছিলেন—কিছুটা সার্থকও হয়েছিলেন, একথা নিশ্চিত। এরপর থেকেই বাংলা ছবির একটানা অবনতি শুরু।

‘শেষ কিছুদিন এভাবেই কেটে গেল। ১৯৬৬ সালে অত্যন্ত আকস্মিকভাবে সত্যজিৎ রায়ের ‘পথের পাচালী’ আবির্ভাব হল। শুরু হলো আর এক উত্থান। সত্যজিৎবাবু এবং আরো কয়েকজন আদর্শবাদী পরিচালক বাংলা চিত্রক্ষেত্রে এক নতুন ধারা এবং প্রাণ সঞ্চার করার চেষ্টা করলেন। তার ফলে কিছু কিছু কাজ হল। পৃথিবীর বর্তমান ছবির জগতের দিকে তাকালে বা তুলনা করলে সেটা নগণ্যই বলা চলে। ‘মুহুর্ত’ ‘মিছা নাচানাচি’ করার মত কিছুই ঘটেনি। তবুও তাই নিয়ে কত না চায়ের কাপে তৃপ্তি উঠলো! অবিশিষ্ট একথা মানতেই হবে যে আমাদের দেশের তুলনায় এসময়ে কিছুটা কাজ-কর্ম হয়েছে বৈকি।”

কথাগুলো বলছিলেন বাংলা দেশের অন্যতম সার্থকনামা পরিচালক ঋত্বিক ঘটক। যুদ্ধ হয়েছে কথাগুলি শুনছিলাম। গতিভঙ্গি হল চায়ের কাপের আবির্ভাব। এক চুমুক দিয়েই প্রশ্ন করলাম—“তারপর?”

“এরপর বাংলা ছবি ক্রমশই নিচের দিকে তলিয়ে যাচ্ছে। জানি না এই নিম্নগতির শেষ হবে কবে! কোথাও এতটুকুও আশার আলো দেখছি না। শব্দ মেরুদণ্ডওয়ালা একটি ছেলেও দেখছি না, যে এসে বুক পেতে দাঁড়াবে প্রতিরোধের ভিগমায়। এর চাইতেও বড় হতাশা—বড় ট্রাজেডি হচ্ছে এই যে, যারা একদিন বুক ঠেকে পায়তারা মেরে করেছিলেন, যা কিছু জীর্ণ, দীর্ঘ, যা কিছু সনাতন, পুরাতন সংস্কার আমাদের অগ্র-গতির পথরোধ করে বসে আছে, তার বিরুদ্ধেই আমাদের আপোষহীন সংগ্রাম। এর জন্যে বা কিছু মূল্য দিতে হয়—দেব-চোখের সামনে দেখলাম তাঁরা একে একে নিজেদের বিক্রী করে দিলেন সনাতনী

গতানুগতিকতার কাছে। নিজেদের মনুষ্যত্বকে বিক্রিয়ে দিয়ে জোর গলায় জাহির করে বেড়াচ্ছেন—এটাই নাকি বিধিগোষ্ঠী!”

“আপনিও তো তাঁদের ভেতর একজন ছিলেন। আপনিও কি আজ তাঁদের মত রণক্লান্ত—সম্মতপ্রাণী?”

“না। বরঞ্চ এমনতর হারের খেলার তাঁদের সঙ্গে যোগ দিইনি বলেই আজ আমি অপারেশন—আজ আমি তাঁদের কাছে মৃত-মান বিভীষিকা।”

“বিচ্ছেদটা কেন হল? সেটা কি এতই দুরতিক্রম্য?”

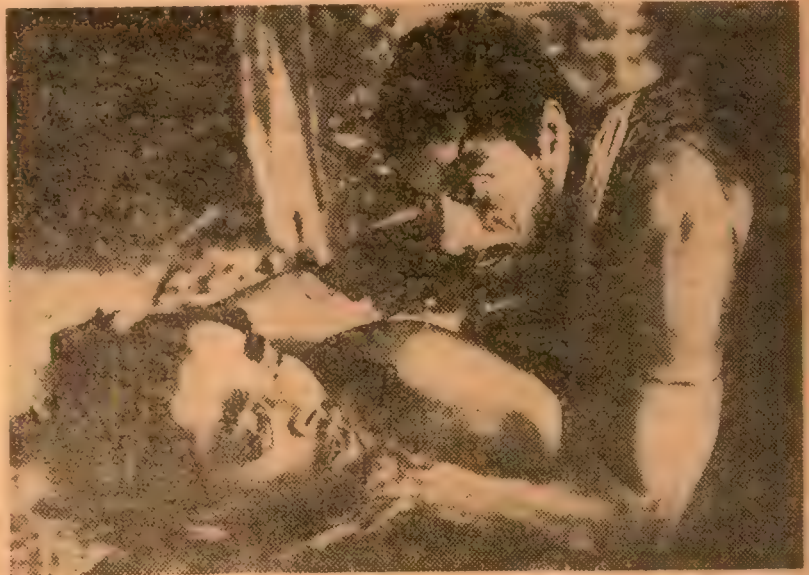
“হ্যাঁ! তাঁদের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে গেলে আমার সমস্ত বিশ্বাসের মূল উপড়ে ফেলতে হবে। বিশেষ করে আমার নিজস্ব আদর্শের ভিত্তিকে অস্বীকার করতে হবে। আমি জগতটাকে দেখি একটা বিশেষ দৃষ্টি-ভঙ্গিতে। তার সঙ্গে সবাই যে একমত হবেন সে আশাও করি না—প্রয়োজনও বোধ করি না। তাঁরা তাঁদের চিন্তা নিয়ে থাকুন, আমি আমার চিন্তা নিয়ে থাকবো। কিন্তু শত্রু হোক, মিত্র হোক, এমন কি তৃতীয় পক্ষও যদি হয়, একটি বিষয়ে আমি বড় নির্দিষ্ট—সেটি হচ্ছে ‘মানুষের’ বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা। যখন ছবি দেখে বুঝতে পারি লোকটা মানুষকে ভালবাসে না—মিথ্যা ভাবনার করে আসরাত করছে, সেক্ষেত্রে কমা করা দূরে থাক—কোনরকম আপেক্ষ-পন্থী মনোভাব প্রদর্শনেও আমি নারাজ। কিছু কিছু শক্তিশালী কর্মী এখন তাঁদের শক্তিকে ব্যবহার করছেন মানুষের বিরুদ্ধে এমন সন্দেহও আমার আছে তাঁদের সম্পর্কে।”



অভিনেত্রী সীমালতী রায়

“যে মানুষের কথা ভেবে আপনি উত্তেজিত, সেই মানুষের দলই কি তাঁদের পুষ্পোষকতা করছে না? আপনার ছবির সম্পর্কে শোনা যায় যে, বেশীর ভাগ ছবিই অর্থনৈতিক সাকল্যাভ্য করেনি। অযাচিতক, মেঘে ঢাকা তারা, সুবর্ণরেখার মত ছবি যে পরিচালক উপহার দিয়েছেন, তাঁর তো ইতিমধ্যে আরো অনেক ছবি তৈরী করার সুযোগ ছিল। সেই হিসেবে তো আপনার কাজ হচ্ছে না!”

“অস্বীকার করবো না যে, ইতিমধ্যে গড়-পত্রতা যতগুলি ছবি তৈরী করা আমার উচিত ছিল—তা করে উঠতে পারিনি। অর্থ-নৈতিক সাফল্যের অভাব কিছুটা দারী হলেও আসল কারণ সম্পূর্ণ অন্য। এর সঙ্গে অনেক সমস্যা জড়িত হয়ে আছে।



পান্না চিত্রে শম্ভু মিত্র ও বিনয় গুপ্ত

তবুও প্রতি পদে পদে যে সমস্যার কথা থেকে সবচেয়ে বেশী বাধা পেরেছি সেটা হচ্ছে চিত্র-ব্যবসায়ের মধ্যে জড়িত বিশৃঙ্খলা এবং প্রজ্ঞাবাহী বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তির আমার প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণ। কারণ অন্যান্য অনেক পরিচালকের মত আমি আমার কাজের ব্যাপারে কোনো হুকুমও মেনে চলি না। কিন্তু কারো কাছে নতিও স্বীকার করি না। তাই আমাকে অপারেশন করে তোলায় ব্যাপারে এঁদের কারসাজির সীমা নেই। আরো যজ্ঞের ব্যাপার এই এঁদের মধ্যে বেশ দিয়েছেন আমার এমন করেকজন সহকারী, বঁদের সঙ্গে মিলে আমরা এক-সংগ্রামে মেয়েছিলাম।”

“এটা কেন হল? এই ধরনের মনো-বৃত্তির মূলে একমাত্র হিসেব ছাড়া তবু কিছুই তো আমি দেখি না।”

“কিছুটা যে ভা নর একথা কলা চলে না। তবে তার চাইতে বেশী যেটা আমার মনে হয়, সেটা হচ্ছে এই যে, তাঁদের নিজস্বের আত্মশাসনের প্রথম পর্য্যক আমি। তাঁদের সঙ্গে মিলে আমিও কেন নিজের লাজ মড়িয়ে দলে ভিড়লাম না—এটাই হচ্ছে আমার প্রতি তাঁদের বিবেকের কারণ।”

“আপনার অভিযোগটা যে নিছক কল্পনা নয়—এসম্পর্কে আপনি কি নিশ্চিত?”

“হ্যাঁ। জন্ম সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, আমি যাতে কোন ছবির পরিচালনা না পাই তাই নিয়ে তাঁদের গোপন কার্যকলাপের শেষ নেই। আমার প্রতিটি কার্যসূচী—প্রতিটি পদক্ষেপকে এঁরা মজবে রাখেন। এবং আমার অবর্তমানে গিয়ে ছবি প্রযোজক বা ডিস্ট্রিবিউটারদের কাছে এমন সমস্ত অভিযোগ করে আসেন যাতে তবুও সব পরিচালনা ভেঙ্গে যায়।”

“আপনার বিরুদ্ধে কি ধরনের অভিযোগ সাধারণত এঁরা প্রচার করেন?”

“আমি নাকি মাতাল! চম্পক বন্টাই হবে ভুবে আছি—তাই ছবি হাতে নিয়ে সে ছবি শেষ করার মত ধৈর্য বা ক্ষমতা আমার নেই। হাসিও পায় লজ্জাও করে। আমার বিরুদ্ধে যদি অভিযোগ করেন, আর যদি সে অভিযোগ সত্যি বলে মনে নেন, আমরার বিরুদ্ধে এই যে, তাঁদের সঙ্গে আমার ঢকাটো হচ্ছে—আমি খোলাখুলিভাবে চলি, আর তাঁরা চম্পকবান পুরুষ তাই সবকিছুই তাঁদের অপকায়। তাছাড়া লামার লক্ষ্যের হুচি বা চাহিদা অনুযায়ী ছবি করার লোক আমি নই। অর্থাৎ অর্থ-নৈতিক সাফল্যাত্মক ফন্ডামেন্টাল ছবি আমি করতে অক্ষম—এ অভিযোগটাই বেশী শোনে যায়।”

আবহাওয়াটা একটু ভারী হয়ে আসছে দেখে অন্য প্রসঙ্গ অবতারণা করলাম।

“অজ্ঞা। বর্তমান বাংলা ছবির মধ্যে আপনি কি কোন আশাবাদ বা উল্লেখযোগ্য বিশেষণ দেখতে পান?”

“উল্লেখযোগ্য কিনা বলতে পারছি না, তবে আমার কাছে বিশেষ প্রীতিপ্রদ মনে হচ্ছে দু-একটি বিষয়।”

“যা?”

“এই যখন না বর্তমানে চিত্র-পরিচালকদের মধ্যে একটা কাফাকাড়ি পড়ে গেছে মিউজিক-ডাইরেক্টর হবার। ভাবতে অবাক লাগে কি করে তাঁরা তাঁদের দাঁড় পালন করেন। চিত্রনাট্য-পরিচালনা-সম্পাদনা এই তিনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের প্রতি পরিচালকদের সর্বক্ষণ কড়া নজর রাখতেই হয়। এর উপরে অতিরিক্ত সংগীতের দাঁড়কেও নিজের বলে গ্রহণ করা উচিত কিনা সে প্রশ্নের উত্তর খুব অস্পষ্টভাবে ভেতরই পাওয়া যাচ্ছে।”

“হয়ত উপযুক্ত সংগীত-পরিচালকের অভাব চিত্র-পরিচালকরা বড় বেশী ঘোষ করছেন।”

“কথাটির ভেতর কিছুটা সত্যি আছে আমি মানছি। চলচ্চিত্র-সংগীতের নিজস্ব একটা ভাগ আছে—সাধারণ পায়ে-চলার পায়ে তার অনাগোনা নয়। চলচ্চিত্র-সংগীত নিয়ে আমাদের দেশে গভীরভাবে অনুধাবন মোটেই হয়নি। বা অনুধাবন করার মত সুযোগ-প্রযুক্তি বা দৃষ্টিভঙ্গি-সম্পন্ন লোকের আগমন ঘটেনি। প্রায় সমস্ত সংগীত-পরিচালকই সম্ভ্রান্ত কিশতিমাতের পক্ষপাতী। চলচ্চিত্র-সংগীতের যে একটা নিজস্ব দাবী আছে তাই নিয়ে কেউ মাথা ঝামালনি বা বামতে রাজী নন। এর ফলে সাধু-কিনারা সংগীত-পরিচালক সৃষ্টি আজও সম্ভব হয়নি। চিত্র-পরিচালকদের উপরেই সংগীতের ব্যবহার নির্ভর করে। তাই যখন উপযুক্ত সংগীত-পরিচালকের অভাব দেখা দিল—অতিরিক্ত বাহাদুরী পাবার লোভ লম্বালানো পরিচালকদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠলো না।”

“এমন তো হতে পারে যে সেবিষয়ে তাঁরা অনভিজ্ঞ নন। শুনেওছি এঁদের ভেতর অনেকেই সংগীতের গভীরতা সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়ার্কবাল।”

“চিত্র-সংগীতের নামে তাঁরা বা করেন সেটা কহতব্যও নয় প্রকাশিতব্যও নয়। চিত্রসংগীতের দাবীকে মেটানো বর্তমানের অনেক পরিচালকের পক্ষেই সম্ভব নয়। অবিশ্যি এটা আমার ব্যক্তিগত মত। এই বিষয়ে অনেকেই বিরুদ্ধমতও পোষণ করতে পারেন। তবে আমার মনে হয় এটা এক ধরনের বুকরুচি ছাড়া আর কিছুই নয়।”

“মতামতটা একটু তাঁর হয়ে যাচ্ছে না কি?”

“যাইরে থেকে হয়ত তাই মনে হবে। কিছু ভেতরকার অনেক ব্যাপার আমাব জানা আছে বলেই সেবিষয়ে তাঁর হস্ত বিধা করছি না।”

“যদি কেউ প্রমাণ দাবী করেন?”

“সেই গ্যালেজের উপযুক্ত উত্তর দেবার মত মাল-মসলা আমার মজুত আছে বৈকি! থাকলে সে সব কথা আসল কথাটা হচ্ছে এই চিত্র-সংগীত সম্পর্কে খাটো-খাটুনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা একান্তই প্রয়োজনীয়। সেটা একেবারেই হয়নি ধা এখনও হচ্ছে না। যেদিন সেটা আন্তরিকতা নিয়ে আরম্ভ হবে সেদিনই জানবেন বাংলা

ছবির বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা দিকের মোহমোহি ঘটছে।”

প্রসঙ্গগুলিকে একটু হালকা করবার ইচ্ছার কথা মোড় ফেরালাম। জানতে চাইলাম যম্বের চাকুর-জীবনের কথা—পুনর ফিল্ম ইনস্টিটিউটের কথা। একটু-খানি বিবাদের হাসি হেসে উত্তর দিলেন ষাণ্ডিকবাবু।

“আমি জানি আপনার প্রশ্নের আড়ালে আছে একটি প্রশ্ন লুকিয়ে আছে। আপনি তো জানেন আমি ফ্রাট-বেলা থেকেই অস্থিরমতি। কোন একটা বিষয়কে আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকবো সে আমার কপালে লেখা নেই। তাই বাধা-ধরা চাকুরি যখনই করতে গেছি তখনই কিছুদিনের ভেতর হাঁকিয়ে উঠছি। মতি চেরে ছ—মতি পেতে গিরে কত-বিকত হয়েছি। প্রচুর ক্রটিগুস্তও হয়েছি নানা-ভাবে। তবুও সেই সর্বনাশা উপগ্রহের হাত থেকে মতি পেলাম না।”

“কি সেই উপগ্রহ?”

“অস্থিরতা। কিছুতেই পারলাম না নিজেকে একটা বাধা-ধরা চলতি পাথর যাত্রী করতে। লোকে বলে আমার চরিত্রের নাকি সেটাই প্রধান দোষ। এটা কাটিয়ে উঠতে পারলেই নাকি বিরাট কিছু একটা করার সম্ভাবনা এখনও আমার আছে।”

“আমারও তাই ধারণা। আপনি পারবেন—নিশ্চয়ই পারবেন এ বিশ্বাস আমার আছে, শুধু যদি একটু সামলে চলেন।”

আমার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটা ব্যতীত ৬৭৪ দেরি হল না। ছেলেমানুষের মত প্রাণ-থলে হাসতে লাগলেন। হাসির খোর খানিকটা কাটিয়ে নিয়ে বললেন—“বাঁচবো কি নিয়ে, চারিদিকে শুধু হতাশা—বিশেষ প্রতারণা, বঞ্চনা। যে প্রিয় কব্জীর নিয়ে মহান সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলাম একদিন—তাঁরা যে শুধু আমাকে নিরাশই করেছেন তা নয়—তাঁরা আজ শত্রুতাও করছেন।”

উঠে দাঁড়ালেন ষাণ্ডিক বটকও। বললেন, “আমি জানি আমার দোষ-গুণের কথা। আমি জানি আমার অপবাদের কথা। তবুও একটা কথা আজ আপনাকে আমি জানিয়ে রাখি, আমি আজও মরে বাইনি—আমি আজও হারস্বীকার করিনি। আমি নীরবে সে সুযোগের অপেক্ষায় আছি। আজ না পায় কাল—কাল না পায় পরশু—আমি প্রমাণ করে দেব আজও আমি সংগ্রামী মানুষের পাশে এসে দাঁড়াবার ক্ষমতা রাখি। তাদের আমি কুলে বাইনি। অভাব-অনটন-অপবাদ কিছুই আমাকে পথভ্রষ্ট করতে পারবে না—তার জন্যে যে মূল্যই দিতে হয় আমি দিতে প্রস্তুত। মরবার আগে আমি প্রমাণ করে দিবে যাবো আমার চারপাশের জনতার চাইতে আমি অন্যরকম।”

—সত্যরত দে

বাংলা ছবি ও তার শিল্পী

১৯৪২ সালে উদয়ের পথে ছবিতে ভূমিকা গ্রহণেই আমার চিত্রজগতের সংগে প্রথম পরিচয়। ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৪৬ সালে।

তখন পরাধীন দেশ স্বাধীনতার আন্দোলনে বহুদূর এগিয়ে এসেছে। সমগ্র দেশ সেই সচেতনতায় উদ্বেগিত। এদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের নেওয়া অসংখ্য বিড়ম্বনা জাতীয় জীবনের শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে দিয়ে গেছে অপারিসমী শ্লানি। নানা দিক থেকে নৈতিক জীবন হয়েছে নিষ্কর, রাজনৈতিক জীবন স্পন্দনহীন।

এই অপজাত আবহাওয়ায় আত্মদ হিন্দ ফেজের মুক্তি-আন্দোলন এল ঝটকা এক ঝড়ের মত। অনেক শ্লানি আর জড়তাকে উড়িয়ে নিয়ে এক বাকুনিতে সমগ্র দেশটাকে যেন সজাগ করে তুলল।

জাতীয় জীবনের এই বিমিশ্র পটভূমিকায় যে কোনো শিল্প, সাহিত্য সে সময় সচেতনভাবে স্ব স্ব গরিমায় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। আমরা দেখতে পাই, কাব্য, অঙ্কনচিত্রে, সাহিত্যে এবং চলচ্চিত্রেও—সবত্র পরাধীনতার শ্লানি-মুক্তির, অবদমিত মানবজীবনের আত্ম প্রতিবাদ সৈনিক সোচ্চারে প্রকাশিত হচ্ছে।

চলচ্চিত্রজগতের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই নিউ থিয়েটার্স প্রতিষ্ঠানের কণ্ঠধার শ্রীযুক্ত বি এন সরকার মহাশয় ব্যবসার দিকের সাফল্যকে খুব একটা বড় স্থান রাখেনি। বহু গুণীর সমাবেশ পরিচয় ভাল ভাল ছবি জনগণের সামনে বার বার ধরে দিয়েছেন, যা দেখে দর্শক মুগ্ধ হয়েছেন। শূন্য তাই নয়, গতিত-গোষ্ঠী-বন্ধ থেকে, ব্যবসায়িক মনোভাব নিয়ে নতুন সম্পর্কে ভীত হওয়া দূরের কথা, নতুন নতুন গুণী জ্ঞানী আগ্রহী কর্মীকে ধাক্কা দিয়ে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে তাঁর স্বাভাবিক অবস্থাই ছিল। এ না হলে, পরিচালক হিসেবে শ্রীবিমল রায়ের পক্ষে নতুন কাহিনীকার, কৃত্তিবাদ্য নামক, সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা নায়িকা এবং আরও অনেক নতুনদের সমাবেশে উদয়ের পথে ছবিটি করা সম্ভব হতো না। চলচ্চিত্রজগতের ইতিহাসে যার সম্মানগত এবং অর্থকরী সাফল্যের প্রতি কোনোদিনই লুপ্ত হবার নয়। এই প্রতিষ্ঠানের বাংলা ছবিগুলির হিন্দী সংস্করণও একইরকম সাফল্যমণ্ডিত বলা যায়। এবং হিন্দীতে ছবি করার দরুন বাড়তি কোনো বাড়িবাড়ি বা অশ্লীলতার কোনোরকম প্রচেষ্টা ছাড়াই সেগুলি সফলতা লাভ করছিল।

দেশ স্বাধীন হল। দেশ ভাগ হল। বাংলা ছবির জগৎ আবশ্য হল একটি ছোট্ট দীর্ঘরেখার মধ্যে। যে কোনো কারণেই

হোক, হিন্দীর প্রচার যথেষ্টভাবে ছড়িয়ে পড়ল।

বাংলা ছবির জগৎ হল কোণঠাসা আর বাংলা পড়ার ছবিঘরগুলির অধিকাংশে হিন্দী ছবিতে ছেঁয়ে গেল। আজ থেকে পনেরো বছর আগেও হিন্দী ছবির এই দৌরাত্ম্যের কথা বা হিন্দী গানের এমন বহুল প্রচারের কথা কল্পনাই করা যেতো না। বাংলা ছবির পরিবেশক-প্রযোজক নড়ে-চড়ে উঠলেন—সম্মান চাই না, ভাল কিছুর দরকার নেই। হিন্দীর সংগে ব্যবসায়িক পাল্লায় দাঁড়াতে হবে। ইংরেজীর বিকৃত নকলে, ভাড়ামি আর অভ্যবতার আক্রমে হিন্দী ছবি দেখতে দেখতে দর্শকের মন মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। সেই তালে ভাল না দিলে বাংলা ছবির মৃত্যু।

সুতরাং এইরকম যখন চিত্র-ব্যবসায়ীদের অধিকাংশের মনোভাব তখন, বাইরের একটা আবরণ রেখে বাংলা ছবির ব্যবসা এখন কিছুকাল পটচিশালাভাবে চলছে বটে, তবে ধীরে ধীরে সে আবরণ যে ব্যবসায়িক প্রয়োজনেই খসে পড়বে এমন আশংকা

বিনতা রায়

অমূলক নয়। তাই বলে ভাল ছবি কি হচ্ছে না? হচ্ছে। সামান্য কয়েকজন পরিচালক আজও চেষ্টা করে চলেছেন। কিন্তু বেশির ভাগই তেমন তেমন সুযোগ পেলেই ছুটছেন বৈদেশ্যে।

তবে, সবচেয়ে আর্থিক টান পড়েছে বাংলার শিল্পী এবং কর্মীদের। কারণ, ছবি তৈরির সংখ্যা ধীরে ধীরে শূন্যের দিকে নেমে আসছে। গত তিন বছরের ছবির একটা সালাতামামি করলেই সে ভয়াবহ সত্যটা ধরা পড়বে। এদিকে চোখের ওপর বাংলার শিল্পী এবং কর্মীরা দেখছেন, বোম্বাই শহরে অর্থের বিপুল বলকানি। তাই গুণী শিল্পীরাও মাটির মায়া ছেড়ে ছুটছেন হিন্দী ছবির জগতে।

এতে ব্যক্তিগতভাবে তারা উপকৃত হচ্ছেন বৈকি! কিন্তু এর পরিণতিটা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে কোথায়? এটা কি একটা মস্ত ভাবনার বিষয় নয়? স্বাধীন রাষ্ট্র কি এত-বড় একটা শিল্পের মাধ্যমকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে কিছু করতে পারেন না একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে বা অমনি আর কিছুর মাধ্যমে? একদিন প্রতিভার স্বীকৃতির ফলে যারা প্রচুর পরিমাণে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন, আজ অনাদরে, সুযোগের অভাবে একে একে তারা বিস্মৃতির তলায় চাপ পড়ে যাবেন এবং বরণ করে নেন শূন্য দারিদ্র্য আর অবহেলা? স্বাধীন রাষ্ট্র অবশ্যই সে দুর্গতি ঠেকিয়ে এদের দারিদ্র্য গ্রহণ করবেন, এ-আশা নিশ্চয়ই দূরশাসন নয়!

প্রতিভাবান কিশোর নৃত্যশিল্পী
রূপশঙ্কর



রূপশঙ্কর। মাত্র এগার বছরের বালক নৃত্যশিল্পী। আসল নাম শ্রীঅরুণকুমার মিত্র। মাত্র তিন বছর বয়সেই তার নৃত্যের প্রতি অসাধারণ অনুরাগে আকৃষ্ট হলেন নৃত্যশিল্পী কাকা নির্মলশঙ্কর। প্রথম পাঠ শুরুর হল তারই কাছে। ধীরে ধীরে জম্বিকাশের দ্বারা বয়ে প্রতিভার স্ফূরণ হতে লাগলো। ভারতবর্ষের প্রতিটি দাসিক দর্শকের কাছে অভিনন্দন এবং স্বীকৃতি ধন্য হয়ে উঠলো এই বালকশিল্পী। অনন্যসাধারণ প্রতিভার বলে। এই অল্প বয়সেই প্রথমশ্রেণীর রাগপ্রদান নৃত্য কুশলী বলে তাকে স্বীকার করতে প্রচ্যাদ-পদ হল না দেশের গণ্যসমাজ। ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থানে নৃত্য প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে অভিনন্দন গ্রহণ করেছে এই বালকশিল্পী। স্বদেশের পারদর্শিতার খবর গিয়ে পৌঁছল—সাগরপার থেকে এল। সাদর আমন্ত্রণ—রাশিয়া ও আরারল্যান্ডের দিকে এবার বালকের নৃত্য-তীর্থ পরিভ্রম শুরুর হবে। লেখাপড়তেও পরাম্ভু নয় রূপশঙ্কর—শ্যামবাজার টাউন স্কুলের অর্থম শ্রেণীর ছাত্র সে। নাচ আর গড়ার বাইরেও রয়েছে তার অন্য জীবন—ভারত স্কাউট, সন্ডাউগ্যা ও সিসিওসে সভ্য। জবসর সমরে তার ছবি ছবি আঁকা, ফুলবাগান তৈরী, তবলা আর গীটার বাজান। ফুটবল আর ক্রিকেট খেলতেও বেশ সে ভালবাসে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নৃত্য-স্নাতক বিস্ববিজয়ী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে রূপশঙ্কর। নৃত্যচার্য মণিশঙ্করের প্রিয় শিষ্য রূপশঙ্কর। বর্তমান বীরহাটা নিবাসী শ্রীযুক্ত তারাপদ মিত্র মহাশয়ের পোটে। শ্যামবাজার নিবাসী অমলেন্দু মিত্র মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র। শ্রীমান রূপশঙ্করের বহুমুখী নৃত্য প্রতিভার একদিকে যেমন মণিপুরী, কথক ও ভারত নাট্যম সন্মায় অর্জন করেছে অন্যদিকে তেমন রবীন্দ্র-নৃত্য। বহু আসরে রূপশঙ্করের নৃত্য শূন্য সমাদৃত নয় উচ্চ প্রশংসায় প্রণয়িত হয়েছে। বহু প্রতিষ্ঠান থেকে সে পেয়েছে বহু মানপত্র ও পুরস্কার। সম্প্রতি শিল্প-স্বর্ণের এক মনোজ্ঞ আসরে রূপশঙ্করের নৃত্য-প্রদর্শনী দেখে বহু সংবাদিত শ্রীমানকে অভিনন্দন জানান। নৃত্যশিল্পী অতীন্দ্রনাথ বলেন 'অপূর্ব'। বাংলা তথা ভারতের খ্যাতি সারা বিশ্বের দরবারে হাজির করে ইতিহাসের পাতায় এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করবে বলে মনে হয়।

ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল প্রসঙ্গে

সত্যজিৎ রায়

ইউরোপে কোন ভারতীয় চলচ্চিত্র-নির্মাতার উপস্থিতির দৃষ্টি সম্ভাব্য কারণ আছে। হয় তাঁর কোন ছবি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে সেক্ষেত্রে তিনি উৎসবে আমন্ত্রিত অফিসিয়াল প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে যেতে পারেন—সাধারণত এক্ষেত্রে ছবির প্রযোজক এবং পরিচালক এবং এর দু-একজন প্রধান অভিনেতা-অভিনেত্রী গিয়ে থাকেন; অথবা যে অন্তর্জাতিক জুরী প্রতিযোগী চলচ্চিত্রগুলির ভাগ্য নির্ধারণ করে থাকে তার একজন সদস্য হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকতে পারেন। আমি এই উভয় কারণেই সেখানে গিয়েছি।

ইউরোপীয় উৎসবে প্রথম আমার ছবি দেখান হয় কানে ১৯৫৭ সালে। এ ছবি হল ‘পথের পাঁচালী’। অনিমন্ত্রিত বলে আমার তখন যাওয়া হয় নি। কিন্তু পথের পাঁচালী পুরস্কার পাওয়ার পর বৎসর আমাকে ভেনিসে আমন্ত্রণ জানান হয়। তখন থেকেই আমি মোটামুটি একরকম নিয়মিতভাবেই হয় বিচারক নয়ত বা প্রতিযোগী হিসেবে চলচ্চিত্র-উৎসবগুলিতে গিয়েছি। এযাবৎ প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যে দেওয়া আমার সাতখানির মধ্যে চারখানি ছবিই পুরস্কার লাভ করেছে এবং একথা ভেবে আমার আনন্দ হয় যে নির্ভুল দূরদর্শিতার জন্যেই এটা সম্ভব হয়েছে। যে তিনবার আমার ছবি পুরস্কার পায় নি সেই তিনবারই আমার অংশগ্রহণ করবার ইচ্ছা ছিল না।

থার্ড ডিগ্রি

যদি বিচারক বা প্রতিযোগী হিসেবে যাওয়ার মধ্যে আমার বেছে নিতে বলা হয় ত আমার পক্ষে সেটা সহজ হবে না। উভয় প্রকার অভিজ্ঞতার মধ্যেই একটা থার্ড ডিগ্রির ভাব আছে, আবার এর একটা প্রীতিপদ দিকও রয়েছে। আপনি যদি জুরীদের মধ্যে একজন হন, তবে আপনাকে সবকিছু প্রতিযোগী ছবিই দেখতে হয়। ভেনিসে এটা তত শক্ত নয় কারণ সেখানে থাকে ১৪টি ছবি এবং দেখবার জন্যে দু সপ্তাহের সময়। ’৬০ সালে মস্কোতে ছিল ৪৪টি পূর্ণাঙ্গিতন ফিচার ফিল্ম এবং ’৬২ সালে বার্লিনে ছিল ৩৫ খানি। অথচ সব বড় বড় উৎসবই সাধারণত দু সপ্তাহের বেশী হয় না। কম্পনা করুন যে, আপনাকে ১৪ দিন ধরে দৈনিক আট ঘণ্টা হিসেবে অশ্রুকার ঘরে ছবি দেখতে হচ্ছে। এর অধিকাংশই বিদেশী ভাষায়, যে ভাষা আপনাকে মাইক্রোফোনে অনুসরণ করতে হচ্ছে তার মধ্যে আবার আসল সাউন্ড ট্র্যাকের জন্যেও এক কান খোলা রাখতে হচ্ছে কারণ বিচারক হিসেবে সঙ্গীতকেও একটা প্রধান বিষয় হিসেবে বিবেচনা করতে হয় এবং সব

শেষে ছবিগুলির শিল্পমূল্যায়নের জন্যে বিদগ্ধ আলোচনার অংশগ্রহণ করতে হয়—সুতরাং বুঝতেই পারছেন যে, উৎসবের বিচারকের পরিস্থিতিটা ঠিক ঈর্ষার উদ্ভব করে না। অবশ্য কয়েকটি সত্যিকারের উচ্চ-দরের ছবি মাঝে মাঝে দেখা যায়—প্রত্যাশিত এবং অপ্রত্যাশিতভাবেই—এবং ছবিগুলি নিয়ে আলোচনার সময় জুরীদের মধ্যে পরিচালক, সমালোচক এবং অভিনেতাদের সঙ্গে যে ইন্টেলেকচুয়াল আলোচনা হয়—তা ভাল মন্দ বা মাঝারি যাই হোক না কেন, সেটি কতিপদূরণ হিসেবে গ্রহণ করা চলে।

কালো ঘোড়া

যদি প্রতিযোগী হিসেবে যান তবে সবকিছু ছবি দেখবার জন্যে আপনার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কিন্তু কোনটা দেখবেন আর কোনটাই বা বাদ দেবেন সেটা স্থির করা শক্ত হবে, কারণ যে কালো ঘোড়াটা শেষ পর্যন্ত বাজি জিতল সেটিকে বাদ দিতে নিশ্চয়ই আপনার ইচ্ছে হবে না; ফলে শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ ছবিই আপনাকে দেখতে হবে, অন্তত যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার ধারণা থাকবে যে এসব ছবিগুলো আপনার সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী। এমন কি কোন ছবির যদি শিল্পগুণ নাও থাকে, তার অন্য ধরনের কোন আকর্ষণ থাকতে পারে। আজকাল চলচ্চিত্র-উৎসবে শব্দনক্কের দৃশ্যের জন্যে ওৎ পেতে থাকা একটা খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে, লোকেরা দেখতে চায় কতখানি সোজাসজি উল্লেখ্যতা দেখান হয়েছে। বার্লিনে বছর দুয়েক আগে এ বিষয়ে প্রতিটি ছবিই মনে হল পূর্বগামীকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত উৎসব শেষ হবার তিন দিন আগে জাপানের অফিসিয়াল ছবিটি জনসাধারণকে দেখাবার এবং আরো গোপনীয়, পরের মুখে

ঝাল খাওয়ার মত ছবি, যার সঙ্গে পিকাসোর সেই বিখ্যাত যুগের আঁকা ছবি-গুলির নামের সাদৃশ্য আছে, তাদের উভয়ের মধ্যে শেষ বাধাটুকুও দূর করে দিলে।

যাই হোক, যদিও চলচ্চিত্র-উৎসবে যাওয়া ঠিক একটি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের ব্যাপার নয় তবু এর অনেকগুলি দিক আছে যা আনন্দের খোরাক যোগায় এবং অনেক অভিজ্ঞতাই লোকে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে শ্রবণ করতে পারে।

প্রথম বার্লিন যাত্রা

প্রথম বার্লিনে যাই ১৯৬১-তে, ফিচার ফিল্মের জুরী হিসেবে। এর আগে ব্রুসেলস এবং ভিয়েনাতে আমি জুরী হিসেবে ছিলাম কিন্তু এগুলো কোন উচ্চ-দরের উৎসব ছিল না, তাই বার্লিনের ব্যাপারে আমি আগ্রহী ছিলাম। যে সব ছবি দেখান হবে তাদের কথা আগেই শুনছিলাম এবং তাদের মধ্যে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ছবিও ছিল। যেমন আন্তোনিওনি, জাঁ-লুদক গদার এবং কুরো-সাওয়ার আধুনিকতম ছবি।

আমার চেয়েও লম্বা

এয়ারপোর্টে প্লেন থেকে নামতেই স্মিতমুখ মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তিনি বললেন তাঁর নাম হারবার্ট লুফত এবং জুরীদের দেখাশোনা করা তাঁর কাজ। মিঃ লুফতকে প্রথমেই তাঁর দৈর্ঘ্যের কথা জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন লম্বায় তিনি ঠিক এক মিটার ৯৯ সেন্টিমিটার, অর্থাৎ আমার চেয়ে পুরো পাঁচ সেন্টিমিটার লম্বা। কিন্তু লুফতের বিরাট দৈর্ঘ্যের পরিপূরক হিসেবে এক অতিমাত্রায় ভদ্রতার ভাব দেখা গেল যত মনে হল যেন তিনি নিজের এই একক শ্রেণী-ভুক্তির প্রতিক্রিয়া কিছু করতে অক্ষম হওয়ার দরুণ সর্বদাই ক্ষমাপ্রার্থী।

সংগোপনে

এয়ারপোর্ট থেকে শহরে গন্তব্যস্থলে গাড়িতে আলোচনা করতে করতে আমি লুফতের সিনেমা সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান এবং ভালবাসা দেখে আশ্চর্য হলাম। তিনি



মহাশ্বেতা চিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও অঞ্জনা ভোমক

বললেন, বালির্ম ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল শুরুর সময় থেকেই তিনি জুরীদের দেখা-শোনার কাজ করছেন। ফেস্টিভ্যালের আগের বিচারকদের চালচলন সম্বন্ধে অনেক মজার কাহিনী শোনালেন। আগের বছরের জুরীদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত আমেরিকান কমিডিয়ান হ্যারল্ড লয়েড। এই নমিনেশন গ্রহণের সময় লয়েড বলেছিলেন যে, চলচ্চিত্রের সঙ্গে তাঁর এখন বিশেষ যোগাযোগ নেই। ছবি দেখানোর সময় তাঁর হাবভাব দেখে পরিচালকরাই বোকা গেল যে, যোগাযোগ পুনঃস্থাপনের ব্যাপারে তিনি খুব বেশী উৎসাহী নন। তাই প্রতিমুহূর্তে কিম্বিরে পড়ার সময় প্রেসিডেন্টকে সপ্তোপনে একটু ঠেলে তোলার ভারটা লুকভের ওপরেই পড়েছিল—উৎসবের অগ্রগতির সঙ্গে এ ব্যাপার একটু ঘনঘনই ঘটে থাকে।

আমাদের জুরী সদস্যদের মধ্যে অবশ্য অতীত দিনের কোন খ্যাতিনামা ব্যক্তি ছিলেন না। এর মধ্যে বাঁরা ছিলেন তাঁরা হয় ছবি তৈরীর কাজে ব্যাপৃত—যেমন প্রযোজক ও পরিচালক নরত ছবি সম্বন্ধে লেখার কাজ করেন—যেমন একজন প্রাচীনতম এবং প্রমুখ্যাজন জাপানী সমালোচক উশিহারা—ইনি ছবি দেখাবার সময় বেশীর ভাগ ক্যাল লাইট পেন নিয়ে নোট বইয়ের ওপর খুঁকে থাকতেন, সমস্ত ছবিটি দেখার চাইতে তাত্ক্ষণিক প্রতিক্রিয়াটি ধরে রাখার জন্যেই তিনি বেশী উদগ্রীব ছিলেন। আমাদের আমেরিকান সহকর্মী ছিলেন পরিচালক নিকোলাস রে বিনি সামাজিক প্রতিবাদের ছবি তৈরী করে অনেকখানি প্রতিদ্বন্দ্বি নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন, কিন্তু অবস্থা-বৈগুণ্যে তাঁকে আবার একটি বাইবেলের মহাকাব্য নিয়ে বিস্তৃত পর্দার জন্যে বহু-বর্গ ছবি করতে হয়েছে।

মায়া প্রোগ্রাম

আমাদের একটি ছোট কিন্তু আরাহ-দায়ক হোটেল রাখা হয়েছিল—পাক-বসাইলারমেরার হোটেলটির পরিবেশ শান্ত, তিক বড় রাস্তার নয়, কিন্তু ফেস্টিভ্যালের অফিস থেকে হাটা পথের দূরত্বের মধ্যেই। ১৯৬১তে এদের বালিনের বড় রাস্তা কুরম্বুরস্টেনডাম-এর ওপর হোটেল আম-বসুতে রাখা হয়েছিল। জুরীদের পক্ষে একটু বিচ্ছিন্ন থাকা বিশেষ দরকার; কারণ ফেস্টিভ্যালের কর্তৃপক্ষ জুরীদের আলোচনাটা গোপন রাখা একান্ত প্রয়োজনীয় বল মনে করেন। আগেই বলেছি আমাদের ১৪ দিনের মধ্যে ৩৫টি ছবি বিচার করার কথা। এই ৩৫টির মধ্যে ২৫ খানি জনসাধারণের সমক্ষেই বসু পালান্ট-এ দেখান হয়। ২০০০ দর্শক ধরার মত এই হলে সাধারণত ফেস্টিভ্যালের ছবি দেখান হয়ে থাকে। বাকীগুলি দেখান হয় 'লিলিপুটে' নামে ছোট একটি মিনিরেচার হলে। প্রতিযোগিতার ছবিগুলি লিলিপুটে দেখানর ফলে একটা অপ্রত্যাশিত সুবিধা পাওয়া গেল। এখানকার দর্শকেরা সকলেই

জুরীর সদস্যবৃন্দ। যদি কোন ছবির তৃতীয় রীল পর্যন্ত দেখে সকলেই মনে করতেন যে, এর পুরস্কারপ্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা নেই তাহলে আমরা ছবি দেখান বন্ধ করে বেলা তিনটোর সময় স্থিতীর প্রদর্শনের আগের সময়টুকু চোখ দুটিকে একটু বাড়তি বিশ্রাম দিকে পারতাম। এ ব্যবস্থা চমৎকার হয়েছিল, কেবল একটি কোরিয়ান ছবির বেলার জুরীদের একজন বেলজিয়াম সদস্য অন্য দশজনের চোখে মা ধরা-পড়ে নি এমন সব সৌন্দর্য আরম্ভ করতে থাকার সেক্ষেত্রে এটা আর সম্ভব হয় নি।

বসু পালান্ট-এর স্থিতীর শো প্রায় ভোর ৫-৩০ নাগাদ শেষ হত। তখন থেকে

সন্ধ্যা ৪টা পর্যন্ত সময়টুকু খালি জুরীদের নিজস্ব ছিল। রাত ৯টার শোর পর মধ্য রাতের একটি পটি একেবারে অন্ধকারিত ছিল। পাটি দিইনে প্রতিযোগী যে কোন একটি দেশ। সংশ্লিষ্ট দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অনুযায়ী পাটির দৌড় নির্ধারিত হত। এর উপযোগিতা হল এই যে, এর ফলে জুরীদের মতামত কতটা প্রভাবিত করা যায় থাকে বলে জবিইং—তার সুযোগ মিলত।

এই চোদ্দ দিনে ফেস্টিভ্যালের অনেক কেনাবেচা চলে। যে বছরের কথা বলছি সে বছর এক আমেরিকান কোম্পানী স্পেনে দুটি মোটা অঙ্কের ছবি তোলার ব্যবস্থা করে ফেলেন। ছবি দুটি হল 'এল সিড' এবং

উত্তম কাহিনী * উত্তম অভিনয় * উত্তম সম্পাদ
* উত্তমকুমার *

॥ অভিনীত এই ছবিটির তিন অধ্যায় ॥

উত্তমকুমার-সুপ্রিয়া-অনুপকুমার-বিকাশ রায়-অজয় গাঙ্গুলী-দ্রায়া দেবী-জহর রায়



সম্পাদনা : বিশ্বনাথ নায়ক ॥ গীত রচনা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
তত্ত্বাবধান ও প্রচার উপদেষ্টা : শ্রীপদ্মন
সহ-ভূমিকায় : রবীন মজুমদার : বঙ্কিম ঘোষ : সীতা দ্বিজী
বীরেন চ্যাটার্জী : হুদা দেবী : সদানন্দ : বিদ্যা রাত্ত : জয়বন্দা : দীপা
বিদিশা : শঙ্কু ভট্টাচার্য : সম্পাদনা :
আপনার প্রিয় চিত্রগ্রহে মৃতি আশ্রয়

‘কিং অব কিংস’। গোড়ারটিতে প্রধান চিত্র-তারকা ছিলেন চার্লটন হেস্টন এবং পরেরটি আমাদের সহকর্মী নিকোলাস রে’র তোলা। ফেস্টিভ্যালে আমেরিকান অফিসিয়াল ছবিতে দক্ষিণ সমুদ্র দ্বীপমালা সংক্রান্ত কিছু ব্যাপার ছিল। বালিনে আমেরিকান পার্টি দেওয়া হয় আমেরিকান মোশান পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে বালিন হিষ্টনের প্রধান ডাইনিং হলে। এই উপলক্ষ্যে ঘরটি হাওয়াইয়ান রীতিতে হুলা ব্যান্ড এবং ঘাসের ঘাঘরা পরা ছোটখাট তারকাদের দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছিল। ‘এল সিড’ এবং ‘কিং অব কিংস’-এর পোস্টার ঘরের সর্বত্র ছড়ান। হেস্টন ব্যক্তি-

গতভাবে দর্শন দেবার জন্যে উড়ে এলেন এবং নিকোলাস রে প্রতিযোগী ছবিগুলির মধ্যে চিন্তিতভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে এবং যীশুখৃষ্টের বিষয়ে কি করবেন সে সম্বন্ধে বলতে শোনা গেল।

দেখা গেল হেস্টন চলচ্চিত্রের একজন সিরিয়াস ছাত্র। চিত্রতারকাদের সঙ্গে মৃদুস্বভাব হওয়া বতই স্বল্পকালের জন্যে হোক না কেন—অনেক সময় তাতে বেশ কিছু জ্ঞান লাভ হয়। এর কারণ তারা যে ধরনের চরিত্রে অভিনয় করে থাকেন তার সঙ্গে তাদের একাত্ম করে দেখার দিকে একটা মানুষের প্রবণতা থাকে। কিন্তু মৃদুস্বভাব হলে তাদের মধ্যে এমন অনেক

দিক দেখা যায় যার অস্তিত্ব লোকে বিশ্বাসই করতে চায় না। বিখ্যাত অনেক অভিনেতার সঙ্গে আমার পাঁচবারই বালিন ভ্রমণে দেখা হয়েছে। পোয়াতিয়ে, রের রুম, হার্ডি জুগার বা আনা কারিনার মত তরুণ আধুনিক অভিনেতাদের মধ্যে কোনরকম চাল দেখতে পাই নি। একমাত্র জার্মান অভিনেতা কুর্ট রুগেনসকেই দেখেছি যিনি তাঁর পদার প্রতিচ্ছবিটি হয়ে থাকার জন্যে সচেতন রয়েছেন।

অজ্ঞাত পিয়ানিস্ট

একটা কথা এখানে বলে রাখা দরকার। বালিন লিডো বা কান্ নয়, যেখানে উৎসবের পনেরো দিন সারা শহর একেবারে মেতে থাকে। কান্ আর লিডো অত্যন্ত ছোট জায়গা। এমন কি সাধারণ সময়েও ক্যাসিনো আর সমুদ্রতীর এগুলোকে বেড়ানোর জায়গা ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। বালিনে কিন্তু প্রায় চার বর্গমাইল পরিধিতে ফেস্টিভ্যালের উপস্থিতি অনুভব করা যায়। এর মধ্যে আছে প্রতিনিধিদের বাসের জন্যে গোটা ছয়েক সুন্দর হোটেল, প্রতিনিধিদের খাবারের কুপনে উন্মীলিত অধিকাংশ রেস্টোরাঁ, সুন্দর নতুন ইয়োরোপা সেন্টার, যেখানে ফেস্টিভ্যালের সব অফিসিয়াল কাজকর্ম করা হয় এবং প্রতিযোগিতা ও তার বাইরের ছবিগুলি যে চার-পাঁচটি প্রেক্ষাগৃহে দেখান হয় সেগুলি। এই সব প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে বন্দু প্যালেস্ট-এর ঠিক পাশেই একটি ছোট হলে শব্দ পুরোনো বিখ্যাত ছবিগুলি দেখান হয়। আমার প্রথমবারের বক্তার, জুরীদের একজন বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে কয়েকটি বিখ্যাত পুরোনো জার্মান ছবি দেখতে না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু শ্রিতীয়বারে তা সম্ভব হয়েছিলো। যে অজ্ঞাতনামা পিয়ানো বাদক অন্ধকারে বসে পদার দিকে তাকিয়ে নির্বাক ছবির আবহসঙ্গীত বাজাচ্ছিলেন তাঁর ক্ষমতা চলচ্চিত্রের সঙ্গীতশ্রুতাদের দ্বারা বিষয় বলে মনে হল।

শ্বাসরোধকারী

ছবি দেখা আর পার্টি ছাড়া ফেস্টিভ্যালের অফিসিয়াল কর্মসূচীতে ছিল উপবনে অ্যাম্ফ থিয়েটারে চিত্রতারকাদের প্যারেড, স্ট্রেন্দীতে নৌকাভ্রমণ, ফিল্ম বল এবং সবশেষে ফেস্টিভ্যালের পরিচালকের দেওয়া উৎসব সমাপ্তির পার্টি। তারকাদের প্যারেডে কতৃপক্ষের চোখধাধানো কর্ম-কুশলতা এবং ব্যান্ডের জাঁকজমক দেখার মত হয়েছিল। একটি মোহময় মূহুর্তে, সন্ধ্যার ক্ষীরমাণ আলোয়, ফ্লাডলাইট জ্বলবার ঠিক আগে ২৫০০০ দর্শকের প্রত্যেক ঠিক একই সময়ে একটি করে দেশলাই জ্বলানোর ফলে মূহুর্তের জন্যে আমরা একটা প্রায় শ্বাসরোধকারী দৃশ্য দেখতে পেলাম—এক ধরনের টিউটনিক দেওয়ালী বেন হুগা-নারের মাপে তৈরী।

কু ডামে

বাঁধাধরা এনগেজমেন্টের কাকে যে সামান্য সময়টুকু নিজের জন্যে পাওয়া যায়

॥ যুক্তি সম্মাসন ॥

সাবিত্রী-অমিত-অনুপ-পাহাড়ী-মিলি-মনিলা-বেণুকা-অজয়-জ্যোৎস্না

গল্পাপদ-জহর অভিনীত



নন্দা চিত্র
পরিবেশিত
কার্তিক বর্মন

প্রযোজিত
রাধারানী সিকচায়েঁ
৩য় নিবেদন

বালুচরী

কাহিনী-আশাপূর্ণা দেবী
পরিচালনা-অজিত গাংগুলী
সুর-রাজেন সরকার

BEE-SEE

তাতে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে হয়। বিশেষ করে কুরফুরস্টেনডামে। এখানে সব সময়েই যেন কিছু না কিছু ঘটে চলেছে। এই কুরফুরস্টেনডামেই যাকে বালিনের লোকেরা ছোট করে বলে কু' ডাম-স্মিতীয় মহাযুদ্ধের স্মারক হিসেবে রয়েছে কাইজার ভিলাহেল্ম গির্জা। এই ধ্বংসাবশেষের একাধারে রয়েছে খাটো আটকোণা উদ্ভূত রকমের সরল এবং আধুনিক মেমোরিয়াল চার্চ, আর অন্যদিকে এরই সংলগ্ন উঁচু আটকোণা ঘন্টা মিনার। এই আধুনিক গৃহটি ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে সঙ্গতিময় বৈপরীত্য রেখে তৈরী, আর আমার ত মনে হয় এটা একটা দেখবার মত এবং অকাটা যুক্তিপূর্ণ সৃষ্টি, যদিও বালিনের লোকেরা এ সম্পর্কে সন্দেহ আছে। তবে বালিনের অধিবাসীরা তাদের অধিকাংশ প্রাচীন চিত্রগুলির আধুনিক রূপান্তর সম্পর্কে সর্বদাই সন্দেহগ্রস্ত। তারা নতুন কংগ্রেস ভবনকে বলে গভর্বতী শৃঙ্গি এবং আমার মনে হয় নতুন অপেরা-ট্রিও একটা ঐ রকম নাম আছে। এর সম্মুখভাগে কৃষ্ণবর্ণ আর বারান্দাগুলিও কালো দেয়ালের টানার মত বেরিয়ে রয়েছে।

গির্জা থেকে প্রায় দুশো গজ দূরে রাস্তার ওপারে হল বালিনের চিড়িয়াখানা আর অ্যাকুরিয়ারিয়াম। চিড়িয়াখানার বাগানে রবিবার সকালে হালকা ক্লাসিক্যাল বাজনা শোনা যায়। তবে আমার চোখে চিড়িয়াখানার সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় জিনিস হল আফ্রিকান জেবুর ঠিক পাশেই ভারতীয় গরুর জন্যে বিশেষভাবে ঘেরা জায়গাটি। গরুটা যদি তার স্বদেশীকে দেখে কোন পরিচয়ে ভাব দেখায় থাকে ত সেটা আমার নজরে পড়ে নি। তবে বালিনে অন্যান্য জিনিসের সামনে যেটুকু অনুভব করেছি তার চেয়ে এর সম্মানে অনেক তীব্রভাবে আমার মনে হয়েছিল যে, আমি বিদেশে রয়েছি।

ফুটপাথ-শিল্পী

শিল্পীদের উপস্থিতির ফলে পথচারীদের কু' ডাম দিয়ে চলাফেরা অনেক খানে মন্থর হয়ে আসে। এই শিল্পীরা ফুটপাথের অনেকখানি জায়গা জুড়ে রঙীন চক দিয়ে বিখ্যাত সব ছবির বিরাট প্রতিলিপি একে থাকে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একই শিল্পীকে একটি ছবি নিয়ে কাজ করতেও দেখেছি। এই সব ফুটপাথ-শিল্পীদের অধিকাংশই হল শিল্পশিক্ষার্থী, অন্যরা হল সংগ্রামী পেশাদার শিল্পী যারা দিনান্তে টুপি সংগ্রহ ছবি আঁকার মালমশলা কেনার ব্যয় করে। দিনের শেষে এই শিল্পীরা চলে যায়, কিন্তু তাদের কাজ পড়ে থাকে। সম্ভাব্যেবার হঠাৎ একটা মোনালিসা, কি বতিচোঁয়ার ডেনাস বা ব্রাক কি পিকাসোর একটা বিমূর্ত ছবি মাড়িয়ে ফেলা পথচারীর পক্ষে কিছু বিচিত্র নয়। পথের মধ্যে অবিরাম যাকে বলে কাইজার ভিলাহেল্ম গির্জার মানবিক রূপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যুদ্ধের দরুণ অক্ষম সৈন্য। এদের মধ্যে বিশিষ্ট করেকজনকে চাকালগান চেয়ারে

বাঁ হাতে বড়সড় একটি ঈগল পক্ষী বসিয়ে ডান হাতে টুপি বাড়িয়ে বসে থাকতে দেখা যায়।

জুরীর কাজ

প্রতিযোগী চিত্রগুলির মধ্যে যদি কোন ছবি আর সকলের চেয়ে অনেকখানি উর্ধ্ব বলে মনে হয় ত জুরী-দের কাজ অনেক সরল হয়ে আসে। রুসেলসে জুরীদের বিজয়ী ছবি নির্ধারণের শেষ সভা ঘোলা ঘন্টা ধরে চলেছিল। বালিনে এক ঘন্টাও লাগে নি। বিজয়ী হয়েছিল আন্তোনিওনির 'লা নেভে' উচিতভাবে পুরস্কৃত হওয়া ছাড়াও ছবিটি জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছিল। ফেস্টিভ্যালের দর্শকরা পুরস্কার সম্বন্ধে মতামত বেশ খোলাখুলিভাবেই দিয়ে থাকে। কখনো

কখনো ছবি দেখানোর সময়ে এবং কখনো যখন পরিচালক মণ্ডের ওপর আবির্ভূত হয়ে স্পটলাইটের আলোয় অভিভাবদ করন তখনও তারা মুখর হয়ে ওঠে। বালিনের এটাই রীতি।

ভেনিসে পরিচালককে ওপরতলার সামনের ব্যালকনির আসন পরিত্যাগ করতে হয় না। ছবির শেষে তাঁর ওপর স্পটলাইট ফেলা হয়। তাঁর কর্তব্য হল উঠে দাঁড়ায় নীচু হয়ে বাও করা, তবে তাঁকে অনেকখানি ঝুঁকতে হয় যাতে নীচের তলার লোকেরা ঝুঁকতে দেখতে পায়, কাকে তারা অবস্থা-ভালভাবে দেখতে পায়, কাকে তারা অবস্থা-গতিকে অভিনন্দন দিচ্ছে বা বিদ্রূপ করছে। আজেন্টিনার এক পরিচালকের একটি ছবি দেখানোর সময় দর্শকদের সারাক্ষণ বিদ্রূপ

এক প্রাণবন্ত বালকের বিচিত্র জীবন কাহিনী!

চিত্র-সংগঠনের নিবেদন



হুগো

নির্দেশক : অমিত মৈত্র
সঙ্গীত : ডি. কালসান্দ্রা



পরবর্তী আকর্ষণ

উত্তরা : পূরবী : উজ্জ্বলায়

ডি, ল্যাক্স ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটর্স রিলিজ

করতে দু'মিনিট এবং শেষে তাঁকে নির্দিষ্ট পদাটাইটের পূর্ণ অঙ্গার পুরো এক মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে দলকবের নবেদনে ফোলাস ডাক শোনাতে দেখেছি। এই পরিচালক এখনো কর্মরত কিনা জানি না, তবে এর চেয়ে কম স্নায়বিক আঘাতের অভিজ্ঞতায় কোন শিল্পীই চিরকালের মত অকর্মণ্য হয়ে যেতে পারেন তা কল্পনা করতে পারি।

মস্কোর পরেই বোধহয় বার্লিনের কৌশলভাষ্য দলকবের পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভদ্র এবং মৈত্রিশীল। আসলে এরা এতই ভদ্র যে, একটি অভ্যস্ত দুর্ভাগ্য টার্কিশ ছবি পরিচালক তাঁর ছবির ভদ্র ভাবসমূহকে পুরোগ্রহের প্রশংসা বলে ভুল করেন এবং তাঁর উদ্বেলিত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন কিছুটা বিলম্বিত করতে থাকেন, অবশেষে একটি উচ্চাঙ্গের বিস্ময়জনক আওয়াজ দলকবের পেছন দিক থেকে আসার ফলে তিনি মগ্ন থেকে দ্রুত প্রস্থান করেন।

বিশ্বজোড়া জাতীয়

আমার ভাগ্যক্রমে এবাং আমার ছবি-গীল ভালভাবেই গৃহীত হয়েছে। এখনো পর্যন্ত অবশ্য আমি 'গোল্ডেন বেসার' পাই নি। তবে যেহেতু সুবর্ণ পুরস্কার প্রযোজক-কেই দেওয়া হয় এবং যেহেতু আমি কখনো আমার ছবির খবর দিই নি— তাতে রোগ্য পুরস্কার পেয়ে আমি আরো সুখী। প্রতিযোগী ছবি নিয়ে তিন তিনবার যাবার ফলে আমার উৎকণ্ঠা চলে গিয়েছে। এমন কি আমি দরকার মত ছবি দেখা বন্ধ করে দেই সমস্ত পৃথিবীর অন্য দেশ থেকে যে সব চিত্রনির্মাতারা আসেন তাঁদের সঙ্গে দুটো কথা বলেও কাটতে পারি। একজন চিত্রনির্মাতা অন্য চিত্রনির্মাতাদের সঙ্গে কত সহজে এবং তাড়াহুড়ি মিশতে পারেন সেটা আশ্চর্যের বিষয়। মনে হয় তাঁরা যেন এক বিশ্বজোড়া জাতীয় বন্ধনে আবদ্ধ—যাদের ভাষা চিন্তা এবং সমস্যা একই ধরনের। গত বছর বার্লিনে আমি পোলিশ রোমান পোলানস্কি, আমেরিকান ডিক সেন্টার, যিনি খ্যাতি কল্পে উঠেছিলেন এবং ভদ্র জার্মান পরিচালক শোলেনডফের সঙ্গে পরিচিত হই। পশ্চিম জার্মানীর লোকেরা তাঁদের তৈরী ছবির সম্পর্কে বিশেষ পবিত্র নন। তার বধেট কারণও আছে। কিন্তু শোলেনডফের মনে হল একটা পরিবর্তন আনবার মত সাহস এবং প্রতিভা আছে আর তাই করবার জন্যে তিনি যেন বদ্ধপরিষ্কার। অবশ্য আমাদের বলবার অনেক কথা ছিল—যেমন নতুন যন্ত্রপাতির কথা, এবং চলচ্চিত্রের ভাষার প্রসারতার জন্যে তাঁরা কি করছেন আর সেই বিশ্বজোড়া সমস্যা—কিভাবে ছবির গুণ অকম কম রেখে খরচ কমানো যায়।

সমালোচকদের সঙ্গে

সমালোচকদের সঙ্গে বরং একটু কম আন্তরিকতা করতে হয় কারণ তাঁরা অনেক সময় চিত্রনির্মাতার কাজের মধ্যে তাঁর চেয়েও আত্মকেন্দ্রিক কিছু একটা খুঁজে পেয়ে থাকেন। কলে আপনি এমন অবস্থার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য একমাত্র তাঁদের চোখে

আপনার কাজের দৃষ্টি কখনো দু'মিনিট নিয়েই তাঁদের দ্রষ্টি দূর করতে পারেন। প্রচলিত চিত্রনির্মাতারাই বিশেষভাবে পাশ্চাত্য সমালোচকদের অভিযোগের টীকা-ডাবার উপজীব্য হয়ে থাকেন। এর মধ্যেই দরুণই চলচ্চিত্রের ভাষার দুটো দিক ধরা পড়ে। একটা হল ওপরের স্তরের, যা সকলের কাছেই সহজলভ্য, অন্যটা এভিহোম শিকড়ে প্রোথিত। এই ফলে কোন শিল্পীর কাজের মধ্যে তাঁর সংস্কারের সঙ্গে একাধা থাকার দরুণ একটা সত্যতা আনা সম্ভব হয়। বিনেশীর পক্ষে এর রসগ্রহণ করতে হলে সময়, চেষ্টা এবং রসগ্রাহিতার প্রয়োজন হয়। কিন্তু চিত্রসমালোচক এ বিষয়ে কদাচিৎ বাধ্যপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন। তার কারণ অবশ্য তিনিই জানেন। তাঁর কাছে কোন প্রকাশভঙ্গীই বৈদেশিক নয়। তিনি সর্বদাই তাঁর প্রতিভা নিয়ে প্রস্তুত, প্রভাব প্রদর্শনেও প্রস্তুত এবং যেখানে কোন প্রতীক নেই সেখানেও প্রতীক দর্শনে প্রস্তুত। এর বিকৃত কলাকলের উদাহরণ স্বরূপ এক আভা গার্ড ফরাসী সমালোচক, যিনি প্রথম একটি বোল্মাইয়ের মার্কামরা ছবি দেখেন, তাঁর কথা বলা যায়। তাঁর কাছে এর সঙ্গীতের বাধ্যময় আংশগুলি রেখার নিঃসঙ্গতার সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মনে হয়েছিল।

বরং যারা ফিল্মকে একমাত্র ব্যবসায়ের উপাদান বলে মনে করেন সেই প্রযোজকদের কাছে আমি অনেকটা নিশ্চিত মনে করি। নিশ্চিত কারণ এখানে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছিন্ন এবং পরিষ্কার প্রত্যক্ষতার পাওয়া যায়। প্রযোজক যত বড় হন ততই তিনি তাঁর গোড়ামি নিয়ে বাড়বাড়ি কম করে থাকেন। বার্লিনে এই ধরনের এক প্রযোজকের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের কথা বলে আমার কাহিনী শেষ করব।

দৃষ্টি মোগল

দৃষ্টি মোগল কথাটা তাঁরশের কোঠায় চালু হয়, হলিউডের চলচ্চিত্রশিল্পের জনহৃদয়ক মাথাওয়ালা লোকের অভিভা হিসেবে।

ভেঁজ সেনজানিক, যিনি তিন বছর আগে মারা গিয়েছেন, তিনি হলেন এ'দের একজন। আমি তাঁকে যারা যাবার হ নাম আগে বার্লিনে দেখেছিলাম।

কয়েক বছর আগে সেনজানিক ইউনাইটেড স্টেটসে প্রদর্শিত শ্রেষ্ঠ বিদেশী ছবির জন্যে একটি বৎসরিক পুরস্কার ঘোষণা করেন। আমার ট্রিলজির প্রথম দুটি ভাগের জন্যে আমি ইতিপূর্বেই দু'বার এই পুরস্কার পাই। কলকাতায় সেনজানিকের কাছ থেকে আমি ভারতীয় বিষয় নিয়ে একটি ছবি করবার জন্যে চিঠি পাই এবং তাতে বলা হয় যে, তাঁর স্ত্রী জেনিফার জোনসের উপযোগী একটি চরিত্র যেন এই ছবিতে থাকে। আমার কাছে বিষয়টা তেমন আকর্ষণীয় হয় নি, তাই আমার বিভিন্ন পরিকল্পনামূলক নিয়ে বাস্তবতার কথা গিয়ে পাঠিয়েছিলাম।

চিঠিপত্রের সেখানেই সমাপ্তি ঘটেছিল। কিন্তু আমার 'মহানগর' ছবিটি নিয়ে বার্লিনে উপস্থিত হবার দু'দিন বাধেই

হিল্টন থেকে সেনজানিকের সেক্রেটারী কাছ থেকে টেলিফোন পেলাম। পরের দিন এটি দৃষ্টি মোগলের সঙ্গে লাগে বসলাম।

বেশ আশ্চর্য ঘটনা ধরে সেনজানিক আমাকে যে সব তারকাদের তিনি তৈরী করেছেন তার কাহিনী শোনালেন।

অন্যান্য কথার মধ্যে জানতে পারলাম যে, সেনজানিক তাঁর প্রথম ছবির পর গ্রেগরী পেককে নৈরাশ্যজনক বলে ত্যাগ করেন কিন্তু প্রচুর পরিমাণে চিত্রমোদীদের চিঠি আসার ফলে তাঁকে রাখতে এবং উন্নতি করতে দিতে বাধ্য হন। আরো শুনলাম যে, ইনিগ্রাড বাগম্যানের নাক তাঁর সমস্ত পরিচালকদের সঙ্গেই প্রেমে পড়ার কোঁক আছে—এক আলফ্রেড হিচকক ছাড়া।

দৃষ্টি অনুবোধ

লাগের মাঝমাঝি অবস্থায় সেনজানিক গল্প বন্ধ করে দৃষ্টি অনুবোধ হাজির করলেন। একটি হল তাঁর ভারতীয় পরিচালকপনাটি সম্বন্ধে আমি যেন আরেকটু মন দিয়ে চিন্তা করি এবং অন্যটি হল আমি যেন সে বছরের সেনজানিক পুরস্কারটি ইংলমার বাগম্যানকে দিই। অনুষ্ঠানটি বার্লিনে পরের দিন হবার কথা। আমি প্রথম প্রস্তাবটি এড়াবার জন্যে স্মিতীয়টিতে সম্মতি দিই। আজকে তাঁর হয়ে কাজ না করবার আরো বেশী কারণ জন্ম গিয়েছে, কেননা অল্প দিন হল এই পত্রিকার পরিচালকদের তিনি যে সব চিঠিপত্র পাঠাতেন তার এক আতঙ্কজনক বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি ছোট কিন্তু অলম্ব্য আদেশ এবং পরিচালকের স্বাধীনতা খর্বকারী। এর ফলে ইতিপূর্বেই 'এ ফোরগেবল টু আমিস' থেকে জন হার্টনকে বিদায় নিতে হয়েছে।

তাঁর চিঠি

আমি সেনজানিককে বললাম যে, তাঁর চিঠির কথা আমি দু'মিনিট।

যদিও তিনি বেশ বিস্তৃতভাবে হলে বললেন যে, জনের বেলার বা করেছেন আমার ক্ষেত্রে তা তিনি করবেন না; তবে দেখলাম তিনি একটু চুপসে গেলেন। আমরা আর সে পরিকল্পনা নিয়ে কোন আলোচনা করি নি।

পরদিন সম্ভ্রাম পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠান হবার কথা। লাগ থেকে হোটেল ফিরে এসে দেখি আমার জন্যে রিসপন্সান্সিটের কাছে একটা বন্ধকরা খাম রয়েছে। খুলতেই একটা ছোট চিরকুট বেরোল। ওপরে ছাপা 'মেমো ট্রম ভেঁজ ও সেনজানিক', তলার টাইপকরা ছোট আঠটি লাইন—অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে বক্তৃতা দিতে হবে সেটি এবং তার তলার অনুবোধ আমি যেন এটি হৃদয় করে নিই।

বক্তৃতা আমি দিয়েছিলাম, তবে ঠিক সেনজানিকের ভাষায় নয় এবং আমার মনে হয় তার ফলেই তাঁর ভারতীয় পরিকল্পনার সমাপ্তি ঘটে।

(কলকাতার জার্মান সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান মাকসমুজার ভবনে প্রদত্ত বক্তৃতা এবং তাঁর অনুষ্ঠান অনুসার প্রকাশিত)।

বায়ক বায়িকা

উত্তমকুমার

আজ ভারতীয় চিত্র-গগনের এক অত্যাশ্চর্য চিত্র-তারকারূপে শোভা পাচ্ছেন বাংলা সিনেমার মধ্যমণি শ্রীউত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায়। বিকশিত হয়ে আছেন চিত্রাঙ্গদী দর্শকদের মনের গভীরে।

ছবির জগতে উত্তমকুমারের প্রবেশ আজ থেকে প্রায় আঠারো বছর আগে। উত্তমকুমার অভিনীত প্রথম ছবি কিন্তু আজো মূর্ত্তি পায় নি। এ খবর গল্প বলেই মনে হবে কিন্তু গল্প হলেও সত্য। 'মাস্তোভার' (হিন্দী) ছবির নাম হয়তো অনেকেরই অশ্রুত। কিন্তু সেটাই ছিল আজকের উত্তমকুমারের প্রথম ছবি।



উত্তমকুমারের অপূর্ব অভিনয়-প্রতিভা প্রথম যে ছবিতে ফুটে উঠলো সে ছবির নাম 'বন্দু পরিবার' (১৯৫২)। এখান থেকেই শুরু হলো উত্তমকুমারের প্রকৃত শিল্পী-জীবন।

তারপর থেকে ক্রমাগত অভিনয় করে গেছেন উত্তমকুমার। প্রতিটি ছবিতেই তিনি অতি সুন্দরভাবে বজায় রেখেছেন নিজের সুনাম এবং অভিনয়ের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। কখনো কোথাও কোনো ছন্দপতন হয়নি। বরঞ্চ শিল্পীর প্রতিভার স্বাক্ষর প্রত্যেক নতুন ছবিতেই বেন আরো নতুনভাবে বিকশিত হয়েছে।

শুদ্ধ রোমান্টিক নায়ক রূপেই উত্তমকুমারের অভিনয়-প্রতিভা ফুটে ওঠে নি। 'ধোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' ছবিতে সে কথা তিনি সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে দিয়েছেন।

উত্তম-প্রতিভার পূর্ণতম বিকাশ আমরা দেখতে পেলাম 'নারক' ছবিতে। সে বেন আর এক মানুস, এক অচেনা উত্তম।

অভিনেতা ছাড়াও উত্তমকুমারকে আমরা পরিচালক হিসেবে পেরোছি 'শুদ্ধ একটি বছর' ছবিতে এবং সংগীত-পরিচালকরূপে পেরোছি 'কাল তুমি আলেয়া' চিত্রে। উত্তমকুমার প্রযোজিত 'ছোট্টা মল্লিকা' ছবিতে উত্তমকুমারকে আমরা টুইস্ট নাচ নাচতে দেখেছি স্নানামধ্যম্য বৈজয়ন্তীমালার সঙ্গে। একজন শিল্পীর কাছে আমরা আর কতো আশা করতে পারি!

সুচিরা সেন

সুচিরা সেনের কথা বলছি।

অভিনেত্রী সুচিরা সেন, চিত্র-তারকা সুচিরা সেন এবং বহু জনগণমন-অধিনায়িকা সুচিরা সেন। তাঁরই কথা বলছি।

'সাত নম্বর কয়েদী' ছবির মাধ্যমে যার অভিনেত্রী-জীবনের যাত্রা শুরু এবং 'গৃহদাহ' ছবিতে এসে সে যাত্রার ক্ষণেক বিরতি—সেই জীবনের পঞ্চদশ বৎসরের ঊত্থান-পতনের ইতিহাস আজো কী করো মনে বিস্ময়ের উদ্বেক করে না।

'সাড়ে চুয়াত্তর'-এ সুচিরা সেনের সাবলীল অভিনয় দেখে বোকা বনে গেলেন অনেকেই। তবুও তাঁরা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলেন—পরের ছবিতে কী হয় তাই দেখার জন্যে।

দেবকীকুমার বন্দু কিন্তু ভিন্নপ্রকৃতির লোক। ভিন্নরুচির মানুষ। তিনি হাত বাড়িয়ে ডেকে নিলেন শ্রীমতী সেনকে তাঁর 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ছবিতে অভিনয়ের জন্যে। সমস্ত মন-প্রাণ ঢেলে দিয়ে অভিনয় করলেন শ্রীমতী সেন। ছবি মূর্ত্তি পেলে



সারা চিত্রশিল্পে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হলো। জয়-জয়কার পড়ে গেল সুচিরা সেনের।

খবে বেশী ছবিতে অভিনয় করেননি সুচিরা সেন। শ্রীমতী সেন অভিনীত বাংলা ছবির সংখ্যা—উনচল্লিশ। হিন্দী ছবির সংখ্যা পাঁচ—দেবদাস, চম্পাকাবি, বোম্বাই কি বন্দু, সরহাদ এবং মমতা।

যদিও 'সাত পাকে বাঁধা' ছবিতে অসাধারণ অভিনয়ের জন্যে মস্কো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর সম্মান লাভ করেছেন, তবুও মনে হয় 'সন্তপদী' রিলা গ্রাউন্ডের চরিত্রাভিনয় তাঁর অভিনেত্রী-জীবনের এক শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

'উত্তরফালগুনী' এবং মমতা ছবিতে মা ও মেয়ের শৈবত ভূমিকায় অতুলনীর অভিনয় শ্রীমতী সেনের জীবনের আর এক অপূর্ব সম্পদ।

'গৃহদাহ' চিত্রের অচলার চরিত্রটি যে অপূর্ণ দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন তাতে মনে হয় শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের পৃষ্ঠা থেকে চরিত্রটি বেন জীবন্ত হয়ে উঠে এসেছে সিনেমার রূপালী পর্দার বুকে।

শ্রীমতী সেনের আগামী ছবির তালিকার আছে 'সাত কদম' (হিন্দী) ও 'দেবী চৌধুরাণী'।



সুপ্রিয়া দেবী

সুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় 'নির্মল মে' পরিচালিত 'বন্দু পরিবার' (১৯৫২) মাধ্যমে। তারপর থেকে প্রায় বছরেই পর্দার বুকে তাঁর দেখা আমরা নিয়মিত পাচ্ছি। না, নিয়মিত তাঁর দর্শন পাওয়া যায়নি—উনিশ-শো তিপায় সাল থেকে উনিশ-শো সাতায় সাল পর্যন্ত তাঁকে আমরা পর্দার বুকে অভিনয় করতে দেখিনি।

পরিচালক সুশীল মজুমদারের 'মম-বাণী' (১৯৫৮) ছবিতে সুপ্রিয়া দেবীকে আবার দেখা গেল অভিনয় করতে।

সেই সন্দেহের অবসান হলো পরের ছবিতে। পরের ছবির নাম 'অন্নপালী' (১৯৫৯)। এই 'অন্নপালী' ছবি থেকেই সুপ্রিয়া দেবীর নাম ছড়িয়ে পড়লো চার

দিকে! সবাই বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো—কে এই মেয়েটি!

বিশ্বদর্শকেরা সুপ্রিয়া দেবীর দিকে চোখ মেলে তাকালেন 'মেঘে ঢাকা তারা' (১৯৬০) ছবিতে তাঁর অতুলনীয় অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর দেখে।

আজ পর্যন্ত প্রায় বিশাখানা ছবিতে অভিনয় করেছেন সুপ্রিয়া দেবী। সব ছবিতেই তাঁর অভিনয় সাঁতাই খুব সুন্দর হয়েছে। কিন্তু তাঁর শেষদিকের ছবির অভিনয় হয়েছে আরো সুন্দর, অতি সুন্দর।

'লাল পাথর' (১৯৬০) ছবির কথাই ধরা যাক। ছবির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গ্রীমতী সুপ্রিয়ার বলিষ্ঠ অভিনয়ের ধারা তখনক রসিকচিহ্নে বিস্ময় জাগিয়েছে। সন্দেহ হয়, এই চরিত্রটিকে ঠিক ঐভাবে অন্য কোনো অভিনেত্রী কটিয়ে তুলতে পারতেন কিনা।

উত্তমকুমার পরিচালিত 'শুরু একটি বছর' (১৯৬৬) ছবিতেও অনিন্দনীয় অভিনয় করেছেন সুপ্রিয়া দেবী।

উত্তমকুমার সুর-সংযোজিত ছবি, 'কাল তুমি আলো'। এ ছবিতেও অপূর্ব অভিনয়-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন সুপ্রিয়া দেবী। মনে হয়, তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের তালিকায় এই অভিনয়টি অন্যতম হয়ে থরা দিয়েছে।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

'অপূর্ব সংসার' (১৯৫৯) ছবির অপূর্ব কথা অনেকেরই হরতো মনে আছে। না থাকলেই বা কী! সেই অপূর্বই তো বড়ো হয়ে দিবা ঘরে বেড়িয়ে আমাদের চোখের সামনে।

'অপূর্ব' চরিত্রকে রূপ ও রসে রাঙিয়ে দিয়ে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নিজের আসলটি বেশ কয়েকটি করে নিলেন বাংলা নৃত্যের সারিতে।



সুযোগও এসে গেল, প্রাপ্তবয়স্ক মতো। কিন্তু প্রথম সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হোলো না সৌমিত্রের পক্ষে। সত্যজিৎ রায় তাঁর 'অপরাজিত' (১৯৫৬) ছবির

নারক কিশোর অপূর্ব চরিত্রে অভিনয়ের জন্য একটি নতুন মূখের সন্ধান করছিলেন। সেই সময়ে সত্যজিৎবাবুর এক সহকর্মী নিত্যানন্দ দত্ত ধরেও নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু গল্পের অপূর্ব চেয়ে সৌমিত্রের বয়েস বেশি হওয়াতে সত্যজিৎবাবুর পক্ষে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে মনোনীত করা সৌন্দর্য সম্ভব হয়নি।

কিন্তু এই নতুন মূখের কথা একদিনের জন্যেও ভুলে যাননি পরিচালক সত্যজিৎ রায়। ভুলে যে যাননি তার প্রমাণ পাওয়া গেল 'অপূর্ব সংসার' ছবিতে। তিনিই খোঁজ করে ডেকে আনলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে। তিনিই সৌমিত্রকে প্রথম পরিচয় করিয়ে দিলেন অভিনেতা হিসেবে।

'অপূর্ব সংসার' থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ছাব্বিশটি বাংলা ছবিতে অভিনয় করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। প্রত্যেকটি ছবির সাহসিক ও সাবলীল অভিনয় বশের শিখরের দিকে ঠেলে দিয়েছে সৌমিত্রকে। দিয়েছে নাম, অর্থ ও প্রতিষ্ঠা। দিয়েছে অসংখ্য দর্শকের প্রীতি ও ভালোবাসার চিহ্ন।



মাধবী মৃধোপাধ্যায়

গ্রীমতী মাধবী মৃধোপাধ্যায় কখন সিনেমার অভিনয় করতে আসেন তখন কাকে কেই বা চিনতো! কিন্তু আজ তিনি সর্বজনপরিচিতা।

মাধবী মৃধোপাধ্যায় / ছাত্রাচিত্রে বোগ দিয়েছেন প্রায় এক দশক আগে। তার আগে তিনি অভিনয় করতেন শৌখিন মঞ্চে। অবশ্য মঞ্চে তাঁর হাতেখড়ি কিন্তু পেশাদারী থিয়েটারের মাধ্যমে।

তখন নাম ছিল মাধুরী। শৌখিন মঞ্চে মাধুরী মৃধোপাধ্যায় সে সময়ের একটি অতি সুপরিচিত নাম।

প্রথম ক্যামেরার সামনে এসে দাঁড়ালেন মাধুরী তখন সিংহ পরিচালিত 'উনসিল' (১৯৫৬) ছবিতে অভিনয়ের জন্যে। অভিনয় অবশ্য করলেন, কিন্তু দর্শকমণ্ডলে বিশেষ একটা দাগ কাটতে পারলেন না। তারপর 'বাইশে শ্রাবণ', 'আজ কল পরশ' চিত্রে অভিনয় করেন।

সত্যজিৎ রায়ের 'মহানগর' (১৯৬৩) ছবিতে অভিনয় করলেন মাধবী। লাভ করলেন পূর্ণপ্রতিষ্ঠা, সর্বজনীন স্বীকৃতি ও বিপুল গৌরব। এ ঘটনা ঘটেছিল আজ থেকে ঠিক চার বছর আগে, এই সেপ্টেম্বর মাসেই।

বিশ্ববন্দিত চিত্রপরিচালক সত্যজিৎ রায়ের 'মহানগর' এক নতুন মাধবী মৃধোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলো।

'মহানগর' ছবিতে প্রতিভার যে কুঁড়িটি ফুল হয়ে ফুটেছিল সেই ফুলের পূর্ণ বিকাশ ঘটলো 'চারুলাতা' ছবিতে। ঋষিক ঘটকের 'সুবর্ণরেখা' পরে মুক্তি পেলেও ছবিটি শেষ হয়েছিল অনেক আগেই। সুভাষা, মাধবী-প্রতিভার পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছিল 'সুবর্ণরেখা'। চিত্রে—একথা বললে নিশ্চয়ই তস্যার বলা হবে না।

বাংলা চিত্রজগতের অনন্য অভিনেত্রী গ্রীমতী মাধবী মৃধোপাধ্যায় অভিনীত মুক্তি-পাওয়া ছবির সংখ্যা হোলো আঠারো। বর্তমানে, তিনি যে সব ছবিতে কাজ করছেন হিসেব করে দেখলে তাদের সম্মিলিত সংখ্যা আঠারোর চেয়ে অনেক বেশি। হয়তো কুড়ি-পঁচিশে গিয়ে দাঁড়াবে।

অনিল চট্টোপাধ্যায়

'বোগ-বিবোগ' ছবি থেকেই অনিল চট্টোপাধ্যায়ের অভিনেতা-জীবনের যাত্রা শুরু বলা যেতে পারে। তবে চরিত্রটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল না। তা না থাক, তবু তো প্রথম প্রকাশের স্বীতি দিয়ে থেরা।

পরের ছবি 'ময়লা কাগজ' এবং 'তুলি'—এ দুটো ছবিতেও কোনো বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করেননি। করেননি ঠিক নয়, করা সম্ভব হয়নি। পরিচালনার কাজে সাহায্য করে অভিনয় করা চলে না।

এরপর কিছুদিন চুপচাপ ছিলেন। মনে হোলো যেন অভিনয়ের ভূত ঘাড় থেকে নামলো। কিন্তু ভূত যে না নেমে আরো



জামিয়ে বসেছে তাঁর পরিচয় পাওয়া গেল 'অসবর্ণা' (১৯৫৬) এবং 'উল্কা' (১৯৫৭) ছবির মাধ্যমে। এ দুয়ের মধ্যে 'উল্কা'র চরিত্রটাই কিছুটা ভালো।

তারপর 'লৌহকপাট', 'অস্বাভাবিক' 'কল্যাণমাটি' প্রভৃতি ছবিতে চমৎকার অভিনয় করে শিল্পীমহলে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন অনিল চট্টোপাধ্যায়।

সত্যজিৎ রায়ের 'দেবী' ও 'তিন কন্যা', ধর্মিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা' ও 'কোমল গাঙ্গার' এবং পরবর্তীকালে 'কাঁচের পুণ্ড', 'স্বপ্নান', 'কাণ্ডপাণ্ডা', 'কুমারী মন', 'ব্রহ্মপলাশ' প্রভৃতি ছবির অভিনয় অনিল চট্টোপাধ্যায়কে দিল প্রচুর খ্যাতি ও পরিচিতি।

আজ পর্যন্ত প্রায় ষাটখানা বাংলা ছবিতে অভিনয় করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়। দু'খানা হিন্দী ছবির নামও 'ফারার' ও 'সাল্লাটা' অভিনীত ছবির তালিকার স্থান করে নিয়েছে। এখন অভিনয় করছেন প্রায় দশ-বারোখানা ছবিতে।

সম্মা রায়

'অন্তরীক্ষ' ছবিতে একটা সামান্য চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন সম্মা রায়। সেই খানেই তাঁর অভিনেত্রী জীবনের শুরুর। সেই শুরুর এখনো শেষ হয় নি। এখনো তিনি পথ চলছেন।

শিশু থেকে বালিকা, বালিকা থেকে কিশোরী। এই কিশোরী বয়সেই সম্মা রায়ের সিনেমা জগতে প্রবেশ। চতুর্দশী সম্মা পঞ্চদশী হবে ঠিক সেই সময়ে সিনেমার মোহময় আকর্ষণ তাকে হতছানি দিলো। সেই ডাকে সাড়া দিলেন সম্মা রায়। লাজকাপ্ত চরণে আজকের



এই সম্মা রায় ধীরে ধীরে একদিন প্রবেশ করলেন স্টুডিওর অন্তরালে।

স্টুডিও গম্বুজ মধ্যে প্রবেশ করে যে-ছবিতে অভিনয়ের জন্যে প্রথম ক্যামেরার

সামনে দাঁড়ালেন সে-ছবির নাম 'অন্তরীক্ষ' (১৯৫৭)। সে-ছবির চরিত্র-চরণ নিয়ে বড়াই করার কিছু নেই। 'পরের ছবিও প্রায় তাই।

পরিচালক রাজেন তরফদারের 'গঙ্গা' সত্যিই এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। সেই ছবিতে অতুলনীয় অভিনয় করলেন সম্মা রায়। খ্যাতির গন্ডি আরো বেড়ে গেল। প্রযোজক ও পরিচালকদের চোখ পড়লো সম্মার উপর। ডাক আসতে লাগলো চারদিক থেকে। সবাই চর সম্মা রায়কে নায়িকা করে ছবি করতে। সুতরাং হাতে এলো অনেক ছবির কাজ।

সম্মা রায় অভিনীত মূর্তি-পাণ্ডর' ছবির সংখ্যা ('অন্তরীক্ষ' থেকে 'প্রসব স্বাক্ষর' পর্যন্ত) হোলো ছেচনিশ। এরপরে আছে 'বাঘিনী', 'জীবন সংগীত' এবং আরো দু-একটি ছবি।

সম্মা রায়ের অভিনয়ের গন্ডি শুধু বাংলা দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। হিন্দী ছবিতেও অভিনয় করেছেন সম্মা রায়। তবে, খুব বেশি ছবিতে নয়। মাত্র দুটো ছবিতে — 'আসলি নকলি' এবং 'পূজা কে ফুল'।

অনুপকুমার

'বিশের কেরা' (১৯৫০) থেকেই ধরা যাক। তখন তো অনুপকুমারের বয়স বাইশ-তেরিশ। এরপর যতো ছবিতে অভিনয় করেছেন সব ছবিতেই তিনি কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন।

চরিত্র-সৃষ্টির এক অত্যুচ্চ ক্রমতা লুকিয়ে আছে অনুপকুমারের মধ্যে। যতোই কঠিন চরিত্র হোক না কেন, যতোই দুর্বোধ্য হোক তার বিশ্লেষণ তবুও অনুপকুমারকে হঠানো যাবে না ফুল মাক'স না দিয়ে।

'বর্ণচোরা' (১৯৬০) ছবিতে আমরা এক নতুন অনুপকুমারকে দেখেছি। 'সংভাই' 'হাই-হীল' ছবিতেও দেখেছি সেই পরিপূর্ণতাকে গভীরভাবে আঁকড়ে রাখা।

'পলাতক' ছবিতে অনুপকুমার হঠাৎ বেন ফেটে পড়লেন। দানা-বাঁধা অভিনয়-প্রতিভা হঠাৎ বেন মূর্তি পেল। হঠাৎ বেন বেরিয়ে এলো আশ্চর্যগর্ভিত অভ্যন্তর থেকে অসাধারণ প্রতিভার টুকরো টুকরো খণ্ড।

এই 'পলাতক' ছবির মাধ্যমে অনুপকুমার আবার নবরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

'হঠাৎ দেখা' (১৯৬৭) এবং 'বালিকা বধূ'—এই দুটো ছবিতে অনুপকুমার



নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিকশিত করার অপূর্ব সুযোগ পেয়েছেন। এবং সেই সুযোগ তিনি গ্রহণ করেছেন তাঁর সমস্ত দেহ ও মন নিয়ে। বাংলা ছবি জগতের যে-চোখ থাকবে ততোদিন 'বালিকা বধূ'র শরৎকে বাঙালী দর্শকেরা কিছুতেই ভুলতে পারবেন না।

—বিজন দত্ত

Breast-La



BREAST BEAUTY CREAM
Now Mfd in India by arrange-
ments with & to the original
Formula of
M/s La & DALTONN (DEN)

ব্রেস্টোলা

বন্ধ সৌন্দর্য শাফটর জন্য একটা
অসাধারণ মেডিকেটেড ক্রীম
সকল ঔষধালয়ে এবং দোকানে
পাওয়া যায়। এজেন্ট—

Angel's Sales Divn.
42/D, J. K. Mitra Rd., Cal-37
Phone : 56-4302

হেস্টিংসের দ্রোহা

সুধীরচন্দ্র সরকার

পুরনো একটি ঘটনা অতিসংক্ষেপে এবারে পুজায় পাঠকদের নিবেদন করব। পুরনো দিনের এইসব ঘটনার মধ্যে সেকালের বোলবোলাও ও জাঁকজমকের সঙ্গে ভারতীয়দের প্রতি বিদেশীদের অবিকেনা ও অত্যাচারও প্রকটিত। তবু অতীতের বগুনা ও বেদনাও কালের প্রলেপ লেগে একধরনের মাধব্যে রূপান্তরিত হয়।

আমরা প্রবীণেরা পরিণত বয়সের সীমান্তে দাঁড়িয়ে রূপকথার মত অতীতকে নিয়ে রোমন্থন করি। নবীনকালের মানুষেরা প্রায়-বিস্মৃত অনতি-আলোচিত এইসব ঘটনায় একধরনের রসবস্তু পেতেও পারেন।

লর্ড ক্রাইস্টের পরে ওয়ারেন হেস্টিংস যখন এদেশের শাসনভার নিলেন তখন থেকেই তিনি প্রায় একটি কিংবদন্তী।



মশলা

ভাল বায়ার জন্ম অপরিহার্য

৪/২/১এফ, কুষ্টিয়া বস, পট্টা
শ্যামবাজার, কলিকাতা-৪

আলিপুত্রে তাঁর হেস্টিংস হাউসের বাসভবন ঘিরেই তাঁর জীবনের গৌরবময় অধ্যায় কেটে গেছে। বর্তমানে হেস্টিংস হাউসে যে শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছে সেখানে কি তাঁর বিগত আশ্রয় দীর্ঘবাস শোনা যায়?

হেস্টিংস কলকাতার এলে যে কাউন্সিলের সৃষ্টি হয় তার মধ্যে চারজন সদস্য ছিলেন। কুমতায় এঁরা হেস্টিংসের সমকক্ষ ছিলেন। তাঁদের নাম জেনারেল ক্রেভারিং, কর্ণেল মনসন, ফিলিপ ফ্রান্সিস ও রিচার্ড বারওয়েল।

ফিলিপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে প্রত্যেক ব্যাপারে মতবিরোধ শেষকালে উভয়ের বন্ধুত্বপূর্ণ পরিণত হয়। বৃন্দ হরোঁজল পিস্তল নিয়ে। আলিপুত্রে সেই স্থান আজও লোকে সম্মান করে থাকে। এই বৃন্দে ফ্রান্সিস পরাজিত হন। এই বিরোধের কারণ আমরা সঠিক বলতে পারি না। তবে অনেক ঝড়ের মত নারী এর কারণ নয়। মনে হয় ষিলাতের দস্তর থেকে প্রমাণিত অর্থের তাগাদায় এই বিপত্তির উৎপত্তি। পরে অবশ্য বিরোধীপক্ষ কাউন্সিল ত্যাগ করতে বাধ্য হওয়ার হেস্টিংস সর্বসর্বা হলেন।

কাউন্সিলে হেস্টিংসের প্রতিটি কাজে ফ্রান্সিস বাধ্য দিতে থাকায় হেস্টিংস বিরক্ত হয়ে তাঁকে "সত্য এবং সম্মানজনক ব্যবহারে অপারগ" বলে অভিযুক্ত করেন। ফলে ফ্রান্সিস হেস্টিংসকে বন্ধুত্বপূর্ণ আহ্বান করেন। হেস্টিংসও সে আহ্বান

গ্রহণ করলেন। ১৭৮০র ১৭ই আগস্ট ভোরবেলা এই বৃন্দ হয়। এসম্বন্ধে হেস্টিংসের বর্ণনা থেকে সবচেয়ে ভাল বিবরণ পাওয়া যায়। মজার কথা এই যে, ফ্রান্সিস ইতিপূর্বে জীবনে পিস্তল ছোঁড়েন নি এবং হেস্টিংস বোধহয় বার দুয়েক পিস্তল ব্যবহার করেছিলেন।

বন্ধুত্বপূর্ণ দিন ভোরে কর্ণেল পিয়র্স হেস্টিংসের কাছে আসেন। ভোর ৪টে নাগাদ হেস্টিংস কোঁচে শুরুর একটু বিশ্রামের চেষ্টা করেন। তারপর পোষাক-পরিচ্ছদ পরে কর্ণেল পিয়র্সের গাড়িতে ঠিক ৫-৩০টার সময় উভয়ে বেলভোডিয়ায় এসে উপস্থিত হন। সেখানে মিঃ ফ্রান্সিস ও কর্ণেল ওয়াটসন তখন পায়চারি করছিলেন। নিজস্ব জায়গা খোঁজবার জন্যে খানিকটা সময় নষ্ট হয়। তারপর স্থির হয় উভয়পক্ষ ১৪ পা দূরে দাঁড়িয়ে পরস্পরের দিকে গুলি ছুঁড়বেন। কর্ণেল ওয়াটসন ৭ পা মাপলেন। হেস্টিংস দাঁড়িয়েছিলেন দক্ষিণ দিকে। কোনরকম হাওয়া তখন ছিল না। কর্ণেল ওয়াটসন বোধহয় বলেন যে কোনরকম হীন সুযোগ যেন না নেওয়া হয়। প্রত্যেক যোশা নিজের নিজের সময় ও সুবিধামত গুলি ছুঁড়বেন। কর্ণেল পিয়র্স হেস্টিংসের পিস্তলে দুটি গুলি ভরে দেন। হেস্টিংস স্থির করেন তিনি পরে গুলি ছুঁড়বেন। ফ্রান্সিস ঘোড়া টিপে তাঁর গুলি বেরোল না। তাঁর সহকারী আবার পিস্তল ঠিক করে দিলেন। উভয়ে আবার স্বস্থানে দাঁড়ালেন। হেস্টিংস তখনো স্থির করেন পরে গুলি ছুঁড়বেন। ফ্রান্সিস দুবার টিপ করলেন কিন্তু দুবারই পিস্তল নাটকীয় রাখলেন। হেস্টিংস তখন ফ্রান্সিসের প্রতি লক্ষ্য স্থির করেন। যখন তাঁর মনে হল লক্ষ্য স্থির হয়েছে তখন তিনি গুলি ছুঁড়লেন। প্রায় একই সঙ্গে ফ্রান্সিসও আবার গুলি ছোঁড়েন। কে যে আগে গুলি করলেন হেস্টিংস তা আর স্থির করতে পারলেন না। ফ্রান্সিস টলে পড়লেন, তাঁর মূখ দেখে মনে হল তিনি আঘাত পেয়েছেন এবং ধীরে ধীরে তিনি পড়ে গেলেন সেই সময় তাঁর মূখ থেকে শোনা গেল "আমি মারা গেলাম"। হেস্টিংস আতঙ্কিতভাবে তাঁর দিকে ছুটে গেলেন। তাঁর সাফল্যে তিনি মোটেই আনন্দিত হননি। তাঁদের সহকারী দুজনও সাহায্যের জন্যে ছুটে এলেন। ফ্রান্সিসের কোটের ডানদিকে ফুটো দেখা গেল এবং ডর হল গুলি বোধহয় তাঁকে বিদীর্ণ করেছে। কিন্তু তিনি বেশী কষ্ট না করেই কয়েকবার উঠে বসেন এবং একবার বিনা সাহায্যেই দাঁড়াবার চেষ্টা করেন; কিন্তু আবার মাটিতে পড়ে যান। কর্ণেল ওয়াটসন বললেন যে, যোশা দুজন যখন ব্যক্তিগত অন্তর্ভুক্তির পরিবর্তে সম্মানের জন্যেই লড়াই করেছেন তখন উভয়ের হাত মেলানো উচিত। তাঁরা তাই করলেন। মিঃ ফ্রান্সিসকে প্রফুল্ল দেখা গেল এবং হেস্টিংস তাঁর তৎপরতার জন্যে তাঁর কাছে অনু-

এই খাদ্যাভাবের দিনে

খাদ্যপ্রাণ পুরোপুরি বজায় রাখতে হলে
প্রেসার কুকারে রান্না করুন

নেপাল শঙ্খর গ্রুপ কোং

৮৫, রাসবিহারী প্রভিন্ডিউ, কলিকাতা-২৬

ফোন ৪৬-৪৪২৫

প্রেসার কুকার, ইক্টমিক্ কুকার, ডোমেস্টিক গ্রাইন্ডার,
কাঁচ, চীনা মাটি ও স্টেনলেস স্টীলের বাসন বিক্রেতা।

তাপ প্রকাশ করলেন। জাঙ্গিস
চিং হয়ে শুরেই একটু স্থিত
পেলেন। মেজর টলির কাছ থেকে একটু
খাটরা আনা হল কারণ, তাঁর কোন পালকী
ছিল না। জাঙ্গিসকে বেলভেডিয়ায় নিয়ে
যাওয়া হল। কর্ণেল পিয়ার্স ও হেস্টিংস
উভয়ে শহরে হেস্টিংসের বাড়ি চলে গেলেন।
সেখান থেকে ডাঃ ক্যাম্পবেল ও ডাঃ
জাঙ্গিসকে ডাকা হয়। তাঁরা দেখে বললেন,
আঘাত গুরুতর নয়। কোটের সেলাইয়ের
ফাঁক দিয়ে ঢুকে বড়ো মাংসপেশী ভেদ করে
কাঁধের একটু নিচে চামড়ার কাছেই গুলি
দেখা গেল।

হেস্টিংস বাড়ি ফিরে মিঃ মাক্‌হ্যামকে
সার ইলাইজা ইম্পের কাছে পাঠিয়ে সমস্ত
বিবরণ জানান এবং আঘাত মারাত্মক হলে
বিচারের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করেন। এবং
জানান যে সেই ক্ষেত্রে তিনি আত্মসমর্পণ করত
প্রস্তুত থাকতেন। বাই হোক জাঙ্গিস আবি-
লম্বেই আরোগ্য লাভ করেন এবং ১১ই
সেপ্টেম্বর কাউন্সিলে যোগ দেন। তবে এই
ঘটনার পর কলকাতায় তার বেশীদিন থাকেন
নি। ১৭৮০-র ডিসেম্বরে তিনি ইংলণ্ডে
ফিরে যান।

হেস্টিংস নিষ্কলঙ্ক হয়ে সর্বময় কতা
হতে পেরে সুবিচারের নামে কার্যত দেশে
অসন্তোষ সৃষ্টি করলেন। এর ফলে তাঁকে
অবসর নিয়ে ভারত ত্যাগ করতে হয়।

সেই সময় বিলাতে একটি দল তাঁর
বিশেষ বিচার (ইম্পীচমেন্ট)-এর জন্য পালি-
মেণ্টে অভিযোগ আনলেন। ফলে তার বহু-
সরের উপর মামলা চলেছিল। এ-ব্যাপারে
জাঙ্গিসেরও হাত ছিল। এডমন্ড বার্ক,
শেরিডন প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তি এতে অংশ
গ্রহণ করেন।

এই ইংরাজ গভর্ণর-জেনারেলের মোটেই
সুনাম ছিল না। রেগুজেন্ট অ্যাক্ট অনু-
সারে তিনি ভারতের প্রথম গভর্ণর-জেনারেল
নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৭৭২ সালের ১৭ই
ফেব্রুয়ারী তিনি কলকাতার প্রথম পদার্পণ
করেন।

এদেশের বহু রাজা-উজীরের ওপর
তিনি নানারকম তত্ত্বাচার করেছেন। যেমন
মহারাজা নন্দকুমার, বেনারসের মহারাজা এবং
অধোখ্যার বেগম ইত্যাদি। কলকাতায় এসে
বিলাতের তদানীন্তন কর্মচারীরা কলকাতা ও
ভারতবর্ষের জন্য যে কাউন্সিলের সৃষ্টি
করেছিলেন তার অধিকাংশ সভ্যের সংগেই
তাঁর হুসাতা ছিল না।

পার্লামেন্টে তাঁর বিচারে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব
তাঁর বিরুদ্ধে অবলম্বন করলেও অবশেষে
হেস্টিংসেরই জয় হয়। যদিও এই সময়ে
তিনি সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছিলেন।

আলিপুরে তাঁর বাসস্থান 'হেস্টিংস
হাউস' নিজনে বিরাট উদ্যান বেষ্টিত ছিল।

তিনি এই শূন্য পুরীতে একাকী কাশ
করতেন।

কথিত আছে মৃত্যুর পর তাঁর অপরাধী
আত্মা এই হেস্টিংস হাউসে গভীর রাতে মধ্যে
মধ্যে ফিরে আসত। প্রকাশ্যে বাড়িতে জন-
শূন্য গভীর রাতে ঘোড়ার গাড়ি চড়ে গমগম
করে তিনি একাকী আসতেন। গাড়ি-
বারান্দায় গাড়ি দাঁড়ালে পরজা খোলার পর
তিনি গাড়ি থেকে নেমে নিজের উপরের ঘরে
চলে যেতেন। যেখানে তিনি নিদ্ৰা যেতেন,
কাজ-কর্ম করতেন, সেখানে তাঁর মোকদ্দমা
সংক্রান্ত কাগজপত্র তিনি যেন খুঁজে
বেরতেন বলে মনে হত। এর জন্য তিনি
দেবরাজ, আলমারি, বাস্তব সবই যেন খুলেছেন
বলে শোনা যেত। তাবপর আবার নিরাশ
হয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতেন।

এ গল্প কলকাতায় অনেকদিন পর্যন্ত
প্রচলিত ছিল। আজকালকার দিনে এই
কাহিনী মানুষের মন থেকে মুছে গেছে।
এর সত্যতা সম্বন্ধে এখন তখনকেই সংশয়-
জন্য। যে অঞ্চলে মূলবস্তু হারিয়েছিল
সেখানে "ডুয়েল এন্ড মিন্ট" আজও সে
ঘটনার সাক্ষ্য বহন করছে।

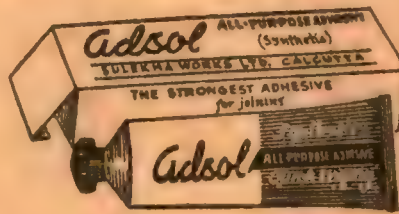
কিন্তু ভালয় মন্দয় ঐশ্বর্যের শীর্ষ
স্পর্শ করে যে রোমাঞ্চ ও রূপকথার স্মৃতি
ওয়ারেন হেস্টিংস রেখে গেছেন আমরা
প্রবীণেরা তাতে আনন্দ-বেদনায় শিহরিত
হই।

মুলেখার

তিনটি অনবদ্য অবদান



আডসল পেট



অলপারপাস অ্যাডেসিভ



আডসল গাম

Sulekha

সুলেখা ওয়ার্কস, লিমিটেড

সুলেখা পার্ক • কলিকাতা-৩২



মহাকাশ
যাবার
৭৪ দিনক

দিলীপ বসু

১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর বিশেষ স্মরণীয় দিন। মানবসভ্যতার ইতিহাসে একটা নতুন যুগ বলা যেতে পারে মহাজাগতিক যুগের জন্ম ঐ দিনে। সেদিন আকাশে উঠল মানুষের হাতে গড়া একটি ছোটো গোলক, ব্যাস তার মাত্র দুই ফুট, আর তার অভ্যন্তরে রয়েছে নানারকমের যন্ত্রপাতি—নাম দেওয়া হলো তার 'স্পুটনিক', অর্থাৎ 'সহযাত্রী'। পুরো রাশিয়ান শব্দটা হচ্ছে 'Iskútsvennye Spútnik Zemli'—অর্থ হচ্ছে 'পৃথিবী-প্রদক্ষিণকারী কৃত্রিম সহযাত্রী'। তখনকার প্রতাপবিক্রম এই ছোটো গোলকটাকে বলা হয়েছিল 'থোকা চাঁদ', কারণ পৃথিবীর প্রাকৃতিক সহযাত্রী চাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মানুষের হাতে গড়া এই থোকা চাঁদটি পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছিলো।

আন্তর্জাতিক

ভূ-পদার্থ-তাত্ত্বিক বর্ষ (আ-ভূ-বর্ষ)

১৯৫৭ সালের ১লা জুলাই থেকে ৩১শে ডিসেম্বর অবধি পৃথিবীকে আরো ভাল করে জানবার জন্য আ-ভূ-বর্ষের (International Geophysical year or IGY) বিরাট কর্মকাণ্ডের অবতারণা হয়েছিল। পৃথিবীর জল-স্থল-আকাশ, সমুদ্র থেকে কুমেরু, প্রশান্ত থেকে অত-লালিতক মহাসাগর জুড়ে ৫০০০ রিসার্চ স্টেশন থেকে ৬০ দেশের প্রায় ১০,০০০ বৈজ্ঞানিক ও রিসার্চ কর্মী একযোগে কাজ করেছিলেন। কারণ, তখন জানা ছিল যে

১৯৫৭-৫৮ সালের ঐ দেড় বছরে সূর্যজাত নানারকমের প্রক্রিয়ার বিশেষ করে সূর্য-কলঙ্কের প্রভাব বৃক্ষি পাবে। সূর্য-কলঙ্কের মাঝ থেকে বেন পিচকারির স্রোতের মতো সূর্যকণিকা-স্রোত পৃথিবীর আবহমণ্ডলে কপিপয়ে পড়ে এবং তার চৌম্বক ক্ষেত্রকে বিপর্যস্ত করে তোলে—যেটা জানা বিশেষ দরকার সেটা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের তলার ভূপৃষ্ঠে বসে সম্যক জানা যেতে পারে না। কেবল সামান্য একটু আন্দাজ হয়তো করা যেতে পারে। সেজন্যই জল-মাটি-বাতাসেরও বাইরে থেকে পৃথিবীকে নিরীক্ষণ করা দরকার।

তাছাড়া অজানা মহাকাশকে জয় করতে হলেও নিশ্চয়ই আগে থেকে 'সে সম্পর্কে' কিছু খবরাখবর সংগ্রহ করতে হবে। অতএব কৃত্রিম উপগ্রহগুলি হলো বেন আমাদের অগ্রবর্তী দূত বা স্কাউট, যার সাহায্যে আমরা মহাকাশের অজানা রহস্যের কিছু হাদিশ পাচ্ছি। পরে অবশ্য মানুষও মহাকাশে সশরীরে হাজির হয়ে আমাদের জ্ঞানের পরিধিকে বাড়িয়েই চলেছে।

কিন্তু মহাকাশ জয়ের ব্যাপারটা পরে এসেছে, প্রথমে রাশিয়ার স্পুটনিক এবং তারপরে ১৯৫৮ সালের জানুয়ারীতে আমেরিকার 'ভ্যানগার্ড' নামে কৃত্রিম উপগ্রহকে মহাকাশে পৃথিবী-প্রদক্ষিণের কক্ষপথে স্থাপন করার আসল উদ্দেশ্য ছিল আমাদের এই বাসভূমি পৃথিবীকেই আরো ভাল করে জানা। কিভাবে এটা সম্ভব হচ্ছে, একটু বিশদ আলোচনা এবারে করা যাক।

আকাশ ও মহাকাশ

আমাদের মাথার উপরে রয়েছে বায়ুমণ্ডল। কতো ব্যাপক সেটি? চলতি হিসাবে প্রায় ৩০০ মাইলের মতন, কিন্তু তারপরেও বায়ুর ছিটেফোটা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। এ বেন গানের সুর—গায়কের কাছ থেকে হতদূরে যাওয়া যাবে ততোই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে মিলিয়ে যাবে। কোনো একটা নির্দিষ্ট বিশেষ সীমানাতে সেটা হঠাৎ শেষ হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ যে সীমানার আগে অবধি গান শোনা যাবে;—আর যেটা

পেরোলেই একেবারে চূপ, সুরের রেশ অবধি শোনা যাবে না, এরকম যেমন হয় না; তেমনি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে হতো উঁচুতে যাওয়া যাবে, বায়ুমণ্ডলের ঘনত্বও ততো পাতলা আরো পাতলা হতে হতে শেষ অবধি মিলিয়ে যাবে। তার কোনো নির্দিষ্ট সীমানা নেই।

কাজেই যদিও বায়ুর একক কণা সমুদ্র-তল থেকে এমন কি ৭০০।৮০০ মাইল উঠে গেলেও পাওয়া যাবে, তথাপি চলতি হিসাবের জন্য আমরা ধরে নিতে পারি যে, বায়ুমণ্ডল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩০০ মাইল উঠে শেষ হয়ে যাচ্ছে।

বায়ুমণ্ডল ঘেরা অঞ্চলটি হলো আমাদের আকাশ, আর তারপরে মহাকাশ। আকাশ ঘন নীল চাঁদোয়ার মত আমাদের মাথার উপরে বিছানো রয়েছে, আর ওপরে হলো মহাকাশ।

আয়নমণ্ডল

আমাদের মাথার উপরে তাহলে ৩০০ মাইল গভীর বায়ুসমুদ্র, যার একেবারে তলাতে আমরা বাস করি।

অবশ্যই পৃথিবী থালার মত গোল নয়, বল বা কমলালেবুর মত গোলাকার। তাহলে পৃথিবীর আসল গতিমাত্রিক গোলাকার রূপটি ভাবলে আমরা বলতে পারি—পৃথিবীটা গোল কমলালেবুর মত, আর কমলালেবুর পুরু শাঁসের চারধারে পাতলা খোসাটির মত পরানো রয়েছে বায়ুমণ্ডল। কমলালেবুটির ব্যাস প্রায় ৮,০০০ মাইল আর তার চারধারে খোসাটি মাত্র ৩০০-মাইল পুরু।

সূর্য থেকে দৃশ্য সাদা আলো (যার বর্ণালী বিন্যাসে পাচ্ছি আমরা সাতটা রং) ছাড়াও নিগত হচ্ছে নানারকমের অদৃশ্য আলো বা রশ্মি, অতি-বেগুনী রশ্মি (ultra-violet rays) সূর্য-কণিকা স্রোত (solar corpuscular radiation), সমান্য (cosmic rays) পরিমাণের মহাজাগতিক রশ্মি প্রভৃতি।

এগুলি যদি সরাসরি পৃথিবীর বৃকে আমাদের উপরে নেমে আসতে পারতো, তার ফল আমাদের জৈবদেহের পক্ষে হতো মারাত্মক। কি করে তাহলে আমরা নিশ্চিন্ত আরামে বাস করছি।

এই সমস্ত মারাত্মক, বহুলাংশে একেবারে প্রাণঘাতী রশ্মি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে হয় একেবারে আটকে যায়, নয় বায়ুকণার সংঘাতে তাদের এমনভাবে রূপান্তর ঘটে যাতে তাদের প্রাণবিনাশকারী ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়।

ঠিক কি ব্যাপারটা উপর আকাশে ঘটেছে একটু দেখা যাক। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল মোটামুটি শতকরা ২১ ভাগ অক্সিজেন আর ৭৮ ভাগ নাইট্রোজেন গ্যাস দিয়ে গঠিত। আর বাকী এক ভাগে রয়েছে আরগন, নিওন প্রভৃতি গ্যাস, যোগদানো আমাদের উপস্থিত আলোচনার মধ্যে ধর্তব্য নয়।

গ্যাসের পরমাণুর কেন্দ্রকে (nucleus) রয়েছে ধনাত্মক-বিশিষ্ট প্রোটন কণিকা আর চতুর্দিকে ঘূর্ণমান ঋণাত্মক-বিশিষ্ট ইলেক-

টন। প্রোটন ও ইলেকট্রনের সংখ্যার পরিমাণ সবসময়ই সমান হয় বলে পুরো পরমাণুটি (atom) থাকে তড়িৎ-নিরপেক্ষ।

সূর্য-নিঃসৃত প্রচণ্ড তেজোশক্তি-বিশিষ্ট অতি-বেগবাহী রশ্মির আঘাতে পরমাণুর কেন্দ্রকে চতুর্দিকে ঘূর্ণমান এক বা একাধিক ইলেকট্রন ছিটকে বেরিয়ে গেলে পরমাণুর বাকী অংশটি ধনতড়িতাবিশিষ্ট হয়ে পড়ে (কারণ কেন্দ্রকে প্রোটনের সংখ্যা ঘূর্ণমান ইলেকট্রন থেকে হয়ে দাঁড়াচ্ছে বেশি); তেমনি ছিটকে বেরিয়ে পড়া স্বাধীন ইলেকট্রনটি (এক বা একাধিক) তাদের প্রতিবেশী পরমাণুর মধ্যে ঢুকে পড়াতে তাকে ঋণতড়িতাবিশিষ্ট করে তোলে (কারণ এখন কেন্দ্রকের প্রোটনের সংখ্যা থেকে ঘূর্ণমান ইলেকট্রনের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে।) তাহলে আমরা দেখছি, অতি-বেগবাহী রশ্মির আঘাতে ওপর আকাশের গ্যাসের পরমাণু-গুলি যথাক্রমে ধনতড়িতাবিশিষ্ট ও ঋণতড়িতাবিশিষ্ট হয়ে পড়ছে। পরমাণু তড়িতাবিশিষ্ট হলে তাকে বলা হয় আয়ন এবং সমস্ত প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় আয়নন।

উপর আকাশের বায়ুমণ্ডল আয়ন দিগে গঠিত বলে তাকে বলা হয়েছে আয়নমণ্ডল। এই আয়নমণ্ডল সমুদ্রপৃষ্ঠের ৪০ থেকে ১০০ মাইল উচ্চে বিস্তৃত।

ঘরে বাইরে

আমাদের মাথার উপরে (অথবা পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘিরে) রয়েছে যে বায়ুমণ্ডল, সেটা তাহলে সূর্যের অতি-বেগবাহী রশ্মির প্রচণ্ড সংঘাত থেকে এবং সেই সঙ্গে মহাকাশের আরো নানারকমের তেজস্ক্রিয় রশ্মির আঘাত থেকে আমাদের রক্ষা করছে। কিন্তু আবার ঠিক সেই কারণেই বাইরের মহাকাশ ও আমাদের ঘর এই পৃথিবী সম্পর্কে জ্ঞান আমাদের অত্যন্ত সীমিত ও অসম্পূর্ণ। কি রকম?

আমরা যখন ঘরের মধ্যে বাস করি, তখন ঘরের ছাদ, চার দেওয়াল, মেঝে, এক কথায় ঘরের সবদিকের দেয়াল আমাদের বাইরের নানারকম ঝড় ঝাপটা থেকে রক্ষা করে। ঘরের মধ্যে বাস করলে নিশ্চয়ই বাইরের বৃষ্টির জল বা তুষারপাত আমাদের আঘাত করতে পারবে না। কিন্তু আমরা যদি চিরজীবন ঘরেই বাস করি, ঘর থেকে কখনও বাইরে না গিয়ে থাকি, তাহলে বাইরের জগৎ সম্পর্কে তো নই। এমন কি নিজের ঘর সম্পর্কেও জ্ঞান কি পূর্ণাঙ্গ হতে পারে? নিশ্চয়ই পারে না, কারণ ঘরের সঙ্গে বাইরের যোগাযোগ হচ্ছে নিবিড়, একেবারে ওতপ্রোত। ঘরের মধ্যে ঠান্ডা লাগার কারণ



ভ্যানগার্ড

যদি বাইরের তুষারপাত হয়, তাহলে সেটা সম্যক কৈবদ্যের জন্ম নিশ্চয়ই ঘর ছেড়ে বাইরে বেরোতে হবে।

পৃথিবীকে ঘিরে বায়ুমণ্ডল যেন ঘরের চারদিকে দেওয়াল। কাজেই ঘর, অর্থাৎ পৃথিবী, ছেড়ে বাইরে, অর্থাৎ মহাকাশে, যা বেরোতে পারলে নিজের ঘর পৃথিবী সম্পর্কেও জ্ঞান পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না, বাইরের মহাকাশ সম্পর্কে তো নই।

১৯৫৭-৫৮ সালে, সোভিয়েত ও আমেরিকান উপগ্রহদের প্রধান কাজ ছিল সেইজন্মে আগে আমাদের পৃথিবীকে ভালো করে জানা এবং সেটা জা-ভূ-বর্ষের (IGY) ১০ পয়েন্ট প্রোগ্রামের অন্যতম একটি প্রধান কর্মসূচী ছিল।

মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপিত হবার আগে আগে আমাদের জ্ঞানবিজ্ঞানের দিগন্ত আজ বহুদূর প্রসারিত। এ যেন মানবের কৃপমশ্রুততা থেকে মস্তিষ্ক। নতুন জ্ঞানের যে ভান্ডার গত দশ বছরে আমাদের সন্নিহিত হয়েছে তা আগেকার বহু শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক সাধনাকে সম্মতর ও নতুন আলোকে উদ্ভাসিত করেছে। বলা বাহুল্য, এই নতুন জ্ঞানের সম্যক চিকিত্সা এই স্বল্প পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়।

পৃথিবী যে ঠিক কমলালেবুর মত গোল নয়, সেই নতুন চেহারার সম্মান আমরা পেরেছি। পৃথিবী থেকে কয়েক হাজার মাইল অন্তর অন্তর তেজস্ক্রিয় বলয়ের সম্মান আমাদের ভাবেরে তুলেছে। সূর্য থেকে নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে থাকলেও আমাদের পৃথিবী সূর্যের আবহমণ্ডলেই অবস্থিত—এই ছোটো তথ্যটির তাৎপর্য অপরিসীম।

তেমনি মহাকাশ যাত্রার পথ আজ মানবের সামনে উন্মুক্ত। এই দশকের শেষেই আমরা পৌঁছানো চাই, তারপর গ্রহভ্রমণ—প্রথমে আমাদের প্রতিবেশী মঙ্গল এবং শূন্য গ্রহে, পরে অনন্ত, এ যাত্রার শেষ নেই।

অবশ্যই মহাকাশ অভিযান কেবলমাত্র জাতিতে জাতিতে সম্প্রীতি ও সহযোগিতার ভিত্তিতেই হতে পারে। সে সম্পর্কে আইনও সম্প্রীতি ইউনাইটেড নেশনসে পাশ করা হয়েছে। মানবের ইতিহাসের মহত্তম অধ্যায়ের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের কবিগুরু শেখ বাণীর কথাই মনে পড়ে :

“জয় জয় জয় রে মানব অভ্যুদয়
মহান্ উঠিল মহাকাশে।”





মেয়েদের ছোটবেলা থেকেই
হাতের দণ্ড নিতে শেখান।

তিনি সুন্দরী, তিনি রূপসী!

প্রতিদিনের বুক পরিচর্যায় তাঁর এই অপূরণ সৌন্দর্যের
উৎস-সাধনা বিউটি ক্রীম।

সাধনা বিউটি ক্রীম রূপসাধনায় অনন্য



সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনানগর কলিকাতা-৪৮

অধ্যাপক বোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.এ.
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ.সি.এস. (মক্কা)
এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাঙ্গলপুর
কলেজের রসায়ন-শাস্ত্রের কৃতপূর্ব অধ্যাপক

কলিকাতা কেন্দ্র।
ডাঃ নরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ
এম.বি.বি.এস. (ভলি)
আয়ুর্বেদশাস্ত্র



সাধনা বিউটি ক্রীম

S.P. 4/67

‘ব্যাপার কি?’ উৎকণ্ঠিত মহীতোষ। তারপর স্তম্ভ বিস্ময়ে শুনলেন অশোকের নাকের সব কথা।

লীনা বি-এ পাস তবুও লেখাপড়া না জানা দেবীকে পছন্দ করেছে তার শিক্ষিত ছেলে। দেবী ছাড়া আর এক কপর্দকও তিনি চান না। কই এতটুকু দৃষ্টি পেলেন না মহীতোষ, শিশুসরল এক অপূর্ব হাসি ছড়িয়ে গিয়েছিল তার মুখের রেখায় তখন। বললেন, দৃষ্টি আমি একটুও পাইনি। এই মুহূর্তে আমি কামনা করছি যে আপনাদের ভাল হোক বেয়ান, আপনার ভালো হোক। বড়গা মেয়েটাকে আপনি দিলেন সৌভাগ্যের সিংহাসন। আনন্দে বিহবল মহীতোষ হঠাৎ থেমে গিয়ে বললেন, আমার মেয়ে লীনার ভবে কি হবে? বৃন্দকের আলোচনায় শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো আপাততঃ চাপা থাকবে দেবীর কথা। আর অশোকের মামার ছেলে, যাকে নিয়ে হাতে মানন্য করেছেন অশোকের মা, লাম্বাখান, শিক্ষিত ভাল চাকুরী করে। সেদিন দেখতেও গিয়েছিল লীনাকে। তাকে একবার দেখিয়ে দিলেন। এবার হাসি ভরা মহীতোষ বললেন, সেদিন কিন্তু বাড়ীর সবাই একেই ছেলে বলে ভেবেছিল,

ভালই হল। কে ছেলে একথা কেউই ওরা স্বীকার করে নি। আর আমাকে ত আগের থাকতেই আপনার বারণ করা ছিল, বলেছিলেন ছেলে নম্রা পাবে: তাই আমি স্ত্রীকে বলেছিলাম, চারজনকে মধ্যে ঠিক করতে পারছি না অশোক কে। স্ত্রী বলেছিলেন, এদের যে কেউ জামাই হলে আমি খুশী হবো। বৃন্দুরা আশা নিয়ে ‘বরের দিন ঠিক করে বাড়ী ফিরলেন মহীতোষ। এলো লীনার বিয়ের দিন। সানাইয়ের গগন, স্বজনের কোলাহলে মুখের বাড়ীখানায় ডীর্ভবিহবল দেবী জুটেছে—এদিক-ওদিক। কোথায় মুখ তার ছুটি হলো। এক একবার ছুটে এসে পড়ছেন মাসীমা। চোখেরা জল নিয়ে কাজ করছে। করছে তার কাজের সংশোধন।

বিকলেও তার সেই হীন বেশ। রান্না-বরে চা করছিল। এমন সময় একটা ভীতের শাড়ী এসে দেবীর হাতে দিয়ে মহীতোষ বললেন, এটা পর মা। বড়ের মতো এসে পড়লেন মাসীমা। এই বরচের মধ্যে নতুন শাড়ী না কিনলেই কি আর চলছিল না। খেতে পরতে পাওরাটাই এই বাজারে বণ্ট—। ধামো। জীবনের প্রথম বৃষ্টি

পলয়ের ভর না করে ক্রম্ব হলেই মহীতোষ। বার খরচ হচ্ছে সেই বুকে, তোমার মাথা গলতে হবে না বলে ছিলুম। হয়ত আরও কিছু বলতে চেয়েছিলেন কিন্তু থামতে বাধ্য হলেন। বর এসে গেছে। লাইকের কলখুজনে বাসত হরে সলে গেলেন তাঁরা। মাসীমারে তখনও বসে আছে দেবী। চোখের জল তার ফোটার ফোটার নানল নতুন শাড়ীখানার উপর। এদিকে জামাই বরগের জন্য বাসত মহী-তোষের স্ত্রী, হঠাৎ সেখানে এসে দাঁড়ালেন অশোকের মা, বেরান—ছেলের মা কেন এলেন—চারদিকে চাপাগলেন। কৌতূহলী অসংখ্য চোখ তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল। আনন্দবিহবল কনের মা একমাত্র ছেলের বিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে দেবেন তাই বৃষ্টি এলেন।

বসুন, সম্রম্ব বিনতি তাঁর।

হ্যাঁ বসব বলেই ত এসেছি। মধু-করান হাসি ঠোটে মাখিয়ে বললেন আগে আমার দেবীমাকে আশীর্বাদ করে আসি।

‘দেবী মা’ আচার্য্যবতে আত’নন্দ করে উঠলেন লীনার মা—

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেরান, অমারিকতার বর্ষণ হল তাঁর স্মরে, কোথায় সে?

এই যে ততক্ষণে লাল শাড়ীখানা পরিগে জোর করে তাকে নিয়ে এসেছে একদল মেয়ে। এতক্ষণ তারা সাহস করান লীনার মায়ের ভয়ে।

এ কে? অশোকের মায়ের চোখ দুটো স্তম্ভ হয়ে গেছে দেবীর চোখে। এই বাড়ীর কোন কোণে লুকিয়েছিল এই পাথরপ্রতিমা। দেবীর জলন্তরা দুটো চোখ তাঁর চোখে স্থির। তিনি এগিয়ে এসে বললেন, তোমাকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি মা, জড়োয়ার একটা নেকলেশ পরিগে দিলেন তার গলায়।

আমার মেয়ের কি হবে, বেরান? বেসুরো গলায় কেনে উঠলেন মহীতোষের স্ত্রী। বিপরীত দিকে লীনা অধৈতন্য।

ভর কি? অশোকের মায়ের চোখে অভয় বাণী, জামাই ত তোমার বিয়ের মন্ত্র পড়ছে, বরগের আরোজন করো।

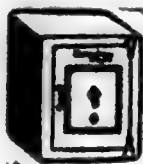
আমার ছেলে ত এখন আসে নি, স্মরে আসছে। তারপর নতুন জামাইয়ের পরিচয় দিয়ে সব বললেন, ঠকবে না, বরং জিতবে।

উপায় কি, বিনা প্রতিবাদে জামাইবরগের আরোজন করলেন লীনার মা, পুরের লগেন অশোকের সঙ্গে দেবীর বিয়ে হয়ে গেল। শূভদৃষ্টির মুহূর্তে দেবীর দুটো চোখ দিয়ে অজস্র জল ঝরল অথোরে। বৃন্দ একটা নির্ভরতা নিয়ে সে চাইল অশোকের দিকে। মঙ্গলমুখ নিয়ে বাজালেন অশোকের মা।

উপহারে এবং নিত্য প্রয়োজনে



বোসে সেফ এন্ড স্টীলের
নির্মিত জিনিষগুণি উৎকৃষ্ট



আগুন এবং চোর-প্রতিরোধক স্টীলসেফ, আলমারী, ক্যাবিনেট, দরজা, কয়লা বাত, সোফা-কাম-বেড, হাসপাতালের ব্যবহারী জিনিষ এবং অফিস, ক্যান্টিন ও বর সাজাবার উপযোগী স্টীলের ব্যবহারী আসবাবগণ প্রস্তুতকারক।

বোসে সেফ অ্যান্ড স্টীল ওয়ার্কস, গ্রাইভোর্ট লিঃ

পোস্ট বক্স ২৭৫৪

৫৬, নেতাজী সড়ক রোড, কলকাতা-১।

১১১, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট-১০

টোলগ্রাম :
“বোসাইসেফ”

ফোন : ২২-১১৮১

২২-৮৭১৬

একাকার। ঐ জমিলাই, ঘর থেকে কাঁধ-কাপড় টেনে টেনে বাইরে আনছিল। আগুন তখন মাউদাউ করে জ্বলছে উঠেছে, পরনের শাড়ীতে তার ছোঁয়া লেগেছিল কী করে, তাই নিয়ে ছুটোছুটি। লাইন দেওয়া মানবের চোখ তখন ঘুরছে, দুলছে। কে একজন ছুটে গিয়ে টান দিয়ে শাড়ীটা খুলে নিল আর সঙ্গে সঙ্গে সেই উন্মাদ অবস্থা শেষ-ধরা যৌন... চাকিত দর্শন কিন্তু ততক্ষণে প্রলয় শব্দ হয়েছিল। ঘরে আগুন, বাইরে আগুন। কাঁধ চাপা দিয়ে জমিলাকে পাশের বাড়ীতে টেনে নিয়ে যেতে তবে তার দাঁড় থেকে মুক্তি। এতক্ষণের দম-লাগা মানবেরা দম নিয়ে বচিল। তারপর ঘরের আগুনের দিকে নতুন করে তাকাল সব। এতক্ষণে জলের কথা মনে পড়ল, আরো সব অন্যান্য উপায় উদ্ভাবনের জন্যে গল্পগল্প থেকে জটীলা ও চীৎকার শব্দ হলো।

কিভাবে কেন? আমরা আছি।

এই সেই তোমরা। প্রতিনিয়ত এই তোমার স্বরূপে ইয়াসিন কত-বিকৃত। স্বাভাবিক অবস্থার স্বেচ্ছা, এখনো ভাবছে। কুকুর-ভীত একপাল ফেট-গাঙ্গা শূণ্য। প্রতিনিয়ত খালী পলারনগর। এবং ভীত শব্দে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণায় ব্যস্ত।

কিন্তু বৃষ্টি আরজানির আত্মগণের দ্বারা আলাদা। কাল রাত্রে এসেছিল, আজ সকালেও ঘুরে গেছে। একই কথা, বাপের বাপ—একবারে দামড়া বকুন। ঘর তো মুখের বাত, বাকুলে অত বড় মেয়ে পুকেল আবার আরশে তাপ লাগে। সইবে কেন—বল তোমরা, আলা তো আর কারো ভাত খায় না, কেন সইবে—আ?

তা বটে!

সে পেরে ফেউলগার দল গদগদ হয়ে পিটিপটি করে ডাকায়। একবার আরজানির মূর্খের দিকে, একবার পোড়া দেওয়ালের নিশ্কাশনের পথে।

ঐ যে, এমন দিনে মানবের মন, হঠাৎ করে মহৎ আর উদার হয়। খড় এলো, বাঁশ এলো, দড়ি এলো। পালতা খাবার পর সব কাজে লাগবে।

ছোট চৌধুরী সেই থেকে দাঁড়িয়ে আছেন। গিয়েছে মোড়ল। বললেন, কাদিস নে। কাদিবে কেন? খোদা কী মসিবত কাকেও দেয় না?

সইতে পারলে তুমি বলবে আমি পাবান হয়ে গেছি। কিন্তু পাবানে আর একটু চাপ দাও—দেখো কেমন ভেঙে পড়েছে হয়ে গেল। তা হলে তোমার ধারণা সত্যি হল না। ইয়াসিনের কণ্ঠও তেমন ভেঙে চূর্ণ হয়ে গেল, কী ভেবেছ আমাকে? শেষে ভিখারী করে ছাড়বে?

তার মানে?

গায়ে হাত রেখে মৃদু কন্ঠে ছোট চৌধুরী জ্ঞান করলেন, এমন দিনে ও সব কথা বলতে আছে রে?

না না—তা বলে আমি ডিকা নিতে পারি না। ভাগো ছিল—ঘর পুড়েছে কিন্তু তাই বলে তো আর জমিতে আগুন লাগে

নি। যে যা দিচ্ছে সব লিখে রাখ। কদিন বাদে আমি সব কড়ার-গন্ডার শোধ দেব।

আ—

ছোট চৌধুরী আর কিছু না বলে খেমে গেলেন।

মুহুর্তে দুটো-পাটা শব্দ হলো। কে আগে লেখাবে তারই প্রতিযোগিতা। পাশে ইয়াসিন বলে—যেন মস্তিদাতা কেবত। তাকে শুনিয়ে লেখতে পারলে মুক্তি। অতঃপর ও জেনে রাখুক—তার বিপদে বন্ধ পেতে দাঁড়বার লেখকের অভাব নেই। সেখো—দু টাকুর বেটে, পাঁচ খানা বাঁশ, দশ গন্ডা খড়। লেখো—এক গন্ডা বাঁশ, দু পন খড়—

সবাই মুখ তুলে তাকাল ওর দিকে। চৌধুরী বললেন, সে কী—তুই বাঁশ পেলি কোথায়? তের তো বাঁশ-ঝাড় নি—

ভাইয়ের বাড়ি থেকে কেটে দিয়েছি।

স্বরে খুশীর লাফলাফি। ইয়াসিন ভাই শুনছে ত? হ্যাঁ—শুনছে। শোনার সেই নিশ্চিত বিশ্বাসে খুশীর মাতাল হল, দর-কর হলে আরো দেব—

হ—সব দাতাদার। পুর্বালি হাওয়ার মত দিল উদার। অন্য সময় হাত দিয়ে জল গলে না।

ঐ একই ব্যাপার। সাপ-মানুষ ভেদ নেই। একটা গাছের ডাল পেঁয়াজের আর একটা গাছের ডগাকে লম্বা সাপ যেমন মূর্খ বাড়িয়ে পরম আদরে জড়িয়ে ধরে তারপর তলা গাছ চলে যায়। সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। দক্ষিণের ভিতর উদার হয়ে লালসার শব্দ—চুড়টা আজ ইয়াসিনকে টপকে জমিলা নামক বন্ধকে জাপটে ধরবার উদগ্র নেশায় ব্যাকুল।

কিন্তু তা হ'ল না। সেই যে রাজপুত্র তরবার দিয়ে অজগরকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলেছিল—তার আর পাখীর জানা খাওয়া হয়নি। ইয়াসিন বললো, ওর কাছ থেকে বাঁশ নিও না। বরং ওকে ফেরা দাও। ওর নিজের ঘরখানাকে সেরে ফেলুক।

উ।

সবাই যেন চেতনা ফিরে পেল নতুন করে। অনেকেই ত ঐ শব্দচুড়। তারা বিস্তারিত লালসার ফণাকে গোটাতে কীনা ভাবতে লাগল।

সম্ভার কিছু আগে বশুরবাড়ী থেকে এলো গাড়ী। এলো গজ-ডাল-কাঁধ-কাপড় হাড়ি-কলসী এবং এখম্বা নানান সামগ্রী। আর এলো সেই ফুলবাড়ী। এর সঙ্গে নাকি এককালে জমিলায় বিয়ের কথা হয়েছিল। গ্রামসুবাদে ভাই, নিকটসঙ্গকে জড়াজড়ি, আর তাতেই ইয়াসিনের সঙ্গে মধুর সম্পর্কে জোড় গাথা।

কী করে পড়ল ভাই। আহা গ!

ইয়াসিন কথা বলল না পবিত্র, অনেক পরে যখন তাকাল তখন আধা কঠোর দৃষ্টি যেন বলছে, দরদেব কলসী। ফেটে দমন গড়াচ্ছে। আহা এমন প্রাণের জন—মুখে মারি খাতি!

শাড়ী তখন ঘরের গলা জড়িয়ে

কামায় উথালপাতাল, ঘর পোড়া নগ-কপাল পোড়া। খোদা এই তোমার বিচার হ'ল।

অর্থাৎ এই একটি মাত্র ঘর ছাড়া পৃথিবীর আর সব ঘর পুড়ে ছাই হ'লে উপর-ওরালার ন্যায় বিচার হতো এবং ঠিক বিচার করেনি বলে, ভুলজাত ভ্রোখে বড়ী এই মুহুর্তে খোদাকে সামনে পেলে হাত-পা-বাঁট সহযোগে একটা মস্ত কাণ্ড করে বসত।

ফুলবাড়ী ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে চায়। কী বলবে ইয়াসিন। আগের দিন-গুলি হলে বৈঠকখানার ঠান্ডা বসিয়ে রাখত কেবল খাবার সমরটুকুতে অন্দরে প্রবেশ এবং আহাযান্তে প্রস্থান। কিন্তু আজ অন্দর-বার সব একাকার। তাই মেয়েমহলের কাছাকাছি যেতেই ইয়াসিন হাঁক দিল খামবে কী না বল—নইলে কোথাও চলে যাই আমি।

কাজ হ'ল। যেন উদ্ভত ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরা। মেয়েমহলের কামা থামল। ফুলবাড়ী ফিরে এল।

কিন্তু এমন চীৎকার? কাঙালীরা ভীড় করেছে দু' চার গ্রামের—হিন্দু, মুসলমান। গোড়া চাল, সিঁথ আলু ও দু'গন্ডা অন্য সামগ্রী নিয়ে কাড়াকাড়ি।

দু' দিনেই ঘর উঠে গেল। বৃক-মহলে দ্রুততা আর প্রতিযোগিতার রসিটানে ইতি পড়ল।

আই ইয়াসিন ভাই—দেখো, কেমন হ'ল ঘর, বৈঠকখানা, গোয়াল এবং চৌকশালসহ মন্ডার জায়গা। উঠে এসো, ঘরে ঘুরে দেখো—কোথাও কোন খুঁত থাকলে—

আবিদ এবং তন্ম্যান উদার হওয়া বৃকবন্দ ইয়াসিনকে টানছে। স্বরের গাঢ়তা ও আন্তরিকতার সে টান স্তম্ভমান। জাম-লার ম্বাশী ইয়াসিন, ফরিদার আশা ইয়াসিন। তাই স্বর স্বভাবতই মৃদু এবং কম্পমান।

বস্ত কণ্ঠ করছে তোমরা। মনে থাকবে। ইয়াসিন কৃতজ্ঞতা জানাল।

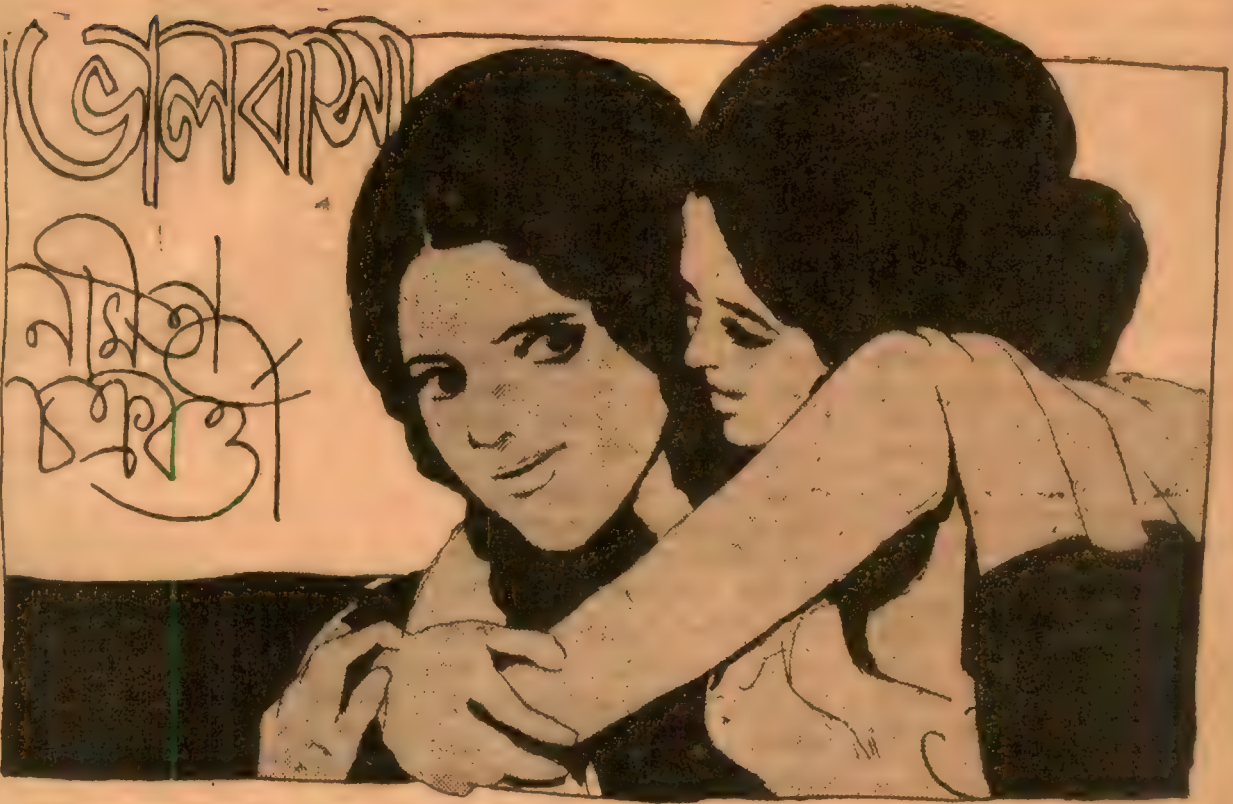
কাজ সেরে অন্দরমহল থেকে বাইরে এল সব। বৈঠকখানার বসল কেউ কেউ। এখান থেকে অন্দরমহলের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না।

সোনার কৌটোল ভীমমূল, রাফনের প্রাণ, যথা নিরাপদ স্থানে আবার অন্তর্হিত। এখন থেকে আবার প্রতিনিয়ত, গ্রামের লোকেরা ছেলে-বৃক এবং প্রৌঢ়, দখিন মাঠে যাবার সময়, এই ঘরের কাছটায় এসে, উদাস এবং বেদনাতুর চোখে তাকাবে। তারপর আবার পথ চলবে।

যেন একটা বৃক হয়ে সামনের পথে হাটা। পরিধির পক্ষিমা শব্দে আবার যথা-স্থানে ফিরে আসা। চরবেড় ভাঙার দুরন্ত ইচ্ছা আবার যত্ন। কিন্তু বৃক গোলাকার এক নিরন্ত সমুখভাগে প্রসারিত। তাই শূন্যবী আজও টিকে আছে।

ভেলবাসা

নন্দিনী
চন্দ্রিকা



আমাদের বাড়ীতে দোতলার ছাদের পাকা সিঁড়ি ছিল না। রোজ পড়া শেষ করে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে মাদুর পেতে শুয়ে থাকতাম। আকাশের ফুটফুটে তারাগুলি যেন হাসতো আমার দেখে। আর একজনের আসার আশার থাকতাম পথ চেরে।

সেদিন ঠান্ডা হাওয়া পেয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি মায়ী এসে আমার জড়িয়ে ধরেছে আর গাল ধরে আদর করছে। ঘুম ভেঙে গেল, জিজ্ঞেস করলাম, 'এত দেরী কেন?'

মায়ী বললে, 'অনেক পড়া ছিল—শেষ করতে দেরী হলো। জানি, তুই রাগ করছিস—তাই ছুটে এলাম।'—বলে আমার মাথার চুল বাঁটতে লাগলো। একটু পরে আবার বললো, 'জানিস সুনী, আমি একটা ছেলেকে ভালবাসি।'

শুনে আমি একটু চমকে উঠলাম। চোদ্দ বছর বয়সে ভালোবাসা! ও আমার মন বুঝে বললে, 'জানি তুই অবাক হবি; কিন্তু সরস্বতী পূজার সময় আমাদের ক্রাবের খিলেটরে সুলালদা বাঁশী বাজিয়েছিলো। ওর বাঁশী শুনে আমি ওকেই বিয়ে করবো ঠিক করেছি।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'বয়স কত, দেখতে কেমন?'

মায়ী বললে, 'বছর কুড়ি বয়স হবে। টানাটানা লম্বা চোখ দুটি অশ্রু সুলার। তবে ওরা কারুণ্য, আমরা রাগাশ—এতে বাধা পড়বে। আরও বাধা পড়ার কারণ আছে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'সেটা কি?'

বললে, 'ওর বাবা অসুস্থ, তাঁর কোনও দিন ভাল হবে না। তাই ওর ওপরই

সংসারের সব দায়িত্ব। আর ওদের অবস্থাও খুব একটা সুবিধের নয়। সুলালদা আমার নিজেকে একথা বলেছে। আমার ও জিজ্ঞেসও করেছে যে, এ সব শুনেও আমি তাকে ভালোবাসি কিনা।'

বললাম, 'কি উত্তর দিলি?'

মায়ী বললো, 'বললাম, আরো বেশী ভালোবাসি।'

মায়ীকে বললাম, 'মায়ী, তোর ওপর আমার ভালোবাসা আরো বেড়ে গেলো। অর্থ দিয়ে ভালোবাসার বিচার হয় না। তোদের এই মন দেওয়া-নেওয়ার তাই আমি সমান আনন্দ পাচ্ছি।' আনন্দের চোটে মায়ীকে আমি বুকে জড়িয়ে ধরলাম। মনে মনে ভাবছিলাম, ভালোবাসার মায়ী সত্যি অতুলনীয়।

মায়ীরা এক ভাই, এক বোন। ওর বাবা যেমন অভ্যস্ত ভালোমানুষ, মা তেমনি খুব কড়া। ওর মায়ের চশমার ভিতর দিয়ে চাউনিটা দেখলে আমার কেমন ভয় ভয় করতো। 'আমার মেয়ে খুব সুন্দরী'—এই ভাবটা তাঁর সব কথায় প্রকাশ পেত। অবশ্য মায়ীর গুণটা ছিল খুব ফরসা, এক পিঠি কালো কৌকড়ানো চুল। চওড়া কপাল। চোখ দুটো খুব বড় না হলেও তার পল্লবগুলি এত সুন্দর যে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

পরের দিন রাত নটা নাগাদ আমরা দুজনে একসঙ্গে ছাদে উঠে মাদুরটা পেতে দুজনে বসলাম। আমিই জিজ্ঞেস করলাম, 'কিছু, সুলালদার সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

মায়ী বললো, 'হ্যাঁ, আজ স্কুলে বাবার সম্মত রথীন্দার বাড়ী গিয়েছিলাম, সেও তখন ওখানে ছিলো। রথীন্দার বৌকে বৌদি

বলি। বৌদি আমাদের কথা বলার খুব সাহায্য করে।'

বললাম, 'এতটা যে এগিয়ে যাচ্ছিস, কিন্তু মাসীমা বা রাশভারি—কখনই এ যিহে হতে দেবে না।'

মায়ী বললো, 'ঠিক বলেছিস। তাই ত লেখাপড়া করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই। তখন এত বাধা থাকবে না।'

এরপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে ও আমার হাত টেনে একটা গান গাইতে বললো। গাইলাম—

"এমন দিনে তারে বলা যায়

এমন ঘন ঘোর বরিষার..."

—বেশ কিছুক্ষণ গাওয়ার পর সত্যিই বৃষ্টি নেমে এলো। ভিজতে ভিজতে দুজনে নেমে এলাম।

পরের দিন বাবার মৃত্যু শুনেলাম, আমাদের এ বাড়ী ছেড়ে যেতে হবে। শুনে মনে দুঃখ হল। কিন্তু বাবাদের বাড়ী তাদের প্রয়োজন। তাই আমরা পুরনো বাড়ী ছেড়ে পার্ক সার্কাসের এক বাড়ীতে উঠে এলাম। মায়ীকে ছেড়ে আমার জন্য বুকটা ব্যথায় ভরে গেলো। আমাদের সেই ছাদ, সেই আনন্দময় স্মৃতি জেগে রইলো মনের মধ্যে।

মায়ী আর আমি দুজনেই স্কুল ফাইনাল পাশ করলাম; ভর্তি হলো একই কলেজে। কি আনন্দ, কত বন্ধু! মায়ী কিন্তু রোজ আমার পাশেই বসতো। বন্ধুদ্বা এর জন্য কত ঠাট্টা করতো; মাঝে মাঝে দুজনের আঁচলে গিট দিয়ে দিত।

একদিন মায়ী বললে, 'এই নীতা, অজ্ঞা খাউ' পিরিয়ডে বেরিয়ে যাবো। তুই আমার প্রিন্স দিবি। আমাকে মা বারবার দেখাচ্ছে

পাত পাকবে। একে আর কল্যাণে একটা ব্যবস্থা করতে।

এক ঠিক তিন মাস পরে আমার নিজের বিয়ের ঠিক হয়ে গেল। শুনলাম এক দুর্ভাগ্যবান মেয়ে, সদা জেল-মেয়ত ছিলে আমার সেকেন্দ্রে আসবে। দাঁড়িয়ে কল্যাণ, 'একটা বিলুপ্ত হাড়া আর কিছু গিও না। কারো আশাকে ত আর পছন্দ হবে না।'

দাঁড়ি আমার গাল টিপে দিয়ে বললে, 'এখন মেয়ে পাবে কোথায়?'

পরদিন বিকালে পাত পাক দেখতে এলেন। এঁদের কথা ছোটবেলা থেকে শুনছি; এঁরা রিভলভার নিয়ে খেলা করেন—হাঙ্গামাধে ফাঁসিতে যান। বৃক্কের মধ্যে আনন্দে চটে বসে গেল। চোখ বৃক্কের ভাব-লায় আঁখি ও ত আঁখি দেশের, আমার মায়ের সেবা করতে পারবে। দাঁড়ি এসে ডাক দিতে যান ভাঙলো। নীলাবরী শাড়ী পরে, কপালে কুমকুমের ছোট একটি টিপ দিয়ে হাঁর পারে ওঁদের সামনে দাঁড়ালাম। সত্যি বলতে কি, সন্ধ্যাকেই আমার ভালো লাগতো। একটা সেকেন্দর পর ওঁরা আমার একটি গান শোনতে অনুমতি করল। গান ধরলাম—

"হার মানালে গো

ভাঙতে অভিমান..."

গান শেষ করে উঠে এলাম। হাবার সময় ওঁরা জানিয়ে গেলেন আমার পছন্দ হয়েছে ওঁ আর একদিন আসবেন।

আর একদিন সত্যি তিনি এলেন হাঁর জন্য সব কথাই এসেছিলেন। দাঁড়ি তিনি বললেন, 'আপনার বোমকে আমার একটি কথা বলার আছে। আপনার কি কিছু আপত্তি আছে?'

দাঁড়ি আনন্দের সঙ্গে সম্মতি দিয়ে তাঁকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

কোট ছিল না ধরে। উনি ধরে চক্রেই আমি চেরাটো এগিরে দিলাম বসার জন্য। বেশ বলিষ্ঠ লম্বা চেহারা, চোখ দুটিও সুন্দর। হঠাৎ কোনও মলিনতা নেই। আমার বেশ ভালো লাগলো। একে কিভাবে করা যায়, সাধী করা যায়। উনি প্রথমেই আমার জিজ্ঞাস করলেন, 'সুনীতা দেবী, কলনে তো, বাট টাফা রাইনের কোন লোক কি বিয়ে করতে পারে?'

উত্তর দিলাম, 'কেন পারে না, যদি স্ত্রী সুগৃহিণী হয় আর চাকরী করে।'

কেন যে এ কথা আমার মনে দিতে বেরিয়ে এলো, তা নিকে সেদিন বক্তৃত পারিনি। এই সময় দাঁড়ি এক শ্রেণি খাবার ও এক কাপ চা নিয়ে ধরে চক্রেই আমি বসে থাকা বারান্দায় এসে বসেছিলেন। দূরে কুমকুমের গাছ লাল ফুলে ভরে উঠেছে। এক দৃষ্টে চেয়ে রইলাম।

বারেই মাঝ আমার বিয়ে। যখন আমার বিয়েতে আমাকে সন্মত করে নাড়িয়ে দিলে। তারপর আরনার সামনে

বসে করিয়ে বললে, 'সেখ, তুই কত সুন্দরী!'

বললাম, 'কেন, আমার বরও তো সুন্দর!'

ও বললো, 'যেহ, তোর কাছে কিছু না।'

মনে মনে বললাম, 'সেখো, তোর কত ভালো হর!'

আমার বিয়ের দুমাস পরেই শুনলাম মায়ার বিয়ে। শুনেন কথাটা প্রথমে বিশ্বাসই হয়নি। মায়ার প্রায়ই আমার শব্দবোঝা হাওয়া আসা করতো। জিজ্ঞাস করলাম, 'কি করে মাসিমাকে রাজি করালি?'

মায়ার বললে, 'মাকে রাজি করিয়েছি, কিন্তু ওদের বাড়িতেই অমত। তাই বিয়ের পরও আমি মা বাবার কাছেই থাকবো; আর নিজের মনস হবার চেষ্টা করবো।'

মায়ার বিয়েতে কোনও রকম আনন্দ হলো না। সব যেন যন্ত্রচালিতের মত কাজ সারা হলো। 'আমার বাড়িতে বৌভাত ও ফলশয্যা হবে'—তাই কথাটি আমি মাসীমাকে জানালাম। আমার এই কথা শনে মাসীমার আনন্দের আর সীমা রইলো না। পরের দিন তিনি সুন্দর করে ফলশয্যার তত্ত্ব আমার বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন। আমি মায়াকে রাণীর মত সাজালাম। এতদিনে আমার মনের আশা পূর্ণ হলো ওদের মধু-মিলন দেখে।

বিয়ের এক বছর পরে মায়াকে নিয়ে সুলালদা আসামে চলে গেল। সেখানে ও ভালো চাকরী ও কোয়ার্টার পেয়েছিলেন। মায়ার মাকে চিঠি দিত। কিন্তু ক্রমশঃ এটা একেবারে কমে গিয়েছিল। একদিন হঠাৎ মায়ার দাদা সুমনদা এসে জানালো যে মায়ার এসেছে। সে আমার তার কাছে যেতেও বললো। আমি পরের দিন গিয়ে দেখি, মায়ার আলনার কাপড় গাছিয়ে রাখছে। কছেই তার বাচ্চাটি দোলনার ঘুমোচ্ছে। আমাকে দেখেই মায়ার হঠাৎ এসে বকে জড়িয়ে ধরে বললে, 'জানি, তুই খুব রাস করে আছিস। কিন্তু কি করি বল, সংসারে কত কাজ!'

অথচ এই মায়ার আমার একদিন না দেখে থাকতে পারত না। একটু পরেই সুলালদা এলো। ছোট ব্যাগটা টেবিলে রেখে আমার বললে, 'দাঁড়িভাই, ভালো আছা ত?'

আমি মাথা নাড়লাম। মায়ার এক গেলার খাবার জল টেবিলে রেখে স্বামীর পারের জুতো খুলতে লাগলো। আমি আনন্দের সঙ্গে ওর স্বামীভক্তি দেখছিলাম। সেদিন জন্মের আমার তাড়াতাড়ি চলে আসতে হলো। কারণ দশ দিন পরেই আমার বি-এ

পরীক্ষা আরম্ভ। ওদের দুজনকে একদিন আমার বাড়ী আসার জন্য বলে এলাম।

প্রায় ছোল বছর মায়ার কোন বর পাঠ নি। শুনিয়েছিলাম আসামেই তারা আছে। হঠাৎ সুমনদা আমার একদিন এসে হাজির। সুমনদার টি-বি হয়েছে। কাশি-এ অনেকদিন ছিল। কিন্তু কোনও উপকার না পেয়ে চলে এসেছে। অফিস থেকে বা থরু দিয়েছিল, তা শেষ হয়ে গেছে। দেখলাম ওর চেহারা বেশ রোগা হয়ে গেছে, বড় বড় চোখ দুটি গর্তে ঢেকে গেছে। এরপর মায়ার কথা জিজ্ঞাস করতেই ও হাত হাউ করে কেঁদে উঠে বললে, 'মায়ার আর নেই রে, নেই। হঠাৎ বাচ্চা হয়েছে। সাতটির বেলায় একেবারেই' হয়ে ও আসামেই মায়ার গেছে।'

শুনেন আমার বৃক্কের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠলো। কী শুনলাম! এও কি সম্ভব। মায়ার নেই!

সুমনদা আরও বললো, 'সুলালদা আমার বিয়ে করেছে। এখনও কলকাতায় বাড়ীতেই আছে।'

সে রাতে আর ঘুম এলো না চোখে। স্বামী বোঝালেন, বললেন, 'গিরে বরং একবার দেখে এসে বাচ্চাগুলিকে।'

পরের দিন বিকেলে ওদের বাড়ী গেলাম। সুলালদা ওখনও ঘেরে নি। দেখলাম বছর তিরিশের একটি শ্যাখ্যাতী মহিলা কুটনো কুটছে। আমার দেখে অবাক হয়ে চেয়ে রইলো।

বললাম, 'আমি মায়ার বন্ধু।'

শুনেন একটা আসন পেতে আমার বসতে দিলে।

বললাম, 'বড় মেয়ে সীতা কোথায়?'

'সে তার পিসীর কাছেই থাকে। আমাকে সহ্য করতে পারে না'—মহিলাটি উত্তর দিল।

একটু পরেই বাচ্চাগুলি হুড়োহুড়ি করতে করতে ঘরে ঢেকে মায়ার কাছে থেতে চাইলো।

মা কাঁথিয়ে উঠে বললো, 'চাঁদাঘ ঘন্টা খালি খাওয়া আর খাওয়া। বাবার কি জমিদারী আছে?'

বাচ্চাগুলির মূখ ভরে শুকিয়ে গেলো, তারা আর কিছু না বলে আশ্রিত আশ্রিত সেখানে থেকে চলে গেল। আমি সবদা ছোটটাকে কোলে টেনে নিলাম। ঠিক মায়ার মূখ বসানো।

এই দেখে মায়ার সতীন তার নিজের বাচ্চাটিকে আমার কোলে দিয়ে বললে, 'এই নিন, এটা আমার।'

বাচ্চাটিকে 'কালে নিয়ে ভাবলাম, মায়ার ত তার যখনবন্দ্য দিয়ে ভালোবাসেছিল সুলালদাকে। কিন্তু সুলালদা কি সত্যি ভালোবাসতো মায়াকে!

'দেহালে গাওয়ার মায়ার ছবিটার দিকে নজর পড়তেই মনে হলো ওর চোখ দুটি জল ভরে আছে। ভালোবাসার এই পরিণাম বৃক্ক ওর স্বপ্নাভীতি ছিল।'



তখনই নারী প্রিয়া, যত দিন বাবে ততই
সে ধাপে ধাপে গৃহিণীর পদে উন্নীত হবে।
গোড়াতেই এক গিন্নীকে বিয়ে করে আনবে
না এই সিদ্ধান্ত অলকেশ নারী সম্বন্ধে
সচেতন হবার সঙ্গে সঙ্গেই করে ফেলেছিল।

আজকের এই অতিরিক্ত বাস্তববাদী
জগতে অলকেশ একটি ব্যতিক্রম—একটু
বেশী ভাববিলাসী, কল্পনাপ্রবণ..... নিজের
মনকে নিয়ে ও যেন খেলা করতে ভালবাসে
...কত কি মনে মনে গড়ে আবার ভাঙে।
ভাবুক হওয়া এমন কিছু, ক্ষতিকর নয়
কিন্তু অলকেশের চারিদিকে একটা বিশেষ

সহজ হয়ে ছেলেকে বারে বারে উৎসাহ
দিচ্ছিলেন—“ও অলক! তুই একটুও
ভাবিসনি, আমি বলছি তোকে বেশী কিছু
জিজ্ঞেস করবে না। যখন কথাবার্তা বলবি,
মনে মনে ভাববি যেন আমার সঙ্গেই কথা
বলছি।”

মুখে উৎসাহ এবং বাহা বাহা জোরালো
নার্ভ টনিক খাইয়ে ছেলেকে চাণ্ডা করে
রাখার অদম্য প্রয়াস অবশ্য সফল হয়েছিল
মায়ের। চাকরীতে প্রবেশ করার দুই-
গাটটি অলকেশ নির্বিকার পেরিয়ে আসতে
পেরেছে।

এ হেন অলকেশের আজ জীবনের রৈড
লেটার ডে তথ্যই ফুলশয্যা। হ্যাঁ—এক
অচেনা, অজানা তরুণী আজ প্রথম
অলকেশের জীবনে ‘রাণীর মত রতন
আসনে’ উপবেশন করার জন্য আবির্ভূত
হচ্ছেন। বিয়ের ঘটকালী করেছেন
অলকেশের সুবাসিকা বৌদি ভারতী দেবী।
এর পছন্দের ওপর অলকেশের অগাধ
আস্থা।

ভারতী আধুনিক—কিন্তু ‘অতি’ নয়—
অর্থাৎ যদিও বেশবাসে ছিমছাম তবুও তার
নিজস্ব ঢুল দিয়েই ফাঁপিয়ে কলিয়ে এলো-
খোঁপা বাঁধেন, কপালে লাল টিপ পরেন আর
ঠোঁটে একটা বাচ্চেতাই বিবর্ণ সেডের
গোলাপী লিপস্টিক লাগান না, (এই রথক

একটি রাত্তির মেসেথায় নীলিমা বুতোসখিয়া

এ রাত জীবনে একবারই আসে। তরুণ
মনের কল্পনা, আশা, স্বপ্ন আর
আবেশ দিয়ে এর মূহুর্তগুলো যেন
বানো, সব অনুভূতি গুছিয়ে মনের মধ্যে
গুঁথি হয়ে যায়, একটা সরু সুতোও খুলে
না, আজন্মের মত স্মৃতির ঘরে সাজান
করে।

অবশ্য আজকাল অনেক হতভাগ্য তরুণ-
তরুণী প্রথম মিলনরাত্রির এই আশ্চর্য
সুখকে ভেবে বিগত হচ্ছে। লোকের ধারে,
লোকের ভেতর, বটানিকসের ঝোপে-ঝাড়
জোড়ায়-জোড়ায় আলাপেরত যুবক-যুবতীর
না রীতিমত করুণা হয় অলকেশের। প্রিয়া
এ অচেনা, অজানা, রহস্যবতাই না রইল
তবে তাকে এক সমারোহময় শূভদিনে
বিবাহের করার মধুর অনুভূতি থেকেই
তা বিগত হতে হবে। বার বার পড়ে ফেলা
দুখির মত পুরোন বউ অলকেশের কোন-
দিনও পছন্দ নয়। যাকে জানা নেই, তার
আকর্ষণই তো মনকে উত্তেজনা, কোতূহলের
গিলিয়ে দেয়, জানা হয়ে গেলেই কোতূহল
মবসান। বিয়ের পর যখন প্রথম জানাজানি

খবর আছে, সেটা হল অতিরিক্ত নার্ভাস-
নেস। মনের মধ্যে যখনই আলোড়নের কারণ
উপস্থিত হয় অলকেশ নিজের ভারসাম্য
হারিয়ে ফেলে—এর ফলে পরীক্ষার সময়
ওর পেট কামড়ায়, মাথা ঘোরে। মাঠে
ইস্টবেপাল, মোহনবাগানের খেলা থাকলে
সেদিন সকাল থেকেই ওর আহায়ে রুচি
থাকে না, বৃক্কের মধ্যে যেন বেড়ালে
ধিমচাতে থাকে। জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট
থাকলে দু’ ঘণ্টা আগে থেকে ওর মনে হয়
ও বোধ হয় যথাসময়ে পৌঁছতে পারবে না।
ট্রেন বা স্টেশন ধরতে হলে এক ঘণ্টা আগে
ও এয়ারপোর্ট বা স্টেশনে গিয়ে নিজের
অবশ্য হাত পাগুলোকে বেশ আনার চেষ্টা
করে।

চাকরীতে ইস্টার্নভিউ দেবার চিঠি যখন
এসেছিল তখন দু’ভাবনার তাড়নে
অলকেশের মনে হয়েছিল ওর যেন ১০৫°
ডিগ্রী জ্বর এসেছে। মা বিলম্ব চিন্তেন
তার পত্রটিকে—ছেলের শূকনো কালাবদ
মুখ দেখে তারও অন্তরাঝা শুকিয়ে
আসছিল, কিন্তু তিনি বুদ্ধিমতী—একান্ত

অলকেশ বলে ঘায়ের মামড়া উঠে বাতায়
পরের টেজ। মোটকথা অতিআধুনিকারা
অলকেশের দু’চক্ষের বিষ।

ভারতী ‘মৌখ পরিবারের মেয়ে। তার
যতগুলি মামাত, পিসতুত, খুড়তুত,
জ্যাঠতুত আইবুড়ো বোন ছিল—সকলেরই
নাম লিখে রেখেছিলেন, কিন্তু তারা সবাই
নাকচ হয়েছে, এর মানে নয় যে এদের মধ্যে
কেউ সুন্দরী নয়। একটি কমন খবর
সকলেরই রয়েছে, তারা সকলেই অলকেশের
পরিচিতা—সুতরাং রহস্যের অবগুপ্তনমুদ্র।
অবশেষে বৌদি খুঁজে খুঁজে একটি সুন্দরী
মেয়ে বার করেছেন—বাড়ীর সকলেরই পছন্দ
হয়েছে। অলকেশকে তো মেয়ে দেখতে বলার
প্রশ্নই ওঠে না, একখানা ছবি দেখাতে
এসেছিলেন বৌদি। চোখের সামনে ধরতেই
তৎক্ষণাৎ চক্কু মুদে তিন হাত দূরে ছিটকে
দাড়াল অলকেশ—

“আঃ বৌদি, কতবার বলব—তোমাদের
পছন্দ হলেই হবে, আমি এখন দেখব না।”
“বাবাঃ বাবাঃ” হাসতে হাসতে গাড়ি
গেলেন বৌদি—“এমন সেকলে এমন অসুখত

হেলে তোমার মত আর একটিও দেখিনি
ঠাকুরপো। এখনকার ছেলেরা তো না দেখে,
না কোর্টশিপ করে বিয়ের নামেই ভয় পায়।
তুমি বাপু, সন্টিছাড়া, শূভলগ্ন না এলে
মুখই দেখবে না?"

"আমি কেমন করে দেখব জান বৌদি"—
রোমাঞ্চে, আবেগে গদগদস্বর অলকেশের—

"পরিপূর্ণ পুর্ণিমার মাঝে
উষা-মুখে চকোর যেমন
আকাশের ধারে যায়

ছিঁড়িয়া দেখিতে চায়
অগাধ স্বপনে ছাওয়া জ্যোৎস্না আবরণ।"
বৌদি আবার হেসে লুটোপুটি—

"কিন্তু ওগো কাব্যডামনি, সব ভার
তো আমার দিলে। আমি তোমার জন্য
জ্যোৎস্না রেখেছি কি অমাবস্যার অন্ধকার
জমা করেছে তার কিছু স্থিরতা আছে?
দেখো বাপু, এর পর আমার দোষ দিও না
—বোল না বৌদি আমার ভূমিমালা দিয়েছে।"

"তোমার চোখ কখনই ভুল করতে পারে
না। তুমি এমন সুপার্ব—গ্লামাড", বাংলা
বিশেষণ বেশ হয় উত্তেজনার ঝোঁকে মনে
এল না, ক্ষতিগুরুগম্বরূপ কাণের কাছে মুখ
এনে গুণ গুণ করল অলকেশ—

"ধীর গম্ভীর, গভীর মৌনমহিমা
স্বচ্ছ অতল স্নিগ্ধ নয়ননীলিমা
স্থির হাসিখানি উষালোকসম অসীমা
অগ্নি প্রশান্তহাসিনী।"

"থাক থাক আমার আর স্মৃতিথাকো
ঘুর দিতে হবে না। ওসব তোমার রহস্য-
লোকচারিণীর জন্য জমা রাখ।"

বৌদি ছাঁব নিয়ে পালালেন।

আজ সকাল থেকে সানাইয়ের সুরে
সুরে অলকেশের হৃদয়তন্ত্রী বারে বারে
রিংরিং করে উঠছে। বিয়ের সময় ইচ্ছা
করেই কনের মুখটি ভাল করে দেখিনি
অলকেশ—তবে আড়ে আড়ে যেটুকু চোখে
পড়েছে তাতে, অসন্তোষের কিছু নেই।
কিন্তু মালাবদলের সময় বৌয়ের চুল বাধার
ধরনটা দেখেছিল, তাতে যেন অতি-
আধুনিকতার ছাপ। সিঁথি নেই বয়েই হয়,
মাথার মাঝখানে টিপি মত করে তার ওপর
সাদা জমির ওড়না আটকানো হয়েছে।
কেমন যেন ছন্দপতন মনে হল অলকেশের।
কপালে টিকিল দেওয়া লালক একটি মুখ
তার মনের মধ্যে আনাগোনা করেছে আজ
সারাদিন।

কুশিড়িকার সময় বৌদি কিন্তু বৌকে
স্নান করিয়ে এলোচুল করে ভারী সুন্দর
সাজিয়েছিলেন। সুন্দর সরু সাদা সিঁথিতে
সিন্দূর পরিবে দেবার সময় উত্তেজনার ধর
ধর করে হাত কাঁপছিল অলকেশের,
অনেকটা সিন্দূর জমকালো সেনারসীর ওপর
পড়ল। বৌদি দেওয়ার চরিত্র জানেন, চুপি
চুপি সাবধান করলেন, "এই ঠাকুরপো,
নাভীস হলো না—বৌ ভাববে কি!"

বদিক বকে ঢৌকির পাড় পড়ছিল—
প্রাপণ চেম্টার স্বাভাবিক থাকার চেম্টা
করেছে অলকেশ। সিন্দূর দিয়ে ঘোমটা টেনে
দিয়েছে বৌয়ের মাথায়। লাজ আবরণ তো
স্বামীকেই ঢেকে রাখতে হয়। অন্তর্ধান লেহ-
হল—কিন্তু মৃদু উত্তেজনার রেশ রয়ে গেছে
অলকেশের হৃকের মধ্যে। কালরাতি বিনিময়
কাটল—সকালে উঠেও আশ্চর্য্য হয়ে রইল
অলকেশ। এই সুন্দর তাজা ফুলের মত
মেয়েটি তার একান্ত নিজের—আজ রাতে
এর সঙ্গে পরিচয় হবে। গানের কলি ঘুরে
ঘুরে মনে আসছে—

"করব তোমার কী সম্ভাষণ,
কোথার তোমার পাতব আসন
পাতাক্ষয়া কুসুম করা নিকুঞ্জ ফুটীরে।"

কিন্তু সম্ভাষণের এখন বহুদূর দেরী—
অনেক কষ্টে দুপূর হয়েছে। সম্ভাষণ
নির্মিতদের আনাগোনা শেষ হবে, মেয়ে
দের নানা রকম স্ট্রী-আচার সাঙ্গ হা
ফুলশয্যা হতে গভীর রাতি হবে নিশ্চয়-
এতক্ষণ উত্তেজনা দমন করা মানে স্নান,
সঙ্গে রীতিমত মলবৃন্দ করা। নিজে
অনামনস্ক করার জন্য গল্পের বইয়ের পাত
ওলটতে লাগল অলকেশ। এমন সময় চো-
পড়ল টেবিলে নতুন সামগ্রিক পটিকা
রয়েছে। এই পটিকার অলকেশ অনেকদিন
ধরেই গ্রাহক—সম্প্রতি এতে দু'তিন সপ্তা-
ধরে একটি ভারী চিত্রাকর্ষক উপন্য
বেরচ্ছে। অলকেশের অত্যন্ত প্রিয় লেখকে
রচিত উপন্যাসটি প্রথম সংখ্যা থেকেই ও

বাংলা
বিহার
আসাম
উড়িষ্যা
প্রভৃতি স্থানে
আমাদের বহুল
প্রচারিত অমলজীন
বিক্রমার্থে
উত্তম সতর্ক
প্রতিপত্তিশালী
স্থানীয় ষ্টকিস্ট
ও ডিলার চাই
সহর লিখন :



অসহ্য পোঁর বেদনা আরোগ্য করে!

এম. এ. করিমের
অমলজীন

অজীর্ণ, অম্লপিত্ত, অম্লশূল, বায়ুশূল,
পলাবুক-জ্বরা, নিভার ব্যথা,
গ্যাস্ট্রিক আলসার ইত্যাদি
সারাস্বক পেটের বীড়া
দ্রুত নিরাময়ে আশ্রয়
ফলপ্রসূ।

অমলজীন কুটীর সায়েস্তা নগর
২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ

উত্তর
পশ্চিম
ও
দক্ষিণ ভারতের
বিভিন্ন প্রদেশে
উচ্চ কমিশনের
ভিত্তিতে
সম্ভ্রান্ত ও
প্রতিপত্তিশালী
এজেন্ট চাই
সতর্কদির জন্য
লিখন।

ভাল লাগছে, পড়া হয়ে গেলেই পরের প্রকাশিত হবার অপেক্ষায় থাকে ও। হিকটি খুলে সাগ্রহে মনোনিবেশ অলকেশ। এই সংখ্যাতে নিপুণ লেখক বাহিত নায়ক নায়িকার প্রথম মিলন-বর্ণনা দিয়েছেন। ভাষা অত্যন্ত সার্বলীল—কিন্তু তার মর্মার্থ পড়ে যেন মাথা কিম্ব কিম্ব করতে লাগল শর। বইতে লেখা আছে নায়ক যখন মনের আবেগ উজাড় করে নায়িকাকে গন করতে উদ্যত—তখনই নায়িকা সরে গিয়ে মোক্ষম বস্তু নিক্ষেপ করলে বকে—সে নাকি স্বেচ্ছায় এ বিয়ে দেবে, সে অন্য একজনের প্রেমাসক্ত, যদি দম্মা করে নায়ক স্বামীর না দাবী করেন তাহলে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। তাৎপর্য আরও অনেক কিছু লেখা সেসব কিছু কিন্তু অলকেশের ডা হল না—সে মাথা টিপে বিছানায় ডিল।

নিশা! এদিকটা তো একবারও মনে ন অলকেশের, নিজেই খালি বোকার মনের জাল ধনে চলেছে। রহস্যময়ী! রিণী। হু—এসব আধুনিকারা কবে ফার কাছে রহস্যের দ্বার পুবেই করে ফেলেছেন কে তার হিসাব গেছে? নানা জায়গায় বিভিন্ন তিতে দেখা আধুনিক মেয়ের দল শর চেখের সামনে নাচানাচি করে লাগল। অনুরাধা! তান্ন বন্ধুর প্রিয়বান্ধবী, দু বছর ধরে দু'জনে গোমেশা কত মন জানাজানি—তারপর লেভফের বড় চাকুরে ইনজিনিয়ারের লিতেই দিব্যি নিখিলকে কলা বিয়ে করে ফেলল। এ পাড়ারই জত—তার বো তো বোশীর ভাগ বাপের বাড়ী থাকে, রজতকে নাকি গৃহস্থ হয়নি। আর তার নিজের বোন বিদিশা—যে দেখা হলেই শর প্রতি বাঁকা বাঁকা বিদ্বেষাণ করে—

লকদা, তোমার মেডিরীভাল যুগের সিজমই না হয় আরম্ভ কর। হয়ে জুলিয়েটের জানলার নীচে একবার দাঁড়াও, তোমার দুই-তিন প্রিয়া চকিতে একবার দর্শনদানে যত্ন করুন।" বচাল মেয়েটা নিত্য নতুন বস্ত্র ঘুরে বেড়ায়। লজ্জাও নেই, না আগলও নেই।

অনেক কুদৃষ্টান্ত ভিড় করে কেশকে ভয় দেখাতে লাগল। উঠে পড়ল অলকেশ—অনর্থক দু'খেল, বারান্দায় পায়চারি করে লাগল। কাজের বাড়ী...সবাই বাস্তব জর ঘরে বোকে শুইয়ে রেখেছেন, মীরের ওপর খুব ধকল হচ্ছে একটু ঘুমিয়ে নিক—আজ আবার ঘরের পালা।

চুপি চুপি একবার জন্ম অলকেশের মনটা উদ্গীর্ষ লি—হৃদয়ের কেমন ছবি ও-মুখে

আঁকা আছে কে জানে—সে ভাষা পড়ার সাধ্য হবে কি অলকেশের! কিন্তু দরজা বন্ধ, ব্যর্থ হয়ে আবার ফিরে আসতে হল।

মানসিক অবস্থার ওপর প্রবল চাপ অনুভব করতে লাগল অলকেশ—হাত পা যেন অবশ হয়ে আসতে লাগল।

তারপর সময়ও একটু একটু করে এগিয়ে চলল। প্রতি মিনিট কটার মত অলকেশকে খোঁচা দিয়ে গড়িয়ে গেল। সম্ভ্রা এল, বর্ণাঢ্য, সমারোহময়—বহু প্রতীক্ষিত রাত্রির আগমনী হয়ে। কত লোক, সানাইয়ের পাগল-করা সুর, কত হাসি, কথা। স্বপ্নে হাটার মত সেসব পেরিয়ে এল অলকেশ। বন্ধুরা কত ঠাট্টা করল, বোয়ের রূপের প্রশংসা করল, ওর সব বোধগম্য হল না, মনে হল এক ভীষণ পরিণামের নিকে সে এগিয়ে চলেছে।

ঘরে ফুলে ফুল, ফুলের মশারি, ফুলের ঝাড়, বিছানা কুসুমাস্তরণ, তার সপ্তে, দামী সেপ্টের গন্ধে বাতাস মদির হয়ে উঠেছে।

দুটি মোটা হুইয়ের গোড়ে নিয়ে এসে রাখলেন বোদি, দেওয়ারের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেন—“সহস্র লোকচক্ষুর সামনে মালবদল করেছে, নিভুতে সেই মধুর কর্মটি সন্ধ্যা করার জন্য এই মালা রেখে গেলাম।”

দরজা বন্ধ করে, আড়িপাতা মেয়ের দলকে বগলদাবা করে বোদি অন্তর্হিত হলেন। অলকেশের মনে হল তার শেষ ভরসাম্বলটুকু মিলিয়ে গেল, এবার অথৈ সমুদ্রে সে যেন ডুবে যাবে। নিজেকে সংযত করার আপ্রাণ চেষ্টা করে ভয়ে ভয়ে বিছানার একপ্রান্তে ধসল অলকেশ। নতমুখী বন্ধু স্থির হয়ে বসে আছে ফুলের গহনার, অলংকারে, বেনারসী শাড়ীতে জ্বলজ্বলে হয়ে!

সাতদিন ধরে পুরো ‘সঞ্চয়িতা’ মুখস্থ করার চেষ্টা করেছে অলকেশ। ভাল ভাল কবিতার লাইন মনে রেখেছে। যথাসময়ে প্রয়োগ করবে বলে। সব গোলমাল হয়ে গেল—কিছুই মনে এল না, শুধু মনে হতে লাগল জলন্ততরুর তার গলা কঠ হ'ল যচ্ছে। অসহয়ের মত দু' একবার বোয়ের মুখের দিকে চেয়ে আমতা আমতা করতে লাগল অলকেশ—“বোদিকে ডাকবে একটু? আমার ভরী তেজটা পাচ্ছে।” বো বোদিকে ডাকল না, টোঁবলের ওপরই। জলের গ্লাস ছিল, উঠে অলকেশের হাতে দিল।

অলকেশের মনে হল সে যেন মুখ টিপে হাসছে ওর বোকামী দেখে। রীতিমত হাত কাঁপতে লাগল জল খেতে গিয়ে। বো এবার সামনে এসে দাঁড়াল, বিলুপ্ত সঙ্কেচ না করে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল—“আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে?”

“হ্যাঁ, মানে—না—মানে এই মাথাটা কি রকম...”

“শুয়ে পড়ুন—সব ঠিক হয়ে যাবে।”

“সব ঠিক হয়ে যাবে”—দৈববাণীর মত মনে হল অলকেশের, ভয় নেই সব ঠিক হয়ে যাবে—কিন্তু অধটন ঘটবে না

অলকেশের জীবনে—এই কথাই কি মেয়েটির মুখ দিয়ে বললেন ভগবান? ও কি ওর মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছে? দুঃসহ আতঙ্ক ওকে কিভাবে কুরে কুরে হস্তগত দিয়েছে সারাদিন—সেকথা ওর এই সদ্যলব্ধ মর্মসংগিনীকে কি বুঝিয়ে বলা যাবে? না—অলকেশের এখন কিছু বলারই ভাষা নেই—কিন্তু তার মনে হল যেন আর একজন স্নেহপ্রবণ মমতাময়ীকে সে লাভ করেছে যে আদরে, ভালবাসায় মা, বোদিদেরই একজন।

দু'বল, ভীরু অলকেশ বদপ করে শুয়ে পড়ল বিছানায়। একটু ইতস্ততঃ করে বোকে ডাকলে—

“শোন, মানে একটু কাছে শুনে যাও।” ধীরপদে মেয়েটি এসে পাশে বসল, সুন্দর চোখ দুটি মেলে তাকাল ওর মুখের দিকে।

“আমার সপ্তে বিয়ে হওয়াতে তোমার কোনও দুঃখ হয়নি তো?”

বিস্ময়ের ছায়া পড়ল আয়ত চোখে।

“দুঃখ হবার কি কারণ আছে?”

“না—মানে তা নয়—এই বলছিলাম আর কি”—আর কোনো কথা খুঁজে পেল না অলকেশ। বোয়ের হাতখানি হাতে নিয়ে সারাদিনের স্মার্যবিক উত্তেজনার পরিশ্রান্ত, ক্ষত-বিক্ষত অলকেশ নিশ্চিন্ত হয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই অগাধ ঘুমিয়ে পড়ল।

বাইরে সানাইয়ের সুর বেজে চলেছে।

ডাঃ প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত

আধুনিক চিকিৎসা

পুস্তক সম্বন্ধে কয়েকটি মতামত

“এই বইটি বিছানার পাশে রাখার মত ডাক্তারী বই।” —দেশ

“সাধারণের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে রচিত বলই এই গ্রন্থের শৈলী সহজ ও সার্বলীল।” —বসন্ত

“The book will prove useful to the Bengali knowing busy Homeopathic Practitioners”

TORCH OF HOMEOPATHY, Jaipur.

মূল্য হ' টাকা, ডাক খরচা গা: ১-৭৫ পঃ

প্রকাশক ও পরিবেশক

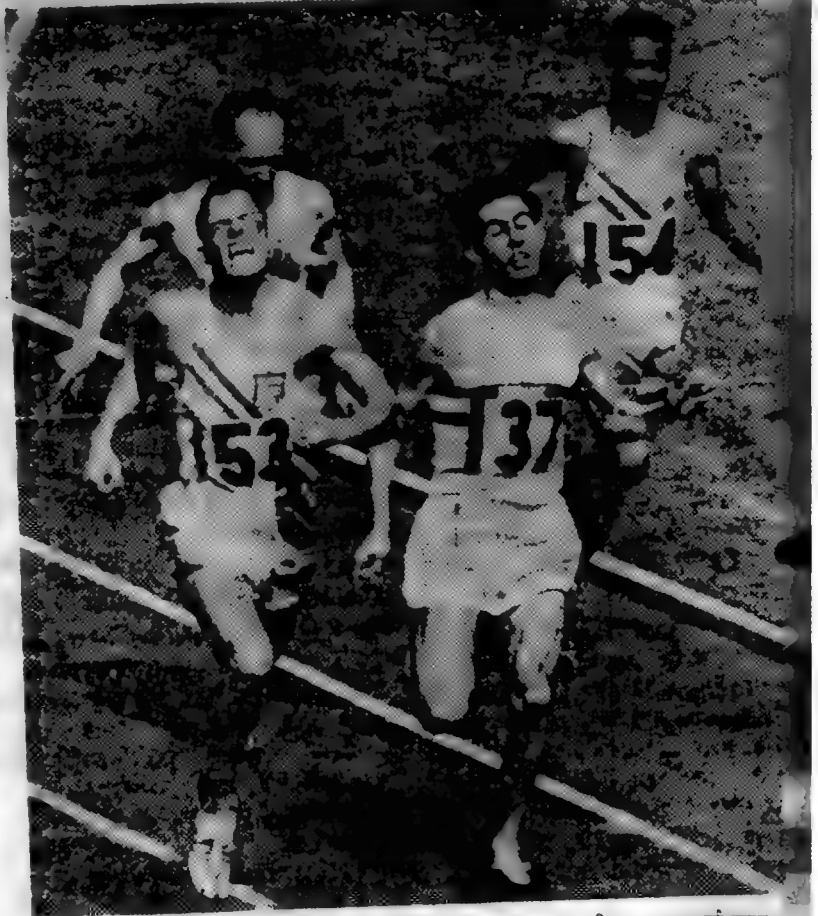
পি. এন. বি. পাবলিশার্স

৩৬বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড

কলিকাতা ২৫

ফোন ৪৭-৫০৮১ এবং ৪৭-২০১৮

মানব সমাজের জন্য সম্পর্কে আগের তুলনায় আজ যে অনেক বেশী স্বাধীন এবং সম্মান দ্বারা পরিচয় পাওয়া যায় আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিক বস্তুপাতির প্রভাবমান চিপড় থেকে। দ্রুত অতিক্রমের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক বস্তুপাতি যেভাবে চূড়ান্তভাবে কাজ করেছে তা এক সময়ে মানবের স্থপ-কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বৈজ্ঞানিক যুগ—এই নাম ছাড়াও আমরা যে সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নামে বস্তুমানকে অভিহিত করে থাকি তার মধ্যে 'স্পিড' নামটা অন্যতম। এই স্পিড হচ্ছে নতুন-অতি দ্রুত। খেলাধুলার ক্ষেত্রেও আমরা স্পিডকে আগের থেকে অনেক বেশী প্রাধান্য দিয়েছি। বিজ্ঞানের কল্যাণে খেলার বিভিন্ন অন্তর্ভুক্তি আগের তুলনায় 'স্পিড' অনেক বেশী বেড়ে গেছে। ম-একটা উদাহরণ থেকে এই অগ্রগতি সহজেই বুঝতে পারা যায়। আধুনিককালের অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধন বছরে (১৮৯৬) পুরুষদের ১০০ মিটার দৌড়ে রেকর্ড সময় দাঁড়ায় ১২.০ সেকেন্ড। আর আজ সেই ১০০ মিটার দৌড়ে অলিম্পিক এবং বিশ্ব রেকর্ড সময় দাঁড়িয়েছে ১০.০ সেকেন্ড। আজ থেকে একশ বছরের বেশী আগে ১৮৬৪ সালে আয়োজিত ১ মাইল দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ড সময় ছিল ৪ মিনিট ৫৬ সেকেন্ড। আর ১৯৬৭ সালের ২৪শ জুন তারিখে আমেরিকার কুড়ি বছরের ছাত্র জিম হাজেন ৩ মিনিট ৫১.১ সেকেন্ড সময়ে ১ মাইল দৌড়ে যে বিশ্ব রেকর্ড করেছেন তাও নিকটে ভবিষ্যতে চুরমার হয়ে যাবে বলে বিশেষজ্ঞরা কোর দিয়ে ঘোষণা করেছেন।



১৯৫৬ সালের মেলবোর্ন অলিম্পিক ৮০০ মিটার দৌড়ের সমাপ্তি। আমেরিকার কটরিন (১৫০ নং) নতুন অলিম্পিক রেকর্ড সময়ে (১ মিনিট ৪৭.৭ সেকেন্ড) বিজয়ী হন।

দৌড় পরিকল্পনা

কেননাথ রায়

দৌড় অনুষ্ঠানে অসাধারণ সাফল্যের সূত্রে যারা বিশ্ব খ্যাতিলাভ করেছেন তাদের মধ্যে এই দুজন হলেন কালজয়ী পুরুষ—ফিলিপাইডের প্যাভো নুরমি এবং চেকোস্লোভাকিয়ার এমিল জেটোপেক। প্যাভো নুরমি তিনটি অলিম্পিক গেমসে (১৯২০, ১৯২৪ ও ১৯২৮) মোট ৯টি স্বর্ণপদক জয়লাভের সূত্রে অলিম্পিক গেমসের ইতিহাসে সর্বাধিক স্বর্ণপদক জয়ের যে রেকর্ড স্থাপন করেন তা আজও কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারেননি। নুরমির অলিম্পিক স্বর্ণপদক জয় ১৯২০ সালে ১০,০০০ মিটার এবং বাস্তব ও দলগত রুস কাশি দৌড়; ১৯২৪ সালে ১,৫০০ মিটার, ৫০০০ মিটার, ৩০০০ মিটার টিম দৌড় এবং বাস্তব ও দলগত রুস কাশি দৌড়। স্বর্ণপদক জয় ১৯২৮

সালে ১০,০০০ মিটার দৌড়ে। এমিল জেটোপেক অলিম্পিক স্বর্ণপদক পেয়েছেন ৪টি—১৯৪৮ সালে ১০,০০০ মিটার, ১৯৫২ সালে ৫,০০০ মিটার, ১০,০০০ মিটার এবং ম্যারাথন দৌড় এবং প্রতিটি অনুষ্ঠানে নতুন অলিম্পিক রেকর্ড সময়ে। অলিম্পিকে একই বছরের আসরে নুর-পায়ার এই তিনটি বিষয়ে নতুন অলিম্পিক রেকর্ড সময়ে স্বর্ণপদক জয়ের নজর আর কারও নেই।

গত কয়েক বছর বিভিন্ন দূরত্বের দৌড়ে নতুন বিশ্ব রেকর্ড স্থাপনের সূত্রে আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করেছেন অস্ট্রেলিয়ার রন ক্রাক, ফ্রান্সের মাইকেল জাজি, নিউ-জিল্যান্ডের পিটার স্নেল, কেনিয়ার কিপচো কুনো, ইংল্যান্ডের বন হিল এবং আমেরিকার জিম হাজেন। দৌড়ের যে সব বিশ্ব

রেকর্ড দীর্ঘদিন অপূর্ণ ছিল সে ক্ষেত্রে চুরমার হয়ে গেছে। ওস্ট্রেলিয়ার রন ক্রাক বলতে কি গাহাডের তুমিকা নিয়েছিলেন। জাতিক এ্যাথলেটিকস জগতে মহলের জন্ম মানটা বিশেষভাবেই স্ব। এই জন্ম মাসের ৩০ দিনে ১০টি বিশ্বের যারা ২০ বার বিশ্ব রেকর্ড তৈরি করেছেন তাদের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার রন এবং ফ্রান্সের মাইকেল জাজির নাম করে উল্লেখযোগ্য। ক্রাক জন্ম মাসে বিশ্ব রেকর্ড ভাঙেন—৪ তারিখে ৩ দৌড় ১০ মিঃ ০০.৪ সেকেন্ডে ৫,০০০ মিটার দৌড় ১০ মিঃ ০০.৪ সেকেন্ডে এবং পুরুষের বারদিনের ১৬ তারিখে ১০,০০০ মিটার ৩ মিঃ ১৪.০ সেকেন্ডে। অপরদিকে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী মাইকেল ৫ মাসে এই তিনটি বিষয়ে বিশ্ব ভাঙেন—৯ তারিখে ১ মাইল মিঃ ৫০.৬ সেকেন্ডে, ২০ তারিখে মিটার দৌড় ৭ মিঃ ৪৯.০ সেকেন্ডে ২ মাইল দৌড় ৮ মিঃ ২২.৬ ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ন্যাশনাল এ্যাথলেটিক এ্যাথলেটিক ক্লাব প্রকাশিত বিশ্ব রেকর্ডের ৯ তালিকার ক্রাকের ছিল ৪টি বিশ্ব



ইরিনা ক্রিজেনস্টিন

ভাইদের নামসহ দ্রুত অতিক্রম করার সময় এবং বছর নীচে দেওয়া হল।

১ মাইল (গাড়ী ৪ মিনিট) : রোগার ব্যানিস্টার (ইংল্যান্ড), সময় ৩ মিঃ ৫৯.৪ সেকেন্ড, ১৯৫৪

২ মাইল (গাড়ী ৯ মিনিট) : প্যাভো নুরমি (ফিনল্যান্ড), সময় ৮ মিঃ ৫৮.২ সেকেন্ড, ১৯২৫

৩ মাইল (গাড়ী ১৩ মিনিট) : রন ক্রাক (অস্ট্রেলিয়া), সময় ১২ মিঃ ৫২.৪ সেকেন্ড, ১৯৬৫

৪ মাইল (গাড়ী ২৭ মিনিট) : রন ক্রাক (অস্ট্রেলিয়া), সময় ২৬ মিঃ ৪৭.০ সেকেন্ড, ১৯৬৫

১০ মাইল (গাড়ী ৪৮ মিনিট) : বি হিটলে (ইংল্যান্ড), সময় ৪৭ মিঃ ৪৭.০ সেকেন্ড, ১৯৬১

২,০০০ মিটার (গাড়ী ৫ মিনিট) : এইচ নরপথ (পঃ জার্মানী), সময় ৪ মিঃ ৫৭.৮ সেকেন্ড, ১৯৬৬

৩,০০০ মিটার (গাড়ী ৮ মিনিট) : জি রিফ (বেলজিয়াম), সময় ৭ মিঃ ৫৮.৮ সেকেন্ড, ১৯৪৯

৫,০০০ মিটার (গাড়ী ১৪ মিনিট) :

ব্যায়াম ও খেলার দ্রব্য

দাশগুপ্ত স্পোর্টস কোং

আবদুল-৫৯৫, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-১

নতুন হাফে স্পোর্টস কলিকাতা

গান্ডার হেগ (সুইডেন), সময় ১৩ মিঃ ৫৮.২ সেকেন্ড, ১৯৪২

১০,০০০ মিটার (গাড়ী ২৮ মিনিট) : রন ক্রাক (অস্ট্রেলিয়া), সময় ২৭ মিঃ ৩৯.৪ সেকেন্ড, ১৯৬৫

২০,০০০ মিটার (গাড়ী ৫৯ মিনিট) : জি রোল্যান্ডস (বেলজিয়াম), সময় ৫৮ মিঃ ০৬.২ সেকেন্ড, ১৯৬৬

অলিম্পিক গেমসের আসরে

অলিম্পিক গেমসে পুরুষদের দৌড় অনুষ্ঠানের বর্তমান সংখ্যা ৮টি। আমেরিকা এই ৪টি অনুষ্ঠানের প্রতিটিতে সর্বাধিক স্বর্ণপদক জয়ের সূত্রে অলিম্পিক রেকর্ড করেছে—১০০ মিটারে ১১টি, ২০০ মিটারে ১১টি, ৪০০ মিটারে ১০টি এবং ৮০০ মিটারে ৭টি স্বর্ণপদক। ফিনল্যান্ডের সর্বাধিক স্বর্ণপদক জয়ের অলিম্পিক রেকর্ড আছে এই দুই দূরপাল্লার দৌড়ে—৫০০০ মিটারে ৫টি এবং ১০,০০০ মিটারে ৫টি। ১,৫০০ মিটারে সর্বাধিক স্বর্ণপদক (৩টি) পেয়েছে গ্রেট ব্রিটেন এবং ম্যারাথন রেসে সর্বাধিক স্বর্ণপদক (৩টি) জয়ী হয়েছে ফ্রান্স। মোট পদক লাভের তালিকায় আমেরিকা এই ৬টি অনুষ্ঠানের প্রতিটিতে সর্বাধিক পদক জয়ের সূত্রে অলিম্পিক রেকর্ড করেছে—১০০ মিটারে



রন ক্রাক

দূরপাল্লার দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ডধারী

২৪টি, ২০০ মিটারে ২৮টি, ৪০০ মিটারে ২০টি, ৮০০ মিটারে ১৫টি, ১,৫০০ মিটারে ১১টি এবং ম্যারাথনে ৮টি। ফিনল্যান্ড সর্বাধিক মোট পদক জয়ের সূত্রে অলিম্পিক রেকর্ড করেছে বার্ষিক দুইটি অনুষ্ঠানে—৫,০০০ মিটারে ১০টি এবং ১০,০০০ মিটারে ১২টি। মহিলাদের ১০০ মিটারে সর্বাধিক স্বর্ণপদক (৪টি) এবং সর্বাধিক মোট পদক (৬টি) জয়ের



বিশ্ববিখ্যাত এমিল জেটো

অলিম্পিক রেকর্ড আমেরিকা ২০০ মিটারে আমেরিকা ২টি করে স্বর্ণপদক জয়ের সর্বাধিক স্বর্ণপদক রেকর্ড করেছে। ২০০ মিটারে মোট পদক (৪টি) জয়ের অস্ট্রেলিয়ার।

দুর্লভ মেডেল

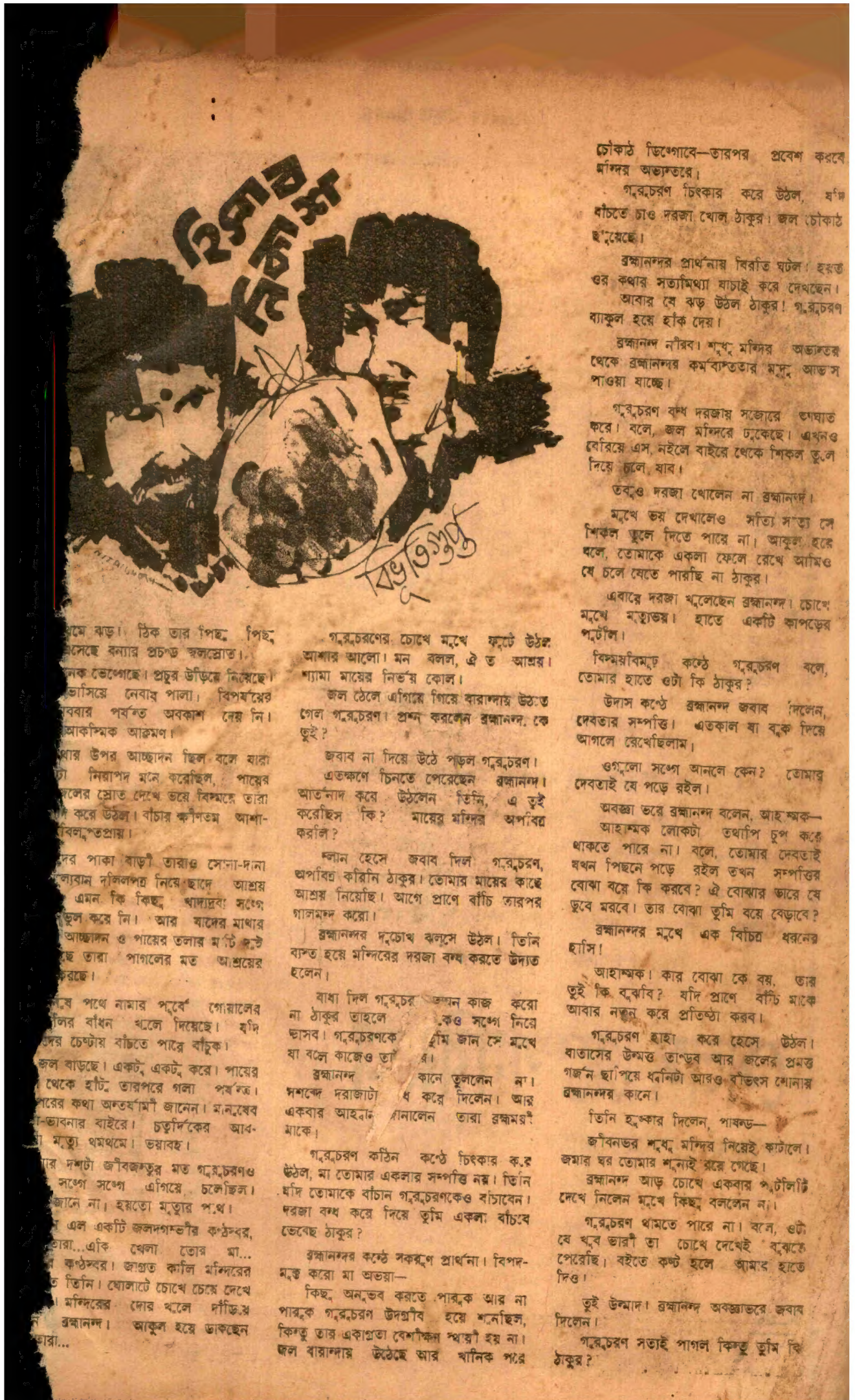
অলিম্পিক গেমসের আসরে একজনের পক্ষে ১০০ মিটার দৌড়ের স্বর্ণপদক জয় অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয়। পুরুষ বিভাগে ৬ জন এবং মহিলা চারজন এ্যাথলীট এই 'ডাবল' খে গৌরব লাভ করেছেন। পুরুষে আছেন আমেরিকার পাঁচজন এবং একজন এ্যাথলীট। উপরদিকে বিভাগের এই তালিকায় আছেন দুজন এবং একজন করে নেদারল্যান্ড আমেরিকার এ্যাথলীট।

পুরুষ বিভাগ

১৯০৪ : আর্চি হ্যান (আমেরিকা)
১৯১২ : আর সি ক্রেগ (আমেরিকা)
১৯২৮ : পার্শি উইলিয়ামস (বেলজিয়াম)
১৯৩২ : এডি টেলান (আমেরিকা)
১৯৩৬ : জে সি ওয়েন্স (আমেরিকা)
১৯৬৪ : ববি মরো (আমেরিকা)

মহিলা বিভাগ

১৯৪৮ : এফ রায়াকাস (ফিনল্যান্ড)
১৯৫২ : এম জ্যাকসন (অস্ট্রেলিয়া)
১৯৫৬ : বোটি কাথবার্ট (অস্ট্রেলিয়া)
১৯৬০ : উইলমা রুডলফ (আমেরিকা)



চৌকাঠ ডিঙোবে—তারপর প্রবেশ করবে
মন্দির অভ্যন্তরে।

গুরুচরণ চিৎকার করে উঠল, যদি
বাঁচতে চাও দরজা খোল ঠাকুর! জল চৌকাঠ
হ'য়েছে।

ব্রহ্মানন্দর প্রাথনায় বিরতি ঘটল। হঠাৎ
ওর কথার সত্যমিথ্যা যাচাই করে দেখেছেন।
আবার যে বড় উঠল ঠাকুর! গুরুচরণ
বাকুল হয়ে হাঁক দেয়।

ব্রহ্মানন্দ নীরব। শুধু মন্দির অভ্যন্তর
থেকে ব্রহ্মানন্দর কর্মবাস্ততার মন্দ্র আভাস
পাওয়া যাচ্ছে।

গুরুচরণ বন্ধ দরজায় সজোরে তপস্বী
করে। বলে, জল মন্দিরে ঢুকেছে। এখনও
বেরিয়ে এস নইলে বাইরে থেকে শিকল তুলে
দিয়ে ঢালে, যাব।

তবুও দরজা খোলেন না ব্রহ্মানন্দ।

মুখে ভয় দেখালেও সত্যি সত্যি সে
শিকল তুলে দিতে পারে না। আকুল হয়ে
বলে, তোমাকে একলা ফেলে রেখে আমিও
যে চলে যেতে পারছি না ঠাকুর।

এবারে দরজা খুলেছেন ব্রহ্মানন্দ। চোখে
মুখে মৃত্যুভয়। হাতে একটি কাপড়ের
পুটলি।

বিস্ময়বিমূঢ় কণ্ঠে গুরুচরণ বলে,
তোমার হাতে ওটা কি ঠাকুর?

উদাস কণ্ঠে ব্রহ্মানন্দ জবাব দিলেন,
দেবতার সম্পত্তি। এতকাল যা বুক দিয়ে
আগলে রেখেছিলাম।

ওগুলো সঙ্গে আনলে কেন? তোমার
দেবতাই যে পড়ে রইল।

অবজ্ঞা ভরে ব্রহ্মানন্দ বলেন, আহাম্মক—
আহাম্মক লোকটা তথাপি চুপ করে
থাকতে পারে না। বলে, তোমার দেবতাই
যখন পিছনে পড়ে রইল তখন সম্পত্তির
বোঝা বয়ে কি করবে? এই বোঝার ভারে যে
ডুবে মরবে। তার বোঝা তুমি বয়ে বেড়াবে?
ব্রহ্মানন্দর মুখে এক বিচিত্র ধরনের
হাসি।

আহাম্মক। কার বোঝা কে বয়, তার
তুই কি বুঝবি? যদি প্রাণে বাঁচি মাকে
আবার নতুন করে প্রতিষ্ঠা করব।

গুরুচরণ হাহা করে হেসে উঠল।
বাতাসের উন্মত্ত তাণ্ডব আর জলের প্রমত্ত
গর্জন ছাপিয়ে ধনিটা আরও বাঁচবে শোনার
ব্রহ্মানন্দর কানে।

তিনি হৃৎকার দিলেন, পাষন্ড—

জীবনভর শুধু মন্দির নিয়েই কাটালে।
জমার ঘর তোমার শুনাই যত্নে গেছে।
ব্রহ্মানন্দ আড় চোখে একবার পুটলিটি
দেখে নিলেন মুখে কিছু বললেন না।

গুরুচরণ থামতে পারে না। বলে, ওটা
যে খুব ভারী তা চোখে দেখেই বুঝতে
পেরেছি। বইতে কণ্ঠ হলে আমার হাতে
দিও।

তুই উন্মাদ। ব্রহ্মানন্দ অবজ্ঞাভরে জবাব
দিলেন।

গুরুচরণ সত্যি পাগল কিন্তু তুমি কি
ঠাকুর?

গুরুচরণের চোখে মুখে ফুটে উঠল
আশার আলো। মন বলল, এ ত আশ্রয়।
শ্যামা মায়ের নিভয় কোল।

জল ঠেলে এগিয়ে গিয়ে বারান্দায় উঠে
গেল গুরুচরণ। প্রশ্ন করলেন ব্রহ্মানন্দ, কে
তুই?

জবাব না দিয়ে উঠে পড়ল গুরুচরণ।
এতক্ষণে চিনতে পেরেছেন ব্রহ্মানন্দ।
আতনাদ করে উঠলেন তিনি, এ তুই
করেছিস কি? মায়ের মন্দির অপবিত্র
করলি?

শ্রদ্ধা হেসে জবাব দিল গুরুচরণ,
অপবিত্র করিনি ঠাকুর। তোমার মায়ের কাছে
আশ্রয় নিয়েছি। আগে প্রাণে বাঁচি তারপর
গালমন্দ করো।

ব্রহ্মানন্দর দুচোখ বলসে উঠল। তিনি
বাস্তব হয়ে মন্দিরের দরজা বন্ধ করতে উদ্যত
হলেন।

বাধা দিল গুরুচরণ। কখন কাজ করো
না ঠাকুর তাহলে কবে সঙ্গে নিয়ে
ভাসব। গুরুচরণকে হুমি জান সে মুখে
যা বলে কাজেও তাই রা।

ব্রহ্মানন্দ কানে তুললেন না।
দশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। আর
একবার আহবান গুনালেন তারা ব্রহ্মময়ী
মাকে।

গুরুচরণ কঠিন কণ্ঠে চিৎকার করে
উঠল, না তোমার একলার সম্পত্তি নই। তিনি
যদি তোমাকে বাঁচান গুরুচরণকেও বাঁচাবেন।
দরজা বন্ধ করে দিয়ে তুমি একলা বাঁচবে
ভেবেছ ঠাকুর?

ব্রহ্মানন্দর কণ্ঠে সঙ্কল্প প্রাথনা। বিপদ-
মুক্ত করো মা অভয়া—

কিছু অনুভব করতে পারুক আর না
পারুক গুরুচরণ উদগ্রীব হয়ে শুনছিল,
কিন্তু তার একাগ্রতা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না।
জল বারান্দায় উঠেছে আর খানিক পরে

সেমে বাড়। ঠিক তার পিছ পিছ
সেমেছে বন্যার প্রচণ্ড স্রলস্রোত।

জনক ভেপেছে। প্রচুর উড়িয়ে নিয়েছে।
ভাসিয়ে নেবার পালা। বিপদভয়ের
সববার পর্বত অবকাশ দেয় নি।
আকস্মিক আক্রমণ।

মাথার উপর আচ্ছাদন ছিল বলে যারা
তা নিরাপদ মনে করেছিল, পায়ের
জলের স্রোত দেখে ভয়ে বিস্ময়ে তারা
বুকে উঠল। বাঁচার কণীভম্র আশা-
বিলাস্তপ্রায়।

দের পাকা বাড়ী তারাও সেনা-দানা
স্বাভাবিক দলিলপত্র নিয়ে ছাদে আশ্রয়
এমন কি কিছু খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে
ভুল করে নি। আর বাদের মাথার
আচ্ছাদন ও পায়ের তলার মটি দুই
ছ তারা পাগলের মত আশ্রয়ের
করছে।

সব পথে নামার পূর্বে গোয়ালের
দিল্লির বন্ধন খুলে দিয়েছে। যদি
দের চেপ্টায় বাঁচতে পারে বাঁচুক।

জল বাড়ছে। একটু একটু করে। পায়ের
থেকে হাটু তারপর গলা পর্যন্ত।
পায়ের কথা অন্তর্হীমী জানেন। মানুষের
স্বাভাবিক বাইরে। চতুর্দিকের আব-
হা মৃত্যু থমথমে। ভয়াবহ।

তার দশটা জীবজন্তুর মত গুরুচরণও
সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলেছিল।
জানেন না। হয়তো মৃত্যুর পথ।

এল একটি জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর,
তারা...একি খেলা তোরা মা...
কণ্ঠস্বর। জাগ্রত কার্লি মন্দিরের
ত তিনি। খোলাটে চোখে চেয়ে দেখে
মন্দিরের দোর খুলে দাঁড়িয়ে
ব্রহ্মানন্দ। আকুল হয়ে ডাকছেন
তারা...

ক্রোধকরে ব্রহ্মানন্দ গজেন করে উঠলেন, গুরুচরণ—

তার ক্রোধকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা কর গুরুচরণ বলল, তুমি অশ্ব। চোখ থেকেও কিছু দেখতে পাও না। দেখবার চেষ্টাও করলে না। গুরুচরণ পাগল আর হিন্দুরের পাজারী অশ্ব। দেবে নাকি ঠাকুর তোমার এই সম্পদের ভারী বোঝাটা?

ব্রহ্মানন্দের দিকে দু'পা এগিয়ে গেল গুরুচরণ।

তুই জাহান্নামে যা—বলেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ব্রহ্মানন্দ, দু'চোখে তার সন্দের কাল ছায়া।

গুরুচরণ আর একবার হেসে উঠে তার পিছ পিছ করে নমিলে।

ভেসে চলেছেন ব্রহ্মানন্দ—ভেসে চলেছে গুরুচরণ। দু'জনের মধ্যে ব্যবধান সমানাই। ব্রহ্মানন্দ কণ্টে নিজেকে ভাসিয়ে রেখেছেন।

গুরুচরণ আস্তে আস্তে বলে, মনে হচ্ছে কন্ট হচ্ছে তোমার—বোঝাটা হালকা করবে নাকি ঠাকুর?

ব্রহ্মানন্দ জবাব দিলেন, না।

এখনও অবিশ্বাস তোমার! তোমার দাবি কি। নিজেকে কোনদিন বিশ্বাস করতে পারনি, আমাকে কেমন করে করবে...

তুই কে? কীকন্টে প্রশ্ন করেন ব্রহ্মানন্দ।

কেন...গুরুচরণ। আমাকে কি চিনতে পারছো না?

তুই শয়তান—

তুমি যে ডুবে যাচ্ছ ঠাকুর।

তাই বলে তোকে দেব? মরে গেলেও না।

গুরুচরণের বাকের মধ্যে একটা অবাক কান্না। সে বলে, আমাকে দিতে হবে না তুমি শত্রু, ফেলে দাও।

প্রতিবাদ বাক্য শোনা গেল, না—

আবার ভেসে চলল দু'জনে। এক সময় সোজাসে চিংকার করে উঠল গুরুচরণ, একটা কাঠের তক্তা ধরেছি ঠাকুর।

সাগরহ আর্তি প্রকাশ পেল ব্রহ্মানন্দের ক্রান্ত কণ্ঠে, ওটা এদিকে নিয়ে আর গুরুচরণ, আমি আর পারছি নে—

তবুও লোভ ছাড়বে না ঠাকুর? সম্পত্তির ভারে অনেকেই তলিয়ে যায়। তুমিও যাও।

আতর্নাদ করে উঠলেন ব্রহ্মানন্দ, আমার এক হাজার সেনার মোহর...

তবে যে বন্দীহলে মারের সম্পত্তি?

আবার কিসের প্রশ্ন? কারুর সাথে কোন কথা নেই। মাঝে মাঝে ডুবে গিয়েও আবার ভেসে উঠছেন ব্রহ্মানন্দ। ইতিপূর্বে অসহ্য হয়ে আসছে। আর কতক্ষণ তিনি লড়াই করবেন?



ফটো : বি

ডাকস মৃত্যুভয়ে ভীত ব্রহ্মানন্দ অনুন্নে ভোগে পড়লেন, তাকেও এ নিয়ে আয় তাই।

লাভ দেখাচ্ছ ঠাকুর? গুরুচরণ কহল, ষোল আনাই কেড়ে নিতে তুমি চাও? করেও বাধ্য দিতে পার চান?

গুরুচরণ—

নলো—

চোখের সামনে একটা মাঝে মাঝে তুই চেয়ে চেয়ে দে... ব্রহ্মানন্দ। গুরুচরণের দাবী আর না গুরুচরণের... এগিয়ে...

বিড় খেয়েছে। বন্যার জলও নে অনেক মরেছে। তার মধ্যে গুরুচরণ ব্রহ্মানন্দও আছেন। সামান্য একটা তক্তা ওদের বাঁচাতে পারে নি।

দুটি মৃত দেহই পাশাপাশি প ব্রহ্মানন্দ এক হাতে বেঁটন করে গুরুচরণকে অপর হাতে ধরা রয়েছে মোহরের পটলিটি। মরে গিয়ে গিধিল হয় নি।

শন্য পথে দুটি মৃত্ত আত্মা যেতে একবার ধামল। আত্মা দুটি এবং গুরুচরণের।

গুরুচরণের আত্মা বলল, শেষ একবার দেখে নাও—

কি দেখবো?

এখনও মৃত্তহটা মোহরে ধরে আছে—

কেন আর লজ্জা দিচ্ছ তাই,

আবার শত্রু হয় চলা...

আসামের ঐতিহ্যপূর্ণ বিচিত্র রং, নক্সার ও অপূর্ণ কারুকার্য-সম্মিলিত সিল্ক ও সূতির মেখলা, শাড়ী, বিছানার চাদর, ডিভান-কভার, কুশন-কভার, স্কার্ফ, কম্বল (লাইচাংফ) ইত্যাদি এবং আসামের পাহাড় ও উপত্যকা এবং নেফা, নাগাল্যান্ড, মণিপুর ও ত্রিপুরা থেকে সংগৃহীত আকর্ষণীয় কারুশিল্প-সামগ্রী এখানে পাবেন :

সেলস এম্পোরিয়াম

আসাম গভর্ণমেন্ট মার্কেটিং কর্পোরেশন লিঃ

৩১, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৬

(প্রবেশ পথ—পার্ক স্ট্রীট)

গ্রাম : আসামকান্ট

ফোন : ২৩-৮০৬৬

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কৃত পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।